বঙ্গদর্শন

THE ASIATIC SOCIETY
13 MAY 1958
THE ASIATIC SOCIETY CALCUTTA-16
1956

চতুর্থ খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা

মাসিকপত্র ও সমালোচন

চতুর্থ খণ্ড] বৈশাখ ১২৮২ [প্রথম সংখ্যা

প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা।

উভয়েই ঋষিকন্যা; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়লরক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।

উভয়েই ঋষিপালিতা। দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজাবরোধবাসিনীগণের ম্লানীভূত রূপলাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণপথে আসিল :—

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদংবপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥

ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন :—

Full many a lady
I have eyed with best regard,—and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too diligent ear : for several virtues
Have I liked several women ;——but you, O you
So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best !

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণী-

প্রকৃতি বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভালবাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই, কেননা তাঁহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্তলা বল্কল পরিধান করিয়া, ক্ষুদ্র কলসী হস্তে, আলবালে জলসিঞ্চন করিয়া দিনপাত করিয়াছেন—সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নবমল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণকারিণী। তাঁহার ভগিনীস্নেহ, নবমল্লিকার উপর; ভ্রাতৃস্নেহ সহকারের উপর; পুত্রস্নেহ মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ গমন কালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুন্তলা অশ্রুমুখী, কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন; তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ?

> Lord! how it looks about! Believe me, Sir,
> It carries a brave form ;—but 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা :—

> I might call him
> A thing divine, for nothing natural
> I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহার লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া, মিরন্দা বলিতেছে—

> O dear father
> Make not too rash a trial of him, for
> He's gentle, and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল—

My affections
Are then most humble ; I have no ambitions
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখ-কাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী ; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়-সংস্পর্শশূন্য ছিল ; কেননা শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্য-হৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবন মধ্যে—এক স্থানে কণ্বের তপোবন—অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন,—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে ; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্ পৃথক্ কবি-প্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুষ্মন্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়া-সক্তা ; কিন্তু দুষ্মন্তের কথা দূরে থাক্, সখীদ্বয় যত দিন না তাঁহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া, পীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া,
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাসূয়ং মুক্তা সখী,
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণ মহো! কামঃ স্বতাং পশ্যতি।

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বল্কল বাঁধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে সকল জানে না ; প্রথম সন্দর্শন কালে মিরন্দা অসঙ্কুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন—

This
Is the third man I e'er saw ; the first
That e'er I sighed for.

এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার প্রিয়-জন বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ, একপ্রকার লুকাচুরি খেলা। "সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন ?"—"তবে, আমি উঠিয়া যাই"—"আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই"—শকুন্তলার এ সকল "বাহানা" আছে ; মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না ; বৃক্ষের ফুল, সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটিয়া, ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে—

By my modesty,
The jewel in my dower—I would not wish
Any companion in the world but you ;
Nor can imagination form a shape
Besides yourself, to like of.

পুনশ্চঃ—

Hence bashful cunning !
—And prompt me, plain and holy innocence.
I am your wife, if you will marry me.
—If not, I die your maid ; to be your fellow
You may deny me, but I will be your servant
Whether you will or no.

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূলগ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়-সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্ব্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, "আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর," মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান্ চিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ

হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্য সমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রঘাতী সেরূপ টলটল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল, ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকাচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা "অদ্ধপধে স্মুমরিঅ এদম্ম হথত্তংসিণো মিণাল বলঅম্ম কদে পড়িণিবুত্তম্হি।" ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দুষ্মন্তের মুখে—

"নমু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?"—এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য, অকৃতকীর্ত্তি—অপ্রথিতযশাঃ; কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয়-সম্ভাষণ প্রণয়-সম্ভাষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেমকরা রূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্তমাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনী-কোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন তিনি শকুন্তলা-চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম; কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য্য, রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্য-হৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে —তিনজনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয়, "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল "অনার্য্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?"—সে শকুন্তলা যে লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরো-

হৃণোত্থতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা' কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা-চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা-চরিত্রের আর একভাগ বুঝিতে বাকি আছে। দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সেভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেস্‌দিমোনা, দুইজনে পরস্পর তুলনীয়া এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া, কেননা উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গোতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তকে যাহা বলিয়াছিলেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেসদিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে—

ণাবেক্খিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএবি পুচ্ছিদো বন্ধু।
এক্কক্কং এব্ব চরিএ কিং ভনদু এক্কং এক্কস্স॥

তুলনীয়া, কেননা উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—উভয়েরই "দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে মোহ, তাহা দেস্‌দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্য্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর প্রগাঢ়তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাঁহার স্বশরীরে স্বর্গারোহণ-পথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ তত্ত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেসদিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়া, কেননা দুই নায়িকারই "দুরারোহিণী আশালতা" পরিশেষে ভগ্না হইয়াছিল—উভয়েই স্বামীকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচার পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িতা হয়। ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে, কেননা মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্ প্রকারে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ—কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেসদিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল; শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুইটি চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয়া হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুইজনে তুলনীয়া কেননা উভয়েই পরম স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজ কাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাদু, মাধু যে সকল নাটক, উপন্যাস, নবন্যাস, প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকা মাত্রেই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে,তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান,আর পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্ব্বাসার ভয়ঙ্কর "অয়মহং ভোঃ" শুনিতে পান নাই। সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না বলিয়া, দেসদিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি; প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেস্‌দিমোনা গরীয়সী। স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্ত্বেও চাতুর্য্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পূর্ব্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অনার্য্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?" যখন তদুত্তরে রাজা, রাজার মত, বলিলেন, "ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে," তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন,

তুহ্মে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মত্থিদিঞ্চ লোঅস্ম।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥

এ রাগ, এ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্‌দিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেস্‌দিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীকৃত করিলেন, তখন দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।" বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই "প্রভু!" বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্‌দিমোনা "আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন।" ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও, পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন—

Alas, Iago!
What shall I do to win my lord again?
Good friend, go to him; for, by this light of heaven
I know not how I lost him; here I kneel;—

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথ শয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে, "বধ করিব!" বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান

নাই—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "তবে, ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন্!" যখন দেস্‌দিমোনা, মরণ ভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, একদিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্ত্ত জন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও, যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার্য্য কে করিল?" তখনও দেস্‌দিমোনা বলিলেন, "কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম!" তখনও দেস্‌দিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে, কেননা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকানন তুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্য্যাপ্ত, স্তূপাকৃত, রাশিরাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োদ্ধত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যাদি ব্যাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল ঊর্ম্মিলীলা,—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীতি—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

তাই বলি, দেস্‌দিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে—তন্মধ্যে অনেক-গুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ প্রণীত মানফ্রেড্—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট্ এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না, কেননা

এরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অতুল্য বলিলে হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি, কেননা ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো, নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেস্‌দিমোনার চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা জীবন্ত, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্‌দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভূলগ্নজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুষ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না, যথা,—

> ন তির্য্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং
> বচোপি পরুষাক্ষরং নচ পদেষু সংগচ্ছতে।
> হিমার্ত্তইব বেপতে সকলইব বিম্বাধরং
> প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদংগতে।

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা, ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী—অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।

সমালোচন সমাপনান্তে আমরা যদি একবার বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বতন বন্ধু ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়কে স্মরণ করি, ভরসা করি পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন। প্রাগুক্ত আচার্য্যের মত এই যে, এই সাদৃশ্য দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, কালিদাস সেক্ষপীয়রের পরবর্ত্তী; এবং ইংরেজীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এবং মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনার অনুকরণ করিয়াই শকুন্তলা প্রনয়ণ করিয়াছেন।

কমলাকান্তের দপ্তর

১৪ সংখ্যা

মশক

আরাম! বড় বিরক্তই করিল যে! এই ঘরের কোণের মশাগুলা, আর এই সংসারের কোণের মশাগুলা। আজি কোথা মনে করিলাম যে, একটু মাত্রা চড়াইয়া একবার Freedom এবং Freewill (অদৃষ্ট ও পৌরুষের) তর্কটা মীমাংসা করিব, না কোথা হইতে দুই কাহন ক্ষুদ্র পতঙ্গ আসিয়া শরীরের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া ডবল মাত্রার নেশাটা একবারে নির্মাত্র করিল!

সংসারের ক্ষুদ্র মশকগুলা আরও বিরক্তিকর। কোন একটি বিষয় কার্য্যের একটু সূত্রপাত করিয়া কেহ বসিল যদি, অমনি জঙ্গল কর্দ্দম অন্ধকার হইতে পালে পালে পতঙ্গ উড্ডীন হইতে আরম্ভ হইল। মৃদু গুণ্ গুণ্, মৃদু গুণ্ গুণ্, ক্রমে দংশন ও শোণিতশোষণ।

পুঁথিতে পড়িলাম যে, অতি অপরিষ্কার জল হইতে মশার উৎপত্তি হয়। বারাণসীস্থ জ্ঞানবাপীর অপূর্ব্ব পয়োরাশির আস্বাদ ও আঘ্রাণের কথা তখন আমার স্মরণ হইল। হিন্দুধর্ম্মের কল্যাণে ও আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে, সেই উদক এক গণ্ডূষ আমি উদরস্থ করিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ হইল। মনে হইল সেই জ্ঞানবাপীর এক গণ্ডূষ জল আনিয়া এই জীবতত্ত্বের রহস্য পরীক্ষা করিব। কিন্তু জ্ঞানবাপী কাশীধামে,—আর আমি অজ্ঞান পাপী নশীধামে। সুতরাং সে জল আমার অতীব দুষ্প্রাপ্য। তখন মনে হইল যে, বোধ হয় কালাপাহাড়ের ভয়ে বিশ্বেশ্বর সেই পথে পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার জল ঐরূপ সমল ও দুর্গন্ধ হইয়াছে। মানবই হউন আর দেবতাই হউন, পলায়নের পথে সৌরভ ছুটিবে কেন? সেই পথ অবশ্য আলোকহীন হইবে, তাহার বায়ু দূষিত হইবে, গন্ধ দুর্গন্ধ হইবে ও জল পঙ্কিল হইবে। তবে আমার স্বদেশে এমন জল বিস্তর পাইব; যে পথে নবদ্বীপ হইতে লাক্ষ্মণেয় পলায়ন করেন তাহাই আমার বঙ্গের জ্ঞানবাপী, সেই জল হইলেই আমার জীবতত্ত্বের পরীক্ষা হইবে। কিন্তু তাহার ত চিহ্ন

দেখি না। সেই পথ থাকিলে আমি সেইখানে একটা মেলা বসাইতাম। নব্য বঙ্গসন্তানগণকে একবার সেই ধূলা মাখাইয়া দিয়া বলিতাম, "যাও বাছা, শ্রীক্ষেত্রে যাও, যে পথে তোমার ধার্ম্মিক রাজা গমন করিয়াছেন, সেই পথে যাও।" তা—তাহারও কোন চিহ্ন নাই! বিশ্বেশ্বরের পথের জল আনিতে আমি যাইতে পারিলাম না, বঙ্গেশ্বরের পথের সন্ধান নাই। তবে এখন প্রসন্নর গোশালায় আশ্রয় লইতে হইল। স্বয়ং কমলাকান্ত অনেকবার সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন। সেই জলেও কার্য্য হইতে পারে। অমনি আমার চিরেতার শিশিটি ধুইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। প্রসন্ন আসিলে বলিলাম, "প্রসন্ন! তুমি সে দিন তোমার সেই পাড়া বেড়ান পঞ্চরসের সেই যে এক গণ্ডূষ দিয়াছিলে, মনে আছে ত?" প্রসন্ন যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয়, আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার সে দুধ আপনাদের ঠাকুর দেবতাদের জন্য নহে। আপনার কি মন হইল, কিছুতেই ছাড়িলেন না, তাহাতেই সে দুধ আপনাকে একটু দিয়াছিলাম।" প্রসন্নকে অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া আমি বলিলাম, "আমি সেজন্য তোমাকে অনুযোগ করিতেছি না; তুমি যে জল দিয়া সেই পঞ্চরস প্রস্তুত কর, তাহা আমাকে এই শিশিটির এক শিশি দিতে হইবে।" প্রসন্ন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয়! আমরা কি দুধে জল দি?" আমি বলিলাম "তা যাই হৌক, সেই জল একটু দিতে হইবে।" আমি শুনিয়াছিলাম (বোধ হয় দেখিয়াও থাকিব), প্রসন্নর গোশালার নিভৃত কোণে মৃৎপাত্রে জল থাকিত, যাহারা দূর জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে দুধে বড়ি খাওয়াইবার জন্য সুলভ মূল্যে নির্জ্জল দুগ্ধ লইত, প্রসন্ন তাহাদিগকে সেই গোশালার বাহিরে দাঁড় করাইয়া গাভী দোহন করিত। গোশালায় কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিত না। তাহা হইলে কাঁচা গাই চমকিয়া উঠে। যাহা হউক প্রসন্ন আমাকে সেই অমৃত কুণ্ডের জল প্রদান করিয়াছিল। শিশিটি আমি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলাম। সূত্রবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট তাহার মধ্যে অনবরত উল্টিয়া পাল্টিয়া খেলা করিতে লাগিল। তল হইতে উর্দ্ধে উঠিতেছে, উর্দ্ধ হইতে তলে নামিতেছে; উঠিবার সময় যেমন ক্রীড়া, নামিবার সময়ও তেমনিই ক্রীড়া। ক্ষুদ্র জীবের উত্থান পতন জ্ঞান নাই। সূক্ষ্ম সূত্র কীট উঠিতে পড়িতে লাগিল। আমি বসিয়া থাকি।

ক্রমে সেই সূত্রগুলি স্ফীত হইতে লাগিল। একদিক কিছু স্থূলতর হইল। তখন সেই দিক মুখ বলিলে বলা যায়। পূর্ব্বে সূত্রকীটগুলি নিমেষ কাল স্থির থাকিতে পারে নাই; এখন, বয়ঃপ্রাপ্তে কথঞ্চিৎ স্থির হইল, আর জলের উপরি মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। দুই একদিন পরে একটি মৃতবৎ ভাসিয়া রহিল; কচিৎ কিঞ্চিৎ চেতনাযুক্ত বোধ হয়; কখনও বা একেবারে জড়বৎ। আমার

শয্যা হইতে উঠিতে কিছু বিলম্ব হয়, পরদিন উঠিয়া দেখি, একটি মশক শিশিমধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে, অর জলোপরি একটি ক্ষুদ্র কীটনির্মোক ভাসিতেছে। একটি, ছুটি, তিন চারিটি করিয়া ক্রমে আমার এক শিশি মশা হইল। আমার বিজ্ঞানপরীক্ষার সার্থকতা অবলোকনে আমি পরিতুষ্ট হইলাম। একদিন নশীবাবুর গৃহিণীর স্বহস্তপ্রস্তুতীকৃত পায়স পিষ্টক সেবনে চিত্তের কিছু প্রশস্ততা লাভ করিলাম। সুন্দর উদর পূর্ত্তি না হইলে মানবের উদারতা হয় না। সেদিন সন্ধ্যার পর উদার মনে একে একে ছিপি খুলিয়া সেই পতঙ্গগুলিকে বিপুল বিশ্বে বিচরণ করিতে দিলাম। শিশিটি সরকারদের ছাদের উপর ফেলিয়া দিলাম, চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। জীবরহস্যোদ্ভেদ হইল। এইরূপে জন্ম যে জীবের, সেই জীব আমাকে আজি বিরক্ত করিল, আমার নেশা দূর করিয়া আমাকে লেখকের আসনে বসাইল। একেই বলে মানব অহঙ্কার। But man is the Lord of Creation.—but না—yet !*

বাস্তবিক মনুষ্যের অই অহঙ্কারের কথাটি মনে হইলে এত মশার কামড়েও হাস্য পায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বকলমে কলমবন্দী করিলেন যে, "ব্যাসস্তু নারায়ণঃ স্বয়ং।" ইংলণ্ডের অন্ধকবি লিখিয়াছেন যে,—

"গদ্যে পদ্যে অচেষ্টিত সাধন সাধিব।" আমাদের বাঙ্গালির সাহিত্য বিপাক বিপত্তে মধুসূদন শ্রীমধুসূদন লিখিয়াছেন যে,

———রচিব মধুচক্র
গৌড়জনগণ যাহে আনন্দে করিবে পান,
সুধা নিরবধি ;———

মানবাবতার মহাপ্রভু হর্শেল লিখিলেন যে, 'মানব—সৃষ্টির মহাপ্রভু।' আমি কমলাকান্তও মধ্যে মধ্যে উত্তম পুরুষের গৌরব গান করিয়া থাকি। এ সকল কি হাস্যকর নহে? সত্যসত্যই কি মনুষ্য সৃষ্টিকাণ্ডে একেশ্বর প্রভু? এই যে ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র প্রাণী আশীবিষ বিষে তাড়িত গতিতে শমনসদনে রপ্তানি হইতেছে, yet man is the Lord of Creation! এই যে কোথাও একটি ক্ষিপ্ত শৃগালের দৌরাত্ম্য হইলে অমনি শত শত ভগ্ন পাইক সাপ্তাহিক পত্রে পোলিশের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকটিত হইতে থাকে,—yet man is

* শুনিয়াছি এই ইংরেজি কথা কয়টিতে ব্যাকরণের তর্ক আছে। তুইটি ইংরেজি অব্যয়ের তর্ক আছে। অব্যয় লইয়া এত বাক্যব্যয় করিতে কমলাকান্তের মত নব্যয় পারে, ভব্যয় পারে না। বাতুল জ্ঞানবাপীর জল আনিয়া মশা করিতে যায়। সেই জল স্পর্শ করিলেই যে জীব মুক্ত হয় তাহা জানে না। আর নবদ্বীপের শ্রীমহাপ্রভুর মেলার যে কিরূপ বিদ্রূপ করিয়াছে, তাহা ত বুঝিতেই পারিলাম না।—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীশ।

the Lord of Creation! এই যে বীডন সাহেবের বেলবিডিয়র বাসে চিত্র প্রদর্শনের প্রথম দিনে, একটি শার্দ্দূলের পিঞ্জরদ্বার অবদ্ধ ছিল বলিয়া শত শত শ্বেত পুরুষ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইলেন, বিবিদের ত কথাই নাই,—yet man is the Lord of Creation! যে মানব বাতবৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য অনবরত গুহা রচনা করিতেছে, কীট পতঙ্গ বিনাশের জন্য দিবারাত্রি যন্ত্র সৃষ্টি করিতেছে, তাহার এরূপ আত্মগরিমা ভাল দেখায় না। সাগরের জলবুদ্‌বুদ্ সাগর শাসক নাম ধারণ করিলে ভাল দেখায় না। ভীষণ মারীভয়ে, গ্রাম, নগর, দেশ, অঞ্চল নির্মানব হইতেছে, তবু বলিবে মানব সৃষ্টির একেশ্বর! ব্যোমদেবের নিশ্বাস প্রশ্বাসে চীন হইতে পীরু উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, তবু বলিবে মানব বিশ্বসংসারের একেশ্বর! দেবী ধরণীর হৃদয়াবর্ত্তভরে, উদ্গীরিত বহ্নিরাশি জীবকাকলি-পরিপূরিত জনপদ জ্বলন্ত কবরে প্রোথিত করিতেছে, তবু কি বলিতে হইবে যে—মানব বিশ্বরাজ্যের রাজা! আর এই মৃদু মধুর তারস্বরানুকরণকারী অণুপতঙ্গে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে,—তথাপি আমাকে বলিতে হইবে যে আমি ও আমার সজাতিগণ প্রকৃত ধরাধিপ! এ অনৃতবাদে কোন প্রয়োজন নাই। আমি সর্ব্বেশ্বর বলিলেই যদি এই দুর্ব্বৃত্তগণ দূরীভূত হইত, তাহা হইলে আমি স্বয়ং মশাবিষয়িনী গাথা প্রকটন না করিয়া কমলাকান্তের স্তব রচনা করিতাম! কিন্তু এই দুর্ব্বৃত্তগণ হর্শেলের ন্যায়শাস্ত্রের বলবত্তা বুঝিতে পারে না। অতএব আজি আমি বাঙ্গালির ন্যায়শাস্ত্রের সহায় গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে দূরীভূত করিব। বাঙ্গালির ন্যায়শাস্ত্রের অর্থ 'গালাগালি।' বড় ছোটকে গালি দিবে, ছোট বড়কে গালি দিবে, সমান সমানে গালাগালি চলিবে, ইহার নাম Argument বা যুক্তি। আমি এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া আজি কলির মশামেধ যজ্ঞে এই পূর্ণাহুতি প্রদান করিলাম।

রে কীটপ্রসূত ক্ষুদ্র পতঙ্গ! অভিমানী মানবের তুই চির-শত্রু; কমলাকান্তকে আর জ্বালাতন করিস্ না। কমলাকান্ত সন্ন্যাসী, অভিমানের সঙ্গে ইহার চিরশত্রুতা। দুর হ রে! পতঙ্গ মশক। আর দূর হ রে! মানব মশক।

ক্ষুদ্রকীট, তোর গুণ্ গুণ্ মধুর সমালোচন, তোর অকারণ পৃষ্ঠদংশন, নীরবে শোণিতশোষণ—আর আমার সহ্য হয় না। তামস-প্রিয়! তুই অন্ত হইতে আর আলোকে দেখা দিস্ না। কোণ-প্রিয়! সমাজে যেন তোকে আর দেখিতে না হয়। সন্ধ্যামোদি! দিনদেবের রাজত্বকালে তুই আর কদাপি নির্গত হইস্ না। কর্দ্দমে, জঙ্গলে, বনে, পূতিগন্ধে, পয়োনালীতে তোর জন্ম—অন্ধকারে, নিভৃত লূতানিকেতনে, শয়নতলে তোর আবাস—পৃষ্ঠদংশনে আর শোণিতশোষণে তোর

আমোদ—পক্ষ হেলনে, পক্ষকম্পনে মৃদু গুণ্ গুণ্ রব, তোর তোষামোদ গান। কিন্তু কে তোর এ রবে মোহিত হইবে? যে হয় সে হউক, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী কখন মোহিত হইবে না। তোরা আমাকে জ্বালাতন করিয়াছিস্। অল্পপ্রাণ পতঙ্গ! ক্ষীণ জীব! তুই প্রভাকরের প্রভায় নষ্টপক্ষ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হস্, শীত সঞ্চারে পলায়ন করিস্, সমীরণের ঈষদ্বেগে কোথায় চালিত হস্, তাহার স্থিরতা নাই, দেবানন্দ সুগন্ধ সর্জ্জরস ধূমে তোর বংশধ্বংস হয়, রে কীটস্য কীট পতঙ্গাধম, অদ্য হইতে তোকে যেন আর সম্মুখে বা পৃষ্ঠে না দেখিতে হয়! আর অদ্য হইতে যেন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে সামান্য মশা বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভীষণ মহাদপুরে মসীবর্ষী ব্রহ্মাস্ত্রক্ষেপ না করিতে হয়। মশা মারিতে নিত্য কামান পাতিলে লোকে বলিবে,

কাপুরুষ—কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামসদয় মিত্রের সঙ্গে ললিতলবঙ্গলতার সম্বন্ধ হইবার আগে আমার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ হইয়াছিল। ললিতলবঙ্গলতার পিত্রালয়, ভবানীনগরের অনতিদূর কালিকাপুর গ্রামে। কালিকাপুরে আমার এক পিসীর বাড়ী ছিল। পিসীকর্ত্তৃক এই সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের কথাবার্ত্তা অবধারিত হইয়াছিল—কিন্তু এমত সময়ে আমাদিগের সেই কুলকলঙ্ক কন্যাকর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিল। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে রামসদয় মিত্র আসিয়া ললিতলবঙ্গলতাকে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল।

বিবাহের পূর্ব্বে আমি ললিতলবঙ্গলতাকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। আমার পিসীর বাড়ীতে আমি মধ্যে মধ্যে যাইতাম। লবঙ্গকে পিসীর বাড়ীতেও দেখিতাম—তাহার পিত্রালয়েও দেখিতাম। মধ্যে মধ্যে লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে "ক" য়ে করাত, "খ" য়ে খরা শিখাইতাম। যখন তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইল, তখন হইতে সে আমার কাছে আর আসিত না। কিন্তু সেই সময়েই আমিও তাহারে দেখিবার জন্য অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিলাম। তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গ-কলিকা ফোট ফোট হইয়াছিল। চক্ষের চাহনি চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল—উচ্চহাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দ্রুতগতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই—এ সৌন্দর্য্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না। বস্তুতঃ অতীত শৈশব, অথচ অপ্রাপ্তযৌবনার সৌন্দর্য্য, এবং অস্ফুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য্য, ইহাই মনোহর—যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসন ভূষণের ঘটা, হাসি চাহনির ঘটা,—বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ, একপ্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাও বিকৃত। যে যৌবনের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য।

যাহা হউক, এই সময়ে লবঙ্গলতা লাভে নিরাশ হওয়ায় আমি বড় ক্ষুন্ন হইলাম—বৃদ্ধ ধনকলস রামসদয়ের উপর এমন জাতক্রোধ হইলাম যে, অনেক সময়েই তাহার লম্বোদরমধ্যে ছুরিকা প্রবেশের অভিলাষ হইত। তাহার পর আর আমি বিবাহ করিতে পাইলাম না—সকল রাগটুকু রামসদয়ের উপর বৰ্ত্তিল। সে কথা আমি আর কখন ভুলিলাম না।

ইহার কয়বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। পশ্চাৎ বলিব কি না, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমি গৃহত্যাগ করিলাম। সেই পর্য্যন্ত নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াই বেড়াই। কোথাও স্থায়ী হইতে পারি নাই।

কেন বল দেখি? আমি ক্রুর, খল, দ্বেষক, মন্দ—যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বল—আমি সব স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমি এই সুখময় গৃহ—এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া, বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম, কেন বল দেখি? কেন আমি, আমার সেই জন্মভূমিতে রম্য গৃহ রম্য সজ্জায় সাজাইয়া, রঙ্গের পবনে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া, হাসির বানে দুখ-রাক্ষসকে বধ করিলাম না? আমার কি দুঃখ? আমার কেহ নাই? কাজ কি কেহতে? কে কার? কার কে? জীবনের নদী কি একা পার হওয়া যায় না? কে বারণ করে? কতটুকু পাড়ি? কিসের সহায়? সহায়ে কি হইবে? একা আসিয়াছি, একা যাইব, একা থাকিব না কেন? জড়জগৎ জগৎ, অন্তর্জ্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্যজগতে কয়টা সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি নাই? আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্যজগৎ দেখাইবে সাধ্য কি? যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে উঠে, যে সাগর এ অন্ধকারে আপনি মাতে, তোমার বাহ্য জগতে তেমন কোথায়?

তবে কেন, সেই নিশীথ কালে, সুষুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যপ্রভা—দূর হৌক। কেন গরল খাইলাম না—কেন জলে ডুবিলাম না, কেন গলায় ছুরি দিয়া মরিলাম না! আমার বড় যন্ত্রণা হইতেছে—আমি মনের কথা বলি বলি, অথচ বলিতে পারিতেছি না। একদিন নিশীথ কালে—এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে শুষ্ক বদরীর মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল—আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না। দেশে দেশে ফিরিলাম—জ্বালা নিবিল না।

আবার ফিরিলাম কেন? সংসারের বন্ধন দুশ্ছেদ্য কেন? কিছুতেই এ বাঁধন কাটা যায় না কেন? আমি কার, কে আমার? তবে আমি আবার ফিরিয়া লোকালয়ে আসিলাম কেন? লোকালয়ের জন্য আমি এত কাতর কেন? লোক

আমার কে ? আমি লোকের কে ? কে আমায় ভালবাসে ? কে আমার জন্য কাতর ? কে আমার জন্য এক দিনের সুখ অল্প করিয়া ভোগ করে ? কে আমার জন্য এক দিনের আমোদ বন্ধ করে ? সুখের সময় কে আমাকে ভাবে ? এমন কে লোকালয়ে আছে ? তবে আমি লোকের জন্য কাতর কেন ? আমি কাহার সুখ বাড়াইব,—কে আমার সুখ বাড়াইবে ? আমি কাহার দুঃখ নিবারণ করিব—কে আমার দুঃখ নিবারণ করিবে ? এমন কি পৃথিবীতে আমার কেহ নাই ? না, এই অনন্ত অসীম, সাগর নদ নগর দেশ প্রদেশ প্রান্তর কানন মণ্ডিত, বিশাল, দুশ্চিন্ত্য জগতে আমার এমন কেহ নাই। কেহ নাই! কেহই নাই! ভাবিয়া, ভাবিয়া, ভাবিয়া, খুঁজিয়া, খুঁজিয়া দেখিলাম এমন কেহ নাই। তবে ভাবি কেন ? কেন ভাবি, তাই ভাবি।

তবে, এ সংসারের মায়া বড়ই দুশ্ছেদনীয়া। অথবা মন বড়ই অবশ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোন সচ্চরিত্র, অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। হরেকৃষ্ণদাসের নিবাস যে গ্রামে, ইঁহারও নিবাস সেই গ্রামে। সে কথা আমি জানিতাম না। ইনি বহুকাল হইতে কাশী-বাস করিয়া আছেন।

একদা তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন কালে পুলিসের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে উত্থাপিত হইল। অনেকে পুলিসের অত্যাচারঘটিত অনেকগুলিন গল্প বলিলেন—দুই একটা বা সত্য, দুই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত। গোবিন্দ-কান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই—

"হরেকৃষ্ণ দাস নামে আমাদিগের গ্রামে একঘর দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার একটি শিশু কন্যা ছিল। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সে নিজেও রুগ্ন। এজন্য সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল। তাহার কন্যাটির কতকগুলিন স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভবশতঃ তাহা সে শ্যালীপতিকে দেয় নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলঙ্কারগুলি সে আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল—বলিল যে 'আমার কন্যার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবেন—এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ করিবে।' আমি স্বীকৃত হইলাম। পরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া, নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণের ঘটিবাটী পাতর টুকনি লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ বলিল যে, হরেকৃষ্ণ

1908 ASIATIC SOCIETY 13 MAY 1958

লাওয়ারেশ নহে—কলিকাতায় তাহার কন্যা আছে। দারোগা মহাশয় তাহাকে কটু বলিয়া, আজ্ঞা করিলেন, 'ওয়ারেশ থাকে, হজুরে হাজির হইবে।' তখন, আমার তুই একজন শত্রু সুযোগ মনে করিয়া বলিয়া দিল যে, গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার সুবর্ণালঙ্কার আছে। আমাকে তলব হইল। আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলাম। কিছু গালি খাইলাম। আসামীর শ্রেণীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম। বলিব কি? ঘুষাঘুষির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কারগুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিলাম; তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

বলা বাহুল্য যে দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন কন্যার ব্যবহারার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, হরেকৃষ্ণ দাসের এক লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তিই নাই; এবং সে লাওয়ারেশা ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই।"

যখন রামসদয়ের সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হয়, তখন রামসদয়ের বাপের উইলের কথা সবিশেষ শুনিয়াছিলাম। হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম এবং জানিতাম যে কথিত লাওয়ারেশা রিপোর্টের নকল দৃষ্টি করিয়াই বিষ্ণুরাম বাবুর বিষয় রামসদয়ের পুত্রদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। আমি গোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "ঐ হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাইয়ের নাম মনোহর দাস না?"

গোবিন্দকান্ত বাবু বলিলেন, "হাঁ। আপনি কি প্রকারে জানিলেন?"

আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরেকৃষ্ণের শ্যালী-পতির বাড়ী কোথা?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "কলিকাতায়। কিন্তু কোন্ স্থানে তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।"

ইহার অল্পদিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম। লবঙ্গলতা-অপহরণের প্রতিশোধ করিব।

অনেক দিন কলিকাতায় রাজচন্দ্র দাসের অনুসন্ধান করিলাম। কোন সন্ধান পাইলাম না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একদা কোন গ্রাম্য কুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রামপর্য্যটনে গিয়াছিলাম। একস্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল; দয়েল সপ্তস্বর মিলাইয়া আশ্চর্য্য ঐকতানবাদ্য বাজাইতেছে; চারিদিগে বৃক্ষরাজি; ঘনবিন্যস্ত,

কোমল শ্যাম, পল্লবদলে আচ্ছন্ন; পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি মিশামিশি, শ্যামরূপের রাশি রাশি; কোথাও কলিকা, কোথাও স্ফুটিত পুষ্প, কোথাও অপক্ক, কোথাও সুপক্ক ফল। সেই বনমধ্যে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একজন বিকট মূর্ত্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতেছে।

দেখিবা মাত্র বুঝিলাম পুরুষ অতি নীচ জাতীয় পাষণ্ড—বোধ হয় ডোম কি সিউলি—কোমরে দা। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত।

ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাদ্ভাগে গেলাম। গিয়া তাহার কক্ষাল হইতে দা খানি টানিয়া লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম। দুষ্ট তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল—আমার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল।

বুঝিলাম, এস্থলে বিলম্ব অকর্ত্তব্য। একবারে তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিলাম। ছাড়াইয়া সেও আমাকে ধরিল। আমিও তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিলাম। তাহার বল অধিক। কিন্তু আমি ভীত হই নাই—বা অস্থির হই নাই। অবকাশ পাইয়া আমি যুবতীকে বলিলাম যে, তুমি এই সময়ে পলাও—আমি ইহার উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।

যুবতী বলিল,—কোথায় পলাইব? আমি যে অন্ধ! এখানকার পথ চিনি না।

দেখিলাম, সে বলবান্ পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম, যে দিকে আমি দা ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সেই দিকে সে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি তখন দুষ্টকে ছাড়িয়া দিয়া অগ্রে গিয়া দা কুড়াইয়া লইলাম। সে এক বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া, তাহা ফিরাইয়া আমার হস্তে প্রহার করিল—আমার হস্ত হইতে দা পড়িয়া গেল। সে দা তুলিয়া লইয়া, আমাকে তিন চারি স্থানে আঘাত করিয়া পলাইয়া গেল।

আমি গুরুতর পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহুকষ্টে আমি কুটুম্বের গৃহাভিমুখে চলিলাম। অন্ধ যুবতী আমার পদশব্দানুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া আর আমি চলিতে পারিলাম না। পথিক লোকে আমাকে ধরিয়া আমার কুটুম্বের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

সেই স্থানে আমি কিছু কাল শয্যাগত রহিলাম—অন্য আশ্রয়াভাবেও বটে, এবং আমার দশা কি হয়, তাহা না জানিয়া কোথাও যাইতে পারে না, সে জন্যও বটে, অন্ধ যুবতীও সেইখানে রহিল।

বহুদিনে, বহুকষ্টে আমি আরোগ্য লাভ করিলাম। ক্রমে যুবতীর পরিচয় পাইলাম। তাহার নাম রজনী—পিতার নাম রাজচন্দ্র দাস। আমি যে রাজচন্দ্র দাসের সন্ধান করিতেছিলাম এ সেই রাজচন্দ্র নহে ত ?

রজনীর নিকট হইতে ঠিকানা জানিয়া লইলাম। ঠিকানা বলিতে রজনী নিতান্ত অনিচ্ছুক, কিন্তু আমাকে অদেয় তাহার কিছুই ছিল না, কেন না আমি প্রায় আপনার প্রাণ দিয়া তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলাম।

রজনী আপাততঃ সেইখানেই রহিল। আমি রাজচন্দ্র দাসের অনুসন্ধানে কলিকাতায় গেলাম। তাহার সঙ্গে কথোপকথনে জানিলাম যে, রজনী হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বটে।

তখন আমি রজনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম। এক নিভৃত গৃহে তাহাকে স্থাপিত করিলাম। সে আমার কাছে স্বীকৃতা হইল যে, সে গৃহ হইতে বাহির হইবে না। বা কাহাকেও দেখা দিবে না। তৎপরে আমি প্রমাণ সংগ্রহে যাত্রা করিলাম। পুনরপি গোবিন্দকান্ত বাবুর কাছে গেলাম। বালার মোকদ্দামার সন্ধান তাঁহারই কাছে প্রাপ্ত হই। সে মোকদ্দামা বর্দ্ধমানে হয়। তাঁহার সাহায্যে অন্যান্য প্রমাণও সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম। বিস্তারে প্রয়োজন নাই।

এখন মোকদ্দামা করিলে, রজনী যে বিষয় পাইবে তাহা নিশ্চিত বুঝিলাম। আমার অভিপ্রায়, রজনীকে বিবাহ করি। কিন্তু আশ্চর্য্য! রজনী, আমার জন্য প্রাণদানেও সম্মতা, তথাপি বিবাহ করিতে সম্মতা হইল না। ভাবগতিকে বুঝিলাম যে আমি যদি পীড়াপীড়ি করি, তবে সে আত্মহত্যা করিবে।

কিন্তু যদি আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ না হইল, তবে তাহার বিষয়োদ্ধারে আমার ইষ্ট কি ? আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, বিষয়োদ্ধারেও রজনী নিতান্ত অসম্মতা। পরিশেষে, আমার অনুরোধে তাহাতে সম্মত হইল—তাহার উদ্ধারার্থে আমি যে আহত হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া, আমার অনুরোধে সম্মত হইল। বিষয়োদ্ধারের পর বিবাহ করিবে, এমত ভরসাও পাইলাম। এবং ইহাও স্বীকার করিল যে, যতদিন না বিবাহ হয়, ততদিন সে আমার গৃহে, আমার পত্নীপরিচয়ে থাকিবে। বহুকষ্টে এ সকল কথা তাহাকে স্বীকার করাইলাম। আমাকেও স্বীকার করিতে হইল যে, যত দিন না বিবাহ হয়, ততদিন আমি তাহাকে পরস্ত্রী বিবেচনা করিব।

কেবল আমার ঋণ পরিশোধার্থ রজনী এতদূর স্বীকার করিয়াছিল। তাহার পরে সে কি প্রকারে যে ফাঁকি দিল, তাহা বলিয়াছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রজনীর শান্তিপুরে যাইবার কথা রাজচন্দ্র দাসকে কাজে কাজেই বলিতে হইল। শুনিয়া রাজচন্দ্র বলিল যে, তবে আমি আর কি সম্বন্ধে এখানে থাকি? আমাকেও বিদায় দিন্।

অগত্যা তাহাও স্বীকার করিতে হইল। রাজচন্দ্রকে একটি বাড়ী কিনিয়া দিলাম। কিছু কিছু মাসিক দিতে স্বীকৃত হইলাম। রাজচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া নূতন বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিল। রজনীকেও সেইখানে লইয়া যাইবার জন্য সে অনেক যত্ন করিল, কিন্তু কিছুতেই রজনী সম্মতা হইল না। সে শান্তিপুরে গেল।

আমি তখন একা—একা কি করিলাম? এই কণ্টকময় জীবনারণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আপাততঃ কলিকাতাতেই রহিলাম। দেখিব, লোকালয়ে কি সুখ। লোকের সঙ্গে মিশিতে লাগিলাম। লোকও আমার সঙ্গে মিশিতে লাগিল। অনেক লোক আমার বশীভূত হইতে লাগিল। কাহাকে কথায় বশ করিলাম, শুধু মিষ্ট কথায়, কাহাকে আলাপে; কাহাকে অর্থের দ্বারা বশ করিলাম, অর্থাৎ কাহাকে অল্প অল্প নগদ দিলাম, কাহাকে ঋণের আশায় রাখিলাম। কাহাকেও ঋণ দিলাম না—কর্জ্জ লইলেই শত্রু হয়। কাহাকে কেবল পরামর্শ দিয়া বাধ্য করিলাম—কাহারেও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া আরও বাধিত করিলাম। কাহারও পীড়ার সময়ে আত্মীয়তা করিয়া আত্মীয় করিয়া তুলিলাম,—কাহারও সুখের দিনে সুখ বাড়াইয়া দিয়া অনুগত করিয়া লইলাম। কাহারও বক্তৃতা লিখিয়া দিলাম—লোকের কাছে প্রকাশ করিলাম না;—কাহারও সুখ্যাতি সম্বাদপত্রে লিখিয়া তাহাকে ক্রীতদাস করিলাম—কাহারও শত্রুনিন্দা লিখিয়া আরও আপ্যায়িত করিলাম। কাহারও কাছে মিষ্ট গল্প করিয়া বন্ধু করিয়া লইলাম—কাহার অমিষ্ট গল্প নীরবে কান পাতিয়া শুনিয়া তাহাকে প্রেমডোরে বাঁধিলাম। কাহাকে হাস্য পরিহাসে প্রীত করিলাম; কাহারও রসশূন্য পরিহাসে হাসিয়া কিনিয়া রাখিলাম। কেহ আমাকে ধার্ম্মিক ভাবিয়া ভালবাসিল—কেহ আমাকে তাহার আপনার মত অধার্ম্মিক বলিয়া ভালবাসিল। কেহ কোন জ্ঞাতি বা অন্য শত্রুর নিন্দা করিতে ভালবাসিত, আমি বিনা আপত্তিতে তৎকৃত জ্ঞাতিনিন্দা শুনিতাম;—কেহ আপনার কুচরিত্রা পত্নীর বা কুপুত্রের বা ততোধিক নিন্দার্হ কোন প্রেমাস্পদীভূত বা প্রেমাস্পদীভূতার সুখ্যাতি করিতে ভালবাসিত, তাহাও কান পাতিয়া শুনিতাম; উভয়েরই প্রিয় হইলাম। পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খের কাছে কতকগুলা গ্রন্থের নাম করিয়া পূজ্য হইলাম—যথার্থ পণ্ডিতদিগের সারগর্ভ বাক্যের মর্ম্মগ্রহণে যত্ন করিয়া তাঁহাদিগেরও শ্রদ্ধা লাভ করিলাম।

অনেকেই শুধু আমার গাড়ি জুড়ি বাড়ী দেখিয়া গোলাম হইল। কেহ বা সে *সকলের নিন্দা করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য ইঙ্গিতে জানাইতেন, আমি সে নিন্দা* প্রকারতঃ স্বীকার করিতাম—সুতরাং তাঁহাদিগেরও আমি প্রিয় হইলাম। কেহ কেবল আমার গাড়ি ঘোড়াতে চড়িয়াই বাধ্য! অল্পদিন মধ্যেই শুনিতে পাইলাম যে, অমরনাথ ঘোষ কলিকাতায় একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক—সকলেরই প্রিয়! অল্পকালমধ্যে দেখিলাম আত্মীয় লোকের জ্বালায় আমার স্নানাহারেরও অবকাশ নাই।

কাহারও কিছু কাড়িয়া লইব, কাহাকেও বঞ্চনা করিব, পাকচক্রে বড় লোক হইব—এরূপ কোন অভিসন্ধিতে আমি এ জাল পাতিলাম না। আমি যাহা হই—আমাকে যদি ক্ষুদ্র প্রবঞ্চক মনে করিয়া থাক, তবে ভুলিয়াছ। রজনীর সম্পত্তি আমি বঞ্চনা করিয়া লই নাই—সে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে দিয়াছে—যে দিন চাহিবে সেইদিন প্রত্যার্পণ করিতে রাজি আছি। শচীন্দ্রের সম্পত্তি ন্যায়ানুসারে রজনীর—তাহাতেও কাহাকে প্রবঞ্চনা করি নাই। এখনও কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা জন-সমাজকে প্রবঞ্চনা করিব, সে অভিপ্রায় রাখিতাম না।

তবে কেন এ জালবিস্তার? কেবল লোকালয়ে কি সুখ তাহা দেখিব, এই কামনায়। তাহা দেখিলাম; ইহা অপেক্ষা অরণ্য ভাল। এখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এ বিষয় সংগ্রহ করিলাম? রজনী ইহা পুনর্গ্রহণ করুক—লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করুক।
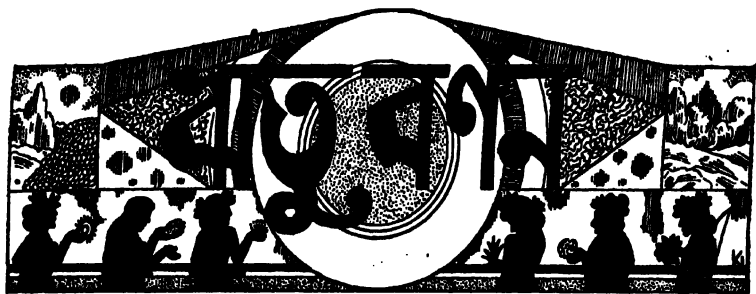
কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য ; বর্ণন ও শোধন।

এই জগৎ শোভাময়। যাহা দেখিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুকোমল, তৎসমুদায়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য খুঁজিতে হয় না—এ জগৎ যেমন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি ইহার যথার্থ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা মাত্রই কাব্য।

সংসার সৌন্দর্য্যময় কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, তাহারও অভাব নাই। পৃথিবীতে কদাকার, কুবর্ণ, পূতিগন্ধ, কর্কশস্পর্শ ইত্যাদি বহুতর কুৎসিত সামগ্রী আছে এবং অনেক বস্তু এমনও আছে যে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের ভাব বা অভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। ইহাও কি কাব্যের সামগ্রী? অথচ ঐ সকলের বর্ণনাও ত কাব্য-মধ্যে পাওয়া যায়—এবং অনেক সময় যাহা অসুন্দর, তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্যস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। কারণ কি?

সকলেই বৃদ্ধিশালী। কাব্যের অধিকারও বৃদ্ধির নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদৌ সুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু জগতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত ; অনেক সুন্দরের বর্ণনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অসুন্দরের বর্ণনা ; অনেক সময়ে আনুষঙ্গিক অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যে স্থান পাইয়াছে ; কালে বর্ণনা মাত্রই বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা বহিস্কৃত করিয়া কাব্যের

ঋতুবর্ণন। শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত। চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্র।

প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, "যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই" সেই আত্মচিত্ত-প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্য্যের অতি প্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না। ইহাকেই আমরা প্রবন্ধারম্ভে শোধন বলিয়াছি। যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য কেবল "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" তাহাকেই আমরা বর্ণন বলিয়াছি।

আমরা দুই জন আধুনিক বাঙ্গালি কবির কাব্যকে উদাহরণস্বরূপ প্রয়োগ করিয়া এই কথাটি সুস্পষ্ট করিতে চাহি। যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেমবাবু প্রণীত "বৃত্রসংহার" তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া, মনোহর নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লোকের মনোমোহন করিতেছেন। মানব স্বভাব সংশুদ্ধ হইয়া দৈব এবং আসুরিক প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে; কর্কশ পৃথিবী পরিশুদ্ধা হইয়া স্বর্গে ও নৈমিষারণ্যে পরিণত হইয়াছে। যে জ্যোতিঃ দেবগণের শিরোমণ্ডলে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। যে জ্বালা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। সংসারকে শোধন করিয়া কবি আপনার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত ঋতু-বর্ণন। ইহাতে প্রকৃতির সংশোধন উদ্দিষ্ট নহে—প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য জগতের আলোকচিত্র ইহার উদ্দেশ্য। উভয়েই কৃতকার্য্য, উভয়েই সুকবি কিন্তু প্রভেদও অতি স্পষ্ট। একটী উদাহরণে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উভয়েরই কাব্যে বিদ্যুৎ আছে—গঙ্গাচরণ বাবুর কাব্যে বিদ্যুৎ উৎকৃষ্টরূপে আত্মকার্য্য সম্পন্ন করে, যথা—

ঘনতম ঘোরঘটা ক্রমে ঘোরতর,
চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, অতি ভয়ঙ্কর।
চপলা চমকি প্রভা করিছে বাহির।
ভীষণ নিনাদে ঘন নির্ঘোষে গভীর।

চারি ছত্রে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ, ইহাতে অসম্পূর্ণতা কিছুই নাই। দোষ ধরিবার কথা কিছুই নাই। যাহা প্রকৃত তাহার কিছুরই অভাব নাই—তাহার অতিরিক্ত একটি কপর্দ্দক নাই। পরে হেমবাবুর বিদ্যুৎ দেখ—

কিম্বা গিরিশৃঙ্গ রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি
ক্ষণ প্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা।
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা॥
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরিচুড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাবে,
বেগে দীপ্ত গিরি কায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লাসিত ভাবে॥

স্থানান্তরে বিদ্যুৎ আরও শোধিত, উৎকর্ষতা-প্রাপ্ত—

কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে।
তুই সে মেঘের অঙ্গে খেলাতিস্ কত রঙ্গে
ঘটা করি লহরে লহরে॥

এক্ষণে গঙ্গাচরণ বাবু প্রণীত দুই একটি "আলোকচিত্র," পাঠককে উপহার দিব। দেখিবেন আলোকচিত্র ঠিক উঠিয়াছে। নিদাঘ কালের গৃহদাহ বর্ণনা করিতেছেন—

বায়ু সঙ্গ চালি অঙ্গ দেখ অগ্নি রোষিছে,
শুষ্ক ঘাস, রজ্জু, বাঁশ শক্তি তার পোষিছে;
দীপ্ত কায় মত্ততায় ভীম মূর্ত্তি খেলিছে;
রশ্মিভাগ রক্তরাগ পল্লিমাঝ মেলিছে;
গেহচাল, বৃক্ষডাল, দাহি বহ্নি মাতিছে;
শূন্যপুরি ভূরি ভূরি বিস্ফুলিঙ্গ ভাতিছে;
ধূমরাশি ভাসি ভাসি ঊর্দ্ধদেশ যাইছে;
ভস্মভার অন্ধকার অন্তরীক্ষ ছাইছে;
উচ্চরোল সোরগোল তাপতেজ বাড়িছে;
বংশরাজি বোম বাজি তুল্য শব্দ ছাড়িছে;
ধেনুপাল আলথাল উদ্ধ মুখ চাহিছে;
দগ্ধকায় শারিকায় মৃত্যুগীত গায়িছে;
"বারি আন," "চাল টান," লোকপুঞ্জ হাঁকিছে;
দীনতায় কাতরায় দেবতায় ডাকিছে;
দূর্ব্বা, ধান, বস্ত্র, পান, অগ্নিমাঝ ডালিছে;
বাষ্পবারি কুম্ভবারি একতায় ঢালিছে;

আর্ত্তনাদি তৈজসাদি আঙ্গিনায় নাড়িছে ;
কেহ কেহ বাস গেহ ভাঙ্গি ভূমি পাড়িছে ;
মুক্ত কেশ, ছিন্ন বেশ, দৌড়াদৌড়ি ধাইছে ;
তপ্ত অঙ্গ, চিত্ত ভঙ্গ, পানবারি চাইছে ;
গেল বাস, সর্ব্বনাশ, বালবৃদ্ধ কাঁদিছে ;
একি দায় ! চোর তায় চৌর্য্যবৃত্তি সাধিছে ;
বহ্নিজাল পণ্যশাল ঘেরি দেখ লাগিছে ;
মাস, মুগ, তৈল, পূগ, খায় আর রাগিছে ;
গেল ঠাট, পুঁজিপাট, মুদি মুণ্ড কুটিছে ,
হায় হায় ! মৃত্তিকায় দেহপাতি লুটিছে ;
নষ্টদেশ, অর্থশেষ নাহি কার থাকিছে ,
ছারখার ভস্মভার দগ্ধধাম ঢাকিছে ;
গ্রামখণ্ড লণ্ডভণ্ড অগ্নিচণ্ড নামিছে ;
দাহিবার নাহি আর ধিকি ধিকি থামিছে ;

নিম্নোদ্ধৃত কয় ছত্রে বাত্যার পর প্রকৃতির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে—

দেখি গিয়া পরদিন, জনপদ শোভাহীন,
লণ্ডভণ্ড মানব বসতি ;
দুরাচার প্রভঞ্জন দৌরাত্ম্যের নিদর্শন
গেছে রেখে, শোচনীয় অতি ;
কতশত তরুবর মূলসহ কলেবর
মৃত্তিকায় করেছে বিস্তার ;
আর নাহি তুলি কায়া, পথিকেরে দিবে ছায়া,
ফল ফুলে তুষিবে না আর।
তাহাদের অধিবাসী, বিহঙ্গম রাশি রাশি,
আছে পড়ে এখানে সেখানে ;
কত বৃক্ষ কাণ্ড সার, নাহি শাখা অলঙ্কার,
স্থাণু হয়ে আছে স্থানে স্থানে।
নরবাস আলথাল, গৃহ হতে কত চাল
দূরে গিয়া, শুয়েছে ভূতলে ;
অনেক ইটের গেহ ত্যজেছে প্রাচীন দেহ,
অঙ্গহীন হয়েছে সকলে।
পথে চলা কষ্ট অতি, ডালে চালে রোধগতি,
স্থানে স্থানে সেতুর নিপাত ;
বিনষ্ট বাজার হাট, ভেঙেছে দোকান পাট,
হানে মুদী শিরে করাঘাত।

মাঠে ঘাটে, জলে ঝড়ে,　　মরে মরে আছে পড়ে
ধেনু মেষ মহিষ বিস্তর ;
কত নর ভাগ্য দোষে　　পড়িয়া ঝঞ্ঝার রোষে
গেছে চলে শমনের ঘর।
ভাসে শব নদী নীরে,　　কত বা লেগেছে তীরে,
কত দ্রব্য স্রোতে ভেসে যায়,
উলটিয়া কত তরী　　ভাসিছে সলিলোপরি,
ভেঙে কত রয়েছে চড়ায়।
বিদলিত কত কুঞ্জ,　　ছিন্ন ভিন্ন লতা পুঞ্জ,
বিহঙ্গের নাহি কণ্ঠকল,
নর নারী হতজ্ঞান,　　হয়ে অতি ম্রিয়মাণ,
ফেলিতেছে নয়নের জল।

আমরা যে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম, উভয়েই শোধনশূন্য উৎকৃষ্ট বর্ণনার উদাহরণ। গঙ্গাচরণ বাবুর কবিতা পড়িয়া, ইংরেজি কবিদিগের মধ্যে ক্রাব (Crabbe)কে মনে পড়ে। কিন্তু ক্রাবের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করিতেছি বলিয়া, বাঙ্গালি কবিদিগের মধ্যে বর্ণনাকাব্য দুর্লভ এমত নহে। বাঙ্গালি সাহিত্যে শোধন এবং বর্ণন উভয়বিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য্য আছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব গীতিকাব্য প্রণেতৃগণ শোধনপটু। বর্ণনকাব্য প্রণেতৃগণমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একজন।

ইহাও বক্তব্য যে গঙ্গাচরণ বাবু স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন যে, তিনি শোধন কাব্যেও অপটু নহেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রভাত-বর্ণনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

মরি কি তরল অমল কিরণে,
ঢল ঢল আভা ঢালিয়া ভুবনে,
পুলকজনক আলোক ভূষণে,
প্রাচী নভোদ্বারে ঊষা উপনীত,
আরক্ত অধরে কিবা হাসি হাসে,
সে হাসি হিল্লোলে চরাচর ভাসে,
নিশার তামস মিশায় আকাশে,
হেরিয়া হইল অখিল মোহিত।
মোহিনী মাধুরী করি দরশন
প্রণয় প্রয়াসে আপনি তপন
আদরেতে কর করে প্রসারণ,
রূপসীরে যেন হৃদয়ে ধরিতে,
অপরূপ রুচি মানস রঞ্জন,
শান্তির সহিত শোভার মিলন,
সে রুচি দেখাতে বিহঙ্গমগণ
জাগায় জগৎ মধুর ধ্বনিতে।
সুধীর গমনে সমীর শীতল
চলেছে জুড়াতে তাপিত ভূতল ;
প্রফুল্ল আননে প্রসূন সকল
পরশনে তার নাচে ধীরে ধীরে ;
নলিনী নিকর তাহার হিল্লোলে
কাচসম স্বচ্ছ সরসীর কোলে
হাসি হাসি মুখে আধ আধ দোলে,
নিরখি গগনে নবীন মিহিরে।

আমরা যাহা কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা নিদাঘ হইতে। এই ঋতুবর্ণনে ছয় ঋতুর বর্ণনা নাই—আপাততঃ বসন্ত এবং নিদাঘই প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বসন্ত হইতে নিদাঘ সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট এবং এতদুভয় যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। নিদাঘের উৎকর্ষ হেতু আমরা নিদাঘ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমরা ভরসা করি যে, গঙ্গাচরণ বাবু এই ঋতুবর্ণনা সম্পূর্ণ করিয়া আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। আমরা তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। তাঁহাকে আমরা উচ্চশ্রেণীর কবি বলিব না—না বলিলেও তিনি আমাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্য এবং মার্জ্জিতরুচি লেখক কখনই আপনার রচনার দোষ গুণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইবেন না। তবে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহার কবিত্ব আছে, এবং তাঁহার কবিতা প্রীতিপ্রদ বটে।

পরামর্শ স্বরূপ ইহাও বলিতে হয় যে, ভবিষ্যৎ সংস্করণে ঋতুবর্ণনের কোন কোন অংশ বাদ দিলে ভাল হয়। উদাহরণ—ইক্ষুরস বর্ণনা ইত্যাদি।—

অনলেতে চড়াইয়া সেই রস জ্বাল দিয়া
করে কৃষী গুড় অপরূপ।
কিবা মিষ্ট তার তার না হয় তুলনা তার
থাক নর দেবতা লোলুপ॥
গুড় হতে ভারে ভার হয় চিনি চমৎকার
সুধা সম যার আস্বাদন।
ভোগ সুখ বাড়ে তায় নানা দেশে লয়ে যায়
বণিকেরা বাণিজ্য কারণ॥
এই যে ভারতবর্ষে নভো হতে বর্ষে বর্ষে
বর্ষে বারি বারিধরগণ।
সেই জলে যত চাষী উৎপাদিয়া শস্যরাশি
করে দেশ লক্ষ্মী-নিকেতন।
যত ধনী মহাজন বাঁধে গোলা অগণন
পূরে তায় খন্দ নানা মত।
প্রতুল ঐশ্বর্য্য হয় সতত স্বাধীন রয়
কত লোক হয় অনুগত॥

গঙ্গাচরণ বাবুর পদ্যের গঠন দেখিয়া বোধ হয়, তিনি রহস্যকাব্যে সফল হইতে পারেন। ঋতুবর্ণনে রহস্যের কোন উদ্যোগ দেখি নাই—কিন্তু ভবিষ্যতে চেষ্টা করিলে কি হয়, বলা যায় না।
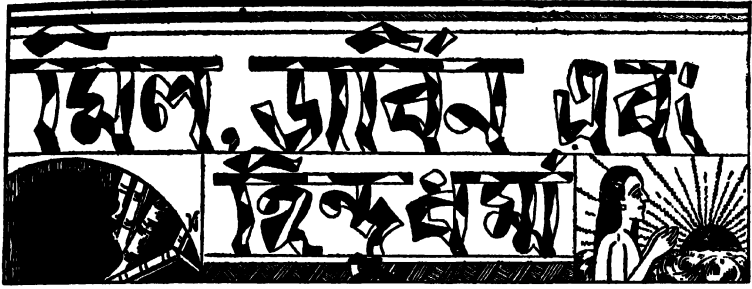
প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিতে তিনি বিভক্ত। এক সৃজন করেন, এক পালন করেন এবং এক ধ্বংস করেন। এই ত্রিদেব লোকপ্রথিত।

বেদ অনুসন্ধান করিলে এরূপ বিশ্বাসের কিছু অঙ্কুর পাওয়া যাইতে পারে। দর্শনে যে পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এরূপ বিশ্বাসের কোন নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া যায় কি?

জনষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুর পর, ধর্ম্মসম্বন্ধে তৎপ্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। তাহার একটির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা করা। মিলের মত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীরা প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটীই সারবান্। জগতের নির্ম্মাণকৌশল হইতে তাঁহার মতে, নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এটি প্রাচীন কথা, এবং অখণ্ডনীয়ও নহে। ডার্বিনের মত প্রচারের পূর্ব্বেও ইহার সদুত্তর ছিল; এক্ষণে ডার্বিন দেখাইয়াছেন যে, এই নির্ম্মাণ কৌশল স্বতঃই ঘটে। মিলও ডার্বিনের এই মত অনবগত ছিলেন এমত নহে; তিনি স্বীয় প্রবন্ধমধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, যদি এই মতটি প্রকৃত হয় তবে উপরি কথিত নির্ম্মাণকৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদক হয় না। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রচারের অল্পকাল পরেই মিলের প্রস্তাব লিখিত হয়। সে মতের সত্যাসত্য পরীক্ষিত এবং নির্ব্বাচিত হওয়ার পক্ষে কালবিলম্বের প্রয়োজন। কালবিলম্বের সে ফল তিনি পান নাই। অতএব তিনি এই মতের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাই। নির্ভর করিতে পারিলে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই।

এখনও অনেকে ডার্বিনের প্রতিবাদী আছেন—কিন্তু বহুতর পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাঁহার মত আদৃত এবং স্বীকৃত। অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্ এবং দর্শনবিদ্ পণ্ডিতেরা এক্ষণে ডার্বিনের মতাবলম্বী। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, এ কথা সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব, ঈশ্বরের অনস্তিত্বের

প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে তাহার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইবে, যদি বিচারের এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থানে প্রমাদ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ একটী তত্ত্ব গ্রহণ করা যাউক। জগৎ নিত্য না সৃষ্ট? জগতের আদি আছে না আদি নাই? যদি বল আদি আছে, সে আদির প্রমাণ কি? কিছু না। তবে আদির প্রমাণাভাবে, জগতের অনাদিত্ব সিদ্ধ। যদি বল আদি নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? এখানে প্রমাণাভাবে জগতের সাদিত্ব বা সৃষ্টতা সিদ্ধ। অতএব জগৎ সাদি এবং অনাদি—সৃষ্ট এবং অসৃষ্ট—উভয়ই প্রমাণ হইয়া উঠে। অস্তিত্বের প্রমাণাভাব অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে।

অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণশূন্য যাঁহারা বলিবেন, তাঁহারাও বলিতে পারিবেন না যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রমাণবিরুদ্ধ বিশ্বাস। ঈশ্বর আছেন এ কথা সত্য হউক না হউক কথা অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবেন না। প্রায় এইরূপ ভাবেই মিল ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। ডার্বিন স্বয়ং স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন।

অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক, ঈশ্বর স্বীকার করা যাউক। কিন্তু যদি ঈশ্বর আছেন, তবে তাঁহার প্রকৃতি কি প্রকার? এ বিষয়ে একটি প্রভেদ এস্থলে স্পষ্টীকরণ আবশ্যক। কতকগুলি ঈশ্বরবাদী আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তৎপ্রতি স্রষ্টা বিধাতা ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন না। অন্যে বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছা প্রবৃত্ত্যাদি বিশিষ্ট—এই জগতের নির্ম্মাতা; ইচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরি কথিত দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সে সকল কথা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই; ইহাতে কেবল জানি যে, সেই জগৎ-কারণ অজ্ঞেয়। হর্বট স্পেন্সর এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র।* তাঁহার দর্শনে ঈশ্বর জগদ্ব্যাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র।

মিল যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এরূপ অজ্ঞেয় নহেন। মিল ইচ্ছাবিশিষ্ট, জগন্নির্ম্মাতা স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার করিয়া ঐশিক স্বভাবের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরবাদীরা সচরাচর ঈশ্বরের তিনটি গুণ বিশেষ-রূপে নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন—শক্তি, জ্ঞান এবং দয়া। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরের গুণ মাত্র সীমাশূন্য—অনন্ত। অতএব ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান এবং দয়াও অনন্ত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ এবং দয়াময়।

* The consciousness of an Inscrutable Power manifested to us through all phenomena has been growing ever clearer.—*First Principles*. p. 108.

মিল এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যেখানে জগতের নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি, সেইখানেই তাঁহার শক্তি যে অনন্ত নহে তাহা স্বীকৃত হইতেছে। কেননা যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয়? যেখানে কৌশল ব্যতীত ইষ্টসিদ্ধি হয় না, সেইখানেই কৌশল প্রয়োজন হয়—যিনি সর্ব্বশক্তিমান, ইচ্ছায় সকলই করিতে পারেন, তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না। কেবল ইচ্ছা বা আজ্ঞামাত্রে কৌশলের উদ্দেশ্য কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে। যদি মনুষ্যের এরূপ শক্তি থাকিত যে, সে কেবল ঘড়ির ডায়ল প্লেটের উপর কাঁটা বসাইয়া দিলেই কাঁটা নিয়ম মত চলিত, তবে কখন মনুষ্য কৌশলাবলম্বন করিয়া ঘড়ির স্প্রিঙ্গের উপর স্প্রিঙ্গ এবং হুইলের উপর হুইল গড়িত না। অতএব ঈশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, ইহা সিদ্ধ।

একথার দুই একটা উত্তর আছে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির অনুসন্ধান আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব সে সকল কথা আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি। সে সকল আপত্তিও মিল সম্যক্ প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন।

সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল বলেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যায়, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকৃত কৌশল সকলের সমালোচনা করিলে অনেক দোষ বাহির হয়। এই মনুষ্যদেহের নির্ম্মাণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, কত যত্নে তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাতে এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত্ন, তাহা ক্ষণভঙ্গুর—কখন অধিক কাল থাকে না। যিনি এত কৌশল করিয়া ক্ষণভঙ্গুরতা বারণ করিতে পারেন নাই, তিনি সকল কৌশল জানেন না —সর্ব্বজ্ঞ নহেন। দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহা পুনঃ সংযুক্ত হইবার কৌশল আছে; উহাতে বেদনা হয়, পুঁজ হয় এবং সেই ব্যাধির ফলে পুনঃসংযোগ ঘটে। কিন্তু সেই ব্যাধি পীড়াদায়ক। যাহার প্রণীত কৌশল, উপকারার্থ প্রণীত হইয়াও পীড়াদায়ক, তাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে। যাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে, তাঁহাকে কখন সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

ইহাও মিল স্বীকার করেন যে এমতও হইতে পারে যে, এই অসম্পূর্ণতা শক্তির অভাবের ফল—অসর্ব্বজ্ঞতার ফল নহে। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলেও হইতে পারেন।

যদি ইহাই বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, তবে এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কে ঈশ্বরের শক্তির প্রতিবন্ধকতা করে? মনুষ্যাদি যে সর্ব্বশক্তিমান নহে, তাহার কারণ তাহাদিগের শক্তির প্রতিবন্ধক আছে। তুমি

যে হিমালয় পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সাগর পারে নিক্ষেপ করিতে পার না—তাহার কারণ মাধ্যাকর্ষণ তোমার শক্তির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। শক্তির প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই সর্ব্বশক্তিমান্ হইত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক কেহ বা কিছু আছে। সেই প্রতিবন্ধক কি? কোন্ বিঘ্নের জন্য সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার অভিপ্রেত কৌশল নির্দ্দোষ করিতে পারেন নাই?

এই সম্বন্ধে দুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে, দেখ, ঈশ্বর নির্ম্মাতা মাত্র, তিনি যে স্রষ্টা এমত প্রমাণ তুমি কিছুই পাও নাই। তুমি তাঁহার নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিয়াই তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ; কিন্তু নির্ম্মাণপ্রণালী হইতে কেবল নির্ম্মাতাই সিদ্ধ হইতে পারেন, স্রষ্টা সিদ্ধ হইতে পারেন না। ঘটের নির্ম্মাণ দেখিয়া তুমি কুম্ভকারের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে পার; কিন্তু কুম্ভকারকে মৃত্তিকার সৃষ্টিকারক বলিয়া তুমি সিদ্ধ করিতে পার না। অতএব এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর স্রষ্টা নহেন, কেবল নির্ম্মাতা। ইহার অর্থ এই, যে সামগ্রীকে গঠন দিয়া তিনি বর্ত্তমানাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, সে সামগ্রী পূর্ব্ব হইতে ছিল—ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে। ঘট দেখিয়া কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় যে, কোন কুম্ভকার মৃত্তিকা লইয়া ঘট নির্ম্মাণ করিয়াছে। মৃত্তিকা তাহার পূর্ব্ব হইতে ছিল, কুম্ভকারের সৃষ্ট নহে, একথা বলা বিচারসঙ্গত হইবে। সেই অসৃষ্ট সামগ্রীই বোধ হয় ঐশী শক্তির সীমা নির্দ্দেশক—তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। সেই জাগতিক জড় পদার্থের এমন কোন দোষ আছে যে, তজ্জন্য উহা ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত নহে। সেই কারণে বহু কৌশলময় এবং বহু শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরও আপনকৃত কার্য্যসকল সম্পূর্ণ এবং দোষশূন্য করিতে পারেন নাই।

আর একটি উত্তর এই যে, ঈশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন চৈতন্যই তাঁহার শক্তির প্রতিপ্রবন্ধক। যদি নির্ম্মাতার কার্য্য দেখিয়া নির্ম্মাতাকে সিদ্ধ করিলে, তবে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবন্ধকতার চিহ্ন দেখিয়াও প্রতিকূলাচারী চৈতন্যেরও কল্পনা করিতে পার। পারসিকদিগের প্রাচীন দ্বৈতধর্ম্ম এইরূপ—তাঁহারা বলেন যে, একজন ঈশ্বর জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত—আর এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত। খ্রীষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর ও সয়তানে এই দ্বৈতমত পরিণত।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে মিল প্রথমোক্ত মতটি অবলম্বন করারই কারণ দর্শাইয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বপ্রণীত "প্রকৃতি তত্ত্ব" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছেন। সংসার যে অনিষ্টময়, তাহা কোন মনুষ্যকে কষ্ট করিয়া বুঝাইবার কথা নহে—সকলেই অবিরত দুঃখ ভোগ করিতেছেন—এবং পরের দুঃখভোগ দেখিতেছেন। জীবের কার্য্যমাত্রই কেবল দুঃখ মোচনের চেষ্টা। যিনি

কেবল জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তৎকর্ত্তৃক এরূপ দুঃখময় সংসার সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে কথিত প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তির মর্ম্মানুবাদ করিতেছি। মিল বলেন—

"যদি এমন হয় যে, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তবে জীবের দুঃখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই।* যাঁহারা মনুষ্য প্রতি ঈশ্বরের আচরণের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা মতবৈপরীত্যশূন্য, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, হৃদয়কে কঠিন ভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দুঃখ অশুভ নহে। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে দয়াময় বলায়

* তৎসম্বন্ধে মিলের কয়েকটি কথা ইংরেজিতেই উদ্ধৃত করিতেছি—

"Next to the greatness of these Cosmic Forces, the quality which most forcibly strikes every one who does not avert his eyes from it is their perfect and absolute recklessness. They go straight to their end, without regarding what and whom they crush on the road.......In sober truth, nearly all things for which men are hanged or imprisoned for doing to one another are Nature's every day performances. Killing, the most criminal act recognised by human laws, Nature does once to every being that lives; and in a large proportion of cases, after protracted tortures such as only the greatest monsters whom we read of ever purposely inflicted on their living fellow-creaturs. If, by an arbitrary reservation we refuse to account anything murder but what abridges a certain term supposed to be allotted to human life, nature does also this to all but a small percentage of lives, and does it in all the modes, violent or insidious in which the worst human beings take the lives of one another. Nature impales men, breaks them as if on the wheel, casts them to be devoured by wild beasts, burns them to death, crushes them with stones, like the first Christian Martyr, starves them with hunger, freezes them with cold, poisons them by the quick or slow venom of her exhalations, and has hundreds of other hideous deaths, such as the ingenious cruelty of a Nabis or a Domitian never surpassed. All this Nature does with the most supercilious disregard both of mercy and of justice, emptying her shafts upon the best and noblest indifferently with the meanest and worst; upon those who are engaged in the highest and worthiest enterprises, and often as the direct consequence of the noblest acts; and it might almost be imagined as a punishment for them. She mows down those on whose existence hangs the well-being of a whole people, perhaps of the prospects of the human race for generations to come, with as little compunction as those whose death is a relief to themselves and to those under their noxious influence. Such are

এমত বুঝায় না যে, মনুষ্যের সুখ তাঁহার অভিপ্রেত; তাহাতে বুঝায় যে, মনুষ্যের ধর্ম্মই তাঁহার অভিপ্রেত; সংসার সুখের হউক না হউক, ধর্ম্মের সংসার বটে। এইরূপ ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা পরিত্যাগ করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে, স্থূল কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল? মনুষ্যের সুখ, সৃষ্টিকর্ত্তার যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের ধর্ম্ম তাঁহার যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। সৃষ্টিপ্রণালী লোকের সুখের পক্ষে যেরূপ অনুপযোগী, লোকের ধর্ম্মের পক্ষে বরং তদধিক অনুপযোগী। যদি সৃষ্টির নিয়ম ন্যায়মূলক হইত, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ দুঃখ আছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য অনুসারে পড়িত, কেহ অন্যাপেক্ষা অধিকতর দুষ্ক্রিয়াকারী না হইলে অধিকতর দুঃখভাগী হইত না; অকারণ ভালমন্দ বা অন্যায়ানুগ্রহ সংসারে স্থান পাইত না; সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নৈতিক উপাখ্যানবৎ গঠিত নাটকের অভিনয় তুল্য মনুষ্যজীবন অতিবাহিত হইত। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা যে উপরিকথিত রীতি-যুক্ত নহে, এ বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; এবং এইরূপ, ইহলোকে

Nature's dealings with life. Even when she does not intend to kill, she inflicts the same tortures in apparent wantonness. In the clumsy provision which she has made for that perpetual renewal of animal life, rendered necessary by the prompt termination she puts to it in every individual instance, no human being ever comes into the world but another human being is literally stretched on the rack for hours or days, not unfrequently issuing in death. Next to taking life (equal to it according to a high authority) is taking the means by which we live; and Nature does this too on the largest scale, and with the most callous indifference. A single hurricane destroys the hopes of a season, a flight of locusts or an inundation desolates a district; a trifling chemical change in an edible root starves a million of people. The waves of the sea, like banditti seize and appropriate the wealth of the rich and the little all of the poor with the same accompaniments of stripping, wounding, and killing as their human prototypes. Every thing in short which the worst men commit either against life or property is perpetrated on a larger scale by natural agents. Nature has Noyades more fatal than those of Carrier; her explosions of fire damp are as destructive as human artillery; her plague and cholera far surpass the poison cups of the Borgias......Anarchy and the Reign of Terror are overmatched in injustice, ruin, and death by a hurricane and a pestilence.—*Mill on Nature.* pp. 28-31.

যে ধর্ম্মাধর্ম্মের সমুচিত ফল বাকি থাকে, লোকান্তরে তাহার পরিশোধন আবশ্যক, পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই গুরুতর প্রমাণ বলিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করায় অবশ্য স্বীকৃত হয় যে, ইহজগতের পদ্ধতি অবিচারের পদ্ধতি, সদ্বিচারের পদ্ধতি নহে। যদি বল যে ঈশ্বরের কাছে সুখ দুঃখ এমন গণনীয় নহে যে, তিনি তাহা পুণ্যাত্মার পুরস্কার এবং পাপাত্মার দণ্ড বলিয়া ব্যবহার করেন, বরং ধর্ম্মই পরমার্থ এবং অধর্ম্মই পরম অনর্থ, তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহার যেমন কর্ম্ম তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না হইয়া, কেবল জন্মদোষেই † বহুলোকে সর্ব্বপ্রকার পাপাসক্ত হয়; তাহাদিগের পিতৃ মাতৃ দোষে, সমাজের দোষে, নানা অলঙ্ঘ্য ঘটনার দোষে এরূপ হয়;—তাহাদের নিজদোষে নহে। ধর্ম্মপ্রচারক বা দার্শনিকদিগের ধর্ম্মোন্মাদে শুভাশুভ সম্বন্ধে যে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা বিকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক না কেন, কোন প্রকার মতানুসারেই প্রাকৃতিক শাসন-প্রণালী দয়াবান্ ও সর্ব্বশক্তিমানের কৃত কার্য্যানুরূপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিবে না।" ‡

এই সকল কথা বলিয়া মিল যাহা বলিয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যায় যে, এই জগতের নির্ম্মাতা বা পালনকর্ত্তা হইতে পৃথক্ শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বা অনিষ্ট সম্পন্ন হইতেছে। এরূপ মত সুসঙ্গত। মিল, এরূপ মত, ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহা তাঁহার জীবনচরিত যে না পড়িয়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে। এজন্য ইংরেজি হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

"The only admissible moral theory of Creation is that the principle of good *cannot* at once and altogether subdue the powers of evil, either physical or moral; could not place mankind in a world free from the necessity of an incessant struggle with the maleficent powers, or make them victorious in that struggle, but could and did make them capable of carrying on the fight with vigour and with progressively increasing success. Of all the religious explanations of the order of nature, this alone is neither contradictory to itself, nor to the facts for which it attempts to account." *

যদি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্ত্তা, এবং সংহারকর্ত্তা স্বতন্ত্র, এমত কথা অসঙ্গত নহে। ইহার উপর যদি একজন

---

† খ্রীষ্টান ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই। পুনর্জ্জন্মবাদী হিন্দুর হাতে মিল তত সহজে নিস্তার পাইতেন না।

‡ *Mill on Nature*. pp. 37-38.

* *Mill on Nature*.pp. 38-39.

পৃথক্ সৃষ্টিকর্ত্তা পাওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া গেল।

মিলে তাহা পাওয়া যাইবে না, মিল হিন্দু নহেন, হিন্দুর পক্ষসমর্থন জন্য লিখেন নাই। তিনি নির্ম্মাণকৌশল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, নির্ম্মাতা ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা মানেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নির্ম্মাণ মাত্র; ভৌতিক পদার্থের সমবায়বিশেষ জীবত্ব। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখি—জীব, উদ্ভিদ্, বায়ু, বারি, মৃৎপ্রস্তরাদি, সকলই সেইরূপে নির্ম্মিত; পৃথিবীও তাই; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, নীহারিকা, সকলই নির্ম্মিত। অতএব সকলেই সেই নির্ম্মাতার কীর্ত্তি—তাঁহার হস্তপ্রসূত। সচরাচর সৃষ্টিকর্ত্তা যাঁহাকে বলা যায়, ঈদৃশ নির্ম্মাতার সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ অল্প। যে আকার শূন্য, শক্তিবিশিষ্ট, পরমাণু সমষ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত, তাহা নির্ম্মিত কি না—নির্ম্মাতার হস্তপ্রসূত কি না—তাহার কেহ স্রষ্টা আছেন কি না, তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। এইটুকু স্মরণ রাখিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা শব্দের প্রচলিত অর্থে নির্ম্মাতাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে। তাহা হউক বা না হউক, ঈদৃশ স্রষ্টার সঙ্গেই ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ। অতএব তাঁহাকে পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মিল বলেন, তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল, নির্ম্মাতা এবং পালন বা রক্ষাকর্ত্তার মধ্যে প্রভেদ করেন না। ইউরোপে, কেহ এরূপ প্রভেদ স্বীকার করে না। এরূপ স্বীকার না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায় যে, জন্মও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল, রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; যে নিয়মাবলীর ফল জন্ম বা সৃজন, সেই নিয়মাবলীর ফল রক্ষা। অতএব যিনি জন্ম, নির্ম্মাণ, বা সৃষ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা বা পালনেরও নিয়ন্তা ইহা সিদ্ধ।

কিন্তু ধ্বংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল। যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল নিয়মেরই ফল ধ্বংস। যে রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ রক্ষিত হয়, সেই রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়-প্রাপ্ত হয়। যে অম্লজানের সংযোগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে—শেষ দিনে সেই অম্লজান সংযোগেই তাহা নষ্ট হইবে। অতএব যিনি পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে সংহারের নিয়ন্তা ইহাও সিদ্ধ।

তবে, পালনকর্ত্তা চৈতন্য সংহারকর্ত্তা চৈতন্য পৃথক্, এরূপ বিবেচনা অসঙ্গত নহে, একথা বলিবার কারণ কি? কারণ এই যে, যিনি পালনকর্ত্তা, তাঁহার অভিপ্রায় যে জীবের মঙ্গল, জগতে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গল তাঁহার অভিপ্রেত হইলেও অমঙ্গলেরই আধিক্য দেখা যায়। যাঁহার

অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্ধি, তিনি আপনার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলতা করিয়া অমঙ্গলের *আধিক্যই সিদ্ধ করিবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। এই জন্য সংহার যে পৃথক্* চৈতন্যের অভিপ্রায় বা অধিকার, একথা অসঙ্গত নহে বলা হইয়াছে।

তবে এরূপ মতের স্থূল কারণ, পালনে ও ধ্বংসে দৃশ্যমান অসঙ্গতি। সৃজন ও পালনে যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে স্রষ্টা ও পাতা পৃথক্, এরূপ মতও অসঙ্গত বোধ হইবে না।

সৃজনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গতি আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। নহিলে ডার্বিনের "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" পরিত্যাগ করিতে হয়। যে মতকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, যে পরিমাণে জীব সৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত বা পালিত হইতে পারে না। জীবকুল অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল—কিন্তু পৃথিবী সঙ্কীর্ণা। সকলে রক্ষিত হইলে পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না, পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোষণ হইত না। অতএব, অনেকেই জন্মিয়াই বিনষ্ট হয়—অধিকাংশ অণ্ডমধ্যে বা বীজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য আছে যে, তদ্দ্বারা তাহারা সমানাবস্থাপন্ন জীবগণ হইতে আহার সংগ্রহে, কিম্বা অন্য প্রকারে জীবন রক্ষায় পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, অন্য সকলে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে। মনে কর যদি কোন দেশে বহুজাতীয়, এরূপ চতুষ্পদ আছে যে, তাহারা বৃক্ষের শাখা ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহা হইলে যাহাদিগের গলদেশ ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সর্ব্বনিম্নস্থ শাখাই ভোজন করিতে পাইবে, যাহাদের গলদেশ দীর্ঘ তাহারা নিম্নস্থ শাখাও খাইবে তদপেক্ষা ঊর্দ্ধস্থশাখাও খাইতে পারিবে। সুতরাং যখন খাদ্যের টানাটানি হইবে—সর্ব্বনিম্নস্থ শাখা সকল ফুরাইয়া যাইবে, তখন কেবল দীর্ঘস্কন্ধরাই আহার পাইবে—হ্রস্বস্কন্ধরা অনাহারে মরিয়া যাইবে বা লুপ্তবংশ হইবে। ইহাকেই বলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। দীর্ঘস্কন্ধেরা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে রক্ষিত হইল। হ্রস্বস্কন্ধের বংশলোপ হইল।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূল ভিত্তি এই যে, যত জীব সৃষ্ট হয়, তত জীব কদাচ রক্ষা হইতে পারে না। পারিলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রয়োজনই হইত না। দেখ একটি সামান্য বৃক্ষে কত সহস্র সহস্র বীজ জন্মে; একটি ক্ষুদ্র কীট, কত শত শত অণ্ড প্রসব করে। যদি সেই বীজ, বা সেই অণ্ড, সকলগুলিই রক্ষিত হয়, তবে অতি অল্পকাল মধ্যে সেই এক বৃক্ষেই, বা সেই একটি কীটেই পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ বা অন্য জীবের স্থান হয় না। যদি কোন কীট প্রত্যহ দুইটি অণ্ড প্রসব করে, (ইহা অন্যায় কথা নহে) তবে দুই দিনে সেই কীট-সন্তান হইতে চারিটি, তিন দিনে আটটি, চারি দিনে ষোলটি, দশ দিনে সহস্রাধিক, এবং বিশ দিনে দশ

লক্ষের অধিক কীট জন্মিবে। এক বৎসরে কত কোটি কীট হইবে তাহা শুভঙ্কর হিসাব করিয়া উঠিতে পারেন না। মনুষ্যের বহুকাল বিলম্বে এক একটি সন্তান হয়, এক দম্পতি হইতে চারি পাঁচটি সন্তানের অধিক সচরাচর হয় না; অনেকেই মরিয়া যায়; তথাপি এমন দেখা গিয়াছে যে, পঁচিশ বৎসরে মনুষ্য সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। যদি সর্ব্বত্র এইরূপ বৃদ্ধি হয় তবে, হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, সহস্র বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে মনুষ্যের দাঁড়াইবার স্থান হইবে না। হস্তীর অপেক্ষা অল্পপ্রসবী কোন জীবই নহে, মনুষ্যও নহে কিন্তু ডার্বিন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, অতি ন্যূনকল্পেও এক হস্তিদম্পতি হইতে ৭৫০ বৎসর মধ্যে এক কোটি নবতি লক্ষ হস্তী সম্ভূত হইবে। এমন কোন বর্ষজীবী বৃক্ষ নাই যে, তাহা হইতে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে না। লিনিয়স হিসাব করিয়াছেন যে, যে বৃক্ষে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে, সকল বীজ রক্ষা পাইলে, তাহা হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হইবে।*

এক্ষণে পাঠক ভাবিয়া দেখুন, একটি বার্ত্তাকু বৃক্ষে কতগুলি বার্ত্তাকু—পরে ভাবুন বার্ত্তাকুতে কতগুলি বীজ থাকে। তাহা হইলে একটি বার্ত্তাকু বৃক্ষে কত অসংখ্য বীজ জন্মে তাহা স্থির করিবেন। সকল বীজ রক্ষা হইলে, যেখানে বার্ষিক দুইটি বীজ হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, সেখানে বৎসর বৎসর প্রতি বৃক্ষের সহস্র সহস্র বার্ত্তাকু বীজে বিংশতি বৎসরে কত কোটি কোটি কোটি বার্ত্তাকু বৃক্ষ হইবে, তাহা কে মনে ধারণা করিতে পারে? সকল বীজ রক্ষা পাইলে, কয় বৎসর পৃথিবীতে বার্ত্তাকুর স্থান হয়?

চেতন সম্বন্ধেও ঐরূপ। যে পরিমাণে সৃষ্টি, তাহার সহস্রাংশ রক্ষিত হয় না। যদি স্রষ্টা এবং পালনকর্ত্তা এক, তবে তিনি যাহার পালনে অশক্ত তাহা এত প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করেন কেন? জীবের রক্ষা যাঁহার অভিপ্রায়, তিনি অরক্ষণীয়ের সৃষ্টি করেন কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায় না? ইহাতে কি এমত বোধ হয় না যে, স্রষ্টা ও পাতা এক, একথা না বলিয়া, স্রষ্টা পৃথক্ পাতা পৃথক্ একথা বলাই সঙ্গত?

ইহার একটি উত্তর আছে—জীবধ্বংসের জন্য একজন সংহারকর্ত্তা কল্পনা করিয়াছ। সৃষ্ট জীবের ধ্বংস তাঁহার কার্য্য—যত সৃষ্টি হয় তত যে রক্ষা হয় না, ইহা তাঁহারই কার্য্য। পাতা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা এক, কিন্তু তিনি যত সৃষ্টি করেন, তত যে রক্ষা করিতে পারেন না, তাহার কারণ এই সংহারকর্ত্তার শক্তি। নচেৎ সকলের রক্ষাই যে তাঁহার অভিপ্রায় নহে, এমত কল্পনীয় নহে। যেখানে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, কল্পনা করিয়াছ, সেখানে তিনি যে সকলকে রক্ষা করিতে

Origin of Species—6th *Edition*. p. 51.

পারেন না, ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, ইহা *বলিতে পার না। উত্তর এই।*

ইহারও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম চলিতেছে, সে সকলের অথবা সেই সংহারিকাশক্তির আলোচনা করিলে ইহাই সহজে বুঝা যায় যে, এজগতে অপরিমিত সংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে—অতএব অপরিমিত জীবসৃষ্টি নিষ্ফল। সামান্য মনুষ্যের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা একথা প্রাপণীয়। অতএব যিনি স্রষ্টা ও পাতা, তিনিও ইহা অবশ্য বিলক্ষণ জানেন। না জানিলে তিনি মনুষ্যাপেক্ষা অদূরদর্শী। কিন্তু তিনি কৌশলময়—জীবসৃজন-প্রণালী অপূর্ব্ব কৌশলসম্পন্ন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যাঁহার এত কৌশল তিনি কখনও অদূরদর্শী হইতে পারেন না। যদি তাঁহাকে অদূরদর্শী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সকল কৌশল যে চৈতন্য-প্রণীত, একথা আর বলিতে পারিবে না, কেননা অদূরদর্শী চৈতন্য হইতে সেরূপ কৌশল অসম্ভব। তবে, বলিতে হইবে যে তিনি জানিয়া নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত। দূরদর্শী চৈতন্য যে নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ নিষ্ফলতা বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে না।

অতএব ইহা সিদ্ধ, যিনি পালনকর্ত্তা, অপরিমিত জীব-সৃষ্টি তাঁহার ক্রিয়া নহে। এজন্য পালনকর্ত্তা হইতে পৃথক্ চৈতন্যকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করা অসঙ্গত নহে।

ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে যে, স্রষ্টা ও পাতা পৃথক্ স্বীকার করিলেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে যে, স্রষ্টা নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত; চৈতন্য নিষ্ফল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এ আপত্তির মীমাংসা কই হইল? সত্য কথা, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, পাতা হইতে স্রষ্টা যদি পৃথক্ হইলেন, তবে সৃষ্ট জীবের রক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিবার আর কারণ নাই। সৃষ্টি তাঁহার এক-মাত্র অভিপ্রায়; এবং সৃষ্টি হইলেই তাঁহার অভিপ্রায়ের সফলতা হইল—রক্ষা না হইলেও সে অভিপ্রায়ের নিষ্ফলতা নাই।

অতএব, স্রষ্টা, পাতা এবং হর্ত্তা, পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য এমত বিবেচনা করা অসঙ্গত এবং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে—ইহাই হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি এবং এই স্রষ্টা পাতা ও হর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম আমরা বলিতেছি না যে এই ত্রিদেবের উপাসনা এইরূপে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা এমত বিশ্বাস করি না যে, ভারতীয় ধর্ম্মস্থাপকগণ এইরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়া ত্রিদেবের কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ইঁহাদিগের উৎপত্তি বেদগীত বিষ্ণু রুদ্রাদি হইতে। বৈদিক বিষ্ণু রুদ্রাদি বৈজ্ঞানিক সঙ্কল্প নহে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বেদেই আছে। কিন্তু পাতৃত্ব হর্ত্তৃত্ব স্রষ্টৃত্বের সূচনাও বেদে আছে। তবে অদ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্রবিৎ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই ত্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়াছিল, জনসাধারণে উহা বদ্ধমূল, ইহাতে অবশ্য এমত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, উহার সুদৃঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি আছে। লোকবিশ্বাসের সেই গূঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি কি তাহাই আমরা দেখাইলাম।

আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই ত্রিদেবোপাসনার নৈসর্গিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু আমরা এমত কিছু লিখি নাই এবং বিচারেও এমত কোন কথাই পাওয়া যায় না যে, তদ্দ্বারা এই ত্রিদেবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায়। প্রমাণে দুইটি গুরুতর ছিদ্র লক্ষিত হয়।

প্রথম এই যে, জগতের নির্ম্মাণকৌশলে চৈতন্যযুক্ত নির্ম্মাতার অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে, এই কথা স্বীকার করাতেই ত্রিদেবের অস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম সূত্রটি ভ্রান্তিজনিত; প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলকেই নির্ম্মাণকৌশল বলিয়া আমাদিগের ভ্রম হয়; সেই ভ্রান্ত জ্ঞানেই আমরা নির্ম্মাতাকে সিদ্ধ করিয়াছি। নচেৎ নির্ম্মাতার অস্তিত্বের নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। নির্ম্মাতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই আমরা সংহার কর্ত্তা, এবং পৃথক্ পৃথক্ স্রষ্টা পাতা পাইয়াছি। যদি নির্ম্মাতার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, তবে ত্রিদেবের মধ্যে কাহারও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।

দ্বিতীয় দোষ এই যে, সৃজন পালন সংহার একই নিয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই শিখাইতেছে যে, যে যে নিয়মের ফলে সৃজন, সেই সেই নিয়মের ফলে পালন, সেই সেই নিয়মের ফলে ধ্বংস। নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক্ সঙ্কল্প করা প্রামাণ্য নহে। আমরা কোথাও বলি নাই যে তাহা প্রামাণ্য। আমরা কেবল বলিয়াছি যে, তাহা অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত নহে, সঙ্গত। যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, বা যাহা কেবল সঙ্গত, তাহা সুতরাং প্রামাণিক, ইহা বলা যাইতে পারে না।

আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও, তাঁহাদিগকে সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা আছে, তৎপোষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সকল উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না।

চতুর্থ, ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসঙ্গত এবং নৈসর্গিক। ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু একজন সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা উপরিকথিত মিলকৃত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে।

পঞ্চম, অনেকের বোধ হইবে যে, এ সকল কথায় আমরা উপধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করিতেছি। কিন্তু প্রচলিত একেশ্বরবাদ যে উপধর্ম্ম নহে একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদিগের বিবেচনায় ত্রিদেবোপাসনাও উপধর্ম্ম, প্রচলিত একেশ্বরবাদও উপধর্ম্ম এবং নাস্তিকতাও উপধর্ম্ম। হইতে পারে একোপাসনাই প্রকৃত ধর্ম্ম,—আমরা সে কথা অপ্রমাণ করিতে পারি না। আমরা কেবল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরই সন্ধান করিয়াছি; এবং বিজ্ঞান ত্রিদেবের অপেক্ষা সর্ব্বশক্তিমান্ একেশ্বরে অধিক আদর করেন না, ইহা দেখাইয়াছি। তবে যদি কেহ বলেন যে বিজ্ঞানের কাছে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিব না, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

ষষ্ঠ, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ সংস্কারে নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, একেশ্বরবাদের পুনরুজ্জীবন অপেক্ষা, ত্রিদেবোপাসনার পুনরুজ্জীবন অধিক সহজ, বিজ্ঞানসঙ্গত, এবং লোকানুমত হয় কি না?

সপ্তম, এই প্রবন্ধে অনেক স্থানে এমত কথা আছে যে তদ্দ্বারা অনেকে বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বর বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ এ কথা আমরা বলি নাই, তাহা অভিপ্রেতও নহে। সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ, দয়াময় এবং প্রবৃত্তিশালী ঈশ্বরই বিজ্ঞানের দ্বারা অসিদ্ধ, ইহাই আমরা বলিয়াছি। জগতের নির্ম্মাতা বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ নহেন। কিন্তু বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে এই জগৎ ব্যাপিয়া, সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে, এক অনন্ত, অচিন্তনীয়, অজ্ঞেয় শক্তি আছে—ইহা সকলের কারণ, বহির্জ্জগতের অন্তরাত্মাস্বরূপ। সেই মহাবলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক আমরা তদুদ্দেশে ভক্তিভাবে কোটি কোটি কোটি প্রণাম করি। আমরা ত্রিদেবের উপাসক নহি।

যথা রম্য মরুদ্বীপ মরুভূমি মাঝে
জুড়ায় পথিক আঁখি শ্যামল শোভায়,
এ স্মৃতি নয়ন পথে তুমিও তেমনি,
সুখধাম সুখচর—সতত সুন্দর!
তব সেই সরোবর—কুসুম কানন—
বিশাল রসাল রাজি—চির দিন তরে
কে যেন রোপেছে আনি হৃদয়ে আমার!
যখনি সংসার তাপে জ্বলে এ অন্তর
ফিরাই কাতর আঁখি জুড়াইতে জ্বালা,
অমনি নয়নে ভাসে সেই সব শোভা;
সমীরণ আন্দোলিত কুসুম, পল্লব,
সরসী শীতল বারি, তৃণ সুশ্যামল।
বহুদিন হল আজি,—এখনো তেমনি,—
নারিব ভুলিতে তোমা থাকিতে জীবন!
আর কি আসিবে ফিরে সে সুখ সময়?
জানি না অদৃষ্টে মম লিখেছে কি বিধি!
আর কি ভ্রমিব আমি সে ফুল্ল হৃদয়ে
মধুর বিজন স্থানে—বৃক্ষাবলিমাঝে?
মরি কি সুখের দিন গিয়াছে চলিয়া!
স্মৃতি মাত্র রেখে গেছে তুষিতে হৃদয়!
মধুর বসন্ত নিশি—প্রভাত মধুর—
মধুর ঘুমের ঘোরে পশিত শ্রবণে
অস্ফুট বিহঙ্গ-কুল-কাকলি-লহরী,
বাতায়ন সন্নিহিত শাখা দল হতে
মাঝে মাঝে সকরুণ "বউ কথা কও"—
"বউ কথা কও" রবে ব্যথিত হৃদয়—
ভাবিতাম এত কিরে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা—
এত যদি বাজে প্রাণে তবে কি কারণ—
মিছা দোষে—মিছা ভ্রমে—মানেতে মজিয়ে
প্রিয়জনে প্রিয়জন দেয় এ যাতনা?
শুনিতাম সুখে শুয়ে এ সকল রব
নীরব সময়ে সেই; প্রভাত সমীর—
গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ নির্জ্জন পুলিনে—
'অবিরাম সেই ধ্বনি স্বপনের মত'
মিশায়ে মধুর ভাবে স্বচ্ছ স্ফটিকের
ঝুল্যমান ঝালরের ঠুন্ ঠুন্ রবে,
ধীরে ধীরে প্রবেশিত শ্রবণ কুহরে;—
আবার ঘুমের ঘোরে মুদিতাম আঁখি।
ক্রমে দিক পরিষ্কার;—বিহঙ্গ কূজন,
গ্রামবাসি-কোলাহল, বাড়িতে লাগিল;
মাঝে মাঝে যাত্রী তরে নাবিক চীৎকার
শুনা যায় মুহুর্মুহু জাহ্নবী উপরে।—
এইরূপে পোহাইত সুখদ যামিনী।
ঊষার কোমল বিভা শোভিলে গগনে
যেতাম প্রফুল্ল মনে ভাগীরথী কূলে
দেখিতে তরঙ্গ-রঙ্গ প্রভাত সমীরে—
প্রকৃতির চারু শোভা ভুঞ্জিতে বিরলে।
ক্রমেতে উঠিত রবি কিরণ বিস্তারি,—
কষিত কাঞ্চন যেন সোহাগে গলায়ে
ঢালিত গগন গায় পূর্ব্বদিক্ ব্যাপি,
নির্ম্মল সরসী জলে—শ্যামল পাতায়
সুবর্ণ বারির ছটা দিত ছড়াইয়া;

অবশেষে তটিনীর তরঙ্গ নিকরে
অযুত তপন-রশ্মি পড়িত আসিয়া—
সেই সে সুবর্ণ রাগে হইয়া জড়িত
অসংখ্য লহরী মালা ঝিক্ মিক্ করি
নাচিতে লাগিত রঙ্গে জাহ্নবী-হৃদয়ে।
ক্রমে সেই রবিকর হইলে প্রখর,
পশিতাম হৃষ্টমনে আপন মন্দিরে।
পুরাতন বাটী সেই তটিনী-পুলিনে,
তিন দিকে লতা পাতা কুসুম উদ্যান,
পশ্চিমে সরিৎগঙ্গা—সোপান উপরে
লৌহময় দ্বার তায় প্রবেশিতে পুরে।—
রম্য স্থান—রম্য বাটী—রম্য সে তটিনী,
জীবন স্বপনমত বহি যায় হেথা!
মধ্যাহ্ন-মিহির-করে ধরণী যখন
জ্বলন্ত অনল রূপ করিত ধারণ,
নীরব বিহঙ্গ যত,—কেবল কোথাও
অমঙ্গলরূপী সেই কালান্ত-বাহন
বায়সের কা! কা! রব—তৃষিত চাতক
সকাতর মৃদুস্বর সুদূর হইতে
অবিরত প্রবেশিত শ্রবণ কুহরে;
জুড়াতে নিদাঘ জ্বালা বসিতাম গিয়া
বিশাল-রসাল-মূলে নির্জ্জন কাননে।
পার্শ্বে স্বচ্ছ সরোবর—তাহার পুলিনে
সুশ্যামল তৃণদল দুলিছে বাতাসে—
দুলিছে পল্লব-কুল—লাগিছে অঙ্গেতে
শীতল দক্ষিণ-বায়ু ঝুর্ ঝুর্ করি—
নীরবে ঝরিছে পাতা—ধরিছে ধরণী—
জগত জীবের মাতা—যতনে অঙ্কেতে।
মর্ মর্ পত্র শব্দে—শীতল ছায়ায়,
মুদি আঁখি দেখিতাম কতই স্বপন—
কতই কোমল ভাব উঠিত এমনে—
কেমনে-কাহারে-আমি কহিব প্রকাশি—
বুঝিবে বা কেবা। জ্বলিলে সংসারতাপে,
হৃদয় জ্বালায় যদি যাই কার কাছে—
প্রিয়জন, প্রিয়বন্ধু, প্রিয় সহবাসে
দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে সে জ্বালা আমার!
শুদ্ধ মা তোমার শান্ত শ্যামল মুরতি
দেখিলে নয়নে মোর জুড়ায় জীবন!
আর কিছু এসংসারে ভাল নাহি লাগে!
বৃক্ষ-অন্তরালে ক্রমে নামিলে তপন,
ব্যাপিলে সুখদ ছায়া ধরণী অঙ্গেতে,
উঠিতাম তথা হতে। সরসী উত্তরে
আছে এক তীর্থরম্য, পূর্ব্ব পাশে তার
একটি বকুল গাছ,—দেখিতে সুন্দর,
নিবিড় পাতায় ঢাকা, নবীন বয়স,
অসংখ্য বকুল ফল রাঙ্গা রাঙ্গা তায়;
নীল, পীত নানাবর্ণ ক্ষুদ্র পাখী কত
রাঙ্গা ফল লোভে আসি বকুল শাখায়
বসিয়া মনের সুখে গায় নিরন্তর!
এই তরুতলে আসি বসিয়া তখন,
শীতল সলিল মাখা মন্দ সমীরণ
সেবিতাম মন সুখে সোপান উপরে,
দেখিতাম স্বচ্ছ জলে মৎস্যদের ক্রীড়া,
মৎস্যরঙ্ক-মৎস্যধরা—আরো শোভা কত
মধুর শীতল ভাব উপজিত মনে।
পরে বেলা ঝিক্ মিক্ করিয়া আসিলে
ত্যজি সে বকুল তরু, ত্যজি সরোবর
যেতাম জাহ্নবী কূলে মনের আনন্দে
দেখিতে তপন অস্ত তরঙ্গিণী পারে,
দ্বাদশ মন্দির পাছে, অপূর্ব্ব সে দৃশ্য!
প্রাচীন দেউল সেই, কৃষ্ণ শ্বেতবর্ণ—
সম্মুখে দ্বাদশ ক্ষুদ্র পাদপ সুন্দর;
দক্ষিণ বাহিনী গঙ্গা বহিছে নিম্নেতে!
পবিত্র তটিনী বারি—মোক্ষদা মহীতে!
পশ্চাতে বৃক্ষের শ্রেণী সুদূর বিস্তৃত।
দেখেছে যে এক বার এই রম্য স্থানে
রবি অস্ত শোভা, নারিবে ভুলিতে কভু।
এক দিন সূর্য্য অস্ত দেখিবার আশে
গেলেম গঙ্গার কূলে, দেখিনু গগনে
নাহিক তপন; শুদ্ধ নীল মেঘ যত

নিবিড় ব্যাপিয়া নভে বহ্নি প্রান্ত প্রায় ;
আগ্নেয় নক্ষত্র এক দেখিনু সহসা
ফুটিয়া নীরদ চাঁদ জ্বলিতে লাগিল ;
বিস্ময় হইনু হেরি সে দৃশ্য গগনে !
ক্রমশঃ বাড়িল তারা বোধ হল যেন
অগ্নিময় রাজ্য এক আছে মেঘ পাছে।
তপন মণ্ডল শেষে হইল বাহির !
চারিদিকে নীল মেঘ, সে মেঘের গায়
সুদীর্ঘ সুবর্ণ ছটা পড়েছে আসিয়া।
ক্রমে নীল তল হতে গোলাপরঞ্জিত
বিচিত্র গগন গায় নামিল তপন,
সুবর্ণের চাপ্ যেন—মধ্যদেশ তার
বিভক্ত শ্যামল মেঘে, দৃশ্য মনোহর !
অবশেষে তাম্র বর্ণ ধরিয়া তপন
ডুবিল মন্দির পাছে দেখিতে দেখিতে।
দিবা অবসান। ক্রমে আইল যামিনী ;
পক্ষিগণ নিজ নিজ কুলায় পশিল,
সন্ধ্যার উজ্জ্বল মণি শোভিল গগনে ;
নৌকায় জ্বলিল দীপ সহস্র আলোক
ভাতিল বিমল জলে জাহ্নবী হৃদয়ে,
শান্ত ভাব ধরি মহী লভিল বিরাম।
হইলে চাঁদনী রাতি উঠিত যখন
রজতের চাপ সম বৃক্ষ অন্তরালে
ভুবন মোহন সেই সুধাংশু সুন্দর,
হাসিত কুসুম কুল—হাসিত কানন,
হাসিত জাহ্নবী দেবী—হাসিত গগন,
কুসুম স্তবকমাঝে পশিয়া দুজনে
আমি ও আমার প্রিয়া—তুলিতাম কত
মল্লিকা, মালতী, যূথি, সুগন্ধি কুসুম ;
সেই সে ফুলের দল একত্র মিশায়ে
মনোহর মালা প্রিয়া গাঁথিত যতনে,
দেখিতাম কাছে বসি কিবা চন্দ্রালোকে
বিমল চন্দ্রিকা মাখা ফুলদল পাশে
প্রেয়সীর মুখচন্দ্র হয়েছে মধুর !
অনিমিষ মুখপানে থাকিতাম চাহি।
অবশেষে সেই মালা দিতাম পরায়ে
দুজনে দুজন-গলে প্রেমের সোহাগে,
হাত ধরা ধরি করি পশিতাম গৃহে।
যথা সেই স্তম্ভ প্রান্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার,
মর্ম্মর খচিত তল প্রকোষ্ঠ সুন্দর,
বসিতাম গিয়া তথা। সম্মুখে জাহ্নবী,
অবিরাম বীচিরব পশিছে শ্রবণে,
হু হু করি সমীরণ বহিছে তথায়,
উদাস করিছে মন—এসংসার হতে
কোথা যেন অন্তরিত করিয়া রাখিছে।
প্রহরান্তে পশিতাম শয়ন মন্দিরে,
লভিতে সুখদনিদ্রা সুখদ শয্যায়,
দেখিতাম চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল সে গৃহ
নিদ্রিত গৃহস্থ সব—নীরব জগত ;
কেবল কখন সুদূর বাজনা শব্দ,
কভু বংশীধ্বনি, কভু নাবিক সঙ্গীত
নিথর আকাশ তলে তুলিছে তরঙ্গ,
মধুর বসন্ত-বায়ু বহিছে মধুর ;
অবশেষে নিদ্রাবেশে মুদিয়া নয়ন
সুখের স্বপনস্রোতে যেতাম ভাসিয়া।
কভু বা সন্ধ্যার আগে পশিয়া কাননে
বসিতাম শীলাতলে ভাগীরথী তীরে।
কহিত আমারে প্রিয়া "দেখ কেবা আগে
দেখিবারে পায় তারা একটী আকাশে।"
একদৃষ্টে দুইজনে আকাশের পানে
একটী তারার আশে থাকিতাম চেয়ে,
দেখিলে একটী তারা প্রেয়সী আমার
করতালি দিয়া উঠি সদর্পে কহিত,
"দেখেছি আগেতে তারা ওই যে আকাশে!"
এই মত কত দিন যাপিনু তথায়।
আর কি সুখের দিন আসিবে ফিরিয়া ?
না এ জন্মের মত গিয়াছে চলিয়া ?

শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জগতে সজীব নির্জ্জীব দুই প্রকার পদার্থ আছে। সুতরাং বিশ্বকারণসম্বন্ধে কোনরূপ কল্পনা করিতে হইলে, হয় জড়জগৎ নতুবা প্রাণিমণ্ডলী এ দুয়ের মধ্যে একটিকে অবলম্বনভূমি করিতে হয়। জড়জগতের তিমিরহারী আলোকপ্রকাশে এবং প্রাণিমণ্ডলীর জীবোৎপত্তি ব্যাপারে যেরূপ সৃষ্টির ভাব লক্ষিত হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। এ নিমিত্ত এই দুইটী ঘটনা লইয়াই প্রাচীনকালে যথাক্রমে দেবোপাসনা ও লিঙ্গোপাসনা, এই দুই প্রকার উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বেদ, পারস্যের জেন্দাবেস্তা, এবং গ্রীসের ইলিয়ড্ ও ওডিসি পাঠ করিয়া জানা যায় যে, প্রাচীন আর্য্যেরা দেবোপাসক ছিলেন; এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে কাল্ডীয়, আসিরীয়, মৈসরীয়, ফিনিসীয় প্রভৃতি অনার্য্যজাতিদিগের মধ্যে অতি প্রাচীনকালে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পার্থিব অগ্নি, অন্তরীক্ষবিহারী অশনিধারী ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশবাসী দিবাকর, বৈদিক সময়ে আর্য্যদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন; এবং অন্য সকল দেবতা তাঁহাদিগেরই রূপান্তর বা নামান্তর বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সৌর-প্রকৃতিসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, এবার শিবের বিষয়ে কয়েকটী কথা বিশেষ করিয়া বলিতে চাই।

বেদে শিব নামে কোন দেবতা দেখা যায় না; কিন্তু মঙ্গলকর অর্থে শিবশব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। যখন শিবের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হয়, যখন তিনি সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন তাঁহাকে রুদ্র বলে। বেদের অনেক স্থলে রুদ্রের উল্লেখ আছে। সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় রুদ্রের নির্দ্দিষ্ট স্থান বা

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নাই। তিনি কখন সূর্য্যরূপী, হেমবর্ণ, রথারূঢ় ও ধনুঃশরধারী; কখন বায়ুভাবাপন্ন, মরুৎকুলের পিতা ও গিরিশায়ী; কখন অগ্নিমূর্ত্তি, কপর্দ্দী, নীলকণ্ঠ, সিতিকণ্ঠ, সহস্রাক্ষ, বিলোহিত, হিরণ্যপাণি ইত্যাদি। বোধ হয় যেখানে উগ্রতা, প্রচণ্ডতা বা ক্রোধ দৃষ্ট হইত, সেখানেই আদৌ রুদ্র শব্দ প্রযুক্ত হইত। বায়ু ও অগ্নির কোপ সচরাচরই লক্ষিত হয়। সুতরাং বায়ু ও অগ্নি হইতেই রুদ্রের অনেক নাম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রচণ্ড ঝটিকায় সহস্র সহস্র গৃহ বৃক্ষ প্রভৃতি সহসা বিনষ্ট হয়, এবং পর্ব্বতশিখরেই প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ বিশেষরূপে অনুভূত হয়; সুতরাং রুদ্র যে মরুৎকুলের পিতা ও গিরিশ বলিয়া উক্ত হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। যাঁহারা অগ্নিশিখার আকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে কপর্দ্দী অর্থাৎ জটাধারী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নাম কিরূপ সুসঙ্গত। রুদ্রের অষ্টমূর্ত্তি। এই অষ্টমূর্ত্তি সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে একটী উপাখ্যান উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"অভূদ্বেয়ম্ প্রতিষ্ঠেতি। তদ্ভূমিরভবৎ। তামপ্রথয়ৎ সা পৃথিব্যভবৎ। তস্যামস্যাম্ প্রতিষ্ঠায়াম্ ভূতানি ভূতানাঞ্চ পতিঃ সংবৎসরায়াদিক্ষন্ত। ভূতানাম্ পতির্গৃহ পতিরাসীদুষাঃ পত্নী। তদ্যানি তানি ভূতানি ঋতবস্তে। অথ যঃ স ভূতানাম্ পতি সম্বৎসরঃ সঃ। অথ যা সা উষা পত্নী ঔষসী সা। তানি ইমানি ভূতানি চ ভূতানাঞ্চ পতিঃ সম্বৎসর উষসি রেতোঽসিঞ্চন্। স সম্বৎসরে কুমারোঽজায়ত। সোঽরোদীৎ। তাম্ প্রজাপতিরব্রবীৎ "কুমার কিং রোদিসি যচ্ছ্রমাৎ তপসোঽধিজাতোঽসীতি।" সোঽব্রবীৎ 'অনপহতপাপ্মা বাস্মি অহিতনামা নাম মে দেহী'তি। তস্মাৎ পুত্রস্য জাতস্য নাম কুর্য্যাৎ পাপ্মানমেবাস্য তদপহন্ত্যপি দ্বিতীয়মপি তৃতীয়মভিপূর্ব্বমেবাস্য তৎপাপ্মানমপহন্তি। তমব্রবীদ্রুদ্রোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ অগ্নিস্তদ্রূপমভবৎ অগ্নির্বৈরুদ্রো যদরোদীৎ তস্মাৎ রুদ্রঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ সর্ব্বোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোদাপস্তদ্রূপমভবন্নাপোবৈ সর্ব্বোঽদ্ভ্যোহি ইদম্ সর্ব্বম্ জায়তে। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ পশুপতিরসীতি। তদযদস্য তন্নামাকরোৎ ওষধয়স্তদ্রূপমভবন্নোষধয়ো বৈ পশুপতিস্তস্মাদ্যদা পশব ওষধির্লভন্তেঽথ পতিযন্তি। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ উগ্রোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ বায়ুস্তদ্রূপমভবৎ বায়ুর্বোগ্রস্তস্মাৎ যদা বলবদ্বাতি উগ্রো বাতি ইত্যাহুঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীদশনিরসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরো-দ্বিদ্যুৎ তদ্রূপমভবৎ বিদ্যুদ্বা অশনিস্তস্মাদ্যম্ বিদ্যুদ্ হন্ত্যশনিরবধীদিতি আহুঃ। সোঽব্রবীজ্জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ ভবোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ পর্জ্জন্যস্তদ্রূপমভবৎ পর্জ্জন্যোবৈভবঃ। পর্জ্জন্যাৎ হীদম্

সর্ব্বম্ ভবতি। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ মহাদেবোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোচ্চন্দ্রমাস্তদ্রূপমভবৎ প্রজাপতির্বৈ চন্দ্রমা প্রজাপতির্বৈ মহান্ দেবঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ ঈশানোঽসীতি। তদযদস্য তন্নামাকরোৎ আদিত্যস্তদ্রূপমভবৎ আদিত্যো বা ঈশান আদিত্যোহি অস্য সর্ব্বস্য ঈষ্টে। সোঽব্রবীৎ এতাবান্বাস্মি মা মেতঃপরোনামধেতি। তান্যেতান্যষ্টাবগ্নি রূপাণি কুমারো নবমঃ।"

অর্থাৎ—

"এই অধিষ্ঠান ছিল। তাহা ভূমি হইল। তাহা বিস্তৃত করা হইলে পৃথিবী হইল। এই অধিষ্ঠানে ভূতসকল ও ভূতসকলের পতি সম্বৎসর দীক্ষিত হইলেন। ভূতদিগের পতি গৃহপতি ছিলেন, উষা পত্নী। এই যে ভূত সকল তাহারাই ঋতু; এই যে ভূতসকলের পতি, সে সম্বৎসর। আর এই যে পত্নী উষা, সে ঔষসী। এই ভূতসকলও তাহাদিগের পতি সম্বৎসর উষাতে বীজক্ষেপ করিলেন। সম্বৎসরে কুমার জন্মিল। সে কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে প্রজাপতি বলিলেন, "কুমার কেন কাঁদিতেছ? অনেক শ্রমে ও তপস্যায় তোমার জন্ম।" সে বলিল, "আমার পাপ যায় নাই, আমার নাম নাই, আমাকে নাম দাও।" এই নিমিত্ত পুত্র জন্মিলে তাহার নামকরণ করিবে; ইহাতে তাহার পাপনাশ হয়; এইরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় নাম দিবে; ইহাতেও পাপনাশ হয়। প্রজাপতি কুমারকে বলিলেন, "তোমার নাম রুদ্র হউক।" তাহার যখন এই নামকরণ হইল, অগ্নি তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ অগ্নিই রুদ্র, রোদন করিয়াছিল বলিয়া রুদ্র। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি সর্ব্ব হইলে।" তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, জল তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ জলই সর্ব্ব, জল হইতে এ সকল জন্মিয়াছে। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি পশুপতি হইলে।" যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, ওষধি তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ ওষধিই পশুপতি; এই নিমিত্ত পশুরা ওষধি পাইলে পরাক্রান্ত হয়। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি উগ্র হইলে।" যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, বায়ু তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ, বায়ুই উগ্র, এই নিমিত্ত যখন প্রবল বাতাস বহিতে থাকে, লোকে বলে যে উগ্র বহিতেছে। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি অশনি হইলে।" তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, বিদ্যুৎ তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ বিদ্যুৎই অশনি, এই নিমিত্ত যে বিদ্যুতের আঘাতে মরে, লোকে বলে অশনির (অর্থাৎ বজ্রের) আঘাতে মরিয়াছে। সে বলিল,

"আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি ভব হইলে।" যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, পর্জ্জন্য তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ পর্জ্জন্যই ভব, পর্জ্জন্য হইতেই সকল হয়। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি মহাদেব হইলে।" তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, চন্দ্রমা তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ প্রজাপতিই চন্দ্রমা, প্রজাপতিই মহাদেব। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি ঈশান হইলে।" তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, আদিত্য তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ আদিত্যই ঈশান, আদিত্যই এসকল শাসন করিতেছেন। সে বলিল, "আমি এত হইয়াছি ; আমাকে আর নাম দিও না।" অগ্নির এই আটটী মূর্ত্তি, কুমার নবম।"

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যে উপাখ্যানটী উদ্ধৃত হইল, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, রুদ্রের রূপে অগ্নিরই প্রবলতা, কিন্তু তথায় সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতিরও স্থান আছে। প্রাচীনকালে যে সকল দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, সকলই সময়ে সময়ে ভীম মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। সূর্য্য কখনও কখন দেশ দগ্ধ করিতেন। বায়ু সময়ে সময়ে বৃক্ষ উন্মূলিত, গৃহ ভগ্ন ও নৌকা জলমগ্ন করিতেন। অগ্নি কখন কখন লোকের সর্ব্বস্বান্ত করিতেন। অশনির আঘাতে সময়ে সময়ে লোকের প্রাণ যাইত। প্রবল জলপ্লাবনে কখন কখন জনপদসকল বিনষ্ট হইত। ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টিতে কখন কখন বিলক্ষণ অপকার করিত। মনোহর চন্দ্রমাও সময়ে সময়ে রাহুগ্রস্ত হইয়া ভয়বিস্তার করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক দেবতারই কখন কখন উগ্রভাব লক্ষিত হইত। সুতরাং ক্রমে সর্ব্বত্রই রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকলের উগ্রতার সমষ্টি লইয়া রুদ্রের বিরাট মূর্ত্তি বিরাজমান হইল। ইহাতে কালে কালে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি কেন না তাঁহার নিকটে ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে? কি প্রকারে বৈদিক দেবতাদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়, স্থির করা সহজ নয় ; কিন্তু এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, সমুদায় প্রাচীন দেবতার উগ্রভাব লইয়া শিবের এবং সৌম্যভাব লইয়া বিষ্ণুর সৃষ্টি, এবং এই কারণে লোকে ক্রমে অন্য দেবতা অপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রতি অধিক ভক্তি দেখাইতে আরম্ভ করে। হয় ভয় নয় ভালবাসা এই দুইটীর মধ্যে কোন একটীর বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণতঃ লোকে অতি-মানুষিক শক্তির উপাসনা করিতে যায়। ইহার মধ্যে একটী হইতে শৈবধর্ম্মের এবং অপরটী হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি।

কিন্তু বর্ত্তমানকালের শিব কেবল বৈদিক রুদ্র নহেন। তিনি লিঙ্গমূর্ত্তিতে পূজিত। অথচ বৈদিক ঋষিদিগের কোন উপাস্য দেবতাই লিঙ্গমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণিত

নহেন, এবং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অতি প্রাচীনকালে অনার্য্যজাতিদিগের মধ্যে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষীয় অনার্য্যজাতিদিগের নিকট হইতে আর্য্যেরা এপ্রকার শিবপূজা-পদ্ধতি পাইয়াছিলেন, ইহা অনেক দূর সম্ভব। শৈব উপাসনা যে অনার্য্যভাবাপন্ন, নিম্নে তদ্বিষয়ের কয়েকটী প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে।—

(১) বেদে লিঙ্গোপাসকদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ আছে। ঋগ্‌বেদে লিখিত আছে,—

"স শর্ধদর্যো বিষুণস্য জন্তোর্মা শিশ্নদেবা অপিগুর্ঋতংনঃ।"

অর্থাৎ "ইন্দ্র শত্রুদিগকে শাসন করুন যেন লিঙ্গোপাসকেরা আমাদিগের যজ্ঞের নিকট না আসিতে পারে।" ইহাতে বোধ হয় যে, যে দস্যুগণ আর্য্য ঋষি-দিগের যজ্ঞের বিঘ্ন করিত, তাহারা লিঙ্গোপাসক ছিল। রামায়ণের অনেকস্থানে বর্ণিত আছে যে, রাক্ষসেরা যজ্ঞকালে মুনিদিগের প্রতি অনেক উৎপাত করিত। রাক্ষসেরা যে আর্য্যধর্ম্মদ্বেষী স্বতন্ত্রধর্ম্মাক্রান্ত অনার্য্যজাতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং উত্তরকালবর্ত্তী বর্ণনাদ্বারা বৈদিক শ্লোকার্থের সমর্থনই হইতেছে।

(২) স্মৃতিতে ব্রাহ্মণদিগের শিবপূজা নিষিদ্ধ দেখা যায়। বশিষ্ঠ-স্মৃতিতে লিখিত আছে,—

শূদ্রাদীনাস্তু রুদ্রাদ্যা অর্চ্চনীয়া প্রযত্নতঃ ॥
যত্র রুদ্রার্চ্চনং প্রোক্তং পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি।
তদব্রহ্মণ্যবিষয়মেবমাহ প্রজাপতিঃ ॥
রুদ্রার্চ্চনং ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ পুরাণেষূচ গীয়তে।
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতিনাং নেতরেষাং তদুচ্যতে ॥

অর্থাৎ শূদ্রাদিদিগের যত্নপূর্ব্বক রুদ্রাদি অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। পুরাণে ও স্মৃতিতে যেখানে রুদ্রার্চ্চনার কথা আছে, তাহা ব্রাহ্মণের জন্য নহে, প্রজাপতি বলিয়াছেন। পুরাণে রুদ্রার্চ্চনা ও ত্রিপুণ্ড্রধারণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের জন্য উক্ত হইয়াছে, অপরের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্য নহে।

(৩) রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে রাক্ষস ও দৈত্যগণ মহাদেবের ভক্ত বলিয়া বর্ণিত, এবং মহাদেবকেও অনেক সময়ে তাহাদিগের প্রতি সদয় দৃষ্ট হয়।

(৪) ইতিহাস পুরাণাদিতে দক্ষযজ্ঞভঙ্গের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় শিব পূর্ব্বে যজ্ঞভাগ পাইতেন না, অনেক মারামারির পরে তিনি দেবতা বলিয়া গৃহীত হন। রামায়ণে প্রথমে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। হরধনু সম্বন্ধে জনক বলিতেছেন,—

দক্ষযজ্ঞ বধে পূর্ব্বং ধনুরায়ম্য বীর্য্যবান্।
বিধ্বস্ত ত্রিদশান্ রুদ্রঃ সলীলমিদমব্রবীৎ ॥
যস্মাদ্ ভাগার্থিনো ভাগান্ নাকল্পয়ত মে সুরাঃ।
বরাঙ্গাণি মহার্হাণি ধনুষা শাতয়ামি বা ॥
ততো বিমনসঃ সর্ব্বে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব।
প্রাসাদয়ন্ত দেবেশম্ তেষাং প্রীতোঽভবদ্ ভবঃ ॥
প্রীতশ্চাপি দদৌ তেষাং তান্যঙ্গানি মহৌজসাং।
ধনুষা যানি যাঙ্গসন্ শাতিতানি মহাত্মনা ॥
তদেতদ্ দেব দেবস্ত ধনুরত্নং মহাত্মনঃ।
ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তং অস্মাকম্ পূর্ব্বকে বিভো ॥

অর্থাৎ "পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ নাশকালে বীর্য্যবান্ রুদ্র ধনুরাকর্ষণ করিয়া দেবতাদিগকে পরাজয় করত উপহাস করিয়া এই বলিয়াছিলেন, "দেবগণ, আমি ভাগার্থী হইলেও তোমরা আমাকে ভাগ দাও নাই; আমি ধনুদ্বারা তোমাদিগের মহার্হ বরাঙ্গ সকল কর্ত্তন করি।" অনন্তর, হে মুনিপুঙ্গব, দেবতাসকল বিমনা হইয়া মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিলে, তিনি প্রীত হইলেন। মহাদেব ধনুদ্বারা মহাতেজসম্পন্ন দেবতাদিগের যাহার যে অঙ্গ কাটিয়াছিলেন, প্রীত হইয়া প্রদান করিলেন। এই সেই ধনুরত্ন, মহাদেব ইহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের হস্তে ন্যস্ত করেন।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে যে, অন্য দেবগণকে রথারোহণে দক্ষযজ্ঞে যাইতে দেখিয়া উমা পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনিও কেন যাইতেছেন না। মহাদেব উত্তর করিলেন,—

"সুরৈরেব মহাভাগে পূর্ব্বমেতদনুষ্ঠিতং।
যজ্ঞেষু সর্ব্বেষু মম ন ভাগ উপকল্পিতঃ ॥
পূর্ব্বোপায়োপপন্নেন মার্গেণ বরবর্ণিনি।
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্য ধর্ম্মতঃ ॥

অর্থাৎ "হে মহাভাগে, দেবতাদিগের প্রাচীন অনুষ্ঠান এই যে কোন যজ্ঞেই আমার ভাগ নির্দ্দিষ্ট নাই। হে বরবর্ণিনি, পূর্ব্ব পদ্ধতি নির্দ্ধারিত মার্গানুসারে ধর্ম্মতঃই দেবতারা আমাকে যজ্ঞের ভাগ দেয় না।"

(৫) শিবের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করা যায় না। বহ্বৃচ গৃহ্য পরিশিষ্টে লিখিত আছে,—

অগ্রাহ্যং শিবনৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
শালগ্রাম শিলাস্পর্শাৎ সর্ব্বোযাতি পবিত্রতাং ॥

অর্থাৎ "পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি শিবনৈবেদ্য গ্রহণীয় নহে। শালগ্রাম শিলাস্পর্শে সকল পবিত্র হয়।"

বরাহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

অভক্ষ্যং শিবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
শালগ্রামশিলাযোগাৎ পাবনং তদ্ভবেৎ সদা॥

অর্থাৎ "পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি শিবনির্ম্মাল্য অভক্ষ্য। শালগ্রাম-শিলাযোগে তাহা সদা পবিত্র হয়।"

লিঙ্গার্চ্চন-তন্ত্র শিবভক্ত কোন এক ব্যক্তির রচিত। তাহাতে মহাদেবকে জিজ্ঞাসিত হইতেছে,—

দুর্ল্লভং তব নির্ম্মাল্যং ব্রহ্মাদীনাং কৃপানিধে।
তৎ কথং পরমেশান নির্ম্মাল্যং তব দূষিতং॥

"হে কৃপানিধে, তোমার নির্ম্মাল্য ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ। তবে, হে পরমেশ, তব নির্ম্মাল্য দূষিত কেন?"

মহাদেব উত্তর করিলেন যে তাঁহার কণ্ঠে বিষ আছে বলিয়া লোকে তাঁহার নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করে না। উত্তরটি ঠিক হউক আর না হউক, মহাদেবের নৈবেদ্য যে গ্রহণ করা যায় না ইহা শিবভক্তেরাও স্বীকার করেন।

(৬) চণ্ডাল চর্ম্মকার প্রভৃতি অতি হেয় জাতিও স্বহস্তে শিবপূজা করিতে পারে। কিন্তু দ্বিজসহায়তা ব্যতিরেকে অন্য দেবতার পূজা হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে শিবপূজা পদ্ধতি অনার্য্যভাবাপন্ন, এবং তন্নিমিত্তই অনার্য্যবংশ-সম্ভূত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ আপনা আপনি মহাদেবকে অর্চ্চনা করিতে ও নৈবেদ্যাদি দিতে অধিকারী। আর বোধ হয় এই কারণেই শাস্ত্রে শিবনির্ম্মাল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৭) পুরাণাদিতে শিবের যে প্রকার মূর্ত্তি বর্ণিত আছে, তাহা সভ্য আর্য্যজাতিদিগের কল্পিত বলিয়া প্রতীত হয় না। গলায় হাড়ের মালা, অঙ্গে ভস্ম মাখা, মস্তকে সর্প, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম অথবা দিগম্বর, সঙ্গে ভূত প্রেত, সিদ্ধি ও ধুতুরা সেবনে চক্ষু রক্তবর্ণ ও বিকৃতাকার; উপাস্য দেবতার ঈদৃশ রূপ আর্য্য ঋষিদিগের চিন্তাসমুদ্ভূত না হইয়া অসভ্য দস্যুদিগের কল্পনার ফল হইবারই সম্ভাবনা।

কি প্রকারে অনার্য্য-মহাদেব বৈদিক রুদ্রের সহিত এক বলিয়া গণ্য হইল, স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু অনুমান হয় যে স্বভাবসাদৃশ্য এরূপ একতার প্রতিপাদক হইয়াছিল। অনার্য্য-মহাদেব এবং বৈদিক রুদ্র, উভয়েই ভীম মূর্ত্তি, উভয়েই উগ্রপ্রকৃতি। আর সাঁওতালদিগের উপাস্য গিরিদেব ও প্রাচীন অনার্য্য-মহাদেব যদি একই দেবতা বলিয়া ধরা যায়, রুদ্রের গিরিশ নাম দ্বারাও একতা সংস্থাপনের একটি উপায় লক্ষিত হয়। যখন প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতভূমি জয়

করিয়া অনেক দস্যু প্রজা প্রাপ্ত হইলেন, এবং যখন উক্ত প্রজারা সমাজের নিম্ন শ্রেণীতে দাসরূপে স্থান পাইল, তখন ধর্ম্ম বিষয়ক অনেক বিবাদের পরে প্রজাদিগের প্রীতি লাভ দ্বারা রাজ্যমধ্যে শান্তি সংস্থাপন বাসনায় দ্বিজগণ এতদ্দেশীয় আদিম নিবাসীদিগের পরমপূজনীয় মহাদেবকে রুদ্র-মূর্ত্তি বলিয়া উপাস্য দেবতা দলভুক্ত করিয়া লন, এপ্রকার কল্পনা নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না। যদি এরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি অপেক্ষা শিব কেন বড় হইয়া উঠেন, তাহার আর একটি কারণ বুঝা যায়। অনার্য্য ভারতবাসীদিগের সংখ্যা আর্য্যদিগের অপেক্ষা অধিক; সুতরাং অনার্য্য জাতিগণ হিন্দুসমাজভুক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক লোকের নিকটে শিবের সমাদরাধিক্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। একে ত রুদ্র সর্ব্বত্র স্বীয় ক্রোধ-প্রজ্জ্বলিত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র চন্দ্র রবি বহ্নি অপেক্ষা আপনার প্রতাপ বিস্তার করিতেছিলেন, তাহাতে আবার ভারতীয় লিঙ্গোপাসকদল তাঁহাকেই তাহাদিগের মহেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিল, রুদ্রের ক্ষমতা কেন না অনিবার্য্য ও বহুবিস্তীর্ণ হইয়া উঠিবে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জড়জগৎ ও জীবমণ্ডলী এই দুইটি হইতে দেবোপাসনা ও লিঙ্গোপাসনা এই দুইটি উপাসনা পদ্ধতির উৎপত্তি। এই দুই প্রকার উপাসনার সংযোগে শৈব উপাসনা সংগঠিত, সুতরাং ভারতবর্ষে যে শিবপূজা বহুকাল প্রবল রহিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কোন্ সময়ে আর্য্য ঋষিগণে লিঙ্গোপাসনার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন, নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি পুরুষ ও বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদে যে লিঙ্গোপাসনার আভাস আছে, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই প্রতীতি হইবে। সুতরাং বুদ্ধদেব জন্মিবার পূর্ব্বে যে শিবশক্তির সমাদরের সূচনা হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় নহে।

শিব যে অনেক দেবতার সমষ্টি, শিবানীর প্রতি দৃষ্টি করিলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কালী ও করালী এই দুইটি অগ্নি জিহ্বার নাম।* পার্ব্বতী, হৈমবতী, গিরিজা, এসকল গিরিশায়ী বায়ুপত্নীর নাম। গৌরী নামটি সূর্য্যজায়া উষা হইতে প্রাপ্ত। প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, শক্তি, এসকল নাম লিঙ্গোপাসনা হইতে সমুৎপন্ন তাহার সন্দেহ নাই। †

---

* কালী করালী মনোজবাচ সুলোহিতা যাচ সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপীচ দেবী লেলায়মানা দহনস্ত জিহ্বাঃ।

মুণ্ডক উপনিষদের টীকা।

† এই প্রবন্ধ, এবং "মিল, ডার্বিন এবং হিন্দুধর্ম্ম" শির্ষক প্রবন্ধ যে ভিন্ন ভিন্ন লেখক প্রণীত, ইহা বুদ্ধিমান্‌কে বলিয়া দেওয়া বাহুল্য। বং সং।

বৈদিক ধর্ম্ম আর্য্যজাতির প্রাথমিক ধর্ম্ম। বেদ হিন্দুগণের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সমস্ত কার্য্যকলাপ বৈদিক ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বেদে কাহারও অবিশ্বাস করিবার ক্ষমতা নাই। কেন না বেদ ঈশ্বরের বাক্য—মানবীয় বাগ্‌যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয় নাই, সুতরাং যিনি বেদে অবিশ্বাস করেন, তিনি নাস্তিক, ঘোর পাষণ্ড,—সমাজশত্রু। বৈদিক আচার ব্যবহারে হিন্দুগণের বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইল এবং যজ্ঞার্থে প্রত্যহ অসংখ্য অসংখ্য পশুর প্রাণ বধ হইতে লাগিল। সোমরস পান এবং পশু বধ করা প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য। এ সকল না করিলে বৈদিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই। আর্য্যগণ ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া নিষ্ঠুরতার একশেষ উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। এ সময় সমাজের বিপ্লব নিতান্ত আবশ্যক, বিপ্লব না হইলে সমাজের মঙ্গল হওয়া দূরপরাহত। সাধারণে ধর্ম্মান্ধ হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় বটে কিন্তু অসাধারণ তেজস্বী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির এ সকল দেখিয়া হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হয়। এ সময় মহাতেজা বিপ্লবকারী অতি দুর্ল্লভ। সাধারণ লোকে তাঁহার উদয় সহজে বুঝিতে সক্ষম নহে। বৈদিক কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠানে আর্য্যগণ প্রবৃত্ত হওয়াতে সমাজের অহিত হইতে লাগিল। সাধারণ লোক ধর্ম্মান্ধ, ব্রাহ্মণগণ সমাজের একমাত্র কর্ত্তা এবং তাঁহারাই সমাজকে যেদিকে ইচ্ছা সেই পথে চালাইতে লাগিলেন। নৈসর্গিক নিয়ম অনুসারে সমাজ কখন এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। মনুষ্যের মনও পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং ভারত-সমাজের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। মনুষ্যের মনোমধ্যে অভিনব চিন্তার অবতারবৎ সমাজের পরিত্রাতা শাক্যসিংহ উদয় হইলেন। ইনি বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিন্দা করিতে তথা সমাজের অভিনব প্রণালী বদ্ধ করিতে প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় জ্ঞানের শাণিত অসিহস্তে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে ইঁহার প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবরণ প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য এবং তাহাই নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম অতি প্রাচীন। বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডীয় নবোত্তর শততম সর্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধ
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধিয়ঃ শক্যতম প্রজানাং
ন নাস্তিকে নাভিমুখো বধঃ স্যাৎ॥

অর্থাৎ যেমন বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে, অতএব যাহাকে বেদবহিস্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না।* এতৎপ্রমাণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় রহিল না। ইহা ভিন্ন বায়ু, কল্কিপুরাণে, গণেশ শম্ভু প্রভৃতি উপপুরাণে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে। শাক্যসিংহ শেষ মর্ত্ত্য বুদ্ধ। ইহার পূর্ব্বে ৫৫ জন বুদ্ধ বর্ত্তমান ছিলেন; তাহার মধ্যে পদ্মোত্তর হইতে সমপুজিত পর্য্যন্ত ৪৯ জন বুদ্ধ স্বর্গে ও বিপশ্চিত, শিখি, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কণক মুনি ও কাশ্যপ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর শেষ বুদ্ধ শাক্যসিংহ "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" মর্ত্ত্যলোকে বোধিসত্ত্বের উন্নতি জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্ব্বশুভপ্রদ ধর্ম্মের একমাত্র উপদেশক; যথা—ললিত বিস্তারে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—

জ্ঞান প্রভং হত তম সুপ্রভাকরং শুভ পদং শুভ বিমলাগ্রতেজসম্।
প্রশান্ত কায়ং শুভ শান্ত মানসং মুনিং সমাশ্রিয়ন্ত শাক্যসিংহম্।
জ্ঞানোদধিং শুদ্ধ মহানুভাবং ধর্ম্মেশ্বরং সর্ব্ববিদং মুনীশম্ ইত্যাদি॥

অভিধান মধ্যে শাক্যসিংহের নামান্তর, যথা—খজিৎ, শ্বেতকেতু, ধর্ম্মকেতু, মহামুনি, পুঞ্জজ্ঞান, সর্ব্বদর্শী, মহাবোধী, মহাবল, বহুক্ষণ, ত্রিমূর্ত্তি, সিদ্ধার্থ, শাক্য, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি, শৌদ্ধোদনি, অর্কবন্ধু, মায়াদেবী সুত, গৌতম। হেমচন্দ্র তাঁহার এই কয়েকটী নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

শাক্যসিংহ, অর্কবান্ধব, রাহুলেষু, সর্ব্বার্থ সিদ্ধ, গৌতমানেয় মায়াসুত, শুদ্ধোদন সুত।

অমরকোষের নামগুলি প্রসিদ্ধ। তাহার সিংহলে পালি ভাষায় অনুবাদ যথা "শুদ্ধোদনিচ গৌতম, শাক্য সিংহো তথা শাক্য মুনিচ অরিচ বন্ধুচ।"

শাক্য সিংহ এই নামটী নামকরণের নাম নহে। শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। "শাক্য বংশ" ইহাও আভিজনিক সংজ্ঞা নহে। ইক্ষ্বাকু বংশীয় কোন ব্যক্তি পিতৃশাপে আক্রান্ত হইয়া কপিলাশ্রমে কিছুকাল পর্য্যন্ত এক

* রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

শাক বৃক্ষে (শেগুন) আশ্রয় লইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ঐ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় পুরুষের নাম শাক্য' বলিয়া প্রথিত হয়। তদ্বংশীয়েরাও তদবধি শাক্য বলিয়া বিখ্যাত। আচার্য্য ভরত "শাক্য মুনি" এই নামের ব্যুৎপত্তি স্থলে লিখিয়াছেন, যথা—"শাক্য বংশ্যত্বাৎ শাক্যঃ শাক্যশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ তথাহি—শাকো বৃক্ষবিশেষঃ তত্রভবা বিদ্যমানাঃ শাক্যোঃ পিতুঃ শাপেন কেচি-দিক্ষাকুবংশীয়া গৌতমবংশজকপিল মুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবাসাশ্চ শাক্যো উচ্যতে তদুক্ত "শাকবৃক্ষ প্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে। তস্মাদিক্ষাকু বংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতিশ্রুতাঃ।" শাক্যের অপর প্রসিদ্ধ নাম গৌতম। এই নাম দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে গৌতমবংশীয় মনে করিয়া থাকেন কিন্তু সেটা তাঁহাদিগের ভ্রম। শাক্যসিংহ প্রকৃত ইক্ষাকুবংশীয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা গৌতম-বংশীয় কপিল নামক মুনির আশ্রমে গিয়া লুক্কায়িতভাবে শাকবৃক্ষে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা শাক্য ও গৌতম নামে বিখ্যাত হন। ইনিও সেই বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া ঐ নামে খ্যাত।

শাক্যসিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন। মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন কপিলবস্তু* নগরের রাজা ছিলেন। আর্য অভিধানে লিখিত আছে, শুদ্ধোদন রাজা অতি ন্যায়বান্ ছিলেন এবং পবিত্রান্ন ভোজন করিতেন, যথা—"শুদ্ধোদন যতো ভুংক্তে ন্যায়বান্ শুদ্ধমোদনম্।" ললিত বিস্তারে লিখিত আছে শাক্যসিংহ জম্বু দ্বীপের ১৮ স্থান ও ১৮ কুল অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শাক্যকুলকে নির্দ্দোষ জানিয়াছিলেন—মগধে বিদেহ কুল, কোশলায় কৌশল কুল, বংশরাজ কুল, বিশালা নগরে প্রদ্যোতন কুল, মথুরা, হস্তিনায় পাণ্ডব কুল ইত্যাদি। তিনি পাণ্ডব বংশকেও সদোষ বিবেচনা করিয়াছিলেন—"পাণ্ডব কুলপ্রসূতৈঃ কৌরব বংশোঽতি ব্যাকুলী কৃতো যুধিষ্টিরো ধর্ম্মস্য পুত্র ইতি কথয়ন্তি ভীম সেনো বায়োঃ—ইত্যাদি—" একুলের দোষ হইল যে পাণ্ডবেরা কুরুদিগকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জারজ। এইরূপ সকল বংশেই দোষ, কেবলমাত্র শাক্য বংশ নির্দ্দোষ।

শাক্য কপিলবস্তু নগরে বসন্তকালে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ বোধিসত্ব যে কালে তুষিত পরিত্যাগ করিয়া মায়াদেবীর দক্ষিণ কুক্ষে প্রবেশ করেন, সেই সময় তিনি নিদ্রিতাবস্থায় এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যথা—

হিম রজত নিভশ্চ ষড়্বিষাণঃ সুচরণ চারুভুজঃ সুরক্তশীর্ষা উদয়মুপগতো গজো প্রধানো ললিত গতির্দৃঢ় বজ্রগাত্র সন্ধিঃ।" অর্থাৎ তুষার বা রজতের ন্যায়

---

* নেপাল দেশের পর্ব্বত সন্নিকটে।

শ্বেত বর্ণ, ছয়টি দন্ত যুক্ত, মনোজ্ঞকর, সুরক্ত শীর্ষদেশ, একটী গজ মনোহর গতিতে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তৎকালে তিনি কিরূপ সুখে ছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না "নচ মম সুখ জাতু এবরূপং দৃষ্টমপিশ্রুতং নাপি চানুভূতম্।" ভাবিলেন, একি! কখন আমার এরূপ সুখোদয় হয় নাই, আর এরূপ রূপও কখন দেখি নাই বা শুনি নাই এবং ধারণ করি নাই। নিদ্রাভঙ্গে তিনি রাজাকে স্বপ্ন বিবরণ সমুদায় অবগত করাইলেন। রাজা গণকদিগকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিল, আপনার সকল প্রাণীর হিতকারী একটী রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মিবে এবং তৎকালে এইরূপ দৈববাণী হইল, যথা—"তুষিত পুরি চ্যবিত্বা বোধিসত্ত্বো মহাত্মা নৃপতি তব সুতত্বং মায়াকুক্ষোপপন্নঃ।" অর্থাৎ, হে নৃপতি, তুমি শঙ্কিত হইও না, মহাত্মা বোধিসত্ব তুষিত পুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া, এই মায়াদেবীতে উপপন্ন হইয়াছেন। মায়াদেবী সুখে বিবিধ সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলে অষ্টপ্রকার নিমিত্ত ঘটিয়াছিল, যথা—তৃণ কণ্টকাদির কাঠিন্য ছিল না, দংশ মশকাদির দৌরাত্ম্য ছিল না—হিমালয় পর্ব্বতের সমস্ত বিহঙ্গগণ আসিয়া রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে রব করিয়াছিল, রাজা শুদ্ধোদনের আগারে সর্ব্বকালীন ফল পুষ্প একদা প্রকাশ হইয়াছিল—শুদ্ধোদনের গৃহে আহার করিলেও আহারীয় দ্রব্য ক্ষয় হয় নাই এবং তাঁহার অন্তঃপুরে যে সকল বাদ্যযন্ত্র ছিল তাহা সমুদায় আপনা আপনি বাদিত হইয়াছিল, ইত্যাদি। শেষ বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিবিধ অলৌকিক বিবরণ ললিত বিস্তারে লিখিত আছে, তাহার এখানে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া উঠে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে শাক্যসিংহ খ্রীষ্ট জন্মিবার ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা মায়াদেবীর তাঁহার জন্মের এক সপ্তাহ পরে মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁহার মাতার ভগ্নী দ্বারা অতি যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। রাজার পুত্রমুখ নিরীক্ষণে দিন দিন আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং শাক্য অচিরকাল মধ্যে বহু বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি, বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে একদণ্ডও অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র বালসুলভ চপলতা ছিল না এবং সময়ে সময়ে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। রাজা তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে সংসারে সুখী করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদা মহন্ধক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য রাজা শুদ্ধোদনকে বলিল, মহারাজ! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে, "যদি কুমারোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতি তথা গতোভবিষ্যতি অর্হন্ সম্যক্ সম্বুদ্ধঃ, উত নাভি নিষ্ক্রমিষ্যতি রাজা

ভবিষ্যতি চক্রবর্ত্তীচ বিজেতা ধার্ম্মিকো ধর্ম্মরাজঃ সপ্তরত্ন সমন্বাগতঃ" (১২ অধ্যায় ললিত বিস্তার)।

যদি আমাদের কুমার প্রব্রজ্যা করেন, তাহা হইলে ইনি সম্যক্ জ্ঞানী বুদ্ধ এবং আর্হত হইবেন। আর যদি গৃহাশ্রমী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন। অতএব কুমারকে অচিরাৎ বিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শাক্যবংশের চক্রবর্ত্তিত্ব আর লোপ হইবে না।

রাজা শুদ্ধোদন কন্যার অন্বেষণ করিবার আদেশমাত্র শতশত শাক্য কন্যা-দানের নিমিত্ত উদ্যত হইল। কুমারকে তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি কহিলেন, সপ্তম দিবসে উত্তর দিব। ভগবান্ শাক্যসিংহ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, আমি কাম ভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছি। যে আমি ধ্যাননিমীলিত নেত্রে ধ্যেয় সুখে উপবন মধ্যে বাস করিব, সেই আমি কি স্ত্রী-গৃহে বাস করিতে পারি? না তাহাতে আমার শোভা পায়? আবার ভাবিলেন, না, সত্বগুণের পরিপাক হইলে কিরূপ হয়, তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে, লোককে শিক্ষা দিতে হইবে, পঙ্কজ কর্দ্দমের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়; জল মধ্যেই শোভা পায়; অতএব যদি কোন বোধিসত্ব পরিবার লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি তন্মধ্যে কদাচিৎ থাকিয়াও বিনেয় হইতে বা থাকিতে অথবা করিতে পারেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্বেরাও ভার্য্যাপুত্র পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব লোকশিক্ষার নিমিত্ত আমাকে ভার্য্যাগ্রহণ স্বীকার করা আবশ্যক। ইহার মূল "বিদিতং ময়ানন্ত কামদোষাঃ শরণ সর্ব্ববাস শোক দুঃখমূলা ভয়ঙ্কর বিষপত্র সন্নিকাসা জ্বলননিভা অসিধারাতুল্যরূপাঃ, কামগুণে নমেস্তিচ্ছন্দং রাগো নচাহং শোভেস্ত্র্যাগার মধ্যে যোন্বহমুপবনে বসেয়ং তুষ্ণীম্ ধ্যান-সমাধিসুখেন শান্তচিত্ত ইতি।"

"সঙ্কীর্ণ পঙ্কি পদ্মমানি বিবৃদ্ধিমেন্তি,
আকীর্ণ রাজ্জু জলমধ্যে লভাতি পূজাম্,
যদি বোধিসত্ব পরিবার বলং লভন্তে,
তদসত্ব কোটি নিযুতাস্তমৃতে বিনেন্তি॥
যেচাপি পূর্ব্বক অভূদ্বিদুবোধিসত্বাঃ,
সর্ব্বেভি ভার্য্যসুত দর্শিতইস্ত্রীগারাঃ
নচ রাগ রক্ত নচ ধ্যান সুখেভিভ্রষ্টা
হন্তানু শিক্ষয়ি অহংপিগুণেষু তেষাং। (১২ অঃ)

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সপ্তম দিনে বলিলেন,—

"ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রাং তথৈবচ।
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয়॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা বৈশ্য যে কোন জাতির কন্যা হউক, যাহার পূর্ব্বোক্ত গুণসকল আছে, সেই কন্যার সহিত আমার বিবাহ দাও।

রাজা শুদ্ধোদন, নিজ নগরে প্রচার করিলেন,—

"ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিত
গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ।"

আমার কুমার কুল, গোত্র বা রূপলাবণ্যে মোহিত হন না; গুণ, সত্য ও ধর্ম্মেই কুমারের মন, ইহা বিবেচনা করিয়া কন্যার অনুসন্ধান কর।

অনন্তর অনুসন্ধান দ্বারা দণ্ডপাণিশাক্যের দুহিতা গোপা নাম্নী কামিনী শাক্যের অভিলষিত গুণবতী হইলেন। সুতরাং ভগবান্ শাক্য তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিলেন। "অথ দণ্ডপাণেঃ শাক্যস্য দুহিতা শাক্যকন্যা সা দাসীশতপরিবৃতা" ইত্যাদি।

কিছুকাল দম্পতি অতি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু শাক্যসিংহ সতত গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা উত্থিত হইত। তিনি মনশ্চক্ষুদ্বারা দেখিতেন—

"সর্ব্ব অনিত্যা, অকামা, অধ্রুবা নচ শাশ্বতাপি,
ন কল্পা মায়ামরীচি সদৃশা, বিদ্যুৎ ফেণোপমাশ্চপলা॥"

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমেই তাঁহার সংসারের সুখে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। একদা তিনি বহুজন সমভিব্যাহারে রথারোহণে নগরের পূর্ব্ব তোরণ দিয়া কুসুম নিকেতনে গমন করিতেছিলেন; এমত সময়ে পথিমধ্যে একজন দন্তহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি কহিল, রাজকুমার! এ ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়স জন্য এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ ব্যক্তি কোন বিশেষ রোগগ্রস্ত নহে। ক্রমে যৌবনাবস্থা গত হইলে আমাদিগের সকলেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে।

তচ্ছ্রবণে রাজকুমার কহিলেন, হায়! আমরা কি মূঢ়, যৌবনগর্ব্বে মনুষ্য-শরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা একবারও চিন্তা করি না। সারথি! রথবেগ সম্বরণ কর, আমি সংসারের দুরন্ত কশাঘাত সহ্য করিতে ইচ্ছা করি না। সাংসারিক সুখ ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে লিপ্ত থাকিয়া কে বৃদ্ধ বয়সের এতাদৃক্ কষ্ট সহ্য করিবে? অন্য একদিবস শাক্যসিংহ রথারোহণে নগরের দক্ষিণ তোরণ সম্মুখে স্বজনপরিত্যক্ত বন্ধুহীন, বহুরোগগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ কলেবর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার এতাদৃক্ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি কর-

যোড়ে তাহার অবস্থার প্রকৃত কারণ বিজ্ঞাপন করিল; তাহা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন, "হায়! শারীরিক অবস্থা কতদূর পরিবর্ত্তনশীল, এবং রোগের তাড়নায় মনুষ্যের এতাদৃক্ হীন অবস্থা হইয়া থাকে। কোন্ জ্ঞানী এই সকল দেখিয়া সংসারের সুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করেন?" এই বলিয়া রাজকুমার উদ্দেশ্য স্থানে গমন না করিয়া নগরমধ্যে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপ তৃতীয় বার রথারোহণে নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়া বিলাস-কাননে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে বস্ত্রাবৃত এক মৃতশরীর দেখিতে পাইলেন। তাহার চতুর্দ্দিকে স্বজন বান্ধবেরা হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তদ্দর্শনে রাজকুমারের মনে সংসারের প্রতি বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ পাইল। তিনি সারথিকে কহিলেন, "যৌবন গর্ব্ব বৃদ্ধ বয়সে শেষ হইবে, শারীরিক স্বাস্থ্য ব্যাধি দ্বারা বিনাশ পাইবে এবং জীবনও কিছু কালের মধ্যে বিনাশ হইবে। এ সকল দেখিয়া সংসারের সুখে কে মুগ্ধ হইতে বাসনা করে? যদি বৃদ্ধ বয়স, রোগ-যন্ত্রণা এবং মৃত্যু সংসারের মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলেই এই স্থান চিরসুখের হইত।" তাহার পর মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "সারথি! নগর মধ্যে গমন কর, আমি এক্ষণে রথ হইতে অবতরণ করিয়া সংসারের কষ্ট হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করিব।"

অবশেষে চিন্তা করিতে করিতে নগরের উত্তরাভিমুখে বিলাস ভবনে গমন করিবার সময় এক শান্তমূর্ত্তি, রোগশোকবিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কে?" সারথি কহিল, "রাজকুমার! এ ব্যক্তি ভিক্ষু, সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত। এ ব্যক্তি সকল রিপুকে পরাজয় করিয়া, আনন্দচিত্তে ভিক্ষান্নে জীবন অতিবাহিত করিতেছে।" রাজকুমার কহিলেন, "সংসারের মধ্যে এই ব্যক্তিই সাধু, জ্ঞানিগণের এই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। আমিও এই পথ অবলম্বন করিব, এবং অন্যান্য লোককেও এই ভিক্ষুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিব। ইহাতে আমাদিগের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।" এই বলিয়া রাজকুমার বাটী প্রত্যাগত হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের ক্রমেই সংসারের বিরাগ হৃদয়ে বদ্ধমূল দেখিয়া, তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ভাব কিছুতেই পরিবর্ত্ত হইল না। তিনি সংসারের সকল সুখ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, জীবনে ধিক্; জরাগ্রস্ত হইবার সম্ভব এমত যৌবনে ধিক্; ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হয় এমত স্বাস্থ্যে ধিক্; এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় এমত জীবনকেও ধিক্—হায়!

ধিগ্যৌবনেন জরয়া সমভিক্রতেন।
আরোগ্য ধিগ্বিবিধব্যাধি পরাহতেন॥

ধিগ্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন।
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতি প্রসঙ্গে॥

তিনি কহিলেন, যদিও ব্যাধি, মৃত্যু না থাকিত, তথাপি তিনি সংসার পঞ্চ স্কন্ধ * জন্য একমাত্র দুঃখস্থান বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন; কিন্তু এক্ষণে জরা ব্যাধি মৃত্যু নিশ্চয়ই জীবনকে অধীন করিবে। এজন্য দুঃখ হইতে পরিত্রাণার্থ উপায় করা কর্ত্তব্য। যথা—

যদি জরা ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ন মৃত্যু-
স্তথাপিচ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিং পুনর্জরা ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবন্ধা
সাধু প্রতি নিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং॥

এইরূপ ভাবিয়া তিনি পিতাকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। শুদ্ধোদন তখন সজলনেত্রে পুত্রকে রাজভোগের সকল সুখ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া সুখে রাজ্য ভোগ করিবার জন্য নানা অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন যদি জরা আক্রমণ না করিয়া শুভ্রবর্ণ যৌবন চির অবস্থিতি করে, তাহা হইলেই তিনি সুখে সংসারে থাকিতে পারেন, যথা—

"ইচ্ছামি দেব জর মহ্যনমাক্রমেয়া।
শুভ্রবর্ণ যৌবন স্থিত্তোভবি নিত্য কালং॥
আরোগ্য প্রাপ্ত ভবিনোচ ভবেতব্যাধি।
রমিত আয়ুশ্চ ভবিনোচ ভবেত মৃত্যুঃ॥"

রাজা এসকল শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিলেন; "হে পুত্র! যে চারিটী বিষয় প্রার্থনা করিলে, তাহা আমার প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই।" রাজকুমার তখন পিতার নিকট সংসার হইতে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। নৃপতি শোকপূর্ণ আননে পুত্রকে অভিষ্টসিদ্ধি জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া অগত্যা বিদায় দিলেন।

এক গভীর রজনীযোগে শাক্যসিংহ ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার স্ত্রী এবং একমাত্র শিশু-পুত্র রাহুলকে পরিত্যাগ করিয়া ঘোটকারোহণে রাজভবন হইতে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর প্রভাতকালে ঘোটক পরিত্যাগ করত অনোমানদীতীরে স্নানাদি করিয়া ভিক্ষুবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে বৈশালীতে † আসিয়া এক ব্রাহ্মণের সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়নে

* দুঃখংসংসারিণঃ স্কন্ধাস্তেচপঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেবচ। বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং রূপ এই পঞ্চ স্কন্ধ, ইহাই সাংসারিক আত্মার দুঃখ হেতু।

† বৈশালী—বিশালা বদরী অর্থাৎ এক্ষণে যাহা হরিদ্বারের উত্তর-পূর্ব্বাংশে বদরীকাশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তন্নিকটবর্ত্তী নগরের নাম বৈশালী।

প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তথায় মুক্তির উপযোগী কোন শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়াতে অগত্যা তথা হইতে তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল। তাহার পর রাজগৃহের এক ব্রাহ্মণের নিকট আর্য্য শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। এস্থান হইতে পঞ্চজন সহাধ্যায়ী সমভিব্যাহারে উর্ব্বিলব নামক গ্রামে ৬ বর্ষকাল, কঠিন পরিশ্রমের সহিত সমাধি, মহাপ্রধান প্রভৃতি যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত কষ্টেও তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। ক্রমেই তাঁহার সহাধ্যায়িগণ পরিত্যাগ করিলে, তিনি একাকী নিঃসহায়ে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর বুদ্ধিদ্রুম মূলে ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল, এবং তিনি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পবিত্র বৌদ্ধ জ্ঞান লাভ করিলেন।

৫৮৮ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া বারাণসীতে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় তাঁহার পূর্ব্বের পঞ্চ সহাধ্যায়ী এবং কতিপয় ব্যক্তি এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ভারতবর্ষের নৃপতিগণ তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বসরের প্রযত্নে রাজগৃহে বক্তৃতাকালে বহুব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। কালান্তক বিহার তাঁহার উদ্দেশে এক ধনাঢ্য বণিক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; তথায় তিনি কিছুকাল বক্তৃতা করিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ সময় তাঁহার ধর্ম্মের গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং দেশ বিদেশ হইতে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া বেদবিধি পরিত্যাগ করত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শাক্য সিংহ তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্র মৌদগল্যায়ন, এবং কাত্যায়ন সমভিব্যাহারে কিছুকাল মগধেশ্বরের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে উক্ত নৃপতি অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তিনি শ্রাবস্তীতে * বাস করেন; তথায় অনাথ পিণ্ডদ নামক বণিক তাঁহার জন্য একটী সুরম্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শাক্যসিংহের বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ, বাণিজ্যব্যবসায়ী বৈশ্যগণ, সকলেই তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কোশলাধিপতি এবং প্রসন্নজিৎ নৃপতি তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ পরে তিনি কপিলবস্তুতে গমন করিয়া তাঁহার পিতৃস্বসা, স্ত্রী এবং শাক্যবংশীয় অন্যান্য লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এইরূপ ধর্ম্মপ্রচারে কালাতিপাত করিয়া বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর

---

* শ্রাবস্তী—ইহা দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অবস্থিত। এই নগর এত প্রাচীন যে ইহার উল্লেখ মহাভারতেও দৃষ্ট হয়।

বয়ঃক্রমে ৫৪৩ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব বৎসরে কুশী নগরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এসময় তাঁহার অসংখ্য শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাহাঁরা সকলেই বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এবং মৃত্যুশয্যা হইতে বুদ্ধদেব তিনবার স্বশিষ্যবর্গকে ধর্ম্মের কুটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কেহই উত্তর করিল না। সে সময় কাহারও ধর্ম্মবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে মৃত্যুকালে ভগবান্ কহিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমি শেষবার তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি; সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় যত্নশীল হও।" ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে সাধারণ ভিক্ষুগণ উচ্চস্বরে বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিল; কিন্তু অর্হতগণ পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া শোকবেগ সম্বরণ করিলেন। চন্দন কাষ্ঠের চিতার উপর তাঁহার মৃত শরীর নববস্ত্রাবৃত করিয়া স্থাপিত হইলে, মহা কাশ্যপ তথা ৫০০ শত ভিক্ষু উহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে সকলে ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। নশ্বর শরীর ধ্বংস হইয়া ভস্মাবশিষ্ট রহিল। ভিক্ষুগণ সেই ভস্মরাশি ধাতুনির্ম্মিত পাত্রে পূর্ণ করিয়া সুগন্ধ পুষ্পে আচ্ছাদিত করত নৃত্যগীত করিতে করিতে নগরমধ্যে আনয়ন করিল। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্তদিবস রক্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিল-বস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উখদ্বীপ, পাওয়া এবং কুশীনগর এই ৮ স্থানে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর অষ্টস্তূপ নির্ম্মিত হইল। বুদ্ধদেবের উপর এত ভক্তি এবং অনুরাগ যে তাঁহার দন্ত কেশাদি লইয়া বহু ব্যয় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য বৃহৎ বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐসকল মন্দির বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং একাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। চৈতন্যদেবের ন্যায় তাঁহার মত শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক মৃত্যু অন্তে জগতের হিতের জন্য প্রচারিত হয়। তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্য ত্রিতয় "ত্রিপেটক" রচনা করেন। প্রথম অধ্যায় অভিধর্ম্ম কাশ্যপ দ্বারা, দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্র আনন্দ দ্বারা এবং তৃতীয় অধ্যায় বিনয় উপালী দ্বারা, খৃষ্ট জন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণ সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিনটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্গমে আচার্য্যগণ ধর্ম্মের গুহ্য কথাসকল মীমাংসা করিয়া বিবিধ গ্রন্থ প্রচার করেন। আষাঢ় মাসে কাশ্যপ ৫০০ শত সুপণ্ডিত স্থবির ও ভিক্ষুগণকে আহ্বান করত সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবান্ মায়াময় মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগকালে আনন্দকে কহিয়াছিলেন যে, "আমি গত হইলে আমার প্রচারিত ধর্ম্ম ও বিনয় তোমাদিগের পথপ্রদর্শক হইবে। এক্ষণে হে জ্ঞানিগণ! আমাদিগের তদালোচনায় প্রবৃত্ত

হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য"। এতদ্‌বাক্যে সকলেই সম্মত হইলেন। এবং মগধরাজ অজাতশত্রু শতপাণি শিখর মূলে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তথায় আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মালোচনা হইয়া ৭ মাস পরে (খৃঃ পূঃ ৫৪৩ বৎসরে) প্রথম সঙ্গম শেষ হয়। ইহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গম কালাশোক কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিল। এই সকল সঙ্গমে বৌদ্ধধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হয়। এসময় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সীমা ছিল না। হিন্দুগণ আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন; রাজা প্রজা সকলেই এই নব ধর্ম্মাবলম্বী। বৈদিক কার্য্যকলাপের ক্রমেই হতাদর হইতে লাগিল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞার্থে পশুবধের শোণিতস্রোত ক্রমেই বন্ধ হইল।

অশোক নৃপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান উন্নতিকারক। ইনি বিন্দুসরের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। বৈরনির্য্যাতনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকাতে ইঁহাকে সকলে প্রচণ্ডাশোক বলিত। তৎপরে ইনি পিতার অবর্ত্তমানে ২৬৩ খৃঃ পূঃ মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হইলে পর বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি করাতে সকলেই ইঁহাকে ধর্ম্মাশোক বলিত। ইনি মহাপরাক্রমশালী নৃপতি। চারি বৎসরের মধ্যে অশোক সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মহাচীন পর্য্যন্ত ইঁহার করতলস্থ হইয়াছিল। এমন কি পাণ্ডবেরাও অশোকের ন্যায় ভারতবর্ষে একাধিপত্য করিতে পারেন নাই। ইনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ইনিই বৌদ্ধগণের "দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী।" অসংখ্য প্রচারকেরা ইঁহার অনুজ্ঞানুসারে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এবং পুরস্ত্রীবর্গের নিকটও ধর্ম্মপ্রচার করতঃ অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের সকল জাতিকেই বৌদ্ধ-মতাবলম্বী করিয়াছিলেন।

অশোক ৮৪ সহস্র স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন। এই সকল স্তম্ভ ভারতবর্ষের বিবিধ নগরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা কয়েকটী প্রসিদ্ধ অশোক-স্তম্ভ দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে 'ফিরোজ সাহেব' নামে খ্যাত লাটটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই সকল স্তম্ভের অঙ্গে পালিভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিবিধ অনুজ্ঞা খোদিত আছে। ইহা ভিন্ন কটকে ধাউলী, গুজরাটে গির্ণারে শিখরে এবং আফগানিস্থানে কপর্দ্দি গিরি অঙ্গে অশোকের যশোঘোষণা খোদিত ছিল। এই সকল লিপি আলোচনায় উরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক ঐতিহাসিক সত্য অবগত হইয়াছেন। জুনগড়ের পার্ব্বতীয় লিপিমধ্যে আন্তিয়োকস্, টলেমী, আন্তিগোনো এবং মগা নামক যবন নৃপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অশোকের

খৃঃ পূঃ ২২২ বৎসরে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের আর উন্নতি হয় নাই। অশোকপুত্র মহেন্দ্র সিংহলে ৩০৭ খৃঃ পূঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তিনি শিষ্যদিগকে প্রশ্নানুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। শিষ্যেরা তদর্থ সকল ধারণ পূর্ব্বক বহু বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতেন। ইহাতে ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন "তদ্বিনেয়াঃ প্রচক্রিরে।" সম্ভব বটে; বুদ্ধের বাক্য সকল গম্ভীর, অর্থবান্ এবং সুপরিপাটী। বুদ্ধদেবের বাক্য কিরূপ গাম্ভীর্য্যার্থপূর্ণ, তাহা পাঠকগণের গোচরার্থে আমরা বহু অন্বেষণ করিয়া কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।—

"ইদম্প্রত্যয়ফলমিতি। উৎপাদাদ্বা তথাগতানামনুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈষাং ধর্ম্মাণাং, ধর্ম্মিতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা প্রতীত্য সমুৎপাদানুলোমতা ইতি— অথ পুনরয়ং প্রতীত্য সমুৎপাদোদ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ, যদিদং বীজাদঙ্কুরোঽঙ্কুরাৎ পত্রং পত্রাৎ কাণ্ডং কাণ্ডান্নালং নালাদ্‌গর্ভো গর্ভাচ্ছুকং শূকাৎ পুষ্পং পুষ্পাৎ ফলমিতি; অসতি বীজেঽঙ্কুরো ন ভবতি যাবদসতি পুষ্পে ফলন্নভবতি, সতিতু বীজেঽঙ্কুরো ভবতি, যাবৎ পুষ্পে সতি ফলমিতি তত্রবীজস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানং অহমঙ্কুরং নির্ব্বর্ত্তয়ামি অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানং অহং বীজেন নির্ব্বর্ত্তিত ইতি, এবং যাবৎ পুষ্পস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানমহং ফলং নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি ফলস্যাপি নৈবং ভবত্যহং পুষ্পেনাভিনির্ব্বর্ত্তিতমিতি, তস্মাৎ সত্যপি চৈতন্যে বীজাদীনামসত্যপি চান্যোন্যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি কার্য্য কারণ ভাব নিয়মোদৃশ্যতে,ইত্যুক্তো হেতূপনিবন্ধঃ। প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ প্রতীত্য সমুৎপাদস্য উচ্যতে প্রত্যয়ো হেতূনাং সমবায়ঃ, হেতুং হেতুং প্রতি অয়ন্তে হেত্বন্তরাণীতি তেষাময়মানানাং ভাবঃ প্রতীত্য সমবায় ইতি যাবৎ। ষণ্ণাং ধাতূনাং সমবায়ং বীজহেতুরঙ্কুরো জায়তে, তত্র পৃথিবী ধাতুর্বীজস্য সংগ্রহে কৃত্যং করোতি,যথাঙ্কুরঃ কঠিনোভবতি, অপ্ ধাতুর্বীজং স্নেহয়তি, তেজো ধাতুর্বীজং পরিপাচয়তি, বায়ুর্ধাতুর্বীজমভিনির্হরতি যতোঽঙ্কুরো বীজান্নির্গচ্ছতি। আকাশ ধাতুর্বীজস্যাবরণং কৃত্যং করোতি রূপ ধাতুরপি বীজস্য পরিণামং করোতি, তদেতেষাং অবিকৃতানাং ধাতূনাং সমবায়ে বীজে রোহত্যাঙ্কুরো জায়তে নান্যথা। তত্র পৃথিবীধাতোর্নৈবং ভবত্যহং বীজস্য পরিণামং করোমীতি; অঙ্কু-রস্যাপি নৈবং ভবত্যহমেভিঃ প্রত্যয়ৈর্নির্ব্বর্ত্তিত ইতি। তথাধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্য সমুৎ-পাদোদ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি,হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ। তত্রাস্য হেতূপ-নিবন্ধো যথা, যদিদমবিদ্যা প্রত্যয়াঃ সংস্কারা যাবজ্জাতি প্রত্যয়ং জরা মরণাদীতি অবিদ্যাচেন্নাভবিষ্যং নৈবং অঙ্কুরো অজনিষ্যন্ত এবং জরামরণাদয় উদপৎস্যন্ত যাবজ্জাতিশ্চেন্নাভবিষ্যন্নৈবং তত্রাবিদ্যায়া নৈবং ভবত্যহং সংস্কারানভি নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি সংস্কারাণামপি নৈবং ভবতি বয়মবিদ্যয়া নির্ব্বর্ত্তিতা ইতি। এবং যাবজ্জাত্যা

অপি নৈবং ভবত্যহং জরা মরণাদ্যভি নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি জরামরণাদীনামপি নৈবং ভবতি বয়ং জাত্যা অভি নির্ব্বর্ত্তিতা ইতি অথচ সৎস্ববিদ্যাদিষু স্বয়মচেতনেষু চেতনানন্তরানধিষ্ঠিতেষ্বপি সংস্কারাদীনামুৎপত্তির্বীজাদিম্বিব সৎস্বচেতনেষু চেতনান্তরাপধিষ্ঠিতেম্বপ্যঙ্কুরাদীনাং, ইদং প্রতীত্য প্রাপ্যেদমুৎপদ্যন্ত ইতি। এতাবন্মাত্রস্য দৃষ্টত্বাৎ—চেতনাধিষ্ঠানস্যানুপলব্ধে। সোয়মাধ্যাত্মিকস্য প্রতীত সমুদায়স্য হেতুপনিবন্ধঃ। অথ প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ পৃথিব্যপ্তেজো বায়্বাকাশ বিজ্ঞান ধাতুনাং সমবায়াদ্ভবতি কায়ঃ। তত্রকায়স্য পৃথিবী ধাতুঃ কাঠিন্যমভি নির্ব্বর্ত্তয়তি অপ্ ধাতুঃ স্নেহয়তি কায়ং তেজো ধাতুঃ কায়স্য শিত পীতে পরিপাচয়তি বায়ু ধাতুঃ কায়স্য শ্বাস-প্রশ্বাসাদি করোতি আকাশ ধাতুঃ কায়স্য শুশিরভাবং করোতি যাশ্চ নামরূপাঙ্কুরমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি পঞ্চবিজ্ঞানার্থ সংযুক্তং সাস্রবঞ্চ মনোবিজ্ঞানং সোঽয়মুচ্যতে বিজ্ঞান ধাতুঃ। যদাধ্যাত্মিকাঃ পৃথিব্যাদি ধাতবো ভবন্ত্য বিকলাস্তদা সর্ব্বেষাং সমবায়াদ্ভবতি কায়স্যোৎপত্তিঃ তত্র পৃথিব্যাদি ধাতুনাং নৈবং ভবতি বয়ং কাঠিন্যাদি নির্ব্বর্ত্তয়াম ইতি কায়স্যাপি নৈবং ভবতি বিজ্ঞান মহমেভিপ্রত্যয়ৈরেভিনির্ব্বর্ত্তিত ইতি —অথচ পৃথিব্যাদি ধাতুভ্যোঽচেতনেভ্যশ্চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেভ্যোঽঙ্কুরস্যেব কায়স্যোৎপত্তিঃ; সোঽয়ং প্রতীত্য সমুৎপাদো দৃষ্টত্বান্নান্যথয়িতব্যঃ। তত্রৈতেষ্বেব ষট্সু ধাতুষু মাতৃসংজ্ঞা, পিতৃসংজ্ঞা, নিত্যসংজ্ঞা, সুখসংজ্ঞা, সত্যসংজ্ঞা, পুদ্গলসংজ্ঞা, মনুষ্যসংজ্ঞা, মাতৃ দুহিতৃ সংজ্ঞা, অহঙ্কারমমকারসংজ্ঞা। সেয়মবিদ্যাঽস্য সংসারানর্থ সম্ভারস্য মূলকারণং তস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং সংস্কার রাগদ্বেষ মোহাবিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে —বস্তুবিষয়া বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞানং বিজ্ঞানশ্চত্বারোরূপিণঃ, উপাদানস্কন্ধাস্তন্নাম, তান্যুপাদায় রূপমভিনির্ব্বর্ত্ততে। তদেকত্বমভিসংক্ষিপ্য নামরূপং নিরূপ্যতে। শরীরস্যেব কলল বুদ্বুদাদ্যবস্থা নামরূপ সম্মিশ্রিতা, তানীন্দ্রিয়াণি ষড়ায়তনং নাম রূপেন্দ্রিয়াণাং, ত্রয়াণাং সন্নিপাতঃ স্পর্শ স্পর্শাদ্বেদনা সুখাদিকা, বেদনায়াং সত্যাং কর্ত্তব্যমেতৎ সুখং পুনর্ময়া ইত্যধ্যবসিতং তৃষ্ণা ভবতি—" ইত্যাদি।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জ্ঞানপূর্ব্বক রচয়িতা কেহ নাই; ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ বুদ্ধদেব, শিষ্যদিগের নিকট জগতের কার্য্যকারণ ভাব ঘটিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই প্রতীতিনিষ্পন্ন। তজ্জন্য তাহারা কার্য্যমাত্রকেই প্রতীত্য নামে ব্যবহার করে। সমুদায় কার্য্যে দুই প্রকার কারণ অনুস্যূত আছে। একের নাম হেতুপনিবন্ধ; অপরের নাম প্রত্যয়োপনিবন্ধ, হেতুপনিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তি কালে যাহাতে মাত্র হেতুভাব থাকে, যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি বীজে হেতুভাব। প্রত্যয়োপনিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ দ্রব্যের সমবায় (সংযোগ) থাকে, যথা উক্ত অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে পার্থিবাদি কার্য্য দ্রব্যে

সমবায় ছিল। এই হেতূপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ নামক কারণদ্বয় বাহ্য জগতে আছে; আধ্যাত্মিক কার্য্যেও আছে। তন্মধ্যে বাহ্য প্রতীত্য সমুৎপত্তি বিষয়ে (ঘট পট বৃক্ষাদি উৎপত্তি বিষয়ে) এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, ক্রমে কাণ্ড, নাল, গর্ত্ত, শূক (পুষ্প বা ফলের কোষ), পুষ্প ও ফল জন্মে। এই একটি হইতে আর একটির জন্ম হওয়াকে হেতূপনিবন্ধ বলা যায়। বীজ না থাকিলে অঙ্কুর জন্মে না; পুষ্প না থাকিলে ফল জন্মে না; পুষ্প থাকিলে ফল হইতে পারে; বীজ থাকিলে অঙ্কুর হইতে পারে; কিন্তু বীজ যে অঙ্কুরকে জন্মায়, তাহাতে বীজের এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরকে জন্মাইতেছি। অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি বীজ হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। পুষ্প, ফল সকলেরই এইরূপ জানিবা; অতএব বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও, চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও, কার্য্য-কারণ ভাবের ব্যাঘাত নাই। বরং কার্য্য-কারণ ভাব নিয়মিতরূপেই আছে। অঙ্কুর কার্য্যের হেতুভাব পক্ষে যেমন, প্রত্যয়-ভাব পক্ষেও (কারণ দ্রব্যের সংযোগ ঘটনা পক্ষে) সেইরূপ। পৃথিবীধাতু, জল-ধাতু, বায়ুধাতু, তেজোধাতু, আকাশধাতু, ও রূপধাতু (বৌদ্ধেরা মূল পদার্থকে ধাতু বলে), এই ছয়টি ধাতুর সমবায় অর্থাৎ সংযোগবিশেষ দ্বারা উক্ত অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবীধাতু সংগ্রাহ কার্য্য করে (যে কার্য্য দ্বারা অঙ্কুরের কাঠিন্য জন্মে), জলধাতু অঙ্কুরের স্নেহভাব সম্পাদন করে (যাহাতে অঙ্কুর সরস থাকে বীজের উচ্ছুনতা জন্মে), তেজোধাতু বীজকে পরিপাক করে (যে ব্যাপারে বীজাংশ অঙ্কুর ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে), বায়ুধাতু অভিনির্হার করে (যদ্বলে অঙ্কুর বীজ হইতে বহিষ্কৃত হয়), আকাশধাতু বীজকে অনাবরণ করে (যাহাতে বীজমধ্যে অঙ্কুর স্থান-প্রাপ্ত হয়), রূপধাতু বীজকে রূপান্তরে নিয়োজিত করে (ইহার প্রভাবেই অঙ্কুর দৃশ্যমান হয়), এইরূপ ষড়্ধাতুর সমবায় বলেই অঙ্কুর কার্য্যে আত্মলাভ করে। সমবায় না থাকিলে আত্মলাভ করে না। এখানেও পৃথিবীধাতুর এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরিত করিবার নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করিতেছি। বাহ্য প্রতীত্য সমুৎপাদ মধ্যেও (বাহ্যস্থ কার্য্য সমূহ মধ্যে) রূপভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেমন বাহ্য কার্য্যের জ্ঞানপূর্ব্বক উৎপত্তি নাই, তেমনই আধ্যাত্মিক কার্য্যেরও নাই।

আধ্যাত্মিক কার্য্য সমুৎপাদেরও পূর্ব্বপ্রকার দ্বিবিধ কারণ আছে। অবিদ্যা, সংস্কার, যাবজ্জাতি, জরামরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর হেতু হেতুমদ্ভাব, আর পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ুঃ, আকাশ ও বিজ্ঞান, এই ষড়্বিধ কারণ দ্রব্যের সমবায় ভিন্ন দেহোৎপত্তি হইতে পারে না। অবিদ্যা ব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতি-রেকে যাবজ্জাতি, যাবজ্জাতি ব্যতিরেকে জরামরণ হয় না। এখানেও যখন অবিদ্যা সংস্কার জন্মায়, তখন অবিদ্যার জ্ঞান হয় না যে, আমি সংস্কার উৎপন্ন

করিতেছি ; সংস্কারেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিদ্যা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি বা করিতেছি। অতএব বীজাদির ন্যায় অবিদ্যা প্রভৃতিরও চৈতন্য না থাকিলেও, অন্য চেতনাবান্ পুরুষের অধিষ্ঠান না থাকিলেও সংস্কারাদির জন্মলাভ দৃষ্ট হয়। এই আধ্যাত্মিক হেতূপনিবন্ধ পক্ষে যেরূপ, প্রত্যয়োপনিবন্ধপক্ষেও সেইরূপ ; পূর্ব্বোক্ত ষড়্ধাতুর সমবায় বশতঃ শরীরের উৎপত্তি। পৃথিবীধাতু শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করে ; জলধাতু স্নেহিত করে। তেজোধাতু ভুক্তান্ন পানাদি পরিপাক করে, বায়ুধাতু শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে, আকাশধাতু ছিদ্রভাব জন্মায়। বিজ্ঞানধাতু, নাম রূপাদির কারণ। এই বিজ্ঞান পঞ্চস্কন্ধাত্মক ; এই ষড়্ধাতু অবিকল ভাবে সংহত হইলেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। এস্থলেও পৃথিবীধাতুর কখনই জ্ঞান হয় না যে, আমি শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করিতেছি। শরীর হইতেই বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয় ; কিন্তু শরীর কখনই জানে না যে, আমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি করিতেছি। অতএব পৃথিব্যাদি সমস্ত ধাতু স্বয়ং অচেতন হইলেও চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হয় না। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অন্যথা করিবার পথও নাই। *

উক্ত ধাতু ষট্‌কের সমবায় ভাবকে লোকে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, সুখ, সত্ত্ব, পুদ্‌গল, মনুজ ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহার করে। এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র, পিতৃ, মাতৃ, দুহিতৃ প্রভৃতি নানা নাম কল্পনা করে। উহাকে অনর্থ শতসম্ভার সংসার বলে ; এই সংসারের মূল কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে বিষয়ের প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে। বস্তু আকারধারী বিজ্ঞানবিষয়। বস্ত্বাকার বিজ্ঞান চারি প্রকার। রূপবিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ নাম প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানদ্বয়ের একীভাব, নাম রূপের আশ্রয়। শরীরের কলল ও বুদ্বুদাদি অবস্থা, নাম রূপ, মিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল, ষড়ায়তন, নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে স্পর্শ বলে। স্পর্শ হইতে বেদনা (অনুভব শক্তি) বেদনা হইতে তৃষ্ণা (এই সুখ পুনশ্চ করিব ইত্যাকার ভাবনা) জন্মগ্রহণ করে।

সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধ লক্ষণ এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"তথাহি কৃত্যাদেবী † বাক্যং
লোকে ভগবতো লোক নাথাদারভ্য কেবলম্।

যে জন্তবো গত ক্লেশান্ বোধিসত্ত্বান চেহিতান্। সাগসেপি নকুপ্যন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ব্বতে। বোধিং স্বৈস্বৈব নেষ্যন্তি তে বিশ্বধরণোত্তমাঃ।"

---

*এতাবতা এই বলা হইল যে জগতের কোন চৈতন্যবান্ স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই।

† কৃত্যাদেবী বৌদ্ধানাং অভিচারোৎপন্না ধর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

অর্থাৎ ভগবান্ লোকনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া, যে সকল জীব গতক্লেশ (মুক্ত) হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি বোধিসত্ত্ব বলিয়া জান। অপরাধ করিলেও যাঁহারা কোপ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমাগুণে উপকার করেন, অন্যকে গতক্লেশ করিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা বোধিসত্ত্ব, তাঁহারাই বিশ্বধারণে উদ্যত।

বৌদ্ধগণের মতে তাদৃশ ধর্ম্ম কখন প্রকাশ হয় নাই, যথা "বোধিসত্ত্বস্য *পূর্ব্বমশ্রুতেষু ধর্ম্মেষু—*" এবং বুদ্ধদেবকে তাহারা *"জরা, মরণবিঘাতী ভিষগ্বর ইবোদগতঃ"* জ্ঞান করিত। তাহাদিগের মতে মনুষ্যজন্ম কেবল কষ্টদায়ক এবং জন্মিলেই সকল জীবকে জরা ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, সুতরাং জ্ঞানিগণের নির্ব্বাণ কামনা করা একান্ত কর্ত্তব্য, বৌদ্ধমাত্রেরই পুর্ব্বজন্ম এবং পরজন্মে বিশ্বাস আছে, এবং তাহাদের মতে নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা জীব মাত্রে বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। কথিত আছে, শাক্যসিংহ স্বয়ং হস্তী, মৃগ প্রভৃতি পশুযোনি হইতে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংসার কেবল কষ্টময়; এবং জীব নিজকর্ম্ম দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

নিরীশ্বর সাংখ্য কপিল, ঈশ্বরের সত্ত্বা অস্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন বিচার উপস্থিত করে নাই বটে, কিন্তু সাংখ্যের ন্যায় ইহারাও নাস্তিক। বুদ্ধের উপদেশ মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নাই। বৌদ্ধেরা প্রায় স্বাভাবিকবাদী; তাহারা বলে, স্বভাব সৃষ্টি হয় নাই; চিরকাল এক অবস্থায় আছে। ইকার্ট, টলর, ব্যুক্নর প্রভৃতি জর্ম্মণ তত্ত্ববিদ্গণের এই মত, অধিকন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের সত্ত্বা লোপ করিবার জন্য নানা কৌশলময় তর্কপরিপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। যিশুখ্রীষ্টের ন্যায় শাক্যসিংহ বৌদ্ধগণকে এই দশ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; যথা জীবহিংসা করিও না, চুরী করিও না, পরদার করিও না, মিথ্যা বলিও না এবং মাদক দ্রব্য সেবন করিও না। এই পাঁচটী ভিন্ন ভিক্ষুগণকে এই ৫টী আজ্ঞা দিয়াছেন; যথা, দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইলে আহার করা অকর্ত্তব্য, নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য, অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে, দুগ্ধফেণনিভশয্যায় শয়ন অনুচিত এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। বুদ্ধের নীতি অতি চমৎকার, তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ভক্তির উদ্রেক হয়। আধুনিক সভ্যগণ কহেন, যীশুপ্রণীত উপদেশ একমাত্র সুখশান্তির উপায়স্বরূপ, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, তাহার প্রমাণ একবার "ধর্ম্ম পদ" গ্রন্থপাঠে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাবৃহস্পতি আধুনিক তত্ত্বদর্শী অগষ্ট কোমৎ বৌদ্ধগ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়াছেন এবং উহা প্রত্যক্ষ দর্শনবাদিগণকে এক এক বার পাঠ জন্য দিন নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করাই বৌদ্ধগণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভিক্ষুগণ তজ্জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। মাধবাচার্য্য কহেন "কৃত্তিঃ কমণ্ডলু মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্ন ভোজনম্। সঙ্ঘো রক্তাম্বরত্বঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুভিঃ" অর্থাৎ চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্ন ভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তাম্বর এই কয়েকটি বৌদ্ধদিগের যতি ধর্ম্মের অঙ্গ*। ইহারা মালা জপিবার সময় এই মাত্র পালি ভাষায় কহিয়া থাকে "অনিত্য দুঃখম্ অনাত্য" ইহাকে ত্রিলক্ষণ কহে। বৌদ্ধেরা কোন প্রকার উপাসনা করে না, কেবল বিহারে বুদ্ধ মূর্ত্তির সমীপে ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকে। রোমান্ কাথলিকগণ পাদ্রির নিকট যেমন প্রতি সপ্তাহে আপনার পাপকার্য্য সকল স্বীকার করিয়া আইসে, তদ্রূপ পূর্ব্বকালে বৌদ্ধগণ ধর্ম্মসঙ্গমমধ্যে স্থবিরগণ সমীপে স্ব স্ব পাপ স্বীকার করিত। প্রিয়দর্শী এজন্য মাসে দুইবার সভা করিতে স্তম্ভের লিপিতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। সিংহলে ভিক্ষুকগণ বিহারমধ্যে ভক্তিসহকারে নিম্নলিখিত পালি প্রতিজ্ঞা পাঠ করে, যথা—খুদ্দক পাঠ।

"নম তসভাগবত অর্হত সম সমবুদ্ধসঃ
বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।
"দুতম্পি বুদ্ধম শরণম্ গচ্ছামি।
দ্যুতম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
দ্যুতম্পি ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
দ্যুতম্পি সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।
শরণ্যতম্।"

বৌদ্ধ আচার্য্য প্রণীত অনেক সংস্কৃত-গ্রন্থ আছে; কিন্তু আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ তাহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক এবং সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে তাহাই জানেন মাত্র; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগের কোন কোন বঙ্গদেশীয় সামান্য নৈয়ায়িক, ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী এবং কিয়দংশ কুসুমাঞ্জলি পড়িয়াই বৌদ্ধমতে দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মূল বৌদ্ধসূত্র

---

* সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ। ৺জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদ।

সকল পাঠ করিলে এরূপ বালসুলভ চাপল্য প্রকাশ করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধদিগের সংস্কৃত-গ্রন্থ সকল অনেক কাল হইতে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। আকবর বাদশাহের অনুজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আবুল ফজল বহু অনুসন্ধানে একখানিও বৌদ্ধসূত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে ধন্যবাদ দিতেছি, তাঁহাদিগের প্রযত্নে নেপাল হইতে অসংখ্য সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

নেপালের বৌদ্ধগণ কহেন ৮৪ সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি নবধর্ম্ম নামে খ্যাত—অষ্ট সাহস্রিক, গণ্ডব্যূহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরিক, তথাগত গুহ্যক, ললিত বিস্তার, সুবর্ণ প্রভাস। বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ সকল দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা, সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য অদ্ভুত ধর্ম্ম, অবদান, উপদেশ। প্রসিদ্ধ কতিপয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ, যথা—প্রজ্ঞা পারমিতা, সারিপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম, দেবপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম, ধর্ম্মস্কন্ধপদ, কারণ্ডব্যূহ, ধর্ম্মবোধ, ধর্ম্মসংগ্রহ, সপ্ত বুদ্ধস্তোত্র, বিনয় সূত্র, মহান্য সূত্র, মহান্য সূত্রালঙ্কার, জাতক মালা, চৈত্য মাহাত্ম্য, অনুমান খণ্ড, বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, বুদ্ধচরিত কাব্য, বুদ্ধকপাল তন্ত্র, সঙ্কীর্ণতন্ত্র প্রভৃতি ; এই সকল গ্রন্থ অধিকাংশ অনেক অনুসন্ধানে হজ্‌সন্‌ সাহেব নেপালীয় বৌদ্ধগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"বোধিচিত্ত বিবরণ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণেতা ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, বৌদ্ধের বহুতর শিষ্যের মধ্যে "সৌত্রান্তিকো বৈভাষিকো, যোগাচারো মাধ্যমিকশ্চেতি চত্বারঃ শিষ্যাঃ "সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক এই চারিজন শিষ্যই তদীয় ধর্ম্মের আচার্য্য। উক্ত সৌত্রান্তিক প্রভৃতি শব্দগুলি ওস্থানে নামমাত্র বোধক কি তাহার শাস্ত্র প্রস্থানবোধক স্থির করা যায় না। আমাদের যেমন ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রস্থানবোধক, গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নাম ভিন্ন, ঐ সকল শব্দ তৎসদৃশ কি না, বলা যায় না।

যাহা হউক উক্ত চারি ব্যক্তি হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নচেৎ বুদ্ধের উপদেশ কখনই বিভিন্ন মতাক্রান্ত নহে। উক্ত বোধিচিত্ত বিবরণ গ্রন্থকার ধর্ম্মকীর্ত্তি এইরূপ বলেন, যথা—

"দেশনা লোকনাথানাংসত্বাশয় বশানুগাঃ।
বিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তান ভেদেন ক্বচিচ্চোভয় লক্ষণা।
ভিন্নাপি দেশনা ভিন্না শূন্যতা দ্বয় লক্ষণা॥"

লোকনাথ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের উপদেশ একরূপ হইলেও তদীয় শিষ্যদিগের অবস্থা ও বুদ্ধি একরূপ না হওয়াতেই বুদ্ধ শাস্ত্র বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধমতের মূল প্রস্রবণ এক হইয়াও আচার্য্যগণের ভিন্ন ভিন্ন মত দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। এমন কি শাক্যসিংহের মত কিরূপ ছিল তাহা সহজে আচার্য্যগণের গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় না। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে চারিজন প্রধান আচার্য্যের মত সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র; তাহাতে বুদ্ধের নিজের মত যাহা সারিপুত্র, আনন্দ উৎপালী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র আভাস দেওয়া হয় নাই। কৃষ্ণমিশ্র, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে যে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অতি ঘৃণিত, বিকৃত ভাবাপন্ন। বোধ হয় তিনি "প্রজ্ঞাপারমিতা" প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থ কখনই পাঠ করেন নাই; কেবল অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রণীত অধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। বুদ্ধের নিজের মত অতি পবিত্র, এজন্য হিন্দুগণ তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া থাকেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহল হইতে ক্রমে চীন, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া, জাপান, শ্যাম, উত্তর সাইবেরিয়া এবং লাপলাণ্ড পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য কোন ধর্ম্মের এতদূর উন্নতি হয় নাই। এখনও পৃথিবীতে ৪৫৫০০০০০০ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আছেন।

সিংহলে ও চীনদেশে এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ আদর আছে। চীনদেশের বৌদ্ধগ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষা হইতে অনুবাদিত। সিংহলে বৌদ্ধগ্রন্থের বহুল প্রচার, তথাকার গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় লিখিত। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার তথা পালি ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ নিচয়ের বিবরণ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইবে। আমরা পাঠকবর্গকে উক্ত প্রস্তাবে পালিভাষার মূল গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় উপহার দিব।

শ্রীরামদাস সেন।

সপ্তম প্রস্তাব

বৈশ্যবর্গ—কৃষি এবং বাণিজ্য

ব্রাহ্মণ ও রাজন্যবর্গ এবং তাঁহাদের আনুষঙ্গিক বিষয় সমস্ত যথাসম্ভব বিবৃত করিয়া এক্ষণে বৈশ্যবর্গ এবং তদানুষঙ্গিক বিষয় সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বৈশ্যেরা আর্য্যসন্তান, আর্য্যসম্প্রদায়ের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত, বেদে অধিকারযুক্ত এবং আর্য্যসন্তান হইলে নিকৃষ্ট বর্ণের নিকট যে যে মান মর্য্যাদা ও প্রভুত্ব পাওয়া যায়, ইহারাও সেই সকলের অধিকারী। এই কথাগুলি আমি রামায়ণের অনুসরণ করিয়া বলিতেছি না, আর্য্যজাতির অতি প্রাচীনতম গ্রন্থাবলীর অনুসরণ করিয়া বলিতেছি এবং এ নিয়ম, এ রীতি যখন পরবর্ত্তী সময়েও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যে উহা রামায়ণেরও সাময়িক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণেরা সমাজের শিরোরত্ন ভাবে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রভৃতির শিক্ষা দ্বারা এবং রাজন্যবর্গ রাজ্যপালন, দেশরক্ষা, শান্তিস্থাপন ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা সামাজিক কল্যাণের যথাসম্ভব অংশ সাধন করিয়া স্ব স্ব ভার হইতে মুক্ত হইতেন। বৈশ্যেরা সেই সামাজিক কল্যাণের কোন্ অংশ কি পরিমাণে সাধনের ভারযুক্ত ছিলেন তাহা বিবেচ্য। মনু চতুর্ব্বর্ণের বৃত্তি-নির্দ্দেশ নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে কহিয়াছেন,—

> "ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণং।
> বৈশ্যস্যতু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনং ॥" ১১ অঃ ২২৬।

ব্রাহ্মণের তপ জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তপ রক্ষণ, বৈশ্যের তপ বার্ত্তাশাস্ত্র এবং শূদ্রের তপ সেবন।—(১)

বৈশ্যেরা বাল্মীকির সময়ে সমাজের জন্য কখন বা কৃষিকার্য্যসাধন ও পশু-পালন, কখন বা তাহার তত্ত্বাবধারণ এবং সাধারণতঃ বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেন।

(১) বৈশ্য নামের ব্যুৎপত্তি এরূপ—"বিশ্ to enter (fields &c) ক্বিপ affix and ষ্য added"—Wilson. ইহার দ্বারা বৈশ্যবৃত্তি বিশেষরূপে জ্ঞাপিত হইতেছে।

বিশেষ বিদ্যা ও গুণবত্তা দেখাইতে পারিলে, কখন কখন বা রাজমন্ত্রিত্বেও অভিষিক্ত হইতে পারিতেন। এবং মনুর গ্রন্থের সহ রামায়ণের যদি কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তবে ইহাদিগের সামাজিক মর্য্যাদা, গার্হস্থ ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার মনু-প্রোক্তমত অবিকল না হউক, প্রায় তদ্রূপ ইহা জ্ঞাতব্য।

এস্থানে একটি বিষয় বিবেচ্য। পূর্ব্বগত প্রস্তাব সকলের মধ্যে একাধিক স্থলে, মনুর বিধানিত নিয়ম-মালা রামায়ণোক্ত বিষয়গুলি পরিস্ফুট করণে এবং সমর্থনে নিযুক্ত হইয়াছে এবং হইবে। কিন্তু ইহা যুক্তিসিদ্ধ কি না? বর্ত্তমান সময়ে অস্মদ্দেশীয় পুরাবৃত্ত সমালোচকদিগের মধ্যে এই এক নূতন সৌখিনত্বের উদয় হইয়াছে যে, আদিমকালীয় আর্য্যগণ জগৎস্থ পূর্ব্বাপর সকল জাতি অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা যে কোনরূপে হউক প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং তাহা সমর্থনার্থে প্রমাণস্থলে ইস্তক আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইত ভবভূতিপ্রণীত উত্তররামচরিত এবং শ্রীহর্ষপ্রণীত নৈষধচরিত পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থ হইতেই বচন উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে, যেন ঐ সকলই এক সময়ের গ্রন্থ এবং একই সময়ের চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। এরূপ লেখক এবং সমালোচক-দিগের বিবেচনা করা উচিত যে, যুগপরিবর্ত্তনে রীতিনীতির ভূয়ঃ-পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে;—এক যুগের এমন অনেক বিষয় যাহা সুকাজ বলিয়া আদৃত ও গৃহীত হয়, যুগপরিবর্ত্তনে তাহাই আবার অকর্ত্তব্য বোধে ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এতদ্রূপ যুগ হইতে যুগান্তরের পরিবর্ত্তন সাধারণ বা অগণনীয় নহে। অতএব যে সময়ের বিষয় আলোচনা করা যায়, তাহার প্রমাণস্থলীয় মূল ভাগে সেই সময়েরই প্রমাণ বচনাবলী প্রয়োজন যুক্তিসিদ্ধ। বাল্মীকির সময় সমালোচনায় সেই নিয়মই পূর্ব্বাপর নিরপেক্ষ ভাবে অবলম্বিত হইয়াছে। মনু প্রভৃতি যে যে গ্রন্থাবলীর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহ মূল প্রস্তাবের যথাসম্ভব অন্তরতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পরস্পরের মধ্যে অন্তরতা রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও মনুপ্রোক্ত বচন ও বিধান অধিক পরিমাণে এবং অধিক ঘনিষ্টতার সহিত গৃহীত হইয়াছে ও হইবে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, মনুর সঙ্গে রামায়ণের কি সম্বন্ধ। রামায়ণের চতুর্থ কাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গে যৎকালে বিনাপরাধে শত্রুতা করার নিমিত্ত বালি রামকে ভৎর্সনা করিতেছে, তখন রাম নিম্নমত বাক্যে বালির পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন বলিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করিতেছেন—

> "শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্র বৎসলৌ।
> গৃহিতৌ ধর্ম্মকুশলৈস্তথা তচ্চরিতং ময়া॥"

এখন দেখা যাইতেছে যে, মনুর নাম রামায়ণের পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক হওয়া দূরে থাকুক, উক্ত শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত যে তাহা বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। ফলতঃ মনুর নাম বহু প্রাচীন, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তে উক্ত। কিন্তু রাম এখানে যে মনুর কথা কহিতেছেন, তিনি স্মৃতিকর্ত্তা মনু, এবং রাম রাজধর্ম্মপালনার্থে তাঁহার অনুগামী। রামের আপন মুখ হইতে উক্ত হওয়ায় সেই স্মৃতি তাঁহার অর্থাৎ বাল্মীকির পূর্ব্বে প্রণীত। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুকে স্মৃতিকারক বলিয়া উল্লেখ ব্যতীত বহুস্থলে মনুসংহিতা স্থিত বিধানমালা সহ বাল্মীকির সাময়িক ব্যবহারের অনেক সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছি ও করিব। এ সকলের দ্বারা কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে মনুসংহিতা সে সময়েরও সমাজ পরিচালক ছিল? তৎপক্ষে উপরি উক্ত প্রমাণ যথেষ্ট বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ করিতে পারা যায় না, যাহা হউক এতদ্বিষয় প্রবন্ধশেষে বাল্মীকির কাল নির্ণয়ে সবিস্তারে বিবেচ্য। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এই মনুসংহিতা বাল্মীকির পূর্ব্বের, সমসাময়িক বা পরবর্ত্তীই হউক, কিন্তু তাহাতে প্রোক্তরূপ ব্যবহার বাল্মীকির সময়ে যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কারণেই মনুসংহিতা এই প্রবন্ধে এত বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বৈশ্যবর্গের সহ কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধ একটি প্রধান সম্বন্ধ। যে দেশে সপ্তসিন্ধু এবং গঙ্গাদেবী দুহিতৃগণ সহ হিমগিরি পরিত্যাগ করিয়া শতমুখে সাগরগামিনী হইয়াছেন, যে দেশে কমলাসনা লক্ষ্মী দেবীর জন্ম ও প্রভব, সে দেশে যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই কৃষিবিষয়ে লোকের আগ্রহাধিক্য এবং সময়োচিত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলা দ্বিরুক্তি মাত্র। আর্য্যজাতির অতি প্রাচীনতম ঐতিহাসিক তত্ত্বময় ঋগ্বেদে ভূয়ো ভূয়ঃ কৃষি কার্য্যের উল্লেখ, তাহার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন, এবং "কিনাশ" শব্দে নামিত কৃষক ও "কুল্যা" শব্দে জল প্রণালীরও অস্তিত্ব সূচন হইয়াছে। (২) তদ্ব্যতীত কৃত্রিম জল প্রণালীরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) বহুস্থানে ধান (৪) এবং যবের (৫) নাম উক্ত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের

---

(২) ঋগ্বেদ ১০-৩৪-১৩, ১০-১১৭-৭, ১০-৪৩-৭ ইত্যাদি।

(৩) "যাঃ আপো দিব্যাঃ উত বা শ্রবন্তি খনিত্রিমাঃ উত বা যাঃ স্বয়ং জাঃ।" এই স্থান সম্বন্ধে জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত কহেন "from this it is not unreasonable lands under cultivation may have been practised"—Muir.

(৪) ঋগ্বেদ ৩-৩৫-৩, ৬-২৯-৪ ইত্যাদি।

(৫) ঋগ্বেদ ১-৬৬-৩ যব সম্বন্ধে Messrs Böhtlink and Roth বলেন, যব অর্থে বৈদিক সময়ের উৎপন্ন সকল প্রকার শস্যকেই বুঝাইত। এ স্থল ম্যুর সাহেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত অংশ হইতে সঙ্কলিত হইল।

এক স্থানে কথিত আছে "ব্রীহিম্ অত্তং যবম্ অত্তং অথো মাসম্ অথো তিলম্—" (৬) ১৪০-২।৬ ইত্যাদি। এই সকলের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, বৈদিক সময়ে কৃষি কার্য্যের যথেষ্টই উন্নতি সাধন হইয়াছিল, এবং নানা উপায়ে ও পরিশ্রমে রত্নপ্রসবিনী বসুন্ধরা হইতে আর্য্যেরা বহু রত্ন দোহন করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এক্ষণে বাল্মীকির সাময়িক কৃষিকার্য্যের অবস্থা দেখা যাউক। এই সময়ে দেশের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বৈদিক সময়ের ন্যায়, এখানেও কৃষির অস্তিত্ব, কৃষিপ্রণালী বা তথাবিধ বিষয়ের নিমিত্ত রামায়ণ হইতে প্রমাণ বচন উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র এবং কিয়দংশে হাস্যজনক। বাল্মীকির সাময়িক সমাজের ন্যায় অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে কৃষিকার্য্য রাজনিয়মে কতদূর রক্ষিত, কৃষিজীবীরা কিরূপ ব্যবহৃত, এবং কৃষিকার্য্য কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল তাহাই দেখা আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হয়। এই প্রবন্ধের চতুর্থ প্রস্তাব হইতে, দ্বিতীয় কাণ্ডের ১০০ সর্গের অংশ বিশেষের অনুবাদ এস্থলে গ্রহণ করিলাম। তথায় রামের অন্বেষণে ভরত চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, স্বদেশ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ক প্রশ্ন মধ্যে রামকর্ত্তৃক ভরত ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতেছেন "সীমন্তে ক্ষেত্র সকল হলকর্ষিত ও শস্য সুপ্রচুর; যথা নদীজলেই কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ জনপদ ত এক্ষণে উপদ্রব শূন্য? কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে? এবং উহারা স্ব স্ব কার্য্যে রত থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে? ইষ্টসাধন ও অনিষ্ট নিবারণ পূর্ব্বক তুমি ত উহাদিগকে প্রতিপালন করিরা থাক?" (৭) এইটি কৃষকদিগের পক্ষে যেমন অনুকূলবাক্য, এমনটি রামায়ণের অন্যত্রে দুর্লভ। কিন্তু এটি খাঁটি বাল্মীকির মুখ নিঃসৃত বাক্য বলিয়া সন্দেহহীন হওয়া যায় না, বা তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারা যায় না, তৎপক্ষে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। পুনশ্চ রামায়ণের দ্বিতীয়কাণ্ডে সপ্তষষ্ঠি সর্গে রাজশাসনের শিথিলতায় কৃষিকার্য্যের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, এবং ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গে রামের বনবাস এবং ভরতের রাজ্যপ্রাপ্ততা হেতু কৃষিজীবী ও পশুপালকগণ যথেষ্ট পরিমাণে আশ্রয় পাইবে না বলিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলের দ্বারা অনুমিত হয় যে, রাজশাসনের শিথিলতা বা রাজা অকর্ম্মণ্য অথবা অল্পাশয় হইলে,কৃষিজীবীর উপর অত্যাচারীর অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইত। সে যাহা হউক,

---

(৬) Muir's Sanscrit test নামক পুস্তক হইতে গৃহীত বচন।

(৭) এ স্থানের মূলাংশ বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। যাহাদের দেখিতে ইচ্ছা হইবে ২।১০০।৪৪-৪৮ এবং রামানুজের টীকা দেখিবেন।

সমস্ত বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, দেশে যখন "রামরাজ্য" প্রবর্ত্তিত হইত, তখন ত কৃষির প্রতি তৎকালোচিত বুদ্ধি অনুরূপ যত্ন এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ হইতই; তদ্ব্যতীত অন্য সময়েও যথাযথ হইতে ত্রুটি হইত না। রাজারা স্বয়ং আত্মহিসাবে লোকদ্বারা পশুপাল রক্ষা এবং কৃষিকার্য্য করাইতে ত্রুটি করিতেন না। মনুসংহিতায় দৃষ্ট হইবে যে, সকল শ্রেণীর আর্য্যেরাই কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব মমতা করিতেন, এবং তাহার উন্নতিসাধন পক্ষে যত্নপরায়ণ ছিলেন। ইহার আদরও এতদূর ছিল যে, আবশ্যক মতে ব্রাহ্মণেও লাঙ্গল ধরিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রামায়ণের এক স্থানে উক্ত হইয়াছে,—

"তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যাস্ত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ।
ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং ফালকুদ্দাল লাঙ্গলী ॥২।৩২।২৯

এখন জিজ্ঞাস্য, যেন কৃষিকার্য্য আদৃত বা সুরক্ষিত হইল, কিন্তু কৃষিজীবী কি সর্ব্বদা তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে এবং ধনশালী হইতে পারিত? বোধ হয় সর্ব্বস্থানে নহে। তাহা হইলে সাধারণ প্রজাবর্গের অসম্পন্ন অবস্থা লক্ষিত হয় কেন? কৃষিকার্য্যের প্রতি উর্দ্ধ হইতে আদর, যত্ন এবং সুরক্ষণ সংযোজন হইলেই যদি কৃষিজীবী আপন পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে পারিত, তবে নীলকরের প্রজার এ দুর্দ্দশা কেন? নীলকরেরা ত নীলের চাসের উপর কম আদর, কম যত্ন, কম রক্ষণ করে না।

কৃষি এবং কৃষিজীবীর অবস্থা অন্য প্রকারে দেখা যাউক। রামায়ণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃ দেখা যাইবে যে তখন ভারতবর্ষে বহুধনের সমাগম হইয়াছে। স্ফাটিক গবাক্ষ (৮) যুক্ত ইন্দ্রভবন তুল্য অত্যুচ্চ অট্টালিকা, সুরম্য উদ্যানমালা, রথ, শিবিকা প্রভৃতি যান, মণিমাণিকের ছড়াছড়ি, দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পজাত বহুবিধ দ্রব্য সকল, ইঁহাদের ভূয় উল্লেখে কে না অনুমান করিবে যে রামায়ণের সময়ে উত্তর ভারত অত্যন্ত ধনশালী হইয়াছিল? বস্তুতঃ তাহাই। কেবল রামায়ণের প্রমাণ যদি অত্যুক্তি বলিয়া অভ্রান্তভাবে গ্রহণ করিতে না পারা যায়, তবে মনুসংহিতা দেখ, বাল্মীকিবর্ণিত সমাজের ন্যায় অনুরূপ উন্নত সমাজের চিহ্ন পাওয়া যাইবে, এবং ইহা কিয়দংশে রামায়ণের উপর সময়ের বর্ত্তিতে পারে। আবার বৈদেশিক ইতিহাস আলোচনা দ্বারা জানা যাইবে যে আসিরীয়া দেশীয় রাণী শমিরমা (যাহার প্রাদুর্ভাব কাল বাল্মীকির সময় হইতে অল্পই এদিক ওদিক) অন্যান্য দেশ জয় করিয়া ভারতের গৌরব এবং ধনশালিত্ব শ্রবণে ভারতজয়ে অগ্রসর হয়েন। ঐরূপ বাল্মীকির অনতি-দীর্ঘকাল পরবর্ত্তী দরায়ুস একমাত্র সপ্ত-সিন্ধুর কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা

(৮) রামায়ণ ৪র্থ কাণ্ড ১সর্গ ৩৮ শ্লোক। ইউরোপ ভূমে প্লিনির সময়ের অব্যবহিত পরে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয়।

বাহ্লিক প্রভৃতি ঘৃণাস্পদ এবং হীনজাতি দ্বারা অধিকাংশ অধিবেশিত হইলেও এত ধনশালী ছিল যে, তথা হইতে বাৎসরিক কর ৩৬০ ট্যালেণ্ট অর্থাৎ ১০০৮০০০ টাকা আদায় হইত। (৯) হিরোডোটসের পরবর্ত্তী টিসিয়স সপ্তসিন্ধুবিষয়ক বর্ণনায় কহিয়াছেন যে, তাঁহার জ্ঞাতসারে যত দেশ আছে, সপ্তসিন্ধু প্রদেশ সে সকল অপেক্ষা স্বচ্ছন্দতা ও সৌভাগ্যযুক্ত এবং ধনশালী। যখন একমাত্র পঞ্জাবের অংশ-বিশেষ সম্বন্ধে ধনবত্তার এত গৌরব, তখন সর্ব্বগরিমার স্থল অনুগঙ্গ মধ্যদেশ যে আরও ধনশালী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং শমিরমার সাময়িক ও হিরো-ডোটস এবং টিসিয়স কর্ত্তৃক বর্ণিত ধনশালিতার পূর্ব্বসম্বন্ধ স্বচ্ছন্দে রামায়ণের সময়ের সহিত যোজনা করিতে পারা যায়।

দেশ এরূপ ধনশালী হওয়ার প্রধান কারণ বাণিজ্য। বাণিজ্যের পূর্ব্বগামী সচরাচর শিল্প অথবা তদভাবে কৃষি, কিন্তু কৃষি উভয়েরই পূর্ব্বগামী। সুতরাং কৃষির শ্রীবৃদ্ধির উপর পূর্ব্বকথিত সর্ব্বপ্রকার ধনশালিতা প্রধানতঃ নির্ভর করে। স্মরণ থাকে যেন এ নিয়ম উর্ব্বর ভূমিযুক্ত প্রদেশের প্রতিই প্রযুক্ত হইতেছে। এক সমাজ যতগুলি লোকদ্বারা সঙ্ঘটিত, তাহার যে অংশ কৃষক, কৃষিদ্বারা তাহাদের ভরণপোষণ হইয়াও যদি সমাজস্থ অবশিষ্ট লোকের পোষণার্থে কৃষিজাত দ্রব্য উদ্বর্ত্ত থাকে, তবেই তদ্দারা সমাজ রক্ষা এবং ভাবী ধনশালিতার উপায় বৃদ্ধি হয়। এই সময়ে কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বস্তু সম্বন্ধে সামান্য শিল্পের উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু কৃষিকার্য্যের ন্যায় লাভযুক্ত না হওয়ায়, শিল্পীরা বহু পরিশ্রমে কৃষিকরণোপযোগী কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিলেই, কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। ইউনাইটেড ষ্টেটে অবিকল এই অবস্থা গিয়াছে, এবং এখনও অনেক পরিমাণে চলিতেছে। এতদ্দারা সমাজ পোষণোপযোগী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াও যখন অনেক অধিক থাকে, তখন সেই সকল শিল্পও বাণিজ্যার্থে, বা তন্নিমিত্ত অপরাপর দ্রব্য উৎপন্নে এবং তাহাও তদ্রূপ নিয়োগ হেতু নিয়োজিত হয়, এবং তদ্দারা দেশ ধনশালী হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোক্ত কারণানুসারে ভারতের ঐশ্বর্য্য গণনা করিলে, ইহা অবশ্যই অনুমেয় যে, তৎকালে ভারতের কৃষিকার্য্য সময়োচিত বিপুলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৯) Hero : III 94. হিরোডোটসের মতে (Hero : III 98) ভারতবর্ষ অতি পূর্ব্বতম দেশ। তৎপরে মরুস্থান। ইহাতে বোধ হয় দরায়ুসের রাজ্য হিরোডোটস যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা পঞ্জাবের অংশ মাত্র। উপরোক্ত মরুস্থান বোধ হয় পঞ্জাব হইতে আরম্ভ রাজপুতানার মরুস্থান। তাহার পর (III 10) পঞ্জাবের অর্থাৎ কথিত দেশের দক্ষিণে লোকের বাস এবং তাহারা দরায়ুসের অধীন নহে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সকল হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে দরায়ুসের ভারতীয় রাজ্যের বিস্তার কত সঙ্কীর্ণ ছিল।

কথিত আছে যে, যে দেশে যত খাদ্যের উৎপত্তি হয়, সে দেশে কেবল উপস্থিত জীবন সমূহের পোষণার্থে উপযুক্তাংশ মাত্র রাখিলে, অপরাংশ হয় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করে, নতুবা সে সুখ স্বচ্ছন্দতার খর্ব্বতা সাধনে রাজ্যে লোক বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বৈদিক সময়ের সহিত তুলনা করিলে, বাল্মীকির সময়ে সেরূপ লোকবৃদ্ধির আধিক্য বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। ম্যাল্থস্ যে হারে যত দিনে লোকবৃদ্ধির নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন, সে নিয়মানুসারে বৈদিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বাল্মীকির সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষ লোকে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমস্ত স্থান যেমন আর্য্যরাজভুক্ত হইয়াছে, তেমন সমস্ত স্থান লোকসঙ্কুল হয় নাই। ভরতকে আনয়নার্থে দূত যে পথে কেকয় রাজভবনে গিয়াছিল, এবং ভরত যে পথে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই নিবিড় ও দুরতিক্রম্য জঙ্গলে পূর্ণ। আবার যমুনার দক্ষিণ তীর হইতেই নিবিড় বনের সঞ্চার। গৃহদ্বারস্থিত অন্ধরাজভবনে গমনকালীন দশরথকে এমত জঙ্গল জনশূন্য স্থান দিয়া যাইতে হইয়াছিল যে, কর্ণেল টড্ তাহাতে মোহযুক্ত হইয়া ভ্রম প্রমাদে পড়িয়া অঙ্গকে তিব্বত বা আভা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র জনক-ভবনে গমনকালীন কতই জনশূন্য স্থান অতিক্রম করিয়াছিলেন। এখন দেখ, সেই সকল স্থানে এতই লোকের আধিক্য হইয়াছে যে, তাহাদের জন্য আজি কালি অন্যত্রে উপনিবেশ স্থাপনের আন্দোলন হইতেছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বাল্মীকির সময়ের লোকসংখ্যা কত অল্প। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে জীবনোপায় বৃদ্ধির সঙ্গে বাল্মীকির সময়ে অনুরূপ লোক বৃদ্ধি না হইয়া বিলাস বৃদ্ধি হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাই। বলিতে কি, যেরূপ অপরিমিত, সুশৃঙ্খল বিলাস এবং স্বচ্ছন্দতা তৎকালে দেখা যায়, সে সময় বিবেচনা করিলে, তাহা আশ্চর্য্যজনক। কিন্তু এ বিলাস, এ ধন, এ স্বচ্ছন্দতা কোথায় প্রবাহিত হইত ?—ধনীর ঘরে, রাজার ঘরে ; কিন্তু ধনী দেশশুদ্ধ লোক নহে। বিশ্বব্যাপিনী রোমরাজ্য যেমন দুই সহস্র মাত্র পরিবারের সুখোৎপাদন করিত, ভারতেও তেমনি তাৎকালিকী ঐশ্বর্য্য কয়েক পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কাঙ্গালের দশা সব কালেই সমান। রাজকর ষষ্ঠাংশ, (১০) অতএব যেখানে ৬ টাকার দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া এক টাকা রাজাকে দিতে হইবে, সেখানে তাহাদের স্বচ্ছন্দতার সম্ভাবনা কোথায় ? এতদ্ব্যতীত অন্য কোনরূপ কর, যুদ্ধব্যয় এবং মহাজনের দেনাও সম্ভবতঃ ছিল, তাহার পর রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচার বা প্রজার অবশিষ্টাংশ ধন রক্ষায় অমনোযোগিতা, প্রজার নির্ধনতার অপর কারণ। এই শেষোক্ত কারণ বোধ হয় বিশেষরূপেই প্রবল ছিল। যেহেতু

(১০) বঙ্গদর্শন ৩য় খণ্ড ২৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

দেখিতে পাওয়া যায় যে কৃষক আপন আবশ্যকীয় ব্যতীত কিছু বেশি ধন উপার্জ্জন করিলেই, তাহা ভয় প্রযুক্ত ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত। একাধিকস্থলে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। একস্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"সমুদ্ধৃতনিধানানি পরিধ্বস্তাজিরাণিচ।
উপাত্ত ধন ধান্যানি হৃতসারাণি সর্বশঃ॥"

রাম বনে যাইতেছেন বলিয়া দুর্ভাগ্যেরা আশঙ্কা করিতেছে যে, যে ধন ভূগর্ভে প্রোথিত আছে তাহা পর্য্যন্তও অপরাপর ধন ধান্য সহ কেকয়ী-পুত্রের রাজত্বকালে অপহৃত হইবে। এখানে কেকয়ীর চরিত্রদৃষ্টে কেকয়ী-পুত্রের গুণ অবধারণ করিয়াই তাহারা এত আশঙ্কাযুক্ত হইতেছে। ভাল রাজার আমলে, মাটিতে পুঁতিলেও বা কিছু রক্ষা হইত, এবার তাহাও হইবে না। যেখানে ধন প্রথমতঃ পূর্ব্বপ্রদর্শিত কারণে সঞ্চিত হওয়াই কঠিন, দ্বিতীয়তঃ যদি বা হইল, তাহা প্রকাশ রাখাই দায়, সেখানে নিম্নশ্রেণীর স্বচ্ছন্দতা বা ঐশ্বর্য্য সম্ভবে না। তাহাদের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করিয়া থাকে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অপর শ্রেণীর লোক, যাহারা সামান্য শিল্প দ্বারা কেবল জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং অপর লাভজনক কাজে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিত না, তাহাদেরই সম্ভবতঃ হীনাবস্থায় থাকার কথা। কিন্তু কথিত আছে যে, কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য তিনই বৈশ্যের হাতে, তবে কেন কৃষিজীবী বা পশুপালকের দশা তদ্রূপ হইত? এস্থলে উত্তর করি যে, কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য এ তিনই, এক ব্যক্তি সব সময়ে স্বহস্তে করিতে পারে না। যদিও বা কাহার ঐ তিন বিষয়ে একীভূত বিষয় ছিল, প্রথমতঃ তাহার কথা স্বতন্ত্র, ঐশ্বর্য্যে তাহাকে ঐ তিন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ অপর লোক দ্বারা সেই সেই কার্য্য সম্পন্ন করাইত। এমন স্থলে যাহারা স্বহস্তে কাজ করিত, এবং কৃষি দ্বারাই দিনান্তে যাহার অন্ন, তাহাদেরই অবস্থাকল্পে উপরে সমস্ত কথিত হইল। স্বাধীন কৃষক হইলেও তাহার সঙ্গে একজন বাণিজ্য ব্যবসায়ীর লাভালাভের তারতম্য দেখ। একজন কৃষিজীবী ৬ টাকার ধান উপার্জ্জন করিয়া রাজাকে এক টাকা দিবে, আর একজন বণিক ৫০ টাকার সুবর্ণ উপার্জ্জন করিয়া সেই এক টাকা দিবে। এই তারতম্য হেতু, ইহাও জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, আদম স্মিথ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত মুদ্রার মূল্যাবধারণ তত্ত্ব তৎকালে এবং মনুর সময়ে আর্য্যদিগের নিকট সম্পূর্ণ ই অপরিজ্ঞাত ছিল। সামান্য শিল্প বা তথাবিধ ব্যবসায়ীদিগের অবস্থাও কৃষিজীবিগণ হইতে উন্নত ছিল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
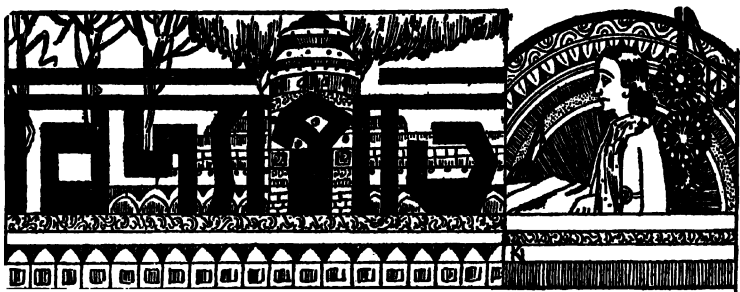
বিদ্যাপতি বঙ্গকাব্য-কাননের পিকবর। তাঁহার সঙ্গীতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সরস কবিতাকুসুমের বাসন্তসৌরভ বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সুধাময় ঝঙ্কার শুনিয়াই কত ভাবুক বিহঙ্গ ও মধুকর সুমধুর তানে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কত শত ভক্তের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে; কত প্রেমিকের পুলকিত তনু অতুল আনন্দানিল হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়াছে। যখন অমৃতময় স্বরলহরী বিস্তার করিয়া কোকিল ঋতুরাজের আগমনবার্ত্তা দেয়, সে কি বলে বুঝি না বুঝি, তাহার স্বরে মন মোহিত হয়, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে; সেইরূপ যখন বিদ্যাপতির গীত শ্রবণ করি, ভাল করিয়া বুঝি না বুঝি, তাহাতে মন মুগ্ধ হয়, হৃদয়ের অন্তরতম তন্ত্র পর্য্যন্ত বাজিয়া উঠে। এই কলকণ্ঠ ভাবুক পিকবরের জীবনবৃত্তান্ত জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা অনুসন্ধান দ্বারা যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি, এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব। আমরা যাহা বলিব, হয়ত তাহাতে অনেকের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে, অনেকের চিরসঞ্চিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে। একাল পর্য্যন্ত যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত আমরা ঐকমত্য রাখিতে পারিব না।

বিদ্যাপতি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই। তবে ইহা জানা আছে যে তিনি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও কবি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক লোক ছিলেন এবং তিনি শিবসিংহ নামক রাজা ও লছিমা নাম্নী রাজ্ঞীর আশ্রয় পাইয়াছিলেন, আর রূপনারায়ণ নামে তাঁহার একজন বন্ধু ছিল। বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণের লেখা হইতে এ সকল কথা সংগ্রহ করা যায়। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে,—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥ (মধ্যখণ্ড)

চৈতন্য চরিতামৃতের এই এবং অন্যান্য কয়েকটী স্থল পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে চৈতন্যদেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা শ্রবণ করিতে ভালবাসিতেন। ভালবাসিবারই কথা। চৈতন্য যেমন কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক, কৃষ্ণরসের রসিক, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসও তেমনই কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক, কৃষ্ণরসের রসিক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত যে প্রীতির উৎস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় তাহা বেগবতী নদী হইয়াছে, প্রেমের পাগল গৌরচন্দ্র কেন না তাহার রস পান করিতে উৎসুক হইবেন ? নরহরিদাস লিখিয়াছেন,—

জয় বিদ্যাপতি কবিকুল চন্দ।
রসিক সভাভূষণ সুখ কন্দ॥
শ্রীশিব সিংহ নৃপতি সহ প্রীত।
জগত ব্যাপি রহু বিশদ চরিত॥
লছিমা গুণহি উপজে বহুরঙ্গ।
বিলসয়ে রূপনারায়ণ সঙ্গ॥
বৃন্দাবন নব কেলি বিলাস।
করু কত ভাঁতি যতনে পরকাশ॥
শ্রীগোকুল বিধু গৌর কিশোর।
গণ সহ যাক গীতরসে ভোর॥
নরহরি ভণ অরু কি কহব তায়।
অনুখন মন জনু রহে তছু পায়॥

পুনশ্চ,—

বিদ্যাপতি কবি ভূপ।
অগণিত গুণজন রঞ্জন, ভণব কি সুখময়
পিরীতি মুরতি রসকুপ॥
শিশু সময়াবধি অধিক পরাক্রম
বিরচল দেবচরিত বহু ভাঁতি।
কোই করল উপদেশ পরম রস উলসিত
তাহে নিরত রহু মাতি॥
শ্রীশিব সিংহ নৃপতি লছিমা প্রিয় অতুল
বিমল যশ বিদিত হি ভেল।
শ্যামর গৌরী কেলিমলি সংপুট
যতনে উঘাতি ভুবন ধনি কেল॥
মরি মরি যাক গীত নব অমিয়
পিবি পিবি জীবই সে রসিকচকোর।
নরহরি তাক পরশ নাহি পাওল
বুঝব কি ওরস মরুমতি মোর॥

বৈষ্ণব দাস লিখিয়াছেন—

জয় জয় দেব কবি, নৃপতি শিরোমণি,
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস, রসশেখর,
অখিল ভুবনে অনুপাম॥

যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্য ময় গীত।
প্রভু মোর গৌর চন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত॥
যবহু যে ভাব উদয় হুহুঁ অন্তরে,
তব গায়হি দুহুঁ মেলি।
শুনইতে দারু পাষাণ গলি যায়ত,
ঐছন সুমধুর কেলি॥
আছিল গোপতে, যতন করি পহুঁ মোর
জগতে করল পরকাশ।
সোরস শ্রবণে, পরশ নাহি হোয়ল,
রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

কবিপতি বিদ্যাপতি মতি মানে।
যাক গীত, জগতচিত চোরায়ল,
গোবিন্দ গৌরী সরস রস গানে॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী।
তাকর সার, সার পদসঞ্চয়ে,
বাঁধল গীত কতহুঁ পরিমাণি॥
যো সুখ সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া,
সো সুখসার, হার সব রসিকহি,
কণ্ঠহি কণ্ঠ পরায়ল বনিয়া।
আনন্দে নারদ না ধরহে থেহা।
সে আনন্দরস, জগভরি বরিখল,
সুখময় বিদ্যাপতি রসমেহা॥
যত যত রসপদ কয়লহি বন্ধে।
কোটিহি কোটি, শ্রবণপর পাইয়ে,
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্দে॥
সোরস শুনি নাগর বরনারী।

কিয়ে কিয়ে করে চিত, চমকে ঐছন,
রসময় চম্পূ বিথারি॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দে।
এত সুখ সম্পদ, বহইতে আনমন,
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে॥

আমরা বৈষ্ণব কবিদিগের যে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, তদ্দৃষ্টে এই কয়েকটী কথা জানা যাইতেছে, (১) বিদ্যাপতির রচিত গীত শ্রবণে অনেক ভক্তের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; (২) চৈতন্য সর্ব্বদাই ঐ সকল গীত শুনিতেন; (৩) শিবসিংহ নৃপতি ও লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাপতির সম্ভাব ছিল; (৪) রূপনারায়ণের সহিত তাঁহার সখ্য ছিল। এক্ষণে দেখা যাউক, বিদ্যাপতির লিখিত কবিতা হইতে তাঁহার কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির কোন কোন গীতে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়,—

কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিব সিংহ লছিমা পরমাণে।

কোথাও এরূপ—

ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
এসব এরূপ জান।
রায় শিব সিংহ, রূপনারায়ণ,
লছিমা দেবী পরমাণ॥

কুত্র এ প্রকার—

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন সব যুবতী
ইহ রসকূপ যে জান।
রাজা শিব সিংহ, রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥

কোন স্থলে ঈদৃশ—

ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি,
রাধা রূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ,
একাদশ অবতারা॥

কুত্র বা এবম্বিধ—

রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক॥

কোথাও এ প্রকার—

বিদ্যাপতি কহ ভাখি।
রূপনারায়ণ সাখি॥

এইরূপ বিদ্যাপতি লিখিত অনেক কবিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজা শিবসিংহ, লছিমা দেবী ও রূপনারায়ণের সঙ্গে তাঁহার সদ্ভাব ছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় পুরুষপরীক্ষা নামক একখানি গদ্য পুস্তক আছে; উহার প্রারম্ভ এই প্রকার, "অমরবৃন্দ কর্তৃক স্তুত ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করেন এবং দেবতাদিগের পূজিত চন্দ্রশেখর যাঁহাকে পূজা করেন ও নারায়ণ দেবগণের ধ্যান প্রাপ্ত হইয়াও যাঁহাকে ধ্যান করেন এতাদৃশী যে পরম দেবতা তাঁহার চরণে আমি কোটি কোটি প্রণাম করি। সুর সমূহের মান্য ও মেধাবিশ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত সমুদায়ের মধ্যে প্রথম গণনীয় যে শ্রীদেব সিংহ রাজার পুত্র শ্রীশিবসিংহ রাজা তিনি জয়যুক্ত হউন।

"অভিনব প্রজ্ঞা বিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্ত এবং কামকলা কৌতুকাবিশিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্ত শ্রীশিব সিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন যে, রসজ্ঞান দ্বারা নির্ম্মল বুদ্ধি যে পণ্ডিত সকল তাঁহারা নীতিবোধানুরোধক যে এই সকল বাক্যের গুণ তন্নিমিত্তে কি আমার এই রচিত গ্রন্থ শ্রবণ করিবেন না অর্থাৎ অবশ্য শ্রবণ করিবেন। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষ পরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।"

এইরূপ বাঙ্গালা গদ্যে কবি বিদ্যাপতি পুরুষ পরীক্ষা রচনা করিয়াছেন, ইহা অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু এটী ভ্রম। ভ্রম বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহও করিয়াছেন, অথচ কোন পক্ষেই কিছু প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। আমরা কেন ভ্রম বলিতেছি, নিম্নে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি—

(১) পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষা আছে। পুস্তকখানি এক্ষণে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে রহিয়াছে। ঐ পুস্তকের উপরে লিখিত আছে,—

"শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা পুরুষপরীক্ষা॥ শ্রীহরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা।"

(২) ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ইতিহাস (Annals of the College of Fort William) নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানা যায় যে, হরপ্রসাদ রায় মূল সংস্কৃত হইতে পুরুষপরীক্ষা বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। উহা ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের কৌন্সিলের অভিপ্রেতানুসারে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে শ্রীরামপুর মিসনরী যন্ত্রে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।*

---

*In a "Catalogue of Literary Works, the publication of which has been encouraged by Government at the recommendation of the Council of the College of Fort William, since the period of disputation, held in 1814," we find the following :—

"পুরুষপরীক্ষা Pooroosha Pureekha or the Test of Man, a work containing the moral doctrines of the Hindus, translated into the Bengalee Language, from the Sanskrit, by Huruprasad, a Pundit attached to the College of Fort William, for the use of the Bengalee class. It is a delineation of eminence of character, in many situations of human life, and consists of forty-eight stories, illustrative thereof. Some of these describe men eminent for moral virtue ; others, men eminent for heroic or daring actions ; others are represented as examples of high qualifications ; and others, of extraordinary folly or wisdom, virtue or vice.—

(৩) আমরা সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উহা হইতে যে পূর্ব্বপ্রদত্ত বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষা সূচনা অনুবাদিত, পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

মঙ্গলাচরণ

"ব্রহ্মাপি যাং নৌতি নুতঃ সুরেণ যামর্চিতোপ্যর্চয়তীন্দুমৌলিঃ।
যাংধ্যায়তি ধ্যানগতোপিবিষ্ণুস্তমাদিশক্তিং শিরসা প্রপদ্যে ॥
বীরেষু মান্যঃ সুধিয়াং বরেণ্যো বিদ্যাবতামাদিবিলেখনীয়ঃ।
শ্রীদেবসিংহক্ষিতিপালসূনুর্জ্জীয়াচ্চিরং শ্রীশিবসিংহ দেবঃ ॥
শিশূনাং সিদ্ধ্যর্থং নয় পরিচিতে নূতনধিয়াং
মুদে পৌরস্ত্রীণাং মনসিজকলাকৌতুকযুষাম্।
নিদেশান্নিঃ শঙ্কং সপদি শিবসিংহ ক্ষিতিপতেঃ
কথানাং প্রস্তাবং বিরচয়তি বিদ্যাপতি কবিঃ ॥
নয়ানুরোধেন গুণেন বাপি কথারসস্যাপি কুতূহলেন।
বুধোপি বৈদগ্ধ্যবিশুদ্ধচেতাঃ প্রবন্ধমাকর্ণয়তাং ন কিম্মে ॥
পুরুষাঃ পরিচীয়ন্তে যুক্তেরস্যাঃ পরীক্ষয়া।
তৎপুরুষপরীক্ষায়াং কথা সর্ব্বজনপ্রিয়া ॥"

পুরুষপরীক্ষা-লেখক বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের আশ্রিত; গীত-রচয়িতা বিদ্যাপতিও রাজা শিবসিংহের আশ্রিত। সুতরাং পুরুষপরীক্ষা-লেখক ও গীত-রচয়িতা একই ব্যক্তি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অন্ততঃ যতক্ষণ অন্যরূপ প্রমাণ না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ এইরূপ বিবেচনা করাই যুক্তিসিদ্ধ; কারণ বিভিন্ন পাত্রস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতা উভয়ের নামের ঐক্য হওয়া অতীব অসম্ভব। পুরুষপরীক্ষা হইতে রাজা শিবসিংহের একটী পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তিনি রাজা দেবসিংহের পুত্র।

বিদ্যাপতি কবি চণ্ডীদাসের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। উভয়ের গুণের কথা শুনিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হন। উভয়ের মিলন সম্বন্ধে চারিটী

The whole forming a useful miscellany of Eastern manners and opinions,

P. 474. Annals of the College of Fort William.

In Appendix—No. II of the same work, giving a "Catalogue of Oriental and other works, which have been published under the patronage of the College of Fort William, since its Institution, in 1800," we find the following :—

"পুরুষপরীক্ষা Pooroosha Pureekha, translated from the original Sanscrit, by Huruprusuda Raya. Serampore, printed at the Mission Press, 8vo. 1815."

কবিতা আছে; তন্মধ্যে আমরা দুইটী উদ্ধৃত করিলাম; একটী রূপনারায়ণের, অপরটী বিদ্যাপতির রচিত।

(১)

চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ডীদাস গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল,
বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব, রহই না পারই,
চলল দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁ জন, দুহুঁ গুণ গাওত,
দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি॥
দৈবহি দুহুঁ দোঁহা, দরশন পাওল,
লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহা নাম, শ্রবণে তহি জানল,
রূপনারায়ণ গোই॥

(২)

সময় বসন্ত, যামদিন মাঝহি বটতলে সুরধুনী তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল, পুলকে কলেবর গীর॥
দুহুঁ জন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল,
দুহুঁক অবশ প্রতিকার॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ, নিভৃতে আলাপই,
পুছত মধুর রস কি?
রসিক হইতে কিয়ে, রস উপজায়ত,
রস হইতে রসিক কহি?
রসিকা হইতে, রসিক কিয়ে হোয়ত,
রসিক হৈতে রসিকা?
রতি হৈতে প্রেম, প্রেম হৈতে রতি কিয়ে,
কাহে মানব অধিকা?
পুছত চণ্ডীদাস কবি রঞ্জনে,
শুনত রূপনারায়ণ।

কহ বিদ্যাপতি,　　　　ইহ রস কারণ,
লছিমা পদ করি ধ্যান ॥

আমরা যে দুইটী গীত উদ্ধৃত করিলাম না, তন্মধ্যে একটীর ভণিতা এইরূপ—

রূপনারায়ণ,　　বিজয় নারায়ণ,
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মিলন ভাবি,　দুহুঁক করু বর্ণন,
তছু পদ কমলভৃঙ্গ।

সুতরাং এটীর রচয়িতা চারিজন, রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ ও শিবসিংহ; এবং এই চারিজনই বিদ্যাপতির মিত্র হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বীরভূমস্থ নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের বাসস্থান ছিল। অতএব বিদ্যাপতির বাসস্থান বীরভূম জেলা হইতে অতি দূরবর্ত্তী ছিল না, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অন্যায় নহে।

এস্থলে আর একটী কথার বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই এক সময়ের লোক; চণ্ডীদাসের লেখার সঙ্গে বর্ত্তমান বাঙ্গালার অল্পই প্রভেদ, কিন্তু বিদ্যাপতির কবিতায় হিন্দির ভাব অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উভয়ের রচনা-প্রণালীগত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা উভয়েরই দুইটী করিয়া কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম ও দ্বিতীয়টী চণ্ডীদাসের এবং তৃতীয় ও চতুর্থ টী বিদ্যাপতির।—

১

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে,　　　থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে　　　চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে,　　　রাঙ্গাবাস পরে,
যেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী,　　　খুলয়ে গাঁথনী,
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বদনে,　　　চাহে মেঘপানে,
কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিট করি,　　　ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়,　　　নব পরিচয়,
কালিয়া বন্ধুর সনে॥

ধিক রহু জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে॥
এপাপ পরাণে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোরে গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া কেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতাবনে।
জলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএব এছার পরাণ যাবে কিসে!
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাসে বলে দৈব গতি নাহি জান।
দারুণ পিরীতি সেই ধরই পরাণ।

৩

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দলবলে ধনী দেকে পড়ি গেল॥
কবহুঁ ঝাপয়ে অঙ্গ কবহুঁ বিথার।
কবহুঁ বাঁধয়ে কুচ কবহুঁ উঘার॥
থির নয়ান নাহি অথির ভেল।
উরজ উদয় থল নালিম দেল॥
চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
বৈরজ ধরহ মিলায়ব আন।

৪

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারনু
নয়ন ন তিরপিত ভেল॥
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

যদিও চণ্ডীদাসের কোন কোন গীতে হিন্দির আধিক্য লক্ষিত হয় এবং বিদ্যাপতির নামবিশিষ্ট কোন কোন কবিতা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় রচিত, তথাপি সাধারণতঃ চণ্ডীদাসের লেখা বাঙ্গালা ও বিদ্যাপতির লেখা হিন্দিভাবাপন্ন। এরূপ হইবার কারণ কি বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্বে কেহ কেহ বলিতেন যে, বিদ্যাপতির সময়ে বাঙ্গালা ভাষা হিন্দি হইতে পৃথগ্‌ভূত হয় নাই; কিন্তু চণ্ডীদাসের রচনাপদ্ধতি দেখিলে এ বিশ্বাস কাহারও মনে স্থান পাইতে পারে না। চণ্ডীদাসের শব্দ বাঙ্গালা, চণ্ডীদাসের ছন্দ বাঙ্গালা। বিদ্যাপতির শব্দ হিন্দি, বিদ্যাপতির ছন্দ হিন্দি। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কৃষ্ণবিষয়ক গীত রচনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতি ব্রজভাষার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কবিতায় হিন্দির আধিক্য; চণ্ডীদাস তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্ ছিলেন না বলিয়াই অনেক ব্রজবুলি প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা এই মতের সমর্থন করেন, তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন যে চৈতন্যের পরেও,

এমন কি এখন পর্য্যন্ত, বঙ্গীয় কবিরা উক্ত প্রকার হিন্দিভাবাপন্ন কবিতা সময়ে সময়ে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে আর একটী কথা ভাবিতে হয়। বিদ্যাপতির গীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে গিয়াই পরবর্ত্তী কবিরা হিন্দি-ভাবাপন্ন কবিতা লিখিয়াছেন। বিদ্যাপতির পূর্ব্বের কোন বাঙ্গালা কবিতা বা কবির উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং বিদ্যাপতিকেই হিন্দিভাবাপন্ন কবিতা লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মাতৃভাষা যদি চণ্ডীদাসের ভাষার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইত, তিনি যে তাঁহার অধিকাংশ গীতগুলিকে ছন্দে ও শব্দে হিন্দিভাবাপন্ন করিতে যাইতেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। আদি কবিরা স্বদেশীয়দিগের বোধগম্য করিয়াই গীত রচনা করেন; তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিবশতঃ পরবর্ত্তীকালের বা দূরতর প্রদেশের কোন কোন লেখক তাঁহাদিগের রচনা-প্রণালী সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বোধ হইলেও বিশেষ পাঠকশ্রেণীর জন্য অনুকরণ করিতে পারেন। সুতরাং বিদ্যাপতির ভাষার ন্যায় ভাষা যে প্রদেশে প্রচলিত ছিল, তিনি সে প্রদেশের অধিবাসী হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাপতি বীরভূম জেলায় চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আমরা দেখাইয়াছি যে চণ্ডীদাসের ভাষা বাঙ্গালা। অতএব বীরভূম হইতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলাভিমুখে গমন করিলে বিদ্যাপতির বাসস্থলে উপস্থিত হওয়া যায়, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নয়। "খেলত," "ভেল," "কহব," "মাতল," "শ্রবণক" ইত্যাদি পদপ্রয়োগ দেখিয়াও বোধ হয় বিদ্যাপতি ভাগলপুর বা পাটনা বিভাগের লোক।

এপর্য্যন্ত বিদ্যাপতির বিষয়ে আমরা যাহা যাহা বলিলাম তাহাতে এই কয়েকটী কথা পাওয়া যাইতেছে; (১) তিনি চৈতন্যের পূর্ব্বে ও চণ্ডীদাসের সময়ে শিবসিংহ নামক কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন, এবং উক্ত রাজার মহিষীর নাম লছিমা ও পিতার নাম দেবসিংহ ছিল। (২) রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও বৈদ্যনাথ বিদ্যা-পতির মিত্র ছিল; (৩) বিদ্যাপতি অনেক পদাবলী ও সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষা রচনা করেন; (৪) তিনি পাটনা বা ভাগলপুর বিভাগের লোক হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে বিদ্যাপতির বাসস্থল মিথিলায় ছিল।

মৈথিল ভাষায় লিখিত বিদ্যাপতির রচিত অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে; সে সকল গীতে শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লছিমা দেবীর নামোল্লেখ আছে। আমরা উদাহরণস্বরূপ একটী গীত উদ্ধৃত করিলাম—

অরুণ পূরব দিশ, বহল সগর নিশ,
গগন মগন ভেল চন্দা।
মুনি গেল কুমুদিনী, তইও তোহর ধনি,
মুনল মুখ অরবিন্দা॥

কমল বদন, কুবলয় দুই লোচন,
অধর মধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর, কুসুম তুঅ সিরজল,
কিঅ দঈ হৃদয় পখাণে॥
অসকতি কর, কঙ্কণ নহি পরিহসি,
হৃদয় হার ভেল ভারে।
গিরিসম গরুঅ, মান নহি মুঞ্চসি,
অপরুব তুঅ ব্যবহারে॥
অব গুণ পরিহরি, হরখি হরু ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
বিদ্যাপতি কবি ভাণে॥

আর একটী গীতের ভণিতা এইরূপ—

ভণই বিদ্যাপতি, সুনু ব্রজ যৌবতি, ইথিক লক্ষী সমানে।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ, লছিমাদেই বিরমাণে॥

অপর একটী কবিতার ভণিতা এবম্বিধ,—

ভণই বিদ্যাপতি, শুন ব্রজনারি।
ধৈরজ ধরয়কু মিলত মুরারি॥

মিথিলায় পঞ্জীনামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ আছে; তাহাতে রাজাদিগের ও ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৪৮ শকে মিথিলাধিপতি হরিসিংহ দেবের রাজত্ব সময়ে উক্ত গ্রন্থের রচনারম্ভ হয়; উহাতে লিখিত আছে,—

শাকে শ্রীহরিসিংহদেবনৃপতেঃ ভূপার্ক তুল্যেজনি।
তস্মাদ্দন্তমিতেঽব্দকে দ্বিজগণৈঃ পঞ্জী প্রবন্ধঃ কৃতঃ॥

অর্থাৎ "১২৪৮ শকে হরিসিংহ দেব নৃপতির সময়ে দ্বিজগণকৃত পঞ্জীপ্রবন্ধের জন্ম হয়।"

এই পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় আছে। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পিতামহের নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম ধীরেশ্বর, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম দেবাদিত্য, এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ধর্ম্মাদিত্য। তিনি মিথিলামহীপতি শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। পঞ্জীপ্রবন্ধানুসারে, এই রাজা মৈথিল ব্রাহ্মণবংশীয়; লখিমা দেবী তাঁহার মহিষী; রাজা দেবসিংহ তাঁহার পিতা, এবং তিনি ১৩৬৯ শকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন।

শিবসিংহ নৃপতি সুগওনা নামক গ্রামে বাস করিতেন। অদ্যাপি সেই গ্রামে তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া বাস করিতেছে। তৎখানিত বিস্তৃত অতি

গভীর রাজপুষ্করিণী নামে অনেক তড়াগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের সদৃশ বৃহৎ জলাশয় দেশান্তরে প্রায় দেখা যায় না। মিথিলায় এই একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,—

"পোখরি রজোখরি অরু সভ্ পোখরা।
রাজা শিবসিংহ অরু সভ্ ছোকরা॥"

অর্থাৎ "রাজখানিত পুষ্করিণীই প্রকৃত পুষ্করিণী, আর সকল ডোবা ; শিবসিংহই প্রকৃত রাজা, আর সকল সামান্য লোক।"

রাজা শিবসিংহ ও কবি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে মিথিলায় একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। কথিত আছে যে রাজা শিবসিংহকে দণ্ড দিবার জন্য দিল্লীশ্বর ধরিয়া লইয়া যান বিদ্যাপতি এই সংবাদ শুনিয়া রাজাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত দিল্লীতে গমন করেন। যাইয়া দিল্লীপতিকে বলেন, আমি অদৃষ্ট দৃষ্টবৎ বর্ণনা করিতে পারি। এই কথা শুনিয়া দিল্লীশ্বর পরীক্ষার্থে তাঁহাকে কাষ্ঠপেটকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া কোন স্থানে রাখিয়া দেন। অনন্তর কতকগুলি নগরাঙ্গণাকে স্নান করাইয়া নিজ নিজ ভবনে পাঠান, এবং কবিকে সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক যমুনাতীরবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আদেশ করেন। বিদ্যাপতি নাকি ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দপ্রসাদে, উহা অদৃষ্ট হইলেও দৃষ্টবৎ মৈথিল ভাষায় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন,—

কামিনী করু অসনানে।
হেরইত হৃদয় উদিত পচবাণে॥
চিকুর গরল জলধারে।
জনি মুখশশি ডর রোঅহি অন্ধারে॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
জনি বিহ আনি মিলাওল দেবা॥
জনি সংশয় ভুজ ফাঁসে।
বান্ধি ধএল উড়ি লাগত অকাসে॥
তিতল বসন তন লাগু।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বড় তপ গুণমতি পুনমতি পাবে॥

বিদ্যাপতির এই গীতটি বাঙ্গালাদেশেও চলিত আছে ; কিন্তু ইহার সম্বন্ধে কোন গল্প কাহারও মুখে শুনা যায় না, এবং এদেশে ইহার যেরূপ আকার হইয়াছে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কামিনী করয়ে সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ॥

চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়াঁরা॥
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনি এক মানস মনমথ জাগি॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা॥
তেঞি শঙ্কা ভুজ পাশে।
বান্ধি ধরল জনু উড়ব তরাসে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥*

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, বিদ্যাপতির অলৌকিক শক্তি সন্দর্শন করিয়া, দিল্লীশ্বর শিবসিংহকে মুক্ত করিলেন এবং কবিকে বীসপী নামক বৃহৎ গ্রাম প্রদান করিলেন। এই কারণে হউক বা না হউক, বিদ্যাপতি যে গ্রাম দান পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তদ্বংশীয়েরা অদ্যাপি উক্ত গ্রাম ভোগ করিয়া বাস করিতেছেন; তাঁহারা দিল্লীপতিদত্ত দানপত্র অদ্যাপি দেখাইয়া থাকেন। রাজা শিবসিংহ নিজভূম্যন্তর্গত সেই গ্রামের দিল্লীপতি দত্ত দানপত্র দৃঢ় করণার্থে আপনিও কবিকে একখানি দানপত্র দেন; তাহা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

অব্দে লক্ষ্মণ সেন ভূপতি মিতে বহ্নিগ্রহ দ্ব্যঙ্কিতে।
মাসি শ্রাবণসংজ্ঞকে শুভতিথৌপক্ষে বলক্ষে গুরৌ॥
বাগ্বত্যাস্সরিতস্তটে গজরথেত্যাখ্যা প্রসিদ্ধে পুরে।
দিৎসোৎসাহ বিবর্দ্ধবাহুপুলকঃ সভ্যায় মধ্যে সভম্॥
প্রজ্ঞাবান্ প্রচুরোর্ব্বরং পৃথুতরাভোগং নদীমাতৃকং।
সারণ্যং সসরোবরঞ্চ বীসপীনামানমাসী মতঃ॥
শ্রীবিদ্যাপতি শর্ম্মণে সুকবয়ে রাজাধিরাজঃ কৃতী।
বীর শ্রীশিবসিংহ দেবনৃপতির্গ্রামং দদৌ শাসনম্॥

অর্থাৎ "২৯৩ লক্ষ্মণ সেন ভূপতির অব্দে শ্রাবণ মাসে শুভতিথিতে শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে বাগ্বতী নদীর তীরে গজরথাখ্য প্রসিদ্ধপুরে রাজাধিরাজ কৃতী প্রজ্ঞাবান্ দানোৎসাহযুক্ত বীর শ্রীশিবসিংহ দেব নৃপতি সভামধ্যে বসিয়া সভ্য সুকবি বিদ্যাপতি শর্ম্মাকে প্রচুরোর্ব্বর বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক সারণ্য সসরোবর বীসপী নামক গ্রাম সীমা পর্য্যন্ত শাসনস্বরূপ প্রদান করিলেন।"

পাঠকগণ দেখিবেন যে, রাজা শিবসিংহের দানপত্রে লক্ষ্মণসেনের অব্দ ব্যবহৃত। বাঙ্গালার সেন রাজারা যে, মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা

* প্রাচীনকাব্য সংগ্রহ। ১৫ পৃষ্ঠা।

তদ্বিষয়ের সামান্য প্রমাণ নহে। মিথিলা হইতে আমরা আরও সংবাদ পাইয়াছি যে, বিদ্যাপতি কবি ৩৪৯ লক্ষ্মণসেনাব্দে মৈথিলাক্ষরে তালপত্রে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এবং উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বিদ্যাপতির জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে গিয়া দুইবার লক্ষ্মণসেনের অব্দের উল্লেখ দেখিয়া আমাদিগের জানিতে ইচ্ছা হয় যে, এক্ষণে ত্রিহুতে লক্ষ্মণসেনের অব্দ প্রচলিত আছে কি না। অনুসন্ধান দ্বারা পরে আমরা অবগত হইয়াছি যে, মৈথিল পণ্ডিত সমাজে অদ্যাপি মহারাজা লক্ষ্মণ-সেনের অব্দ চলিতেছে। উহার চিহ্ন "লসং।" মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে উহার বৎসর পরিবর্ত্তন ঘটে। এক্ষণে ৭৬৭ লক্ষ্মণ সংবৎ চলিতেছে। এ সময়ে শকাব্দ ১৭৯৭ ও খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৪ বর্ষ বহমান। সুতরাং শকাব্দ ১০৩০ ও খ্রীষ্টাব্দ ১১০৭ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল হইতেছে। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান দ্বারা খৃঃ অঃ ১১০০ হইতে ১১২০ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব সময় ধরিয়াছেন। মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্মণাব্দ দ্বারা তাঁহার মতেরই সমর্থন হইতেছে।

১০৩০ শকাব্দে লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ। সুতরাং ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে ১৩২৩ শকাব্দ হইতেছে। যদি শেষোক্ত বৎসর রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতি কবিকে ভূমিদান পত্র দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৩৬৯ শকে শিবসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হন, মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে এরূপ উক্তি কেন দেখা যায়? ইহাতে ত তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে দান করিতে দেখা যাইতেছে। মৈথিল পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই দানপত্র তাঁহার যৌবরাজ্যকালে প্রদত্ত। শিবসিংহ অনেক আয়াসসাধ্য কার্য্য করিয়াছিলেন, এ প্রকার জনশ্রুতি আছে। কিন্তু তিনি অত্যল্পকাল অর্থাৎ সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইহাতে প্রতীতি হয় যে সেই কার্য্য সকল তদীয় যৌবরাজ্য কালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। মিথিলায় এইরূপ কিম্বদন্তীও আছে। পঞ্জী প্রবন্ধানুসারে শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের রাজত্বকাল ৬১ বৎসর। সুতরাং রাজা হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে শিবসিংহ যুবরাজ ছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই বিস্ময়কর নহে। ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ভূমিদান-পত্র পাইলেও রাজা শিবসিংহের রাজ্যাভিষেকের পরে বিদ্যাপতি যে জীবিত ছিলেন, পুরুষপরীক্ষার মঙ্গলাচরণ দৃষ্টে জানা যায়। আর বিদ্যাপতি ৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দে অর্থাৎ ১৩৭৯ শকাব্দে তালপত্রে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছিলেন, এতদ্দারাও সেই কথারই প্রমাণ হইতেছে।

বিদ্যাপতির মৃত্যু সম্বন্ধে মিথিলায় একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। বিদ্যাপতি আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া গঙ্গাতীরে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, ভগবতী ভাগীরথী ভক্তবৎসলা, এমন সময়ে আমার নিকটে তিনি আসিবেন না কেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভাগীরথী ত্রিধারা হইয়া তরঙ্গমালা

বিস্তার করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া বিদ্যাপতি সানন্দে সেই খানেই শরীর ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চিতা প্রদেশে একটী শিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই শিবলিঙ্গ ও নদীচিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়, যে স্থান এই সকল কারণে প্রসিদ্ধ, সেস্থান ভাগীরথীর উত্তর কুলস্থ বাজিতপুর নগরের উত্তরভাগে বাঢ় নামক নগর হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে অবস্থিত।

যে শিবসিংহের সভায় বিদ্যাপতি ছিলেন, সে শিবসিংহ নারায়ণ নামক সামান্য দ্বিজকুল-সম্ভূত। তাঁহার পূর্ণনাম "রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ।" তাঁহার পিতা মহারাজ দেবসিংহ, পিতামহ মহারাজ ভবেশ্বর, পিতৃব্য হরসিংহদেব। হরসিংহের চারিপুত্র, দর্পনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ নরসিংহ, জীবন-নারায়ণ পদাঙ্কিত রত্নসিংহ, বিজয়নারায়ণ পদাঙ্কিত রঘুসিংহ, ও বীরনারায়ণ পদাঙ্কিত ভানুসিংহ। মহারাজ শিবসিংহের তিন মহিষী ছিল, পদ্মাবতী দেবী, লখিমা দেবী ও বিশ্বাস দেবী; রাজার মৃত্যুর পরে ইঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কথা আছে। অনন্তর নরসিংহদেব রাজা হন; তাঁহার পরে তৎপুত্র হৃদয়-নারায়ণ পদাঙ্কিত ধীরসিংহ ও হরিনারায়ণ পদাঙ্কিত ভৈরবসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর রূপনারায়ণের রাজত্ব। এই সকল বৃত্তান্ত মিথিলার পঞ্জী প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত; এবং এতদ্দারা রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও শিবসিংহ নামক বিদ্যাপতির তিনজন মিত্রের ও লখিমা দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। রূপনারায়ণ নামটী অনেক স্থলেই শিবসিংহের বিশেষণ; কিন্তু কোন কোন স্থলে ভিন্ন ব্যক্তির নাম বলিয়া বোধ হয়।

আমরা বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষা পাই নাই। কিন্তু মিথিলায় আমরা উক্ত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার উপসংহারে যে কয়েকটী শ্লোক আছে, বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষায় তাহার অনুবাদ নাই। এখানে সে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইল;—

ভুক্ত্বা রাজ্যসুখং বিজিত্য হরিতো হত্বারিপূন্ সংগরে।
হুত্বাচৈব হুতাশনং মখবিধৌ ভৃত্বা ধনৈরর্থিনঃ॥
বাগ্বত্যাঃ ভবসিংহদেব নৃপতিস্ত্যক্ত্বা শিবাগ্রে বপুঃ।
পূতো যস্য পিতামহঃ স্বরগমদ্দারদ্বয়ালঙ্কৃতঃ ॥
সংকুরীপুর সরোবর কর্ত্তা হেমহস্তী রথ দান বিদগ্ধঃ।
ভাতি যস্য জনকো রণজেতা দেব সিংহনৃপতির্গুণরাশিঃ॥
যো গৌড়েশ্বর গর্জ্জনে খররণে ক্ষৌণীষু লব্ধা যশঃ।
দিক্কান্তাচয়কুন্তলেষু নয়তে কুন্দস্য দামাস্পদম্॥
তস্য শ্রীশিবসিংহ নৃপতের্বিজ্ঞপ্রিয়স্যাজ্ঞয়া।
গ্রন্থং (অস্পষ্ট) নীতি বিষয়ে বিদ্যাপতির্ব্যাতনোৎ॥

অর্থাৎ "রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া, দশদিক্ জয় করিয়া, যুদ্ধে রিপুদিগকে নিহত করিয়া, যজ্ঞ বিধিমতে অগ্নিতে হোম করিয়া, ধনদ্বারা অর্থীদিগকে তুষ্ট করিয়া, যাঁহার পিতামহ ভবসিংহ দেব নৃপতি বাগ্বতী নদীতীরে মহাদেবের অগ্রে শরীর পরিত্যাগ করিয়া পূত ও দারদ্বয় ভূষিত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; সংকুরীপুরের সরোবর কর্ত্তা হেমহস্তীরথদান তৎপর রণজয়ী গুণরাশি দেবসিংহ নৃপতি যাঁহার জনক ছিলেন; যিনি গৌড়পতির সহিত সংগ্রাম করিয়া যশোলাভদ্বারা দিক্ কান্তাচয়ের কুন্তলে কুন্দদাম দিয়াছেন; সেই বিজ্ঞপ্রিয় শিবসিংহ নৃপতির আজ্ঞায় নীতি বিষয়ক গ্রন্থ বিদ্যাপতি রচনা করিলেন।"

মৈথিল পদাবলী ও সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষা ব্যতীত বিদ্যাপতি-রচিত অনেকগুলি সংস্কৃতগ্রন্থ মিথিলায় প্রচলিত আছে; যথা "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী", "দানবাক্যাবলী", "বিবাদসার," "গয়াপত্তন" ইত্যাদি। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর প্রারম্ভ এই প্রকার :—

"অভিবাঞ্ছিত সিদ্ধর্থং বন্দিতো যঃ সুরৈরপি।
সর্ব্ববিঘ্নচ্ছিদে তস্মৈ গণাধিপতয়ে নমঃ।।১।
ভক্ত্যানম্রসুরেন্দ্রমৌলি মুকুট প্রাগ্ভারতারস্ফুরণ্
মাণিক্যদ্যুতিপুঞ্জরঞ্জিত পদদ্বন্দারবিন্দশ্রিয়ঃ।
দেব্যাস্তৎক্ষণ দৈত্যদর্পদলনা সচ্চিৎ প্রহৃষ্টামর
স্বারাজ্যপ্রতিভূতবিষ্ণুকরণা গম্ভীরদৃক্পাতু বঃ ॥২।
অস্তি শ্রীনরসিংহদেব মিথিলা ভূমণ্ডলাখণ্ডলো
ভূভৃন্মৌলি কিরীট রত্ননিকর প্রত্যর্চ্চিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়ঃ।
আপূর্ব্বাপরদক্ষিণোত্তরগিরি প্রাপ্তার্থি বাঞ্ছাধিক
স্বর্ণক্ষৌণিমণি প্রদান বিজিত শ্রীকর্ণকল্পদ্রুমঃ ॥৩।
বিশ্বখ্যাতনয়স্তদীয়তনয়ঃ প্রৌঢ়প্রতাপোদয়ঃ।
সংগ্রামাঙ্গণলব্ধবৈরিবিজয়ঃ কীর্ত্ত্যাপ্তলোকত্রয়ঃ।
মর্য্যাদানিলয়ঃ প্রকামনিলয়ঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষাশ্রয়ঃ
শ্রীমদ্ভূপতি ধীরসিংহ বিজয়ী রাজত্যমোঘক্রিয়ঃ ॥ ৪।
শৌর্য্যাবর্জ্জিত পঞ্চগৌড় ধরণীনাথোপনম্রীকৃতা
নেকোত্তুঙ্গতরঙ্গ সঙ্গিতসিতচ্ছত্রাভিরামোদয়ঃ।
শ্রীমদ্ভৈরব সিংহদেব নৃপতির্যস্যানুজন্মাজয়
ত্যাচন্দ্রার্কমখণ্ডকীর্ত্তিসহিতঃ শ্রীরূপনারায়ণঃ ॥৫।
দেবীভক্তি পরায়ণঃ শ্রুতিমুখ প্রারব্ধপারায়ণঃ
সংগ্রামে রিপুরাজ কংসদলন প্রত্যক্ষ নারায়ণঃ।
বিশ্বেষাংহিত কাম্যয়া নৃপবরোঽনুজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিং
শ্রীদুর্গোৎসব পদ্ধতিংস তনুতে দৃষ্ট্বানিবন্ধ স্থিতিম্ ॥৬।

এই কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিয়া জানা যায় যে, রাজা নরসিংহদেবের রাজত্ব কালে রাজকুমার রূপনারায়ণের আদেশে বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচনা করেন। ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ ও রূপনারায়ণ নামক নরসিংহদেবের পুত্রত্রয় উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; রূপনারায়ণ কংস নামক কোন রাজাকে পরাজয় করেন; এবং ভৈরবসিংহ গৌড়ের রাজার সহিত যুদ্ধে জয়ী হন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শিবসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি তাঁহার নিকটে ভূমিদান-পত্র প্রাপ্ত হন। দানপ্রাপ্তিকালে কবি খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের ন্যূন হইবার সম্ভাবনা নহে। অতএব শিবসিংহের সিংহাসনাধিরোহণকালে বিদ্যাপতির বয়স অন্যূন ৬৬ বৎসর, এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় নহে। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী পাঠ করিয়া জানা যায় যে, রাজা নরসিংহদেবের রাজত্ব সময়েও কবি বর্ত্তমান ছিলেন। পঞ্জীপ্রবন্ধানুসারে মহারাজ শিবসিংহের রাজত্বকাল ৩।৷৹ বৎসর, তৎপরে মহারাণী পদ্মাবতী ১।৷৹ বৎসর, লখিমা দেবী ৯ বৎসর ও বিশ্বাস দেবী ১২ বৎসর রাজত্ব করেন; তদন্তর নরসিংহদেব রাজা হন। সুতরাং নরসিংহদেবের রাজত্বারম্ভ সময়ে বিদ্যাপতির বয়স প্রায় ৯২ বৎসর হইবার কথা। অতএব অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কবি অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা সারা জীবন বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকে দীর্ঘায়ুঃ হইতেন। সেদিন কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি প্রায় শত বর্ষ বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি সতেজ ছিল।

পুরুষপরীক্ষা শিবসিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৩৬৯ হইতে ১৩৭৩ শকাব্দ মধ্যে লিখিত। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রাজা নরসিংহের সময়ে রচিত। নরসিংহদেব ১৩৯৫ শকে সিংহাসনারোহণ করিয়া ৬ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। সুতরাং দুর্গা-ভক্তিতরঙ্গিণী ১৩৯৫ হইতে ১৪০১ শকাব্দ মধ্যে প্রকাশিত। কিন্তু গ্রন্থখানি অল্প-দিন মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্বমধ্যে দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণীর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"অতএব দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীকৃত্য মহার্ণবধৃতেন দেবীপুরাণেন পশুঘাত বলিদানয়োঃ পৃথক্ ফলমভিহিতং। যথা,—

দেবীংধ্যাত্বা পুজয়িত্বা অর্দ্ধরাত্রেঽষ্টমীষুচ।
ঘাতয়ন্তি পশূন্ ভক্ত্যা তে ভবন্তি মহাবলাঃ॥
বলিং যে চ প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বভূত বিনাশনং।
তেষাম্ভ তুষ্যতে দেবী যাবৎ কল্পন্ত শাঙ্করং॥

দুর্গোৎসবতত্ত্ব।

জ্যোতিস্তত্ত্বে "একাক্ষীন্দ্র শকাব্দকে" পদের প্রয়োগ দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, উক্ত তত্ত্ব ১৪২১ শকে লিখিত। দুর্গোৎসবতত্ত্ব যদিই বা পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী যে অল্পকাল মধ্যেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ হইতেছে।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমাদিগের প্রায় বক্তব্য শেষ হইল। তিনি যে মৈথিল কবি, তদ্বিষয়ের প্রমাণার্থে আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি, এস্থলে তাহার সারসংগ্রহ করা যাইতেছে। (১) মৈথিল ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে এবং ঐ সকল গীতের ভণিতায় রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লখিমা দেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (২) মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। (৩) রাজা শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লখিমা দেবী তাঁহার মহিষী ছিলেন, ইহা পঞ্জীগ্রন্থ ও জনপ্রবাদ দ্বারা নির্ণীত হয়। (৪) বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতা ও তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে মিথিলায় আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা দেশে নাই। (৫) বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকটে বীসপী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন ; দানপত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে ; এবং উহার বলে কবির উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রাম ভোগ-দখল করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। (৬) বিদ্যাপতির হস্ত-লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত অদ্যাপি তদ্বংশীয়দিগের নিকটে মিথিলায় দেখা যায়। (৭) রাজা শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া মিথিলায় আছেন। (৮) বিদ্যাপতি-লিখিত পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী এবং অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুস্তক মিথিলায় প্রচলিত দেখা যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। (৯) এই সকল পুস্তকে তাৎকালিক রাজাদিগের যেরূপ পরিচয় আছে, পঞ্জীগ্রন্থে মিথিলার রাজাদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। (১০) বিদ্যাপতি-রচিত মৈথিল গীতের সহিত বঙ্গদেশে প্রচলিত তদীয় গীতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় ; অঙ্গণাগণের স্নানবিষয়ক উদ্ধৃত গীতদ্বয়ের তুলনা করিয়া দেখিলেই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। এ সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ বিদ্যাপতিকে মৈথিল কবি বলিতে না চাহেন, তাঁহার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

কিন্তু বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাঁহাকে বাঙ্গালি বলা অন্যায় নহে। বল্লালসেন বাঙ্গালাদেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন ; তন্মধ্যে মিথিলা একভাগ। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের অব্দ বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় প্রচলিত ছিল,এখনও মিথিলায় প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণসেন বিজয়ী বাঙ্গালি রাজা হইলেও,বাঙ্গালিরা লক্ষ্মণ সংবৎ ভুলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু মৈথিল পণ্ডিতেরা তাহা ভুলেন নাই। বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু রাজ্যস্মারক লক্ষ্মণসংবৎ বল্লালের বাঙ্গালার যে বিভাগে অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে বিভাগকে বাঙ্গালার অংশ ও তন্নিবাসীদিগকে বাঙ্গালি বলিতে কেন

সঙ্কুচিত হইব ? এতদ্ব্যতিরিক্ত, বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালি হৃদয়। তিনি যে রসের রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালি জয়দেবের নিকটে পাইয়াছিলেন এবং সে রস পরে চৈতন্যদেব ও তদ্ভক্তদিগের সময়ে মূর্ত্তিমান্ হইয়া বাঙ্গালা প্লাবিত করিয়াছিল। সুতরাং বিদ্যাপতির কবিতাকুসুম সাদরে বঙ্গকাব্যোদ্যানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

মিথিলা অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যাচর্চ্চার একটী প্রধান স্থান। এখানেই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া রাজর্ষি জনকের নিকটে উপস্থিত হন। এখানেই ন্যায়মত প্রবর্ত্তক গৌতমের আশ্রম ছিল। এখানেই সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক টীকাকার পক্ষিলস্বামী প্রাদুর্ভূত হন। এখান হইতেই ন্যায় শিক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে চৌপাঠী সংস্থাপন করেন এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতিভা প্রদীপ্ত করেন; আর এখানে আসিয়া পক্ষধর মিশ্রকে পরাভূত করিয়া শারদ চন্দ্রিকা-বিনিন্দিত নির্ম্মলবুদ্ধি শিরোমণি ন্যায় বিষয়ে নবদ্বীপকে ভারত-শিরোমণি করেন। সুতরাং কেবল বিদ্যাপতির সরস কবিতা নহে, আরও অনেক কারণে বাঙ্গালা মিথিলার নিকটে ঋণী।

উপসংহারকালে আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমান মৈথিল রাজবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধারী সিংহ মহাশয়ের নিকটে বিদ্যাপতির জীবন-চরিত সংগ্রহ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার সহায়তা ব্যতিরেকে কবির বিষয়ে অনেক কথা জানা দুঃসাধ্য হইত।

(রূপক)

হিমালয়ের কোন নিরালয় প্রদেশে একজন তেজস্বী তপস্বী বাস করিতেন, সেই মহাপুরুষ কোথা হইতে আসিয়াছিলেন এবং তিনি কতকালই বা এ নির্জ্জন বিজনস্থানে বাস করিতেছেন, এই সকল বিষয় কেহই বিশেষ জানিত না। কেহ কেহ বলিত যে তাঁহার বয়ঃক্রম শতবৎসরের বড় অধিক হইবে না। কেহ কেহ বলিত যে সৃষ্টির সমকালেই তিনি জন্মপরিগ্রহ করেন। কেহ বলিত যে তিনি ত্রেতাযুগে অযোধ্যাধিপতি যোধপ্রধান অশেষ যশোধাম শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন এবং দ্বাপরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের উপরোধে দুর্দ্ধর্ষ দুর্ব্বাসা সহকারে যুধিষ্ঠির কুটীরে অতিথি হয়েন।

এইরূপে নানা জনে নানা কথা কহিত। দিগ্‌দিগন্তর হইতে মানবগণ তদীয় পাদযুগ পূজনার্থ আগমন করিত এবং জীবনমরণ সম্বন্ধে সতত তদীয় উপদেশ গ্রহণ করিত। রাজনীতি এবং দণ্ডনীতি বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণার্থ দূরদেশ হইতে নরপালগণ আগমন করিতেন, জ্ঞানীরাও পরমার্থ বিষয়ে এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ প্রার্থনা করিতেন। মহর্ষি সকলকে সাদর সদুত্তর প্রদান করিতেন; তদীয় অতীব গভীর নীতিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশকলাপ সংসারস্থ জনগণ-হৃদয়ে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান থাকিত।

একদা বাসন্তীয় প্রভাত সময়ে যখন নবোদিত দিনকর স্বীয় কর দ্বারা হিমাকরের তুঙ্গ-তুহিন-শিখর-নিকর পাতিত করিতেছিলেন, যৎকালে সুশীতল পরিমলসঙ্কুল নির্ম্মল মলয়ানিল হিমালয় নিলয়ে মন্দ মন্দ বিচরণ করিতেছিল, যখন বিমানবিহারী বিহঙ্গমবর্গের বিনোদ কলরবে তপোবন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, যখন পার্ব্বতীয় বন্যকুসুম-সৌরভ দিগ্বিদিক পরিব্যাপ্ত হইতেছিল,—তখন যোগিরাজ এক পবিত্র লতামণ্ডপ মধ্যবর্ত্তী শিলাতলে উপবেশন করত একমনে মুদ্রিতনয়নে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছিলেন। তৎকালে তদীয় শুভ্র মূর্ত্তি, গম্ভীরাকৃতি, এবং

অচল প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিলে বোধ হইত যেন স্বয়ং ভগবান্ ভবানীপতি ভবদেব কৈলাস ভূধরে মহাযোগে মগ্ন আছেন।

এদিকে ক্রমে ক্রমে কতিপয় যাত্রী নানা জনপদ হইতে সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত ভক্তিভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। ক্ষণকাল পরে মহর্ষি নয়নোন্মীলন করিলেন, এবং সকলকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন—"বৎসগণ! তোমাদের স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন কর, আমি অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ করিতেছি।"

অনন্তর প্রথমতঃ এক কামিনী মুনি-চরণে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,—"মহর্ষে! মদীয় স্বামী বহুদূরস্থিত কতিপয় দ্বীপপুঞ্জের নৃপতি। তদীয় প্রগাঢ় প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া আমিই তাঁহাকে মদীয় পিতৃসিংহাসনে স্থানদান করিয়াছিলাম; বহু দিবসাবধি আমি তাঁহার একান্ত প্রণয়িনী ছিলাম, কিন্তু দেখুন কি আক্ষেপের বিষয়, তিনি আর আমাকে প্রণয়নয়নে নিরীক্ষণ করেন না; অধিক কি কহিব, তিনি আমাকে সামান্য মহিলার ন্যায় অবহেলা করেন; অতএব প্রভো! কি উপায় অবলম্বনে তাঁহার প্রণয় আমি পুনরুদ্দীপন করিতে পারি, এ বিষয়ে আপনি সৎপরামর্শ প্রদান করুন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্যক্ শিষ্টাচারসহকারে মুনিবর সন্নিধানে এইপ্রকারে আবেদন করিল,—"ঋষিরাজ! যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়কুলে এ অভাগার জন্মপরিগ্রহ হইয়াছে। এক অসাধারণ রূপলাবণ্যশালিনী কামিনীর প্রণয়ে আমি মুগ্ধ হওয়াতে সে কিছুকাল পরে আমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহার সেই আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া তদীয় প্রণয়লাভার্থ বহুল তুমুলবিঘ্নসঙ্কুল রণস্থলে বিজয়লাভপূর্ব্বক স্বীয় যশোরশ্মিতে পৃথিবীতল প্রদীপ্ত করিয়াছি। কিন্তু হায়! অদ্যাপি আমি তদীয় প্রণয়রত্ন সম্পূর্ণ লাভ করণে কৃতকার্য্য হই নাই; এক্ষণে সেই কামিনী মৎপ্রতি অনুরাগিণী নহে।"

এইরূপে ক্ষত্রিয়নন্দন আত্মবেদন ঋষিসমক্ষে নিবেদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিল,—"তাপসবর, মদীয় বিবরণ আদ্যোপান্ত আকর্ণন করিলেন, এক্ষণে কি প্রকারে আমি তাহার হৃদয়ে প্রণয়াগ্নি পুনঃ প্রজ্বালন করি এ বিষয়ে আমাকে সুপরামর্শ প্রদান করুন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তির বিজ্ঞাপন সমাপ্ত হইবামাত্র তৃতীয় ব্যক্তি অতিমাত্র ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন,—"আমি বিপুল সম্পত্তির অধিপতি, এক্ষণে ভ্রাতৃপ্রণয় অপনয় শোকে একান্ত প্রপীড়িত। আমি আমার একমাত্র সহোদরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম, সমুদায় ঐশ্বর্য্য রাজকার্য্য তাহার সহিত সমানাংশে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলাম, অধিক কি কহিব, আমি সংসারস্থ যাবতীয় সুখ তদীয়

সুখান্বেষণে বিসর্জ্জন করিয়াছি; কিন্তু আমার অদৃষ্টগুণে সে আমার পূর্ণ প্রীতি প্রতিশোধ প্রদানে একান্ত পরাঙ্মুখ, ঋষিরাজ! ভ্রাতৃপ্রীতি প্রাপণার্থ আমি এক্ষণে কি করি?"

অনন্তর চতুর্থ যাত্রী নিবেদন করিল,—"মুনিকুলতিলক, আমি স্বয়ং একজন কবি, মদীয় প্রণয় জনৈক মানবে পর্য্যবসিত হয় নাই। যাবতীয় বিজ্ঞ এবং সাধুরাই আমার প্রণয়পাত্র এবং সেই সকলের চিত্ত বিনোদনার্থ আমি আমার হৃদয়ের গূঢ়ভাব সংগীতাবলীতে নিবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু ইহা কি সামান্য খেদের বিষয় যে, আমি যাঁহাদের জন্য ঈদৃশ বিষদৃশ যত্নশীল তাঁহারা আমার বিষয়ে একবার জিজ্ঞাসা করেন না। মহর্ষে, এক্ষণে তাঁহাদের নিদ্রিত প্রণয় জাগরিত করণার্থ কি কর্ত্তব্য, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিউন।"

অনন্তর এক সৌম্যমূর্ত্তি ধীরপ্রকৃতি পুরুষ ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিজ্ঞাপন করিল, "আর্য্য, আমি একজন বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসু বিদ্যাপথের পথিক। গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রাদি পরিপূরিত নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে সমস্ত নিয়ম কৌশল নির্ণয় করিয়াছি, পৃথিবীর অন্তরস্থ অন্ত্র উদ্ভেদ করিয়া যে সমস্ত মহামূল্য পদার্থপুঞ্জের অস্তিত্ব অবধারিত করিয়াছি, তরুলতা ওষধিপুঞ্জের পরীক্ষানন্তর যে সমস্ত উত্তমোত্তম ঔষধরাশি গবেষিত করিয়াছি, সে সমুদায়ই আমি যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, কিন্তু কৃতঘ্ন মানবগণ আমার কথা কর্ণকুহরে স্থান দান করে না,—ফলতঃ তাহারা আমাকে অবহেলা করে, সাধারণ প্রণয় আহরণার্থ এক্ষণে কি কর্ত্তব্য?"

অনন্তর এক অবলা অগ্রসর হইয়া বিজ্ঞাপন করিল,—"পিতঃ! আমার কিঞ্চিন্মাত্রও মাহাত্ম্য, জ্ঞান, ধন, ঐশ্বর্য্য বা সৌন্দর্য্য নাই; আমি এক সামান্যা, সুদীনা, সহায়হীনা, সরলপ্রাণা কুমারী মাত্র হইয়াও, কি ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান্, কি হীনবল অজ্ঞান, আমি সকলের প্রতি সমভাবে সম্যক্ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকি। তাহাদিগকে বিপন্ন দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, বলিতে কি, আমি তাহাদের মঙ্গল চেষ্টায় আমার জীবন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনেও পরাঙ্মুখ নহি। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় তাহাদের মৎপ্রতি অণুমাত্রও অনুরাগ বা স্নেহ নাই এবং সেই জন্যই আমি আমার অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিতে পারি না, অতএব হে তাপসশ্রেষ্ঠ! এ অধীনীর প্রতি কৃপাবিতরণ পূর্ব্বক কি প্রকারে এ অবলা তাহাদের প্রণয়পাত্রী হইতে পারে তদ্বিষয়ে আপনি সৎপরামর্শ প্রদান করুন।"

অনন্তর এক শান্তশীলা যোষিৎ অগ্রসর হওত ক্ষিতিন্যস্তজানু হইয়া ধীর বিনয় বচনে একান্ত মনে আবেদন করিল,—"হে ঋষিপ্রবর! মদীয় শোক-অম্বুধির অবধি নাই। আমি একজন সামান্য মহিলা এবং একমাত্র সন্তানের জননী।

পুত্রমুখ দর্শনাবধি আমার অপত্যস্নেহ অতি প্রবল। সত্য বটে আমি আমার অন্ধধন সেই নন্দনকে রাজসিংহাসন, কি মান সম্ভ্রম, কি ভূমি সম্পত্তি, কি বিপুল জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করিতে পারি নাই, কিন্তু আমার হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটনপূর্ব্বক অমূল্যরত্নস্বরূপ মাতৃস্নেহ প্রদান করিয়াছি, হায় ঋষিরাজ, কি ক্ষোভের বিষয় দেখুন, তথাপিও তাহার হৃদয়ে মাতৃভক্তির লেশমাত্রের উদয় হয় নাই। এক্ষণে কি প্রকারে তাহার অন্তঃকরণে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহা মহাশয় বলিয়া দিউন।"

এইরূপে স্বীয় স্বীয় আবেদন সমাপনান্তে এই সপ্তসংখ্যক অভিযোজক যথাস্থানে নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। মহর্ষিও ক্ষণকাল গম্ভীর তুষ্ণীম্ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

তাহাদের এতৎসমস্ত বিনয় বিজ্ঞাপন বচনবিন্যাসে বেলা অধিক হইয়া উঠিল। দিনমণি শীতশীর্ণ অচলবাসীদিগের উপর হিমানির দুঃসহ প্রপীড়ন নিবারণ মানসে যেন স্বীয় প্রখরতর কর বিকীরণ কারণে তাহাদিগের শিরোপরি ক্রমে ক্রমে সমাগত হইলেন। শৈত্য এবং অন্ধকার উভয়ে এক শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বন্ধুত্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একত্রে নিভৃত গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। সকলে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সহসা অচল গুহাটি আলোকময় হইল। বোধ হইল যেন একটি অগ্নিময় কুজ্ঝটিকায় উহার অন্তর্দ্দেশ পরিপূরিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! সকলে এই কুজ্ঝটিকা মধ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে বোধ হইল যেন আকাশপথে অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন এক যুবা পুরুষ নবীন নীরদে পৃষ্ঠভার অর্পণ করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে; তপোধন ক্ষণকাল ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অবলোকন করত অভিযোজকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"দেখ, প্রণয় কি ঘোরতর সুষুপ্তিতে অভিভূত রহিয়াছে। এ মহীমণ্ডলে তদীয় নিদ্রাভঙ্গ করণে কাহারও ক্ষমতা নাই।" এই বাক্য বলিবা মাত্র সম্মুখস্থ ধূমাবলীর অভ্যন্তর হইতে কতিপয় সুন্দর মূর্ত্তি বহির্গত হইয়া প্রণয়ের শয্যা সন্নিকর্ষে সমাগমন পূর্ব্বক কেহ বা চুম্বন প্রদানদ্বারা, কেহ বা অশ্রুবারি বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে জাগরিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ বা অন্তরে দুঃখরাশি থাকিতেও কৃত্রিম হর্ষ প্রকাশ করিতে করিতে, কেহ বা মনঃপীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া হস্তঘর্ষণ করিতে করিতে, কেহ বা ক্ষিতিন্যস্তজানু হইয়া, কেহ বা রাজ্যসিংহাসন, কেহ সুপ্রচুর স্বর্ণ ও হীরকাবলী, কেহ সম্ভ্রমপতাকা, কেহ যশোমালা প্রদানানন্তর কাতর স্বরে কহিতে লাগিল,—"হে প্রণয়! আর কতকাল নিদ্রা যাইবে? শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর।" প্রণয় তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, এবং তাহাদের প্রদত্ত ধনে, সস্নেহ চুম্বনে এবং অশ্রুজীবনে কিছুমাত্র উদ্বুদ্ধ না হইয়া অগাধে নিদ্রা যাইতে

লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত মূর্ত্তি যাত্রিগণের নয়নপথ হইতে অপসারিত হইয়া গেল। অবিলম্বে জনৈক পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণকলেবর পুরুষ, সৎকারোপযোগী বসনে বসান, ধূমগর্ভ হইতে বহির্গত হইলেন। নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রণয়ের পালঙ্ক-পার্শ্বে সমাগত হইলেন। ঘোর ঘনঘটায় ধরণী অঙ্গে যেরূপ কালিমা পড়ে, তাঁহার আগমনে প্রণয়ের স্বর্ণকান্তি সেইরূপ বিকৃতভাব ধারণ করিল। চীৎকার করিয়া প্রণয় উঠিয়া বসিলেন, এবং যাহারা তদীয় নিদ্রাভঞ্জনার্থ এতকাল বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদিগকে হৃদয়ে গ্রহণার্থ করপ্রসারণ করিলেন। কিন্তু তাহারা যে পথে গিয়াছে সে পথ হইতে কেহ কখন ফিরে নাই; কেহই আসিল না। তখন উদ্বুদ্ধ প্রণয় রোদন করিতে লাগিলেন।

এই সময় যোগিবর যাত্রীদিগের প্রতি স্বীয় উজ্জ্বল গম্ভীর কটাক্ষ ক্ষেপণ করিলেন। ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"তোমাদিগের হৃদয়বেদনা-শান্তিসাধনার্থ আমার এই মাত্র মহৌষধ—সকলেই বুঝিতে পারিয়াছ,—**মৃত্যুচ্ছায়া স্বীয় শরীরে পতিত না হইলে নিদ্রিত প্রণয় উদ্বুদ্ধ হয় না।"**

চতুর্থ বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শিল্প বাণিজ্য ও ব্যবসায় এই সময়ে কাহার কাহার হাত দিয়া সম্পন্ন হইত তাহা বিবেচ্য। রামায়ণের বহুস্থানে বহুবিধ ব্যবসায়ী ও শিল্পীর নাম উল্লেখ আছে, সেই সকল এই সংকীর্ণ স্থানে উদ্ধৃত হইতে পারে না। তবে এক স্থলে যথায় বহুতর শিল্পী ও ব্যবসায়ীর নাম একত্রে আছে, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োশিতিতম সর্গে ভরত যৎকালে রামের অনুসরণে সসৈন্যে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন, তৎকালে নিম্নলিখিত শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিল।—

"মণিকারাশ্চ যে কেচিৎ কুম্ভকারাশ্চ শোভনাঃ।
সূত্রকর্ম্মবিশেষজ্ঞা যে চ শস্ত্রোপজীবিনঃ ॥১২
মায়ূরকাঃ ক্রাকচিকা বেধকা রোচকাস্তথা।
দন্তকারাঃ সুপকারা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ ॥১৩
সুবর্ণকারাঃ প্রখ্যাতাস্তথা কম্বলকারকাঃ।
স্নাপকোষোদকা বৈদ্যা ধূপিকা শৌণ্ডিকাস্তথাঃ ॥ ১৪
রজকাস্তুন্নবায়াশ্চ গ্রামঘোষ মহত্তরাঃ।
শৈলুষাশ্চ সহ স্ত্রীভির্যান্তি কৈবর্ত্তকাস্তথা ॥" ১৫

মণিকার, সূত্রকর্ম্মবিশেষজ্ঞ (তন্তুবায় রামানুজ), কুম্ভকার, শস্ত্রোপজীবী (শস্ত্র নির্ম্মাণোপজীবিনঃ—রা), মায়ূরক (ময়ূর পিচ্ছৈঃ ছত্রাদিব্যঞ্জনকারিণঃ—রা), ক্রাকচিক (করপত্রং তেন জীবন্তি তে ক্রাকচিকাঃ—রা, করাতি), বেধকা (মণিমুক্তাদিবেধকর্ত্তারঃ—রা), দন্তকারঃ (গজদন্তাদিভিঃ সমুদ্রকাদিকর্ত্তারঃ—রা), গন্ধোপজীবী (গন্ধ দ্রব্য বিক্রয়িকাঃ—রা), সুবর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য, ধূপক (ধূপবিক্রিয়য়া জীবিনঃ—রা), শৌণ্ডিক, রজক, তুন্নবায় (সূচ্যা সীবনকর্ত্তারঃ—রা,

দর্জি), সুধাকার (যে চূর্ণ লেপন করে), শৈলূষাশ্চ সহ স্ত্রীভিঃ (বাইজি এবং ভেড়ো), কৈবর্ত্ত।

এই উদ্ধৃত অংশ দ্বারা একবারে তিনটি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ শিল্পকার্য্য ও ব্যবসায় বহুবিধ সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায় এবং লাভের আকরস্থান রাজধানী অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া, যখন লাভের সর্ব্বপ্রকার আশার ধ্বংসস্থল চিত্রকূটের জঙ্গলে রাজাজ্ঞায় শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা গমনে বাধ্য হইয়াছে, তখন ইহা অনুমেয় যে, ব্যবসায়ী ও শিল্পীদিগের কার্য্যপথে স্বাধীনতা-স্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইত না। সুতরাং তদ্রূপ বাধাজনিত তদ্বিষয়ের অনুগামী যে অমঙ্গল ও মান্দ্যতা, তাহাও অবশ্য ঘটিত। এই সকল শিল্পী, ব্যবসায়ী ও বণিকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুগামী, বা অনুগমনে বেতনভোগী হইলে একথা খাটিত না, কিন্তু ভরতের আজ্ঞা হইল যে, সেই সেই বণিক্ অনুগমন করিবে।

"যে চ তত্রাপরে সর্ব্বে সম্মতা যে চ নৈগমাঃ।"

—"তত্র নগরে সম্মতাঃ প্রসিদ্ধাঃ নৈগমা বণিজঃ॥"—রামানুজ।

কোন্ প্রসিদ্ধ বণিক্ এ কর্ম্মভোগে সহজে যাইতে স্বীকৃত হয়, অথবা স্ব-ইচ্ছায় হইলে আবার রাজাজ্ঞা কেন? পুনশ্চ রাম যৎকালে বনগমন করিতে উদ্যত হয়েন, তখন রামের রক্ষা এবং সুখার্থে দশরথ সৈন্য প্রেরণের আদেশ দিয়া কহিতেছেন, বণিকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন করুক।

"——বণিজশ্চ মহাধনাঃ।

শোভয়ন্তু কুমারস্য বাহিনীঃ সুপ্রসারিতাঃ।"

—"প্রসারিতাঃ—সুপ্রসারিতাপণাঃ।"—রামানুজ। (১১)

---

(১১) বণিক্‌দিগের উপর এরূপ বা তথাবিধ দৌরাত্ম্য প্রাচীনকালে প্রায় সকল দেশেই কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যমকালে এমন কি আধুনিককালেও কম ছিল না। সভ্যদেশ ইংলণ্ডেও এলিজিবেথের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত স্বদেশীয় বণিক্‌দিগের উপর তত না হউক, বিদেশীয় বণিকদিগের উপর অপরিমিত অত্যাচার হইত। ১৬৪০ খৃঃ অঃ রাজবিপ্লবের পর হইতেই কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় উভয় প্রকার বণিক্‌দিগের উপর অত্যাচার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া শমতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রজাদ্বারা বিনা পুরস্কারে নিয়মিতকালে রাজার ব্যাগার-খাটার কিরূপভাবে অস্তিত্ব এবং প্রচলন ছিল। রাজপথ মেরামত রাখা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ফিলিপ এবং মেরির অষ্টবিংশতি রাজঘোষে এরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে, যে রাজপথ যে পরিসরের মধ্য দিয়া গমন করিবে, সেই পরিসরস্থ লোকেরা সেই রাজপথ পরিষ্কার রাখার নিমিত্ত বৎসরে চারিদিন কাজ করিতে বাধ্য। ঐরূপ স্কট্‌লণ্ডে ১৬৬৯ খৃঃ অঃ পার্লিয়ামেণ্টেতে যে আইন হয়, তদনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরের মধ্যে ছয়দিন কার্য্য করিতে বাধ্য।

কেবল ইহা হইয়াই ক্ষান্ত নহে। মনুর বিধানানুসারে ধরিলে, প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে আবার রাজার জন্য মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া খাটিয়া দিতে হইত। মনু, সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

"কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্মং মাসি মাসি মহীপতিঃ॥"

তৃতীয়তঃ ব্যবসায়ের প্রকৃতিভেদেই অনুমিত হইতেছে যে বেদাধিকারী বৈশ্যের দ্বারা ঐ সমস্তই সম্পন্ন হইত না। ভিন্ন ভিন্ন সঙ্করজাতি দ্বারা ব্যবসায় বা শিল্প বিশেষ সম্পাদিত হইত,—এস্থলে সেই সকল সঙ্করজাতির নাম পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে। বাল্মীকির বহুপূর্ব্ব হইতে সঙ্করজাতির উৎপত্তি। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ধরিলে, বাল্মীকি ত্রেতাযুগের এবং বেণরাজা সত্যযুগের। কথিত আছে যে, সেই বেণরাজার রাজত্বকালে রাজশাসনের শিথিলতায় প্রজাবর্গ কামবশে যথেচ্ছা অভিগমন করিলে বহুবিধ সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হয়। সে যাহা হউক, পূর্ব্বে যে সকল অপেক্ষাকৃত হীনকার্য্য আর্য্যেরা স্বহস্তে বা শূদ্রের সাহায্যে করিতেন, যে দিন সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হইল, সেই দিন হইতে সেই সকল কার্য্যের ভার তাহাদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া, অন্য বিষয়ে চিত্ত পরিচালন করিতে অবসর গ্রহণ করিলেন। প্রত্যেক সঙ্করবর্ণের আভিজাত্য বিবেচনায়, তাহাদের উপর উচ্চ বা নীচ ব্যবসায় আরোপিত হইল। তাহাই হিন্দু-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ বন্দোবস্ত তত্তদ্ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ব্যতীত সুসম্পাদিত হয় নাই। বাল্মীকির সময়ে এই বিস্তৃতির আরও বিস্তার। এই নিমিত্তই বহুবিধ ব্যবসায় ও শিল্প সকল যে বৈশ্য হইতে ভিন্নতর বর্ণের হস্তে বাল্মীকির সময়ে দেখা যাইতেছে, তাহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। বৈশ্যেরা এসময়ে সাধারণতঃ সেই সকল জাতির শ্রমজাত দ্রব্য লইয়া উচ্চতম বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল, ইহাই অনুমিত হয়। এই সময়ের চিত্র এরূপ দেখা গেল, আবার আর্য্যজাতির আদিম সমাজের চিত্র দেখ। ঋগ্বেদের এক-জন কবি আত্মপরিচয় দিয়া কহিতেছেন যে, তাঁহার পিতা বৈদ্য, তিনি কবি, তাঁহার মাতা শস্যপেষণকারিণী।—

"কারুর অহম্ তাতো ভিষগ্ উপলপ্রক্ষিণীননা।" ৯-১১২-৩।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত ব্যতীত আর কোথাও জাতিবিভাগের কথার উল্লেখ নাই। তথায়ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিটি মাত্র জাতির বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। অনেকের মতে পুরুষ সূক্ত অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক। (১২) একারণে অনেকে অনুমান করেন যে, প্রাচীনতম বৈদিক সময়ে জাতিভেদ

(১২) Max Muller's Ans : Sans : lit pp. 570.

ছিল না। তাহার পর দেখা যাইতেছে যে, সেই বেদের যে সকল সূক্ত প্রাচীন বলিয়া গ্রাহ্য, সেই সকলেই তক্ষা অর্থাৎ ছুতার, বৈদ্য, কামার, পাখীমারা, রথ-নির্ম্মাণের কৌশল ও ব্যবসায় বর্ণন দৃষ্টে তাহার নির্ম্মায়ক, তন্তু এবং ওতু ও বয়ন শব্দের উল্লেখে তাঁতির কার্য্য, কৃষি, ক্ষৌরকার্য্য, রসারসি, চর্ম্ম এবং জল বা সুরাবহনার্থে মসক বা ভিস্তির ("ছতি") উল্লেখ (১৩) হেতু তত্তদ্ব্যবসায়ীর ও কার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এসকল ব্যবসায়ী বা কাহারা ও এসকল কার্য্য কাহারাই বা করিত। আর্য্যেরা মুখে বেদসূক্ত রচনা এবং হাতে সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যে যে বিষয়ের বৈষম্যতা বৈদিক সময়ে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, বাল্মীকির সময়ে তাহা অতি প্রবল।

পূর্ব্বালোচিত কৃষি, ব্যবসায় এবং শিল্পের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে, তৎকালে দেশমধ্যে অন্তর্বাণিজ্য বিশেষরূপে প্রবাহিত হইত। এস্থলে আর এক বিষয় বিবেচ্য। অন্তর্বাণিজ্যই হউক, আর বহির্বাণিজ্যই হউক, তাহার সুবিধার নিমিত্ত দেশমধ্যে আপাততঃ এই কয় বিষয়ের আবশ্যক—রাজপথ, খাল, ঋণ দানাদান এবং ব্যাঙ্ক।

রাজপথ সম্বন্ধে পূর্ব্বগত এক প্রস্তাবে যথাযথ কথিত হইয়াছে, এবং একরূপ দেখান হইয়াছে যে, রাজপথ যাহা ছিল, তাহা ভাল রূপই ছিল, কিন্তু অধিক সংখ্যক ছিল না। তাহা সে সময় বিবেচনা করিলে না থাকারই সম্ভব। ইংরাজ রাজত্বের পুর্ব্বেই বা আমাদের কত রাজপথ ছিল! যাহা হউক, রাজপথের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং রাজপথ-নির্ম্মাণদক্ষ কর্ম্মকারগণেরও অস্তিত্ব যখন অবলোকিত হয়, এবং সেই কার্য্যই তাহাদের বৃত্তিস্বরূপ দেখা যায়, তখন কি এরূপ অনুমান করায় দোষ আছে যে, যে স্থান দিয়া লোকের গতিবিধি সর্ব্বদা হইত, এবং বাণিজ্য কার্য্য নিরন্তর প্রবাহিত হইত, সেই সেই স্থানে প্রশস্ত রাজপথের অভাব ছিল না? ভরত যখন রামের অনুসরণে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন, তখন সৈন্য চলাচলের নিমিত্ত পরিসর রাজপথনির্ম্মাণ হেতু নিম্নলিখিত মত কর্ম্মকারগণ নিয়োজিত হইয়াছিল।—

"অথ ভূমিপ্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্ম্মবিশারদাঃ।
স্বকর্ম্মাভিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকাস্তথা॥
কর্ম্মান্তিকাঃ স্থপতয়ঃ পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ।
তথাবার্দ্ধকয়শ্চৈব মার্গিণো বৃক্ষতক্ষকাঃ॥

---

(১৩) Muir's Sanscrit texts vol. V. তথা হইতে ব্যবসাদারের এই তালিকা গৃহীত হইল।

সূপকারাঃ সুধাকারা বংশচর্ম্মকৃতস্তথা।
সমর্থা যে চ দ্রষ্টারঃ পুরতস্চ প্রতস্থিরে॥” ২।৮০

ভূমি প্রদেশজ্ঞ, সূত্রকর্ম্মকার (শিবিরাদি নির্ম্মাণে সূত্র গ্রহণকুশল), খনক, যন্ত্রক (জল প্রবাহাদি যন্ত্রণসমর্থ), স্থপতি (রথাদি কর্ত্তার), যন্ত্রকোবিদ (ক্ষেপণী), আদি (যন্ত্রকরণকুশল), মার্গিণ (বনমার্গ রক্ষায় নিযুক্ত), বৃক্ষতক্ষক (মার্গাবরোধক বৃক্ষছেত্তার), সূপকার, সুধাকার, বংশকার, চর্ম্মকার।

অনন্তর ইহারা ভরতের নিমিত্ত কিরূপ রাজপথ প্রস্তুত করিল, তাহার প্রক্রিয়া নিম্নে যাহা প্রদর্শিত হইল, তদ্দৃষ্টে তৎকালে পথাদি নির্ম্মাণপ্রণালী বহুলাংশে অনুমিত হইবে।—“অনন্তর সূত্রকর্ম্মপর, ভূভাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, সুদক্ষ, খনক, অবরোধক, স্থপতি, বার্দ্ধকী, সূপকার, সুধাকার, বংশকার, চর্ম্মকার, যন্ত্র-নির্ম্মাতা, কর্ম্মান্তিক ভৃত্য ও পথপরীক্ষকেরা যাত্রা করিল। বহুসংখ্যক লোক হর্ষভাবে নির্গত হইলে, পূর্ণিমার খরবেগ মহাসাগরের তরঙ্গরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পথশোধকেরা সর্ব্বাগ্রে দলবল সমভিব্যাহারে কুদ্দালাদি অস্ত্র লইয়া চলিল এবং তরুলতা গুল্ম স্থানু ও প্রস্তর সকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। যেস্থানে বৃক্ষ নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল, এবং অনেকে কুঠার টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা নানাস্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল। কোন কোন মহাবল বদ্ধমূল উশীরের গুচ্ছ উৎপাটন করিল, এবং অনেকেই উন্নত স্থানে সমতল ও গভীর গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দিল। কেহ সেতুবন্ধন, কেহ কর্কর চূর্ণ, (১৪) এবং কেহ কেহ বা জল নির্গমার্থে মৃৎ পাষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল। স্বল্পকাল

(১৪) ইহার দ্বারা নিঃসন্দেহ জানা যাইতেছে যে, রাজপথ সকল কাঁকরাদি দ্বারা পাকা (metalled) করা হইত। ইহা অবশ্যই আমাদের প্রাচীনকালের পক্ষে গৌরবের কথা। পাশ্চাত্য ভূভাগের ইতিবৃত্ত দেখিলে পাকা রাস্তার প্রথম উল্লেখ শমিরমার রাজত্বকালে দেখা যায়। তৎপরে থিবস এবং কার্থাজিনীয় নাগরিকেরা পাকা পথ প্রস্তুত আরম্ভ করিয়াছিল। রোমনগরে ৫৬০ খৃঃ পূঃ আপিয়স ক্লডিয়সের দ্বারা ইহার অনুষ্ঠান হয়। বর্ত্তমান সভ্যতম ইউরোপ ভূভাগে ৮৫০ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে নাগরিক রাস্তা সমস্ত পাকা করা হয় নাই, ঐ শকে স্পেনদেশীয় চতুর্থ খলিফা দ্বিতীয় আবদুল রহমানের আজ্ঞাক্রমে কর্ডোবানগরের রাস্তা দিয়া ইহার প্রথম আরম্ভ হয়। পারিস নগর তদভাবে এমন ধূলা ও জঞ্জালময় ছিল যে, তন্নিমিত্ত উহার পূর্ব্ব নাম লুটিটিয়া (Lutetia) পরিবর্ত্তন হইয়া পারিস হয়। তথায় ১১৮৪ খৃঃ অঃ দ্বিতীয় ফিলিপ প্রথমে পাকা রাস্তার অনুষ্ঠান করেন। লণ্ডননগরে একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহার অনুষ্ঠান হয় নাই। জর্ম্মানীতে ইহার প্রথম সূত্রপাত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এই তুলনে আমাদের পিতৃপুরুষদিগের কার্য্যশৃঙ্খলা ও উদ্ভাবনীশক্তি অবধারণ কর।

মধ্যেই সূক্ষ্ম প্রবাহসকল জলপূর্ণ ও সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়া গেল এবং যে প্রদেশে জল নাই, তথায় বেদি পরিশোভিত কূপাদি প্রস্তুত করিল।" (১৫)

মার্গিন নামক কর্ম্মচারীর অস্তিত্ব হেতু ইহাও বোধ হয় যে, রাজপথের মধ্যে আশঙ্কাযুক্ত স্থান রক্ষার নিমিত্ত, রক্ষণে যত সমর্থ হউক বা না হউক, কিন্তু নিযুক্ত হইত। আমাদেরও নিযুক্ত হওয়াটুকুই জানিবার প্রয়োজন। যে সকল রাজপথ রাজধানী বা সহরের ভিতরে, সে সকলে নিয়মিতভাবে জলসিঞ্চন হইত। এবং উৎসবকালে আলোকে আলোকিত হইত। অন্য সময়ে আলোকিত হইত না, তাহা নিম্নলিখিত কথার ভাবে বোধ হইতেছে। রামের যৎকালে রাজ্যাভিষেকের কথা হয়, তখন উৎসব হেতু, এবং রাম যদি রাত্রিকালে নগর ভ্রমণে বহির্গত হয়েন, এজন্য স্তম্ভসকল নির্ম্মাণ করিয়া পথে আলোক দিবার নিমিত্ত তাহাতে দীপাবলী সজ্জিত হইল।—

"প্রকাশীকরণার্থঞ্চ নিশাগমন শঙ্কয়া।
দীপবৃক্ষাং স্তথা চক্রুরনুরথ্যাস্থ সর্ব্বশঃ॥" (১৬) ২।৬।১৮

পথ সকল সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করা হইত। মনুসংহিতায় যে যে ব্যক্তি রাজপথে মল মূত্র ত্যাগ প্রভৃতি যে কোনরূপে পথ অপরিষ্কার করিত, তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করা হইত (মনু ৯।২৮২-২৮৩)। কিন্তু সচরাচর পথ পরিষ্কার রাখার নিমিত্ত দণ্ডবিধি দ্বারা বা অন্য কোনরূপে বাধ্য করা হয় নাই।

(১৫) অযোধ্যাকাণ্ডে ৮০ সর্গ। এস্থলে পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ গৃহীত হইল। বাহুল্যভয়ে মূলাংশ উদ্ধৃত হইল না।

(১৬) নৈমিত্তিক আলোদানের অভাব হেতু অন্যের সহ তুলনা করিলে আর্য্যগণ নিন্দনীয় হইবেন না। পুরাকালে প্রায় সর্ব্বদেশেই কেবল উৎসবাদি আনন্দ কার্য্যে মাত্র পথে আলোক প্রদানের প্রথা অবলোকিত হয়। বেক্‌মান সাহেবের কহত মত জানা যায় যে, হিরোডোটসের সাময়িক মিসরীয়েরা বাল্মীকির সময়ের ন্যায় উৎসবে মাত্র এই প্রথার অনুসরণ করিত। য়িহুদিরা Festum encoeniorum নামক পর্ব্বকালে অষ্টরাত্রি প্রতি গৃহের সম্মুখে দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিত। স্কাইলসের বাক্যানুসারে ইহা ব্যক্ত যে গ্রীকেরা উৎসবাদিতে কেবল ঐ প্রথাবলম্বী ছিল। রোমনগরে ক্যাটিলিনের ষড়যন্ত্র ভেদ হইলে কিকিরোর গৃহাগমনকালীন নগরবাসীরা আনন্দে নগর আলোকিত করিয়াছিল। ইত্যাদি। কিন্তু ধারাবাহিক রূপে পথে আলোক প্রদানের প্রথা পুরাকালে এবং খ্রীষ্টের পরেও বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত কোথাও লক্ষিত হয় না। ইহার প্রথম সৃষ্টি পারিস নগরে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ নগর দস্যুদল দ্বারা এতদূর উত্যক্ত হয় যে, অধিবাসীরা অনন্যোপায় হইয়া রাত্রি নয়টার পর হইতে সমস্ত রাত্রি নগর দীপাবলী দ্বারা আলোকিত রাখিত। এ নিমিত্ত ১৫২৪ খৃঃ অঃ রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয়, সেই আজ্ঞা সময়ে সময়ে (১৫২৬, ১৫৫৩ খৃঃ অঃ ইত্যাদি) লোকের স্মরণার্থে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়। এইরূপে নিত্য আলোকদানের প্রথা পারিস নগরে প্রথম সৃষ্টি হয়।

"পথ সংস্কার" শব্দের ভূয় উল্লেখ হেতু পথ মেরামত প্রথার বহুলতা জ্ঞাপিত হয়। এ পথসংস্কারের নিমিত্ত রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত কি না, তাহা নিরূপণ হয় না। হইতে পারে, যে সকল ব্যক্তিকে পূর্ব্বকথিত রাজনিয়ম অনুসারে মাসে মাসে রাজার জন্য কিছু কিছু করিয়া কাজ করিতে হইত, তাহাদেরই মধ্যে কার্য্যক্ষম এবং তদুপযুক্ত জাতীয় ব্যক্তি দ্বারা এই পথসংস্কার ও পূর্ব্বোক্ত পথ পরিষ্কার কার্য্য সমাধা করা হইত। (১৭)

উত্তর ভারতবর্ষ যেরূপ নদীমাতৃক দেশ তাহাতে খালের আবশ্যক ছিল না। তথাপি "কৃত্রিম সরিৎ" প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতন্নিমিত্ত যদি কোন আর্য্য-সন্তান এই বলিয়া অহঙ্কার করিতে চাহেন যে, যে খাল কাটা প্রথা ১৭৫৫ খৃঃ অঃ সাঙ্কিব্রুক খাল কাটা দিয়া ইংলণ্ডে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, আর্য্যেরা বহু প্রাচীন কালেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আপাততঃ কোন আপত্তি নাই। ব্যাঙ্কের প্রথা ছিল কি না তাহা জানি না। ছয় কাণ্ড রামায়ণে তদ্ভাবের কোন আভাষ নাই। তবে ঋণ দানাদানের প্রথা যখন ঋগ্বেদেই (১০-৩৪-১০) লক্ষিত হয়, তখন বাল্মীকির সময়ে যে ইহার বহু প্রচলন, তাহা বলা বাহুল্য। বহুলোক একত্র হইয়া ভাগে বাণিজ্য করণ প্রণালীর উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাই না। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার জন্মকালীন ইহার প্রচলন অবলোকিত হয়। যথা—

"সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্মকুর্ব্বতাং।
লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথা বাসম্বিদা কৃতৌ ॥"

ব্যবহার কাণ্ড।

(১৭) পাশ্চাত্য ভূমির অধুনিক সভ্যতাগর্ব্বিত জাতির ব্যবহারসহ এখানে তুলনা করিয়া দেখা যাউক। ফ্রান্সরাজ্যে ১৩৭২ খৃঃ অঃ এবং স্কটলণ্ডে ১৭৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গৃহস্থগণকে আপন গৃহের ময়লা গৃহের সম্মুখস্থ পথে নিক্ষেপ করিবার বাধা ছিল না। সুতরাং অপরিষ্কারকের দণ্ড ছিল না। কিন্তু যে অংশ দিয়া পথ গিয়াছে সেখানকার সকলকে আত্মব্যয়ে বা কায়িক পরিশ্রমে সেই পথ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইত। ১২৮৫ খৃঃ অঃ ফিলিপের রাজত্বকালে যে আইন জারি হয়, তদনুসারে যাহার বাড়ীর কাছ দিয়া যে পথ গিয়াছে, তাহাকে সেই পথ মেরামত করিতে হইবে। ইহাতে লোকের অমনোযোগবশতঃ ১৩৮৮ খৃঃ অঃ এই আইনসহ দণ্ডবিধি পর্য্যন্ত যোজিত হয়। ১৬০৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ফ্রেঞ্চেরা এই রাজদৌরাত্ম্যভোগ করিয়া আসিয়াছিল। বার্লিন নগরে ১৫৭১ খৃঃ অঃ এক আইন হয়, তদনুসারে, যে যে বাজার ঘাটে অধিক ধুলা মাটি জমিবে, সেই সেই বাজার ঘাটে যিনি যিনি গতায়াত করিবেন, তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে ধুলা মাটির ভার সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে হইবে। কেমন, এর তুলনায় গরিব ব্রাহ্মণদের বিধি কি রকম ?

ধনাগমের প্রধান উপায় স্বরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা বাল্মীকির সময়ে কিরূপ বিস্তৃত ও উন্নতিশালী হইয়াছিল তাহা দেখা যাউক। এখানে প্রায়ই অন্ধকারে পদক্ষেপ করিতে হইবে। বিদেশ বাণিজ্য সম্বন্ধে "বণিজো দূরগামিনঃ" ইহা বাল্মীকি কর্ত্তৃক অসংখ্য বার উক্ত হইয়াছে। দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকের সেই পরিমাণে উল্লেখ পাওয়া না যাউক, কিন্তু পাওয়া যায়।—

"উদিচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেবলাঃ।
কোট্যাপরান্তাঃ সামুদ্রা রত্নান্যুপহরন্তু তে॥" ২।৮২।৮

—উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশস্থ, দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকেরা রত্ন উপহার প্রদান করুক।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, বহুদূরগামী বাণিজ্য কেবল স্থলপথে নহে, জলপথেও আছে। জলপথে গমন কেবল বাল্মীকির সময়ে নহে, বৈদিক আমলেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (১-১১৬, ১-২৫,৭-৮৮) "নাব সামুদ্রিয়" বাক্যের উল্লেখে অবশ্যই সমুদ্রগামী জাহাজ বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু এখন কথা এই যে, এ সমুদ্র গমন আর্য্যেরা আপনারা করিতেন, না অন্যের গমনাগমন করিতে দেখিয়া গান করিতেন। তাই বা কি করিয়া বলি, মনুতে ভূয়ো ভূয়ঃ সমুদ্রগামীর কথার উল্লেখ হইয়াছে, এবং তাহাদের সম্বন্ধে নানারূপ ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আবার নারদীয়ে পর্য্যন্ত—

"——সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ।
*　　　　*
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনিষিণঃ॥"

পূর্ব্বকালীন সমুদ্রযাত্রা প্রথা সূচনা করিয়া কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং মানিতে হইবে যে প্রাচীনকালে আর্য্যেরা সমুদ্রে গমন করিতেন। কিন্তু আবার ঐ মনুতে (২।২৩-২৩) দেখ, তথায় আর্য্যবাসস্থান সম্বন্ধে শেষ নির্দ্দেশ এই করা হইয়াছে যে, কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ যেখানে যেখানে বিচরণ করে তাহাই যাজ্ঞিক দেশ, তাহাতেই আর্য্যেরা অধিবাস করিতে পারেন, অন্যত্রে কদাপি নহে। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে এ বিধান নাই, তাহারা জীবিকার্থে যথায় তথায় গমনে এবং বাসে সমর্থ। (১৮) এ কথা সম্ভবতঃ বাল্মীকির সময়েও খাটে। আবার বাল্মীকির পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনাবলী যদি ইহার কিছু মাত্র প্রতিপোষক হয়, তবে দেখা যায় যে Sarmancherja (সম্ভবতঃ শর্ম্মনাচার্য্য) নামে এক ব্রাহ্মণ

(১৮) Hero : vii 65, 86. &c. গ্রীকদেশে যুদ্ধগামী সৈন্যমধ্যে ভারতীয় পদাতি ও অশ্বারোহীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহারা কিরূপ ভারতীয় তাহা জ্ঞাত নহি, হইতে পারে ভারতস্থ পার্ব্বতীয় বা তদ্রূপ অপরাপর কোন নিকৃষ্ট জাতি হইবে।

গ্রীক ভূমে গমনান্তর, ম্লেচ্ছদেশে আগমনে আপনাকে পতিত জ্ঞানে, প্রায়চিত্তস্বরূপ আথেন্স নগরে অগ্নি প্রবেশ করেন। ঐরূপ কল্যাণ নামে আর এক ব্রাহ্মণ আলেকজাণ্ডারের সহগামী হইয়া, ঐ একই কারণ হেতু Pasargada নগরে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব ধর্ম্মভীরু ভারতে, স্বদেশ পরিত্যাগ এবং ম্লেচ্ছদেশে গমন যখন এমন দূষণীয়,তখন কিরূপে নির্ণয় করিতে পারা যায় যে,ইহারা সমুদ্রপথে পোতারোহণপূর্ব্বক অতি দূরদেশে গমনাগমন এবং বিদেশ-বাণিজ্য সম্পন্ন করিতেন। সমুদ্রযাত্রা যেন কোন মতে হইল, কিন্তু যে দেশের সহ বাণিজ্য করিতে হইবে, সে দেশে ত সম্ভবতঃ কতকগুলি লোককে আজীবন না হউক, কিছুদিন থাকিতে হইবে। সে সময়ের জলপথে গতিবিধি থাকিলেও তাহা উন্নতভাবের ছিল না, সুতরাং যাওয়া আসার সুবিধার অভাবে সে কিছুদিন, নেহাত কিছুদিন নহে—যদি এ কিছুদিনে দোষ না পড়ে, তবে কাম্বোজ প্রভৃতি প্রদেশীয় লোকেরা কেন ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল? যদি বলা যায় শূদ্রেরা যদৃচ্ছা গমনে সক্ষম, সুতরাং তাহাদের দ্বারা বিদেশ-বাণিজ্য সমাধা হইত, কিন্তু তাহা হইলে শূদ্রেরা সমাজে এত হীন ও নির্ধন হইবার কারণ কি? এই সকল কারণে বোধ হয় যে, আর্য্যেরা সমুদ্রযাত্রায় যে বাণিজ্য করিতেন, তাহা কৃষ্ণসার বিচরিত দেশমধ্যেই আবদ্ধ ছিল, অর্থাৎ ভারতেরই অধিবেশিত উপকূলভাগে এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ সহ সামুদ্রিক বাণিজ্য সমাধা হইত। এখানে বলিতে পারা যায় যে, যেন পরবর্ত্তী আর্য্যেরা স্বধর্ম্ম বিনাশ ভয়ে সহসা স্বদেশ পরিত্যাগ করিতেন না,কিন্তু বৈদিক সময়ে ত সে বাধা ছিল না; ইহা সত্য বটে, কিন্তু যে সময়ে বৈদিক আর্য্যেরা সভ্যতা পদবীতে পদার্পণ করিয়া বিলাসকলা বিস্তার করিয়াছিলেন, সে সময়ে সমস্ত মেদিনী ঘোর মূর্খতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মিসরীয় এবং ফিনিসীয় জাতীরা যদিও কিয়ৎপরিমাণে সভ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা আয়ত্তাতীত দূরবর্ত্তী ছিল। অতএব বোধ হয় বৈদিক আর্য্যদেরও জলপথ, স্থলপথে অপরিচিত ও অগম্য, কেবল জলপথে পরিচিত ও গম্য, এমন সকল ভারতস্থ দেশেই গমনাগমন হইত।

আদিমকালীয় দক্ষ সমুদ্রগামী জাতি ফিনিসীয়দিগের ভারতে গতিবিধি ছিল কি না তাহা জ্ঞাত নহি। যদি বা ছিল, তাহা না থাকারই মধ্যে, নতুবা আরব ও ভারতের মধ্যে সমুদ্র অনাবিষ্কৃতের ন্যায় থাকিত না। এবং সিন্ধুনদ হইতে মিসর পর্য্যন্ত সমুদ্রপথ আবিষ্কারার্থে সাইলাক্স দরায়ুস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইতেন না। আবার দেখা যায় যে, ১৩০ পূঃ খৃঃ টলিমি এবারগিটিসের রাজত্বকালীন এক্ষদস ভারত এবং মিসরদেশের মধ্যস্থ সমুদ্র পার হওয়াতে অলৌকিক কার্য্যসাধনের ন্যায় "ধন্য-ধন্য" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতেও এ সমুদ্র

পার হওয়া আর আশ্চর্য্যজনক ছিল না, তখন ইহা সাধারণ কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

দূরবর্ত্তী দেশ সকলের সহ বাল্মীকির সময়ের ন্যায় প্রাচীনকালে ভারতের জলপথে বাণিজ্যবহুলতা না থাকিলেও, পাশ্চাত্য ভূভাগের দূরতর দেশ পর্য্যন্ত ভারতের ধনবত্তার গৌরব ধ্বনিত হইত এবং তাৎকালিক প্রায় সকল সভ্যদেশেই এরূপ সকল বস্তু ব্যবহৃত হইত, যাহার জন্ম কেবল ভারতবর্ষ বলিলেই হয়, এবং সম্ভবতঃ কেবল ভারতবর্ষই তৎকালে তাহাদের জন্মভূমি ছিল। ইহা কিরূপে সম্ভবে। ভারতের বিদেশ গমন যথাযথ উপরে আলোচিত হইল। গ্রীক্‌দিগেরও সে প্রাচীনকালে, তদ্বিষয়ে বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। হোমরের সময়ে লিবিয়া এবং মিসর দেশ কেবল জনশ্রুতিতে পরিচিত ছিল। ইটালী এককালেই অপরিজ্ঞাত ছিল। এমন কি কৃষ্ণসাগরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ জ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ হেসিয়ডের গ্রন্থে সমুদ্রযাত্রা যেরূপ ভয়াবহ এবং জাহাজগঠন-প্রণালী যেরূপ কুৎসিত অনুমিত হয়, (১৯) তাহাতে সে সময়ে দূরদেশাদিতে কি স্থলপথে কি জলপথে গমনাগমন অতি সংকীর্ণই বলিতে হইবে। তথাপি সেই গ্রীসে এমন অনেক বস্তুর ব্যবহার তৎকালে দেখা যায় যে, যাহার জন্মস্থান কেবল ভারতবর্ষ। এস্থানে বলা উচিত যে, সেই সেই দ্রব্য ফিনিসীয় বণিক্‌দিগের দ্বারা তদ্দেশে নীত হইত। যাহা হউক ঐরূপ পুরাতন বাইবেলে জবাধ্যায় অনুসারে অফির দেশজ যে সকল দ্রব্য হিব্রুদেশে আমদানি হইত, তাহার অবস্থাগত বিবরণ দৃষ্টে পণ্ডিতবর মক্ষমূলর বিবেচনা করেন যে, সে সকল ভারতজাত দ্রব্য এবং অফির সৌবীরদেশের নামের অপভ্রংশ মাত্র। (২০) বাইবেল গ্রন্থের আর একস্থলে (২১) টায়র নগরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনে তদ্দেশে নীল, উত্তমোত্তম কার্পাস বস্ত্র, এবং নানাবিধ সূচের কাজযুক্ত পট্টবস্ত্র, পলা, মুক্তা ইত্যাদি আমদানী হইত। ইহার সকলেই যে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য এমন নহে, কিন্তু সে সমস্তই যে ভারতবর্ষস্থ বা তন্নিকটস্থ অন্যান্য পূর্ব্বদেশজাত দ্রব্য, তৎপক্ষে বোধ হয় সন্দেহ নাই, এবং সে সন্দেহ না থাকিলেই ভারতবর্ষের সঙ্গে তাৎকালিক পাশ্চাত্য বাণিজ্যের অপরিমিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। নীল বহুপূর্ব্বকাল হইতে আমেরিকায় আবিষ্কার কাল পর্য্যন্ত কেবল ভারতবর্ষ হইতেই যে আর সর্ব্বত্রে নীত হইত, তৎপক্ষে অল্পই সন্দেহ আছে, (২২) এবং বাইবেলে যে নীলের কথা আছে, তথায়ও এ বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

(১৯) Grote's Greece I. 491.

(২০) Max Muller's same of Language I 708.

(২১) Greek : xxvii.

(২২) নীল সম্বন্ধে অধ্যাপক বেক্‌মান বলেন যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে আমেরিকা উপনিবেশিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপে ব্যবহৃত সমস্ত নীল ভারতবর্ষ হইতে আমদানী হইত।

টায়র নগরে নীত অন্যান্য দ্রব্য সমূহের পক্ষে পণ্ডিতবর বিনসেণ্ট কহেন যে, এজিকিয়েল অধ্যায়ে শিল্পজাত পট্টবস্ত্র প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, যৎসম্বন্ধে তৎস্থলে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, সেই সকল বস্তু ইউফ্রেটিস নদীর তীরস্থ হারাণ,

---

এবং উত্তমাশা (Cape of Good Hope) দিয়া ভারতবর্ষের পথ পরিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে, উহা ভারতীয় অন্যান্য দ্রব্যের সহ, পারস্য উপসাগর দিয়া স্থলপথে ব্যাবিলন বা আরবদেশের মধ্য দিয়া মিসরে নীত হইত, এবং তথা হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইত। নীলের জন্মভূমি এবং বাণিজ্য বিষয়ে উক্ত অধ্যাপক বলেন, "The proper country of this production is India ; that is to say, Gudseherat or Gutscherad, and Cambaye or Cambaya, from which it seems to have been brought to Europe since the earliest periods. It is found mentioned, from time to time, in every century ; it is never spoken of as a new article, and it has always retained its old name ; which seems to be a proof that it has been used and employed in commerce without interruption. "পুনশ্চ" I shall now prove what I have already asserted that indigo was at all times used, and continued without interruption to be imported from India."—Johnston's translation of Beckmann's History of Inventions and Discoveries. Vol. II 260, 260. এখানে যত প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টীয়ের পরস্থ এবং অল্প অংশে পূর্ব্বস্থ, সে সকল প্রায়ই অকাট্য। কিন্তু প্রাচীনতম প্রমাণ যত উদ্ধৃত করা উচিত ছিল, যদিও বেক্‌মান সাহেব তাহা করেন নাই, তথাপি তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, যত দিন তাহার বিরুদ্ধে কোন অটল প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততদিন সে মত অখণ্ডনীয়, এবং পাঠক চেষ্টা করিলে ঐ মত সমর্থনে যত সফল হইবেন, খণ্ডনে তত হইবেন না। নীলের উৎপাদন প্রাচীনকালে যে ভারতের একচেটিয়া ছিল, এবং ভারত উহার উৎপত্তিস্থান সমূহের মধ্যে যে নিতান্তই প্রধান, নীলের আমদানী রপ্তানীর বর্ত্তমান সাময়িক তালিকাতেও সে কথা সমর্থন করিবে। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ মুদ্রিত Waterson's Cyclopeadia of Commerce নামক পুস্তকে সমস্ত সভ্যতম দেশের নীলের খরচ এইরূপ দেওয়া আছে।—

বৃটনদ্বীপে	১১৫০০ বাক্স
ফ্রান্স	৮০০০ ঐ
জর্ম্মানি এবং ইউরোপের অপরাপর সমস্ত দেশ	১৩৫০০ ঐ
পারস্য	৩৫০০ ঐ
ভারতবর্ষ	২৫০০ ঐ
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্	২০০০ ঐ
অন্যান্য সমস্ত দেশ	২০০০ ঐ
সমুদয়ে	৪৩৫০০ ঐ

ইহার মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষ হইতে ৩৪৫০০, এবং মান্দ্রাজ ও গোয়াটিমালা প্রভৃতি আমেরিক স্থান হইতে ৮৫০০ উৎপন্ন ও রপ্তানি হইয়া থাকে। Page 385. art : Indigo.

কামেক প্রভৃতি নগর হইতে আমদানী হইত, সেই সকল দ্রব্য বাস্তবিক সেই সকল স্থান হইতে আমদানী হইত না। ইউফ্রেটিস তীরস্থ নাগরিকেরা সে সকল দ্রব্যোৎপাদক শিল্প-কৌশল বিন্দুমাত্র অবগত ছিল না। ঐ সকল দ্রব্য যে আসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বখণ্ড হইতে আমদানী হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এবং ইহাতেও অল্প সন্দেহ আছে যে, ডিডন ও ইডুমিয়া নগর হইয়া আরব দেশের মধ্য দিয়া যে বাণিজ্য চলিত এবং পট্টবস্ত্রাদি যাহার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল, সেই বাণিজ্য-স্রোতের মূলস্থান ভারতবর্ষ। অপরঞ্চ পুরাতন বাইবেলের কোনস্থানে স্পষ্টতঃ ভারতবর্ষের নামোল্লেখ নাই। বাইবেলের জ্ঞাতসারে ইউফ্রেটিস নদীই পৃথিবীর পূর্ব্বতম দেশের সীমা এবং তদ্রূপ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ বাইবেলেই আবার পূর্ব্বদেশজাত শিল্প দ্রব্যাদি পাশ্চাত্য ভূভাগে নীতার্থে, বহুপূর্ব্বকাল হইতে স্থাপিত বণিক্‌দিগের গতায়াতের পথের উল্লেখ আছে। (২৩) আমি বিবেচনা করি যে, এই পথ নিঃসন্দেহই বহুপুর্ব্বতর দেশে প্রধাবিত এবং ইহার সঙ্গে ভারত-বর্ষীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধ বাল্মীকির বহুপূর্ব্ব হইতে স্থাপিত ও পরেও প্রচলিত, অতএব ইহা বাল্মীকির সময়ের উপরেও বর্ত্তে।

প্রাচীন কালীয় স্থলীয় বাণিজ্য-কার্য্য আলোচনায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে,দূর ব্যাবধানস্থিত তুই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইতেছে বটে, অথচ উভয় দেশের লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য করে না, এবং হয়ত কেহ কাহাকে চিনেও না, অথবা একে অপরের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। ব্যবধানের মধ্যস্থিত জাতি সমূহের দ্বারা হস্ত হইতে হস্তান্তরে ব্যবসার দ্রব্য নীত হইয়া দেশবিদেশে বিকীর্ণ হইত। এরূপ হওয়ার কারণ সহজেই উপলব্ধ হইবে। বোধ হয় ইহাও এক প্রধান কারণ যন্নিমিত্ত প্রাচীন কালে হিব্রু বা গ্রীক্‌ভূমে যদিও ভারতীয় দ্রব্যের বিস্তার দেখা যাইতেছে, কিন্তু ভারতীয় লোকের দেখা নাই, ঐরূপ আবার ভারতেও তাহাদের নাম কেহ শুনিয়াছে কেহ বা শুনে নাই। ভারতের প্রতিবেশী পহ্লব বা পারস্যবাসীদিগের ভারতে সমা-গমের যথেষ্ট উল্লেখ ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতেই পাওয়া যায়। উড়িষ্যার ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় যে, ৫৩৮ খৃঃ পূঃ যখন বজ্রদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন পারস্যবাসী ম্লেচ্ছরা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার বোধ হয় পহ্লবজাতিরাই ভারতবর্ষের সহ পাশ্চাত্য বাণিজ্যের মধ্যস্থলীয়।

(২৩) এই স্থানের "Murray's History of India" নামক পুস্তকে অনুসন্ধান পাইয়া, পরীক্ষাপূর্ব্বক এস্থানে সঙ্কলিত হইল।

ভারতীয়েরা যদিও ম্লেচ্ছদেশে গমনবিমুখ ছিলেন, তথাপি ম্লেচ্ছদিগের ভারতে আগমনের দ্বারা বিদেশ বাণিজ্য সুন্দররূপে প্রবাহিত হইত। তাহাতে ধনবৃদ্ধি পক্ষে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই, তবে স্বয়ং কৃতী হইলে যতদূর হইবার সম্ভব তাহা অবশ্যই হইবে না। আডাম স্মিথ বলেন যে, যখন স্বদেশ হইতে বিদেশস্থ দ্রব্য প্রেরণ এবং গ্রহণে স্বয়ং কৃতী না হইতে পারা যায়, সেস্থলে দেশজাত বস্তু সকলের অযথাভাবে নিয়োগাপেক্ষা, বৈদেশিক যত্নে বিদেশ-নীত হইলেও যথেষ্ট লাভের সম্ভব আছে, এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই নিয়ম হেতু প্রাচীন-কাল হইতে মিসর, চীন এবং ভারতবর্ষ স্বয়ং বৈদেশিক বাণিজ্যবিমুখ হইলেও বিপুল ধনশালী হইয়াছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, এই কারণেই উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় উপনিবেশ সকলের ধনশালিত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের ভাগ্যে কি এই অবস্থাই আবহমান কাল চলিবে?

ইতি সপ্তম প্রস্তাব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদা কোন উৎসব স্থলে অনেকগুলি স্ত্রীলোক একত্রিত হন। গৃহস্থের পরিবারবর্গ সকলেই অতিশয় ব্যস্ত, কেহ এক দণ্ড কাল কোথাও বসিয়া থাকিতে পারেন না। কেবল একজন অর্দ্ধপ্রাচীনা আভ্যন্তরিক ভারবৃদ্ধি বশতঃ মন্থরগতি হইয়া বড় কিছু করিতে পারিতেছিলেন না। ইত্যবস্থায় তাঁহাকে পরিহাস করিবার যোগ্য যুবতীগণ ঠারাঠারি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের বদন-জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ তদুপলক্ষে গৃহমধ্যে যেন অপর একটী উৎসব উপস্থিত হইল। প্রৌঢ়া বিপদ্ বুঝিয়া আপন কর্ম্মক্ষমতা প্রদর্শনার্থ কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু পাঠকগণ বুঝিতেই পারিতেছেন যে, অল্পকাল মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন নিরুপায় হইয়া দুইচারিটী সমবয়স্কার নিকট আক্ষেপ সহকারে বলিলেন, "ভাই, ছুঁড়িগুলার জন্যে জ্বালাতন হইয়াছি।" তাঁহারা গম্ভীরভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কথাতে বিলক্ষণ সহৃদয়তা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "তাই ত ওদের রঙ্গ দেখে আর বাঁচি না।" কেহ দীর্ঘ্ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ওগো ওতে কিছু মনে করো না, এ সকল ভাগ্যি থাকলেই ঘটে।" আর একজন বলিলেন, "তা ভাই এতে তোমার দোষ কি, এ সকল ভগবানের ইচ্ছা ; তা তুমি কেন দুঃখ করিতেছ?" তখন এই কথা শুনিয়া আর এক সুন্দরী মৃদু মধুর বচনে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভাই যদি সত্য কথা বলিতে হয়,—তা সব দোষটা ভগবানের নয়,—একটু একটু ওঁরও ছিল!" এই কথাতে মহা হাসি পড়িয়া গেল ইত্যাদি।

নিষ্ঠুরতা কদাচই আদরণীয় নহে। যে প্রকারেই উৎপন্ন হউক, ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মন কখন অবিচলিত থাকে না, থাকিলেও দোষের বিষয় হয়। লোকে ভগবানের নাম করিয়া অনেক দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা পাইয়া থাকে। কিন্তু সমাজের ভদ্রমণ্ডলী বিচক্ষণ হইলে এতাদৃশ দোষ কখনই আবৃত থাকে না। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি আচরণ প্রায় প্রকাশ্যরূপে

আলোচিত হয় না, এই জন্য অনেক দুর্বৃত্ত দুরাচার জনসমাজে ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারে, নচেৎ তাহারা লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিত না।

আমরা যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, তাহার সকল কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিলে পাঠকবর্গের নিকট আমাদিগের শীলতার ক্রটী হইতে পারে কিন্তু ইহার সার কথাগুলি প্রচার করা এত আবশ্যক হইয়াছে যে, এখন চক্ষুলজ্জা ত্যাগে আর দোষ নাই। বঙ্গদর্শন বালকবালিকাদিগের পাঠের নিমিত্ত লিখিত হয় না, সুতরাং শৈশব পাঠকদিগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই প্রবন্ধ সন্তানদিগের হস্তে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে যথাযোগ্য বিচার করিবেন।

শাস্ত্রে লেখা আছে যে, পুৎ নামে এক নরক আছে, তাহা হইতে যিনি ত্রাণ করেন, তাঁহার নাম পুত্র। শাস্ত্রের কথা কে শুনে; বেদাধ্যয়ন, দয়াদাক্ষিণ্য এ সকল বিষয়ে শাস্ত্র কেবল হিজিবিজি বলিয়া গণ্য, কিন্তু বংশরক্ষার বেলা শাস্ত্রের দোহাই দিতে কেহই ছাড়েন না। তাতে আবার ছাপার অক্ষরে ইংরাজি হরফে লেখা আছে live and multiply, তখন আর কে পায়? বাঙ্গালিরা বংশ-বৃদ্ধিতে যেমন পটু এমন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার শিষ্যগণ বিধবাবিবাহের জন্য লালায়িত। অমনিই রক্ষা নাই আর বাড়াবাড়ি কেন?

আমাদিগের সমাজে বংশবৃদ্ধি লইয়া কতই আনন্দ! হাতে খড়ির আড়ম্বরটা বহুদিন হইল উঠিয়া গিয়াছে। উপনয়ন কেবল ঐতিহাসিক ব্যাপার মাত্র বলিলেই হয়। কিন্তু ষেটেরা পূজা, ষষ্ঠী পূজা, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, পুনর্বিবাহ, পঞ্চামৃত, সাধ ইত্যাদি গণ্ডা গণ্ডা উৎসব কেবল বংশবৃদ্ধি লইয়াই হইয়া থাকে। বংশধরেরা কাজ করেন কি? ফের বংশ বাড়াইতে নিযুক্ত হন। আহা! কি সুন্দর! ঠিক যেন প্রবাল কীট পালে পালে আসিতেছে যাইতেছে আর সমুদ্রে চড়া পড়িতেছে। প্রবালের মূল্য আছে, এবং প্রবাল কীটগণ যে সকল দ্বীপ উৎপাদন করে, তাহা ক্রমশঃ লোকের আবাস হয়। কিন্তু বঙ্গীয় কীটগণ আবির্ভূত হইয়া অনেকেই কেবল পিতৃলোকের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগের পথ করিয়া দেন।

আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, যাঁহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নাই তাঁহারাই, স্বয়ং বিবাহ করিতে কিম্বা পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে যারপরনাই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইনি কে? না, একজন বংশজ ব্রাহ্মণ, অর্থাভাবে বিবাহ করিতে পারেন না—সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বংশলোপ হইবার উপক্রম। উনি কে? না শত্রুমুখে ছাই দিয়ে গুটি আষ্টেক জন্ম দিয়াছেন; কতক আছে কতক গিয়াছে; যারা আছে তাদের জন্য বিব্রত, বস্ত্র দিবার সংগতি নাই, সোনার চাঁদেরা দিগম্বর-মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ধূসরিত কলেবরে রাজপথ সুশোভিত করিতেছে; গৃহিণী

কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছেন ; কর্ত্তা দোকানে বসিয়া কলিকাতে ফুঁ দিচ্ছেন আর কোথায় নিমন্ত্রণ আছে তাহার তত্ত্ব লইতেছেন। আর একজন বলিতেছেন, "ভিক্ষাই আমাদের ব্যবসা—কি দিবি তা দে, না দিবি তো তোকে নির্ব্বংশ করব।" কেহ বলিতেছেন, "গ্রামে একটু সম্ভ্রম আছে, লোকটা জনটা চেনে, তা ছোট কাজ করি কেমন করে, দশজন বড় লোকের দ্বারস্থ হইয়াই সংসার চালাচ্চি তা ভগবানের ইচ্ছা।" সন্তানের অভাব নাই—জন্ম দিচ্ছেন আর বড় লোকের দ্বারে আসিয়া বলিতেছেন, আমি কন্যাভারগ্রস্ত। এমন বংশ কি না রাখিলেই নয় ?

বাঙ্গালিদিগের ন্যায় নির্ব্বোধ জাতি প্রায় দেখা যায় না। উল্লিখিত লোক সকল যে সুখে আছে, তাহা নহে ; নির্দয় স্নেহহীন, তাহাও নহে কিন্তু মহাপুরুষেরা এক ভগবানের উপর মাদার দিয়া বসিয়া আছেন, আর বৎসরান্তে এক একটী কাঙ্গালি বৃদ্ধি করিতেছেন। একবার ভুলেও ভাবেন না যে, সন্তানোৎপাদন বন্ধ হইলে অনেক দুঃখ দূর হইবে।

কুষ্ঠ রোগী অস্পর্শীয় ; কিন্তু সে কখনই গুপ্তভাবে লোকের নিকট আইসে না ; লোকালয় ত্যাগ করিতে পারে না বটে, কিন্তু সমীপবর্ত্তী ব্যক্তিরা তাহাকে দেখিয়া সরিয়া যাইতে পারে। সুতরাং তাহার স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার উপায় আছে। পৃথিবীতে দস্যুভয় যথেষ্ট আছে। সেইজন্য যথাযোগ্যরূপে রাজদণ্ড নিয়োজিত হইয়াছে এবং লোকে স্ব স্ব যত্নেও আপনাদিগের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু যে সকল দুরদৃষ্ট সন্তান ঔরসজাত রোগে আক্রান্ত হইয়া কিম্বা দারিদ্রভার ধারণ পূর্ব্বক জগতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের যন্ত্রণার হেতু কে ? তাহাদিগের কষ্টের শান্তি নাই, কিন্তু কষ্টদাতৃগণ কি দণ্ডের পাত্র নহে ? দণ্ডের পাত্র হইলে কি দণ্ড পাইবে না ?

পৃথিবীতে পরের ক্ষতি করিলে দণ্ড হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার বুদ্ধির দোষে বা রিপুসম্বরণের ত্রুটিতে সমস্ত সন্ততিগণকে আজন্মকাল রুগ্নশরীরে অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হয়, তাহার দণ্ড হয় না। নিষ্ঠুরতা আদরণীয় নহে। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার সীমা নাই তথাচ ভদ্রমণ্ডলী এতাদৃশ লোকের সমাদর করিয়া থাকেন।

ভগবান্, গ্রহ, অদৃষ্ট—ইহাদিগের কথা যতই বল, জন্মদাতার দোষ স্খলন কিছুতেই হয় না—যাঁহারা সংসার মধ্যে পদে পদে ঐশীশক্তির কার্য্য দেখিতে পান তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে স্ত্রীপুরুষ আত্মসম্বরণ করিলে বংশবৃদ্ধিজনিত যন্ত্রণার লাঘব হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে আত্মসম্বরণও ঈশ্বরাধীন সুতরাং মনুষ্যের চেষ্টাতে কিছুই হয় না। কিন্তু এদেশের কেহ কখন কি বংশবৃদ্ধি নিবারণের চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন ? যাঁহারা জানেন না তাঁহাদিগকে বলা আবশ্যক যে ইউরোপের কোন কোন স্থানে অতি হীন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিরাও পুত্রোৎপাদনের পূর্ব্বে

আপনাদিগের সংস্থানের প্রতি বিশিষ্টরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। অনেকে তিনটী সন্তান হইলে আর স্ত্রী সহবাস করে না। যাহারা তিনটীকেও ভরণপোষণ করিতে না পারে, তাহাদের বিবাহই হয় না।

লোকের মুখে সর্ব্বদাই শুনা যায় যে, বংশরক্ষা না হইলে নাম লোপ হইবে। আমরা অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, নাম লোপের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। আমি হরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—আমার বংশ না থাকিলে কি আর কোন হরিশ, চাদর স্কন্ধে করিয়া বেড়াইবেন? না হরিশের নাম করিয়া আর কেহ কি পিণ্ডং গয়াং গচ্ছ, বলিবে না? পৃথিবীতে অনেক হরিশ হইয়াছে আবার হবে। তাহাদের ঢের ঢের বংশ। হরিশের নাম করিয়া অনেকেই পিণ্ড দিবে; তবে আমি হরিশ হতভাগ্য পিণ্ড খাইতে পারিব না এই বড় দুঃখ।

কিন্তু পিণ্ডের কথা ত কেহই বলে না—নাম লোপ হইবে এই আশঙ্কাই প্রবল। সন্তান থাকিলে নাম রক্ষা হইবে। সে কেমন? অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত, বেটারা কালে ভদ্রে কোন একটা বুড়োর সম্মুখে পড়িয়া জিজ্ঞাসিত হইলে একবার একবার আমার নাম করিবে। হয়ত হরিশ বলিতে গবেশ বলিয়া বসিবে আর শ্রাদ্ধের সময়ে "যথা নাম" বলিয়া সারিবে, কিন্তু তাহার পরে আর কোন্—আমার নাম করিবে? অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতাকে কি বলিয়া পরিচয় দিতে হয় তাহা যখন জানি না, তখন আর অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্রের পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক কি। যাহা হউক মনে করিলাম যে ৫ পুরুষে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কেহ না কেহ একবার একবার নাম উচ্চারণ করিবে। আর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত আর একটী সুখভোগ করিতে হইবেক।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ব্যাস বাল্মীকির নাম কে কতবার করিয়া থাকে? তা এই সকল সুখের জন্য কি কতকগুলি কাঙ্গালি রাখিয়া যাইতে হইবেক?

বংশ রক্ষার নিমিত্ত অনেকগুলি উপায় হইয়াছে। এক, শাস্ত্রের বচন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ইত্যাদি। দুই, কন্যার বিবাহ না দিলে নয়। শুদ্ধ তাই নয়, বিবাহের পূর্ব্বে যদি কন্যা রজস্বলা হয়, তবে পিতা মাসে মাসে তাহার ভ্রূণহত্যা পাতকে পতিত হবেন। (৪) রজস্বলা নারীর গর্ভাধানের কোন প্রকার বিঘ্ন না হয় তদুপলক্ষে ভূরি ভূরি নিয়ম হইয়াছে। ইহাতেও পিতৃপুরুষ মহাশয়দিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। কি জানি যদি পুত্রই বা বৈরাগ্য অবলম্বন করে, এইজন্য তাহার বিবাহের ভারও পিতৃহস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। আরও আছে। (৬) অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই, ভাগ্যক্রমে যদি বা ঘরের লক্ষ্মী বড় একটি আশীর্ব্বাদ করেন না, সন্তানের জ্বালা সহিতে হয় না, কিন্তু মাঠাকুরুণ বড়ই উৎকণ্ঠিত, পুনরায় বিবাহ না করিলে নয়। তিনিও শাস্ত্রের দোহাই দেন। শাস্ত্রের কথা শুনিলে, যতদিন

পুত্রের মুখ না দেখিব, ততদিন যত খুসী বিবাহ করিতে পারি ; এমন মজার শাস্ত্র কি আর কখন জন্মিবে ?

সম্প্রতি একটি কণ্টক উপস্থিত হইতেছে। এখন "পাসওয়ালা" পাত্র না হইলে কন্যার বিবাহ দেওয়া ভার। আর পাসের মূল্য দেওয়া কঠিন, সুতরাং অনেক স্থলে কন্যাকাল থাকিতে থাকিতে বিবাহ দেওয়া ঘটে না ; যদি এইরূপ আর কিছুদিন চলে, তবে হয়ত ক্রমশঃ অবিবাহিত কন্যার বয়স আরো বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে এবং পরিশেষে বংশবৃদ্ধির কিছু কিছু ব্যাঘাত ঘটিবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মুন্সী প্যারীলাল আর হিন্দুপেট্রিয়ট তাহার প্রতিকার চেষ্টায় বিলক্ষণ যত্নবান্ হইয়াছেন। তবে আর বংশবৃদ্ধির ভাবনা কি ?

নব্যসম্প্রদায় আবার একটি নূতন ধূয়া ধরিয়াছেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের উৎপাতে পুতুলখেলার মত বিয়ে আর কেহ মুখে আনিতে পারেন না কিন্তু চিরকালের অভ্যাস কোথায় যাইবে ? এখনকার কথা এই যে, অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে পুত্রগণ দুশ্চরিত্র হইয়া উঠে। বহুকাল পূর্ব্বে পুরুষেরা অনেকেই পরিবার বাটীতে রাখিয়া বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করিতে যাইতেন সুতরাং অনেকস্থলে বয়ঃক্রম অধিক না হইলে, সন্তান হইত না। পিতা মাতার শরীর পরিপুষ্ট হইয়া সন্তান হইলে পুত্র সবল হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? তবে তৎকালে বিদেশবাসী পুরুষদিগের চরিত্রের দোষ ছিল। ইহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত সুশিক্ষিত যুবকগণ আপনাদিগের চাকুরির স্থানে পরিবার লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। এবং জিতেন্দ্রিয়তার একশেষ করিয়া ফেলিলেন। তদবধি বংশবৃদ্ধির অনেক সদুপায় হইয়াছে, কেবল দুর্ভাগ্য বশতঃ সন্তানগুলি কিছু রুগ্ন হইয়া থাকে এবং গৃহস্থের প্রথম সন্তান প্রায়ই বিনষ্ট হয়। বাবুরা আপনাদিগের কীর্ত্তিধ্বজা অনেক উচ্চে তুলিয়াছেন, এখন পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের ধর্ম্মরক্ষা হওয়া ভার। এঁরাও বাপের বেটা, বেয়াল্লিশকর্ম্মা। পূর্ব্বে বাবা বলেছেন,—"বাবা বিয়ে দিয়েছেন আমার কি ?" এখন ছেলে বলেন,—"বাবা কেন আঠার বছর বয়সে আমার জন্ম দিয়াছিলেন ?" ছেলের বাবা ভেবে ভেবে সারা হলেন ; তাঁর বাবা বিয়ে দিয়েই যত সর্ব্বনাশ করেছেন। তা চুলোয় যাক, এখনকার উপায় কি ?—কাজেই ছেলেটীর বিবাহ দিতে হয়েছে। খুব বাহাদুর ! এগ্জামিনের সময়ে মালথসের পেপরে ৯৯ মার্ক পেয়েছিলেন ; এখানেও তার ফল হাতে হাতে !
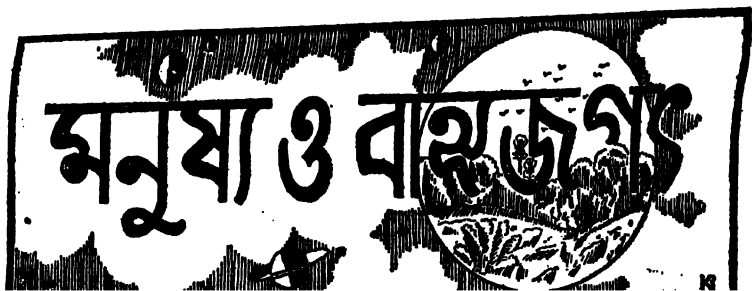
মনুষ্য সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিয়া * বাহ্য জগতের প্রভু হইয়া বসিয়াছেন। এখন তিনি অগ্নিকে পূজা করা দূরে থাক, তাহাকে পাচক ও পরিচারক করিয়া তুলিয়াছেন; তাহাকে দিয়া ভক্ষ্য প্রস্তুত করান, প্রয়োজনমত আলোক জ্বালান, কল ঘুরান, এমন কি গাড়ী ও নৌকা পর্য্যন্ত টানান। তাঁহার কৌশলে বায়ুও বশীভূত হইয়াছে। বায়ু এখন পেষণ যন্ত্র (১), জলযান ও ব্যোমযান চালাইতে নিযুক্ত। এদিকে দিবাকর চিত্রকরের কার্য্য পাইয়াছেন (২), এবং ইন্দ্রের প্রিয় বিদ্যুৎ, মানব সন্তানের আদেশে দেশে দেশে সংবাদ বহিয়া বেড়াইতেছেন (৩)। বৃষ্টি সময়ে হউক বা না হউক, খাল ও কূপ খনন করিয়া ক্ষেত্রে সলিলসিঞ্চনের উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক মনুষ্য আবশ্যক শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছেন। কোথায় তিনি পর্ব্বত কাটিয়া পথ করিতেছেন (৪), কোথাও সমুদ্র তাড়াইয়া বাসস্থান করিতেছেন (৫), কোথাও শুষ্কস্থলে সাগর করিতেছেন (৬), কোথাও জলের নীচে রাস্তা করিতেছেন (৭)। উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সম্বলিত ভীষণ সিন্ধু সভ্য নরজাতির যাতায়াতের বর্ত্ম হইয়াছে। কি সূর্য্যসন্তপ্ত উষ্ণমণ্ডল, কি তুষারাবৃত হিমমণ্ডল, সর্ব্বত্রই বাসগৃহ, পরিধেয়, আহার-সামগ্রী ও বাতাতপ নিয়মিত করিয়া মনুষ্য সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতে সক্ষম হইতেছেন। তাঁহার প্রতাপে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; এবং যে সকল

* Buckles' Works, Mahaffy's Lectures on Primitive Civilizations, Smith's History of Greece &c.

(১) Wind Mill.
(২) Photograph.
(৩) Electric Telegraph.
(৪) Mont Cenis Tunnel.
(৫) Holland.
(৬) Suez Canal.
(৭) Thames Tunnel and projected Gibraltar and Dover Tunnels.

বিস্তীর্ণ ঘন বিজন কাননভূমিতে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিত, সে সকলও বিলুপ্ত হইতেছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গো, মহিষ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পশু সকল মানবের দাস হইয়াছে; এবং যে সকল পক্ষী কোনরূপে কার্য্যোপযোগী বলিয়া বোধ হইয়াছে, সে সকলও অনেক পরিমাণে মানুষের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের প্রভুত্ব বাড়িয়াছে। মানবগণ যত প্রকৃতির নিয়ম অবগত হইতে পারিয়াছেন ততই বাহ্য-পদার্থ সকল ইচ্ছার বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া জগতের সহিত মনুষ্যের যুদ্ধ চলিতেছে; আরও বহুকাল চলিবে। কিন্তু ক্রমে মনুষ্যের জয়লাভ ও অধিকার-বৃদ্ধি হইলেও বাহ্যজগৎ মানবজীবনের ঘটনাস্রোত বহুপরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। মানবেতিহাসে বহির্জগতের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আমরা কয়েকটী কথা বলিব।

ভূমণ্ডলের পুরাবৃত্ত ও বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে, দেশ বিশেষের অবস্থান, তথাকার শীতোষ্ণতা, ভূমির উর্ব্বরতা ও সাধারণ খাদ্যের সহিত অধিবাসীদিগের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এ বাহ্য কারণগুলিও পরস্পর নিরপেক্ষ নহে। কোন দেশে যে প্রকার খাদ্য জন্মে, তাহা সেখানকার ভূমি ও শীতোষ্ণতার সাপেক্ষ। শীতোষ্ণতাও দেশের অবস্থান সাপেক্ষ। আমরা প্রথমে শীতোষ্ণতার কার্য্য প্রদর্শন করিব।

শীতে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়; গ্রীষ্মে পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহার কারণ আছে। শারীরিক কার্য্যসকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত মনুষ্য-শরীরে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তাপ থাকা আবশ্যক। কিন্তু চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর তাপদ্বারা দৈহিক তাপের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ক্রমাগত শীতল বায়ু সংস্পর্শে শরীরের তাপ কমিয়া যায় এবং ক্রমাগত উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়। (৮) এই জন্য শীতপ্রধান প্রদেশে লোকে শরীরের নিয়মিত তাপ রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, কারণ যে কোন প্রকার শরীরসঞ্চালন দ্বারাই দেহাভ্যন্তরে তাপ উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্তই গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশে পরিশ্রম করা কষ্টকর বোধ হয়। সুতরাং শীতোষ্ণতার তারতম্যানুসারে নিতান্ত সামান্য ফল ফলিতেছে না। শীতে মনুষ্যকে পরিশ্রমপ্রিয় করে; গ্রীষ্মে মনুষ্যকে অলস করে। শীতে মনুষ্যকে ক্রমাগত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়, গ্রীষ্মে মনুষ্যকে বিশ্রাম অন্বেষণ করিতে শিখায়। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর, ইতিহাস পাঠ কর, এই কথার সত্যতা পদে পদে প্রতিপন্ন হইবে। ইউরোপ খণ্ডের সহিত এসিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণপ্রদেশ সকলের তুলনা কর। ইউরোপ পরিশ্রমের আকর, আফ্রিকা ও এসিয়া আলস্যের

(৮) See Carpenter's Human Physiology, 6th Ed. p. 429.

আবাসভূমি। লোকের পারলৌকিক বাঞ্ছাতেও বাহ্যজগতের ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদিগের মোক্ষ নির্ব্বাণ বা লয়। ইউরোপের মোক্ষ অনন্ত উন্নতি।

অনেক সময় দেখা যায় যে, সমতল প্রদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা পার্ব্বতীয় প্রদেশের লোক শক্ত ও পরিশ্রমপ্রিয়। ইহারও কারণ সহজে বুঝা যায়। সমতল প্রদেশাপেক্ষা পার্ব্বতীয় প্রদেশসকল উচ্চ বলিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল; সুতরাং তথাকার অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত পরিশ্রমপ্রিয় ও তন্নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত বলবান্ হইবার কথা। মিড্ (৯) ও পারসিকদিগের যদিও ভাষা ও ধর্ম্ম এক ছিল, তথাপি সমতলপ্রদেশবাসী মিডেরা, পরিশেষে পার্ব্বতীয় প্রদেশবাসী পারসিকদিগের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশের প্রতি লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন কি? বাঙ্গালির সহিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও মহারাষ্ট্র-প্রদেশের অধিবাসীদিগের তুলনা কর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বাঙ্গালা অপেক্ষা অধিক শীত হয়, এখান অপেক্ষা তথায় অধিক কাল শীত থাকে। এখানকার লোক অপেক্ষা তাহারা শক্ত, সবল ও পরিশ্রমপ্রিয়। মহারাষ্ট্র পার্ব্বতীয় প্রদেশ, সেখানকার অধিবাসীরাও অপেক্ষাকৃত সাহসী ও পরিশ্রমী। (১০)

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। শরীরে অধিক উত্তাপ লাগিলে শারীরিক জলীয় পদার্থ কিয়ৎপরিমাণে বাষ্পাকারে দেহ হইতে নির্গত হয় ও সেই সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণ তাপও বহির্গত হয়। যদি চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকে, তাহা হইলে দেহ হইতে বাষ্পনির্গমনের বাধা জন্মে, সুতরাং তাপ নির্গমনেরও প্রতিবন্ধকতা হয়। (১১) এই কারণে শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে যত তাপ সহ্য করা যায়, সজল ও উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে তত তাপ সহ্য করা যায় না। (১২) এই নিমিত্ত দৃষ্ট হইবে যে, সজল ও উত্তপ্ত বায়ুবিশিষ্ট দেশের অধিবাসীরা যেরূপ অলস ও বিশ্রামপ্রিয়, শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ুবিশিষ্ট প্রদেশবাসীরা সেরূপ নহে।

ভূমির উর্ব্বরতা অনেক পরিমাণে উত্তাপ ও জলের উপর নির্ভর করে। যে সকল দেশ উষ্ণ ও সলিলসিক্ত, সেই সকল দেশের ভূমিই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা; যেখানে এই দুইটীর মধ্যে একটীর অভাব আছে, অথবা যেখানে এই দুইটীর

(৯) Medes.

(১০) "The inhabitants of the dry countries in the north, which in winter are cold. are comparatively manly and active. The Maharattas inhabiting a mountainous and unfertile region, are hardy and laborious"—Elphinstone's History of India.

(১১) See Carpenter's Human Physiology, 6th Ed. p. 444.

(১২) Ibid p. 432.

প্রয়োজনানুরূপ মিলন সংঘটিত হয় নাই, সেখানকার ভূমি অনুর্ব্বরা। এই কারণেই সপ্তসিন্ধু, অনুগঙ্গ প্রদেশ, নীলনদের তীর, ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদী সন্নিহিত স্থান, উর্ব্বরতাজন্য প্রসিদ্ধ। এই কারণেই তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ও হিমমণ্ডলের অন্তর্গত স্থান সকল উর্ব্বরতা বিষয়ে নিকৃষ্ট। এক্ষণে বিবেচনা কর, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা তাপবৃদ্ধিকারী দ্রব্য অধিক খাইতে ভালবাসিবে না; সুতরাং মাংস অপেক্ষা ফল-মূলই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য হইবে। শীতপ্রধান দেশের লোকে তাপবৃদ্ধিকারী তৈলাক্ত অর্থাৎ বসাযুক্ত মাংস আহার করিতে অনুরাগ প্রকাশ করিবে। যে সকল মাদক দ্রব্যে শরীর উষ্ণ করে, সে সকলও গ্রীষ্মপ্রধান দেশাপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে প্রিয় পদার্থ হইবে। এতদ্দেশবাসীদিগের সহিত ইউরোপ খণ্ডের অধিবাসীদিগের তুলনা করিলেই, এসকল কথার সত্যতা প্রতীত হইবে। আবার মনে কর, যে উষ্ণদেশ সলিলসিক্ত সুতরাং উর্ব্বরা, সেখানে অল্প পরিশ্রমেই আবশ্যক আহার্য্য উদ্ভিদ্ সকল উৎপন্ন হইবে। এই কারণেও অল্প পরিশ্রমই লোকের অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, ও তাহাদিগের আলস্য বৃদ্ধি হইবে। শীতপ্রধান প্রদেশে ভূমির গুণে ভক্ষণীয় উদ্ভিদ্ সকল যে কেবল অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইবে, এরূপ নহে; অধিবাসীরা মাংসপ্রিয় বলিয়া মৃগয়াপ্রিয় হইবে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত সাহসী ও সবল হইবে। যদি কোন উষ্ণদেশ সলিলসিক্ত না হয়, সে দেশের ভূমি উর্ব্বরা হইবে না; সুতরাং তথাকার লোকের অধিক পরিশ্রম ও যত্নসহকারে ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে এবং অল্পজন্মা দেশে লব্ধ খাদ্য অপরের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যও অনেক প্রয়াস পাইতে হইবে। সুতরাং অধিবাসীরা শক্ত ও সবল হইবার কথা। ইহার দৃষ্টান্তস্থল আরব দেশ। আরব উষ্ণ দেশ বটে, কিন্তু সেখানে বড় জলকষ্ট। সেখানে বৃহৎ নদ, নদী, হ্রদ নাই। সুতরাং সেখানে উর্ব্বরা ভূমি প্রায় নাই। এজন্য ভক্ষ্য সংগ্রহ নিমিত্ত আরবদিগকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এই কারণে তাহারা পরিশ্রমী, শক্ত ও সাহসী। আরবের বায়ু শুষ্ক; ইহা অন্য প্রকারেও অধিবাসীদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ইহাতে সজল বায়ুবিশিষ্ট উষ্ণ প্রদেশের ন্যায় আরবে শ্রমকাতরতা সমুৎপন্ন হইতে পারে নাই। স্থানমাহাত্ম্যে আরবের অধিবাসীরা এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হওয়াতেই তাহারা এক সময়ে সিন্ধুনদ হইতে আট্লাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত, ভারত মহাসাগর হইতে ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগ পর্য্যন্ত, মুসলমান জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। যেরূপ পার্ব্বত্য প্রদেশে কখন কখন বহুদিন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ জলরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে, পরে সামান্য কারণে কোন দিক্ ভাঙ্গিয়া প্রচণ্ডবেগে বহির্গত হয় ও অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্লাবিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ বহুকাল পর্য্যন্ত আরবে যে মানবশক্তি, ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়াছিল, মহম্মদের আদেশে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থে সেই শক্তি

একবার স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভূমণ্ডল প্লাবিত করিতে সবেগে ছুটিয়াছিল। পারসিক সাম্রাজ্য ও পূর্ব্বরোমক সাম্রাজ্য তাহার প্রভাবে বিলুপ্ত হয়। এসিয়ার পশ্চিমভাগ, আফ্রিকার উত্তর খণ্ড, ইউরোপের স্পেন ও পর্ত্তুগাল, অল্পদিনেই আরবদিগের করতলস্থ হয়। কে বলিবে একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই আরবের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে? এক্ষণে অগ্নিশিখা বা ধূম দৃষ্ট হইতেছে না, সত্য; কিন্তু আগ্নেয়গিরি বহুকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও কখন কখন আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সলিলসিক্ত, সেখানকার ভূমি উর্ব্বরা, যথা নীলনদের উপত্যকা, ইউফ্রেটীস্ নদীর তীরবর্ত্তী ভূমি, অনুগঙ্গ প্রদেশ, সপ্তসিন্ধু ইত্যাদি। আফ্রিকার উত্তর পূর্ব্বাংশে মিসরদেশ দিয়া নীলনদ প্রবাহিত, নদের উভয় তীরেই কিয়দ্দূরে পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে কয়েক ক্রোশ বিস্তৃত উপত্যকা। পর্ব্বতশ্রেণীদ্বয় অতিক্রম করিলেই বিস্তীর্ণ মরুভূমি ও বালুকারাশি দৃষ্ট হইবে। মিসরে প্রায় বৃষ্টি হয় না। কেবল বর্ষাকালে নীলনদের জল বৃদ্ধি পাইয়া উপত্যকা প্রদেশ প্লাবিত করে, তাহাতেই ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা পায়। আষাঢ়মাস হইতে জল বাড়িতে আরম্ভ হয়, শতদিন বৃদ্ধির সময়, এই সময়ে প্রায় ১৩।১৪ হাত জল বাড়ে। অনন্তর জল কমিতে থাকে, এবং প্রায় চারিমাসে নদের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। বর্ষার জল হইতে যে পলল পড়ে, তাহাতেই প্লাবিত ভূমি উর্ব্বরা হয়; এবং জল সরিতে সরিতেই মিসরবাসীরা ক্ষেত্রে বীজ বপন করে। নীলনদ মিসরের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ করিয়া উত্তর সীমা পর্য্যন্ত যাইয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িয়াছে। সুতরাং নীলনদের উপত্যকা সঙ্কীর্ণ হইলেও অতিদীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন। জলপথে সর্ব্বত্রই যাতায়াতের সুবিধা। বৎসরের মধ্যে আটমাস উত্তর দিক্ হইতে বাতাস বহিতে থাকে, ইহাতে পালভরে স্রোতের প্রতিকূলে অনায়াসে নৌকাযোগে দক্ষিণাভিমুখে যাওয়া যায়। স্রোতের সাহায্যে দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করাও সহজ। জল বায়ু সর্ব্বত্রই সমান। ভূমিকম্প প্রভৃতি ভয়ঙ্কর নৈসর্গিক ঘটনার উৎপাতও প্রায় নাই, পীরামিড প্রভৃতির রক্ষাই ইহার সামান্য প্রমাণ নহে। নদের জলপ্লাবনের গুণে উপত্যকা প্রদেশে বন্যজন্তুর দৌরাত্ম্য নাই। মিসরের পশ্চিমে বৃহৎ মরুভূমি, পূর্ব্বে লোহিতসাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে আফ্রিকার অসভ্য জনপদসকল। সুতরাং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় মিসরবাসীদিগের অধিক ছিল না। এক্ষণে বিবেচনা কর, এই সকল কারণে প্রাচীনকালে দেশের কিরূপ অবস্থা হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্ষান্তে কৃষিকার্য্য করিবার যেরূপ সুবিধা হইত, তাহাতে সাধারণতঃ লোকে কৃষিজীবী হইবার কথা। দ্বিতীয়তঃ জলপ্লাবনে ক্ষেত্র সকল যেরূপ একাকার হইয়া যাইত, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভূমি নির্ণয় নিমিত্ত

ভূমিপরিমাণ করিতে জানা আবশ্যক হইত। তৃতীয়তঃ, কোন্ সময়ে নীলনদের জল বাড়িতে ও কোন্ সময়ে কমিতে আরম্ভ হয়, ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত নক্ষত্রপুঞ্জ সকলের আবির্ভাব, তিরোভাব বা অবস্থান নিরূপণ করিবার প্রয়োজন হইত। এই সকল কারণে অতি প্রাচীনকালে মিসরে কৃষিবিদ্যা, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চারম্ভ হইয়াছিল, এবং দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

আবার ভাবিয়া দেখ, সমুদায় দেশটী একই উপত্যকা; মধ্যে কোন মরুভূমি, পর্ব্বত বা নদী থাকিয়া দেশটীকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নাই; সর্ব্বত্র গমনাগমনেরও সুবিধা ছিল। সুতরাং সমুদায় দেশটী একই রাজ্য হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাই ঘটিয়াছিল। পলল পড়িয়া ভূমি যে প্রকার উর্ব্বরা হইয়াছিল, তাহাতে অল্প পরিশ্রমে অনেক শস্য উৎপন্ন হইত। একারণে অনেক লোকে আহারান্বেষণ কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছিল। ইহা হইতেই মিসরের পুরাতন সভ্যতার উৎপত্তি; ইহা হইতেই খ্রীষ্ট জন্মের তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের মহিমা প্রকাশ। আর দেশের চতুর্দ্দিক্ যে ভাবে রক্ষিত ছিল, তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত বহিঃশত্রুর আক্রমণদ্বারা আভ্যন্তরিক উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতে পারে নাই; বিশেষতঃ উপত্যকার সমুদায় অধিবাসিগণ একই রাজার অধীন থাকাতে সহসা মিসর আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করাও সহজ ব্যাপার ছিল না। একস্থল হইতে অন্যস্থলে সর্ব্বদা যাতায়াতের সুবিধা থাকাতে সর্ব্বত্রই লোকের শিক্ষা প্রায় একরূপই ছিল। ইহা দেখিয়া প্রাচীন গ্রীকেরা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। গ্রীসে আথেন্স, স্পার্টা, আর্কেডিয়া, বিওসিয়া, খেসালী, ইপাইরস্ প্রভৃতি স্থানসকলের সভ্যতার তারতম্য ছিল; কিন্তু এসকল স্থান পরস্পর যত দূরবর্ত্তী, তদপেক্ষা অধিকতর দূরবর্ত্তী প্রদেশের মিসরবাসীদিগের মধ্যে সভ্যতা সম্বন্ধে কোন বিভেদ দৃষ্ট হইত না। নীল নদের উপত্যকা যেরূপ শস্যশালিনী ছিল, তাহাতে প্রয়োজনীয় বস্তু জন্য মিসরবাসীদিগের অন্যদেশের অপেক্ষা রাখিতে হইত না। এজন্য তাহারা বহির্বাণিজ্য করিতে বা বিদেশে যাইতে ভালবাসিত না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা উদ্ভিদ্‌ভোজী হয়। মিসর এ বিষয়ের একটী প্রমাণ। কিন্তু মিসরের ন্যায় যেখানে অল্প পরিশ্রমে অনেক শস্য উৎপন্ন হয়, সেখানে আর একটি ফল ফলে। একে ত গ্রীষ্ম বলিয়া বস্ত্রের জন্য লোকের বিশেষ ভাবনা করিতে হয় না, তাহাতে আবার খাদ্য অনায়াসে লভ্য হইলে শ্রমজীবী লোকে বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিতে চিন্তিত হয় না। এইরূপে শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। কিন্তু শ্রমজীবীদিগের

সংখ্যা বাড়িলে তাহাদিগের বেতনের হার কমে; সুতরাং তাহারা অনেক ধন উপার্জ্জন করিতে পারে না, কোনরূপে মাত্র জীবন ধারণ করিতে পারে। এদিকে বহুসংখ্যক লোকের শ্রম আয়ত্ত করিতে পারিয়া ধনীদিগের বিলক্ষণ লাভ হয়। এইরূপে একদিকে যেমন শ্রমজীবীরা নিঃস্ব হইতে থাকে, তেমনই অপরদিকে কতকগুলি লোকের অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হইতে থাকে। অর্থবলে শেষোক্ত দলের অত্যন্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়; দেশের শাসনভার তাহাদিগের হাতে যাইয়া পড়ে; এবং তাহারা সমাজের মধ্যে উচ্চশ্রেণী বা প্রধান বর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। সভ্যতার ইতিহাসলেখক বাকল সাহেব বিবেচনা করেন যে, এইরূপেই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং মিসরের যাজক ও সৈনিকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি। যেখানে সাধারণ লোকে এপ্রকার নিঃস্ব ও ক্ষমতাহীন, সেখানে শূদ্রদিগের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার হইবে, এবং রাজা স্বেচ্ছাচারী বা উচ্চশ্রেণীর অনুগত হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষে ও মিসরে রাজা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেন, কেবল তাঁহার ব্রাহ্মণ বা যাজকদিগকে কিয়ৎপরিমাণে ভয় করিতে হইত।

নীলনদের উপত্যকা যেরূপ উর্ব্বরা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ প্রায় সেইরূপ। মিসরের ন্যায় এখানেও বৃষ্টি অল্প হয়; কিন্তু জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে আর্ম্মাণদেশের পর্ব্বতে যে বৃষ্টি পতিত হয়, তাহাতে নদীদ্বয় পুরিয়া যায়, ও জলপ্লাবন উপস্থিত হয়। ইহাই তাহাদিগের তীরবর্ত্তী প্রদেশের উর্ব্বরতার কারণ। সামান্য শ্রমেই সেখানে যথেষ্ট শস্য জন্মে। এই নিমিত্তই অতি প্রাচীনকালে তত্রত্য ব্যাবিলন রাজ্য সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। নদীদ্বয় রাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরিখাস্বরূপ ছিল; দক্ষিণে অনতিদূরেই সমুদ্র; উত্তরে পার্ব্বত্য আর্ম্মাণদেশ। সুতরাং দেশ রক্ষা কার্য্যও সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত। ব্যাবিলনের সভ্যতার পরিচয় দিতে বর্ত্তমানকালে পীরামিড প্রভৃতির ন্যায় প্রকাণ্ড কোন মন্দির নাই; কিন্তু এক সময় সেখানে চারিশত হস্তাধিক উচ্চ একটি দেবমন্দির ছিল। ব্যাবিলনে প্রস্তর পাওয়া যাইত না, সুতরাং ইষ্টক নির্ম্মিত সৌধ সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। নীলনদের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে যথেষ্ট প্রস্তর পাওয়া যাইত, সুতরাং তন্নির্ম্মিত মিসরের কীর্ত্তি এতকাল স্থায়ী রহিয়াছে। এক্ষণে মৃত্তিকাখনন করিয়া ব্যাবিলন রাজ্যের যে সকল স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য কার্য্যের উদ্ধার হইতেছে, তদ্দ্বারা তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

আফ্রিকার উত্তরে মিসর ভিন্ন আর কোন স্থানে অধিক পরিমিত অবিচ্ছিন্ন উর্ব্বরা ভূমি নাই; এবং অতি প্রাচীন কালে মিসর ভিন্ন আর কোথাও স্বতঃ সভ্যতার উৎপত্তি হয় নাই। এসিয়াখণ্ডে ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ব্যতিরিক্ত ভারতবর্ষে সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে, তাতারে চক্ষুস

নদকূলে, এবং চীনে ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো সন্নিহিত প্রদেশে বিস্তীর্ণ উর্ব্বর ভূমি ছিল। সুতরাং পুরাকালে চক্ষুস নদকূলে আর্য্য সভ্যতার উদয়; এবং ভারতবর্ষে ও চীনেও বিলক্ষণ সামাজিক ও মানসিক উন্নতি হইয়াছিল। উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ও একটি পর্ব্বতশ্রেণী এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদ ও একটি শৈলমালা; এই সকল কারণে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হইয়া সভ্যতা বৃদ্ধির উপায় হইয়াছিল। আর এদেশে প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত এত অধিক জন্মিত যে, এখানকার অধিবাসীরা বিদেশের সহিত বিশেষ সংস্রব রাখিতে তত প্রয়াসী হন নাই। উত্তরদিক্ ব্যতিরিক্ত আর কোন দিক্ দিয়া চীন আক্রমণ করিবার সুবিধা ছিল না। সেই দিকেই চীনেরা বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বহুকাল পর্য্যন্ত চীনে ও ভারতবর্ষে রীতিনীতি অধিক পরিবর্ত্তিত হয় নাই দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হন। কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝা আবশ্যক যে, কোন একটি অনুষ্ঠান বহুবিস্তীর্ণস্থানব্যাপী হইলে বহুকাল স্থায়ী হয়; এবং চীন ও ভারতবর্ষ উভয়ই বৃহৎ দেশ, বিশেষতঃ উভয় দেশের অধিবাসীরাই স্বদেশে ভোগ্যবস্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া বিদেশের সহিত অধিক সংস্রব রাখেন নাই; সুতরাং অপর দিক্ হইতে কোন পরিবর্ত্তন-স্রোত আসিয়া তাঁহাদিগকে একবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে ফিনিসিয়া দেশ অবস্থিত। উহার বিস্তৃতি ও দৈর্ঘ্য উভয়ই অল্প। একপার্শ্বে উচ্চ লিবেনন পর্ব্বত, অপর পার্শ্বে সমুদ্র। সমুদ্রে অনেক মৎস্য পাওয়া যায়, লিবেনন পর্ব্বতে বড় বড় বৃক্ষ জন্মে। সুতরাং মৎস্য ধরিবার জন্য নৌকা নির্ম্মাণ করিতে অধিবাসীদিগের সহজেই প্রবৃত্তি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। নৌকায় ভ্রমণ করিতে করিতে বাত্যাবশে সাইপ্রসদ্বীপ ও নীলনদের মুখ পর্য্যন্ত তাহারা কখন কখন উপস্থিত হইবে বিচিত্র নহে। এই-রূপে ক্রমে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতে করিতে তাহাদিগের সাহস বৃদ্ধি হইবে এবং তাহারা সাইপ্রসদ্বীপ হইতে তাম্র, ও মিসর হইতে শস্যাদির বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিবে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। লিবেনন পর্ব্বতেও অনেক বহুমূল্য ধাতু পাওয়া যাইত, ইহাতেও তাহাদিগের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইবার সুবিধা হইয়াছিল, বোধ হয়। ব্যাবিলন ও মিসর প্রাচীনকালে যেরূপ সভ্য হইয়াছিল, এক রাজ্যের উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত অপর রাজ্যে লইয়া গেলে বিলক্ষণ ব্যবসায় চলিবার কথা। অবস্থানগুণে ফিনিসিয়ার অধিবাসীরা এই ব্যবসায়েও প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিল। ক্রমে ফিনিসিয়ার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয়। কোন কোন স্থানে কোন ধাতু বা

বণিজ্‌দ্রব্যবিশেষ সংগ্রহ নিমিত্তও তাহাদিগের তথায় থাকিবার প্রয়োজন হয়। ক্রমশঃ তাহারা সাইপ্রস, ক্রিট, গ্রীস, আফ্রিকা ও স্পেন প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সন্নিবেশিত করে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের হিসাব রাখিবার কোনরূপ সহজ চিহ্ন ব্যবহার করা তাহাদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। মিসরে চিত্রসদৃশ (১৩) একপ্রকার অক্ষর প্রচলিত ছিল, ব্যাবিলনে শরমুখসদৃশ (১৪) আর এক প্রকার বর্ণমালা ছিল। ফিনিসিয়াবাসীরা সংক্ষেপে হিসাব রাখিবার নিমিত্ত আরও সরল বর্ণমালা সৃষ্টি করিলেন। গ্রীক্ ও য়িহুদিরা ফিনিসিয়া হইতেই অক্ষর প্রাপ্ত হন, এবং বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যজাতি ও তাহাদিগের সন্তান-সন্ততিগণ ও মুসলমান ও য়িহুদীরা অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত ফিনিসিয়ার বর্ণমালাই ব্যবহার করিতেছেন। ফিনিসিয়াবাসীরা যে সকল উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তন্মধ্যে কার্থেজই উত্তরকালে বিশেষ বিখ্যাত হয়।

এসিয়াখণ্ড হইতে এক্ষণে ইউরোপের অভিমুখে চল। ইউরোপীয় সভ্যতার মূল গ্রীসদেশ। গ্রীস হইতেই ইউরোপের অন্যান্য জাতি দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাকাব্যে হোমর তাঁহাদিগের আদর্শ, গীতিকাব্যে পিণ্ডার, নাটকে সফক্লিস ও ইস্কিলস। হেরোডোটস ইতিহাস রচনার পথপ্রদর্শক। সক্রেটিস ও প্লেটো দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক। আরিষ্টটল বৈজ্ঞানিক-প্রণালী সংস্থাপক। ইউক্লিড জ্যামিতির, আর্কিমিডিস পদার্থবিদ্যার, হিপার্কস ও টিলেমি জ্যোতিষের এবং হিপক্রেটিস ভৈষজবিদ্যার দীক্ষাগুরু। ফিডিয়াস স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কার্য্যের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ এবং এপিলিস চিত্রকর দলের উন্নতিপথ প্রদর্শক। এক্ষণে দেখা যাউক বাহ্যজগতের প্রভাবে গ্রীসে কিরূপ ফল ফলিয়াছে।

গ্রীসের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি কর। দেখিবে গ্রীস ও এসিয়া মাইনরের মধ্যবর্ত্তী সাগরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলি পরস্পর এত নিকটবর্ত্তী যে, সমুদ্রপথে একটি দেখিতে দেখিতে প্রায় আর একটিতে উপস্থিত হওয়া যায়। গ্রীসের নিকট হইতে দ্বীপাবলীর আরম্ভ; এবং সাগর মধ্যে যেখানে চাহিবে, সেখান হইতেই কোন শৈল বা দ্বীপ দেখিতে পাইবে; এবং এক বন্দর হইতে অল্পদূরে অন্য বন্দর লক্ষিত হইবে। এরূপ অবস্থায় গ্রীসের অধিবাসীরা যে সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিয়া বাণিজ্য অবলম্বন করিতে ভাল বাসিবে, এবং বাসযোগ্য দ্বীপগুলি ও এসিয়া মাইনর তাহাদিগের কর্ত্তৃক উপনিবেশিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য

(১৩) Hieroglyphics.
(১৪) Cuniform writings.

নহে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। এস্থলে অর্ণবযানে পর্য্যটন করিবার আর একটি সুবিধা ছিল। হেলেস্পর্ণ্ট হইতে ক্রিট দ্বীপ পর্য্যন্ত নিয়মিত বাণিজ্যবায়ু বহিত।

গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি পর্ব্বত আছে। তাহাদিগের দ্বারা অল্পস্থল মধ্যেই অনেক প্রকার জল বায়ু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। আথেন্সে অনেক যত্ন না করিলে দক্ষিণ প্রদেশের সুখাদ্য ফল সকল জন্মে না। কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ দিকে চল। আর্গোলিসের উপকূলে কমলা ও কলম্ব লেবুর বিচিত্র উদ্যান দৃষ্ট হইবে। সেস্থল হইতে কয়েক ঘণ্টা মধ্যে এমন স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, যেখানে দ্রাক্ষালতাও বাঁচে না। এদিকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মেসিনি প্রদেশে খর্জ্জুর পর্য্যন্ত পাকিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিকটে নিকটে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হওয়ায়, পরস্পর বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা প্রবল হইবার কথা। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত মধ্যে থাকায়, একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থলপথে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, কুত্র বা অসম্ভব। আটিকা ও বিওসিয়ার মধ্যে পর্ব্বত, এবং এতদুভয় থেসালী হইতে চারি পাঁচ হাজার হাত উচ্চ শৈলমালা দ্বারা বিভক্ত, উক্ত শৈলমালা মধ্যে বিখ্যাত গিরিসংকট থর্ম্মাপলী। করিন্থ যোজক দিয়া দক্ষিণস্থ উপদ্বীপ যাইতেও পাহাড় বাধে; এবং উক্ত উপদ্বীপের মধ্য দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্থলপথে যাওয়া অপেক্ষা জলপথে গমন অনেক সহজ। গ্রীস-দেশের অঙ্গে সমুদ্র সর্ব্বত্র এরূপভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে,সকল স্থান হইতেই উহা নিকটবর্ত্তী। এই প্রকার নানা কারণে, সাগরপর্য্যটন প্রবৃত্তি গ্রীকদিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ঈদৃশ অনুমান করা অন্যায় নহে। উত্তরকালে গ্রীকদিগের যেরূপ বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তাহারা ভূমধ্যসাগরের চতুঃপার্শ্বে যাদৃশ উপনিবে-শাবলী সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের দেশের অবস্থা হইতেই এইরূপে তাহার সূত্রপাত হয়।

গ্রীসের পূর্ব্বপার্শ্বে যেরূপ বন্দর ছিল, ও যেরূপ গমনাগমনের ও বাণিজ্য করিবার সুবিধা ছিল, পশ্চিমপার্শ্বে সেরূপ ছিল না। পশ্চিমপার্শ্বের উপকূল দুরারোহ ও তথাকার বায়ু অসুখকর। সুতরাং পশ্চিমপার্শ্ব রোম ও আথেন্স উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলেও, তাহা পূর্ব্বপার্শ্বের ন্যায় সভ্য হইতে পারে নাই। আথেন্স যে আটিকা প্রদেশের রাজধানী, সে আটিকায় আবশ্যক শস্য জন্মিত না; সুতরাং আথেন্সবাসীরা খাদ্য সংগ্রহ-জন্য বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইতেন। যে সকল স্থান স্পার্টার অধীন ছিল, সেখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত। এই কারণেই বোধ হয় আথেন্সবাসীরা জলপথে যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, স্পার্টাবাসীরা সেরূপ পারেন নাই।

গ্রীসের কোথাও সমতল ক্ষেত্র, কোথাও উচ্চ শৈল ; কোথাও নদীপ্রবাহিত, কোথাও জল পাওয়া দুষ্কর। আটিকা প্রদেশে উত্তম উত্তম বন্দর, পরিষ্কার বায়ু, কিন্তু শস্যের অভাব। বিওসিয়া প্রদেশে যথেষ্ট উর্ব্বরা ভূমি, যথেষ্ট শস্য ; কিন্তু মৃত্তিকা সলিলসিক্ত ও বায়ু কুজ্ঝটিকাবিশিষ্ট। আরও পশ্চিমে চল। দেখিবে দেশ শৈলময়, অধিবাসীরা ছাগ, মেষ চরায় ও পর্ব্বতগহ্বরে বাস করে। দক্ষিণের উপদ্বীপে ও বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে। এইপ্রকার প্রদেশভেদে অবস্থাভেদ ঘটায়, গ্রীসে অল্পস্থানে অধিক মনুষ্যচরিত্রের ভেদ ঘটিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ ধর্ম্ম, ভাষা ও রীতিনীতির বহুপরিমাণ একতা সত্ত্বেও গ্রীক চরিত্রে যে বৈচিত্র দৃষ্ট হয় এইরূপ দৈশিক বৈচিত্রই বোধ হয় তাহার একটি প্রধান কারণ।

পর্ব্বত দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত বলিয়া গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি স্বতন্ত্র রাজ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ইতিহাস লেখকেরা ইহার কয়েকটী ফল বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ গ্রীস কখনই এক সাম্রাজ্য হইতে পারিল না, এবং এ নিমিত্ত অগ্রে মাসিডনের ও পরে রোমের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক রাজ্য ক্ষুদ্র হওয়ায় অল্পদিনেই রাজারা সমুদায় প্রজামণ্ডলীর পরিচিত হইয়া পড়েন, এবং ইহাতে রাজাদিগের দেবত্বে বা অসাধারণ শক্তিতে লোকের বিশ্বাস তিরোহিত হয়। সুতরাং ক্রমে সর্ব্বত্র রাজপদ উঠিয়া যায় এবং প্রদেশের অবস্থাভেদে সম্ভ্রান্ততন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হয়। তৃতীয়তঃ দেশ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত হওয়ায়, স্থানভেদে ভাষাভেদ সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে আথেন্সে একপ্রকার ভাষা, স্পার্টায় আর একপ্রকার, থিব্সে অপর আর একপ্রকার। আবার যে প্রদেশের ভাষায় যে বিষয় প্রথমে আলোচিত হইয়াছিল, ভিন্ন স্থানের লোকে লিখিলেও সেই প্রদেশের ভাষায় সেই বিষয়ের অলোচনা করাই রীতি ছিল। এইরূপে মহাকাব্য সকল দুর্ব্বোধ্য হইলেও হোমরের ভাষায় রচিত হইত। আথেন্সে যে সকল নাটক লিখিত বা অভিনীত হইত, তাহাদিগের অন্তর্গত গীতগুলি আথেন্সের পরমশত্রু স্পার্টার ভাষায় গ্রথিত হইত। এমন কি যখন স্পার্টাবাসীরা আটীকা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতেছিল, তখনও এ রীতির ব্যত্যয় ঘটে নাই। আমাদিগের দেশের কবিরা যখন কৃষ্ণবিষয়ক গীতরচনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণ করেন, তখন তাঁহারা গ্রীকদিগের পথাবলম্বী হন।

যে সকল পর্ব্বত পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রধাবিত তাহারা যেরূপ অবস্থাভেদ উৎপন্ন করে, উত্তর-দক্ষিণে ধাবিত পর্ব্বতগুলি সেরূপ নহে। হিমাচল তিব্বত হইতে

ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিতেছে। হিন্দুকুশ আফগানস্থান হইতে তুর্কিস্থান পৃথক করিতেছে। আল্পস্ পর্ব্বত ইতালীকে ইউরোপের অপরভাগ হইতে স্বতন্ত্র করিতেছে। পীরেনীস্ ফ্রান্স ও স্পেনদেশ বিভিন্ন রাখিতেছে। ইউরাল পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বে রুশিয়া। আপিনাইন পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বেই একই ইতালী রাজ্য। রকি ও আণ্ডিস পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় দেশভেদের হেতু হয় নাই। এইরূপ হইবার একটী কারণ বোধ হয় এই যে, পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রধাবিত পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা যে প্রকার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দেশের শীতাতপভেদ ঘটে, উত্তর-দক্ষিণ প্রধাবিত পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা সে প্রকার হয় না। যখন সমতল প্রদেশস্থ অধিবাসীরা বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠে, তখন অপেক্ষাকৃত শীতল পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীদিগের নিম্নদেশ আক্রমণ দ্বারা জয়লাভ করিবার কথা কোন কোন স্থানে শুনা যায়। কিন্তু আবার যখন কোন দেশে বিজেতৃদল প্রবেশ করে, তখন পরাজিত ব্যক্তিবর্গ পর্ব্বতপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর্য্যদিগের আক্রমণে এদেশে সাঁওতাল, পাহাড়িয়া প্রভৃতি জাতির এইরূপ দশা হইয়াছে।

জঙ্গলে সভ্যতা বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা করে। অরণ্য কাটিয়া কৃষিকার্য্যের অধিকার-বৃদ্ধি, সভ্যতা বিস্তৃতির একটির প্রধান লক্ষণ। ইউরোপখণ্ডে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে বন ছিল। কিন্তু বহুকাল হইল নৈসর্গিক কারণে বা মনুষ্যের প্রভাবে দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশের কানন সকল বিনষ্ট হয়; এবং সেই প্রদেশেই অগ্রে সভ্যতার উদয় হয়। গ্রীস, ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ইহার দৃষ্টান্তস্থল। জঙ্গলের অধিবাসীরা প্রায়ই অসভ্য, এই কারণে জঙ্গলিয়া বলিতে অসভ্য বুঝায়। যখন কোন দেশ বিজিত ও উপনিবেশিত হয়, তখন পরাভূত জাতি অনেকস্থলে নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে। এই নিমিত্ত কানন প্রদেশ অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির বাসস্থল হয়। আমেরিকা ও সাইবেরিয়ায় দেখা যায় যে, যাহারা জঙ্গলে বসতি করে, তাহাদিগের প্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে জঙ্গলিয়া হইয়া যায়। কোন কোন বুদ্ধিমান্ লোকে বিবেচনা করেন যে, মর্ম্মণদিগের বহু বিবাহ আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের নিকট হইতে অনুকৃত।

যাহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জঙ্গলে বাস করে, তাহারা দুর্ব্বল, ক্ষুদ্রকায়, কদাকার ও নির্ব্বোধ হয়। হিমালয়ের দক্ষিণস্থ শালবনের মেচিরা, সিংহলের বৃহদরণ্যের বেদেগণ, মাডাগাস্কার দ্বীপের একনাহিরা, ফ্লোরিডা উপদ্বীপের নিবিড় কাননের আমেরিকেরা ইহার প্রমাণ। যে স্থানে বহুদূরব্যাপী কানন থাকে, সে স্থানের ভূমি এত সলিলসিক্ত হয় যে, তাহা মনুষ্যের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়। ইহাই বোধ হয় জঙ্গলবাসীদিগের অবনতির কারণ।

বাহ্যজগতের অবস্থাভেদে মানবেতিহাসে কিরূপ ফলভেদ ঘটিয়াছে, আমরা দেখাইলাম। কিন্তু কেহই যেন মনে করেন না যে, কেবল দৈশিক সংস্থান দ্বারা, কেবল চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহিঃপদার্থ দ্বারা ইতিহাসের ঘটনামালার ব্যাখ্যা করা যায়। প্রত্যেক জাতির অন্তর্নিহিত শক্তিও এস্থলে গণনীয়। নীলনদের তীরে কাফ্রিরা থাকিলে যে তাহারা প্রাচীন মিসরবাসীদিগের ন্যায় সভ্য হইতে পারিত, কে সাহস করিয়া বলিবে ? আর্য্যেরা যদি ভারতবর্ষে না আসিতেন, তাহা হইলে কি এদেশে বাল্মীকি বা কালিদাসের ন্যায় কবি, গোতম বা কপিলের ন্যায় দার্শনিক এবং আর্য্যভট্ট বা ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় গণিতবেত্তা জন্মিত ? যদি বাহ্যবস্তু হইতেই সমুদয় হয়, তাহা হইলে মিসর, ব্যাবিলনিয়া ও গ্রীসের সভ্যতা অন্তর্হিত হইল কেন ? দেশের ভাব প্রায় একরূপই আছে, কিন্তু অধিবাসীদিগের ভাব অন্যপ্রকার হইয়াছে কেন ? আর্য্যজাতি ইউরোপখণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে তথায় অন্য জাতীয় লোকে বাস করিত ; কিন্তু তাহাদিগের সভ্যতার চিহ্ন ভগ্নপ্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র। যীহুদীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিতেছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাদিগকে চিনা যায়। গ্রীন্‌লণ্ডে যাও, আমেরিকায় যাও, আফ্রিকায় যাও, অষ্ট্রেলিয়ায় যাও ; ইংরেজ সর্ব্বত্রই সমান দেখিবে। চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের অট্টালিকায় যে কাফ্রি চিত্রিত আছে, এখনও তাহার মূর্ত্তি বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আবার দেখ যে বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যে আর্য্যজাতি যে প্রকার উন্নতি দেখাইয়াছেন, অন্য কোন জাতি সেরূপ পারে নাই। এবং সৈমজাতি হইতেই যীহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান তিনটী একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ক্ষমতা ; এবং যে কোন অবস্থায় যে জাতিকে রাখনা কেন, সহসা তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না।

কিরূপে নিগ্রো, মোগল, মালয়, আর্য্য, সৈম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট জাতির উৎপত্তি হইল, স্থির করিয়া বলা যায় না। পরিণামবাদী ওয়ালেস্‌ সাহেব বিবেচনা করেন যে, আদৌ বাহ্যাবস্থার ভেদই এরূপ জাতিভেদ উৎপন্ন হইবার কারণ। যখন মনুষ্যেরা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই, যখন তাহাদিগের কোনরূপ পরিধেয় ছিল না, যখন তাহারা অগ্নিকে আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা পাক করিতে বা নিয়মিত শারীরিক তাপ রক্ষা করিতে জানিত না, তখন তাহারা যে দেশে যাইত, অন্যজীবের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সে দেশের স্বভাবানুবর্ত্তী হইত। সে দেশে শীত থাকিলে, সম্পূর্ণরূপে শীত সহ্য করিত। সে দেশ গ্রীষ্মপ্রধান হইলে আতপতাপে পুড়িত। সেখানে যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য মিলিত, তাহাই আহার করিত। এইরূপে তাহারা সম্পূর্ণরূপে বাসস্থলের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইত।

কিন্তু প্রাচীনকালে যাহা হইয়া থাকুক, সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে বাহ্য-জগতের ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে এবং মনুষ্যের প্রভাব বাড়িতেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানকালে দেশের অবস্থা অপেক্ষা অধিবাসীদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির উপর সভ্যতাবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যে জাতি যে পরিমাণে নৈসর্গিক নিয়ম অবগত হইতেছে ও তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, সেই জাতি সেই পরিমাণে উন্নত হইতেছে। কালে বোধ হয় মনুষ্যের প্রভুত্ব এত বহুবিস্তীর্ণ হইবে যে, ভূমণ্ডলে মানবের অপ্রয়োজনীয় জীবোদ্ভিদ্ কিছুই থাকিবে না এবং প্রাকৃতিক শক্তি পরম্পরা এতদূর মনুষ্যের আজ্ঞাধীন হইবে যে, তাহা কবিরাও কখন কল্পনা করিতে সাহস করেন নাই।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিপদে আরম্ভ

অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র, ভাগীরথীর তীরস্থিত বৃক্ষ সকলের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত করিতেছিল ; মন্দ মন্দ মারুতহিল্লোলে নদীর হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল হইতেছিল ; নদীর উভয়পার্শ্বে মনুষ্য বা মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ণ অথবা অন্য কোন শব্দ ছিল না, কেবলমাত্র সমীরণ সঞ্চালিত নদীতীরস্থ বৃহৎ বৃক্ষদিগের শন শন শব্দ, আর অনন্তপ্রবাহিনী ভাগীরথীর অনন্ত সাগর সম্ভাষণে গমনের কল কল রব শুনা যাইতেছিল। রজনীকান্তের ক্ষুদ্র জলযান, কোন বৃহৎ শ্বেতপক্ষীর ন্যায় শ্বেতপক্ষ বিস্তৃত করিয়া নাচিতে নাচিতে ভাগীরথীর বিশালবক্ষে বিচরণ করিতেছিল। জলোচ্ছ্বাসে যেমন ভাগীরথীর বারিরাশি উছলিতেছিল, পিতৃ মাতৃ সম্ভাষণাকাঙ্ক্ষা সুখ রজনীকান্তের হৃদয়ে তেমত উছলিতেছিল। অনেক দিবসের পর রজনী বাটী যাইতেছিলেন ; রজনী একাগ্রমনে তাহার জননীর মুখমণ্ডল ভাবিতেছিলেন। সেই স্নেহ, সেই যত্ন, সেই ব্যগ্রতা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বাটী পঁহুছিবামাত্র তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার জননী কি করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। কখন কখন তাঁহার বয়স্যবর্গ, কখন বাল্যক্রীড়ার স্থান স্মরণ করিতেছিলেন ; তাঁহাদিগের গ্রামপ্রান্তে সেই নিবিড় ঘনান্ধকার আম্রকানন, তন্মধ্যস্থিত পদ্মপুকুর নামে সরোবর, যাহাতে গ্রাম্যকুলকামিনীগণ অণুক্ষণ আগ্রীব নিমজ্জিতা হইয়া পদ্মবনে পদ্মপুষ্পের সহিত মিশিয়া থাকে এবং যে পুকুরে সাঁতার দিতে দিতে একদিন আপনি ডুবিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেছিলেন। আবার কখন কখন মনে হইতে লাগিল, তাঁহার বিবাহ হইবে। কাহার সহিত বিবাহ হইবে—শিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃকন্যার সহিত ?—কুমুদিনী ? সে ত বাল্যকালে বিধবা হইয়াছে এবং তাহার পুনরায় বিবাহ দিতে না পারায় কুমুদিনীর পিতা হরিনাথ উদাসীন হইয়াছেন। সুবর্ণপুরে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করে কাহার সাধ্য ?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমুদিনীর কি কনিষ্ঠা ভগিনী আছে? বোধ হয় আছে। নহিলে কাহার সঙ্গে বিবাহ স্থির হইতেছে? ভাবিতে ভাবিতে অনন্যমনে নদীর পূর্ব্ব তীর দৃষ্টি করিতেছিলেন; হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। অতিদূরে বনমধ্যে নদীকুলোপরি রাজহংসের ন্যায় একটি ধবল পদার্থ দেখিয়া জানিলেন যে, নিজ গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, কেননা ঐ রাজহংসের ন্যায় ধবল পদার্থ তাঁহার গ্রামের একটি ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট মাত্র; এবং উহা বসুন্ধরার ঘাট বলিয়া খ্যাত। রজনী অধীর হইয়া দাঁড়িদিগের জোরে দাঁড় টানিতে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীর জলোচ্ছ্বাসে এবং বিস্তৃত পালসংযোগে নৌকা তর তর বেগে ছুটিতেছিল, হঠাৎ মাঝিরা পাল নামাইল। রজনী কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, পশ্চিমে বড় মেঘ উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে মেঘ সমুদায় গগনে ব্যাপ্ত হইয়া দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল, অল্পকাল মধ্যেই ঘোররবে প্রবল ঝটিকা উঠিল। ভাগীরথীর প্রশান্ত হৃদয় দুরন্ত হইয়া উঠিল, রজনীকান্তের নৌকায় বিষম কোলাহল উঠিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে নৌকা জলমগ্ন হইল। রজনী সাঁতার জানিতেন, দুরন্ত বেগবান্ তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কিছুদূর আসিলেন। ক্রমে তাঁহার হস্তপদাদি শিথিল হইয়া আসিল, তথাচ কূল অতি নিকটে বিবেচনা করিয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন। ক্রমে অবসন্ন হইয়া অচেতন হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আর একপ্রকার বিপদ

রজনীকান্ত অচেতন হইয়া জলমগ্ন হন নাই, অনুকূল বায়ু দ্বারায় তাড়িত হইয়া কূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। যখন তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন তখন রাত্রি হইয়াছে; ঝড় বৃষ্টি শেষ হইয়াছে। সে প্রকার ঝড়ের হুঙ্কার শব্দ নাই, সে প্রকার নদীর তরঙ্গ নাই, সে প্রকার নদীর শব্দ নাই, সে প্রকার প্রকৃতির সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি নাই, তাহার পরিবর্ত্তে শান্ত এবং সুশীতলমূর্ত্তি হইয়াছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত নিবিড় নীলাকাশে সপ্তমীর চন্দ্র অসংখ্য তারার সহিত বিরাজ করিতেছে; নিম্নে অনন্ত দেশব্যাপিনী বিশালহৃদয়া জাহ্নবী নিঃশব্দে রজনীকান্তের চরণ ধৌত করিয়া ছুটিতেছে। নদীতীর জনহীন, শব্দহীন; কেবল মাত্র রজনীকান্ত মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া শয়ন করিয়া আছেন।

রজনীর জ্ঞানলাভ মাত্রেই বোধ হইল যে, তিনি নদীতীরে মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মস্তক কঠিন মৃত্তিকায় রক্ষিত নহে, অথচ কোমল উপাধানেও নহে। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন এক লাবণ্যময়ী যুবতী অর্দ্ধ জলে

অর্দ্ধ স্থলে বসিয়া সেই বিজন তটিনী কূলে তাহার উরূপরে রজনীর মস্তক রাখিয়া আলুলায়িত আর্দ্র কেশরাশি দ্বারায় ঝড় বৃষ্টি হইতে রজনীর দেহ রক্ষা করিতেছিল। রজনী স্বপ্ন মনে করিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা তাঁহার পাদমূলে আঘাত করাতে সে ভ্রম দূর হইল, আবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন কিন্তু পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইলেন না। যুবতীর মুখ কুঞ্চিত বিপুল কেশরাশি-মধ্যে লুক্কায়িত। সেই কেশরাশির শেষাগ্রভাগ রজনীকান্তের বাহুদ্বয়, বক্ষ, মুখমণ্ডল আবরণ করিতেছে; যুবতী মধ্যে মধ্যে সেই সুগন্ধযুক্ত কেশগুচ্ছ সকল রজনীর নাসিকাগ্রভাগ হইতে কোমল অঙ্গুলি দ্বারা স্থানান্তরিত করিতেছে। রজনী যুবতীর মুখ দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তিনি যে অলকাগুচ্ছের অন্তরাল হইতে তাঁহার প্রতি ব্যগ্রভাবে দৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহা দেখিলেন। রজনী বিংশতি বৎসর বয়স্ক। এ বয়সে কে সেই সপ্তমী চন্দ্রালোক-বিধৃত কলকলনাদী তরঙ্গিণীর তীরোপরি নিবিড় কেশরাশি-মধ্যে লুক্কায়িত অপ্সরানিন্দিত সুন্দরীর উরূপরে মস্তক রাখিয়া, তাহার কেশরাশি বক্ষে করিয়া মোহিত না হয়? রজনী আত্মবিস্মৃত হইলেন, নিজ বিপদ্ ভুলিয়া গেলেন, স্বাভাবিক বল পাইলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

অনন্তর যুবতী চকিতনেত্রে মস্তক নত করিয়া রজনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। উভয়ের নিশ্বাস মিশ্রিত হইল। যুবতীর অলকগুচ্ছ রজনীর গণ্ডদেশে পড়িল। রমণী দেখিলেন যে, রজনী চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছেন, অমনি সলজ্জে অঞ্চল টানিয়া মস্তক এবং পৃষ্ঠ আবরণ করিতে চেষ্টা করিলেন এবং সেই চেষ্টাতে অলক্ষ্যে রজনীকান্তের মস্তক তাহার উরু হইতে ভূমে পতিত হইল। অমনি যুবতী আপনার মস্তক আবরণ করিতে ভুলিয়া গেলেন এবং দুই হস্তে তাহার মস্তক ধারণ করিয়া অতি দয়ার্দ্র স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আহা!" তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেগেছে কি?" রজনীকান্ত সেই স্বর শুনিলেন; যেমন কোন পুষ্পের সুগন্ধ আঘ্রাণে অথবা কোন সঙ্গীত শ্রবণে কখন কখন মনুষ্য-হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়, এই রমণীকণ্ঠ-স্বর শুনিয়া রজনীর সেইরূপ হইল। রজনী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, যুবতী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেগেছে কি?"

রজনীকান্ত উত্তর করিলেন, "না—আপনি কি মুখুয্যেদের—?" তখন রমণী আত্মস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া অঞ্চল টানিয়া মস্তক আবরণ করিয়া সলজ্জে মৃদু মৃদু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, রজনী প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন বসন্তপবনসঞ্চালিত মেঘবৎ আস্তে আস্তে চলিলেন। রজনীও উঠিলেন, দুই একবার পদস্খলিত হইল, তথাপি চলিলেন; সম্মুখে একটি বাঁধাঘাট দেখিলেন এবং চিনিলেন যে, তাঁহার নিজ গ্রামের বসুন্ধরার ঘাট। অতি ধীরে ধীরে

সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরে আসিলেন। কিন্তু রমণীকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার পরিচয় লাভার্থ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, *কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না ; এই আর একরূপ বিপদ্।*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিপদ নানাপ্রকার

পূর্ব্বকথিত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে এক দিবস রজনীকান্ত গঙ্গাতীরে একাকী দাঁড়াইয়া নদীর শোভা দেখিতেছিলেন। সম্মুখে জাহ্নবীর অনন্ত বিস্তার নীলাম্বুরাশি, তদুপরি বণিক্‌দিগের বৃহৎ বৃহৎ তরণী শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া অতি দূর হইতে উড্‌ডীন, শ্রেণীবদ্ধ রাজহংসের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কিন্তু রজনী সে সকল কিছুই দেখিতেছিলেন না। অতি দূরে একখানি ক্ষুদ্র তরী শ্বেতপাল বিস্তৃত করিয়া তর তর বেগে আসিতেছিল, তিনি তাহাই অনিমিষ লোচনে দেখিতেছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইলে তাঁহার জলমগ্ন বৃত্তান্ত সুখস্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। কাল মেঘ তাঁহার মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সেই পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গের গর্জ্জন তাঁহার মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার সেই বিপদে পড়িতে ইচ্ছা জন্মিল। আবার সেই সুন্দরীর উরূপরে মস্তক রাখিতে বাসনা হইল। এই যে নৌকা তর তর বেগে আসিতেছে, ইহাতে আরোহণ করিলে তৎক্ষণাৎ কাল মেঘ উঠিবে, সেইরূপ প্রচণ্ড ঝড় উঠিবে, শেষে নৌকা জলমগ্ন হইবে, পুনরায় রমণীকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু রজনীর আশা নিষ্ফল হইল ; নৌকা নক্ষত্রবেগে বসুন্ধরার ঘাট উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে ছুটিল। রজনী নিরাশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তৎপরে পশ্চাতে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিয়া মস্তক ফিরাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সমবয়স্ক একটি যুবা তাঁহার দিকে হাসিতে হাসিতে আসিতেছে। যুবক তাঁহার বাল্যসহচর, নাম মহেন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনাথ রজনীকে কলিকাতার নানা সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রজনীকান্ত অন্যমনস্ক হইয়া কেবল "হাঁ" এবং "না" উত্তর করিতে লাগিলেন। রজনীর এই প্রকার ভাবান্তর দেখিয়া মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রজনী, প্রায় দুই মাস হইল আমি যখন তোমায় কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম, তখন তুমি সদানন্দ ছিলে, এখন ঈদৃশ ভাবান্তর কেন? তোমার বাটী আসাতে কোথায় আনন্দ বৃদ্ধি হইবে—না উহা হ্রাস হইল? ইহার কারণ একমাত্র আমার অনুভব হইতেছে যে, তুমি কলিকাতায় কোন রমণীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছ এবং তাহার বিচ্ছেদে এমন বিমর্ষ হইয়াছ।" রজনীকান্ত উত্তর দিলেন

না। মহেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার এই শেষ উক্তিতে রজনীর চমক ভাঙ্গিল। তিনি তাঁহার বিমর্ষতার কারণ এপর্য্যন্ত অনুসন্ধান *করেন নাই; অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার হৃদয়-মুকুরে সেই জাহ্নবীতট-বিহারিণী যুবতীর ছায়া রহিয়াছে। রজনীকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন যে,* সেই যুবতীকে প্রথম সন্দর্শনেই ভালবাসিয়াছেন। তবে সেকি শৈশবসহচরী কুমুদিনী! তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অন্যমনে সেই জাহ্নবীতীরে দাঁড়াইয়া, একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের পাতা লইয়া, হস্তদ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া জাহ্নবীনীরে প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং কেমন তাহারা ক্ষুদ্র বীচিমালা সঞ্চালনে নাচিতেছিল তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বালিকার প্রেম তাও বিপদ

এখনও অল্প অল্প বেলা আছে—আম্র, বকুল, নারিকেলাদির উচ্চশাখায় সুবর্ণ সদৃশ সূর্য্যকিরণ এখনও জ্বলিতেছিল, প্রশান্ত গঙ্গাহৃদয় অতি ক্ষুদ্র বীচিমালা-সঞ্চালনে প্রতিস্ফুরিত হইতেছিল। এমত সময়ে দুইটি বালিকা গাত্রধৌত করিতে আসিতেছিল। পথ জনশূন্য, বালিকারা অন্য দিন আমোদে আমোদে আসিয়া থাকে, কিন্তু আজ ভয়ে ভয়ে আসিতেছিল। দেখিল কোথাও লোক নাই, শব্দ নাই, কেবল মাথার উপরে নীলনভোমণ্ডলে পাপিয়ার আকাশব্যাপী রব আর পৃথিবীতে জাহ্নবীর মৃদুবাত সংস্পর্শ জনিত মধুর ধ্বনি। বালিকারা দ্রুতপাদবিক্ষেপে সঙ্কোচিত নয়নে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে চলিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠা হঠাৎ দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিদ্বারা গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি অশ্বত্থবৃক্ষ প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া জ্যেষ্ঠাকে কহিল, "দেখ স্বর্ণপ্রভা, ঐ গাছের আড়ালে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।" স্বর্ণপ্রভা একাদশ-বর্ষীয়া আশ্চর্য্য সুন্দরী, তাহার শরীর যুবতীদিগের ন্যায় গুরুত্ব প্রাপ্ত হইতেছিল। স্বর্ণপ্রভা কহিল "কৈ?" বয়ঃকনিষ্ঠা অর্থাৎ কামিনী ভয়সূচক মৃদু স্বরে পুনরায় অঙ্গুলিদ্বারা দেখাইল "ঐ," এবং তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল,—"স্বর্ণপ্রভা, তোর বর লো তোর বর।" স্বর্ণপ্রভা একবার চাহিয়া দেখিল, পরে সলজ্জে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাটীর দিকে দৌড়িল। রজনীকান্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে সকল দেখিতেছিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, বুঝি স্বর্ণপ্রভার সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে সুখী হইতে পারিবেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই গঙ্গাতটবিহারিণী রমণীর ছায়া হৃদয়মধ্যে অনুভব করিলেন। রজনীর অমনি সকল সুখের আশা অন্তর্হিত হইল, রজনী চিন্তা করিবার অবকাশ পাইলেন না। বালিকাদিগের মধ্যে চীৎকারধ্বনি শুনিলেন। দেখিলেন, স্বর্ণপ্রভা

দৌড়িতে দৌড়িতে পড়িয়া গিয়াছেন। রজনী রুদ্ধশ্বাসে গমনপূর্ব্বক স্বর্ণপ্রভাকে হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। স্বর্ণপ্রভা লজ্জায় রক্তিমাবর্ণ হইল, এবং রজনীর হস্তত্যাগ করিবার জন্য বলপ্রকাশ করিল, রজনীও বলপ্রকাশ করিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্য! রজনী পরাভূত হইলেন। স্বর্ণপ্রভা কামিনীকে ইষ্টিগুরু, গঙ্গার শপথ করাইয়া নিষেধ করিলেন, যেন রজনীকান্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ কাহারো নিকটে প্রকাশ না করে। স্বর্ণপ্রভা বাটী পৌঁছিয়া সন্ধ্যার সময় কালী বাড়ীতে আরতি দেখিতে গিয়া প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলেন, "হে মা কালি, রজনীকান্ত যেন আমার বর হয়।" তৎপরদিন প্রত্যূষে স্বর্ণপ্রভার মাসি দুর্গা দুর্গা বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছিল, স্বর্ণপ্রভা অমনি মনে মনে বলিল,—"হে মা দুর্গা, রজনীকান্ত যেন আমার বর হয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কেশবিন্যাস

তাহাই হইল, দুই সপ্তাহ পরে দেবতারা স্বর্ণপ্রভার প্রার্থনা শুনিলেন, রজনীকান্তের সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইল। আগামী সোমবার ২২শে আষাঢ় বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। অদ্য গাত্র-হরিদ্রা, সুবর্ণপুরে বড় ধূম; বরকর্ত্তা, কন্যা-কর্ত্তা উভয়েই ধনাঢ্য, উভয়েই বিবাহ-উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত। কন্যা-কর্ত্তার বাড়ীতে অদ্য বড় গোল, স্বর্ণপ্রভার আহ্লাদের শেষ নাই, রজনীকান্ত তাহার বর হইবে।

অপরাহ্নে তাহার বিংশতিবর্ষীয়া বিধবা ভগিনী কুমুদিনী তাহার কেশরাশি লইয়া প্রাসাদোপরি বসিয়া বিন্যাস করিতেছিল। সম্মুখে আদরদিদি নামে এক বৃদ্ধা ঠাকুরাণী দিদি দাঁড়াইয়া,—আদরদিদি নামেও যেমন কাজেও তেমন, সকলকেই আদর করিতে ভালবাসিতেন, ভগিনীদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠাকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন,—"আহা! কুমু আমাদের কি সুন্দরী! অমন সুন্দরী স্বর্ণও নয়—"

কুমুদিনী বিরক্ত হইয়া বলিল,—"আদরদিদি! স্বর্ণের চেয়ে আমায় সুন্দরী বলিলে আমি কি সন্তুষ্ট হইব?" স্বর্ণপ্রভা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি রাগ করিলি কেন, সত্য সত্যই ত তোর মতন সুন্দরী কেউ কখন দেখে নাই।" আদর-দিদি ভীত এবং অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "তা নয়, আমি স্বর্ণপ্রভাকে কুৎসিত বলি নাই, স্বর্ণও বড় সুন্দরী, আর তেমনি উপযুক্ত পাত্রেও পড়িল; কুমু, তুই স্বর্ণপ্রভার বর রজনীকান্তকে কখন দেখিয়াছিস্?"

কুমুদিনী নীরব হইয়া রহিল।

আদর। আমি দেখিয়াছি, দিব্বি সুন্দর, তবে কি না, শুনেছি সদা সর্ব্বদা বিমর্ষ, বুঝি কোন আবাগি ঔষধ করেছে, আহা! কার রূপে বশীভূত হইয়াছে, তা হক, আমাদের স্বর্ণপ্রভা তেমন মেয়ে নয়, শীঘ্র বশ করে নেবে।

এই প্রকারে কথোপকথন চলিতেছিল, কিন্তু কুমুদিনী উহাতে বিরক্তি প্রকাশ করাতে আদরদিদি চলিয়া গেল। স্বর্ণপ্রভা কেশ রচনা শেষ হইলে চলিয়া গেল, যাইতে যাইতে অস্ফুটস্বরে আদরদিদিকে সম্বোধন করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল "শীগ্‌গির মর্, শীগ্‌গির মর্, শীগ্‌গির মর্।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহ, সন্দেহ ভঞ্জন

অদ্য বিবাহরাত্রি। বড় ধুম, সুবর্ণপুরের পথ ঘাট জনাকীর্ণ, কত দেশ দেশান্তর হইতে কত শত শত লোক বিবাহ দেখিতে আসিয়াছে। বরের বাটী হইতে কন্যার বাটী পর্য্যন্ত আলোকময়, এবং অবিশ্রান্ত লোক জন যাতায়াত করিতেছে; রাত্রি এক প্রহরের পর রজনীকান্ত বরবেশে শিবিকারোহণ করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার স্বজনগণের অসুখ জন্মিল। চারিদিক্ হইতে দর্শক-মণ্ডলীর কোলাহলে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বৃহৎ অট্টালিকার একটী নিভৃত কক্ষে স্বর্ণপ্রভা সেই গগনভেদী কোলাহল শুনিলেন, তাঁহার হৃৎকম্প হইল, অকারণে মনে ভয়সঞ্চার হইল, স্বর্ণপ্রভা কাঁদিয়া উঠিলেন। জ্যেষ্ঠা কুমুদিনী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনিও কাঁদিয়া উঠিলেন, কি কারণে কাঁদিতে লাগিলেন দুইজনের কেহই বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে কোলাহল নিকটবর্ত্তী হইল এবং পরক্ষণেই পৌরস্ত্রীগণ "বর আসিয়াছে" "বর আসিয়াছে" বলিয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিল। স্বর্ণপ্রভার ক্ষণকালের জন্য আহ্লাদে শরীর কণ্টকিত হইল, বর আসনে গিয়া বসিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া পৌরস্ত্রীগণ নানাপ্রকার ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। যে সকল যুবতী বাসরে বরের সহিত রহস্য করিবার আশায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বরকে দেখিয়া অস্ফুট স্বরে বলাবলি করিতে লাগিলেন "ও আবার কি রকম? ছোঁড়া কি লড়াই করিতে আসিয়াছে নাকি?" স্বর্ণপ্রভার জননী রজনীকান্তের মূর্ত্তি দেখিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। কন্যাকর্ত্তা বিষণ্ণবদনে সভাস্থ সকলের নিকট অনুমতি লইয়া বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। স্বর্ণপ্রভা স্ত্রী-আচারস্থানে আনীত হইল, কুমুদিনী স্বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। স্ত্রী-আচার আরম্ভ হইল; দূর হইতে এক উন্মাদিনী গাইয়া উঠিল।—

যমুনার জলে গিয়ে
কদমতলার পানে চেয়ে
না জানি দেখিলা কোন জনে।

রজনীকান্ত সচকিত নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কি দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল—শরীর কাঁপিতে লাগিল। কন্যা-সম্প্রদান হইল, দুই হাত এক হইল, স্বর্ণপ্রভা যাবজ্জীবনের জন্য রজনীকান্তের হইল। সন্ধ্যা হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এখন একবার গভীর নিনাদে মেঘ ডাকিল, বিদ্যুৎ হানিল, পরক্ষণে প্রবল ঝটিকা উঠিল, প্রাঙ্গণের আলো নিবিয়া গেল, পৌরস্ত্রীগণ কোলাহল করিয়া উঠিল, কন্যার জননী বর-কন্যা বাসরে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু অন্ধকারে বরকে দেখিতে পাইলেন না। আলো আনিলেন, তথাচ দেখিতে পাইলেন না। বাটীর এদিক্ ওদিক্ চতুর্দ্দিক্ অবশেষে সমুদায় গ্রাম আলো লইয়া ভৃত্যবর্গ অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও বরকে দেখিতে পাইল না, তখন কন্যাকর্ত্রী চীৎকার করিয়া আছাড়িয়া ভূমিতে পড়িলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিপদের উপর বিপদ

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, গভীরশব্দে শ্রাবণের মেঘ ডাকিতেছে, শন শন শব্দে ঘোরতর বায়ু বহিতেছে, রজনীকান্ত জনহীন প্রকাণ্ড এক প্রান্তরমধ্যে একাকী। বর্ষাকালে প্রান্তরের স্থানে স্থানে জল দাঁড়াইয়াছে, কর্দ্দম হইয়াছে, রাত্রি ঘনান্ধকার —ত্রয়োদশীর রাত্রি। রজনীকান্ত চলিলেন। অন্ধকারে কোথায় যাইবেন? কিন্তু দুঃসহ মনের চাঞ্চল্য হেতু রজনীকান্ত একস্থানে স্থির হইতে পারিলেন না, সুতরাং চলিলেন,—কাদার উপর দিয়া চলিলেন,—মধ্যে মধ্যে জলের উপর দিয়া চলিলেন। আবার পথ অন্বেষণে দাঁড়াইলেন, অন্ধকারে কোথায় পথ! পশ্চাতে একবার মনুষ্য-পদশব্দ শুনিতে পাইলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কেও?" কোন উত্তর পাইলেন না, কিছু দেখিতেও পাইলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন; একবার ভাবিলেন, তাঁহার সদ্য-বিবাহিতা স্বর্ণপ্রভাকে ত্যাগ করিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছেন, সম্মুখে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ বাতাসে শন শন শব্দ করিতেছিল, রজনীকান্ত তাহাতে বুঝিলেন যেন বৃক্ষ তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেছে—"কি কুকাজ করিলে"; পবনদেব যেন রাগান্বিত হইয়া তাঁহার কানে কানে কহিতেছেন—"ছি,ছি! কি কাজ করিলে?" আবার তখন কি ভাবনা মনোমধ্যে উদয় হইল, রজনী অমনি দ্রুত চলিলেন। এবার হাঁটুসমান জলে আসিয়া পড়িলেন। কোথাও পথ দেখিতে পাইলেন না,

সম্মুখে এক ধবল পদার্থ দেখিলেন। মনুষ্য বলিয়া বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও ?" এবার উত্তর পাইলেন "পথিক," রজনীকান্ত অনুভবে বুঝিলেন যে, পথিক এক দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী। তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে প্রান্তর উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইতে পার ?" পথিক কহিল, "আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।" রজনীকান্ত চলিলেন। কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া পথিককে আর দেখিতে পাইলেন না, চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "কোথা গেলে গো ?" উত্তর নাই, কেবল প্রান্তরের অপর পার্শ্ব হইতে প্রতিধ্বনি হইল "হো হো।" রজনীকান্ত আবার দাঁড়াইলেন, এবার কলকলনাদী সমীরণ-সন্তাড়িত ভাগীরথীর তরঙ্গগর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। সেই শব্দ উদ্দেশে চলিলেন। এখন একটু আকাশ পরিষ্কার হওয়াতে পথ দেখিতে পাইলেন। হঠাৎ সম্মুখে দেখিলেন বহুবারিপূর্ণা শ্রাবণ মাসের গঙ্গা কলকল রবে তরতর বেগে সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে। সম্মুখে গঙ্গাবাসীর কোটা দেখিয়া রজনীকান্ত বুঝিলেন যে, অন্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই বসুন্ধরার ঘাটে আসিয়াছেন। এই স্থানে প্রায় মাসাবধি হইল তাঁহার বিপদ্ ঘটিয়াছিল। এই ঘাটে কুমুদিনীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মূর্চ্ছিত ছিলেন। রজনী অনেকক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া নদীর ভয়ঙ্কর শোভা দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে জলক্রীড়ার শব্দ শুনিলেন, বোধ হইল কে জলে গা ধুইতেছে। আস্তে আস্তে ঘাটে নামিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল—কুমুদিনী একাকিনী রাজহংসীর ন্যায় জলক্রীড়া করিতেছে। রজনীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না কিন্তু জলবিহারিণী রমণী মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে বলিল, "কে, রজনীকান্ত, ভগিনীপতি ?" রজনীর শরীর কণ্টকিত হইল; অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কেন ?" জলবিহারিণী উত্তর করিল "ডুবে মরিব বলে।"

রজনী কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দুঃখে ডুবে মর্‌বে ?" জলবিহারিণী কামিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "আমি সত্য সত্যই ডুবিতে আসি নাই, তুমি আমার ভগিনীপতি, আমি পরীক্ষা করিতেছিলাম আমার প্রতি তোমার স্নেহ জন্মিয়াছে কিনা।" রজনীকান্ত উত্তর না করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "আমিও জানিতে ইচ্ছা করি তোমার ভগিনীপতির প্রতি তোমার স্নেহ জন্মিয়াছে কিনা—আজ আমি এই গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিব, দেখি তুমি কি কর।" কুমুদিনী উত্তর করিল, "ভগিনীপতি, তোমার কি মনে পড়ে ? যখন আমরা বাল্যকালে একত্রে ক্রীড়া করিতাম, এক দিবস পদ্মপুকুরে আমার জন্য একটি পদ্ম তুলিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিলে, মনে পড়ে ? কে তোমায় বাঁচাইয়াছিল ; আর সেদিন এই গঙ্গাতীরে যেমন করে একবার বাঁচাইয়াছিলাম তেমনি করে এবারও

বাঁচাব।" এই উত্তরের পর উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন। যেন গঙ্গার ভীষণ শোভায় দুইজনেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, ক্ষণেক পরে রজনী বলিলেন, "আচ্ছা তবে আমি জলে ডুবি, তুমি সেই প্রকারে আমায় বাঁচাও দেখি।" এই বলিয়া কূল হইতে জলে ঝাঁপ দিলেন, অমনি কুমুদিনীও চীৎকার করিয়া রজনীর পশ্চাতে পশ্চাতে ঝাঁপ দিলেন। চীৎকারধ্বনি সেই ভীষণ তমিশ্র নৈশ গগনে আরোহণ করিয়া গঙ্গার একূল ওকূল হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। কুমুদিনী রজনীকে ধরিতে গিয়া দেখিলেন, তাহার সম্মুখে এক দীর্ঘাকার পুরুষ চিবুক পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুমুদিনী কাঁদিয়া তাহাকে বলিলেন, "ওগো তুমি কে গো রক্ষা কর, আমার ভগিনীপতি এইমাত্র জলে ডুবিল, তাহাকে বাঁচাও।" আগন্তুক অতি ক্রুদ্ধ এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কুমুদিনি!" কুমুদিনীর শরীর কাঁপিয়া উঠিল, নিস্পন্দ হইল। তিনি দেখিলেন, এক দীর্ঘাকার ভীষণাকৃতি সন্ন্যাসী তাঁহাকে ডাকিতেছে। ভয়ে তাঁহার অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী পুনরপি ডাকিল, "কুমুদিনি! "তুমি যাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলে তাঁহার শিবপূজা শেষ হইয়াছে। ঐ দেখ তিনি তোমার জন্য মন্দিরের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, উঠ বাড়ী যাও।" কুমুদিনী বলিল, "আমার ভগিনীপতি?" সন্ন্যাসী বলিল "ভয় নাই।" মন্দিরের নিকট হইতে বামাকণ্ঠে একজন ডাকিল, "কুমু, আয় আমার হইয়াছে।" কুমুদিনী আস্তে আস্তে তীরে উঠিয়া চলিলেন। আবার দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভগিনীপতিকে আমাদের সঙ্গে পাঠাও, আজ যে তাহার বাসর।" সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ হইতে কে উত্তর করিল "এই আমার বাসরঘর।"

বিধির অনন্ত লীলা !—অনন্ত সৃজন !
একদিকে দেখ, উচ্চ হিমাদ্রি শিখর,
ভেদিয়া জিমূত রাজ্য আছে দাঁড়াইয়া,—
প্রকৃতি গৌরবধ্বজা, অচল অটল ;
অন্যদিকে দেখ নীল ফেণিল সাগর
ব্যাপিয়া অনন্ত রাজ্য !—সতত চঞ্চল,
অচিন্ত্য জীবনে যেন সদা সঞ্চালিত,
সদা বিলোড়িত, সদা কম্পিত, গর্জ্জিত।
উপরে অসীম নভঃ নক্ষত্র মালায়
প্রজ্বলিত—কে বলিবে কত কাল হতে ?
কে বলিবে কত কাল প্রজ্বলিত রবে ?
নীচে নীল নীর-রাজ্য—অনন্ত, অসীম ;
কতকাল হতে তাহে ভাসিতেছে হায় !
অসংখ্য পৃথিবী খণ্ড, কে বলিতে পারে ;
কে বলিবে কতকাল ভাসিবে এ রূপে ?
মধ্যে এক খণ্ড বারি !—এক তীরে তার
পুণ্য ভূমি ইউরোপ জুড়ায় নয়ন,
রঞ্জিত স্বভাবে, শিল্পী—চারু অলঙ্কৃতা !
অন্য তীরে প্রকৃতির প্রকাণ্ড শ্মশান,
মরুভূমে ভয়ঙ্করা 'আফ্রিকা' ভীষণ !
বিধির অনন্ত লীলা ! কে বলিবে হায় !
এই দুই রাজ্য এক শিল্পীর সৃজন !
লজ্জিতা প্রকৃতি বুঝি তাই রোষ ভরে,
হতভাগ্য আফ্রিকায় করিতে মগন
অনন্ত জলধি জলে, দুই মহা শাখা
করিল প্রেরণ দুই সূচীরন্ধ্র পথে—
উত্তরে ভূমধ্য,—পূর্ব্বে রক্তিম সাগর।
দুঃখিনী আফ্রিকা ভয়ে পড়িল কাঁদিয়া
"এসিয়া" চরণ তলে ; ভারত-গর্ব্বিণী
দিলেন অভয়, রাখি স্কন্ধের উপরে
চরণ কনিষ্ঠাঙ্গুলী ; অশক্ত বারীশ
বলে টলাইতে তারে ! সেই দিন হতে,
পুণ্যবতী এসিয়ার শুভ পরশনে,
মরুভূমি মধ্যে মৃগ-তৃষ্ণিকার মত,
সোণার মিশর রাজ্য হইল সৃজন।
মিশর অপূর্ব্ব সৃষ্টি ! দৃশ্য মনোহর !
বিশাল অরণ্য যার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ;
আপনি সাগর গড় প্রহরীর প্রায়
আছে দাঁড়াইয়া, জগত-বিস্ময়
'টলেমির' চিরকীর্ত্তি-স্তম্ভ সারি সারি।
অদূরে আলোক স্তম্ভ(১)—আকাশ প্রদীপ !
জ্বলিতেছে নীলাকাশে নক্ষত্রের মত,—
নিশান্ধ নাবিকগণ নয়ন রঞ্জন !
শিল্পীর গরবে মাতি প্রকৃতি মানিনী,
পরাইল নীল নদী (২) নীলমণি হার,—
তরল আভায় পূর্ণ ! ভুবন বিজয়ী
'মেকিডন' অধিপতি গ্রন্থি স্থলে তার,
বিশ্ব-খ্যাত রাজধানী করিলা স্থাপন। (৩)

(১) LIGHTHOUSE of Sesostres.
(২) River Nile.
(৩) Alexandria.

রাজধানী রাজহর্ম্মে বসিয়া নীরবে,
বিরস বদনে, আজি টলেমি-দুহিতা
ক্লিওপেট্রা ;—মরি চিত্র বিশ্ববিমোহিনী !
ধরা ব্যাপী 'রোম' রাজ্যে, যে রূপের তরে
ঘটিল বিপ্লব ঘোর ; যে রূপ শিখায়
বিশ্বজয়ী বীরগণ,—যাহাদের হায় !
বীরপণা ইতিহাসে রয়েছে লিখিত
অমর অক্ষরে ! করে, অস্ত্রে যাহাদের,
সমগ্র পৃথিবী ভার ছিল সমর্পিত !—
সিজার, এণ্টনি,—এই নাম যুগলের
সসাগরা বসুন্ধরা ছিল সমতুল !—
হেন বীরগণ, যেই রূপের শিখায়
পড়িয়া পতঙ্গ প্রায় হলো ভস্মীভূত,
কেমনে বর্ণিব আমি সে রূপ কেমন ?
মিশর বিহনে এই আফ্রিকা যেমন
মরুভূমি, এই রূপ বিহনে তেমন—
কেবল মিশর নহে—এই বসুন্ধরা
বিস্তীর্ণ অরণ্য সম। চিত্রিব কেমনে
হেন রূপ রাশি ?—রূপ অনুপম ভবে !
কল্পনা অতীত রূপ,—নহে চিত্রনেয় !
বিষাদ আঁধারে এই রূপ-কহিনুর
জ্বলিতেছে ; জ্বলিতেছে শুখতারা সম
বিষাদ আকাশ গায়ে যুগল নয়ন।
দুই বিন্দু—দুই বিন্দু বারি,—মুক্তানিভ !—
আছে দাঁড়াইয়া দুই নয়ন কোনায় ;
নড়ে না, ঝরে না,—আহা ! নাহি চাহে যেন
ত্যজি সেই অনঙ্গের আনন্দ-আসন,
পড়িতে ভূতলে ; হেন স্বর্গ-ভ্রষ্ট হতে
কে চাহে কখন ? যেই নয়নের জ্যোতিঃ
কামান অভেদ্য বক্ষে করিয়া প্রবেশ,
উচ্ছ্বাসিয়া হৃদয়ের বিলাস লহরী,
ভাসাইল তাহে রোম হেন রাজ্য-লিপ্সা
(সসাগরা পৃথিবীর রাজসিংহাসন !)
আজি সেই নেত্রে আহা ! সজল এমন !
বিষাদ লহরী, পূর্ণ-বদন-চন্দ্রিমা,
রম্য রাজাসন পৃষ্ঠে ফেলিছে ঠেলিয়া ;
অপমানে কেশরাশি, বিলম্বিয়া কায়,
আসনের পৃষ্ঠ বাহি পড়িয়া ধরায়,
বিদারি ভূতল চাহে পশিতে তথায় ;—
'রোমেশ' হৃদয় যার অতুল আধার,
স্বর্ণ-সিংহাসন তার তুচ্ছ অতিশয় !
রক্ষিত যুগল কর, বক্ষে রমণীর—
হায় ! যেই রমণীয় কর সঞ্চালনে
বীরগণ হৃদয়ও হইত চঞ্চল,
প্রণয় তাড়িত-ক্ষেপে ;—ইঙ্গিতে যাহার
চলিত পুতুল প্রায় ধরার ঈশ্বর,—
আজি সেই কর আহা ! অবশ, অচল !
পাষাণ হৃদয়োপরে, পাষাণের প্রায়
রয়েছে পড়িয়া ; বুঝি হৃদয় পিঞ্জর
ভাঙ্গি রমণীর প্রাণ চাহে পলাইতে,
সেই হেতু, হায় ! এই যুগল পাষাণ,
রেখেছে চাপিয়া সেই হৃদয় কপাট।
দৃষ্টিহীন সঙ্কোচিত যুগল নয়ন,—
অপলক, অচঞ্চল ! চাহি ঊর্দ্ধ পানে ;
কৃষ্ণ রেখাঙ্কিত দুই কমলের দলে,
হইয়াছে যেন নীলমণি সন্নিবেশ !
মরি কি বিষাদ মূর্ত্তি ! সম্মুখে বামার,
রতন খচিত শ্বেত প্রস্তরের মঞ্চে,
শোভিছে আহার্য্য চয় ; বহুমূল্য পাত্রে
শোভিছে মিশর জাত সুরা নিরমল !
উপরে জ্বলিছে দীপ বিলম্বিত ঝাড়ে ;
বিমল স্ফটিকে দীপ শাখায় শাখায়
জ্বলিতেছে, চারু চিত্র খচিত দেয়ালে।
অনন্ত আনন্দময়ী, আমোদ রূপিণী
ক্লিওপেট্রা সুন্দরীর, এই সেই কক্ষ
মনোহর—অনঙ্গের চিরবাস ! রতি
অধিষ্ঠাত্রী দেবী !—যেই কক্ষ আনন্দের
ধ্বনি, অতিক্রমি সিন্ধু, প্রবেশিয়া রোমে

'সেনেট' (৪) মন্দিরে হতো প্রতিধ্বনি ময়,
গণিত জেমেশ (৫) কেহ রোমে নিশি জাগি
লহরী যাহার ; সেই আনন্দ ভবনে
আজি কেন দেখি সব নীরব, অচল !
অচল আলোক রাশি ; দেখায় দেয়ালে
অচল মানব চিত্র ; অচলিত ভাবে
পড়ে আছে যন্ত্রচয় যন্ত্রী অনাদরে ;
অচল অনীল কক্ষে, অজ্ঞাত পরশে
আন্দোলিত হয়ে পাছে মধুর 'সিটার' (৬)
বামার বিষাদ স্বপ্ন করে অপনীত ;
অচল বামার মূর্ত্তি ; অচল হৃদয়ে
অচল যুগল কর ; অচল জীবন
স্রোত ; চিত্রার্পিত প্রায় দাঁড়াইয়া পাশে
অচল ভর্ত্তৃর শোকে, সহচরীদ্বয়
কেবল বামার সেই অচল হৃদয়ে,
সবেগে বহিতেছিল, ঝটিকা তুমুল !
"ওলো চারমিয়ন !"(৭)—চমকিল সখীদ্বয়
বামার বিকৃত কণ্ঠে, হলো রোমাঞ্চিত
কলেবর ; যেন এই তমসা নিশীথে
শ্মশান হইতে স্বর হইল নির্গত !—
"ওলো সহচরি ! এই হৃদয় মন্দিরে
অভিনেতা ছিল যেই প্রণয় দুর্লভ,
অন্তরিত হলো যদি, তবে কেন আর
এ বিলম্ব যবনিকা হইতে পতিত ?
শূন্য আজি রঙ্গভূমি ! যৌবন পরশে
উঠিল প্রথমে যবে লজ্জা আবরণ,
দেখিলাম রঙ্গভূমি নায়ক এণ্টনি,
জীবন সঙ্গীত স্রোতে খুলিল নাটক—
ক্লিওপেট্রা জীবনের চারু অভিনয়।"
"সুখদ প্রথম অঙ্কে, ওলো চারমিয়ন !—
আছে কি হে মনে ?—অনন্ত বালুকাময়ী
প্রাচি মরুভূমি—পন্থাহীন, বারিহীন ;—
পদতলে প্রজ্জ্বলিত বালুকা অনল ;
তৃষ্ণাগ্নি হৃদয়ে, শিরে উল্কা রাশি রাশি,
শত্রু শস্ত্র বিনির্গত, হতেছে বর্ষণ ;—
তবু অতিক্রমি হেন দুস্তর প্রান্তর
বীরভরে,—উড়াইয়া ইন্দ্রজালে যেন,
শত্রুসৈন্যচয়, শুষ্ক পত্ররাশি যেন
ভীম প্রভঞ্জনে হায় !—প্রবেশিল যবে
দিগ্বিজয়ী রোম সৈন্য মিশর নগরে ;—
লতা গুল্ম তরু তৃণ দলিয়া চরণে,
পশে গজযূথ যথা কমল কাননে।
বিজয়ী বীরেন্দ্র-ব্যূহ-নগর-প্রবেশ
নিরখিতে, বসেছিনু অলিন্দে বিষাদে,
চিত্ত কৌতূহল ময় ! পদতলে মম
প্লাবিয়া প্রশস্ত পথ, সৈন্যের প্রবাহ
প্রবাহিত ; দেখিলাম,—আর নাহি সখি !
ফিরিল নয়ন মম ; ডুবিল মানস
সেই প্রবাহ ভিতরে।

"ষোড়শ বর্ষীয়া
সেই বালিকা হৃদয়ে, অজ্ঞাতে, কি ভাব
প্রবেশিল, অভিনব ; হেন ভাব সখি !
কি পূর্ব্বে, কি পরে, শৈশবে, যৌবনে,
আর ত কখন করি নাহি অনুভব ;—
সেই যে প্রথম, আহা ! সেই হলো শেষ !
চিত্ত মুগ্ধকরী ভাব ! চিত্ত উন্মাদিনী !
বালিকার অরক্ষিত হৃদয় মোহিল।
কোথায় রোমীয় সৈন্য, কোথায় মিশর,
কোথায় তখন বিশ্ব—গগন—ভূতল ?
অদৃশ্য হইল সব নয়নে আমার।
কেবল একটী মূর্ত্তি—বীরত্ব যাহার
মিশি সরলতা, দয়া,—দাক্ষিণ্যের সনে,

(৪) Senate.
(৫) Augustus Cæsar.
(৬) Guitar.
(৭) Charmian—one of the two maid attendants.

[আতপ মিশিয়া যেন চন্দ্রিকা শীতলে !]
ভাসমান ছিল শ্বেত প্রশস্ত ললাটে ;
প্রজ্জ্বলিত নেত্র দ্বয়ে ; চির বিরাজিত
উন্নত প্রশস্ত বক্ষে ; ক্ষরিত প্রত্যেক
বীর—পদ সঞ্চালনে ;—হেন মূর্ত্তি সখি !
লুকাইয়া অনুপম বীরত্বে তাহার,
সৈন্যের প্রবাহ, (যথা মহীরুহ চয়,
লুকায় চন্দ্রমাচল (৮) আপন গহ্বরে !)
ভাসিল নয়ন মম,—ব্যাপিয়া হৃদয়,
ব্যাপিয়া অনন্ত বিশ্ব, ভূতল, গগন ।
সেই মূর্ত্তি সখি মম বীরেশ এণ্টনি !
চঞ্চলিয়া বালিকার অচল হৃদয়
প্রথম প্রণয়াবেশে—স্বরগ ভূতলে !—
সেই মূর্ত্তি, প্রিয় সখি ! হইল অন্তর,
সুদূর সুন্দর রোমে, কিছু দিন তরে ;
স্থির জলধির জল করিয়া চঞ্চল,
প্রতিপদ চন্দ্র সখি ! গেল অস্তাচলে !”
“খুলিল দ্বিতীয় অঙ্ক । জনক আমার—
(পিতৃনিন্দা, দেবগণ ! ক্ষমিও আমারে !)
অস্ত্রধারী টলেমির বংশে বংশীধর (৯)
কুলাঙ্গার—বিসর্জ্জিয়া স্বাধীন মিশরে
রোম রূপী শার্দ্দূলের বিশাল করাল ;
পতিহন্ত্রী, পাপিয়সী, জ্যেষ্ঠ দুহিতার
তপ্ত শোণিতাক্ত, ভ্রষ্ট সিংহাসনে সুখে
আরোহিয়া,—বিধাতার কেমন বিধান !
পতি হন্তা দুহিতার কন্যা হন্তা—পিতা !—
অবশেষে—হায় ! দুঃখ বলিব কেমনে !—
দশম বর্ষীয় শিশু কনিষ্ঠ আমার,
করি আমি যুবতীর পতিত্বে বরণ ;—
সেইখানে ক্লিওপেট্রা জীবন উদ্যানে,
যেই বীজ, প্রিয় সখি ! হইল রোপণ,
সে অঙ্কুরে কি পাদপ জন্মিল স্বজনি !
কি ভীষণ ফল পুনঃ ফলিবেক আজি ?
বধি জ্যেষ্ঠ দুহিতায় ; বধিতে আমায়,
সেই দিন মৃত্যু অস্ত্র করিয়া সৃজন ;
ডুবায়ে মিশরে ; আহা ! ডুবিবে আপনি ;
ডুবায়ে টলেমি বংশ ; জনক আমার
সম্বরিলা নর লীলা,—নব দম্পতিরে
সমর্পিয়া দুরাচার ক্লীব মন্ত্রি করে,
দুগ্ধের প্রহরী করি পাপিষ্ঠ মার্জ্জারে ।”
“না হতে পিতার শেষ নিশ্বাস নির্গত,
সিংহাসন হতে পাপী—ফেলিল আমায়
পূর্ব্বারণ্যে । হা অদৃষ্ট ! রাজার উদ্যানে
ফুটেছিল যে কুসুম, পড়িল এখন
মরুভূমে !—সে যে দুঃখ কহা নাহি যায় !
কিন্তু নারী প্রতিহিংসা, প্রচণ্ড অনল,
শীতানিল মার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্ন কিরণ ।
সহসা মিলিল সৈন্য । সেনা পত্নী—আমি
সাজিনু সমর সাজে । কবরীর স্থলে
বাঁধিলাম শিরস্ত্রান, উরস্ত্রান, উচ্চ
কুচ যুগোপরে । যেই কর, কমনীয়
কুসুমদামের ভরে হইত ব্যথিত,

(৮) Mountain of the moon.

(৯) ক্লিওপেট্রার পিতা টলেমি বংশীবাদন ইত্যাদি লঘু আমোদে মত্ত হইয়া প্রজার বিরাগভাজন হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে মিসরের রাজ্ঞী করে। টলেমি রোমের সাহায্যে, তাঁহার কন্যাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হন—এই সময়ে এণ্টনি রোমান সৈন্যের একজন অধ্যক্ষ হইয়া আইসেন। টলেমি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বধ করেন—এই পাপিয়সীও তাহার প্রথম স্বামীকে তাহার মনোমত হয় নাই বলিয়া ইতিপূর্ব্বে বধ করিয়াছিল। টলেমি মৃত্যু সময়ে মিসরদেশের রীতি মতে, উইল দ্বারা ক্লিওপেট্রাকে তাহার একটী ১০ম বর্ষীয় ভ্রাতার সঙ্গে পরিণয়বদ্ধ এবং একজন ক্লীব দুরাচারকে তাহাদের অভিভাবক করিয়া যান।

লইলাম সেই করে তীক্ষ্ণ তরবার ;
পশিলাম এই বেশে মিশর ভিতরে,
ক্লীব রক্তে নীল নদী করিতে লোহিত,
কিম্বা বীরাঙ্গণা রক্তে রঞ্জিতে মিশরে।
হেন কালে রোম রাজ্য বিপ্লাবি, বিলোড়ি,
ভীষণ তরঙ্গ দ্বয় (১০)—সিন্ধু অতিক্রমি,
পড়িল জীমূতমন্দ্রে মিশরের তীরে ;
কাঁপিল মিশর সেই ভীষণ আঘাতে,
রণোন্মত্ত অসি দ্বয় (১১) পড়িল খসিয়া।
এক উর্ম্মি হলো লয় সমুদ্র সৈকতে,
দ্বিতীয় উঠিল শূন্য সিংসনোপরে!"
"সিজার মিশরে!—দূরে গেল রণসজ্জা।
নব ফার্শেনিয়া—পম্পি বিজয়ী সিজার,
মিশরের সিংহাসনে!—খুলিলাম সখি!
রণবেশ, দীনা বেশে রোমেশ চরণে
পড়িলাম,—সে কুহক আছে কি হে মনে?(১২)
ঝটিকায় ছিন্নমূল ব্রততী যেমতি,
বন্দে মহীরুহ হায়!—নিরাশ্রয়া লতা!"
"সে ঐন্দ্রজালিক সখি! কর সঞ্চালনে
নিবারি তুমুল ঝড়, রক্ষিল আমারে,
আলিঙ্গিয়া স্নেহভরে। প্রিয় সখি! হায়!
এই জীবনে প্রথম,—এই মরুভূমে—
স্নেহ সুশীতল বারি হলো বরিষণ।
নিষ্ঠুর জনক যার ; নিষ্ঠুরা ভগিনী ;
শিশু সহোদর, ভর্ত্তা ; মন্ত্রী—নরাধম ;
সে কিসে জানিবে সখি! স্নেহ যে কি ধন?
যুড়াইল প্রাণ, সখি! পুরাইল আশা,
বসিলাম সিংহাসনে, বসিলাম?—ভীম
ভূকম্পনে, কিম্বা অগ্নি—গিরি—উদ্গীরণে,
টলিতে লাগিল মম নব সিংহাসন।
দেখিলাম অন্ধকার, ঘুরিল মস্তক,
পড়িতেছিলাম সখি! মূর্চ্ছিত হইয়া
অকূল সাগরে,—কি যে বীরপণা সখি!
জলে, স্থলে, কি অনলে করিল বীরেশ,
স্বচক্ষে দেখেছ, সখি! শুনেছ শ্রবণে।
দেখিলাম মূর্চ্ছাভঙ্গে মেলিয়া নয়ন,
ভাসিয়াছে শিশু ভর্ত্তা শত্রুদলসহ,
অনন্ত জীবন জলে ; বসিয়াছি আমি
মিশরের সিংহাসনে,—বলিব কেমনে
সেই লজ্জা?—সিজারের হৃদয় আসনে!
কৃতজ্ঞতা রসে সখি ভরিল হৃদয়,
ধন, প্রাণ, সিংহাসন, প্রণয় দাতায়,
করিলাম সহচরি আত্মসমর্পণ।
কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতা—জ্ঞান সমুদয়—
সেই কৃতজ্ঞতা শেষে কোথা হলো লয়!
একে প্রাণদাতা, তাহে পৃথিবী ঈশ্বর,
ততোধিক ভুজবলে ভূমণ্ডল জয়ী ;
এত প্রলোভন!—সখি! পড়িলাম আমি,
অজগর আকর্ষণে—সরলা হরিণী।"
"হেনকালে চারিদিকে সমর অনল
জ্বলিল, সিজার এই মিশরে বসিয়া
দেখিল অনল শিখা ; বৈশ্বানর রূপে
ঝাঁপ দিল, সখি! সেই বহ্নির ভিতরে ;
নিবাইল কটাক্ষেতে শোণিত প্রবাহে
বীরবর! বাহুবলে আপনি সমুদ্র
রহিয়াছে বন্দি যার রাজ্যের ভিতরে,

(১০) ফার্শেনিয়ার যুদ্ধের পর পম্পি সিজারের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া মিশরে উপস্থিত হইলে, মিশরবাসী সমুদ্রতীরে তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া সিজারকে উপঢৌকন দেয় ; সিজার মিসরের আভ্যন্তরিক বিগ্রহ নিবন্ধন শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

(১১) ক্লিওপেট্রার এক অসি, এবং তাঁহার শত্রু পক্ষে দ্বিতীয় অসি।

(১২) ক্লিওপেট্রার জনৈক অনুচর তাঁহাকে বসনরাশিতে বেষ্টিত করিয়া সিজারের নিমিত্ত উপঢৌকন বলিয়া তাঁহকে গুপ্তভাবে সিজারের সমীপে লইয়া যায়।

এই ক্ষুদ্র অগ্নি শিখা কি করিবে তারে ?
বিজয় পতাকা তুলি ; ভীম সিংহনাদে
কাঁপায়ে ভূধর শ্রেণী সুদূর উত্তরে ;
ডুবায়ে জলধি মন্দ্র অদূর দক্ষিণে,
ছড়ায়ে গৌরব ছটা দিগ্ দিগন্তরে ;
ঢালিয়া আনন্দ স্রোত অজস্র ধারায়
রাজপথে ; প্রবেশিল বীর অহঙ্কারে,
দিগ্বিজয়ী বীরবর রোম রাজধানী ।
সতী সহধর্ম্মিণীর স্বপ্ন উপেক্ষিয়া
চলিল সেনেট গৃহে,—হায় ! জাল মুখে
প্রলোভনে মুগ্ধ ক্ষুব্ধ কেশরী যেমতি,
ক্ষুধার্ত্ত ! তোমরা কেহে ?(১৩) তোমরা দুজন
বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে ? চৌষট্টি রৌরব
যেন ভাবিতেছ মনে ? কণ্টক স্বরূপ
কেন সিজারের পথে, আছ দাঁড়াইয়া ?
জান না সিজার আজি হইবে ভূপতি ?
সরে যাও ।—বীরবর সেনেট মন্দিরে
প্রবেশি বসিল স্বর্ণ চারু সিংহাসনে ;
"বিশ্বজয়ী মহারাজ সিজারের জয় !"
আনন্দে ধ্বনিল শত সহস্র জিহ্বায় ;
আনন্দে রোমান বাদ্য করিল সঞ্চার
নর রক্তে সেই ধ্বনি পূরিল গগন
সেই জয় জয় রবে ; নামিতে লাগিল
রোম ইতিহাসে এই প্রথম মুকুট
সিজারের শিরোপরে, এণ্টনির করে ।
ফুরাইল ;—কি ? সিজারের রাজ্যাভিষেক ?
কেন আনন্দের ধ্বনি থামিল হঠাৎ ?
নিরবিল যন্ত্রিদল ? কেন অকস্মাৎ
এই হাহাকার ?—সখি দেখিনু সম্মুখে ;
কি দেখিনু ? ইহজন্মে ভুলিব না আর ।
ভূপতিত, হা অদৃষ্ট ! বীরেন্দ্র সিজার !
কোথায় মুকুট ? সখি ! বক্ষে তরবার !"(১৪)
কণ্টকিল রমণীর কম কলেবর ;
বিস্ফারিল নেত্রদ্বয় ; সহিল না আর
অবলা হৃদয়ে, মূর্চ্ছা হইল রমণী—।
সুগন্ধ তুষার বারি, নয়নে, বদনে,
তুষার উরস শ্বেতে, সহচরীদ্বয়,
বরষিল, কিছুক্ষণ পরে রূপসীর
অচল হৃদয়যন্ত্র, জীবন পবন
স্পর্শে চলিল আবার ; খুলিল নয়ন,—
প্রভাতে দক্ষিণানীলে কোমল পরশে,
উন্মেষিল যেন ধীরে কমলের দল ।
অর্দ্ধ উন্মূলিত নেত্রে, এক দৃষ্টে চাহি
কক্ষে বিলম্বিত এক চারু চিত্র পানে,
বলিতে লাগিল বামা—"ওই, সহচরি !
ওই যে দেখিছ—চিত্র,—নিসর্গ দর্পণ !—
অপূর্ব্ব—অঙ্কিত !—ওই দেখ ওই,
'চিদনস' (১৫) স্রোতে ওই প্রমোদ তরণী
ভাসিতেছে, নাচিতেছে বারিবিহারিণী,
হাসিতেছে, জ্বলিতেছে, পশ্চিম তপনে,
প্রতিবিম্বে ঝলসিয়া তরল সলিল ।
ময়ূর ময়ূরী প্রেমে মুখে মুখ দিয়া,
বঙ্কিম গ্রীবায় ভাসে তরী পুরোভাগে ;
চন্দ্রককলাপ রাশি—নয়ন রঞ্জন !—
চারু চন্দ্রাতপরূপে শোভিছে পশ্চাতে ।
তাহার ছায়ায় বসি কর্ণিকা রূপসী ;

(১৩) ব্রুটস এবং কেশিয়াস্ ।

(১৪) রোমরাজ্যে ইতিপূর্ব্বে রাজ-তন্ত্র শাসন ছিল না, সুতরাং রাজাও কেহ ছিল না। সিজারই প্রথম রাজ উপাধি গ্রহণ করিতে উদ্যোগ করেন ; এই কারণে কতিপয় ষড়যন্ত্রী তাঁহাকে অভিষেকের দিবস বধ করেন। ইহাদের মধ্যে ব্রুটস্ এবং কেশিয়াস প্রধান ছিলেন।

(১৫) চিদনস নামক নদ—এসিয়া মাইনরে ? এণ্টনির আজ্ঞামতে ক্লিওপেট্রা তাহার সঙ্গে 'টারসাসে' সাক্ষাৎ করিতে যান।

নাচে স্বর্ণ-কর্ণ, বদ্ধ কুসুম মালায়
কুসুমকোমল করে। বসন্ত রঙ্গের
নাচিতেছে সুবাসিত সুন্দর কেতন,
সৌরভে মোহিত—মৃদু—অনিল চুম্বনে।
তরণীর মধ্য দেশে, সুবর্ণ খচিত
চন্দ্রাতপ তলে, স্বর্ণ-কমল আসনে,
বারুণী রূপিণী—ওই তরণী ঈশ্বরী;
আপনার রূপে যেন আপনি বিভোর!
দুই পাশে সুকুমার সহচর চয়
দাঁড়ায়ে মন্মথ বেশে—সস্মিত বদন!—
ব্যজনিছে ধীরে ধীরে বিচিত্র ব্যজনে।
কিন্তু সে অনিলে কই যুড়াবে বামায়,
বরং হইতেছিল কোমল পরশে,
কাম লালসায় উষ্ণ কপোল যুগল!
সম্মুখে অঙ্গণাগণ—অনঙ্গ মোহিনী!—
কোমল মদনোন্মাদী—সঙ্গীত তরল
বর্ষিতেছে নানা যন্ত্রে; তালে তালে তার
পড়িছে রজত দাঁড় রজত সলিলে,—
তরণী সুন্দরী—ভুজ মৃণালেতে যেন
আলিঙ্গিছে প্রেমাহ্লাদে নদ 'চিদনসে!'
সে সুখ পরশে নাচি স্রোত হিল্লোলিয়া,
প্রেম-মুগ্ধ ছুটিতেছে—তরণী পশ্চাতে;
নাচিছে তরণী;—মরি! সেই নৃত্য, সেই
সলিলের ক্রীড়া, সখি! দেখ চিত্রকর
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে! নাচিতে নাচিতে
চুম্বিয়া সরিৎ বক্ষ, কহি কানে কানে
অস্ফুট প্রণয় কথা তর তর স্বরে,
চলেছে রঙ্গিণী ওই,—আশ্চর্য্য অদৃশ্য
সৌরভে করিয়া, মরি! ইন্দ্রিয় অবশ।
নগর, সজীব দীর্ঘ-দর্শক-মালায়,
সাজায়েছে দুই তীর। উচ্চ সিংহাসনে
অদূরে নগরে বসি—একাকী এণ্টনি
ডাকিছে অস্ফুট সিসে অপহৃত মন।
কিন্তু সখি! তৃষ্ণাতুর সহস্র নয়ন,
যে রূপ সুধাংশু অংশু করিতেছে পান

কে ওই রমণী,—সর্ব্বদর্শক-দর্শন?
ক্লিওপেট্রা? আমি? না, না, সখি! অসম্ভব!
সেই যদি ক্লিওপেট্রা, আমি তবে নহি;
আমি যদি ক্লিওপেট্রা,—তরী-বিহারিণী,
ওই চিত্র নহে সখি! আমি দুঃখিনীর।
সেই মুখে হাসি রাশি, এ মুখে বিষাদ;
সে হৃদয়ে সুখ, সখি! এ হৃদয়ে শোক;
সে যে ভাসিতেছে সুখে প্রণয় সলিলে,
আমি ডুবিয়াছি হায়! নিরাশ সাগরে।
যেই মনোহর বেশ, ওই চিত্রে, সখি!
শোভিতেছে মরি! যেন শারদ কৌমুদী
বেষ্টিয়া কুসুম বন; আজিও সে বেশে
সজ্জিত এ বপু মম; কিন্তু সহচরি!
সেই শোভা—এই শোভা—কতই অন্তর!
আজি সেই বেশ, স্বর্ণ-হীরক খচিত,
নিবিড় তমিস্র যেন সমাধি বেষ্টিয়া।
সে দিন প্রেমের শুক্ল দ্বিতীয়া আমার,
আজি হায় নিরাশার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী!"
নীরবিল ধীরে বামা;—মধুর বাঁশরী
পাইয়া বিষাদ তান, নীরবে যেমতি।
স্থির নেত্রে, কিছুক্ষণ চাহি শূন্যপানে,
বলিতে লাগিল পুনঃ ইন্দীবরাননা।
"চলিল তরণী বেগে, চলিলাম আমি
ভেটিতে এণ্টনি; সখি! করিতে অর্পণ
বালিকার চিত্ত চোরে, যুবতী যৌবন।
যত অগ্রসর তরী হতেছিল বেগে
ততই হইতেছিল মানস আমার
সঙ্কোচিত;—নির্ঝরিণী মুখে যথা নদ
চিদনস। হায়! সখি, ভাবিতেছিলাম
কি আছে অদৃষ্টে মম,—প্রেম সিংহাসন,
কিম্বা—রোম কারাগার! দেখিতে দেখিতে
সঙ্কুচিত আশা স্রোত প্রণয় নির্ঝরে
উত্তরিল, কিন্তু সখি! সেই সংমিলনে
উথলিল যেই ঢল প্রেম প্রস্রবণে—
হৃদয় প্লাবিনী!—সেই সলিল প্রবাহে

ভেসে গেল মম কুল, শীল, লজ্জা, ভয়,
ভেসে গেল সেই বেগে, ভূত ভবিষ্যত,
বর্ত্তমান উভয়ের ; হইল চঞ্চল
বেগে, রোম, মিশরের রাজ্য সিংহাসন ;
ভেসে গেল—সেই স্রোতে সপত্নী সিল্‌ভিয়া (১৬)
ভাসিয়া ভাসিয়া সেই প্রণয় প্লাবনে
আসিলাম মিশরেতে, প্লাবন প্রবাহ
সখি ! মিশিল সাগরে। স্বজনি ! তখন
সকলি—অনন্ত ! হায়, অনন্ত প্রেমের ;
অনন্ত লহরী লীলা ! অনন্ত আমোদ
বিরাজিত নিরন্তর অধরে নয়নে !
অনন্ত, অতৃপ্ত সুখ, যুগল হৃদয়ে !
ভাবিলাম মনে,—প্রেম, সুখ, রাজ্য, ধন,
প্রেমিক জীবন হায় ! অনন্ত সকল।
যে কাম-সরসী সখি ! করিনু নির্ম্মাণ,
যত পান করি, বাড়ে প্রণয় পিপাসা ;—
অনন্ত পিপাসাতুর নায়ক আমার !
ঢালিয়া দিলাম তাহে, জীবন, যৌবন
মম ; ঝাঁপ দিল রাজহংস উন্মত্তের
প্রায়,—মদন-বিহ্বল ! সেই সরোবরে
কভু মৃণালিনী আমি, সখা মধুকর ;
আমি মরালিনী, সখা মরাল সুন্দর।
কখন মৃণাল আমি অদৃশ্য সলিলে,—
সখা মদমত্ত করি ; সলিলের তলে
কভু আমি মীনেশ্বরী, সখা মীনপতি ;—
অধিপতি ক্লিওপেট্রা-কাম-সরসীর !
এই রূপে, এই সুখে, গেল দিন, গেল
মাস, চলিল বৎসর, বিদ্যুতের স্কন্ধে,—
অনঙ্গ বিলাসে, সুরা, সঙ্গীতে বিহ্বল !

ক্রমশঃ।

---

(১৬) এণ্টনির প্রথম পত্নী।

হরিহর বাবু বড়ই রাশ্‌ভারি লোক ; কার সাধ্য যে তাঁর সম্মুখে মুখ তুলে কথা কয় ? তাঁহার ভয়ে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই আপনাপন দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করে। তিনি যে পল্লীতে বাস করেন, সেখানে কোথাও কুক্রিয়াসক্ত লোকদিগের প্রশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার দৃষ্টি সকল দিকেই আছে অথচ সহসা কোন কথার উচ্চবাচ্য নাই। অকস্মাৎ সম্মুখে কিছু পড়িলে দেখেও যেন দেখেন না। পথে চলিবার সময় বালকেরা খেলা করিতে করিতে অনাবিষ্টতা-বশতঃ তাঁহার গতিরোধ করিলে একপার্শ্ব দিয়া যান, যেন টেরই পান নাই। বিচক্ষণও তেমনি ; একটি কথা উপস্থিত হইলে তিন বৎসর পরে কি ঘটনা হইবে তাহা বলিয়া দিতে পারেন ; তাহার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সমস্তই একবারে দেখিতে পান এবং তোমার মুখে দু'চারিটি কথা শুনিয়াই তোমার মনের সকল কথা বুঝিয়া লন। যেমন ধার তেমনি ভার ; লোকে তাঁহাকে এমনি মান্য করে যে, তাঁহার কথা যেন বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করে। তুমি তিন মাস বুঝাইয়া যাহার মনের দ্বিধা দূর করিতে পারিবে না, প্রস্তাবিত বিষয়ে হরিহর বাবুর অভিপ্রায় ইঙ্গিতের দ্বারা ব্যক্ত হইলেই সে ব্যক্তি অবিচলিত চিত্তে তদনুসারে কার্য্য করিবে।

কিন্তু হরিহর বাবু যাহার প্রতি বিমুখ হন, তাহার নিষ্কৃতি নাই। একবার শ্যামসুন্দর বসু নামক এক ব্যক্তি তাঁহার কোপে পড়িয়াছিল। শ্যামসুন্দর কিছু দিন তাঁহার সহিত বিরোধ করিয়া নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িল, মোকদ্দামা মামলাতে বিব্রত, অনেকের নিকটেই ঋণগ্রস্ত ; পরিশেষে এক ব্যক্তি তাহার নামে দস্তকের পেয়াদা বাহির করিল ; পরদিন প্রাতে ৫০০ পাঁচশত টাকা দিতে না পারিলে পিয়াদা আসিয়া গ্রেপ্তার করিবে। সমস্ত দিন শ্যামসুন্দর লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া কোথাও টাকা সংগ্রহ করিতে পারিল না, অবশেষে রাত্রি একটার সময় হরিহর বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত ; হরিহর বাবু তখন শয়ন করিয়াছেন, ভৃত্য একজন সংবাদ দিবার নিমিত্ত দ্বারে আঘাত করিবামাত্র বলিয়া

উঠিলেন, "কে রে, রামা?—শ্যামসুন্দর এসেছে বুঝি?" "আজ্ঞা হাঁ।" অনন্তর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া ভৃত্যকে দীপ লইয়া যাইতে বলিলেন, এবং সেই অন্ধকার ঘরে শ্যামসুন্দরকে আনিতে বলিয়া যে দ্বারে সে প্রবেশ করিবে সেই দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসিলেন।

শ্যামসুন্দর স্বভাবতঃ মনের যন্ত্রণায় নিতান্তই পীড়িত, তাহাতে অন্ধকার ঘরে আহূত হইয়া একবারে হতবুদ্ধি হইল। কিন্তু উপায় নাই। আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টার ক্রটি করে নাই। "রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব। দস্তকের পিয়াদা রাস্তা দিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে ইহা অপেক্ষা হরিহর বাবু যদি অস্ত্রাঘাত করেন এবং তাহাতে প্রাণবিয়োগ হয় সেও ভাল।" হরিহর বাবুর সহিত এতকাল যে শত্রুতা করিয়াছিল সমস্তই মুহূর্ত্তেক মধ্যে তাহার স্মরণ হইল; এবং এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্যামসুন্দর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। হরিহর বাবু যেমন ফিরিয়া বসিয়াছিলেন সেই অবস্থায় বলিলেন "আমার সম্মুখে আসিস্ না; সব কথা বুঝেছি, এই নে টাকা ধর্ আমার কাছে মুখ দেখাস্ না।" শ্যামসুন্দর এরূপ অনুগ্রহের কথা স্বপ্নেও ভাবে নাই। ভাবিয়াছিল, হরিহর বাবুর সহিত বিরোধ করাতেই এই বিপদ্ ঘটিয়াছে এবং তিনি কটাক্ষপাত করিলেই নিষ্কৃতি পাইব; কিন্তু টাকার তোড়া মাটীতে পড়িল সেই শব্দে অবাক্ হইয়া রহিল। হরিহর বাবু চলিয়া যান, তাঁহার পদশব্দে শ্যামসুন্দরের চৈতন্য হইল; তখন সে কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "আমার ঘাট হয়েছে, নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আপনার মত লোকের বিরুদ্ধাচরণ করিছি; যা কল্লেন এতে তো আমি কেনা রইলুম, কিন্তু বলুন যে আমার প্রতি প্রসন্ন হোলেন?" হরিহর বাবু পা ছাড়াইয়া দেয়ালের পার্শ্বে শ্যামসুন্দরের দিকে পিঠ ফিরাইয়া থাকিলেন। শ্যামসুন্দর মেজেয় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্তর কাকুতি মিনতি করিল, হরিহর বাবু চুপ করিয়া থাকিলেন; পরে শ্যামসুন্দর ক্ষান্ত হইলে বলিলেন, "তা হবে না, আমার স্মরণাপন্ন হলি, আমি তোকে রক্ষা কল্লুম কিন্তু তোর মুখ কখনই দেখব না, আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবার নয়।" এই বলিয়া অবিলম্বে চলিয়া গেলেন।

গল্পটি উপন্যাস মাত্র। কিন্তু শুনিলে অনেক বাঙ্গালির মনে এই হরিহরের নানাপ্রকার প্রতিমূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইবেক। মনে হইবে যে, অমুক এইরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা দূরদর্শী ছিলেন, অমুক তাঁহার ন্যায় সর্ব্বদর্শী। কেহ আশ্রিতের প্রতি দয়াতে বা শত্রুশাসনে তাঁহার অনুরূপ আর কেহ বা অনর্থক প্রতিজ্ঞাপালনে অথবা কেবল বাক্ সম্বরণে এতাদৃশ প্রকৃতির অনুকরণকারী। এইরূপ গুণ কতক কতক থাকিলে আমাদিগের সমাজস্থ লোক রাশভারি বলিয়া গণ্য হয় এবং "রাশভারি" প্রকৃতি প্রায় সকলেরই প্রশংসার স্থল।

বুদ্ধির অপরিপক্ক অবস্থাতে অনুচিকীর্ষা বৃত্তিই শিক্ষালাভের প্রধান উপায়, *কিন্তু সকল বিষয়ের দোষ গুণ বিশ্লেষ করিতে না পারিলে বুদ্ধি কখনই পরিণত হয় না। ইহাই সমালোচনার মহোপকার। সমালোচনা ভ্রান্ত হইলেও সমালোচকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রোতৃ বা পাঠকবর্গ বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হন, সুতরাং সমালোচিত* বিষয়ের যথাযোগ্য বিচার না হইলেও শুদ্ধ বিচার কার্য্যের দ্বারাই বুদ্ধির বিশিষ্টরূপ চালনা হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ যদি কেবল মনের মত কথা অন্বেষণ করেন তবে সমালোচনাতে কেবল মতভেদই বৃদ্ধি হয়।

হরিহর বাবুর সুখ্যাতি সকলেই করে, এই ভাবিয়া যদি লোকে কেবল তাঁহার অনুকরণ করিতেই চেষ্টা করে তবে তাহারা কিয়দংশে উন্নতিলাভ করিতে পারে বটে। বালকেরাও প্রথমতঃ এই প্রণালীতে শিক্ষা করিয়া থাকে এবং পশুগণ ইহার অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু এতাদৃশ অনুকরণ সম্যক্‌রূপে সুসিদ্ধ হইবার নহে। যাহাদের তাদৃশ তেজ নাই, যাহারা তাঁহার ন্যায় ঠেকে নাই, তাহারা কখনই হরিহর বাবুর প্রকৃতি পাইবে না। কিন্তু এমনও লোক আছে যাহাদিগের বুদ্ধি ও জীবনযাত্রা কথঞ্চিৎরূপে হরিহর বাবুর সদৃশ। তাহারা তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিলে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। কিন্তু ইহা কি সর্ব্বতোভাবে মাঙ্গলিক? আদর্শের যদি দোষ থাকে এবং তাহা দোষ বলিয়া অনুভূত না হয়, তবে অনুকরণ হইতে ক্রমশঃ কেবল দোষেরই বৃদ্ধি পায়। অতএব বিচারপূর্ব্বক অনুকরণ করা প্রয়োজন। হরিহর বাবুর দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে তদপেক্ষা নির্দ্দোষ পাত্র কাহাকে আদর্শ করিতে হয়। অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ কেন সম্পূর্ণ দোষাভাব অন্বেষণ করাই ভাল। কিন্তু মানব শরীরে এরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত। অতএব লোকচরিত্রে কি হইলে দোষ হয়, কি হইলে গুণ হয় তাহা বিশ্লেষ ক্রিয়ার দ্বারা স্থিরকরণান্তর একের অভাব অপরের পূর্ণতা অনুমান করিয়া লইতে হইবেক। আমরা লোকের দোষ গুণ বিচার কালে ব্যক্তিবিশেষের সহিত তুলনা করিয়া থাকি; ইহা নিষিদ্ধ। কেন না এরূপ তুলনা দ্বারা কেবল এই মীমাংসা হইতে পারে যে, অমুক আমার মনের মত লোক এবং অমুককে আমি দেখিতে পারি না। কিন্তু তোমার আমার প্রসন্নতাতে তো কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কাহার কি দোষ কাহার কি গুণ তাহাই স্থির করা আবশ্যক।

এতদ্দেশের লোকাচার মতে চপলতা নিন্দনীয় এবং গাম্ভীর্য্য প্রশংসার স্থল—কেন এরূপ হইল?—একথা বলিলেই বিপাক। কেহ মনে করেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ।—কেহ বলেন চপলতা বালকস্বভাব; কিন্তু তাহাতেই দোষ কি? বালকেরা ক্ষুদ্র এবং অল্পবুদ্ধি; তবে বালকপ্রকৃতির বৈপরীত্যই কি বুদ্ধিমত্তার আদি লক্ষণ?—কেহ বলিবেন মুনিঋষিরা গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন। ইহা লোক-

দৃষ্টান্তমাত্র ; এক হরিহর বাবুর দোষ গুণ বিচার জন্য যেন আর কতকগুলি হরিহর সংগৃহীত হইল। এ প্রণালীও অসিদ্ধ।—কেহ বলিবেন, শাস্ত্রের বচন আছে। এবার হারিলাম। শাস্ত্রসমগ্র অতি বিজ্ঞলোকের আদেশ এবং সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়, কিন্তু শাস্ত্রও বিচারাধীন। সমালোচক লেখক অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও বিচারাধিকারী বটে।

আমরা বলি গাম্ভীর্য্য বিবেচনার সহচর, চপলতা বিবেচনার বিঘ্নকারী, এই জন্য গাম্ভীর্য্য প্রশংসনীয়। মনুষ্য জনসমাজে থাকিয়া স্বতন্ত্র হইতে পারেন না ; এই কারণে বিবেক ত্যাগের সাবকাশ নাই। যদি তোমার বিবেক না থাকে তবে যত লোক কোন প্রকারে তোমাতে আশ্রয় করিতেছে, তাহারা সকলেই তোমার অবিবেচনার ফলভোগী হইবেক। যদি বিবেককে তুচ্ছ কর তবে এই সকল লোকের সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইবে ; অর্থাৎ একদিক্ ভাঙ্গিয়া গেল, রাশির ভার খর্ব্ব হইল। আর সেই সমস্ত লোকের অবস্থা চিন্তনীয় বলিয়া স্বীকার কর ; অমনি চিন্তাস্রোত বৃদ্ধি হইবে ; তোমার আপন কার্য্য লইয়া মনে মনে সকলের নিকটে জবাবদিহি করিতে হইবে। ফলতঃ যাহাকে মন হইতে ছাড়িবে তাহার ভার কমিয়া যাইবে ; যাহার প্রতি মনে মনে দৃষ্টিপাত করিবে তাহার ভার তোমার উপরে আসিয়া বর্ত্তিবে। “ধারে কাটে আর ভারে কাটে।” প্রবাদ বাক্যটী অপ্রকৃত নহে ; অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মনে এই অভিমানসূচক আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে যে, আমার কথা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত হইলেও অমুক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তির কথার “ভার” অপেক্ষাকৃত অধিক। এই ভার সহজে হয় না। লোকের ভার বহন করিতে হয় তবেই “ভারে কাটে।” এ ভার চিন্তার অঙ্গ, মনে মনে বহিতে হয়। চিন্তার আবির্ভাবে চপলতা দূরে যায়, বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, যুবা বার্দ্ধক্য লাভ করে এবং নারী পুরুষপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক মাত্রেই তরল স্বভাব। কেননা পুরুষেরাই স্ত্রীদিগের ভার বহন করেন। আবার এতদ্দেশের স্ত্রীজাতি অধিকতর তরলপ্রকৃতি ;—স্বতন্ত্রতাতেও ইহারা অন্য দেশস্থ স্ত্রীলোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা মীমাংসা কিরূপ পদার্থ তাহা কখনই জানে না। বস্তুতঃ চিন্তা বা মীমাংসা করিবার ভারই পায় না। সুতরাং স্ত্রী-লোকদিগের গাম্ভীর্য্য ও বিচারশক্তি উভয়ের কিছুই নাই। এবং চপলতাই তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কথা না কহিলেই যে গম্ভীর হয় এমন নহে। নতুবা বঙ্গীয় নববধূগণ গাম্ভীর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিদ্রা বিচার কার্য্যের অনন্যোপায়।

গাম্ভীর্য্য রাজলক্ষণ, কেননা রাজা প্রজার ভারবহন করেন। রাজা যত আপনার ভার বৃদ্ধি করেন, প্রজার ভার তত লঘু হইয়া যায়। এইজন্য সাধারণ

তন্ত্রে প্রজাবর্গের এত গৌরব। রাজ্য পরাধীন হইলে প্রজাবর্গ রাজকার্য্য হইতে অপসারিত হইয়া তৎকারণে মতিচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বাঙ্গালিরা সাহেবদিগের তুলনায় আপনাদিগকে গম্ভীরপ্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন। ইহা প্রকাণ্ড ভুল। রাজনীতিঘটিত বিষয়ে বাঙ্গালিদিগের মতামত নাই; কেবল অন্নবস্ত্র বা অন্যান্য স্বার্থ সম্বন্ধীয় চিন্তাতেই ইঁহারা মগ্ন। গাম্ভীর্য্যও তদনুরূপ। রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায় কিন্তু কেবল কৌপীনখণ্ড দগ্ধ হইবে সেই ভয়ে গবাক্ষের দিকে ধাবিত। ইংরাজ স্বার্থসাধনে অনেক সময়ে যথেচ্ছাচারী হইয়া চাপল্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু যখন ভারপ্রাপ্ত হইয়া কতকগুলি লোক সমবেত হয়েন, তখন চপলতার লেশ থাকে না। বিরোধ থাকুক, বিসম্বাদ হউক, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সকলেই একাগ্রচিত্ত, সকলেই চিন্তায় মগ্ন, সকলেই ভারাক্রান্ত। বাঙ্গালিরা পৃথগ্‌ভাবে বরং ভাল কিন্তু একত্রিত হইলে হয় সঙ্কোচপ্রিয়, অথবা ভবিষ্যতে দোষস্পৃষ্ট হইবার শঙ্কাতে বিচলিত অথবা ভার ত্যাগে অভিলাষী কিম্বা অন্যের বাসনা ও পরামর্শের প্রতি অমনোযোগী হন; নতুবা, অপরিণামদর্শী, বাচাল, কলহপ্রিয়, স্বার্থাভিলাষী এবং জেদে অভিভূত হইয়া পড়েন। এগুলি প্রকৃত গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ বা প্রশংসার স্থল নহে। ফরাসি জাতি সভ্যতাতে ইংরাজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে কিন্তু রাজ্য রক্ষা করিতে অপেক্ষাকৃত অপটু। ইংরাজেরা বলেন ফরাসিরা চপলপ্রকৃতি; ফলতঃ তাঁহারা যে রাজকার্য্য নির্ব্বাহকালে পরের বিবেচনা প্রণিধান করিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়েন এ কথা আমাদিগেরও মনে হয়। তাঁহাদিগের আচরণ দেখিলে বোধ হয় সকলেই যেন আপনার মনের চিন্তাতেই উন্মত্ত আর কিছুর প্রতিই দৃক্‌পাত নাই। সুতরাং ঐক্যের সম্ভাবনা কি! ছোট মুখে বড় কথা বলিতে পাইলে বলা যায় যে, বাঙ্গালিরা এই বিষয়ে কথঞ্চিৎ ফরাসি জাতির সদৃশ।

হরিহর শ্যামসুন্দরকে মনে মনে মার্জ্জনা করিয়াও যে তাহার দিকে মুখ ফিরাইলেন না, এটি তাঁহার জেদ। প্রতিজ্ঞাপালন অতি প্রধান ধর্ম্ম কিন্তু তাহার নিমিত্ত দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হওয়া উচিত নহে। শ্যামসুন্দরকে যদি মনে মনে মার্জ্জনা করিয়া থাকেন তবে তাহার মুখ দেখিতে দোষ কি? যদি কখনও তাহার প্রতি আক্রোশ সম্পূর্ণরূপে না গিয়া থাকে, তথাচ ক্রোধশান্তির চেষ্টা করাই ভাল। প্রতিজ্ঞারক্ষা ভ্রমে সঞ্চিত ক্রোধ প্রতিপালন করা সর্ব্বপ্রকারেই ক্ষতিজনক। জেদ স্বভাবতঃ গুণও নহে দোষও নহে। ইহাতে যেমন সৎকর্ম্ম তেমনি কুকর্ম্ম বৃদ্ধিরও ক্ষমতা জন্মে। যে ব্যক্তি প্রশংসনীয় কার্য্যে জেদ করেন, তিনিই প্রশংসনীয় কিন্তু কুকর্ম্মে জেদ অজ্ঞানকৃত হইলেও অন্ততঃ নিন্দনীয় এই পর্য্যন্ত বলা যায়। কিন্তু তাহাতে ত ক্ষতির কিছুই লাঘব হয় না। তরবারি দ্বারা শত্রু মিত্র উভয়েই

বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তরবারের কোন মহত্ব দৃষ্ট হয় না। আওরঙ্গজেব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ফিরোজ শা কোমলপ্রকৃতি ছিলেন; লোকে আওরঙ্গজেবেরই প্রশংসা করে। আজি কালি বিস্মার্কের নামে কজন বাহবা না দিয়া থাকিতে পারেন? এক সময়ে প্রথম নেপোলিয়ানও এইরূপে জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার প্রাধান্য কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে? তেজ দেখিলেই আমরা স্বভাবতঃ চমৎকৃত হইয়া থাকি। ইহা পতঙ্গপ্রকৃতি। রাশভারি লোকের জেদ কিছুই নয়; পরোপকারই তাঁহাদের মহত্বের প্রকৃত লক্ষণ।

রাশভারি লোক কর্ত্তৃত্ব ভালবাসে। সেই উদ্দেশ্যেই হউক বা চরিত্রগত গুণ হইতেই হউক পরোপকার করা ইঁহাদিগের একটি বিশেষ লক্ষণ। আমরা যেমন দূরদর্শিতা ও সর্ব্বদর্শিতার অল্পতা হেতুক আপনাদিগের গাম্ভীর্য্যের স্থল সঙ্কীর্ণ করিয়া লইয়াছি, পরোপকার এবং তাহার আনুষঙ্গিক কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তা বিষয়েও আমাদিগের দৃষ্টি ও প্রয়াস তদনুরূপ। জমীদার প্রজাগণের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে ভালবাসেন। হাকিমেরা আমলা উকীল ও আহেলা মামলার উপর কর্ত্তৃত্বাকাঙ্ক্ষা করেন। হেডমাষ্টার, হেডকেরাণী অধীন কর্ম্মচারিগণের উপর ধুমধাম করেন। এবং সংসর্গগুণে ভারতকলঙ্কিত ইংরাজ কাল মুখ দেখিলেই কর্ত্তৃত্ব করিতে ইচ্ছা করেন। এবং হরিহর বাবুর ন্যায় রাশভারি লোকেরা যাহার পরিচয় পান তাহাকেই আজ্ঞাবহ করিব মনে করেন। আজ্ঞা নানাবিধ। তন্মধ্যে শুভঙ্করের আজ্ঞাই সর্ব্বপ্রধান। এতাদৃশ আজ্ঞা দানেচ্ছা বড় একটা দেখা যায় না।

যেমন লক্ষ্মীর অনেক প্রকার বরযাত্রী থাকে, উন্নতির পক্ষে কৃত্রিমতাও সেইরূপ একটি সহচর। উন্নতির সৌন্দর্য্য আছে। যেমন কদাকার ব্যক্তি সৌন্দর্য্যের গুণে মোহিত হইয়া কৃত্রিম রূপ ধারণ করিতে চেষ্টা করে তেমনি সভ্য সমাজে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ পরের নিকট চিত্ত-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার জন্য কৃত্রিম দয়া অভ্যাস করে। এই কৃত্রিমতা লোকের ক্ষতিজনক না হইলে, শুদ্ধ ইহার স্বার্থপরতার জন্য কেহ বড় বিরক্ত হয় না। রাশভারি লোকেরা আপনাদিগের মনোগত ভাব পরিষ্কার করিয়া না বুঝিলেও এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে; লোকের প্রতি আন্তরিক দয়া থাকুক বা না থাকুক দয়ার মাহাত্ম্য জানিয়া পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়। প্রশংসাকাঙ্ক্ষীরাও ঠিক্ এই প্রণালীতে কার্য্য করিয়া থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, একজন প্রশংসা এবং আর একজন কর্ত্তৃত্ব অভিলাষ করে। আর আশাভঙ্গ হইলে নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসাভিলাষী স্ত্রীলোকের ন্যায় অভিমান করে ও কর্ত্তৃত্বাভিলাষী বৈরনির্য্যাতনে সচেষ্ট হয়। অভিমান যে মনে করে তাহারই পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক, অন্যের পক্ষে উপহাসস্থল। বৈরনির্য্যাতন অপেক্ষাকৃত গুরুতর দোষ। কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিলাষী এবং রাশভারি

লোকেরই সম্মান সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ পুরুষের চক্ষে অভিমান অপেক্ষা বৈরনির্য্যাতনই ভাল লাগে। কর্ত্তৃত্বাভিলাষ এবং প্রশংসাভিলাষ উভয়ই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। কিন্তু প্রথমটি বাহুল্য পরিমাণে স্বার্থপর; অনেকে এই কথার স্মৃতি অভাবে পৌরুষ বলিয়া ইহার গৌরব করেন। রাশভারি লোকের দয়া সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় নহে। কেননা স্বার্থপর হইলেও ইহা অনেকস্থলে বিশুদ্ধরূপে পরের হিত-জনক হয়। লোকে এই স্থূল কথাটি বিলক্ষণ বুঝিয়াছে এবং তৎকারণে রাশভারি লোকের আজ্ঞাপালন করিয়া থাকে। নতুবা কর্ত্তৃত্বাভিলাষিগণের উদ্দেশ্য দেখিয়া যদি সকলেই তাহাদিগের প্রতি বিমুখ হইত, তাহা হইলে এই শ্রেণীস্থ লোকের জীবন ও কার্য্যক্ষমতা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ব্যর্থ হইত এবং আজি পর্য্যন্ত জগতের যত উন্নতি হইয়াছে তাহার অনেকাংশ অনায়ত্ত হইয়া থাকিত। ফলতঃ রাশভারি লোকেরা যে সকল মঙ্গলক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন তজ্জন্য উপকৃত ব্যক্তিদিগের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিলাষীদিগের চরিত্র অনুকরণ করা উচিত নহে।

যেমন কর্ত্তৃত্বাভিলাষের প্রকাশ্য ফল মাঙ্গলিক হইলেও উৎপত্তি নিন্দনীয়, আজ্ঞাবহন প্রকৃতির আদি এবং অন্তও তদনুরূপ। আজ্ঞাবহন অজ্ঞতা এবং তেজ-ক্ষীণতা হইতে উৎপন্ন হয়। অজ্ঞতার অনেক দোষ এবং তেজকে যত্নপূর্ব্বক সৎপথে পরিবর্দ্ধিত করাই আবশ্যক। কর্ত্তৃত্বাভিলাষীরা যেমন ছাগলের নিকটে শার্দ্দুলের ন্যায় আচরণ করে তেমনি সিংহের সমীপে শৃগালবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ধর্ম্ম বাঙ্গালি জাতিতে প্রকৃষ্টরূপে লক্ষিত হয়। আমাদিগের জ্ঞান ও দৃষ্টি যেমন, উচ্চাভিলাষও তদ্রূপ। উভয়ই "বিঘত প্রমাণ।" যে উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বামিত্র ব্রহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং ব্যাস শিবের সমতুল্য হইতে প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহাকে আমরা বামনের চন্দ্রস্পর্শ আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ বলিয়া উপহাস বা উপেক্ষা করিয়া থাকি এবং যে প্রতিজ্ঞার প্রভাবে পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনের যুদ্ধবিদ্যাবৃদ্ধির প্রতীক্ষাতে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি আমরা মনোযোগ করি না, কিন্তু ভীম যে বীভৎসের একশেষ করিয়া দুঃশাসনের রক্তপান করেন তাহাই আমাদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞাপালনের দৃষ্টান্ত হইয়াছে। এই সংস্কার প্রযুক্তই হরিহর বাবু শ্যামসুন্দরের মুখ দেখিব না স্থির করিয়াছিলেন। বাঙ্গালিরা তর্কের বলে শ্বেতবর্ণকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিলে, বিচারকের চক্ষে ধূলি নিঃক্ষেপ করিতে পারিলে এবং মনিবকে আপন মতে ঘুরাইতে পারিলে উচ্চাভিলাষ সর্ব্বোতোভাবে চরিতার্থ হইল বলিয়া বোধ করেন। এইরূপ অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সৎপ্রকৃতি ব্যক্তিরাও জ্ঞানপূর্ব্বক কুতর্ক করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না; এবং অনেকে মিথ্যাকথন পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহাদিগের প্রসন্নতা ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি হয় না তাহাদিগের সমীপে এইরূপ আচরণ আর যাহাদিগের প্রতি ভয় মৈত্র উভয়ই

প্রদর্শিত হইতে পারে সেখানে কাল্পনিক ব্যবহার। ইহাই কর্ত্তৃত্বাভিলাষী বাঙ্গালির বীজমন্ত্র। ইহারা সময়ে সময়ে অন্তরাত্মার নিকট সহস্র ধিক্কার সহ্য করিয়াও হীনবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের তোষামোদে প্রবৃত্ত হন। এই তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্বের পরাকাষ্ঠা। ফলতঃ যে কর্ত্তৃত্বে আপনার নিকটেই নতশির হইয়া থাকিতে হয় তাহার গৌরব কি?

রাশভারি লোকের গুণ এই যে পরের মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকেন; চাপল্য বশতঃ কোন বিষয়ে উপেক্ষা করেন না। ইহারা বহুলোকের ভারবহন করেন। তাঁহাদিগের মনে যাহাই থাকুক, কার্য্যে অনেকের হিতসাধন হয়। ভারবহনের মর্ম্ম —জবাবদিহি। যে সকল বিষয়ের ভারবহন করিতে হয় তাহার জবাবদিহি করা আবশ্যক। জবাবদিহি যে কোন নির্দ্দিষ্ট লোকের নিকটেই করিতে হয় এমত নহে। আপনার মনে মনে জবাবদিহি করার ন্যায় কঠিন কার্য্য নাই। জবাবদিহি প্রকৃত ভারিত্বের লক্ষণ কিন্তু সকল রাশভারি লোক যথাযোগ্য মতে জবাবদিহি করেন না। অনেকে কেবল কর্ত্তৃত্বাভিলাষী, স্বার্থপর এবং অতিশয় জেদপ্রিয়; তাঁহারা ইষ্টলাভের জন্য সকল কুকর্ম্মই করিতে পারেন। এতদ্দেশে রাশভারি লোকের দোষগুণের বিষয় প্রকৃত বিচার হয় না বলিয়াই তাঁহাদিগের এত সম্মান আর আড়ম্বর।

সংস্কৃত ভাষায় দুইখানি কান্যকুব্জাধিপতি সাহসাঙ্ক নৃপতির জীবন-বৃত্তান্ত ঘটিত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে প্রথম খানি সাহসাঙ্ক-চরিত ও শেষোক্ত খানি নবসাহসাঙ্ক চরিত নামে খ্যাত। সুবিখ্যাত কোষকার মহেশ্বর সাহসাঙ্ক-চরিত রচয়িতা। এই গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে কিন্তু বিশ্বপ্রকাশ নিঘণ্টুর প্রারম্ভে মহেশ্বর অন্যান্য কোষকারের বিষয় লিখিয়া আপন পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তিনি গাধিপুরেশ্বর সাহসাঙ্কের চিকিৎসক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের বংশধর এবং তাঁহার পরিচয় অনুসারে ১০৩৩ শকে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ উইলসন সাহেব যে তাঁহার ১১১১ খৃষ্টাব্দ সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে না। বিশ্বকোষের ৯ এবং ১০ শ্লোকে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, মহেশ্বর কৃষ্ণের পৌত্র। সাহসাঙ্কের অপর এক নাম বিক্রমাদিত্য, তিনি মহেশ্বরের মতে গাধিপুরাধিপতি। কেহ কেহ গাধিপুর গাজিপুরের সংস্কৃত নাম মনে করিয়া থাকেন কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভ্রম। উহা কান্যকুব্জের অপর নাম মাত্র।* উইল্‌সন সাহেব বলেন যে, হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণির "নানার্থভাগ" বিশ্বকোষ হইতে সঙ্কলিত কিন্তু এ কথার আমরা অনুমোদন করি না। সে যাহা হউক বিশ্বকোষ হইতে আমাদিগের মত পরিপোষক কবির জীবন-বৃত্ত সম্বন্ধীয় বিবরণ ও গ্রন্থ-প্রণয়নের অবতরণিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা—

শ্রীসাহসাঙ্ক নৃপতেরনবদ্য বিদ্য বৈদ্যান্তরঙ্গ পদপদ্ধতিমেব বিভ্রৎ।
যশ্চংই চারু চরিতো হরিচন্দ্র নামাস্ত ব্যাখ্যয়া চরকতন্ত্র মলং চকার (৫)
আসীদসীম বসুধাধিপ বন্দনীয়স্তস্যান্বয়ে সকল বৈদ্যকুলাবতংসঃ।
শক্রস্য দস্র ইব গাধিপুরাধিপস্য শ্রীকৃষ্ণ ইত্য মল কীর্ত্তি-লতাবিতানঃ (৬)

---

*প্রসিদ্ধ কোষকার হেমচন্দ্র "কান্যকুব্জং গাধিপুরং" ইত্যাদি ক্রমে কান্যকুব্জ নগরের পর্য্যায়ে 'গাধিপুর' শব্দ বলিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য কোষ এবং মহাভারতাদি গ্রন্থেও কথিত আছে।

সংকল্প সংমিলদনল্প বিকল্প জল্প কল্পানলাকুলিত বাদিসহস্র সিন্ধুঃ।
তর্কত্রয় ত্রিনয়ন গণয়ন্তদীয়ো দামোদরঃ সমভবদ্ভিষজাং বরেণ্যঃ (৭)
তস্মা ভবৎস্মরুদারবাচো বাচস্পতিঃ শ্রীললনা বিলাসী।
সদ্বৈদ্য বিদ্যানলিনী দিনেশঃ কৃষ্ণস্ততঃ সৎকুমুদাকরেন্দুঃ ॥৮।
যস্ত্রাতৃজঃ সকল বৈদ্যকতন্ত্র রত্ন রত্নাকর শ্রীয়মবাপ্যচ কেশবোভূৎ।
কীর্ত্তির্নিকেতন মনিন্দ্যপদ প্রমাণ বাক্য প্রপঞ্চ রচনা চতুরানন শ্রী।৯।
কৃষ্ণস্য তস্যচ সুতঃস্মিতপুণ্ডরীকদণ্ডাতপ ত্রপ ভাগযশঃ পতাকঃ।
শ্রীব্রহ্মাইত্ব বিকল্লাম্রমুখারবিন্দ সোল্লাস ভাসিত রসার্দ্র সরস্বতীকঃ।১০।
তস্যাত্মজঃ সরস কৈরবকান্তকীর্ত্তিঃ শ্রীমন্মহেশ্বর ইতি প্রথিতঃ কবীন্দ্রঃ।
অশেষ বাঙ্ময় মহার্ণব পারদৃশ্বাশব্দাগমাম্বুরুহষণ্ড রবির্বভূব।১১।
যঃ সাহসাঙ্ক চরিতাদি মহাপ্রবন্ধ নির্ম্মাণ নৈপুণ্য গুণ পৌরবশ্রীঃ।
যো বৈদ্যকত্রয় সরোজ সরোজবন্ধুর্বন্ধুঃ সতাং চ কবি কৈরব কাননেন্দুঃ।১২।
সেয়ং কৃতিস্তস্য মহেশ্বরস্য বৈদগ্ধসিন্ধোঃ পুরুষোত্তমানাং।
দেদীপ্যতাং হৃৎকমলেষু নিত্য সাকল্প সাকল্পিত কৌস্তভশ্রীঃ।১৩।
লব্ধৈঃ কথঞ্চিদভিজাত সুবর্ণকারলীলেন কোষ শত বারিধি শব্দবর্ণ্যৈঃ।
বিশ্বপ্রকাশ ইতি কাঞ্চন বন্ধু শোভাং বিভ্রময়াত্র ঘটিতো মুখখণ্ড এষঃ।১৪
ফণীশ্বরোদীরিত শব্দকোষরত্নাকরালোড়ন লালিতানাং।
সেব্যঃ কথং নৈষ সুবর্ণ শৈলো বিশ্ব প্রকাশো বিবুধাধিপানাং।১৫।
ভোগীন্দ্র কাত্যায়ন সাহসাঙ্ক বাচস্পতি ব্যাড়িপুরঃ সরাণাম্।
সবিশ্বরূপামর মঙ্গলানাং শুভাঙ্ক বোপালিত ভাগুরীণাং।১৬।
কোষাবকাশ প্রকট প্রভাবসংভাবিতানর্ঘগুণঃ স এষঃ।
সংপাদয়ন্তে স্যাতি বাঞ্ছিতার্থান্ কথং ন চিন্তামণিতাং কবীনাং।১৭।
আমিত্র শৈল চরমাচল মেখলাদ্রি কৈলাস ভূমিবয়াদয়দিহাস্তিকিঞ্চিৎ।
একত্র সংভূত মগোবরশব্দ রত্ন মালোক্যতাং তদখিলং সুধিয়ঃ কবীন্দ্রাঃ ১৮।

ইত্যাদি

অর্থাৎ যিনি সাহসাঙ্ক নৃপতির নিকট বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মনোহর চরিত্রে অবস্থান করত সদ্ব্যাখ্যা দ্বারা চরক শাস্ত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহার নাম হরিচন্দ্র। (হরিচন্দ্রকৃত চরক টীকা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।) এই হরিচন্দ্রের বংশে বহুল বসুধাপতিমান্য, বৈদ্যকুলোদ্ভব, নির্ম্মলকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ নামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ইন্দ্রের অশ্বিনীকুমারের ন্যায় গাধিপুরাধিপতির বৈদ্য ছিলেন। (৫,৬) এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্ত ভিষগ্‌গণের পূজ্য দামোদর জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর মানসিক শক্তি সমুদ্ভূত বহুবিধ জল্প রূপ অনলে বাদীরূপ সমুদ্র পরিতপ্ত হইয়াছিল। এবং ত্রিবিধ তর্কশাস্ত্রে ত্রিনয়ন অর্থাৎ শিবতুল্য ছিলেন। (৭) ইঁহার পুত্রের নাম বাচস্পতি। বাচস্পতি অতি স্ত্রী-বিলাসী ছিলেন এবং

বৈদ্যবিদ্যারূপ পদ্মকুলের দিবাকর ছিলেন। এই বাচস্পতি হইতে সাধুজনরূপ কুমুদের চন্দ্রস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণ উৎপন্ন হন। (৮) ইঁহার ভ্রাতৃপুত্র কেশব। কেশবও বৈদ্যক শাস্ত্রের পারদৃশ্বা ছিলেন। অপিচ পদ, বাক্য, প্রমাণ ও রচনা বিষয়ে সুচতুর ছিলেন। (৯) তাদৃশ কৃষ্ণের পুত্র শ্রীব্রহ্ম। ইনিও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। (১০) এই শ্রীব্রহ্মের আত্মজ মহেশ্বর। ইনি চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল কীর্ত্তিলাভ করেন এবং ইনি কবিগণের শ্রেষ্ঠ। বাক্যরূপ অপার সমুদ্রের পারগমনকারী, শব্দশাস্ত্ররূপ পদ্মবনের সূর্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (১১) ইনি সাহসাঙ্ক চরিত প্রভৃতি মহা প্রবন্ধ নির্ম্মাণে নিপুণতা প্রকাশ করিয়া, গুণ গৌরবে শ্রী সম্পন্ন, বৈদ্যক শাস্ত্ররূপ পদ্মের সূর্য্য, সাধুজনের বন্ধু, কবি এবং কবিত্বরূপ কৈরব বনের চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া প্রথিত। (১২) এতাদৃশ মহেশ্বরের কৃত এই গ্রন্থ উত্তম পুরুষদিগের হৃদয়ে আকল্প পর্য্যন্ত নিত্য নিত্য শ্রীপুরুষোত্তমের কৌস্তুভ ধারণের শোভালাভ করুক। (১৩) (১৪) ফণিপতি কর্ত্তৃক উদীরিত শব্দকোষ সমুদ্র আলোড়ন করিতে করিতে যাঁহারা লালায়িত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কেন না এই সুবর্ণ সুমেরুতুল্য বিশ্বপ্রকাশ সমাদৃত হইবে ? (১৫)

ভোগীন্দ্র অর্থাৎ ফণিপতি, কাত্যায়ন, সাহসাঙ্ক, * বাচস্পতি, ব্যাড়ি, বিশ্বরূপ, অমর, মঙ্গল, শুভাঙ্ক, বোপালিত, ভাগুরী, এবং আদি প্রভৃতিরা কি কাঞ্চন শৈলের সেবায় পরাঙ্মুখ হইবে ? দেবতারা কি এই কাঞ্চন শৈলের (সুমেরুর) সেবা করেন না ?—ইত্যাদি ইত্যাদি—(১৬) (১৭) (১৮)
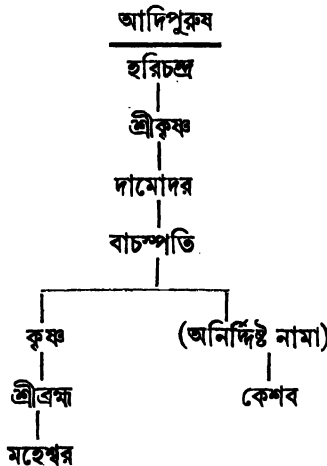
* সাহসাঙ্ক কৃত শব্দগ্রন্থ যাহা আছে তাহা আমরা দেখিতে পাই নাই, কিন্তু শব্দ শাস্ত্রের টীকাকারেরা স্থানে স্থানে "ইতি সাহসাঙ্ক দেবঃ" এই বলিয়া উক্ত ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এবং "দেবঃ" এই বিশেষণ দ্বারা বোধ হয় সাহসাঙ্ক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন।

অপিচ, রায় মুকুট মণি খ্যাত বৃহস্পতি ৪৫৩২ কলিগতাব্দে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকা পদচন্দ্রিকা রচনা করেন এবং মেদিনীকর তাঁহার পরে স্বীয়কোষ রচনা করিয়াছেন, ইঁহারা উভয়েই বিশ্বপ্রকাশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তথাহি মেদিনী—

হারাবল্যভিধাং ত্রিকাণ্ড শেষঞ্চ রত্ন মালঞ্চ।
অপি বহু দোষং বিশ্বপ্রকাশ কোষঞ্চ সুবিচার্য্য। ইত্যাদি—

কোলাচল মল্লিনাথ সূরি বিশ্বকোষের প্রমাণ স্বীয় টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। রায় মুকুট, মেদিনীকর, এবং হেমাচার্য্য সকলেই মহেশ্বরাচার্য্যের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাউক। মহেশ্বরের সাহসাঙ্ক চরিত রচনার পরে নৈষধ কর্ত্তা শ্রীহর্ষ নবসাহসাঙ্ক চরিত রচনা করেন।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, রাজশেখরের প্রবন্ধ চিন্তামণির প্রমাণানুসারে শ্রীহর্ষ দেব ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। এই প্রমাণ বিদ্বৎ-শার্দ্দূল বুলার মহোদয় গ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং আমরাও তাহা রাজশেখরের শ্রীহর্ষ প্রবন্ধ পাঠে প্রামাণিক বোধ করিতেছি। পুনরায় রাজশেখর সূরি হরিহর প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, হরিহর শ্রীহর্ষ বংশধর। তিনি শ্রীহর্ষের নৈষধ চরিত প্রথম প্রচারিত খণ্ড ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে লইয়া গিয়া ঢোল্‌কার রাণা বিরাধ বলের মন্ত্রী বস্তুপালকে প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষের সাহসাঙ্ক চরিতের পূর্ব্বে "নব" শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি নূতন রাজা সাহসাঙ্কের চরিতবর্ণনা করিয়াছেন সুতরাং এখানি মহেশ্বরের গ্রন্থ হইতে পৃথক্ নৃপতির চরিত্র বর্ণন বিষয়ক গ্রন্থ এজন্য ইহার নাম নবসাহসাঙ্ক চরিত যথা—

দ্বাবিংশো নবসাহসাঙ্ক চরিতে চম্পূকৃতোয়ং মহাকাব্যে
তস্য কৃতৌ নলীয় চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ।

ইহাতে টীকাকার নারায়ণ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

নবো যঃ সাহসাঙ্ক নাম রাজা তস্য চরিতে বিষয়ে চম্পূং
গদ্য পদ্য ময়ীং কথাং করোতীতিকৃৎ তস্য বিনির্ম্মিত
বতঃ সোপি গ্রন্থো তেন কৃত ইতিসূচ্যতে।

অর্থাৎ—যিনি অভিনব সাহসাঙ্ক রাজার চরিত্র লইয়া চম্পূ অর্থাৎ গদ্য পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এই নলচরিত বর্ণাত্মক মহাকাব্যের দ্বাবিংশ সর্গ তৎকর্ত্তৃক সমাপ্ত হইল। নলচরিত বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের রচয়িতা এস্থলে এই অর্থের সূচনা করিলেন যে, নবসাহসাঙ্ক চরিত গ্রন্থও তাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, নূতন সাহসাঙ্ক নৃপতির চরিত্র বর্ণন গ্রন্থ; এজন্য শ্রীহর্ষ ইহার নাম নব সাহসাঙ্ক চরিত রাখিয়াছেন।

শ্রীরামদাস সেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"এক দিন নিজ কক্ষে বসিয়াছি আমি—
মদালসে! শ্লথ দেহ, নিশি জাগরণে
অবশ পড়িয়া আছি কোমল 'ছোফায়।'
কখন পড়িতেছিনু; কভু অন্য মনে
গাইতেছিলাম গীত গুণ্ গুণ্ স্বরে,—
প্রেমময়,—নব রাগে, নব অনুরাগে,
নিরখি অসাবধানে শায়িত শরীর,
প্রতিকূল দেয়ালের দীর্ঘ-আরসীতে।
শিথিল হৃদয় যন্ত্রে, বালা চারমিয়ন!
মধুরে বাজিতেছিল আনন্দ সঙ্গীত;
আবার অজ্ঞাতে সখি! না জানি কেমনে
বিষাদ ভাঙ্গিতেছিল সে লয় মধুর।
কখন হাসিতেছিনু,—না জানি কারণ;
আবার অজ্ঞাতে অশ্রু নয়নে কখন
হঠাৎ আসিতেছিল, না জানি কেমনে।
একটি মানব ছায়া, এমন সময়ে,
পতিত হইল সখি! কক্ষ গালিচায়;
পলকে ফিরাতে নেত্র, দেখিলাম কক্ষে
প্রাণেশ আমার। কিন্তু সেই মূর্ত্তি!—যেই
মূর্ত্তি, অন্য দিন কক্ষে প্রবেশিতে মম,
বিকাসিত প্রেমানন্দ ললাটে, নয়নে;
হাসি রূপে সমুজ্জ্বল করিত অধীর;
নিঃসারিত সম্ভাষিতে,—'কই গো কোথায়
প্রাচীনা নীলজ (১) চারু ফণিনী আমার?'
সেই মূর্ত্তি—আজি দেখি গাম্ভীর্য্য আঁধার,
কাঁপিল হৃদয় মম।—'ক্লিওপেট্রা! এই
দুঃসময় যোজিতেছে জলধর রূপে,
চারিদিকে এণ্টনির অদৃষ্ট আকাশ;
যদি এ সময়ে, নাহি উড়াই তাহারে,
হইবে অসাধ্য পরে। রোম হতে আজি
কুসম্বাদ;—আন্তরিক বিগ্রহ কৃপাণে
'ইতালি' কণ্টকাকীর্ণ! কৃপাণ ফলকে
প্রতিবিম্বে রবিকর নির্ভয়ে দিবসে,
উপহাসি এণ্টনির বিলাস জীবন।
প্রেয়সি! বিদায় তবে কিছু দিন তরে
দেও যাই; কটাক্ষে সে কৃপাণ সকল
ছিন্ন শস্য রাশি মত, আসি শোয়াইয়া
আমি ডুবাইয়া নেত্র নিমিষে, পম্পির
জল যুদ্ধ সাধ, সেই সমুদ্রের জলে,—
পিতার অন্তিম শয্যা প্রদানি পুত্রেরে!
দেও অনুমতি তবে। ঈর্ষার অনল
জ্বলে থাকে যদি তব রমণী হৃদয়ে,
নিবাও তাহারে, শুন দ্বিতীয় সংবাদ—
মরেছে ফুলভিয়া আমা—'

মরেছে!—

কি মরেছে ফুলভিয়া! 'হাঁ মরেছে ফুলভিয়া।'
দংশেছিল এণ্টনির বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ

(১) নীলজ—নীলনদী-জাত।

যেই পলে, সেই পলে, মরেছে ফুলভিয়া—
এ সংবাদে, চারমিয়ন! অমৃত ঢালিল।
এই মুক্তাহার নাথ! পরাইয়া গলে,
বলিলেন,—'এই হারে যত মুক্তা প্রিয়ে!
ইতালির রণজয় করিতে প্রচার,
তত রাজ্যে সাজাইব মুকুট তোমার
কল্যাণি! অন্যথা এই তরবারি মম,
বিসর্জ্জি আসিব ওই ভূমধ্য-সাগরে।
প্রেয়সি! বিদায় দেও যাইব এখন।
মিশরে থাকিবে তুমি, কিন্তু ছায়া তব
যেতেছি লইয়া মম ছায়াতে মিশায়ে;
বিনিময়ে চিত্ত মম যাইব রাখিয়া
তব সহচর সদা,—'

"ধরিয়া গলায়,
উন্মত্তার প্রায় সখি! কত কাঁদিলাম,
কত বলিলাম—'নাথ! নাহি চাহি আমি
রাজ্য ধন, মুহূর্ত্তের ভালবাসা তব,
শত শত রাজ্যে কিম্বা সমস্ত ধরায়,
নাহি পাবে ক্লিওপেট্রা। পৃথিবী কি ছার!
স্বর্গ তুচ্ছ তার কাছে, প্রাণেশ! তোমার
প্রণয় রাজ্যের রাণী যেই সুভাগিনী।'
কত কাঁদিলাম, সখি! কত বলিলাম,
কত শুনিলাম, কিন্তু বিফল সকল;—
রণে মত্ত কেশরীরে, কেমনে সজনি!
রমণী বীতংসে বল, রাখিবে বাঁধিয়া?
ফুটিল অধরে উষ্ণ কোমল চুম্বন
বিদ্যুতের মত—সখি! নাহি জানি আর।"
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, পুনঃ বিধুমুখি—
(হায়! সেই বিধু আজি নিবিড় জলদে
আচ্ছাদিত)—আরম্ভিল,—"পাইলাম জ্ঞান
যবে ওলো চারমিয়ন! নাহি পাইলাম
আর হৃদয় আমার। নাহি দেখিলাম
চাহি আকাশের পানে—রবি, শশী, তারা;
ধরাতল মরুভূমি; নাহি তাহে আর
সুশোভার চিহ্ন মাত্র। শব্দবহ হায়!
নিঃশব্দ আমার কাণে। কেবল সজনি!
দেখিলাম কি আকাশ, কিম্বা ধরাতল
এণ্টনিতে পরিপূর্ণ! শুধু সমীরণ
বহিছে এণ্টনি স্বর! দেখিতে, শুনিতে,
কিম্বা ভাবিতে,—এণ্টনি! ক্লিওপেট্রা কর্ণে,
কণ্ঠে, নয়নে, হৃদয়ে—এণ্টনি কেবল?
আহার, পানীয়, নিদ্রা, শয়ন, স্বপন—
সকলি—এণ্টনি! সখি! কি বলিব আর,
হইল জীবন মম অবিকল ওই
আফ্রিকার মরুভূমি, প্রত্যেক বালুকা
কণা—একটি এণ্টনি! দিবা, নিশি, পক্ষ,
মাস, কিছুই আমার নাহি ছিল জ্ঞান।
গণিতাম কাল আমি বৎসরে কেবল।
অনন্ত ভুজঙ্গ সম কাল বিষধর
দাঁড়াইয়া এক স্থানে, হতো হেন জ্ঞান,
দংশিছে আমারে যেন অনন্ত ফণায়।
প্রভাতে উঠিলে রবি, ভাবিতাম মনে,
জিনিতে মিশর ওই আসিছে এণ্টনি,
রণবেশে! রবি অস্তে, সায়াহ্নে আবার
ভাবিতাম বীরশ্রেষ্ঠ চলি গেল রোমে।
হাসিমুখে শশধর ভাসিতে গগনে
ভাবিতাম আসিতেছে এণ্টনি আবার,
প্রণয় পীযুষে হায়! যুড়াতে আমায়।
অস্ত গেলে নিশানাথ, প্রাণনাথ গেল
ছাড়ি ভাবিতাম মনে।"

"এইরূপে সখি!
গেল যুগ, গেল বর্ষ, কিম্বা দিন, মাস,
নাহি জানি। একদিন তাপিত হৃদয়
যুড়াইতে জ্যোৎস্নায়, শুয়েছি নিশীথে
সুকোমল কৌচ অঙ্কে, ছাদের উপরে।
সেই দিন দূত মুখে, নব পরিণয়
এণ্টনির নারী-রত্ন অগস্তার (১) সনে
শুনিয়াছিলাম;—তরুভ্রষ্ট হায়! যেই

(১) অগস্তা—এণ্টনির দ্বিতীয় পত্নী।

বিশুষ্ক বল্লরী, কেন, রে দারুণ বিধি !
হেন বজ্রাঘাত পুনঃ তাহার উপরে !
শুয়েছি ; উপরে নীল চিত্রিত আকাশ
প্রসারিত,—নাক্ষত্রিক চারু রঙ্গভূমি !
মধ্যস্থলে শশধর হাসিয়া হাসিয়া,
রূপের গৌরবে যেন ঢালিয়া ঢালিয়া
করিতেছে অভিনয়। নক্ষত্র সকল
নীরবে, অচলভাবে করিছে দর্শন
সেই সুশীতল রূপ। কেহ বা আনন্দে
জ্বলিতেছে ; অভিমানে নিবিতেছে কেহ ;
কেহ রূপে বিমোহিত পড়িছে খসিয়া।
ছুটিছে জীমূতবৃন্দ উন্মত্তের প্রায়
আলিঙ্গিতে সেই রূপ ; উথলিছে সিন্ধু ;
রূপ মুগ্ধ—অধিক কি ঘুরিছে ধরণী।
এই অভিনয় সখি দেখিতে দেখিতে
কতই নিদ্রিত ভাব উঠিল জাগিয়া
হৃদয়ের ! সময়ের তামস গহ্বরে,
এই চন্দ্রালোকে, অঙ্কে অঙ্কে দেখিলাম
বিগত জীবন। কভু ভাবিলাম মনে,
আমি চন্দ্র, মেঘবৃন্দ বীরেন্দ্র সকল,
নক্ষত্র মানবচয় ; আমি শশধর,—
সিন্ধু বীরের অন্তর। আবার কখন
ভাবিলাম আমি চন্দ্র, ধরণী এণ্টনি।
ভাবিতেছিলাম পুন, এই চন্দ্রালোকে
নব-প্রণয়িণী পাশে, নব অনুরাগে,
বসিয়া সুদূর রোমে প্রাণেশ আমার,
ভুলেছে কি ক্লিওপেট্রা ? ভাবিছে কি মনে—
কোথায় নীলজ চারু ফণিনী আমার ?
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ ? কিম্বা অগস্তার
নবীন প্রণয় রাজ্যে এবে এণ্টনির
হয়েছে কি অধিকৃত সমস্ত হৃদয় ?
করেছে কি ক্লিওপেট্রা চির-নির্ব্বাসিত ?—
নবীনা সপত্নী নামে, ওলো চারমিয়ন !
জ্বলিয়া উঠিল তীব্র ঈর্ষার অনল
রমণী-হৃদয়ে, যেন বিশুষ্ক কাননে
অকস্মাৎ প্রবেশিল ভীম দাবানল।
রমণীর অভিমানে রমণীহৃদয়
ভরিল। আরক্ত নেত্রে ছুটিল অনল।
যেই মানসিক বৃত্তি, প্রণয়ের তরে
ধরার কলঙ্ক রাশি ঠেলেছিল পায়ে,
আজি অপমানে পুনঃ সেই বৃত্তিচয়
হলো খড়্গ-হস্ত সেই প্রণয়-ঘাতকে !
সুষুপ্ত ভুজঙ্গ যেন, দুষ্ট প্রহারীকে,
বিস্তারিয়া ফণা ক্রোধে ছুটিল দংশিতে।
'কি ! মিশরের ঈশ্বরী !—টলেমি দুহিতা !
ক্লিওপেট্রা আমি !—রূপ বিশ্ববিমোহিনী !
যে রূপের তেজে সেই ভুবন বিজয়ী
সিজারের তরবারি পড়িল খসিয়া !
সামান্য শুক্তিকা তরে, সে রূপ রতন
এণ্টনি ঠেলিল পায়ে !'—তীরের মতন
বসিনু শয্যায় ; কিন্তু দুর্ব্বল শরীর
দুরূহ যন্ত্রণা, চিন্তা, সহিতে না পারি,
ভুজঙ্গে দংশিত যেন পড়িল ঢলিয়া
শয্যার উপরে পুনঃ। মধুরে তখন
বহিল শীতল নীল-নীরজ অনিল ;
কোমল পরশে ধীরে হইল সঞ্চার
অর্দ্ধ নিদ্রা, অর্দ্ধ মূর্চ্ছা, ক্লান্ত কলেবরে।"
"দেখিনু স্বপন ! সখি ! কি যে দেখিলাম
এখনো স্মরিতে কেশ হয় কণ্টকিত।
দেখিনু শার্দ্দূল এক—ভীষণ আকৃতি !
নিবিড় অরণ্যে মম ধাইছে পশ্চাতে,
বিস্তারিয়া মুখ। ত্রাহি ত্রাহি বলি আমি
চাহিনু আকাশ পানে। দেখিলাম সখি !
অপূর্ব্ব তপন এবে উদিত গগনে
উজ্জ্বলিয়া দশ দিক্ করে আকর্ষিয়া
সেই মার্ত্তণ্ড আমারে তুলিল আকাশে ;
সখি ! আমি শোভিলাম শশধর-রূপে
বামে সবিতার। হায় ! এমন সময়ে
অকস্মাৎ রাহু আসি গ্রাসিল তাহারে।
হইয়া আশ্রয়হীনা আমি অভাগিনী

পড়িতেছিলাম বেগে, অর্দ্ধ পথে সখি!
বীর-সূর্য্য অস্ত জন হৃদয় পাতিয়া
লইল আমারে। আমি আনন্দে মাতিয়া
পরাইনু প্রেম-হার গলায় তাহার,
কিন্তু কি কুক্ষণে হায়! বলিতে না পারি!
সে হার পরশে বীর হৃদয় তাহার,
—ফাটিত যে উরস্ত্রাণ রণরঙ্গে মাতি,—
হইল বিলাসে যেন নারী সুকুমার!
শারসন হতে অসি পড়িল খসিয়া,
—অরাতি মস্তকে ভিন্ন নামে নাহি যাহা,—
কুসুম শয্যায়! শেষে মাথার মুকুট
পড়িল খসিয়া ওই ভূমধ্যসাগরে,
অস্তগামী রবি যেন! কি বলিব আর,
যেই বক্ষে অরাতির অসংখ্য কৃপাণ
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া যেন প্রচণ্ড শিলায়
স্ফটিকের দণ্ড, কিম্বা মত্ত গজ দন্ত
হায় রে! যেমতি চন্দ্র-পর্ব্বত প্রস্তরে;
মম প্রেম হার তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত,
সেই বক্ষে প্রিয় সখি! পশিল আমূল!
তখন সে হার ধরি ভুজঙ্গের বেশ
ছুটিল পশ্চাতে মম। সভয়ে তখন
ডাকিতেছি—'কোথা নাথ! এমন সময়ে,
কোথা নাথ!—'
'প্রিয়ে! এই চরণে তোমার।—'
যে সঙ্গীতে এই ধ্বনি পশিল শ্রবণে,
সে সঙ্গীত ক্লিওপেট্রা শুনিবে না আর।
ভাঙ্গিল স্বপন সখি, ফুটিল চুম্বন
বিশুষ্ক অধরে মম; মেলিয়া নয়ন
দেখিলাম প্রাণনাথ! হৃদয়ে আমার।
অভিমানে বলিলাম—'সে কি নাথ! ছাড়ি
রোম রাজ্য, ছাড়ি নব প্রণয়িনী, কেন
এখানে আপনি? কিম্বা এ আপনি নন;
এই ছায়া আপনার, আসিয়াছে বুঝি
বিরহ আতপ তাপে যুড়াতে আমায়।—'
'নিমজ্জিত হক্ রোম টাইবরের জলে,
রাজ্য; প্রণয়িনী সহ, এই রাজ্য মম,—'
(বলিলা হৃদয়ে ধরি হৃদয় আমার,)
'প্রণয়িনী ক্লিওপেট্রা—ইহ জীবনের
সুখ এই,—' পুনঃ নাথ চুম্বিলা অধর;
'জীবন তোমার প্রেম, বিরহ মরণ।'
দূরে গেল অভিমান; রমণীর প্রেম
স্রোতে অভিমান, সখি! বালির বন্ধন।
বলিলাম—'সত্য নাথ! এই হৃদয়ের
তুমি অধীশ্বর, কিন্তু বলিব কেমনে
এই ক্ষুদ্র-রাজ্য তব? অনন্ত জলধি
জলে যেই শশধর করে ক্রীড়া, নাথ!
ক্ষুদ্র সরসীর নীরে মিটিবে কেমনে
ক্রীড়া সাধ, প্রাণেশ্বর! সেই শশাঙ্কের?
প্রণয় বারিদ তুমি! তুমি যদি তবে
রাখ সসলিলা এই সরসী তোমার,
যোগাবে অনন্ত বারি, এই প্রেমাধিনী।'
মৈশরী হৃদয়াকাশে প্রণয়ের সখি
প্রকাশিল যদি পুনঃ, মিশরে আবার
ছুটিল দ্বিগুণ বেগে আমোদ জোয়ার।
কত রাজ্য সিংহাসন, আসিল ভাসিয়া
ক্লিওপেট্রা পদতলে বলিব কেমনে।
সমস্ত পূরব রাজ্য মিলি এক তানে,
'পূরব রাজ্যের রাণী, মিশর ঈশ্বরী!—'
গাইল আনন্দ স্বরে। হায়! সেই ধ্বনি
জাগাইল সুপ্ত সিংহ—কনিষ্ঠ সিজার—(১)
কুক্ষণে; কুগ্রহ সখি হইল তখন
ক্লিওপেট্রা, এণ্টনির অদৃষ্টে সঞ্চার।
শুনিনু গর্জ্জন তার সহস্র কামানে,
মিশরে বসিয়া সখি, ছুটিল হর্য্যক্ষ
অসংখ্য অর্ণবপোতে, গ্রাসিতে মিশরে,
শতধা বিদারি ভীম ভূমধ্য সাগর,

(১) কনিষ্ঠ সিজার—Augustus Cæsar.

সহোদরা অপমান প্রতিবিধানিতে। (২)
নির্ভয় হৃদয়ে সখি! সাজিল এণ্টনি,
হেলায় খেলিতে যেন বালকের সনে।
বলিলা আমারে নাথ! হাসিয়া হাসিয়া
'মিশরে বসিয়া প্রিয়ে! দেখ মুহূর্ত্তেকে
বালকের ক্রীড়া সাধ আসি মিটাইয়া।'
ধৈর্য্য না মানিল মনে; ভাবিলাম যদি
পাপিষ্ঠা সপত্নী আসি প্রাণেশে আমার
লয়ে যায় এ কৌশলে। বলিলাম—'নাথ!
বহু দিন সাধ মম করিতে দর্শন
অর্ণব আহব, প্রভু পূরাও সে সাধ;
তুমি যদি না পূরাবে, কে পূরাবে আর
বীরেন্দ্র;—' হাসিয়া নাথ বলিলা আমারে,—
'সাজ তবে, বীরেন্দ্রাণি! বালকের রণে
মহারথী ক্লিওপেট্রা, সারথী এণ্টনি!'
আপনি প্রাণেশ, রণবেশে সাজাইলা
আমাকে, সজনি! সুখে সাজাইতে হায়!
কত যে কি সুখ নাথ দেখিলা নয়নে,
চুম্বিলা অধরে, সখি! পরশিলা করে,
বলিব কেমনে? অঙ্কে অঙ্কে বিরাজিয়া
স্ফুট নলিনীর, অলির কি সুখ, পদ্ম
বুঝিবে কেমনে? আমি আপনি সজনি!
বীরবেশে প্রেমাবেশে হইনু বিভোর।
ফুরাইলে বেশ, নাথ হাসিয়া আদরে,
সমর্পিয়া করে চারু কুসুমের হার,
বলিলা—'কি কাজ প্রিয়ে! অস্ত্রেতে তোমার,
বিনা রণে, এই অস্ত্রে, জিনিবে সংসার।'
অসংখ্য অর্ণব যান, সৈন্য অস্ত্র ভরে
প্রায় নিমজ্জিত কায়, বিশাল ধবল
পক্ষে বন্দী করি দেব প্রভঞ্জনে দর্পে,
বিক্রমে ফেণিয়া সিন্ধু, চলিল সাঁতারি
যেন প্রমত্ত বারণ। চলিলাম আমি
নির্ভয়ে, কেশরী যেই হরিণীরে সখি!
দিয়াছে অভয়, তার কি ভয় জগতে?
বীর প্রণয়িনী আমি, বীরের সঙ্গিনী,
ডরিব কাহারে? কিন্তু অবলা মনের
না জানি কি গতি; যত আশ্বাসিয়া মন
করি ভাসমান, তত ভাবী আশঙ্কায়
হইতেছে ভারি। তত কাল রঙ্গে, মম
চকিত কল্পনা হায়! অজ্ঞাতে কেমনে
চিত্রিতেছে ভবিষ্যৎ। যদিও না জানি,—
পর চিত্ত অন্ধকার!—বুঝিনু তথাপি
ভাবী অমঙ্গল ছায়া পড়েছে হৃদয়ে
এণ্টনির। লুকাইতে সে করাল ছায়া
রমণীর কাছে, নাথ! হয়েছে মগন
সঙ্গীতে, সুরায়,—"
"দ্রুত ভাঙ্গিল স্বপন,
সর্ব্বনাশ!!—এ কি দেখি সম্মুখে আমার!
অসীম বারিদ পুঞ্জ, ভীম কলেবর!—
পড়েছে খসিয়া ও কি জলধি হৃদয়ে?
খেলিছে বিদ্যুৎ ও কি জীমূত ঘর্ষণে?
ও কি শব্দ ভয়ঙ্কর?—জীমূত গর্জ্জন?
সকলই ভ্রম!—সখি! শুকাইল মুখ,
বিপক্ষ তরণী ব্যূহ সজ্জিত সমরে!
বিদ্যুৎ,—কামান অগ্নি; দুর্জ্জয় কামান
মুহুর্মুহু মেঘমন্দ্রে গর্জ্জিছে ভীষণ।
যেই দৃশ্য—নেত্রে কর্ণে, চিত্তে ভয়ঙ্কর!—
দেখিলাম চারমিয়ন! বলিব কেমনে
কামিনী কোমল কণ্ঠে? শুনিবে তোমরা
নারী কোমল হৃদয়ে? দেখে থাক যদি
প্রতিকূল প্রভঞ্জনে প্রাবৃট্ অম্ভোদ
আঘাতিতে পরস্পরে, বিলোড়ি গগন,
ছিন্ন নক্ষত্র মণ্ডল; বুঝিবে কেমনে
প্রতিকূল তরী ব্যূহ পশিল সংগ্রামে।
মুহূর্ত্তেকে ধূমপুঞ্জে ঢাকিল জলধি
আঁধারিয়া দশ দিশ; কিন্তু না পারিল
সংহারক রণমূর্ত্তি লুকাতে আঁধারে।
সেই অন্ধকারে সখি অঙ্গ মিশাইয়া

(২) অগস্তা—অগস্তস সিজারের কনিষ্ঠা ছিলেন।

তরীর উপরে তরী ঝাঁপ দিল রোষে।
গর্জ্জিল কামান,—ঝাঁপ দিল শত সূর্য্য
ফেণিল সাগরে, তরী বৃন্দ বিদারিয়া
নিমজ্জিয়া জলে, নর রক্তে কলঙ্কিয়া
সুনীল সলিলে। হায়! সখি! তুচ্ছ নর;
আপনি জলধি,—সেই ভীষণ নির্ঘাত,
তীব্র অনল বর্ষণ, না পারি সহিতে,
করিতেছে ছটফট উত্তাল তরঙ্গে,
ফেণিয়া ফেণিয়া, ঘন ঘন নিশ্বাসিয়া
পড়িতেছে আছাড়িয়া কূলের উপরে।
তরণীর প্রতিঘাত কামান গর্জ্জন,
দহ্যমান তরণীর, অনল হুঙ্কার,
বন্দুকের অগ্নিবৃষ্টি, অস্ত্রঝনৎকার,
জেতার বিজয়ধ্বনি, মৃতের চীৎকার,
ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গ, সিন্ধু আস্ফালন
ভয়ঙ্কর! নিরখিয়া উড়িল পরাণ।
অবলা হৃদয় ভয়ে হইল অচল;
বলিলাম কর্ণধারে—'ফিরাও তরণী,
বাঁচাও পরাণ।' আজ্ঞামাত্র সংখ্যাতীত
ক্ষেপণী ক্ষেপণে, বেগে চলিল তরণী
মিশর উদ্দেশে হায়! মন্দুরার মুখে
ছুটিল তরঙ্গ যেন। কিছুক্ষণ পরে
সভয়ে ফিরায়ে আঁখি দেখিতে পশ্চাতে
দেখিলাম ভাঙ্গিয়াছে কপাল আমার।
না দেখি তরণী মম, রণে ভঙ্গ দিয়া
উন্মত্তের প্রায় ওই আসিছে এণ্টনি!
আকাশ ভাঙ্গিয়া হায়! পড়িল মস্তকে
অকস্মাৎ! ভাবিলাম মনে, এ সময়ে
নাথের সহিত যদি হয় দরশন,
অনুতাপে নাহি জানি কোন অপমান
করিবে আমার; হায়! কেন আসিলাম,
আমি কেন মজিলাম! নাহি ডুবিলাম
কেন জলধির তলে? নাহি মরিলাম
সেই বিষম সংগ্রামে, নাথের সম্মুখে?
কেন আসিলাম আমি!—কেন মজিলাম!"

"অনাহারে, অনিদ্রায়, মুমূর্ষুর মত,
অবতীর্ণ হইলাম মিশরের তীরে
বহু দিনে। এই রণে গিয়াছিনু সখি!
এণ্টনির সোহাগিনী, পৃথিবীর রাণী;
আসিলাম ভিখারিণী ডুবায়ে এণ্টনি।
চলিলাম গৃহ মুখে, বিসর্জ্জন করি
মাথার মুকুট, ভাবি রোম সিংহাসন,
এণ্টনির প্রেম,—হায়! মৈশরী জীবন,—
ভূমধ্য সাগরে;—এই জীবনের মত
বিসর্জ্জিয়া যত আশা ব্যোম নিকেতন।
চলিলাম গৃহে;—কোন মতে, কোন পথে
নাহি ছিল জ্ঞান। নিল উড়াইয়া যেন
মানসিক ঝটিকায়। প্রবেশি প্রাসাদে
দেখিলাম অন্ধকার! নাহি সে মিশর
রাজ্য নাহি রাজধানী, দেখিনু কেবল
অন্ধকার!—মরুভূমি! সমস্ত ভূতল
হইতেছে তরঙ্গিত ভীম ভূকম্পনে।
সেই অন্ধকারে, সেই মরুভূমি মাঝে
দেখিনু কেবল—মম সমাধি ভবন!
চলিলাম সেইদিকে, উন্মাদিনী আমি।
বলিলাম—তোমারে কি?—না হয় স্মরণ,
চারমিয়ন্!—বলিলাম—আসিলে এণ্টনি,
অনুতাপে ক্লিওপেট্রা ত্যাজিল জীবন,—
বলিও প্রাণেশে মম, বলিও তাঁহারে,—
'মৈশরীর শেষ কথা – ক্ষমিও এণ্টনি!'
সমাধির দ্বারে সখি! পড়িল অর্গল।"
"আসিল এণ্টনি; সখি! নাথের সে মূর্ত্তি
স্মরিলে এখনো মম বিদরে হৃদয়!
প্রসারিত নেত্রদ্বয়—উন্মত্ত, উজ্জ্বল!
প্রশস্ত ললাট—যেন ধবল প্রস্তর,—
নাহি রক্ত চিহ্ন মাত্র! বিষাদ লিখেছে
রেখা কপোলে, কপালে, উপহাসি যেন
বার্দ্ধক্যে! চিত্রেছে শুক্লে মস্তক সুন্দর!
এত রূপান্তর সখি! এই কয় দিনে
গিয়াছে নাথের যেন কতই বৎসর!

শুনিলা সখীর মুখে, স্তম্ভিতের মত,—
'অনুতাপে ক্লিওপেট্রা, ত্যাজিল জীবন,
মৈশরীর শেষ কথা—ক্ষমিও এণ্টনি।'
'ক্ষমিলাম'—বলি নাথ হৃদয় চাপিয়া
দুই হাতে, প্রবেশিল রাজ হর্ম্ম্যে বেগে,—
বিদ্যুতের গতি! হেন কালে চারিদিকে
উঠিল নগরে সখি! ভীম কোলাহল।
ভূমধ্য সাগর যেন তীর অতিক্রমি
প্লাবিল মিশর! ত্রস্তে বাতায়ন পথে
দেখিলাম—নহে সিন্ধু—সৈন্য সিজারের,
লুঠিতেছে হতভাগ্য—নগর আমার।
অপূর্ব্ব সিজার গতি! চক্ষুর নিমিষে
ঘেরিল সমস্ত পুরী,—সমাধি আমার;
পড়িনু ব্যাধের জালে আমি কুরঙ্গিণী!
কিন্তু ও কি, সহচরি! সমাধির তলে!
ওই শয্যার উপরে মুমুর্ষু এণ্টনি!!
চাহিলাম ঝাঁপ দিতে শয্যার উপরে,
তুমি ধরিলে অমনি। তুলিলাম নাথে
সমাধি উপরে;—হায়! সমাধি উপরে!
এই ছিল লেখা সখি কপালে আমার,
কে জানিত! প্রাণনাথ বলিলা আমারে
সেই স্বর, প্রিয় সখি! অস্ফুট দুর্ব্বল!—
'মৈশরি! ভবের লীলা ফুরাইল আজি
এণ্টনির; পৃথিবীতে, প্রেয়সি! আমার
আর নাহি প্রয়োজন! ফুরাইল কাল,
আমি যাই অস্তাচলে। এই অস্ত্রলিখা
প্রিয়ে হৃদয়ে আমার,—নহে শত্রুদত্ত;
হেন সাধ্য কার? নাহি এই ভূমণ্ডলে
এণ্টনি বিজয়ী,—বিনা ক্লিওপেট্রা! আজি
এণ্টনির করে প্রিয়ে! আহত এণ্টনি।
আসিয়াছি,—শেষ সুরা পাত্র করি পান
তব সনে, প্রণয়িনি!—লইতে বিদায়;
দেও, প্রিয়তমে! যাই—বিদায় চুম্বন।
সুরা করিলাম পান, চুম্বিনু চুম্বন।
শুনিনু অস্ফুট স্বরে, জন্মের মতন—
'ক্লিওপেট্রা!—প্রণ—য়ি—নি!—'
'প্রাণনাথ আমি
ক্লিওপেট্রা অভাগিনী!'—বলি উচ্চৈস্বরে,
আঁটিয়া হৃদেশে সখি ধরিনু হৃদয়ে
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে যুগল নয়ন—
জ্যোতিতে যাহার রোম আছিল উজ্জ্বল,
অসংখ্য সমর ক্ষেত্রে, কিরণ যাহার
ছিল বিভাসিত যেন মধ্যাহ্ন তপন;
খেলিত বিদ্যুৎ মত সৈন্যের হৃদয়ে
উত্তেজিয়া রণরঙ্গে;—নিবিল ক্রমশঃ।
মানব গৌরব রবি হলো অস্তমিত!
'প্রাণেশ্বর!—প্রাণনাথ এণ্টনি আমার।'
ডাকিলাম বারম্বার উন্মাদিনী প্রায়;
'প্রাণেশ্বর!—প্রাণনাথ!—এণ্টনি আমার।'
শুনিলাম উত্তরিল, সমাধি ভবন।
প্রাণে—শ্বর!—প্রাণ!——"
আহা সহিল না আর;
অবশ মস্তক ভার গ্রীবা দুঃখিনীর
পড়িল ভাঙ্গিয়া, বামা পড়িল ভূতলে;—
ব্যাধ শরে বিদ্ধ যেন বন কপোতিনী!
অতি ত্রস্তে সখিদ্বয় ধরাধরি করি,
তুলিল শয্যায় শ্বেত প্রস্তর পুতুলী;
উরবাস, কটিবন্ধ, করিয়া মোচন,
শীতল তুষার বারি, উরসে, বদনে,
বরষিল কিন্তু নাহি পাইল চেতন
অভাগিনী! তবু নাহি মেলিল নয়ন।
সহচরীদ্বয় দুঃখে বসিয়া নিকটে
কাঁদিতেছে ভর্ত্রী-শোকে, হৃদয় বিকল।
অকস্মাৎ তীরবেগে, বসিয়া শয্যায়,—
মুষ্টি-বদ্ধ করদ্বয়,—বিস্তৃত নয়ন,—
তীব্র জ্যোতি পরিপূর্ণ! চাহি শূন্য পানে
উন্মত্ত, বিকৃত কণ্ঠে, বলিতে লাগিল।
"পরিণয়!—পরিণয়!—তুচ্ছ পরিণয়
যদি না থাকে প্রণয়। প্রণয় বিহনে
পরিণয়!—পরিমলহীন পুষ্প! মণি-

হীন ফণী—আজীবন অনন্ত দংশক।
মধুহীন মধুচক্র!—মক্ষিকা পূরিত।
হেন পরিণয় বলে, ওই দেখ সখি
এণ্টনির পাশে বসি, অগস্তা সিল্‌ভিয়া,
আমায় কুলটা বলি করে উপহাস।
কি কুলটা—ক্লিওপেট্রা! প্রণয়ের তরে
বিসর্জ্জিয়া কুল আমি পেয়েছিনু যারে,
কুল তুচ্ছ—প্রাণ দিয়া—তোরা অভাগিনী
না পাইয়া তারে, আজি তোরা গরবিণী,
পোড়া পরিণয় বলে! পরিণয় বলে
জীব লোকে তোরা নাহি পাইলি যাহারে,
দেখিব অমর লোকে, পরিণয় বলে
তারে রাখিবি কেমনে।" উন্মাদিনী হায়!
ছুটিল তাড়িত বেগে, সহচরীদ্বয়,
না পারিল প্রাণপণে রাখিতে ধরিয়া
প্রবেশিয়া কক্ষান্তরে, দ্রুত হস্তে বামা,
একটী সুবর্ণ কৌটা খুলিল যেমতি,
ক্ষুদ্র বিষধর এক ফণা বিস্তারিয়া,
বসাইল বিষদন্ত কোমল হৃদয়ে—
রূপে মুগ্ধ ফণী যেন করিল চুম্বন!
সখীদ্বয় উচ্চৈস্বরে করিল চীৎকার,
ভূতলে ঢলিয়া আহা! পড়িল মৈশরী।
"এই বেশে চারমিয়ন! ভেটিয়াছিলাম
নাথে চীদনস তীরে, এই বেশে আজি
চলিলাম প্রাণনাথ ভেটিতে আবার—"
বলিতে বলিতে বিষে, কালিমা সঞ্চার,
করিল অতুল রূপে, যেই রূপে হায়!
সমস্ত রোমান রাজ্য—প্রাচীনা পৃথিবী—
ছিল বিমোহিত; সেই রূপে জলে, স্থলে,
হলো প্রজ্বলিত কত সমর অনল,
কতই বিপ্লবে রোম হলো বিপ্লাবিত:
নিবিল সে রূপ আজি,—মরিল মৈশরী,
সমর্পিয়া কালে পূর্ণ যৌবন রতন,
অপূর্ব্ব রমণী কীর্ত্তি—রূপে, গুণে, দোষে!
রাখি ভূমণ্ডলে হায়! রাখি প্রতিবিম্ব
অসংখ্য প্রস্তরে, পটে, কাব্যে, ইতিহাসে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বাখ্যান

বহুকাল পূর্ব্বে স্ববর্ণপুরে রামভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক জন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ধনীদিগের গৃহে নিমন্ত্রণ খাইয়া রামভদ্র আপনার উদর পূরণ করিতেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে একমাত্র নবমবর্ষীয়া ভগিনী ছিল। তাঁহার ভগিনী চন্দ্রাবলী অসামান্য রূপবতী ছিল। পূর্ব্বাঞ্চলের কোন অশীতিবর্ষবয়স্ক ধনাঢ্য ভূস্বামী তাঁহার পাণিগ্রহণ করাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে রামভদ্রের দরিদ্রতা ঘুচিল। প্রাচীন ভূস্বামী কিঞ্চিৎকাল পরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। চন্দ্রাবলীর সন্তান হইল না দেখিয়া তিনি আপন মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে চন্দ্রাবলীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বর্ণ এবং রৌপ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে চন্দ্রাবলী আপন ভ্রাতা রামভদ্রকে তাঁহার আলয়ে বাস করাইলেন এবং তিনিও কিছুদিন পরে রামভদ্রকে স্বামীর চিরসঞ্চিত ধনরাশি উপঢৌকন দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। রামভদ্র ভগিনীর বিয়োগের দুঃখেই হউক, আর "যঃ পলায়তি স জীবতি" ভাবিয়াই হউক, তৎক্ষণাৎ ভগিনীপতির বাটী পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীতীরে, নিজ গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। সম্ভবাতিরিক্ত ব্যয়ভূষণ করিলে পাছে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন, এই আশঙ্কায় রামভদ্র অপর্য্যাপ্ত ধনের অধিপতি হইয়াও অতি সাবধানে কালযাপন করিতেন। তাঁহার পরলোক গমন হইলে তাঁহার পুত্রদ্বয় কমলাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত তাদৃশ সাবধানের আবশ্যকতা বিবেচনা করিলেন না; তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন এবং আপনাদিগের আবাস জন্য পৃথক্ পৃথক্ অতিবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন ও পৈতৃক ধনরাশির উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

এই প্রকারে লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দুই পৃথক্ পৃথক্ অতি বিস্তৃত জমিদারীর মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের

পরে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত দুই সহোদরের বংশ উহা অবিবাদে ভোগদখল করিয়াছিল। তৎপরে যখন রমাকান্ত এবং তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই জমিদারীর অধিপতি হইলেন, তখন এই বহুকালের সম্পত্তিতে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিল, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে—

রমাকান্ত কিছু সাবধান-ব্যয়ী হওয়াতে তারাকান্ত অপেক্ষা অধিক ধনী হইয়া উঠিলেন। এমন কি যখন তরফ সুবর্ণপুর নীলামের ইস্তাহার হইল, তখন তারাকান্তের নিতান্ত ইচ্ছা উহা ক্রয় করিয়া বাসভূমির অধিপতি হয়েন। কিন্তু নিজের তত সঙ্গতি না থাকাতে রমাকান্তের নিকট একখানি তালুক বন্ধক রাখিয়া খত লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিলেন। কালে এই খতই দুই বংশের মধ্যে অনর্থের মূল হইল।

এপর্য্যন্ত দুই বংশে সম্প্রীতি ছিল, সম্প্রতি অল্প কারণে অপ্রীতি ঘটিল। একদিবস রমাকান্তের একজন চাকরাণী খিড়কীর পুষ্করিণীতে বাসন মাজিতে গিয়া তারাকান্তের একজন খাসপরিচারিকার পরিষ্কার গাত্রে অসাবধানে জল দিয়াছিল। খাসপরিচারিকার উহাতে অপমান বোধ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ উভয়ে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ও সেই যুদ্ধ দুই বাড়ীর দুই গৃহিণী পর্য্যন্ত পৌঁছিল; সুতরাং সেই সূত্রে রমাকান্ত ও তারাকান্তের বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল।

প্রথমে গালিগালাজ পরে আলাপ ও নিমন্ত্রণ বন্ধ। তৎপরে ছোট ছোট মোকদ্দামা, প্রজা ধরিয়া টানা টানি, শেষ লাঠালাঠির উপক্রম। শেষে তারাকান্ত জেলার সদর আদালতে আরজি দাখিল করিলেন যে, আমি রমাকান্তের ঋণ, টাকা দিয়া পরিশোধ করিয়াছি। রমাকান্ত বন্ধকি সম্পত্তিতে দখল দেয় না, অতএব দখল পাওয়ার প্রার্থনা। দাবির প্রমাণস্বরূপ তারাকান্ত কয়েক খণ্ড রসীদ দাখিল করিলেন। রমাকান্ত বলিলেন, রসীদ জাল। মোকদ্দামা ক্রমে ক্রমে প্রিবিকৌন্সেল পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তিন আদালতে রমাকান্ত জয়ী হইলেন এবং তিন আদালতের খরচা পাইলেন। তারাকান্ত ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া একে একে সকল বিষয় খোয়াইলেন, শেষে অর্থহীন ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া মনোদুঃখে উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে তিনি পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পাইলেন না; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমণীকান্ত অতি কিশোর বয়সে রামহরি মুখোর ভ্রাতৃকন্যা কুমুদিনীকে বিধবা করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন; কনিষ্ঠ রতিকান্ত বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তারাকান্ত বান্দ্যোপাধ্যায়ের চরমকালে যত্ন এবং সেবার্থ ক্ষোভ ছিল না; তাঁহার পুত্রবধূ কুমুদিনী আপনার শরীর পতন করিয়াও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতেন। তারাকান্ত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গঙ্গালাভ করিলেন।

পিতার মৃত্যুসম্বাদ পাইয়া রতিকান্ত দেশে আসিলেন; পরে পিতার শ্রাদ্ধাদি সমাপনানন্তর আপনার স্ত্রী ও ভ্রাতৃজায়া কুমুদিনীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। গৃহস্থ অন্যান্য সকলের মধ্যে কাহাকে শ্বশুরবাড়ী কাহাকে বাপের বাড়ী কাহাকেও অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার অতি বৃহৎ অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। এদিকে রমাকান্ত, তারাকান্তের সমুদায় ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া অতি প্রবল জমীদার হইলেন এবং কিছুদিন পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র রজনীকান্তের বিবাহ দিলেন; বিবাহ-রাত্রি হইতে রজনী নিরুদ্দেশ হওয়াতে রমাকান্ত পুত্রের বিরহে রোগগ্রস্ত হইয়া অতি অল্পকালেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

যাহা সচরাচর ঘটে না

রমাকান্তের শ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত, তাঁহার কন্যারা মহাসমারোহপূর্ব্বক আয়োজন করিয়াছেন, একজন জ্ঞাতি শ্রাদ্ধ করিবে, সভা সুসজ্জিত হইয়াছে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বসিয়াছেন, শ্রাদ্ধাধিকারীর আসন প্রস্তুত। পুরোহিত পুষ্পাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, জ্ঞাতি অতি গম্ভীরভাবে যজ্ঞোপবীত মার্জ্জনা করিতে করিতে আসনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমত সময় হঠাৎ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, জ্ঞাতি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, স্বয়ং রজনীকান্ত আসন গ্রহণ করিতেছেন। আহ্লাদে আত্মীয়েরা চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন; রজনীকান্ত রীতিমত শ্রাদ্ধাদি করিলেন। শ্রাদ্ধান্তে পরিবারস্থ সকলকে ডাকিয়া একত্রিত করিলেন। সকলে সমবেত হইলে বলিলেন, "তোমরা সকলেই জান যে, এই বিষয় আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কৃত। পিতা কোন উইল করিতে পারেন নাই।" রজনীর ভগিনীপতি দেবনাথ মুখো বলিলেন, "তাঁহার উইল করিবার আবশ্যক কি? তিনি সকলকে আপনার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই সকলের পক্ষে উইল। তাহাতেই সকলের মঙ্গল করা হইয়াছে।"

রজনীকান্ত বলিলেন, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার কথা অমৃততুল্য; এক্ষণে শ্রবণ করুন। পিতা উইল করিয়া যান নাই, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার উপদেশ ছিল যে, আমি তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার আশ্রিত অনুগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমার ইচ্ছানুরূপ তাঁহার সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করিতে পারিব।"

দেবনাথ মুখো বলিলেন, "দেবতারা মেঘকে বৃষ্টি করিতে বলিয়া থাকেন।"

রজনী বলিলেন, "দেবতারা কখন কখন অনাবৃষ্টিও ঘটাইয়া থাকেন। এক্ষণে আপনারা সকলে জানেন আমি কিছু কৃপণ।"

দেবনাথ মৃদু মৃদু বলিলেন, "সূর্য্যদেব অন্ধকারের কর্ত্তা।"

এবার রজনী উত্তর না করিয়া কহিলেন, "আমি স্বেচ্ছাক্রমে যাহাকে যাহা দিতেছি তাহা শ্রবণ কর। আমার মধ্যমা ভগিনী শৈলবতী কোথায়?" একজন স্ত্রীলোক কহিল, "তিনি আসেন নাই, কাঁদিতেছেন।"

রজনীকান্ত বলিলেন, "মেজদিদিকে পনর হাজার টাকা দিলাম। তৃতীয় ভগিনী শৈলবালা কোথায়?" শৈলবালা প্রসন্নমুখে অগ্রবর্ত্তিনী হইল। রজনী বলিলেন, "তোমাকে দশ হাজার টাকা দিলাম।"

শৈলবালার প্রফুল্ল মুখ ম্লান হইল—বলিল, "কেন রজনী, মেজদিদিকে পনর হাজার, আমাকে দশ হাজার?"

রজনী কহিলেন, "মেজদিদি তোমা হইতে পাঁচ বৎসরের বড় এই জন্য।"

শৈলবালা "আমি টাকা চাহি না" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কক্ষের বাহিরে গেল।

রজনী অম্লান বদনে বলিলেন, "সেজদিদি টাকা লইলেন না—আমি তাঁহার টাকাও মেজদিদিকে দিলাম।" দেবনাথ মুখো বলিলেন, "তিনি রাগ করিয়া গিয়াছেন, এখনি আবার আসিবেন। আপনার উপর রাগ করিবেন না ত কাহার উপর রাগ করিবেন?" সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রজনীকান্ত পিসী, মাসী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, কুটুম্ব, ভৃত্য প্রভৃতিকে পিতৃসঞ্চিতার্থ বিতরণ করিলেন। কিন্তু রজনীকান্ত দেবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন কথা উল্লেখ করিলেন না দেখিয়া দেবনাথ বলিলেন, "তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহার অংশ আমি পাইতে পারি।"

রজনী বলিলেন, "আপনি যখন তাঁহার কাছে যাইবেন তখন আপনার হস্তে তাঁহার টাকা প্রেরণ করিব।"

দেবনাথ কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তবে আমার নিজাংশ?"

রজনী উত্তর করিলেন, "আপনাকে এক টাকা দিলাম।"

দেবনাথ প্রথমে মনে করিলেন রহস্য, কিন্তু যখন রজনী গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া যান তখন বুঝিলেন রহস্য নহে। তখন বলিলেন, "এক টাকাই আমার এক লক্ষ।"

দশম পরিচ্ছেদ

যাহা সচরাচর ঘটে

রাত্রি ঘনান্ধকার, অমাবস্যা। নিশীথকালে সমীরণ গভীর গর্জ্জন করিতেছে। তৎকর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া সুবর্ণপুর গ্রামের প্রান্তবাহিনী জাহ্নবী কল কল করিতেছে। তটোপরি এক উচ্চ দেবমন্দির। গ্রামের প্রান্তভাগে বসতি

নাই ; কেবল সেই কল কলনাদিনী বহুজলপূর্ণা নদী, আর সেই তুঙ্গ-শিখরশালী মন্দির। নিকটে নিবিড় বন—ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ তরু, লতা, কণ্টকাদিতে দুর্ভেদ্য বন। মন্দির ভগ্ন, প্রাচীন, জনসমাগমচিহ্নশূন্য। মন্দির মধ্যে করাল মূর্ত্তি দেবী, কালী—সেই ভৌতিক রাজ্যের যোগ্য অধিষ্ঠাত্রী। সপ্তহস্তপরিমিতা, পাষাণময়ী, ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি সেই অন্ধকার স্থানে অন্ধকার করিয়া, মহাকাল হৃদয়োপরি বিরাজ করিতেছেন। দিবসে এক বৃদ্ধ বারেক মাত্র আসিয়া সামান্য প্রকারে পূজা করিয়া যাইত। রাত্রে কেহ তথায় আসিত না। নিকটে শ্মশান, তথায় শবদাহ হইত। গ্রাম্য লোকে দিবসেও সেখানে আসিতে সাহস করিত না।

সেই ভয়ঙ্কর মন্দির মধ্যে রাত্রে কখন কখন গ্রাম্য লোক দূর হইতে আলো দেখিতে পাইত। সেই আলোক দেবযোনি কর্ত্তৃক জ্বালিত বলিয়া গ্রামবাসীদিগের বিশ্বাস ছিল। কখন কখন তথা হইতে শঙ্খধ্বনিও হইত।

অদ্য অমাবস্যার রাত্রি; এই গভীর অন্ধকার নিশীথে একজন দুঃসাহসিক গ্রামবাসী, সেই মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিল। একবার সাহস করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, আবার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছিল। কখন চলিতে ছিল, কখন দাঁড়াইয়া দূরলক্ষ্য নভঃস্থ মন্দিরচূড়া নিরীক্ষণ করিতেছিল। এমত সময়ে মন্দির মধ্যে আলো জ্বলিতেছে, অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন আরও সন্দিগ্ধ-চিত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা গম্ভীর শঙ্খনাদে সেই কানন কম্পিত হইল। শুনিবামাত্র পথিক নিঃসঙ্কোচিতচিত্তে মন্দিরাভিমুখে চলিল।

মন্দিরে আসিয়া, মুক্ত পথে প্রবেশ করিয়া, ভক্তিভাবে দেবীকে প্রণাম করিল। দেখিল, এক ব্রাহ্মণ রাশীকৃত জবাপুষ্প, বিল্বপত্র, রক্তচন্দনাদির দ্বারা দেবীর পূজা করিতেছে। সদ্যশ্ছিন্ন ছাগমুণ্ড এবং ছাগদেহ তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। রক্তে মন্দির প্লাবিত হইতেছে।

যতক্ষণ পূজা সমাপন না হইল, ততক্ষণ আগন্তুক নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। পূজা সমাপনান্তে পূজক জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও ত স্থিরপ্রতিজ্ঞ ?"

আগন্তুক বলিল, "আমার প্রতিজ্ঞা স্থিরই আছে।"

পূজক কহিল, "তবে দেবীর পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর।"

তখন আগন্তুক কালী প্রতিমার চরণে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "মা জগদম্বে, আমি তোমার চরণস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন রজনীকান্ত বাঁড়ুয্যের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান থাকিবে, ততদিন আমি কায়মনোবাক্যে তাহার শত্রু। যাহাতে তাহার সর্ব্বস্বান্ত হয়, তাহা আমি করিব।"

পূজক তখন গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, "আমার প্রতিজ্ঞা শুন। আমি জীবিত থাকিতে যে আমার পিতৃসম্পত্তি ভোগ করিবে, আমি তাহার চিরশত্রু। তাহার সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল আমি কায়মনোবাক্যে সাধিব। যদি তাহাতে অযত্ন করি তবে যেন হে জগদম্বে, আমি তোমার কোপে পতিত হই।"

তখন উভয়ে দেবীকে প্রণাম করিয়া প্রতিমাতলে উপবেশন করিল।

ইহাদিগের মধ্যে যে প্রথম হইতে মন্দিরে থাকিয়া পূজা করিতেছিল, সেই রতিকান্ত বাঁড়ুয্যে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহার নিরুদ্দেশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি পরে আসিয়াছিল, সে রজনীর ভগিনীপতি দেবনাথ মুখোপাধ্যায়। রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "রজনী এখন আমার সন্ধান করিতেছে কেন, কিছু জান ?"

দেবনাথ। কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছে না।

রতি। দেখ, আমরা যে অভিপ্রায়ে এই গুরুতর শপথ করিলাম, তাহাতে যদি পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করি, তবে আমাদিগের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

দেবনাথ। আমি এই দেবীর মন্দিরে বসিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিতেছি না। আমি বাস্তবিক জানি না। তুমি মনে করিতেছ যে, একত্রে বাস করি, সর্ব্বদা কাছে থাকি, এ সকল কথা আমার জানিবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা নহে। রজনীকান্ত সহজ লোক নহে। তাহার চরিত্রের মধ্যে কেহ কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে না।

রতি। তোমার যদি ভয় হয়, তবে তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে পার।

দেবনাথ। আমি কালীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি ভয় হইলেও আমি তোমার ক্রীতদাস। বিশেষ আমরা যে জয়ী হইব, তাহার এক বিশেষ লক্ষণ দেখিতেছি। আমাদের একজন প্রধান সহায় জুটিয়াছে।

রতি। কে ?

দেব। রজনীর তৃতীয়া ভগিনী শৈলবালা। পিতৃধনে রজনী তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছে।

রতি। তাহাকে বিশ্বাস করিও না। হাজার হউক সে ভগিনী।

দেব। তুমি তাঁহাকে চেন না; সেও একটি রত্ন। সে যে আমার সহিত একপরামর্শী, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তোমাকে একটি সম্বাদ দিতেছি। আগামী কল্য রজনী কলিকাতায় যাইবে।

রতি। সেটা কি এমন বিশেষ সম্বাদ, তাত বুঝিলাম না।

দেব। বিশেষ সম্বাদ এই যে, রজনীর সঙ্গে অনেক নগদ টাকা যাবে।

রতি। কেন ?

দেব। কেন ? তুমি আজ দুই দিনের জন্য সন্ন্যাসী হইয়া কি সব ভুলিয়া গেলে! ঘরে নগদ টাকা ধরে না সুতরাং কলিকাতার ব্যাঙ্কে অথবা অন্য কোন স্থানে উহা রাখিতে যাইতেছে।

রতি। এ সম্বাদ ভাল বটে, কোন্ পথ দিয়া যাইবে ?

দেব। কলিকাতায় যাইবার নৌকাপথ ভিন্ন কি আর কোন পথ আছে ? কিন্তু রজনী প্রথমতঃ পাল্কীতে শ্রীধরপুর পর্য্যন্ত যাইবে, তথায় মামার বাটীতে একদিবস থাকিয়া নৌকাপথে যাইবে।

রতি। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম, এক্ষণে কার্য্যে চলিলাম।

এই কথার পরে উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া স্ব স্ব স্থানাভিমুখে চলিলেন। গভীর নিশীথে অমাবস্যার অন্ধকারে দেবনাথ শ্যালক-গৃহে ফিরিয়া চলিলেন; কিন্তু তিনি যে ভয়ঙ্কর শপথ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল; অন্ধকারে প্রতি পদে তাঁহার ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পথপার্শ্বে নদীগর্ভে প্রেতভূমি। তৎপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন যেন কত প্রেতমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া বাহু তুলিয়া তাঁহাকে বলিতেছে "কি ভয়ানক শপথ !" পরিষ্কার নৈশাকাশপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ তারা তাঁহার দুর্লঙ্ঘ্য ভীষণ শপথের সাক্ষ্য দিতেছে; উজ্জ্বল নিষ্ঠুর কটাক্ষে তাঁহাকে বলিতেছে "আমরা সাক্ষ্য আছি।" দেবনাথ তখন আপনার অভিসন্ধি মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন। ভাবিলেন, "রজনীর আমি সর্ব্বনাশ করিব, কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। কিন্তু কেন ? আমি রজনীর আশ্রিত, তাহার গৃহে থাকি, তাহার অন্ন খাই। তাহার পিতার অন্নে আমার শরীর। রজনীকান্ত কি আমার কোন অপকার করিয়াছে ? কিছু না। তবে কেন ? তবে আমাকে কিছু দেয় নাই; দেয় নাই, ইহা নিতান্ত বৈরিতার কাজ করিয়াছে। টাকাগুলি পাইয়া এই সময়ে আমার মনের মানস সিদ্ধ করিতাম। টাকা না দিয়া রজনী আমার ইহ-জন্মের সুখ নষ্ট করিয়াছে। আমি তাহাকে না নষ্ট করিব কেন ? কিন্তু টাকা কার ? রজনীকান্তের। তবে আমার ক্ষতি কি ? ক্ষতি এই, আমি রজনীকান্তকে দেখিতে পারি না; পিছনে কে ?"

"পিছনে কে ?" এই কথাটি দেবনাথ পরিস্ফুট স্বরে বলিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, অন্ধকারে কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু যতক্ষণ পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন, ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। পরিশেষে রজনীকান্তের অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারে

সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন এমত সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহাকে বলিল "মুখোপাধ্যায় মহাশয় এত রাত্রে একটা আলো লইলে ভাল হইত, অন্ধকারে সিঁড়িতে পা বাঁধিয়া পড়িয়া যাইবেন।"

দেবনাথ চমকিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "কে, রজনী বাবু!"

রজনী বলিলেন, "আপনারই ভৃত্য।"

দেব। এত রাত্রে কোথায় গিয়াছিলেন ?

রজনী। কোথায় যাইব ? আপনার বাড়ীতেই আছি। আপনি কোথায় গিয়াছিলেন ?

দেব। নিমন্ত্রণে।

দেবনাথ কম্পিত কলেবরে শয্যাগৃহে গমন করিলেন। রজনীও আপন শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম প্রস্তাব

সামরিক ব্যাপার

সাগরগর্ভে মহার্ঘ রত্নসঞ্চার, এবং ঘোর নির্জ্জন অরণ্যে বিকসিত কুসুম গন্ধ প্রবাহ, লোক সমাগম তাহাতে আকর্ষিত না হইলেও, নিত্য নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পদে পদে পরপদে দলিত দীর্ঘদিন পরাধীনা ভারতে এক-কালে বল, বীর্য্য, শৌর্য্য, সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলাদির বরপুত্রগণের আবির্ভাব এবং তাহাদের গৌরবের উচ্চ নিশান গগনস্পর্শী হইয়া উড্ডীয়মান হইত কি না, তাহাতে কি সন্দেহ হয়? রাম, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, সর্ব্বজিৎ, অর্জ্জুন, আসমুদ্র করগ্রাহী রাজরাজেশ্বর দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, রন্তিদেব ইত্যাদি নাম মহাকবি-গণ তাঁহাদের গীতিযোগ্য বলিয়া গান করিয়াছেন, এবং অলৌকিক ও অদ্ভুত কার্য্য-কলাপহেতু অলৌকিক জীব-অংশে তাঁহাদের জন্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীনগণ ভক্তিভাবে সেই সকল শুনিয়া অখণ্ডনীয় সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই সকল শুনিতেছি কিন্তু পূর্ব্বকালের বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন তুমি বিশ্বাস কর না, আমি করি, এইরূপ। তোমার প্রমাণ, খৃঃ পূঃ ৪০০৪ সঙ্গে মিস খায় না বা তদ্রূপ সারবান্ যুক্তি, আমারও প্রমাণ খৃঃ পূঃ ৪০০৪ মানি না বা তদ্রূপ; সুতরাং বিশ্বাস করা না করার প্রমাণ উভয় পক্ষেই দৃঢ়তায় সমান। এ বিবাদস্থলে কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাচীনা ভারতের গৌরবস্থলে আলেকজণ্ডার, সিজর, হানিবল বা নেপোলিয়নের ন্যায় যোদ্ধা; গ্রিসীয় কডরস বা হেলবিটিয় উইঙ্কিলরিডের ন্যায় স্বদেশহিতৈষিতায় আত্ম বা আত্মতুল্য প্রাণঘাতী; অথবা মারাথন বা থার্মপিলির ন্যায় তীর্থক্ষেত্র, ঐতিহাসিক সন্দেহবিহীন হইয়া এবং সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে উল্লেখ করিবার নাই। প্রাচীনা ভারতের ঐতিহাসিক বিষয়ের অধিকাংশই কালগর্ভে নিহিত হইয়াছে। বর্ণজ্ঞানশূন্য নর-মাংসভোজী আজটেক জাতিও ইতিবৃত্ত রক্ষণের মর্ম্ম বুঝিয়াছিল, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য যে আর্য্যসন্তানেরা উচ্চ

বিদ্যাবিশারদ হইয়াও তাহার মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হয়েন নাই! যাহা হউক, সে সকল তৎকারণবশতঃ যদিও কালগর্ভে নিহিত হউক এবং নামবিশেষের উল্লেখ নাই পাওয়া যাউক, কিন্তু যদি সে সময়ের লোকচরিত্র এবং সমাজচিত্র জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই সেই লুপ্ত বিষয়ের আভাস উপলব্ধ করিতে অল্পক্ষণই লাগিয়া থাকে। লোকচরিত্র সমুহের সঙ্ঘটনে সমাজচিত্র। যে সমাজের বিবরণ আলোচনায় দেখা যায় যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বীর্য্য, বীরত্ব ইত্যাদি তাহার প্রতিপর্ব্বে প্রতিফলিত, সে সমাজের লোকচরিত্রও সুতরাং বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বীর্য্য, বীরত্ব ইত্যাদিদ্বারা নির্ম্মিত। প্রাচীনা ভারতের লোকচরিত্র ও সমাজচিত্র তদ্রূপ। অতএব লোকস্মৃতি কালসমীপে দুর্দ্দমনীয় হইলে, নিঃসন্দিগ্ধভাবে নামবিশেষের যে উল্লেখ পাওয়া যাইত না, ইহা কখনই হইতে পারে না। ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্বের যখনই কিঞ্চিৎ টুকরা উদ্ধার হয়, তখনই দেখিতে পাই যে তাহা কোন না কোন মহাপুরুষের নামে ধ্বনিত। ফলতঃ যে জাতি স্মৃতি-বহির্ভূত সময়ে উত্তর কুরুবর্ষ পরিত্যাগাবধি, ডাহিরের পরাজয় বা দাসানুদাস কুতবুদ্দিনের ভারতে আগমন পর্য্যন্ত, পরাধীনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, যাঁহার বংশাবলী অদ্ভুত বীরত্বে জগজ্জেতা আলেকজণ্ডারকেও স্তম্ভিত করিয়াছিল, যাঁহার বংশাবলী রোম-সম্রাট্ আগষ্টসের সহ সখিত্বনিবন্ধন তাঁহার সভায় দূত প্রেরণ দ্বারা রাজতত্ত্ব মীমাংসা করিতেন, যাঁহার বংশাবলী গ্রীকভূমি পরাজয়ার্থ পারস্যরাজের সৈন্যমধ্যে গণনীয় পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার বংশাবলী জ্যোতিষ এবং অঙ্কশাস্ত্রে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং যাঁহার বংশাবলী ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ খণ্ডেরও ধর্ম্মদাতা, সেই জাতি যে প্রাচীনকালে কোন গৌরবযুক্ত নামের কাঙ্গাল ছিল, একথা শুনিব না এবং শুনিবার যোগ্যও নহে। কিন্তু সেই সকল নাম কালকবলে নিহিত বা উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে;—সেই সকল পূজনীয় নাম সাগরগর্ভস্থিত মহার্ঘ রত্ন এবং বিজন অরণ্যস্থিত সুবাস কুসুমের সহ সমভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাল্মীকির সাময়িক সমাজ বীরবীর্য্য সাহস ইত্যাদি দ্বারা প্রতিপর্ব্বে প্রতিফলিত। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড বীরত্ব, সাহস এবং স্বপক্ষহিতৈষিতার আভাসে পরিপূর্ণ। যুদ্ধকৌশল এবং স্বপক্ষ রক্ষণচাতুর্য্য নানাবিধ ও চমৎকার। যুদ্ধপ্রণালী ব্যূহরচনা প্রভৃতি, হোমারিক সময়ের তত্তৎ বিষয়ের সহ সমজাতীয়। যুদ্ধস্থলে সেনাপতিই সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহাদের হারিজিতের উপর যুদ্ধের ফল প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকে। আনুষঙ্গিক সৈন্যগণ পশুবৎ মরিতেছে ও মারিতেছে। জয়োদ্দেশ্য নগর সকল প্রাকার পরিখায় সমাবৃত, শত্রুগণের পক্ষে সহসা সুগম নহে। দেশরক্ষার্থে যদ্রূপ দুর্গাদি স্থাপিত, রক্ষিত এবং অবরোধকালীন ও অসময়ের নিমিত্ত দুর্গে যেরূপ দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত, রাজধর্ম্ম প্রস্তাবে তাহা যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে।

সৈন্য চারিবিধ। হস্তী, অশ্ব এবং রথে আরোহণ করিয়া যাহারা যুদ্ধ করে তাহারা এবং পদাতি। (১) অস্ত্র নানাবিধ। শরাসন, চর্ম্ম, শর, খড়্গ, মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, পরশু, চক্র, তোমর, শক্তি, পরিঘ, গদা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত শতঘ্নী নামক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ আছে। (২) রামায়ণের প্রথমকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গে, বিশ্বামিত্র যেস্থলে রামকে মন্ত্রপূত বহু অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তথায় অভূতপূর্ব্ব অশ্রুত বহু বিকট নামযুক্ত অস্ত্রসমূহের নামোল্লেখ আছে। উহা কবিকল্পনার পরাকাষ্ঠা। যাহা হউক, উপরে যেরূপ অস্ত্র শস্ত্র এবং চতুর্ব্বিধ সৈন্যের বিষয় কথিত হইল, তাহাই প্রামাণিক এবং সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। গ্রীকভূমে ৪৭৯ খৃঃ পূঃ প্লেটিয়ার যুদ্ধে জরকসিসের পক্ষে যতগুলি ভারতীয় সেনা ছিল, তাহারা পদাতি এবং অশ্বারোহী এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল। ইহারা কিরূপ ভারতীয় তাহা বলিতে পারি না। ইহাদের বৃত্তান্ত হিরোডোটস তাঁহার পুস্তকে (৩) যদ্রূপ প্রদান করিয়াছেন, উপরি কথিত বৃত্তান্তের সহ তাহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ভারতীয়েরা কখন সমুদ্রযুদ্ধ করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না, বাল্মীকিতে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। নদী প্রভৃতিতে নৌযুদ্ধের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। রামায়ণের দ্বিতীয়কাণ্ডে ৮৪ সর্গে রামের অনুসরণে যখন ভারত চিত্রকূট গমন করেন, সেই সময়ে তিনি নিষাদরাজ্যে আগমন করিলে, গুহ তাঁহার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া গমনে বাধা দিবার নিমিত্ত অন্যান্য সৈন্য সমাবেশের আজ্ঞা দিয়া কহিতেছেন :—

"নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যুনাস্তিষ্ঠন্তিত্যভ্যচোদয়ৎ॥" ৮

"অসংখ্য কৈবর্ত্তযুবা কবচাদি ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ প্রতিক্ষায় পঞ্চশত নৌকায় আরোহণ করিয়া রহুক।" ইহার সাদৃশ্য মেক্সিকোবাসীদিগের তেজকুকো হ্রদের নৌযুদ্ধে দৃষ্ট হয়। এই নৌযুদ্ধের বলে স্পানিয়ার্ডরা একরাত্রে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন যে,আজি পর্য্যন্ত তাহা "মহাকুরাত্র" (Noche Triste) বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন।

উপরে যত প্রকার অস্ত্রের বিষয় কথিত হইল, তাহার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ অস্ত্রবিশেষে পারদর্শিতালাভ করিয়া খ্যাতিযুক্ত হইতেন। কিন্তু সাধারণতঃ ধনুর্ব্বানেরই যুদ্ধকালীন বহু ব্যবহার লক্ষিত হয়। যোদ্ধারা প্রায় এইরূপ সাজে সজ্জিত হইতেন :—শরীর বর্ম্মাবৃত, শিরে শিরস্ত্রাণ, পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণ, কটিতে লম্ববান খড়্গ এবং শরাকর্ষণ নিমিত্ত অঙ্গুলিতে গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ। রথের আকার এরূপ একস্থানে দেওয়া আছে :—

---

(১) বেদে দ্বিবিধ সৈন্য দৃষ্টি হয়, রথী ও পদাতি।

(২) বঙ্গদর্শন ২য় সংখ্যায় এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাব দেখ।

(৩) Herodotus Book VII. 65, 86. IX 28, 32.

"তং মেরুশিখরাকারং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
হেমচক্রমসম্বাধং বৈদূর্য্যময়কূবরম্॥ ১৩
মৎস্যৈঃ পুষ্পৈদ্রুমৈঃ শৈলৈশ্চন্দ্রসূর্য্যৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ।
মাঙ্গল্যৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ তারাভিশ্চ সমাবৃতম্॥ ১৪
ধ্বজনিস্ত্রিংশ সম্পন্নং কিঙ্কিণীভির্বিভূষিতম্।
সদশ্বযুক্ত——————" ॥১৫। ৩।২২

উহা মেরুশিখরাকার (তদ্বৎ উন্নত) তপ্তকাঞ্চণভূষিত, হেমচক্র ও বৈদূর্য্যময় কূবর সম্বলিত। উহাতে কাঞ্চণনির্ম্মিত নানাবিধ মৎস্য, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, মাঙ্গল্য পক্ষী এবং তারাগণে ইতস্ততঃ পরিবৃত। ধ্বজ এবং খড়্গসম্পন্ন, কিঙ্কিণীজালে বিভূষিত ও উত্তম অশ্বদ্বারা বাহিত (৪)

রথের সারথ্য সম্ভ্রান্ত বা বন্ধুদ্বারাও সম্পন্ন হইত। জাতীয় ধ্বজ এবং যুদ্ধকালীন ধ্বজবহন যখন বৈদিক সময়েও দৃষ্ট হয়, (৫) তখন যে রামায়ণের সময়েও তাহা ছিল, তাহার জ্ঞাপনার্থে উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। রঘুবংশীয় রাজাদিগের ধ্বজের নাম কোবিদার ধ্বজ। নিষাদরাজ গুহের ধ্বজের নাম স্বস্তিকা। ইত্যাদি।

এই সময়ে মল্লযুদ্ধেরও বিশেষ আড়ম্বর দেখা যায়, সুতরাং যুদ্ধকৌশলের ন্যায় দৈহিক বলেরও বিশেষ আদর। সীতা-স্বয়ম্বরে রামের দৈহিক বল-পরীক্ষা ধনু, উত্তোলন ও ভঙ্গে অভিনীত হইয়াছিল। রাম বালিবধে সমর্থ হইবেন কি না সুগ্রীব তাহা পরীক্ষার্থে ও রামের দৈহিক বল অবধারণার্থে, মৃত দুন্দুভির কঙ্কাল দেখাইয়া পদে উত্তোলনপূর্ব্বক নিঃক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বালি-দুন্দুভির যুদ্ধ মল্লযুদ্ধ, সুগ্রীব-বালির যুদ্ধও মল্লযুদ্ধ, ইত্যাদি। (৬) মল্লযুদ্ধ কিরূপ হইত, একস্থান হইতে দেখাইব। বালি ও সুগ্রীবে যুদ্ধ হইতেছে। প্রথমে ক্ষণেক বাগযুদ্ধ হইল, তৎপরে "বালি সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণপূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন পর্ব্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল। তিনি নির্ভয় হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাবেগে এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক, যেমন পর্ব্বতের উপর বজ্রনিক্ষেপ করে, সেইরূপ বালির উপর তাহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বালি বৃক্ষপ্রহারে ভগ্ন হইয়া সাগরমধ্যে গুরুভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয়ে ভীমবল ও

(৪) রথের আকারাদি সম্বন্ধে বৈদিক সময়ের বৃত্তান্ত ঋঃ বেঃ ৫-৬২-৬, ৬-২৯-২, ৮-৩৩-১১, ১-৬-২ ইত্যাদি দেখ।

(৫) "যত্র নরঃ সময়ন্তে কৃতধ্বজাঃ"—১০-১০৩ ঋঃ বে।

(৬) মহাভারতেও ইহার বহুবিস্তার। আদিপর্ব্বে—
"যদাশ্রৌষং জরাসন্ধং ক্ষত্রমধ্যে জ্বলন্তং, দোর্ভ্যাং হতং ভীমসেনেন।" ইত্যাদি।

পরাক্রান্ত, উভয়ের বেগ গরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ে ভীমমূর্ত্তি ও রণদক্ষ এবং উভয়েই পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর। তৎকালে উঁহারা আকাশের চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শাখাবহুল বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ, বজ্রকোটিপ্রখর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ, ও হস্তদ্বারা পরস্পরকে বারম্বার প্রহার করিতে লাগিলেন।" (৭)

বৃহৎ যুদ্ধাদির ব্যবস্থা এরূপ। (৮) চতুর্ব্বিধ সৈন্য যথাক্রমে ব্যূহ রচনা করিয়া শিরস্ত্রাণ বর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা শরীর আবরিত করিয়া যথাযোগ্য অস্ত্রহস্তে দণ্ডায়মান হইল। রণবাদ্যনির্ঘোষে চতুর্দ্দিক আন্দোলিত হইল। উভয়দিকে সিংহনাদ ধনুষ্টঙ্কার এবং শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, তৎপরে বাগ্-যুদ্ধ। তৎপরে যদৃচ্ছা কি ধর্ম্মযুদ্ধ হইবে তাহা নিরূপণ হইয়া যুদ্ধ বাধিল। রথীতে রথীতে,

---

(৭) এখানে নিজে অনুবাদের পরিশ্রম বাঁচাইয়া পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক এই অনুবাদটুকু গ্রহণ করিলাম। ইহা আমার উপরি লাভ।

(৮) এই সংগ্রাম-পদ্ধতির সহ নিম্নলিখিত সংগ্রাম-পদ্ধতি মিলাইয়া দেখার আমোদ আছে। গ্রীকদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত সম্বন্ধে গ্রোট এরূপ লেখেন—"The mode of fighting among the Homeric heroes is not less different from the historical times, than the materials of which their arms were composed. In historical Greece, the Hoplites or the heavy-armed infantry, maintained a close order and well-dressed line, charging the enemy with their spears protended at even distance, and coming thus to close conflict without breaking their rank : there were special troops, bowman, slingers &c. armed with missiles, but the Hoplite had no weapon to employ in this manner. The heroes of the Iliad and Odyssey, on the contrary, habitually employ the spear as a missile which they launch with tremendous force : each of them is mounted in his war-chariot drawn by two horses and calculated to contain the warrior and his charioteer, in which latter capacity a friend or comrade will sometimes consent to serve. Advancing in his chariot at full speed, in front of his own soldiers, he hurls his spear against the enemy : sometimes indeed he will fight on foot and hand to hand, but the chariot is usually near to receive him if he chooses, or to ensure his retreat. The men of Greeks and Trojans coming forward to the charge, without any regular steps or evenly maintained line, making their attack in the same way by hurling their spears. Each chief wears habitually a long sword and a short dagger, besides his two spears to be launched forward—the spear being also used, if occasion serves, as a weapon or thrust. Every man is protected by shield, helmet, breastplate and greaves, but the armour of the chiefs is greatly superior to that of the common men, while they themselves

পদাতিতে পদাতিতে, অশ্বে অশ্বে, গজে গজে, মল্লে মল্লে যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধর্ম্মযুদ্ধ হইলে, যে দুইজনে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। রণে যে পৃষ্ঠ দিবে, তাহার হার হইল, তাহার প্রতি আর কেহ আক্রমণ করিবে না। সেনাপতির পরাজয় যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত। যুদ্ধকালীন পূর্ব্বকথিত অস্ত্র সকল যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহৃত হইত। যদৃচ্ছা যুদ্ধের নিয়ম নাই, ছলে কৌশলে যে যেরূপে পারিবে, সে সেইরূপে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিবে। সমজাতীয় সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ হইলে অস্ত্রব্যবহার সময়ানুসারে যাহার যাহাতে সুবিধা তদনুসারী। উভয়দল অন্তরে থাকিলে শর, শিলা, অগ্নি প্রভৃতি নিক্ষেপ দ্বারা যুদ্ধ, এবং সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া উভয় দলে মিশামিশি হইলে গদা, খড়্গ, শূল, পরশু প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধ হইত; প্রথমে ব্যূহ রচনা দ্বারা সৈন্য সমাবেশ হইত বটে, কিন্তু উভয়দল মিশামিশি হওয়ার পর আর তাহা রক্ষিত হইত না। বিপক্ষ দলের প্রধান চেষ্টা সর্ব্বপ্রথমে ব্যূহভেদ করা। যুদ্ধারম্ভেই যে পক্ষের ব্যূহভেদ হইত, সে যুদ্ধে তাহার আশা বড় অধিক থাকিত না। সেনাপতিরা বিবিধ মণিরত্নাদি বীরসাজসহ ধারণ করিয়া ধ্বজ-

---

are more strong and more expert in the use of their weapons. There are a few bowmen, as rare exceptions, but the general equipment and proceeding is as here described"—*Grote*'s *Greece*. Vol. I pp. 494. এক্ষণে দেখিবে যে হোমারের বর্ণিত রণবৃত্তান্ত বাল্মীকির সহ কত সামান্য অন্তর। ফলতঃ জগতের সকল আদিম সভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির রণপাণ্ডিত্য প্রায় এইরূপ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর এক অর্দ্ধসভ্য জাতির রণবৃত্তান্তের সহ মিলাইয়া দেখ। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্যের আদিম অধিবাসীরা স্পেনিয়ার্ডদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে—"Many of the Indians were armed with lances handed with copper tempered almost to the hardness of steel, and with huge maces and battle-axes of the same metal. Their defensive armour, also, was in many respects excellent, consisting of stout doublets of quilted cotton, shields covered with skins, and casques richly ornamented with gold and jewels, or sometimes made like those of the Mexicans, in the fantastic shape of the heads of wild animals, garnished with rows of teeth that grinned horribly above the visage of the warrior.........the Spaniards were roused by the hideous clamour of conch, trumpet, and atabal, mingled with the fierce war-cries of the barbarians, as they let off volleys of missiles of every description.........But others did more serious execution. These were burning arrows, and red-hot stones wrapped in cotton that had been steeped in same bituminous substance, which scattering long trains of light through the air fell on the roofs of the buildings, and speedily set them on fire. &c.—*Prercott Conquest of Peru.*

পতাকাশোভিত রথারোহণে সর্ব্বদাই থাকিতেন, এবং তথা হইতে ধনুর্ব্বাণাদির দ্বারা অপর পক্ষের সেনাপতির সহ যুদ্ধ করিতেন। উভয় সেনপতি কখন কখন ভূতলে নামিয়া মল্লযুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইতেন। ইঁহাদের পার্শ্বে আরও রথ থাকিত, পূর্ব্ব রথ ভগ্ন হইলে অপর রথে আরোহণ করিতেন; এবং সেনাপতি রণক্লান্ত ও মূর্চ্ছিত হইলে, সারথি আপন বিবেচনা অনুসারে পলায়ন দ্বারা রথীর প্রাণ রক্ষা করিতেন। এই দুই কারণেই অনেক সময় রামের সহ যুদ্ধে রাবণের প্রাণ বাঁচিয়াছিল এবং শেষোক্ত কারণ হেতু, সারথি গর্ব্বিত রাবণের নিকট অনেকবার তিরস্কারও সহ্য করিয়াছিল।

রামায়ণের সকল যুদ্ধের বর্ণনা দৃষ্টে উপরে ঐ সারাংশ সম্ভব বোধে সঙ্কলিত হইল, নতুবা রামায়ণের অবিকল বর্ণিত যুদ্ধ অদ্ভুত জিনিস। উহাতে বৃক্ষ পর্ব্বত পর্য্যন্ত অস্ত্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। একজন লক্ষজনের লক্ষশর নিবারক, লক্ষজনের একজন বিনাশক, কোথাও বা একপক্ষে অসংখ্য সৈন্য, অপর পক্ষে একাকী একটি বীর। এসকল লোকে অসম্ভব, কবিকল্পনায়ও তাহাই, কেবল বাল্মীকির ন্যায় তেজস্বী কবিকল্পনাতেই সম্ভব। বাল্মীকি ঋষি, যুদ্ধ চক্ষে কখন দেখিয়াছিলেন কি না তাহা তিনিই জানেন, বোধ হয় জনশ্রুতি, অথবা কল্পনাই তাঁহার যুদ্ধবর্ণনের মূলমন্ত্র। বাল্মীকিবর্ণিত সংগ্রাম ক্রিয়ার উপর আমি এক বিন্দুও বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক বর্ণিত অস্ত্র শস্ত্র সাজ ও সেনানিবেশ যাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সম্ভব বোধে বিশ্বাস করিব; যেহেতু সেই সকল বিষয় রণস্থলগামী না হইলেও ঘরে বসিয়া অক্লেশে জ্ঞাত হইতে পারা যায়, এবং সর্ব্বদর্শী, বহুবিদ্যাবিশারদ ও সর্ব্বজনপূজনীয় একজন মহর্ষি যে তাহা জ্ঞাত না হইয়াছেন একথা অসম্ভব। যখন আমরা বাল্মীকির সাময়িক অস্ত্র-শস্ত্র সাজ ও সেনানিবেশ একরূপ নিঃসন্দেহ ভাবে জ্ঞাত হইতেছি, এবং যখন দেখিতেছি যে সেই সকল আদিম সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের তত্তৎ বিষয়ের সহ কিছু কিছু ইতর-বিশেষতা ব্যতীত সমজাতীয়, আবার সেই সেই আদিম সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে সমর-প্রণালী প্রায়ই একজাতীয়, তখন বাল্মীকির সাময়িক সমর-প্রণালীও যে তদ্বৎ সমজাতিত্ববিশিষ্ট হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

রাবণ ও রামের নিমিত্ত সুগ্রীবের সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা দৃষ্টে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, প্রত্যেক রাজেশ্বরের আত্মরাজধানী রক্ষণার্থে যাহা আবশ্যক, সেই পরিমাণে বেতনভোগী সৈন্য রক্ষিত হইত। অধীনস্থ সম্ভ্রান্তগণ যাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট সীমায় রাজাকে করমাত্র প্রদান করিয়া একাধিপত্য করিত, তাহাদিগকে রাজার যুদ্ধ সময়ে অধীনস্থ সৈন্যগণ এবং আত্মপ্রদানে রাজাকে সাহায্য করিতে হইত। সম্ভ্রান্তগণ ডাকিবামাত্র ক্ষত্রিয় প্রজাবর্গকে যুদ্ধার্থে আপন আপন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া

তদাজ্ঞানুবর্ত্তিতায় উপস্থিত হইতে হইত। অস্ত্র-ব্যবহার সময় ব্যতীত তাহারা জীবিকার্থে যদৃচ্ছা আত্মবৃত্তি অথবা শূদ্রের উর্দ্ধে অপর যে কোন বৃত্তির অনুসরণ করিত। সৈন্যমধ্যে শক, কিরাত, যবনাদির উল্লেখ দেখা যায়, এজন্য বোধ হয় তাহারাও নির্দ্ধারিত বেতন বা বৃত্তিভোগে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইত। যে ব্যক্তি আপন প্রভুর আহ্বানমত অস্ত্রহস্তে আসিতে কোন কারণে সমর্থ না হইত, তাহারা তন্নিমিত্ত ইউরোপীয় ফিউডাল সাময়িক এসকূয়েজ (escuage) নামক করের ন্যায় ক্ষতিপূরক কোন কর দিতে বাধ্য ছিল কি না, তাহা জানি না। সৈন্যসংগ্রহ-প্রথা যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে প্রজারা যখন প্রভুর আদেশমত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ ও যুদ্ধে গমন ব্যতীত অপর সময় যদৃচ্ছা অতিবাহিত করিত, তখন, এমন অবস্থায়, তাহারা দৈহিক বলের পরিচালনা যদিও ঘরে ঘরে করিত, কিন্তু নিত্য নূতন যুদ্ধকৌশল শিক্ষার সুযোগ অল্পই পাইত; সুতরাং তাহারা যে রণস্থলে পালে পালে নিপাত হইত ও করিত ইহা অসম্ভব নহে। কেবল যাহারা বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ও নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে পটু, এবং যাহাদের অশিক্ষার সহিত প্রভুত্বহানিরূপ ফল যোজিত, তাহাদিগকে কাজেই নানারূপ উপায়ে এবং গরজে বহুতর যুদ্ধ-কৌশলী হইতে হইত। এই নিমিত্তই বোধ হয় প্রাচীন সাময়িক যুদ্ধের জয় পরাজয় তদ্রূপ লোকের একা যুদ্ধে একা জয় পরাজয়ের উপরেই অধিক নির্ভর করিত।

উৎকৃষ্ট কৌশলে এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্রে রামের জয়ে এবং তদ্বিপরীতে রাবণের পরাজয়ে আমাদের পক্ষে সুন্দর শিক্ষা দেদীপ্যমান আছে। মানসিক উন্নতির উপর জাতীয় সর্ব্বপ্রকার গৌরব নির্ভর করে। সাহস ও বীরত্ব জনিত গৌরব ইহার বহির্ভূত নহে। সাহস এবং বীরত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাধীনতা বা জাতীয় স্বভাব ও অবস্থা অনুসারে তত্ত্বৎ বাঞ্ছনীয় অভাব পরিপূরণ। স্বাধীনতার জন্য অকাতরে রক্তপাত সাধারণতঃ মনুষ্যের দ্বিবিধ অবস্থায় দেখা গিয়া থাকে। এক বনবিহঙ্গ প্রায় স্বচ্ছন্দচারী মানব, যাহার এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার উৎকর্ষতা জনিত মমতা, স্বাধীনতার মমতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ। অপর, যাহারা চিত্তের অত্যুৎকর্ষতা লাভহেতু নিরাপদে তাহার বেগপ্রবাহের জন্য পদে পদে স্বাধীনতার আবশ্যকতা অবলোকন করিয়া থাকে। প্রথমটির সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল পেরু মেক্সিকো প্রভৃতি, দ্বিতীয়টির তদ্রূপ সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল গ্রানেডা হইতে মুসলমান এবং ইউনাইটেড ষ্টেট হইতে ইংরেজ নির্ব্বাসন প্রভৃতি। মধ্যমাবস্থার সুন্দর দৃষ্টান্ত-স্থল লক্ষ্মণসেনের বাঙ্গালা দেশ অথবা রোম, গ্রীস ও ভারতের অধঃপতন। এই অসামান্য দেশত্রয়ে যখনই অত্যুৎকৃষ্ট মানসিক উৎকর্ষতার হ্রাস হইয়াছে, তখনই তাহারা অধঃপাতে গিয়াছে।

কিন্তু সাহস ও বীরত্বে অভীষ্ট সিদ্ধ কিরূপে হইতে পারে, তাহা বিবেচ্য। অনেকের বিশ্বাস ইহার মূল একমাত্র দৈহিক বল। একথা অগ্রাহ্য, তবে দৈহিক বল আংশিক বটে, কোন স্থানে তাহাও এত বিলুপ্ত ভাবে থাকে যে তাহা নজরে আসে না। সকলের মূল বাসনা এবং কৌশল। আবার এখানেও অনেকের বিশ্বাস যে বাসনার মূল গায়ের জোর, একথাও শুনিব না। তেজ দ্বারা বাসনার কতক পরিমাণ হয়। কিন্তু তেজ আমরা কাহাদিগেতে দেখিতে পাই? এক জাতির স্বাধীনতায়, অপর চিত্তের উৎকর্ষতায়। কুকি সাঁওতালের যে তেজ আছে, দুর্ভাগ্য বঙ্গসন্তানের তাহা নাই। আবার এক্ষণকার ক্ষীণজীবী বঙ্গসন্তানের যে তেজ লক্ষিত হইতেছে, 'ডাইল রুটি' ভোজী সবলকায় হিন্দুস্থানিতে তাহা লক্ষিত হয় না। পুনশ্চ শুনিতে পাই আমাদিগের স্বর্গীয় বংশরক্ষকেরা তাল মারিয়া বৃহৎ গাছকেও দোদুল্যমান করিতেন, কিন্তু পেয়াদা দেখিলেই গৃহিণীর আঁচল ধরিয়া পিছনে লুকাইতেন; তেজ বিষয়ে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের নিৰ্জ্জীব উত্তর পুরুষমধ্যে কত অন্তরতা। ফলতঃ বাসনার মূল পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, অনুন্নত সমাজে পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত স্বাধীনতার ভাব, এবং উন্নত সমাজে মানসিক উৎকর্ষতার অভাব বোধ। কিন্তু কৌশলের মূল সর্ব্বসময়েই মানসিক উৎকর্ষতা। এই উৎকর্ষতা যখন যেরূপ পুষ্টতা ধারণ করে, তখন কৌশলও সেই অনুসারে অঙ্গসম্পন্ন হয়। যেখানে বাসনা, কৌশল এবং দৈহিক বলের একত্র সমাবেশ, সেখানকার মঙ্গলের আর কথা কি আছে। যেখানে তদভাবে কেবল কৌশল ও বাসনা প্রবলা সেখানেও জয়শ্রী বিচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল দৈহিক বল, বা দৈহিক বল ও বাসনা, অথবা দৈহিক বল, বসনা ও অধম কৌশল এ তিন একত্র হইলেও, প্রবলা বাসনাও উন্নত কৌশলের ফলের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ। যখন সপ্ত ঋষি কেবল কয়েকজন মাত্র স্বদলস্থ লোক লইয়া ভারতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অনার্য্য দস্যুরা এই ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বাস করিত। আর্য্যগণের তুলনে, তাহারা সংখ্যায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকাবৎ। বলেও সামান্য ছিল না, সভ্যের অপেক্ষা, আহারপ্রচুর দেশের অসভ্যের গায়ের জোর এবং কষ্টসহিষ্ণুতা অধিক; দ্বিতীয়তঃ গড়ে তাহাদের এবং আর্য্যদের বল তুলনা করিলে, শেষোক্তেরা সিংহের নিকট মশক সদৃশ বোধ হইবে। পুনশ্চ তাহাদের বাসনাও বিপুল ছিল, নতুবা তাহারা এত রক্তপাত করিতে পারিত না। তথাপি আর্য্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়া দাসত্ব, অতি অধম দাসত্ব স্বীকার করিতে হইল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, আর্য্যেরা অল্পবল ও অল্পসংখ্যক বটে, কিন্তু ইহাদের বাসনা অনার্য্যদের সঙ্গে সমান দৃঢ়, মানসিক উৎকর্ষতা অত্যন্ত অধিক, সুতরাং ইহারা কৌশলী ও কৃত্রিম বলে বলী।

ঐরূপ মেক্সিকো দেখ। যখন কোর্টেস কেবল চারিশত পদাতি ও পনেরটি অশ্ব লইয়া লাসকালায় (Tlascala) উপস্থিত হয়েন, তখন অধিবাসীরা স্বদলের সহস্র সহস্র নিপাত হইলেও, কিরূপ সাহস ও বীরত্ব সহ বারম্বার স্বদেশরক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের অধিনায়ক জিকো-তেঙ্কাতল (Xicotencatl) কতই সাহসিকতা, কতই স্বদেশপ্রিয়তা, কতই যুদ্ধামোদিতা দেখাইয়াছিল! ইহার স্বভাবচরিত্র আলোচনায় এরূপ বোধ হয় যে এই দুর্ভাগ্য ইণ্ডিয়ান যদি অনুকূল সময় ও সমাজে পতিত হইত, তাহা হইলে বিখ্যাতনামা নূতন পুরাতন অনেক মহাবীরের যশোরবি মলিন করিয়া ফেলিত, কিন্তু এটিও অরণ্য-কুসুম। এততেও কোর্টেসের পক্ষে ৫০ জন মাত্র হত হইল বটে, কিন্তু সমস্ত লাসকালা অর্দ্ধলক্ষের অধিক কোর্টেসকে বলি দিয়া তাহার পদানত হইল। তৎপরে কোর্টেস অবশিষ্ট ৩৬৫ জন লইয়া সদর্পে সমস্ত আনাহক সাম্রাজ্যের রাজধানী টিনকৃটিটলানে উপনীত হইলেন। এই সাম্রাজ্যের দেববৎ পূজিত অদ্বিতীয় অধীশ্বর কোর্টেসের অনুচর বিলাসকেজের ভ্রূকুটীভঙ্গীতে ভয় পাইয়া স্পেনীয়দিগের মন্দিরে আবদ্ধ হইলেন। যাহার ভ্রূকুটীমাত্রে আমূল আনাহক কম্পিত হইত, যাহার অঙ্গুলি হেলনে পতঙ্গ-পালের ন্যায় সৈনিক আসিয়া প্রাণদান করিতে সম্মত, সম্ভ্রান্তের স্কন্ধ ব্যতীত যাহার যানের অভাব, অল্পক্ষণ পরে তাহারই হাতে কোর্টেস হাতকড়ি লাগাইলেন। ইহার মূল, বাসনা এবং উৎকর্ষতাজনিত কৌশল ও কৃত্রিম বল। স্বদেশরক্ষণে মেক্সিকো-বাসীরা যত রক্তপাত করিয়াছে, এক পেরু ভিন্ন কোন ইতিহাসে তাহার তুলনা দেখা যায় না। ঐরূপ জরক্সিসের সঙ্গে গ্রীকজাতির যুদ্ধেও উৎকর্ষতার জয়শ্রী কেমন তেজোদীপ্ত লাবণ্যময়ী। বিপুল বল ও বিপুল দেহ বিশিষ্ট সৈনিকমণ্ডলের অধিনায়ক রুসিয়ারাজ পিটর, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যেশ্বর এবং ক্ষুদ্রসেনার অধিনায়ক দ্বাদশ চার্লশ কর্ত্তৃক কিরূপ হতশ্রী হইয়াছিলেন! পিটর তখন খেদে বলিয়াছিলেন যে, সুইডরা তাহাদিগেরই সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত এরূপভাবে বিপক্ষকে রণকৌশল শিক্ষা দিতেছে। পিটরের ন্যায় ব্যক্তিই কেবল এবাক্যের সত্যতা সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আর উদাহরণ প্রয়োগ অনাবশ্যক।

আবার দেখ, যে ওয়ালিদ খলিফ আসমুদ্র করগ্রাহী সম্রাট্, উদয়গিরি হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত যাহার রাজত্ব বিস্তার, তিনিও ভারতে সিন্ধু প্রদেশের অংশমাত্র জয় করিয়া রক্ষণে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু দাসানুদাস কুতবুদ্দিন স্বচ্ছন্দে ভারত-সিংহাসনে আরোহণ করিল। যে রোমরাজ্য বিশ্বব্যাপিনী, কয়েকজন বর্ব্বরে তাহার ধ্বংস করিল। ইহার কারণ কি? পূর্ব্বার্জ্জিত উৎকর্ষ, কৌশল, কৃত্রিমবল সকলই ত ছিল, কিন্তু সে সকল ব্যবহার করিবার লোক ছিল না, পূর্ব্বের ইচ্ছা বিগত হইয়াছে; উৎকর্ষতার মলভাগ বিলাস এখন সর্ব্বস্বধন, সুতরাং অধঃপতন রাখে কে?

বিজ্ঞানোদ্ভব কৃত্রিমবলের পূর্ব্বে মল্লযুদ্ধ বহুপরিমাণে রণস্থলে অভিনীত হইত। কিন্তু সে দিন ইহকালের মত চলিয়া গিয়াছে। ভারতে মল্লক্রিয়া এখনও প্রচুর আছে, এত আছে যে পৃথিবী হইতে যদি আজি বিজ্ঞান উঠিয়া যায়, তবে কালি আবার ভারত জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জাতীয় পদবীতে পদার্পণ করে। সেদিন একটি মল্লযুদ্ধ দেখিলাম, তাহাদের অঙ্গচালনা এবং মল্লক্রিয়া অবশ্যই অপূর্ব্ব, কিন্তু এ মল্লযুদ্ধ এখন আমোদস্থলীয়। যাহাতে আগে দেশ রক্ষা হইত, যাহাতে আগে জাতীয় ভাগ্য নিরাকৃত হইত, এখন তাহা সাধারণের চিত্তবিনোদনের উপায়। মানসিক উৎকর্ষতা এবং বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এ যুগের অধিনায়ক। ভারত সন্তান! শরীর মন সুস্থ রাখিয়া তাঁহার উপাসনা কর, অভীষ্ট লাভ হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
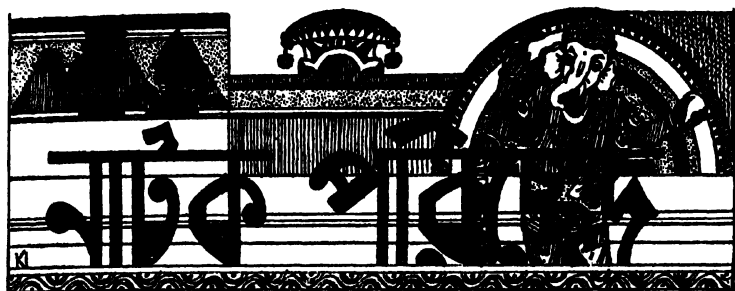
মহাকাব্য প্রভৃতি কেবল শ্রবণ করা যায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে শ্রাব্যকাব্য বলে। শ্রাব্যকাব্যের ন্যায়, নাটকের শ্রবণ হয়, অধিকন্তু রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনয়কালে দর্শনও হইয়া থাকে; এবং ইহাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্যকাব্য। প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার অর্থাৎ প্রধান নট, স্বীয় পত্নী অথবা অন্য দুই এক সহচরের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দেয়। যে যে স্থলে ইতিবৃত্তের স্থূল স্থূল অংশের একপ্রকার শেষ হয়, সেই সেই স্থলে পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক।

নাটকে এক অবধি দশ পর্য্যন্ত অঙ্ক সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত একরূপ রচনা দেখা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্যভেদে রচনা বিভিন্ন হইয়া থাকে। রাজা, মন্ত্রী, ঋষি, পণ্ডিত ও নায়ক প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সচরাচর উত্তম ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। সামান্য স্ত্রী, বালক ও সাধারণ জনগণ গ্রাম্যভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। অভিজ্ঞ মহিলাগণ উত্তম ভাষায় আলাপ করেন।

অভিনয় বা রূপক।

কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তিবিশেষের অবস্থাদির অনুকরণকে অভিনয় বা রূপক কহা যায়।

অভিনয়াদিতে অন্যের রূপাদির অনুকরণই প্রধান বিষয়, এই হেতু নাটকাদি দৃশ্যকাব্যের নাম রূপক।

অভিনয় চারি প্রকার—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা রূপককে (অভিনেয় কাব্যকে) দশভাগে বিভক্ত করেন। বঙ্গভাষায় তিনটী মাত্র বিভাগ দেখা যায়—নাটক, প্রহসন ও মাস্ক।

অঙ্কের লক্ষণ।

নাটকের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ বা সর্গের নাম অঙ্ক। যে অঙ্কে যাহার প্রসঙ্গ থাকে, তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করা উচিত। নাটকে কূটার্থ বা অপ্রসিদ্ধ শব্দ ব্যবহার হয় না। অনাবশ্যক কার্য্যের সংশ্রব মাত্রও থাকে না। আবশ্যকীয় বিষয়ের চমৎকারিত্ব থাকিলে বর্ণন বিবিধপ্রকারে বর্ণিত হইতে পারে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে নিন্দনীয় বিষয় নাটকে বর্ণনযোগ্য বলিয়াই কথিত হয় না। কিন্তু বঙ্গভাষায় নাটকে অনেকে সকল শাসন স্বীকার করেন না।

অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অবস্থার অনুকরণের নাম আঙ্গিক অভিনয়। বাক্যভঙ্গী দ্বারা অন্যের স্বর ও কথার অনুকরণের নাম বাচিক, বেশভূষাদি দ্বারা অন্যের সাদৃশ্য অনুকরণের নাম বহুরূপী, ও স্তম্ভ স্বেদাদি সত্ত্বগুণসম্ভূত অভিনয়ের নাম সাত্ত্বিক অভিনয় কহা যায়।

নাটকের নায়ক ও নায়িকা ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত এই চারিপ্রকারের যে কোন একপ্রকারের হইতে পারে। আদ্য অথবা বীররস নায়ক অথবা নায়িকার প্রধান আশ্রয়। আনুষঙ্গিক অন্যান্য রসেরও উদ্বোধ ও অপগম হইতে পারে। কিন্তু পরিণামে কোন কার্য্যব্যপদেশে অদ্ভুত রসের আবির্ভাব দ্বারা অভিনয় সমাপন করিতে পারিলে নাটকের চমৎকারিত্ব জন্মে।

এক অঙ্কের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ অন্য বিষয় বর্ণন করিতে হইলে গর্ভাঙ্করূপে পৃথক্ সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ কল্পনা করিতে হয়।

নাটকে কোন বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণন যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্ক অপেক্ষা পরবর্ত্তী অঙ্কগুলি ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।

বাঙ্গালা নাটকে পূর্ব্বরঙ্গাদি নাই। কোন কোন সংস্কৃতানুযায়ী নাটকে উহা আছে। তদনুসারে পূর্ব্বরঙ্গাদির স্থূল স্থূল বিষয়গুলি সামান্যতঃ বলা গেল।

পূর্ব্বরঙ্গ।

রঙ্গভঙ্গী (রঙ তামাসা) দেখাইবার পূর্ব্বে নট বা নটী যে মঙ্গলাচরণ (গৌর চন্দ্রিকা) করে, তাহার নাম পূর্ব্বরঙ্গ।

নান্দী।

পূর্ব্বরঙ্গের পর নট বা নটী স্বস্তিবাচনে অথবা দেবাদির স্তুতিগানে অলঙ্কৃত যে মঙ্গলাচরণ করে, তাহার নাম নান্দী। কোন কোন নাটকে কেবল পূর্ব্বরঙ্গ থাকে, কোনটীতে দুইটিই দেখা যায়।

নান্দীর উদাহরণ।

শিশুশশী শোভে ভালে, বপু বিভূষিত কালে
গলে কালকূটের কালিমা।

রজত ভূধর শোভা, ভক্তজন মনোলোভা,
এরূপের দিতে নাহি সীমা।
বাম উরু পরে বসি, অকলঙ্ক উমাশশী,
পুলকে প্রফুল্ল কলেবর।
নিতান্ত কিঙ্কর জনে, কৃপাবিন্দু বিতরণে,
ত্রাণ কর ওহে গঙ্গাধর॥
কুলময়ী কুলারাধ্যা, কুলভক্তজনবাধ্যা,
জগদাম্বা কুলকুণ্ডলিনী।
অমূল কল্পিত কুল, সমূলে করি নির্ম্মূল,
সত্যকুল বৃদ্ধি বিধায়িনী॥
কুলকাণ্ডে মনোমত, নিদ্রা যাও আর কত,
জাগো মা গো জগৎ সংসারে।
তোমা বিনা গতি নাই, কুলকাণ্ডে ডাকি তাই,
পড়ে আমি অকূল পাথারে॥

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব।

নান্দীর পরেই সূত্রধারের কথাপ্রসঙ্গে স্থাপয়িতা আসিয়া নাটকীয় ইতিবৃত্ত একপ্রকার অবতারণা করিয়া দেন।

প্রস্তাবনা।

নটী, বিদূষক অথবা পারিপার্শ্বিক যথায় সূত্রধারের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত বিষয়ের কথোপকথন করে, তথায়ই প্রস্তাবনা কহা যায়।

সূত্রধারের সহচরের নাম পারিপার্শ্বিক।

প্রস্তাবনা পাঁচ প্রকার। যথা—উদ্‌ঘাত্যক, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক ও অবলগিত।

উদ্‌ঘাত্যক।

যেখানে ব্যক্তিবিশেষের কথার অভিধেয়কে অপরবিধ অভিপ্রায় গ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে পাত্রপ্রবিষ্ট হয় তথায় উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনা কহা যায়।

মুদ্রা রাক্ষস—"প্রিয়ে সেই দুরাত্মা ক্রূরগ্রহ সম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

সূত্রধারের এই অর্দ্ধোক্তি মাত্র শুনিয়া নেপথ্য হইতে চাণক্য কহিলেন, "আঃ আমি জীবিত থাকিতে ক্রূর আগ্রহবিশিষ্ট কোন্ দুরাত্মা সার্ব্বভৌম চন্দ্রগুপ্তকে অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে?"

এখানে অন্য ব্যক্তির প্রক্রান্তবিষয়ের অর্দ্ধোক্তির অভিধেয় তাৎপর্য্যবশতঃ অর্থান্তরে পরিণত করিয়া পাত্রপ্রবেশ হইয়াছে, এ নিমিত্ত এইখানে উদ্ঘাত্যক কহা যায়।

কথোদ্ঘাত।

সূত্রধারের কথা শুনিয়া অথবা তদীয় কথার তাৎপর্য্য অবধারণপূর্ব্বক পাত্র প্রবিষ্ট হইলে কথোদ্ঘাত নামে প্রস্তাবনা কহা যায়। যথা রত্নাবলীতে—

"বিধাতা যদি অনুকূল হন তবে কি দ্বীপান্তরিত, কি সাগরের প্রান্তস্থিত অথবা কি দিগন্তরগত প্রিয় বস্তু তাহার সহিত অনায়াসেই মিলন হইতে পারে। তদ্বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতা জন্মে না।"

সূত্রধারের এই বাক্য শুনিয়া নেপথ্য হইতে যৌগন্ধরায়ণ সূত্রধারের বাক্যের সাধুবাদ দিয়া কহিলেন, "সকলি সত্য! নতুবা দেখ কোথায় বা সিংহলেশ্বরের দুহিতা, কোথায় বা তাহার যানভঙ্গ এবং কোথায় বা তাহার কৌশাম্বীয়দিগের সহিত মিলন এবং এখানে আনয়ন ইত্যাদি।"

বেণীসংহারেও দেখ—

"পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দলাভ করুন। যেহেতু শত্রুদমন দ্বারা এক্ষণে তাঁহাদিগের বৈরনির্য্যাতনরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এবং যাঁহাদিগের রুধিরে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছে, সেই ক্ষতবিক্ষতশরীর কৌরবগণও সভৃত্য সুস্থ হউন।"

সূত্রধারের এই বাক্য পাঠ করিয়া নেপথ্য হইতে ভীমসেন কহিলেন, "রে পাপিষ্ঠ দুরাত্মন্, আর তোর বৃথা মাঙ্গলপাঠের আবশ্যকতা নাই। এখনও আমি ভীমসেন জীবিত থাকিতে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সুস্থ থাকিবে?"

এই কথা বলিয়া সূত্রধার প্রস্থান করিলে ভীমসেনের প্রবেশ সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগাতিশয়।

যেখানে এরূপ প্রয়োগে অপরবিধ প্রয়োগের অবতারণা অনুসারে পাত্র প্রবেশ সুসম্পন্ন হয়, তথায় প্রয়োগাতিশয় কহা যায়। যথা—

যথা কুন্দমালা নাটকে—

নেপথ্যে—"আর্য্যা এইস্থানে আগমন করিতে পারেন।"

সূত্রধার এই কথা শুনিয়া কহিল, "এ আবার কোন্ ব্যক্তি, আর্য্যাকে আহ্বান করিয়া আমার সহায়তা করিতেছেন?"

চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া—

"আঃ কি কষ্ট কি কষ্ট! সীতাদেবী অনেকদিন লঙ্কেশ্বর ভবনে বাস করিয়াছিলেন এই লোকাপবাদ ভয়াকুল রামকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা জনকনন্দিনীকে লক্ষ্মণ নিতান্ত গর্ভমন্থরা জানিয়াও জনপদ হইতে বনগমন জন্য এই যে আনয়ন করিতেছেন।"

এখানে সূত্রধারের নৃত্যপ্রয়োগ বিষয়ে স্বীয় ভার্য্যার আহ্বানের ইচ্ছাটী লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সীতাদেবীর বনগমনাহ্বানরূপ প্রয়োগ বিশেষ সূচনা করিয়া আপন প্রয়োগের আতিশয্য সম্পাদন করিল।

প্রবর্ত্তক।

যেখানে বর্ত্তমানকাল আশ্রয়পূর্ব্বক সূত্রধার পাত্রপ্রবেশ সম্পন্ন করিয়া দেয় তথায় প্রবর্ত্তক কহে। অধিকাংশ নাটকেই এইরূপ প্রস্তাবনা দেখা যায়।

অবলপিত।

যেখানে সদৃশ কার্য্য বা সদৃশ বস্তুর কথন বা স্মৃতিহেতু পাত্র প্রবিষ্ট হয়, তথায় অবলপিত প্রস্তাবনা কহা যায়। যথা—শকুন্তলায়ঃ—

"রাজা দুষ্মন্ত যে প্রকার বেগবান্ মৃগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, আমি সেই প্রকার তোমার গীতরাগে বিমোহিত হইয়া সমাক্রান্ত হইয়াছি।"

এই কথা শ্রবণ দ্বারাই দুষ্মন্তের প্রবেশ সম্পন্ন হয়।

সর্ব্বপ্রকার প্রস্তাবনাতেই সূত্রধার প্রস্তাবনা সম্পাদন করিয়াই রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

প্রহসন—হাস্যরসোদ্দীপক নাটককে প্রহসন কহা যায়।

নাটকাত্মক আখ্যায়িকা—নভেলে প্রস্তাবনা, নান্দী, পূর্ব্বরঙ্গ, বিদূষক, নট, নটী প্রভৃতি নাম নাই। প্রসঙ্গতঃ যাহার আবশ্যক তাহার নামই স্পষ্টরূপে লেখা থাকে।

কোন কোন নাটকে যেমন গ্রন্থকারের নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক সভার ও দেশের বিষয়াদি বর্ণিত থাকে, ইহাতে গ্রন্থকারের নাম না থাকুক কিন্তু সেইপ্রকার বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে তাৎকালিক ইতিবৃত্ত ও সমাজাদির বিবরণ ও আচার ব্যবহারাদির কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হয়।

নাটক ও নাটকাত্মক আখ্যায়িকার ভাষা।

ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তা ভদ্ররীতিতে ও সাধুভাষায় সম্পন্ন হয়। গ্রাম্য লোকের ভাষা সামান্য ও চলিত কথাবার্ত্তায় হইয়া থাকে।

বিদূষক প্রায় আমোদপ্রমোদপ্রিয় ও ভোজনপটুরূপে বর্ণিত হয়।

সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা নীচ পদবীস্থ ও দাসীদিগের প্রতি ওলো, হ্যাঁলো, ওরে প্রভৃতি বাক্যে সম্বোধন করিয়া থাকেন।

সম্মানযোগ্য স্ত্রীজনদিগকে লোকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করেন।

সমযোগ্যা কামিনীগণের মধ্যে পরস্পর সখী বা প্রিয়সখী বলা রীতি।

কথাবার্ত্তা।

স্বগত—অন্যের অগোচরে আপনি একাকী প্রকাশ্যে যে কথা কহে, তাহার নাম স্বগত।

জনান্তিক—একজনের অন্তরালে অপর ব্যক্তির সহিত কথোপকথনের নাম জনান্তিক।

আকাশবাণী—দেববাণী অর্থাৎ যে কথা অপর ব্যক্তি শুনিতে পায় না কিন্তু যাহার উদ্দেশে কথিত হয় সে ব্যক্তি শুনিতে পায়।

উপক্রমণিকা

বাঙ্গালা অধঃপাতে গিয়াছে, এ কথায় সকলে বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমরা বিশ্বাস করি এবং একগলা গঙ্গাজলে দণ্ডায়মান হইয়া শপথ করিয়া তাহা বলিতে পারি। বাঙ্গালার যে কোন আশাই একেবারে নাই, এরূপ কঠোর কথা আমরা হৃদয়ে স্থানদান করিতে পারি না; অথচ নবযুবকগণের যেরূপ রীতি-নীতি হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালার যে কিছু ভরসা আছে, এমন কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে একেবারে হতাশও নহি।

কিঞ্চিৎ আশা আছে বলিয়াই, বাঙ্গালার দুর্দ্দশার কারণানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি হয়। যখন স্বয়ং শতপীড়নে পীড়িত হইয়া এবং শত সহস্র স্বদেশীয়কে নিষ্পেষিত দেখিয়া মনে হয় যে, "এ যন্ত্রণা আর কতকাল ভুগিতে হইবে? কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব?" তখনই সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, "কতকাল এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি? এবং না জানি কত পাপই করিয়াছি?"

পাপের স্বরূপ নির্ব্বিশেষ উপলব্ধি করিতে না পারিলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। প্রথমে জানিতে হইবে, বাঙ্গালা কি কি পাপ করিয়াছে, তবে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

সংসারের নিয়মই এই, আপনার জন্য আপনাকে ভুগিতে হয়, আর পরের জন্য আপনাকে ভুগিতে হয়। জাতিসাধারণের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। কোন এক জাতির শুভাশুভ যে কেবল সেই জাতির চরিত্রের উপর নির্ভর করে এমন নহে, অপর দশ জাতির বল, বিক্রমে বা আচার-ব্যবহারেও নিরীহ একজাতির ভালমন্দ ঘটিতে পারে ও ঘটিতেছে। যদি বাবর শাহ বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ও স্বজাতীয়গণ ভ্রমণশীল, যুদ্ধক্ষম, শ্রমসহিষ্ণু, দিগ্বিজয়াকাঙ্ক্ষী না হইতেন, তাহা হইলে পৌরাণিক হিন্দু সন্তান হয়ত আরও শত শত বৎসর যজনাধ্যয়ন ও ঈশ্বর চিন্তায় যাপিত করিত। যদি অর্জ্জনস্পৃহ বণিগ্জাতির করতলে বঙ্গদেশ এই শতাধিক বৎসর যাপন না

করিত, তাহা হইলে কি এখনকার মত বঙ্গসন্তান মানমর্য্যাদা, লোক-লৌকতা, সম্ভ্রম, সৌজন্য—সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া কেবল ধনসঞ্চয় করিতে ব্যস্ত হইত?

কোন এক জাতির শুভাশুভ যে নানাদেশবাসীর জাতিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে সকল বিলাতীয় বিখ্যাতনামা পণ্ডিত, শুদ্ধ দেশবিশেষের অবস্থা হইতে জাতিবিশেষের চরিত্র নিষ্কাশিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা অর্দ্ধদর্শী। সকল জাতির শুভাশুভের কারণ কেবল জড় নহে; শুভাশুভের কারণ জড় এবং জীব। যখন আমরা আমাদের বীর্য্য-হীনতার উল্লেখ করিয়া বলি যে, "শাক সিদ্ধান্ন শর্করা সেবনে আমাদের আর কত বীরত্ব হইবে?" তখন আমরা জড়-প্রকৃতিকে আমাদের দুরবস্থার কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। তাহার পর আবার যখন বলি, "আর শত শত বৎসর দাসত্বের পর বীরত্ব থাকিবেই বা কি প্রকারে?" তখন আমরা জীব-প্রকৃতিকে আমাদের দুরবস্থার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। বাস্তবিক জড়, জীব উভয়েই আমাদিগের বিরোধী। বোধ হয়, জন্মলগ্নকাল হইতে জড়জগৎ আমাদিগকে জড়ীভূত করিতেছে; আর জীবগ্রহ একটির পর একটি আসিয়া, কেন্দ্রে ভর করিয়া,অনিষ্টসাধন করিতেছে। শুনিতে পাই আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে সকল ব্যবস্থাই আছে, এ কুগ্রহ-শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কি কোন ব্যবস্থা নাই?

এই কুগ্রহ জড়ের অত্যাচার নিবারণার্থ বঙ্গসন্তান কার্য্যে কোন চেষ্টা করুক বা না করুক,অন্ততঃ কথায় স্বীকার করেন, এবং হয়ত কেহ কেহ মনেও বুঝিয়াছেন। আহার পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন করিতে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে, বিশুদ্ধ বায়ু-সেবন করিতে, উচ্চ ভূমিতে বাস করিতে, প্রশস্ত গৃহে শয়ন করিতে—বাঙ্গালি এখনও অভ্যাস করেন নাই বটে, কিন্তু বোধ হয় যেন কিছু চেষ্টা করিতেছেন।

জীবপ্রকৃতির কার্য্যকারিত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালি বুঝেন—কেবল বর্ত্তমান সম্বন্ধ। সেইজন্যই বাঙ্গালায় সম্বাদপত্রের সৃষ্টি, সেইজন্য সভা, সেইজন্য বক্তৃতা; সেই জন্যই বাঙ্গালার রাজনীতি, সমাজনীতি এরূপ স্বল্পায়ত। বাঙ্গালির ইতিহাস নাই; বাঙ্গালি বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যৎ চিন্তা করেন; মহাভূতের সমীপে শিষ্যত্ব স্বীকার করেন না; সুতরাং চিরদিন কেবল গণ্ডগোল করেন। ইতিহাসে উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালি যে সকল মতপ্রচার করেন, তাহা সম্পূর্ণ সহৃদয়তা ব্যঞ্জক হইলেও কোন কার্য্যকর হয় না। বাঙ্গালি বর্ত্তমান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, বাল্যবিবাহে, কুলীন বিবাহে, বিক্রয় বিবাহে, বাণিজ্য বিবাহে বাঙ্গালার মহা অনর্থপাত হইতেছে, অমনই আশাঙ্কুরিত হৃদয়ে বলিলেন, "এগুলি উঠাইয়া দাও।" একবার অতীত স্মরণ করিলেন না, কেন যে এগুলি এদেশে প্রচলিত হইল, একবার তাহার অনুধাবনা করিলেন না। একবার মনে হইল না যে, যে যে কারণে এই সকল

প্রথা বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়াছে ও রহিয়াছে, সেগুলি যদি এখনও থাকে, তাহা হইলে, যতদিন না সে কারণগুলির ধ্বংস হয়, ততদিন পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথাগুলি কখনই দেশ হইতে উৎপাটিত হইবে না। কারণের ধ্বংস না হইলে কার্য্যের নাশ হইবে না। সমাজসংস্করণের পূর্ব্বে প্রথমে কারণানুসন্ধান করা, ইতিহাস শিক্ষা করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, একথা বাঙ্গালি আজিও স্বীকার করেন না।

জীবপ্রকৃতির তাড়নায় কোন জাতির আচার, ব্যবহার প্রভৃতিতে যে বৈলক্ষণ্য সঙ্ঘটন হয়, ইতিহাসে তাহাই বিবৃত থাকে। কোন কোন বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা কতবার এইরূপ তাড়িত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এক ইংরাজদিগের কথা দেখিতেছি, আর এক মুসলমানের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা অন্ততঃ আরও দুই তিন বার ভিন্নজাতি বা ভিন্নধর্ম্মী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় নিশান বঙ্গবাসীর অন্তর্বাহিরে রাখিয়া গিয়াছে; আমরা অদ্যাপি সেই সকল কলঙ্কতিলক সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। বৌদ্ধেরা আসিয়া মঠমন্দির নির্ম্মাণ করিল; আমরা ভাঙ্গি নাই; যে একটু আধটু ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছে, তাহা এখনও ভুলি নাই। সন্তাল আসিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গে কালি ঢালিয়া দিল, এখন ঘুচে নাই; বক্ষে রক্ত ছিটাইয়া দিল, আমরা তাহা এখনও মুছি নাই। সেনবংশ কুলধ্বজা প্রোথিত করিয়াছেন, গৃহে গৃহে এখনও উড়িতেছে। মুসলমান আগুন লাগাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা এখনও পুড়িতেছে।

আমরা অমায়িক; কিছুতেই আমাদিগের পক্ষাঘাতগ্রস্ত শরীরে বেদনা বোধ হয় না। আমরা রোগী হইয়াও যোগীর ন্যায় নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি। কিন্তু আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলে না। এখন অনেকেই সমাজসংস্কারকরূপে বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন। ইতিহাসের সাহায্য না লইয়া সেই সকল বিষয়ে কোনরূপ মত প্রদান করা বিড়ম্বনা মাত্র, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমরা বাঙ্গালার পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমাদের দেশের কোন একটি সত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদা বিভিন্না, স্মৃতয়ো বিভিন্না হইলে ক্ষতি ছিল না, তদ্রূপ সকল দেশেই হইয়া থাকে। আমাদের কোন একটি কথার স্থির নাই। সংস্কৃতে যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহাই লোকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, এদিকে আবার সংস্কৃতে সকল কথাই লেখা আছে; ফলে হইয়া উঠিয়াছে এই যে, হিন্দু সন্তান ক্রমে সত্য মিথ্যা প্রভিন্ন করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে; একই পদার্থকে কেহ সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া শুক্ল বলিলে বিশ্বাস করে; আর একজন সেইরূপ আর্য্যাচ্ছন্দের শ্লোক

পাঠ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ বুঝাইয়া দিলে, তখনই বলে যে "হাঁ উহা কৃষ্ণবর্ণ।" দুই জনে একেবারে পীড়াপীড়ি করিলে বলে যে, "দুইই হইয়া থাকে।"

সকলের বোধগম্য হইবে বিবেচনায় সামান্য 'পঞ্জিকা' হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। পঞ্জিকায় লেখা থাকে যে, বিষ্ণুর দশাবতার। সত্যযুগে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ। ত্রেতায় বামন, পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ। কলিতে (হইবে) কল্কী। পৌরাণিক এসকল কথায় বিশ্বাস করেন। তাঁহার পুরাণে আরও শুনা যায় যে, পরশুরাম ও দাশরথি রাম সমসাময়িক—দশরথ জামদগ্ন্যের ধনুর্ব্বহন করিতেন; জানকীর সহিত পরিণয়ের পরই শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামের সহিত পথিমধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেন। উত্তম, পরশুরাম ও দাশরথি রাম সমসাময়িক হইলেন। দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের শিষ্য। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনাদির গুরু ও শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। সুতরাং তিনটি অবতারের সময় অব্যবহিত পরে পরে হইতেছে। শুদ্ধ তাহাই নহে। কলির আরম্ভেও যুধিষ্ঠির রাজা এবং দ্বাপরের মধ্যেই বুদ্ধাবতার সুতরাং এক যুধিষ্ঠিরের সময়েই (কৃষ্ণ ও বুদ্ধ) দুই অবতার হইয়াছেন। অতএব পরশুরাম, দাশরথি রাম, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব চারিটি অবতারই এক সময়ে হইয়া উঠিল। অথচ মধ্যে একটি পৌরাণিক দ্বাপরযুগ গিয়াছে। দ্বাপরযুগের পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসর। বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরের সময়ে, যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের শিষ্য। পৌরাণিক প্রথানুসারে এক একজনের জীবনকাল দশ সহস্র বা বিংশতি সহস্র বর্ষ স্বীকার করিলেও, কিছুতেই আট লক্ষ বা নয় লক্ষ বৎসর হইবে না। গণিতের সহিত, জমা খরচের সহিত এসকল কথার কোন সম্পর্ক নাই। শুন, বিশ্বাস কর, আর নিদ্রা যাও।

এইরূপ সকল কথাতেই। একটু পরীক্ষা করিতে যাইলেই মহা বিপদ্; কিছুতেই বুঝা যায় না, সমস্ত শিথিল হইয়া পড়ে। ভারতবাসিগণ একটি সহজ উপায় স্থির করিয়াছেন, কোন কিছু বিবেচনা না করিয়া সকল কথায় সম্মতিদান করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। একজন সেকেন্দর মাকিডন হইতে ভারতবর্ষ জয় করিতে আসিয়াছিলেন, ভারতবাসী তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন; আর একজন সেকেন্দর শাহ দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন; অমায়িক ভারতবাসী জানেন দুইই এক। নানা সময়ে নানা বিক্রমাদিত্য ভারতে রাজ্য করিয়াছেন, ভারতবাসী জানেন বিক্রমাদিত্য একজন। অষ্টাদশ পুরাণ একই জনের কৃত; মহাভারত—সেই মহাত্মারই কৃত; বেদ গ্রন্থন—তিনিই করিয়াছিলেন, দ্বাপরে চন্দ্রবংশের তিনিই—ঔরস পিতা; প্রধান দর্শন বেদান্ত—তাঁহারই কৃত। শৈববৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব—তাঁহা হইতেই আরম্ভ হয়। ব্যাসকাশী—তিনিই পত্তন করেন, বদরীনাথ মহাদেব—

তাঁহারই স্থাপিত। এসকল কথায় কোন তর্ক নাই। পুরুষানুক্রমে বিশ্বাস কর আর লীলাসম্বরণ কর।

এইরূপ বিকৃতবাদে বাঙ্গালার ইতিহাস পরিপূর্ণ। আমাদের বোধ হয় বাঙ্গালার ইতিহাসের "বিসমল্লায় গলৎ" আছে, ইহার "সিদ্ধিরস্তুতে" বর্ণাশুদ্ধি আছে। এখন যে সমাজ দেখা যাইতেছে, এ সমাজের বীজ এক সময়ে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপ্ত হয়; আর এক সময়ে আর এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহার অঙ্কুর সমস্ত রোপিত হয়। ব্রাহ্মণ আনিল কে? আদিশূর। শ্রেণীবদ্ধ করিল কে? বল্লাল সেন। কায়স্থ আনিল কে? আদিশূর। শ্রেণীবদ্ধ করিল কে? বল্লাল সেন। আদিশূর রাজা, রাজবংশীয়েরা বৈদ্য। উপবীত প্রদান করিয়া গৌরব বৃদ্ধি করিল কে? সেই বল্লাল সেন। বণিক্ বঙ্গে কবে আসিল? আদিশূরের সময়ে। সেই বণিক্‌কে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া, এক জাতিকে হীনগৌরব করিল কে? বাঙ্গালার ইতিহাসের সেই দ্বিতীয় নায়ক বল্লাল সেন। বর্ত্তমান সামাজিক বিভাগ সম্বন্ধে সকল প্রশ্নের উত্তর এইরূপ একই। কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক ও বাঙ্গালা কারিকা এই অনর্থ উৎপাদন করিয়াছে। এই সকল বচনে বিশ্বাস করিলে বাঙ্গালা কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব কথার পরিষ্কৃতিসাধন জন্য আমরা এইরূপ বালক বুঝান প্রবাদ যে কখনই সত্য নহে, তাহাই প্রদর্শনের চেষ্টা করিব। অনেক দিন হইতে আমরা এই কথার বাচনিক আলোচনা করিয়া আসিতেছি; আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করেন, একথায় বিন্দুমাত্র সংশয় আছে শুনিলেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থগণ শিহরিয়া উঠেন, যেন তাঁহাদিগের নিজের ও পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব লোপ করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি, এইরূপ জ্ঞান করেন। এটী কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। মুখুয্যে মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষকে কোন রাজা আনেন নাই ও একখানি গ্রাম দান করিয়া স্থাপিত করেন নাই, তাঁহারা বাঙ্গালায় দুই সহস্র বৎসর বাস করিতেছেন। তাহাতে ক্ষতি কি? ইহাতে অগৌরবের কথা কিছুই নাই।

অতএব ভরসা করি, আমাদিগের দ্বিতীয় প্রস্তাব সর্ব্বসমীপে বিশেষ আলোচিত হইবে।

চন্দ্রমাশালিনী নিশা গভীর সুমতি !
নির্ম্মল নীলিমাকাশে, সুধাংশু নক্ষত্র হাসে,—
হাসায় পার্থিব, নৈশ শোভার প্রকৃতি !
ভূধর, প্রান্তর, বন, নদ নদী প্রস্রবণ,
হাসির তরঙ্গে ভাসে বিকাশি মূরতি !
হেসে পাগলিনী হল ধরা রূপবতী ।

২

পাদপ পাতার আর স্রোতস্বতীকূলে
ধবল ফুলিত কাশে, সোহাগে খদ্যোত হাসে
শশীমুখী সন্ধ্যামণি হাসে মন খুলে ;
মৃদু নৈশ বায়ুভরে, আদরে গলিয়া পড়ে ;
ধবল তুহিনকণা মুক্তাহার গলে !
এ সব থাকিবে কোথা, নিশি পোহাইলে ?

৩

'ওই যে ভূধর হতে নির্ঝর নির্ম্মল
বারিবিম্ব ভেসে যায়, চন্দ্রমাতে দীপ্তি পায়,
পলকে মিশায়ে হবে যে জল সে জল !
গাঢ় জলদের ঘটা চল সৌদামিনী ছটা
গম্ভীর অশনি, ঘোর বৃষ্টি অবিরল
হইলে সহসা কোথা যাবে এ সকল ?

৪

ওই যে নৈশিক বায়ু মৃদুল দুলিয়া
দুলায় বৃক্ষের পাতা, দুলায় বনের লতা,
দুলায় শারদী নদী থাকিয়া থাকিয়া ;
সৌধ গবাক্ষেতে পশি স্বেদসিক্ত মুখ-শশী
কার মুছাইছে ওই আদরে গলিয়া ?
ওই যে মৃদুলানিল মৃদুল দুলিয়া !

চঞ্চল শঠের প্রেম হীরক রতন
উপরে অমিয়ময় গোপনে গরল বয়,
আপাত সুখের পরে সংহারে জীবন !
পৃথিবী কম্পিত করি ভূধর উপাড়ি পাড়ি
গম্ভীর কল্লোলি নীল সাগরে যখন
ভীম দুর্ণিবার ঝড় হবে নিমগন !

৬

তখন কোথায় রবে এ সব সম্পদ্ ?
ধীরে কি বনের লতা, ধীরে কি গাছের পাতা
ধীরে কি গবাক্ষে লয়ে সুরভি আমোদ
দুলিবে ? দুলাবে সবে ? কোথায় নিবায়ে যাবে
কৌমুদী চন্দ্রমা হাসি অমৃত আস্পদ !
মেঘেতে মিশাবে সব হইবে বিপদ !

৭

হেসনা হেসনা এত হাসি ভাল নয়
নির্ম্মল হৃদয়াকাশে, অমনিই হেসে হেসে
আশার সুধাংশু হয়েছিল যে উদয়,
সেই দিন সাধ করি, হেসেছিনু মুখভরি,
অমনি আঁধার হল এ পোড়া হৃদয়
তাই বলি এত হাসি হাসা ভাল নয় !

৮

এই যে মধুরা নিশা নিদ্রিতা ধরণী,
নিদ্রা আসিল না চখে, কি ভাবিছি মনোদুখে ?
কি ভাবনা—কাহারে বা বলি সে কাহিনী !
হৃদয়ের মধ্যে উঠে, হৃদয়ের মধ্যে ছুটে
হৃদয়েই লয় হয় আপনা আপনি,
কে শুনিবে অভাগার দুঃখের কাহিনী ?

সংসার-তড়াগ মাঝে জীবন-মৃণালে
সোদর কমল নিধি, প্রতিভার প্রতিকৃতি
বিদ্যান আদর্শ হয়েছিল যত্নবলে,
বিকাশ হতে না হতে সুরার ভীষণ স্রোতে
জীবন বন্ধনে মোর অতলে ডুবালে
সুখের প্রদীপ নিবাইয়া দিলে কালে!

১০

আশ্রয় বিহীন, লয়ে শৈশব জীবনে
অপুষ্ট পাষাণ গলে, সংসার সাগর জলে,
ডুবাইনু দেহ ভাবি উৎকর্ষ রতনে;
হৃদয় উৎসাহ হীন, হুতাশে শরীর ক্ষীণ
কি করিব কি হইবে যাব কোন স্থানে
ভাবিয়া কাঁদিছি নিত্য বসিয়া নির্জ্জনে!

১১

দরিদ্র মানব চিত্ত মরুভূমি প্রায়,
আশা-বারি বিন্দু নাই, আশ্রয় পাদপ নাই
ভিক্ষার আকাশে ঋণ-মার্ত্তণ্ড পোড়ায়!
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা মাঠে, দুরাশা পাবক উঠে
দুশ্চিন্তা বালুকাকণা হুতাশে উড়ায়!
দরিদ্র মানব চিত্ত মরুভূমি প্রায়।

১২

সোনার কনিষ্ঠ মোর ননীর পুতুল
উত্তাপে গলিয়া যায়, ঘুমালে জাগান দায়,
নিতান্ত শৈশব প্রিয় জীবনের মূল,
বিদেশে পরের ঘরে, পরের দাসত্ব করে,
শিক্ষার আশায় হায়! বিধি প্রতিকূল!
সোনার কনিষ্ঠ মোর ননীর পুতুল!

১৩

সকল সুখের স্রোত সুখায়ে গিয়েছে!
তবু খুঁজে দেখি দেখি, কোন সুখ আছে নাকি?
আছেইত—মরুভূমে কমল ফুটেছে!
একটি বিশুষ্ক নালে, দুটি পুণ্ডরীক দোলে
সুবাসে পূর্ণিত প্রাণ কাড়িয়া লতেছে
চিরতপ্ত মরুভূমে কমল ফুটেছে!

১৪

এত কালে মরুভূমি করি পর্য্যটন,
মৃগতৃষিকার ফাঁদে　শুষ্ক কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে
এখন পেয়েছি এক সুধার সদন!
যখন যন্ত্রণাভরে, প্রাণ ছাড় ছাড় করে
পৃথিবী আকাশ সম করি দরশন,
তখনি আকাশে আঁকা সুহৃদ রতন!

১৫

সোণার প্রতিমা মোর হৃদয়ের নিধি,
লজ্জার লেপনি দিয়ে, সরলতা মাখাইয়ে
নিভৃতে নির্ম্মাণ বুঝি করেছিল বিধি,
কোমলহৃদয়া সতী, প্রণয়ের প্রতিকৃতি,
দরিদ্র আনন্দময়ী সোহাগের নদী
সোনার প্রতিমা মোর হৃদয়ের নিধি!

১৬

ভ্রমি অনাবৃত দেহে হিমানীর শীতে,
নিদাঘ সন্তাপে পুড়ে　ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে
দিনান্তে যদ্যপি পাই সে মুখ দেখিতে!
দুর্গম কান্তারে থাকি যদি শশীমুখ দেখি,
কারাগারে বদ্ধ যদি হই তার সাতে
তথাপি স্বর্গের সুখ তুচ্ছ করি চিতে!

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী।
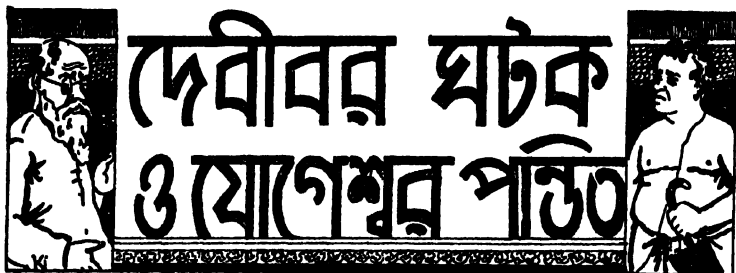
(মেল বন্ধন। তাহার সময় নিরূপণ)

আনুষঙ্গিক তৎকালিক সামাজিক অবস্থা

এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত একজনের দৌহিত্র। তদনুসারে এই দুইজন পরস্পর মাসতুত ভাই। যোগেশ্বর কুলীনপুত্র। দেবীবর বংশজ গোষ্ঠী সম্ভূত। সুতরাং সমাজমধ্যে দেবীবর অপেক্ষা যোগেশ্বর পণ্ডিতের মর্য্যাদা অধিক। যোগেশ্বর মুখ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। নানা দেশীয় ছাত্রগণকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। সেই জন্য তাঁহার উপাধি পণ্ডিত হয়। যোগেশ্বর সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে যে, তিনি অত্যন্ত আতিথেয়ী ছিলেন। নিজের দান অতি সঙ্গোপনে নির্ব্বাহ করাই তাঁহার ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার বদান্যতার বিষয় আপামর সাধারণের শ্রুতিগোচর ছিল না।

যোগেশ্বর পণ্ডিত একসময়ে যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া দেশভ্রমণে নির্গত হন। দৈবগত্যা একদিন ভ্রমণ উপলক্ষে মধ্যাহ্নে দেবীবরের ভবনে উপস্থিত হইলেন। যোগেশ্বরের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে দেবীবরের জননী শশব্যস্তে দ্রুতপদে আসিয়া যথাবিহিত স্নেহ সম্ভাষণ পুরঃসর অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা করিলেন। যোগেশ্বর বিনয়বচনে অতি নম্রভাবে তদীয় মাতৃষ্বসার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তিনিও যথাবিহিত আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক যোগেশ্বরকে কহিলেন, "বাছা জলপান কর, আমি তোমার জন্যে অন্নাদি প্রস্তুত করিতে যাই।"

যোগেশ্বর তদীয় মাতৃষ্বসার সেই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "মাসি, আমার মাতামহ আপনাকে যে কুলে সম্প্রদান করিয়াছেন, আমরা সে কুলে পদ প্রক্ষালনও করি না। অতএব আপনি আহারের জন্য আমায় বিশেষ অনুরোধ করিবেন না। আপনি মাসি, আপনার অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাটীতে স্বপাকে ভোজন করিলে গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। তাহাতে পাতক জন্মে। এবং মাসতুত

ভাই দেবীবরের গৃহে ভোজন করিলে আমাদিগের মর্য্যাদার হ্রাস হয়। সুতরাং আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সহজ ও সাধ্যায়ত্ত নহে।" এই বলিয়া যোগেশ্বর প্রস্থান করিলেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত যে সময়ে দেবীবর ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে দেবীবর দেশভ্রমণে নির্গত হন।

দেবীবর বাটী আসিয়া জননীকে অপ্রসন্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি স্বীয় মনঃক্ষুণ্ণের পূর্ব্বাপর সমস্ত কারণগুলি স্বীয় পুত্রের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "বাপু, যদি যোগেশ্বর আমার বাটীতে আসিয়া সাধ্য সাধনা পূর্ব্বক অন্ন দাও বলিয়া ভোজন করে, এরূপ কোন উপায় করিতে পার, তবেই প্রাণরক্ষা করিব, নতুবা আমার এ মর্য্যাদাহীন তুচ্ছজীবনে প্রয়োজন কি।" দেবীবর কহিলেন, "মাতঃ, ক্ষান্ত হও, মনের খেদ মনেই রাখ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অচিরেই তোমার মনোমালিন্য দূর করিব, যদি নিতান্তই অকৃতার্থ হই, তাহা হইলে তোমার নিকট এ মুখ দেখাইব না ও জীবন রাখিব না।"

দেবীবরের জননী কহিলেন, "বাছা তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। আমার পরামর্শ শ্রবণ কর; কালীর আরাধনা কর, সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবে।"

দেবীবর যখন দেবীর বর পাইয়া সিদ্ধ হন, তখনই তাঁহার নাম দেবীবর হয়। ইতিপূর্ব্বে ইঁহার অন্য এক নাম ছিল। সিদ্ধ হইলে তাঁহার সে নাম লোপ পায়। তিনি দেবীবর নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন। সুতরাং তাঁহার প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না। দেবীবরটী তাঁহার উপাধি স্বরূপ ধরা যায়।

দেবীবর বাক্‌সিদ্ধ হইয়া কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাঢ় ও বঙ্গের সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কুলাংশে কে কতদূর পরিশুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত আছেন, তাহা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিশেষ পর্য্যালোচনা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, কুলীনদিগের অধিকাংশই নবগুণবিহীন হইয়াছেন। তখন বিবেচনা করিলেন, আমার নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার এই প্রকৃত অবসর ও সময়।

তিনি সময় বুঝিয়াই সমস্ত ঘটক চূড়ামণিদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদিগের নিকট কুলীনদিগের দোষোল্লেখ পূর্ব্বক কৌলীন্য মর্য্যাদার পুনঃ সংস্কারের ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। সমস্ত কুলাচার্য্য একবাক্য হইয়া দেবীবরের অভিপ্রায়ের অনুকূল পক্ষে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদিগকে স্বপক্ষ পাইয়া দেবীবর দিনস্থির করিলেন।

যেদিন সভায় উপবিষ্ট হইয়া সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে সকলের গুণ বিচার পূর্ব্বক সভার অগ্রে মর্য্যাদা সংস্থাপন করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে হঠাৎ একটী দৈববাণী হইল যে, বৎস দেবীবর! তুমি যেদিন কৌলীন্যাদির নিয়ম

নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বিশেষ সভা করিবে সেদিন সমস্ত দিবসের জন্য কৌলীন্য বিষয়ে তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিবে না। তুমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সভার নির্দ্ধারিত দিবসে দশ দণ্ডকাল মধ্যে কুলমর্য্যাদা প্রদান বিষয়ে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী থাকিবে; নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে কুলমর্য্যাদা প্রদান বিষয়ে তোমার প্রভাব থাকিবে না।

দেবীবর দৈববাণীর প্রতি বিশেষ বিশ্বাস সহকারে কার্য্য করিবেন বলিয়া স্বপক্ষ ও বিপক্ষ মণ্ডলীর নিকট আকাশবাণীর কথা প্রচার করিলেন।

নির্দ্ধারিত দিন উপস্থিত হইল, ঘড়িয়াল ঘড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকিল। দেবীবর দোষ দেখিয়া একবিধ দোষাশ্রিত ব্যক্তিবর্গকে এক এক দল নিবদ্ধ করেন। তদনুসারে এক একটী মেল হয়। সমস্ত কুলীনকে ছত্রিশটী মেলে বিভক্ত করেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিতের কুল বিচারের সময় দেবীবরের মুখ হইতে নিম্নলিখিত কারিকাটী নির্গত হইয়াছিল। যথা—

শশে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদিচ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে কুলং॥

যোগেশ্বর পণ্ডিত খড়দহ মেলের প্রকৃতি। ইনি দেবীবরের সমসাময়িক লোক। কেননা তিনি দেবীবরের মাসতুত ভাই ও সমবয়স্ক। দেবীবরের বাটীতে অন্নগ্রহণ না করাতেই যোগেশ্বর প্রথমে নিষ্কুল হন। দেবীবর কেন যোগেশ্বরকে নিষ্কুল করিয়াছিলেন তাহা প্রথমে যোগেশ্বর অনুভব করিতে পারেন নাই। তৎপরে দেবীবরের অনুগ্রহে যোগেশ্বর পুনর্ব্বার কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, ইহা প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী।

শোভাকর ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী পরম পণ্ডিত হলায়ুধ ভট্টের বংশীয়, সুতরাং ইনি চট্টোপাধ্যায় কুলসম্ভূত।* ইনি দেবীবরের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। এই হেতু মনে করিলেন কুলমর্য্যাদা প্রাপ্তি বিষয়ে দেবীবরকে অবশ্য আমায় সর্ব্বপ্রধান করিতে হইবেক। তদনুসারে তাঁহার অন্তঃকরণে আর একটি ভাব উদয় হইল। সে ভাবটী এই, দেবীবর পরম পণ্ডিত ও সিদ্ধ ব্যক্তি। সিদ্ধ হইলেও সে সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে গুরুর নাম গ্রহণ পুরঃসর স্বস্তিবাচন করে। আমিই তাহার গুরু। আমি যদি সভার অগ্রে উচ্চাসনে আসীন হইয়া তাহাকে

---

*বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
ধ্রুবানন্দ মিশ্র ধৃত কুলপদ্ধতি।

সন্দর্শন দিয়া, তাহার প্রীতিবিধান করিতে পারি, তাহা হইলে সে অবশ্য গুরু দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিবে।

এই মনস্কামনা স্থির করিয়া সভার অগ্রে এক উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সভার অগ্রে সভ্যগণের বিনানুমতিতে উচ্চাসনে উপবেশন যে অতীব দূষ্য ইহা দেবীবর বিলক্ষণ জানিতেন, তদনুসারে তিনি গুরুর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। দেবীবর সভাপতি, সভাপতির ভাব দেখিয়াই সভ্যেরা মনে করিল দেবীবর ইহার অশিষ্টতা অবগত হইয়াছেন, সুতরাং এবিষয়ের উল্লেখ দ্বারা আমাদিগের অসৌজন্য দেখান উচিত নহে। তথাপি সকলেই কর্ণাকর্ণিপূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

শোভাকরের অশিষ্টতা হেতু দেবীবর যে বিরক্ত হইয়াছেন ইহা এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু পাছে লোকে বিদ্রূপ করে এজন্য আসন হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। দেবীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস দেবীবর, আমি তোমার গুরুদেব, যেন আমার মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানাস্পদীভূত হয়।"

শিষ্য গুরুর ঈদৃশ বিষম বাক্যের উত্তরে কিছু প্রতিশ্রুত হইতে পারিলেন না। গুরুদেবের নিরন্তর উত্তেজনায় কহিলেন, "প্রভো নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে বাগ্‌দেবী আমার মুখ হইতে কি বলাইবেন তাহা আমি অগ্রে কি প্রকারে স্থিরনিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি?"

এই সকল জনশ্রুতির মূল এই,—

ডাক দিয়ে বলে দেবীবর।
নিষ্কুল শোভাকর॥
ডাক দিয়ে বলে শোভাকর।
নির্ব্বংশ দেবীবর॥

মেলমালা।

এখন দেবীবর যাঁহাদিগের প্রতি কুলমর্য্যাদা প্রদান করিলেন ও যাঁহাদিগের কুলধ্বংস করিলেন, তাঁহারা কতকালের লোক তদনুসারে বিচার কর। নিম্নলিখিত ছয় ব্যক্তিকে সমকালীন ও সমান মেলের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারা যাইবে—

১। যোগেশ্বর পণ্ডিত।
২। দিনকর চট্টোপাধ্যায়।
৩। হরি বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

৫। ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। সুসেন মুখোপাধ্যায়।*

উল্লিখিত কয়েক মহাপুরুষের অধস্তন পুরুষের গণনা করিলে দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ সন্ততির অতিরিক্ত দেখা যাইবে না। এক্ষণে ত্রয়োদশ পুরুষের কাল একটা মোটামুটী ধর; প্রত্যেক ২৫ বৎসরে এক এক পুরুষের জন্ম ধরা যাইতে পারিবে। তাহা হইলে ২৫ × ১৩ = ৩২৫ বৎসরকাল পূর্ব্বে এই কয়েক মহাত্মা জীবিত ছিলেন।

এক্ষণে শালিবাহনের শক ১৭৯৭ উহা
হইতে ৩২৫ বৎসর
অন্তর কর।

১৪৭২ দেখিবে

যদি বার পুরুষ ধর, তাহা হইলে ৩০০ তিন শত বৎসর অন্তর কর ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইবে এবং দেখিবে যে পঞ্চদশ শকাব্দার শেষভাগে দেবীবরের কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। এখন দেখ ঐ সময়টি কেমন সময়; তখন কোন্ ভাবের স্রোত চলিতেছে; তখন নবদ্বীপ নিবাসী নিমাই ভূমণ্ডলে চৈতন্যদেব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তখন বঙ্গসমাজের জাতিভেদ উঠাইবার প্রস্তাব হইতেছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভিনব মত সকল হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে সমভাবে প্রচারিত হইতেছে। চৈতন্যদেব লোকান্তরিত হইয়া তদীয় কীর্ত্তির গুণদোষের স্তুতি-নিন্দা শ্রবণ করিতেছেন। যথা—

---

*যোগেশ্বরো, দিনেশশ্চ, হরিবংশধরস্তথা।
পঞ্চাননো সুসেনশ্চ ষড়েতে টেকমেলকাঃ॥

ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

পঞ্চাননে হয় কুল দিনকর বংশে।
সুসেন হয়েন মূল নৃসিংহের অংশে॥
সুসেন বলিলে হয় ত্রিযোগের সঙ্গা।
জগদানন্দের সঙ্গে আইসে যে গঙ্গা॥
পঞ্চানন পূর্ব্বে ছিল সেই অংশে মেলা।
খড়দা যোগেশ্বর বংশে কুলেতে বিরলা॥
হরিবন্দ্য গয়গড় পাল্টী মূল হয়।
বংশধর ভগীরথ জানহ নিশ্চয়॥
যোগেশ্বর খড়দহে বংশ সার হয়।
চট্টবংশ দলেতে দিনেশ কুল রয়॥

(বলাগড়ী নিবাসী চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কুলচন্দ্রিকা)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী ॥
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের বিধান।
চৌদ্দশত ছাপ্পান্নে তাঁহার অন্তর্ধান ॥
চৈতন্য চরিতামৃত।

সে সময়ে বঙ্গসমাজের সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত। যখন স্মার্ত্ত-চূড়ামণি বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বর্গবাসী হইয়া বঙ্গবাসীদিগের নিকট মহর্ষি মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছেন, যে সময়টী আর একজন মহাপুরুষের কাল বলিয়া বঙ্গবাসীদিগের নিকট বড় আদরের ও গৌরবের সময়, তখন কাণা ভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) পক্ষধর মিশ্রের নিকট পাঠ সমাপ্তি পূর্ব্বক মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্রের স্রোত ফিরাইয়া নবদ্বীপে আনয়ন করিয়া দেবলোকে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় নৈয়ায়িকদিগের মুখ হইতে স্বীয় প্রশংসা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহারা শিরোমণিকে গৌতমাদি অপেক্ষা কুশাগ্রবুদ্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

উপরি কথিত মহোদয়দিগের মত সংস্থাপিত হইলেই দেবীবরের মেল বন্ধন ও কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়।

এই কথার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য আমরা কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের অধস্তন বংশাবলীর উল্লেখ করিব।

বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের ত্রয়োদশ পর্য্যায় অর্থাৎ অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে কায়স্থদিগের মধ্যে সমান পর্য্যায়ে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

এইটী দেবীবরের দৃষ্টান্তে হয়। পুরন্দর বসু এই নিয়ম স্থির করেন। তিনি দশরথ বসু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ অন্তর। দেবীবরের পূর্ব্বে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত ছিল। দেবীবরের সময় হইতে সমান সমান পর্য্যায়ের কন্যা-পুত্রে বিবাহের ব্যবস্থা হয়। পিতা পরে পুত্র ও পৌত্র পিতা পিতামহের সমান পর্য্যায় থাকিয়া কুলরক্ষা করিবার অধিকারী হন।

এই সময়েই কুলীনদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় দলে আবার অবান্তর ভেদ হয়। সেটী এই ;—আর্ত্তি, ক্ষেম্য ও উচিত। ১ আর্ত্তিঃ—শিরোভূষণং। ২ ক্ষেম্যঃ—পদভূষণং। ৩ উচিতঃ—সমানং। ঘটকবিশারদ দেবীর পিতৃপর্য্যায়ের লোকের সহিত কন্যাদানকে আর্ত্তি শব্দে ব্যাখ্যা করেন। পুত্র পর্য্যায়ের সহিত কন্যাদানকে ক্ষেম্য শব্দে নির্ণয় করিয়াছেন। সমানে সমানে কন্যাদানকে উচিত শব্দে নির্দ্দেশ

করেন। আৰ্ত্তিকুল হইলে শিরোভূষণরূপে মান্য হন। ক্ষেম্যকুল হইলে পাদভূষণ রূপে পরিগণিত হন। উচিতকুল হইলে দোষ গুণ কিছুই হয় না।*

দেবীবরের সময়েই কিছুকাল এরূপ সমান ঘরের বরে আদান প্রদান চলিয়াছিল। পরে এই নিয়মানুসারে চলা, কুলীনদিগের পক্ষে অতি সুকঠিন বিবেচিত হইলে অন্যান্য ঘটক বিশারদেরা সমান পর্য্যায়ের দান উত্তম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যথা—

সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমং।
কন্যাভাবে কুলত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরম্পরং॥

রাঢ়ীয় কুলীনগণ পর্য্যায় সমান রাখিবার জন্য বর দিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কুলকৰ্ত্তা নিজের মর্য্যাদা পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতৃপুত্রদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পিতা, পিতামহ ও পিতৃব্যদিগের ন্যায় সম্মানাস্পদীভূত পদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গুণদোষ বরদাতার স্কন্ধে পতিত হইতে লাগিল। যথা—

গ্রহণাৎ স্বস্য পুত্রস্য বরস্যাভিমতস্যচ
পৌত্রস্য ভ্রাতৃপুত্রস্য কুলকর্ত্তুর্ভবেৎকুলং।

কুলদীপিকা।

ব্রাহ্মণদিগের এই দৃষ্টান্ত অনুসারে পুরন্দর বসু কায়স্থকুলের সম্মান পর্য্যায় লইয়া কুলীনদিগের বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

কান্যকুব্জাগত কালিদাস মিত্রের অষ্টম পুরুষে ধুই গুঁই নামক দুই সন্তানের যৌবনকালে সমাজবদ্ধ হয়।† তাঁহাদিগের সমাজের নাম বড়িষা টেকা। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের আট দশ পুরুষ গত হইলে কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপিত হয়। এবং কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপনের ত্রয়োদশ পুরুষ গত হইলে কায়স্থদিগের মধ্যে প্রকৃত সোপান গণানুসারে সপর্য্যায়ে বিবাহের নিয়ম হয়। সুতরাং পূর্ব্বাপর দুইটীকে সমষ্টি করিলে তৎকালে কান্যকুব্জদিগের ২৩ ত্রয়োবিংশতি পুরুষ হইয়াছে ধরিতে হয়। কায়স্থদিগের পর্য্যায় বন্ধন হইতে এইক্ষণে কাহার ১২ বার, কাহার বা ১৩ তের পুরুষ হইয়াছে। এক্ষণে ঐ তের পুরুষের সঙ্গে যোগ করিলে তখন ইহাদিগের বার পুরুষের সময় ঠিক করিলে নিশ্চয় হইবে যে, ঘটক বিশারদ দেবীবর ৩০০ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কুলীনদিগের মেল বন্ধন করেন।

---

* পিতৃস্থানং ভবেদার্ত্তিঃ পুত্রস্থানঞ্চ ক্ষেমকং।
উচিতশ্চ সমানং স্যাৎ ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে।

দেবীবর কারিকা।

† শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থদিগের কৌলীন্য দেখ।

আর একটী প্রমাণ দেখিলেও জানা যাইবে যে, দেবীবরের মেল বন্ধন ঐ সময়েই হইয়া থাকিবে।

বারেন্দ্রকুলে অদ্বৈত প্রভুর জন্ম হয়। তিনি চৈতন্যের সহচর ও অভেদাত্মা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার আর এক সঙ্গী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। অদ্বৈত মহাপ্রভুর আট সন্তান হয়, তন্মধ্যে অচ্যুত গোস্বামী সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইঁহাকে অদ্বৈত প্রভু বিশেষ স্নেহ করিতেন। এক সময়ে এমন বলিয়াছিলেন যে,—

অচ্যুতের যেই মত সেই মোর সার,
আর সব পুত মোর হৌক ছারখার;
অদ্বৈতবাক্য চৈতন্য-চরিতামৃত।

এই সময় হইতেই ইঁহাদিগের কুলের গৌরব হয়। তৎকালে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া গণনীয় হন। ইঁহাদিগের মেল (পটী) বন্ধনের পারিপাট্য এই সময় হইতেই হয়। এক্ষণে অচ্যুত গোস্বামী হইতে গণনা করিলেও দেখা যায় যে, তৎকুলে ধারাবাহিক ১১।১২ পুরুষ হইয়াছে। ইনি আবার নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। দেবীবর বীরভদ্র সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বীরভদ্রী থাকের অন্তর্গত করেন। বীরভদ্রের জীবনকাল গণনা করিলে আমরা তাঁহাকে ৩২৫ সওয়া তিনশত বৎসর পূর্ব্বে দেখিতে পাই সুতরাং দেবীবরের মেল বন্ধনের সময় ৩২৫ সওয়া তিন শত বৎসরের অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে না। বরং পরবর্ত্তী হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এখন দেখ, সে সময় আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ রাজা ছিল কি না; সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে কি না; তদনুসারে দেখা যায় যে, তৎকালে বঙ্গদেশে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ রাজার নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। তৎকালে বাঙ্গালা দেশে যশোহরে প্রতাপাদিত্যের অত্যন্ত প্রভাব বর্ণিত দেখা যায়। প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন।

তৎকালে ভারতের রাজধানী হস্তিনা নগরের সিংহাসনে মুসলমান ভূপতি আক্বর শা অধিরূঢ় ছিলেন।

দেবীবর কুলীনদিগকে ৩৬ প্রধান শাখায় বিভক্ত করেন। যথা—

১ ফুলিয়া	৮ বাঙ্গাল পাশ
২ খড়দা	৯ গোপাল ঘটকী
৩ বল্লভী	১০ ছয়ান রেন্দ্রী
৪ সর্ব্বানন্দী	১১ বিজয় পণ্ডিত
৫ সুবাই	১২ চাঁদাই
৬ আশ্চর্য্য শেখরী	১৩ মাধাই
৭ পণ্ডিত রত্নী	১৪ বিদ্যাধরী

১৫ পারিহাল
১৬ শ্রীরঙ্গ ভট্টী
১৭ মালধীর খানী
১৮ কাকুস্থী
১৯ হরি মজুমদারী
২০ শ্রীবর্দ্ধনী
২১ প্রমোদনী
২২ দশরথ ঘটকী
২৩ শুভরাজ খানী
২৪ নড়িয়া
২৫ রায় মেল
২৬ চট্ট রাঘবী
২৭ দেহাটী
২৮ ছয়ী
২৯ ভৈরবী ঘটকী
৩০ আচম্বিতা
৩১ ধরাধরী
৩২ বালী
৩৩ রাঘব ঘোষাল
৩৪ শুঙ্গোসর্ব্বানন্দী
৩৫ সদানন্দ মানী
৩৬ চন্দ্রবতী

এই ছত্রিশটী মেলের মধ্যে ফুলিয়া মেলের মান্য অধিক ; তদনুসারে ফুলিয়া গ্রামেরও মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ; কৃত্তিবাস পণ্ডিত স্বীয় রামায়ণের মধ্যে ফুলিয়া গ্রামকে সকল স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সে কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি ? কৌলীন্য মর্য্যাদায় ফুলিয়া সর্ব্বাগ্রগণ্য স্থান সুতরাং স্বর্গ-তুল্য। যথা—

স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গায় দ্বিজ মনে অভিলাষ॥

অরণ্য কাণ্ড।

কৃত্তিবাস যখন ফুলিয়া গ্রামের নামে আপনার মনকে প্রফুল্ল মনে করিতেছেন, তখন দেবীবরের মেল বন্ধনের পরেই ফুলিয়া গ্রামের প্রভাব হইয়াছিল ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তাঁহার রামায়ণে নবদ্বীপকে সপ্ত দ্বীপের সার বলিয়া বর্ণন করিতেন না। চৈতন্য রঘুনন্দন কাণা ভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) প্রভৃতির জন্মস্থান বলিয়াই নবদ্বীপকে সপ্তদ্বীপের সার বলিয়াছেন। এই নিয়ম ধরিলেই ফুলিয়া গ্রামকে মেল বন্ধনের পরে প্রসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিতে হয়। ১৪৫৬ শকে চৈতন্যের তিরোভাব হয়। ঐ কাল হইতে অন্ততঃ এক পুরুষের কাল গত না হইলে তাঁহাকে দেবতা মনে করা সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং ১৪৫৬ সহিত অন্ততঃ ২৫ বৎসর যোগ করিতে হয়। ঐ কালটি যোগ করিলে ১৪৮১ হয়, এই সময়ে রামায়ণ রচনার সময় ধরিলে সর্ব্বাংশের একতা হইতে পারে। ১৪৮১ + ৭৮ বৎসর যোগ করিলে ১৫৫৯ খৃঃ অব্দ হয়। এক্ষণে খ্রীষ্টীয় ১৮৭৫, এক্ষণে এই অব্দ হইতে ৩২৫ বৎসরকাল পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে মেল বন্ধনের

পরবর্ত্তী ১২।১৩ পুরুষের কাল পাওয়া যাইবে। এই কাল পাইলেই জানা যায় যে, কৃত্তিবাস ঐ সময়ে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রামায়ণের নবদ্বিপাদীর প্রশংসার সার্থকতা থাকে। যথা—

গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হইয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া॥
সপ্ত দ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম॥
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা নাম সপ্তগ্রাম॥
সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ সমান।
সেখান হইতে গঙ্গা করিলেন প্রয়াণ॥*

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে কৃত্তিবাস মেল বন্ধনের পর রামায়ণ রচনা করেন।

এরূপ অনুমান যে নিতান্ত ভ্রমসংকুল নহে, তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য কবিকঙ্কণের চণ্ডী রচনার সময়ের উল্লেখ করিতে পারি। মুকুন্দরাম নিজগ্রন্থে মানসিংহের প্রশংসা করিয়াছেন। মানসিংহ ১৫১১ শকে (খৃঃ ১৫৮৯ অব্দে) বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদ প্রাপ্ত হন। কবিকঙ্কণের গ্রন্থে তাঁহার মহিমা যখন বর্ণিত হইয়াছে তখন কবিকঙ্কণের চণ্ডী রচনার সময় ১৫৮৯ খৃঃ অব্দ ধরিতে হয়। ইহার ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার সময় নির্দ্ধারণ করিলে কৃত্তিবাসকে আমরা ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দেখিতে পাই। এই সময়েই দেবীবরের মেল বন্ধন হয়, দেবীবরের দ্বারাই ফুলিয়ার নাম বিখ্যাত হয়। তৎকালে ফুলিয়া-নিবাসী কৃত্তিবাসের স্বগ্রামের প্রশংসা করা অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; বরং স্বদেশানুরাগেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, কবিকঙ্কণে যে সংস্কৃত শ্লোকটি আছে, তাহার অর্থ করিলে কবিকঙ্কণের রচনার সময় ১৪৯৯ শাক হয়। যথা—

শাকে রসরস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥

এ শ্লোকটিকে কবির নিজের রচিত বলিয়া প্রতীতি করিতে গেলে কবিকঙ্কণের স্ববচনের বিরোধ হয়। যথা—

ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ, গৌড় বঙ্গ উৎকল সমীপে।
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাত পায় মামুদ শরীপে॥
কবিকঙ্কণ।

---

* আদিকাণ্ড সগরবংশ উদ্ধার রামায়ণ।

মেল বন্ধনের পর ধারাবাহিক পুরুষ গণনা করিলে ১১।১২ পুরুষের অতিরিক্ত দেখিতে পাই না। সুতরাং এখন হইতে ৩০০ শত বৎসর মাত্র কাল অগ্রবর্ত্তী হইলে কৃত্তিবাসকে কবিকঙ্কণের সমকালবর্ত্তী বলিতে হয়, কারণ এখন ১৭৯৭ শক। ইহা হইতে ৩০০ বৎসর অন্তর করিলে ১৪৯৭ শক হয়। এটী যদি সত্য বল, তবে কি কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস সমকালীন লোক? বস্তুতঃ তাহা নহে। কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ অপেক্ষা ৩০।৪০ বৎসরের অধিক অগ্রবর্ত্তী কালের লোক। কৃত্তিবাসকে কেন আমরা কবিকঙ্কণের ৩০।৪০ বৎসর অগ্রবর্ত্তী বলি, তাহার কারণ এই, কৃত্তিবাসের পূর্ব্বে কোন বঙ্গীয় কবি ত্রিপদী ছন্দ রচনা করেন নাই। উক্ত মহোদয় জয়দেব প্রণীত নিম্নলিখিত গীতকে আদর্শ করিয়া গীত ত্রিপদী রচনা করেন। পূর্ব্বকালে কোন নূতন বিষয় অত্যল্পকাল মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে পারিত না। তৎকালে একটি বিষয় সর্ব্ববাদিসম্মত করাইতে হইলে ন্যূনকল্পে ৩০।৪০ বৎসর লাগিত। তদনুসারেই কৃত্তিবাসকে আমরা মুকুন্দরামের ৩০।৪০ বৎসর অগ্রবর্ত্তী কহিতে ইচ্ছা করি। কৃত্তিবাসের পরেই মুকুন্দরাম লঘু ত্রিপদী ছন্দ গ্রহণ করেন। ইতি পূর্ব্বে অন্য কেহ গ্রহণ করেন নাই।

গীত গোবিন্দ {

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং, পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখরমধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং, রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলং॥

লঘুত্রিপদী যথা—

রাবণ সংহার, জানকী উদ্ধার
কর এই উপকার।
তোমার উদ্যোগ, নহিলে দুর্য্যোগ,
কে লইবে হেন ভার॥
রাবণ দুরন্ত, কর তার অন্ত,
অনন্ত যশঃ প্রকাশ।
গীত রামায়ণ, করিল রচন,
ভাষা কবি কৃত্তিবাস॥

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

সুতরাং ঐ সংস্কৃত শ্লোকটী আমরা কবিকঙ্কণের রচিত বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা নিতান্ত উহাকে কবির রচিত বলেন, তবে উহাকে গ্রন্থরচনার সূত্রপাতের কাল ধরিতে হইবে।

শক ১৪৯৭ (খ্রীঃ অঃ ১৫৭৫) ইহার প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে একরূপ নিশ্চয় হইল যে, দেবীবর ও যোগেশ্বর ৩২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তৎকালে চৈতন্য অবতার বলিয়া কথিত হইতেছেন। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বনামক স্মৃতির নিয়মানুসারে বঙ্গসমাজে আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সময়েই শিরোমণির দীধিতি গ্রন্থের সবিশেষ আলোচনা দ্বারা ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চার প্রকৃত পথ পরিচিত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয়েরা অন্যদেশীয়দিগের নিকট বিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত হন। তদবধিই চৈতন্যের দৃষ্টান্তানুযায়ী সাধারণ লোকদিগের মনে অদ্বৈতবাদের বীজ রোপিত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয় জাতিচতুষ্টয়ের মধ্যে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময় হইতে সন্ন্যাস ধর্ম্ম যে অন্য বর্ণের বিশেষ প্রতিসিদ্ধ নহে, ইহা আপামর সাধারণ সকলেরই প্রতীতিযোগ্য হয়। এই সময়েই প্রসিদ্ধ মন্ত্রী মুসলমান বংশোদ্ভব রূপ সনাতনের দৃষ্টান্ত অনুসারে অনেক মুসলমান বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুদিগের তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। সর্ব্বজাতীয় প্রজাদিগকে সমভাবে দেখিতে হয়, ইহা এই সময়েই প্রথমতঃ মুসলমান ভূপতিদিগের হৃদ্বোধ হয়। এই সময়েই হিন্দুগণের বুদ্ধিমত্তা মুসলমানদিগের নিকট প্রতিভাশালিনী বলিয়া আদৃত হয়। এই সময়েই হিন্দুদিগের মাথা-গণতি কর (জীজীয়া নামক কর) ও তীর্থযাত্রার শুল্ক রহিত হয়। এই সময়েই হিন্দু ভূপতি তোডরমল্ল কর্ত্তৃক কর সংগ্রহের সুব্যবস্থা হয়। এই সময়েই শস্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রা দ্বারা কর প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

এই সময়েই—

শশে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি
সুতো যদিচ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে কুলং।

এই পাঠের পরিবর্ত্তে "তদা যোগেশ্বরেঽকুলং" এইরূপ পাঠ স্থির হয়। ব্যাকরণ অনুসারে পদের অন্তঃস্থিত একারের পর অকারের লোপ পায়, এই সূত্র ধরিয়া দেবীবরের বাক্য সমর্থন পূর্ব্বক যোগেশ্বরের কুলরক্ষা হয়।

দেবীবর বাঙ্গাল ঘটক ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান, তাঁহার মেল বন্ধন দ্বারাই তিনি লোক সমাজে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। দেবীবরের পিতার নাম সর্ব্বানন্দ ঘটক, পিতামহের নাম (লক্ষণ) লখাই। প্রপিতামহের নাম আনো বা অনন্ত। বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম সঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্কেত সাগরের ভাই।

কেহ কেহ বলেন বারেন্দ্র কুলের মধু মৈত্রেয়, ধেয় (ধেঞী) বাগ্‌চী, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী, মণ্ডল মিশ্র প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোক, দেবীবরের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

মধু মৈত্রেয় হইতে কাপের সৃষ্টি। ইনি শান্তিপুরের গোস্বামীদিগের ঘরে বিবাহ করেন। ধেঞ্ৰী বাগ্‌চী ইঁহার ভগিনীপতি। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র-বংশে কংশনারায়ণ কুলাচার্য্য একজন প্রবল প্রতাপান্বিত সমৃদ্ধিশালী জমিদার, মণ্ডল মিশ্র বারেন্দ্র বংশের কুলাচার্য্য ; উদয়নাচার্য্যের লীলাবতীনাম্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তদ্দ্বারা মধু মৈত্রেয়ের কুল রক্ষা পায়। তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রগণ কাপ হন। শান্তিপুরের পক্ষের সন্তানগণ কুলীন থাকিলেন। মধুমৈত্রেয় অদ্বৈতের ভগিনীপতি। অদ্বৈতের পিতার নাম নৃসিংহ লাড়ুলী। নৃসিংহের পুত্র অদ্বৈতের সহচর। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র। দেবীবর বীরভদ্রের সমকালীন লোক, সুতরাং দেবীবরকে আমরা চৈতন্যের পরবর্ত্তী বলি।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

নিবুক্ নিবুক্ প্রিয়ে! দাও তারে নিবিবারে
আশার প্রদীপ;
এই ত নিবিতেছিল, কেন তারে উজ্জ্বলিলে,
নিবুক সে আলো, আমি
ডুবি এই পারাবারে।

২

কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ, যুগ কত,—
কত যুগান্তর;
এই আলো লক্ষ্য করি, জীবন সিন্ধুর নীরে,
দিবস যামিনী প্রিয়ে!
ভাসিয়াছি অনিবার!

৩

এখন সে আশা-আলো, হায়! দূর দরশন,
সুদূর!—স্বপন!
কতবার পাই পাই, উন্মত্ত অন্তরে ধাই
চকোরের আকিঞ্চন,
যথা চন্দ্র-পরশন।

কিবা সুখ, কিবা দুখ, কিবা দেশ দেশান্তরে
জাগ্রতে নিদ্রায়,—
স্থির নেত্রে অনুক্ষণ, করিয়াছি দরশন,
এই আশা-আলো প্রিয়ে;
হায়রে! বিষাদ ভরে।

৫

প্রচণ্ড তপন-ত্রাস, কালের তিমিরে হায় !
এই ক্ষীণালোক,
হয়ে ক্রমে ক্ষীণতর হতেছিল নির্ব্বাপিত,
কেন অকরুণ প্রাণে
জ্বালাইলে পুনরায় ?

৬

নিবুক্—নিবুক্ প্রিয়ে, দাও তারে নিবিবারে,
জ্বালিও না আর ;
উন্মত্ত জলধিরূপ, উন্মত্ত জীবন-জলে,
অস্ত যাক্ শেষ তারা,
হক্ সব অন্ধকার !

৭

"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়—"
জানি প্রিয়তমে !
"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়,"
কিন্তু সে পাষাণ মন
আশা ছাড়িবার নয়।

৮

প্রেমের অমর বর্ণে, আশার কোমল করে,
চিত্রিব যে ছবি,
কালের অনন্ত জলে, আজীবন প্রক্ষালনে,
পাষাণ মনের ছবি
প্রক্ষালিতে নাহি পারে।

৯

আশার আলোকে যেই, বিশ্ব-বিনোদিনী ছবি
পড়েছে পাষাণে,
পাষাণ হৃদয়ে ধরি, ভাসি আশালোক চেয়ে
আশাময়ী আলিঙ্গনে
তরলিত হয় যদি।

১০

কি সে আশা ?—কার ছবি ? জীবন কাহার ধ্যান
বলিব কেমনে ?

বলিব কেমনে হায়!　　প্রেয়সি তোমার কাছে
আশা, তব ভালবাসা;
আশাময়ী—তুমি প্রাণ?

১১

ক্ষমা কর প্রিয়তমে,　　দুরাশয়ে মত্ত আমি,
উন্মত্ত পামর;
ক্ষমাকর দয়াময়ি,　　বিদীর্ণ-হৃদয় জনে,
ক্ষমা কর ক্ষণপ্রভা!
উন্মত্ত-প্রলাপবাণী।

১২

হায় যেই আশা স্বপ্ন,　　অন্তর অন্তরে মম
ছিল লুক্কায়িত;
কেহ না জানিত যাহা,　　বিনা সে অন্তর-যামী,
আদরে রাখিয়াছিনু
দরিদ্রের ধন সম।

১৩

"পাষাণ মানব মন,　　সময়েতে সব সয়—"
শুনিলাম যবে
শোণিতে বিজলি ঝলি,　　হৃদয় বিদীর্ণ হলো,
আজি সেই স্বপ্নকথা
হইল জগত ময়।

১৪

নির্ব্বাপিতপ্রায় আশা,　　আবার হইল আজি
দ্বিগুণ উজ্জ্বল!
আবার পাষাণে প্রিয়ে,　　তব চিত্র দেখা দিল,
জীবন-সিন্ধুর জল
হাসিল আলোকে সাজি।

১৫

কিন্তু বৃথা আশা প্রিয়ে,　　যাবে দিন যাবে মাস,
বর্ষ যুগান্তর;
ফলিবে না আশাময়,　　জীবনের এই তীরে,
কিন্তু অন্য তীরে, প্রিয়ে!
পুরাইব অভিলাষ!

এই উনবিংশ শতাব্দীতে মনুষ্যের অসীম ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই ক্ষমতা কেবল মাত্র বুদ্ধি সম্ভূত, বস্তুতঃ শারীরিক বলে মনুষ্য অনেক জন্তু অপেক্ষা হীনকল্প। কত শত বৎসরে মনুষ্যবুদ্ধি চালিত ও মার্জ্জিত হইয়া যে বাষ্পীয় কল ও তাড়িতবার্ত্তাবহ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? মনুষ্যের আদিম অবস্থার কোন পুরাবৃত্ত নাই। মনুষ্যজাতি এতকাল পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে, তাহার সহিত তুলনায় ঐতিহাসিক কাল গতকল্য আরম্ভ হইয়াছে বলিলেও অযথা উক্তি হয় না। যে সকল লেখকেরা মনুষ্য সৃষ্টি খ্রীষ্ট জন্মের কেবল কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভূতত্ত্ব-শাস্ত্র দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মনুষ্যজাতি শত শত শতাব্দী পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল।

কোন এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতীয় অধিকতর সভ্য লোকের বিনা সাহায্যে উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারে কি না, এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, সভ্যতা ঈশ্বর প্রদত্ত; মনুষ্য হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অসভ্য হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে অনেকে বলেন যে, অসভ্যতাই মনুষ্যের আদিম অবস্থা ও কোন না কোন সুযোগ পাইয়া, মনুষ্য ক্রমে ক্রমে আপন মানসিক বলে সভ্যপদারূঢ় হয়। এই দুই মতের মধ্যে কোনটি সঙ্গত তাহা মীমাংসা করা কঠিন। লিখিত ইতিহাস অতি সামান্য কাল অর্থাৎ প্রায় ২৫০০ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে ও আফ্রিকা ও আমেরিকার অসভ্যজাতিদিগের সহিত ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রায় ৪০০ বৎসর ঘটিয়াছে। অধিকন্তু যে সময় অসভ্য জাতীয় লোকের সহিত সভ্যজাতীয় লোকের সাক্ষাৎ হয়, সেই সময় হইতেই অসভ্যজাতির অবস্থা পূর্ব্বমত থাকে না, সুতরাং ইতিহাস বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপরোক্ত দুই মতের কোন এক মতের পোষকতা করা সুকঠিন। পরন্তু বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে যে স্থানে কোন অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক নাই, সেই সেই স্থানে মনুষ্যের বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতা উত্তরোত্তর

পরিপক্কতা লাভ করিতেছে। ঐতিহাসিক কালের প্রথমে যদিও গ্রীক্, রোমক ও হিন্দু জাতীয়েরা অনেক বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল কিন্তু অধুনাতন ইউরোপীয়-দিগের সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে না। যদি মনুষ্যজাতির ক্রমশঃ মানসিক উন্নতি স্বীকার করা যায় তবে ইহাও স্বীকার্য্য হইতে পারে যে, আদিম মনুষ্য ঐতিহাসিক কালের মনুষ্যাপেক্ষা বুদ্ধি ও মানসিক বলে অনেকাংশে হীনকল্প ছিল। অকাট্য প্রমাণের দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আদিমাবস্থার মনুষ্যজাতিসমূহ নিঃসহায় ও আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল। তখন পৃথিবীতে এক প্রকার পশ্বাদির রাজত্ব ছিল। তখন আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্যের যত সময় অতিবাহিত হইত। যে মানসিক বলে মনুষ্য সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই মনের উন্নতির জন্য তাহার কিছুমাত্র সাবকাশ ছিল না।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মনুষ্যের আদিমাবস্থার কোন লিখিত পুরাবৃত্ত নাই। কিন্তু পুরাকালিক মনুষ্যের যে সকল চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা তাহাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। বর্ত্তমান শতাব্দীতে অনেক ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা সেই তমসাবৃত কালের অনেক বিষয় আলোকে আনিয়াছেন। অতি পূর্ব্বকালে মানবজাতি বাটীনির্ম্মাণকৌশল জানিত না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না থাকায় গিরিগুহায় বাস করিত; ক্রমে পর্ব্বতাবৃত স্থান সকল অধিকৃত করিয়াছিল ও সুবিধামত বিল ও হ্রদে দ্বীপ নির্ম্মান করিয়া তথায় বাস করিত। এই সকল গিরিগুহা প্রভৃতি আদিম বাসস্থানে ও তাৎকালিক সমাধি মন্দির সমূহে ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির দ্বারা আদিম মনুষ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ডারউইন, হুক্স্লি প্রভৃতি কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের মতে মনুষ্য বানর জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিমূলক তাহা স্থির করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু মনুষ্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহাই উপলব্ধ হয় যে মনুষ্য ও বানর স্বতন্ত্র জাতি। মনুষ্য বানর হইতে উৎপন্ন হয় নাই, অথবা বানর মনুষ্যের সন্ততি নহে। ঐতিহাসিক কালে বা তৎপূর্ব্বে বানরের অবস্থা যে কখন উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। বানর চিরকালই শাখামৃগ আছে। তাহার হস্ত পদাদির গঠন স্বতন্ত্র। বানর কখনই অগ্নির ব্যবহার জানে না ও শিখিতেও পারে না, বানর কখনই রন্ধন-পদ্ধতি শিখিতে পারিবে না ও এপর্য্যন্ত আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিল না। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, মনুষ্যের উন্নতির ইয়ত্তা নাই। প্রথমে মনুষ্য হীনবল নিঃসহায় কেবল আত্মরক্ষায় ও আত্মপোষণে

সকল সময় অতিবাহিত করিত। অতি আয়াসে ও বহুকষ্টে দিন দিন বন্য পশুর অপক্ক মাংসে উদর পূরিত করিত, সময় বিশেষে মনুষ্য-মাংস বা শৃগাল ও ইন্দুরের মাংস তাহার অভক্ষ্য ছিল না। ক্রমে অগ্নির আবিষ্ক্রিয়া হইল, তখন দগ্ধ মাংস ভোজন, প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্র ও তৈজসাদির গঠন ও ব্যবহার, ও পশ্বাদি পালন আরম্ভ হইল। তৎপরে মিশ্র ধাতুর ব্যবহার ও কৃষিকার্য্যের আরম্ভ, শেষে লৌহের আবিষ্ক্রিয়া ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি। গুহাবাসী মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে শিকারী, পশুপালক, কৃষিজীবী হইয়া শেষে বাহ্যিক সমস্ত বিষয়ে নিরুদ্বেগ হইয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছে। মনুষ্য প্রথমে হীনবল ও নিঃসহায় ছিল, এক্ষণে মনুষ্য পৃথিবীর অধিপতি। জ্ঞানবলে মনুষ্যের অবস্থার আরও যে কত উন্নতি হইবে তাহা কে বলিতে পারে ?

ইউরোপখণ্ডে গিরিগুহা প্রভৃতি পূর্ব্বকালিক মনুষ্যের বাসস্থানে ও সমাধি-মন্দিরে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, আদিম মনুষ্যের পুরাবৃত্ত দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, প্রথম প্রস্তর কাল, দ্বিতীয় ধাতু কাল। ইউরোপ সম্বন্ধে এই দুই কালের কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব উপসংহার করা যাইতেছে।

১ম প্রস্তর কাল। এই কালে কোন ধাতুর আবিষ্ক্রিয়া হয় নাই। মনুষ্য ধাতুর ব্যবহার জানিত না। এই কালের যে সকল অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা সমুদায় প্রস্তর নির্ম্মিত। কোন কোন অস্ত্র পশ্বাদির অস্থি বা শৃঙ্গে নির্ম্মিত। এই কাল তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথম কালে ম্যামথ অর্থাৎ কেশর যুক্ত হস্তী ও গুহাস্থিত ভল্লুক, ও অন্যান্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীবসকল বর্ত্তমান ছিল। এই সকল জন্তু এক্ষণে পৃথিবী হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু এককালে তাহারাই ইউরোপের অনেক দেশের অধিকারী ছিল। মনুষ্য তাহাদের ভয়ে সশঙ্কিত থাকিত ও অতি কষ্টে সামান্য প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রের দ্বারা আত্মরক্ষা করিত। এই সময় কেবল গিরিগুহাই মনুষ্যের বাসস্থান ছিল। দ্বিতীয় কালে কেশরযুক্ত হস্তী প্রভৃতি বড় বড় পশুর চিহ্ন আর লক্ষিত হয় না। কিন্তু সমস্ত ইউরোপ তখনও হিমপ্রধান দেশ ছিল। বেনডিচর প্রভৃতি যে সকল পশু এক্ষণে হিমপ্রধান দেশে আশ্রয় পাইয়াছে, এই সময়ে তাহারা ইউরোপের প্রায় সকল দেশে বিচরণ করিত। এই কালে মনুষ্য পূর্ব্বাপেক্ষা নির্ভয় হইয়াছিল। গিরিগুহা ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের আবৃত স্থানে অথবা হ্রদমধ্যে দ্বীপ নির্ম্মাণ করতঃ তথায় কাষ্ঠ ও চর্ম্ম নির্ম্মিত কুটীর প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। এই কালের অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রস্তর ও বেনডিচরের শৃঙ্গনির্ম্মিত দেখা যায়। এই কালে শিকারো-পযোগী অনেক অস্ত্র দেখা যায়, বোধ হয় এই সময়ে মনুষ্য শিকারে বিশেষ পটু

ছিল। তৃতীয় পোষিত পশুর কাল। এই কালে গো, অশ্ব, কুক্কুর প্রভৃতি অনেক পশু মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাত্যহিক আহার বিষয় মনুষ্যের পূর্ব্বমত অনিশ্চিত ছিল না, কিন্তু পশুপালনের সুবিধা জন্য সময়ে সময়ে বাস পরিবর্ত্তন করিতে হইত। এই সময়ের প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রাদিতে অধিক পারিপাট্য, বুদ্ধিকৌশল লক্ষিত হয়।

২য় ধাতুকাল। এই কাল দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমে মনুষ্য ধাতুর ব্যবহার শিখিয়াই লৌহ প্রস্তুতের পদ্ধতি শিখিতে পারে নাই। Bronze বা পিত্তল প্রস্তুত করা অতি সহজ, কিন্তু খণিজাত দ্রব্য হইতে লৌহ প্রস্তুত প্রক্রিয়া সহজ নহে। ধাতুর আবিষ্ক্রিয়া হইলে পর প্রথমতঃ কেবল পিত্তল নির্ম্মিত অস্ত্র ও তৈজসাদির ব্যবহার দেখা যায়। এই কালের বাসস্থানে লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া যায় না; এই কালে কৃষিকার্য্যের আরম্ভ হইয়া থাকিবে, কারণ কেবল কৃষিকার্য্যোপযোগী পিত্তলের দ্রব্যাদি এই সময়েই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কালে মনুষ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল, এমত বোধ হয়, কিন্তু পিত্তলের দ্রব্যাদি ব্যবহার-জনিত অনেক কার্য্যের অসুবিধাও ঘটিত। শেষে লৌহের আবিষ্ক্রিয়া হয়। কি প্রকারে যে এই অমূল্য ধাতু প্রথমে মনুষ্যের পরিচিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা কঠিন। বোধ হয় অভাব অনুভূত হইলেই মনুষ্য-বুদ্ধি স্বয়ং অভাব পূরণ করে। লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হওনাবধি মনুষ্যের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কালের পরেই ঐতিহাসিক কালের আরম্ভ। মনুষ্য জাতি লৌহের নিকট যে কত প্রকারে ঋণী আছে তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, লৌহের আবিষ্ক্রিয়া না হইলে ইউরোপীয় সভ্যতা মিসর, মেক্‌সিকো ও পেরুদেশের আদিম সভ্যতার সহিত অদ্যাবধি সমপদস্থ থাকিত।

না আইল কালাচাঁদ, যায় যে যামিনী ;
কুঞ্জবনে কমলিনী হইল মলিনী ;
দেখা দিল সুখতারা, না উদিল সুখ-তারা,
কেন নাহি কান্তিহারা হইবে কামিনী ?

২

স্মরশর জর জর ক্লান্ত কলেবর ;
কম্পমান অনুক্ষণ হিয়া থর থর ;
আশানাশে হীনবল, তনুতরী টলমল ;
আঁখি করে ছল ছল বিপদে বিস্তর ।

৩

কতক্ষণে মনকথা অতি ধীরে ধীরে
কহিলা কাতরে রামা, সম্বোধি সখীরে ।
কেনা জানে সিন্ধুনারী, হৃদয়ে ধরিতে নারি,
বর্ষাগমে ফেলে বারি উছলিয়া তীরে ?

(প্রভাতের তারা)

সখিলো

বিফলে রজনী যায় প্রাণকান্ত এল না ।
এ মনের ঘোরতর প্রেমজ্বালা গেল না ।
ওই দেখ সুখতারা, দিবাদূতী দিব্যাকারা,
আমারে করিতে সারা, বিকশিত বদনা ;
নিশার আঁধার যাবে, আমারে আঁধারে পাবে,
সহে না সজনি আর এ বিষম যাতনা ।

সখিলো

অচিরে উদয়াচলে হৈম উষা হাসিবে,
আমার সকল আশা একেবারে নাশিবে ।
হেরি তার মন্দ হাসি, যেনরে জলদরাশি,
শরীরে প্রবেশি আসি, সুখশশী গ্রাসিবে ।
দেবতা হইয়া কেন, তাহার স্বভাব হেন ?
উচ্চ কি নীচের দুখে রঙ্গরসে ভাসিবে ?

৩

সখিলো

কেন আজি রসরাজ আসিবারে ভুলিল ?
মিছা অঙ্গীকার করি এ দাসীরে ছলিল ?
বল সই, বল, বল, দেহে আর নাহি বল,
বিকল হিয়ার কল, একি ভাব ধরিল ?
অথবা কি দেখি দোষ, শ্যাম করিয়াছে রোষ ?
অভাগিনী সে চরণে কিসে দোষী হইল ?

সখিলো

শুনিব না আর কি লো সে মধুর বচন ?
দেখিব না আর কি সে প্রেমোৎফুল্ল লোচন ?
আর কি সে মুখে হাসি, মেঘে সৌদামিনীরাশি
সকাশে বিকাশি আসি, রঞ্জিবে না জীবন ?
আর কি প্রণয়োল্লাসে, বসিয়া আমার পাশে,
তুষিতে আমারে নাথ করিবে না যতন ?

সখিলো
সে অঙ্গ-পরশে পুনঃ বহিবে কি শরীরে
সুধাময় সুখানিল নিন্দি মন্দ সমীরে ?
পাইয়া নূতন বল, হৃদয়-জলধিজল
উথলিয়া চল চল করিবে কি অচিরে ?
লোমাবলী কলেবরে, শিহরি কি প্রেমভরে,
মনের আনন্দ পুনঃ প্রকাশিবে বাহিরে ?

৬

সখিলো
ওই দেখ জলধর রোষাবেশে আসিয়া
স্বর্ণময়ী সুখতারা ফেলিল লো গ্রাসিয়া।
আমার অন্তরাকাশে, যে সুখের তারা হাসে,
সেও লো বিরহগ্রাসে মৃতপ্রায় বিষিয়া।
পশি যেন বাঞ্ছা করে, বিস্মৃতির সরোবরে,
যাই যেন একেবারে অন্ধকারে মিশিয়া।

৭

সখিলো
সরিল জলদদল ; বাহিরিল দেখ না
প্রভাতের প্রিয়তারা প্রফুল্লিত-বদনা।
ঘটিবে কি এ কপালে, বিচ্ছেদ-বারিদজালে
ছেদিতে পারিব কালে, বল সই, বল না ?
দুর্ব্বল অবশ তনু, প্রতিক্ষণে হয় তনু ;
কোথা পাব নব বল পুরিতে এ বাসনা ?

(অস্তাচলগামী চন্দ্র)

১

ওই দেখ দাঁড়াইয়া আকাশের পাশে
যামিনী বিলাসী ;
পাণ্ডুবর্ণ কলেবর, কাঁপিতেছে থর থর,
কপোল নয়নজলে যাইতেছে ভাসি ;
ছাড়িতে প্রাণের প্রিয়া, ব্যাকুল প্রণয়ি হিয়া;
প্রেম বিনা এ সংসার অন্ধকার রাশি ;
কেনরে গোকুল-চাঁদ ভুলিল আমারে ?
বিষের জলনে জলি ভব-কারাগারে।

বিরহ রাহুর ভয়ে শশীর এ দশা
গগন মণ্ডলে ;
দেবতার বুদ্ধি হত, মানুষের সহে কত,
দুর্ব্বল মানবকুল সকলেই বলে ;
অবলা মনুজে নারী ; যন্ত্রণা সহিতে নারি ;
জীবন জলিছে যেন বাড়ব অনলে ;
বল স্বজনিলো বল বাঁচিব কেমনে ?
অথবা মরণ ভাল শ্যামের বিহনে।

৩

প্রেমের কমল, হায়, মানস সরসে
ফুটিবে কি আর ?
হৃদয়-গগনরবি, সংসাররঞ্জন-ছবি,
উষার সহিত দেখা দিবে কি আবার ?
লোকে মোরে কমলিনী, বলে কেন নিতম্বিনি?
আমারে ঘেরিয়া আছে চির অন্ধকার।
এ নিশার অবসান হবে কিলো সই ?
আর কার কাছে মোর মনকথা কই !

৪

কেন সই তোর আঁখি করে ছল ছল
বল্ না আমারে ?
কি ভাবি হৃদয়ে তোর, উথলে যন্ত্রণাঘোর ?
কিসে তোর ফুল্লমুখ গ্রাসিল আঁধারে ?
বুঝিলাম মোর দুখ, হরিয়াছে তোর সুখ,
সুখ সুখ, দুখ দুখ, চৌদিকে বিস্তারে।
যেখানে বসন্ত যায়, ফুটে ফুলকুল ;
যথায় শীতের গতি, সৌন্দর্য্য নির্ম্মূল।

৫

স্বজনিলো সরোবরে দেখনা কাঁপিছে
ভয়ে কুমুদিনী,
নয়ন মুদিত প্রায়, যেন অবসন্ন কায়,
নাথ যায় বলি হায়, এমন মলিনী।
না আইল মোর নাথ, কেবল বিরহ সাথ
যাপিতে হইল মম বিষম যামিনী।
নিশা তো হইল গত, বিরহ না যায়।
কেন হরি নিদারুণ হইলে আমায় ?

বলিতে আমারে তুমি কত ভালবাস,
বৃন্দাবনধন।
কত প্রেমকথা কয়ে, আমায় হৃদয়ে লয়ে,
করিতে পুলক কায়ে সাদরে চুম্বন।
একেবারে স্বপ্নবৎ, হইল কি সে তাবৎ?
অবলা ছলিতে তুমি পার কি কখন?
অথবা কপালগুণে—আমি অভাগিনী—
অমৃত হইল বিষ, লো প্রিয় ভগিনি।

(কোকিল)

১

ওই শুন, স্বজনিলো, সুললিত স্বরে
কে যেন গাইছে গীত, বিহরি অম্বরে;
রাগের তরঙ্গ উঠে, যথা পূতধারা ছুটে
বিষ্ণু পাদপদ্ম ফুটে, যবে মোক্ষ তরে
বাঁধিতে আশার সেতু, পাপ বিনাশের হেতু,
উড়াতে ধর্ম্মের কেতু, এ বিশ্ব ভিতরে,
বিশ্বরূপ নিরঞ্জন, সৃজিলা সহর্ষ মন
জ্যোতির্ম্ময়ী নীরময়ী গঙ্গায় সত্বরে।

২

সঙ্গীত গাইয়া যদি ভ্রমিছ গগনে
দয়াময় দেব কেহ, নিবেদি চরণে;—
কহ এ দাসীর কথা, নীলকান্তমণি যথা,
শুনিলে অবশ্য ব্যথা হবে তাঁর মনে।
না পাইয়া কালাচাঁদে, বৃকভানু সুতা কাঁদে,
পড়িয়া বিষম ফাঁদে বিরহ দহনে;
অবসন্ন কলেবর, কাঁপিতেছে নিরন্তর,
ব্যাকুল বিকল প্রাণ নিকুঞ্জ কাননে।

৩

যে যন্ত্রণা জ্বলিতেছে হৃদয়ে আমার,
নিবাইব কি প্রকারে? এ যে অনিবার।
শরীরে চন্দন দানে, বোধ হয় অগ্নি হানে;
সলিল মৃণাল স্থানে নাহি প্রতীকার।
পদ্মপত্রে পদ্মদলে, দ্বিগুণ এ দেহ জ্বলে;
চন্দ্র যেন হলাহলে বর্ষে বারম্বার;
মলয় পবন ছায়া, হইয়াছে উষ্ণ কায়া;—
হায় বিধি ঘটাইলে কি ঘোর বিকার!

শুন পুনঃ সহচরি, কে আবার গায়?
এ বুঝি বসন্তসখা অমৃত ছড়ায়।
মোর দুখে পিকবর, হইয়া কি সকাতর,
এরূপ বিলাপ কর, বল না আমায়;
দেখিয়া আমার মুখ,তোমার কি নাহি সুখ,
মলিন কি তব মুখ হইয়াছে হায়?
যে যাহারে ভালবাসে, তার দুখে দুখে ভাসে,
প্রণয়ের এই রীতি সতত ধরায়।

ভালবাস মোরে তুমি জানি হে কোকিল,
বরষিতে তুমি হেথা সুস্বর-সলিল,
যখন শ্যামের সনে, বসি সুখে একাসনে,
প্রণয়ের আলাপনে আতিল পাতিল,
বকিতাম কব কত, মত্তভাবে অবিরত,
বর্ষাবারি স্রোতমত উল্লাসে আবিল,
আনন্দ তরঙ্গ সঙ্গে, উৎসাহে অন্তর রঙ্গে,
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে শিথিল।

হে পিক, তোমার ডাকে আসেন তপন,
প্রফুল্লিত করিবারে নলিনীবদন;
শুনিলে তোমার গীত, বসন্ত হইয়া প্রীত,
বিতরেণ চারিভিতে সৌন্দর্য্য শোভন;
মরে রাই কমলিনী, অনুক্ষণ বিষাদিনী,
অশ্রুত্যাগ বিলাপিনী করে ঘন ঘন;
তাহার বসন্ত রবি, বিশ্ববিমোহন ছবি,
আনি দেহ মধু-বঁধু, মোর নিবেদন।

(ঊষা)

সৌরভ মণ্ডিত হেম কলেবর ;
কপালে উজ্জল তারকা জলে ;
কোকিল কূজন ভাষ মনোহর ;
বিকচ কুসুম মালিকা গলে ;
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে
আইল আলোক-বসনা ঊষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশভূষা।

২

পেয়ে প্রিয়কর বিকশিত হাসি,
বদন বসন খুলিয়া ধীরে,
অলি গুন গুন মধুর সম্ভাষি,
নাচয়ে নলিনী সরসী নীরে।
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে
আইল আলোক-বসনা ঊষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশভূষা।

৩

রসে টস্ টস্ বসন্ত-বল্লরী
গাঁথিয়া পরিয়া ফুলের হার,
প্রিয় চূততরু জড়াইয়া ধরি
বিস্তারি সুখের সুগন্ধ ভার।
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে
আইল আলোক-বসনা ঊষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশভূষা।

৪

রসাল মঞ্জরী, বকুলের ফুল,
ফুটিয়া কেমন রয়েছে গাছে ;
চুম্বিয়া আনন্দে দেখ অলিকুল
গুঞ্জরিয়া গান করিছে কাছে।
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে
আইল আলোক-বসনা ঊষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশভূষা।

বিগত বিরহ-নিশা অবসানে
চক্রবাকযুগ সহর্ষমুখে,
চাহে পরস্পর পরস্পর পানে,
মগন নূতন প্রণয় সুখে।
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে
আইল আলোক-বসনা ঊষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশভূষা।

মিলনে সকলে পুলকে বিহ্বল,
নাহিক মিলন এ পোড়া ভালে ;
আমায় কেবল, ঘেরে অবিরল,
বিষম বিরহ তিমিরজালে।
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে
আইল আলোক-বসনা ঊষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশভূষা।

(মলয়ানিল)

১

বন পরিমল বাসিত শীতল
মলয় অনিল মধুরভাষী,
"দিনেশ আইল," বলিতে ধাইল ;
বন্দে ফুলকুল আনন্দে হাসি।
কি কাজ সমীর এ কুঞ্জে আসি ?
বাঞ্ছা কি বহিতে বিষাদরাশি ?

অবলা বালায়, হেথায় জ্বালায়—
বিকট কবল বিরহানল ;
হিয়া উথলিয়া, নয়নান্ত দিয়া
বহে অবিরল শোকাশ্রুজল ;
নাথের বিহনে হারাই বল
কেমনে অধীনী সহে সকল ?

জানি এসকল, দলে অবিরল,
রমণী মণ্ডলে পুরুষ দল ;
ফিরে ফুলকুল, জিনি অলিকুল,
জিনিয়া অনিল, সদা চপল ;
নূতন অমিয়ে চাহে কেবল।
না গণি আশ্রিতজন কুশল।

আশ্রয় বিহনে ভবের ভবনে,
রমণী বাঁচিয়া রহে কেমনে ?
লতিকা ললিতা, তরুর আশ্রিতা,
চপলা নিয়ত জড়িত ঘনে ;
নলিনী জীবিত সরজীবনে ;
কৌমুদীর স্থান চন্দ্র বদনে ;

নির্ম্মল এমন, তথাপি আনন
সতত সুধার সুধারা ঢালে ;
কথায় ভুলায়, অবলা বালায়,
কেমন মোহন মায়ার জালে।
হৃদে হলাহল অমিয় গালে ;
জুটিয়াছে ভাল নারীর ভালে।
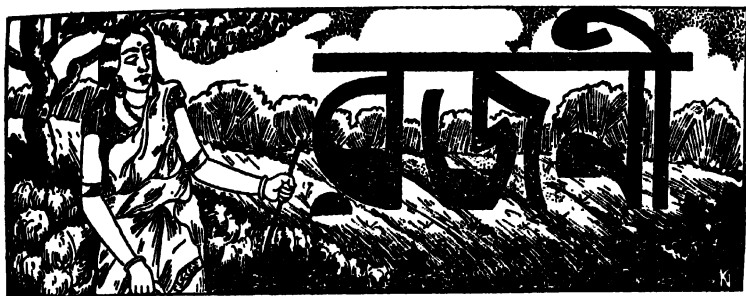
চতুর্থ খণ্ড

(পুনর্ব্বার শচীন্দ্র বক্তা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঐশ্বর্য্য হারাইয়া, কিছুদিন পরে আমি পীড়িত হইলাম। ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পতনে, মনে কোন বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, কি কিজন্য এই পীড়ার উৎপত্তি তাহা আমি বলিবার কোন চেষ্টা পাইব না। কেবল পীড়ার লক্ষণ বলিব।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রৌদ্রের তাপ অপনীত হইলে পর, প্রাসাদের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলাম। সমস্ত দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। জগতের দুরূহ গূঢ় তত্ত্ব সকলের আলোচনা করিতেছিলাম। কিছুরই মর্ম্ম বুঝিতে পারি না, কিন্তু কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায় না। যত পড়ি তত পড়িতে সাধ করে। শেষে শ্রান্তি বোধ হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া হস্তে লইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু নিদ্রা আসিল—অথচ নিদ্রা নহে। সে মোহ, নিদ্রার ন্যায় সুখকর বা তৃপ্তিজনক নহে। ক্লান্ত হস্ত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল। চক্ষু চাহিয়া আছি—বাহ্য বস্তু সকলই দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কি দেখিতেছি তাহা বলিতে পারি না। অকস্মাৎ সেইখানে, প্রভাতবীচি-বিক্ষেপচপলা কল কল নাদিনী নদী বিস্তৃতা দেখিলাম—যেন তথা ঊষার উজ্জ্বল বর্ণে পূর্ব্বদিক্ প্রভাসিত হইতেছে—দেখি সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, সৈকতমূলে, রজনী! রজনী জলে নামিতেছে। ধীরে, ধীরে, ধীরে! অন্ধ! অথচ কুঞ্চিতভ্রূ, বিকলা অথচ স্থিরা; সেই প্রভাতশান্তি-শীতলা ভাগীরথীর ন্যায় গম্ভীরা, ধীরা, সেই ভাগীরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জ্জয় বেগশালিনী! ধীরে, ধীরে, ধীরে,—জলে নামিতেছে। দেখিলাম, কি সুন্দর! রজনী কি সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবমুঞ্জরীর সুগন্ধের ন্যায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে নামিতেছে! ধীরে রজনি! ধীরে! আমি দেখি তোমায়। তখন

অনাদর করিয়া দেখি নাই, এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। ধীরে রজনি, ধীরে! তুমি সর্ব্বত্যাগিনী, সন্ন্যাসিনী,—সুবদনী, সুহাসিনী—

আমার মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছার লক্ষণ সকল আমি অবগত নহি। যাহা পশ্চাৎ শুনিয়াছি, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। আমি যখন পুনর্ব্বার চেতন প্রাপ্ত হইলাম, তখন রাত্রিকাল—আমার নিকট অনেক লোক। কিন্তু আমি সে সকল কিছুই দেখিলাম না। আমি দেখিলাম—কেবল সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃদুগামিনী রজনী। ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম, তবু দেখিলাম সেই গঙ্গা আর সেই রজনী। আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! দিগন্তরে চাহিলাম—আবার সেই রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। ঊর্দ্ধে চাহিলাম—ঊর্দ্ধেও আকাশবিহারিণী গঙ্গা ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে; আর আকাশবিহারিণী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে নামিতেছে। অন্যদিকে মন ফিরাইলাম; তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রজনী। আমি নিরস্ত হইলাম। চিকিৎসকেরা আমার চিকিৎসা করিতে লাগিল।

অনেকদিন ধরিয়া আমার চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নয়নাগ্র হইতে রজনী-রূপ তিলেক জন্য অন্তর্হিত হইল না। আমি জানি না আমার কি রোগ বলিয়া—চিকিৎসকেরা কি চিকিৎসা করিতেছিল। আমার নয়নাগ্রে যে রূপ অহরহঃ নাচিতেছিল, তাহার কথা কাহাকেও বলি নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওহে ধীরে, রজনি ধীরে! ধীরে, ধীরে আমার এই হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ কর! এত দ্রুতগামিনী কেন? তুমি অন্ধ, পথ চেন না, ধীরে, রজনি ধীরে! ক্ষুদ্রা এই পুরী, আঁধার, আঁধার, আঁধার! চিরান্ধকার! দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলো কর;—দীপশলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আঁধার পুরী আলো করিবে।

ওহে ধীরে, রজনি ধীরে! এ পুরী আলো কর, কিন্তু দাহ কর কেন? কে জানে যে শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে—তোমায় ত পাষাণগঠিতা, পাষাণময়ী জানিতাম, কে জানে যে পাষাণেও দাহ করিবে? অথবা কে না জানে পাষাণ ও লৌহের সংঘর্ষণেই অগ্ন্যুৎপাত হয়। তোমার প্রস্তরধবল, প্রস্তরস্নিগ্ধদর্শন, প্রস্তর-গঠিতবৎ মূর্ত্তি যতই দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। অনুদিন, পলকে পলকে, দেখিয়াও মনে হয় দেখিলাম কই? আবার দেখি। আবার দেখি, কিন্তু দেখিয়া ত সাধ মিটিল না।

পীড়িতাবস্থায়, আমি প্রায় কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেহ কথা কহিতে আসিলে ভাল লাগিত না। রজনীর কথা মুখে আনিতাম না—কিন্তু প্রলাপকালীন কি বলিতাম না বলিতাম, তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। প্রলাপোক্তি সচরাচরই ঘটিত।

শয্যা প্রায় ত্যাগ করিতাম না। শুইয়া শুইয়া কত কি দেখিতাম তাহা বলিতে পারি না। কখন দেখিতাম, সমরক্ষেত্রে যবন নিপাত হইতেছে—রক্তে নদী বহিতেছে; কখন দেখিতাম, সুবর্ণ প্রান্তরে হীরক বৃক্ষে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে। কখন দেখিতাম, আকাশমার্গে অষ্টশশিসমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চন্দ্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল—গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে সকল জ্বলিয়া উঠিয়া, দহ্যমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম, এই জগৎ, জ্যোতির্ম্ময় কান্তরূপধর দেবযোনির মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অম্বর পথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে; তাহাদিগের অঙ্গের সৌরভে আমার নাসারন্ধ্র পরিপূর্ণ হইতেছে। কিন্তু যাহাই দেখি না—সকলের মধ্যস্থলে—রজনীর সেই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। হায়! রজনি! পাথরে এত আগুন!

ধীরে, রজনি ধীরে! ধীরে, ধীরে, রজনি ঐ অন্ধ নয়ন উন্মীলিত কর। দেখ, আমায় দেখ, আমি তোমায় দেখি! ঐ দেখিতেছি—তোমার নয়নপদ্ম ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে—ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে নয়নরাজীব ফুটিতেছে! এ সংসারে কাহার না নয়ন আছে? গো, মেষ, কুক্কুর, মার্জ্জার ইহাদিগেরও নয়ন আছে—তোমার নাই? নাই, নাই, তবে আমারও নাই! আমিও আর চক্ষু চাহিব না।
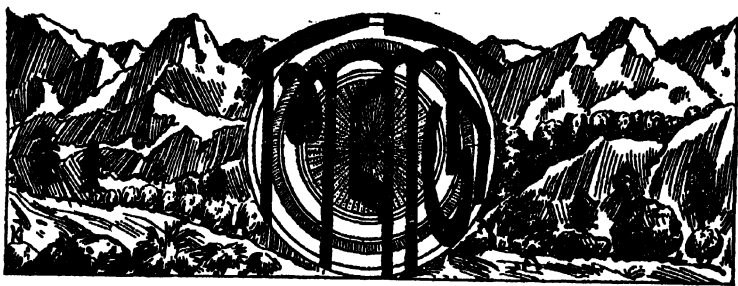
প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসলমান রাজত্বকালে আর্য্যকুলে যে সকল বীরগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে, বোধ হয়, কেহই শিবজির ন্যায় ক্ষমতাশালী ছিলেন না। তিনি কেবল ভারতবিজয়ী মোগল-পতাকা দলিত করিয়া রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন এমত নহে; তিনি স্বজাতিকে এরূপ সজীব ও সতেজ করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর অত্যল্পকাল পরেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থল কম্পান্বিত হইয়াছিল। ঈদৃশ মহাত্মার জীবনচরিত যত পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই উপকার লাভের সম্ভাবনা। এজন্য তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

বাল্যকালে আমরা বৃদ্ধলোকের মুখে যে বর্গিদিগের দৌরাত্ম্য বৃত্তান্ত শুনিতাম, তাহাদিগের অপর নাম মহারাষ্ট্রীয় বা মারহাট্টা। মহারাষ্ট্র প্রদেশের পূর্ব্বসীমা বরদা নদী; উত্তর সীমা সাতপুর গিরিমালা; পশ্চিম সীমা সাগর; দক্ষিণ সীমা গোয়ানগর হইতে মাণিক দুর্গ পর্য্যন্ত একটী কল্পিত বক্ররেখা। এই ভূভাগে সহ্যাদ্রি বা ঘাট পর্ব্বত সমুদ্রসলিল হইতে দুই তিন সহস্র হস্ত উর্দ্ধে শৃঙ্গ নিকর তুলিয়া সিন্ধুকূলকে পঞ্চদশ হইতে পঞ্চবিংশতি ক্রোশ দূরে রাখিয়া দক্ষিণোত্তর ধাবিত হইয়াছে। শৈল-পদতল হইতে অর্ণব তীর পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ডের নাম কঙ্কণ; তথায় নিবিড় কানন, উচ্চ পর্ব্বত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, দুরারোহ গিরিসঙ্কট প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। পার্ব্বতীয় বিভাগে অনেকগুলি স্বাভাবিক দুর্গ আছে; অল্পায়াসেই সেগুলিকে দুর্ভেদ্য করা যায়।

সাধারণতঃ মহারাষ্ট্র শৈলময়; এবং তাহার জল বায়ু এত উত্তম যে, বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি এমন নাই। এই প্রদেশে নর্ম্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, ভীমা এবং কৃষ্ণা প্রবাহিতা রহিয়াছে; এই সকল নদীর উভয়কূলস্থ ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা; এবং তথায় অনেক শস্য জন্মিয়া থাকে। গোদাবরী, ভীমা এবং তৎশাখা নীরা ও মান, ইহাদিগের তটবর্ত্তী স্থানসমূহে ভাল ভাল অশ্ব জন্মে

তাহারা উৎপত্তিস্থলভেদে গঙ্গথরী,* ভীমথরী, নীরথরী এবং মানদেশী নামে খ্যাত।

অপরাপর পার্ব্বতীয় দেশবাসীদিগের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়েরা পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী। যদিও তাহারা রাজপুতদিগের ন্যায় সুশ্রী ও দীর্ঘদেহ নহে, তথাপি সাহসে ও শক্তিতে তাহারা রাজপুতগণাপেক্ষা কোন ক্রমে ন্যূন নহে; এবং বুদ্ধি ও চতুরতায় বোধ হয় ভারতবর্ষীয় কোন জাতিই তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। মহারাষ্ট্রীয় মহিলারা অন্যান্য স্থানীয় হিন্দুকামিনীকুলের ন্যায় অন্তঃপুরনিরুদ্ধা নহেন। তাঁহাদিগের অনেক দূর স্বাধীনতা আছে; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অশ্বারোহণ করিতে জানেন।

মহারাষ্ট্রের প্রাচীন বিবরণ অপ্রাপ্য। কিন্তু বিবেচনা হয় যে এককালে তাহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি ছিল। খৃষ্টাব্দের সার্দ্ধদ্বিশতবর্ষ পূর্ব্বে এই প্রদেশের টগর নগরে মিসরের বণিক্গণ বাণিজ্য করিতে আসিতেন; খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেও গ্রীকেরা তথায় বাণিজ্যদ্রব্য সংগ্রহার্থে আগমন করিতেন। এই প্রদেশের গোদাবরীতটস্থ প্রতিষ্ঠান পুরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পরাক্রান্ত শালিবাহন শকাব্দা প্রচলিত করেন; এবং এই প্রদেশেই জগদ্বিখ্যাত কৈলাশধাম সমন্বিত ইলোরাস্থ ক্ষোদিত গিরিগহ্বরমালা, দ্বিতল ত্রিতল গৃহ, বিচিত্র গঠিত স্তম্ভ ও দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকার্য্য সমূহে পরিশোভিত হইয়া কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন প্রতাপশালী জাতির পূর্ব্বাধিপত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যখন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্থসং এদেশে আগমন করেন, তখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের এত বল বিক্রম যে, দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত করতলস্থ করিয়া মহারাষ্ট্র হইতে পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন। মুসলমানদিগের দক্ষিণাপথ প্রবেশকালে† এই প্রদেশস্থ দেবগিরিতে যাদববংশীয় রাজা রামদেব রাজত্ব করিতেছিলেন;‡ প্রচণ্ড আলাউদ্দীন তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিলে পর অনেককাল পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের আর কোন জীবিত লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই।

শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মুসলমানদিগের লিখিত ইতিবৃত্তে আবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের উল্লেখ দেখা যায়। মহারাষ্ট্র তৎকালে দক্ষিণাপথস্থ

---

* মহারাষ্ট্রীয়েরা গোদাবরীকে গঙ্গা বলিয়া থাকে।

† খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

‡ রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বকালে বৈয়াকরণ বোপদেব প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ভাগবতপুরাণ লেখক বলিয়া প্রবাদ আছে। হেমাদ্রি রাজা রামচন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন।

বিজয়পুরের আদিলসাহী ও আহম্মদ নগরের নিজামসাহী রাজ্যভুক্ত ছিল। উক্ত রাজ্যদ্বয়ের চক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে সর্ব্বদা বিরোধ ঘটিত, এবং পার্শ্ববর্ত্তী নৃপালবর্গের সহিতও তাঁহাদিগের অনেক সময়ে যুদ্ধ উপস্থিত হইত। এজন্য মারহাট্টা প্রজাগণের মধ্য হইতে তাঁহাদিগের অনেক সৈন্য ও সৈনাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষদলের কেহ কেহ সেনাপরিপোষক জায়গির ও সম্মানসূচক পদবী পাইয়াছিলেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়গণ দিন দিন এত উন্নতিলাভ করেন যে, শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দী সমাপ্ত না হইতে হইতে বিজয়পুরপতি হিসাবপত্রে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে মারহাট্টা ভাষা ব্যবহারের আদেশ প্রদান করেন এবং দলিলদস্তাবেজ উভয় ভাষায় লিখিতে বলেন। শকাব্দা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আহম্মদনগরে দুইটি, এবং বিজয়পুরে সাতটি মহারাষ্ট্রীয়বংশের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। নিরন্তর সংগ্রাম ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া মারহাট্টারা সাহসী ও সমরকুশল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহারা স্বদেশের গৌরব বুঝিত না; এবং বিধর্ম্মী যবনদিগের মহিমাবৃদ্ধি নিমিত্ত সমধর্ম্মা ও আত্মীয়দিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। একতা, স্বজাতিপ্রিয়তা এবং স্বধর্ম্মানুরাগ মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যে প্রতাপশালী ঐন্দ্রজালিক তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্য হিন্দুকুলের অলঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা আরম্ভ করা যাইতেছে।

পুনা নগরীর প্রায় পঁচিশ ক্রোশ উত্তরে শিবনারী দুর্গে ১৫৪৯ শকের বৈশাখ মাসে শিবজি জন্মগ্রহণ করেন। যে বৎসরের উদয়ে শিবজীর জন্ম, তাহার অন্তকালে সাজাহানের দিল্লীসিংহাসন সমারোহণ। রত্ননির্ম্মিত ময়ূর সিংহাসন, বিচিত্ররচিত তাজমহল, নগরসদৃশ বৃহদায়তন সুদৃশ্য পটমণ্ডপ প্রভৃতি মোগল সমৃদ্ধির চরমোন্নতিসূচক চিহ্ন নিচয়ের সূচনা না হইতেই, মোগল সাম্রাজ্য বিলয়কারীর আবির্ভাব হইল। মুসলমানেরা বলিতে পারেন, পুষ্পটি ভাল করিয়া প্রস্ফুটিত না হইতে হইতেই, মধ্যে কীট জন্মিল। হিন্দুরা বলিবেন, কাহারও অতিবৃদ্ধি হইতে দিবার পূর্ব্বে বিধাতা তাহার পতন বিধান করেন।

পঙ্কজাত পদ্মসদৃশ শিবজি নীচকুলোদ্ভূত ছিলেন না। তিনি বহ্নি হইতে প্রজ্বালিত বহ্নির ন্যায় শূরবংশসম্ভূত। তাঁহার পিতা সাহজি ভোঁসলা বীরপুরুষ বলিয়া পরিচিত। সাহজি আহম্মদনগরের সৈন্যাধ্যক্ষতা কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ পূর্ব্বক বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করেন এবং পতনোন্মুখ নিজামসাহী রাজ্যরক্ষার্থ বারম্বার মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তদুচ্ছেদ নিবারণে অসমর্থ হইলে বিজয়পুর রাজসংসারে কর্ম্মগ্রহণানন্তর কর্ণাটে বিজয়পতাকা উড্ডীন করত একটি হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের সূত্রপাত করেন।

শিবজির মাতা জিজিবাই* লক্ষজি যাদবরাও দেশমুখের † কন্যা। লক্ষজি আহম্মদনগরাধিপতির নিকটে দশ সহস্র অশ্বারোহী প্রতিপালনের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ জায়গির পাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দেবগিরির রাজাসনে আসীন ছিলেন। শকাব্দা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যাদবেরা মহারাষ্ট্রীয়-দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও পরাক্রান্ত বলিয়া গণ্য হইত।

শিবজির পিতামহ মল্লজি ১৪৯৯ শকে লক্ষজির অনুগ্রহে নিজামসাহী রাজ্যের একটি সামান্য অশ্বারোহীদলের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৫১৬ শকে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। আহম্মদনগরস্থ সাহ সরিফ নামক পীরের প্রার্থনায় পুত্রকামনা সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া, সন্তানের নাম সাহজি রাখিলেন। সাহজির বয়স পাঁচ বৎসর হইলে একদা মল্লজি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দোলযাত্রার উপলক্ষে যাদবরাও দেশমুখের আলয়ে গমন করিলেন। লক্ষজি সাহজির সৌন্দর্য্য ও প্রফুল্লতা সন্দর্শনে প্রীত হইয়া তাহাকে আহ্লাদ সহকারে নিকটে ডাকিলেন এবং আপনার তিন-চারিবর্ষবয়স্কা নন্দিনী জিজিবাইর পার্শ্বে বসাইলেন। বালকবালিকা আমোদে খেলা করিতে লাগিল, দেখিয়া সানন্দ হৃদয়ে যাদবরাও পরিহাসচ্ছলে দুহিতাকে বলিলেন, "দেখ, তোমার কেমন বর আসিয়াছে।" এবং সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ইহাদিগের বিবাহ হইলে কেমন সাজে?" এই সময়ে ভোঁসলা কুমার এবং যাদব কুমারী পরস্পরের প্রতি আবির নিক্ষেপ করাতে, সভায় হাসি উঠিল। এই হাস্যতরঙ্গ মধ্যে মল্লজি উঠিয়া বলিলেন, "সকলের যেন স্মরণ থাকে, লক্ষজি আমার পুত্রকে কন্যাদান করিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলেন।" ইহাতে কেহ কেহ সম্মতি প্রদান করিল; কিন্তু যাদবরাও বিস্মিত এবং অবাক হইয়া রহিলেন। পরদিন লক্ষজি মল্লজিকে নিমন্ত্রণ করিলে, মল্লজি বলিয়া পাঠাইলেন, "যাদবরাও আমার পুত্রকে জামাতা বলিয়া গ্রহণ না করিলে আমি তাঁহার নিমন্ত্রণে যাইব না।"

যাদবরাও শুনিয়া সম্মত হইলেন না, বরং ক্রুদ্ধ হইলেন। কেন না হইবেন? তাঁহার প্রসাদেই মল্লজির সাংসারিক উন্নতি। আর যে বংশে মল্লজি জন্মিয়াছিলেন, সে বংশ কি দেবগিরির রাজকুলের তুল্য? উত্তরকালীন মহারাষ্ট্রীয় পুরাবৃত্ত লেখকগণ যে ভোঁসলা বংশকে চিতোরের 'হিন্দুসূর্য্য'-কুল সমুদ্ভূত বলিয়াছেন, যে কোন কারণে হউক যাদবরাও সে বংশের ঈদৃশ মহত্ত্ব জানিতেন না।

---

* মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বাই সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগের উপাধি।

† দেশমুখ শব্দে দেশপ্রধান, দেশাধিকারী বা জমীদার বুঝায়।

লক্ষজির অসম্মতি দেখিয়াও মল্লজি সংকল্প করিলেন যে, যাদবহুহিতার সহিত অবশ্য অবশ্যই পুত্রের বিবাহ দিবেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার অনেক অর্থ সমাগম হইল। কিরূপে হইল, কে জানে! মহারাষ্ট্রীয় কিংবদন্তী এই যে ভগবতী ভবানীদেবী স্বয়ং মল্লজিকে দেখা দিয়া ধনরাশির সন্ধান প্রদান করেন এবং বলেন "তোমার বংশে একজন শম্ভু সদৃশ গুণবিশিষ্ট নরপাল জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাষ্ট্রে সদ্বিচার সংস্থাপন করিবে; এবং যাহারা ব্রাহ্মণের হিংসা করে ও দেবতার মন্দির অপবিত্র করে, তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবে। তাহার রাজ্যকাল হইতে নূতন সময় আরম্ভ হইবে এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ সপ্তবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে।"

সৎ কি অসৎ যে উপায়েই মল্লজি ধনসঞ্চয় করুন, তদ্দারা তাঁহার বিশেষ উপকার হইল। তিনি অনেকগুলি ঘোটক ক্রয় করিয়া, স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিলেন; এবং কূপ খনন, পুষ্করিণী খনন, মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি লোকপ্রিয় পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। অর্থবলে কোথায় কি না হয়, বিশেষতঃ মোসাহেবপূর্ণ মুসলমান রাজসংসারে? আহম্মদনগরের সুল্‌তান সন্তুষ্ট হইয়া মল্লজিকে রাজা উপাধি দিলেন এবং পাঁচ হাজার সোয়ারের অধ্যক্ষ করিলেন। পরগণা পুণা এবং সোপা জায়গির রূপে মিলিল; শিবনারী ও চাকুন দুর্গ এবং তদধীনস্থ প্রদেশ সমস্ত হস্তগত হইল। যাদবরাওর আর উদ্বাহ সম্বন্ধে কি আপত্তি থাকিতে পারে? ১৫২৬ শকে (১৬০৪খৃঃ) সুলতানের সমক্ষে মহাসমারোহে সাহজি এবং জিজিবাইর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল।

জিজিবাইর গর্ভে সাহজির দুই পুত্র জন্মে; জ্যেষ্ঠ শাম্বজি, কনিষ্ঠ শিবজি। শাম্বজি শাহজির বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, বাল্যকাল হইতেই পিতার সঙ্গে থাকিতেন। ছোট ছেলের প্রতিই মায়ের আদর; শিবজি জননী সন্নিধানেই থাকিতেন।

যৎকালে শিবজি জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে দিল্লীর মোগল সম্রাটই আর্য্যাবর্ত্তের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। দক্ষিণাপথে আহম্মদনগর, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ড নামক তিনটী পাঠান রাজ্য ছিল। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আক্‌বর বাদসাহ আহম্মদনগর আক্রমণ করিয়া বহু কষ্টে জয়লাভ করেন; কিন্তু মালিক অম্বর নামে মন্ত্রীর প্রতিভাবলে নিজামসাহী রাজ্য পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। শিবজি জন্মিবার পূর্ব্ব বৎসর মালিক অম্বরের মৃত্যু হয়; এবং প্রায় সেই সময়েই বিজয়পুরের বিখ্যাত সুলতান ইব্রাহিম আদিল সাহ বিচিত্র অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা মহাসমারহে রাজ্য করিয়া কালকবলে কবলিত হন। গোলকুণ্ডপতি পূর্ব্ব এবং দক্ষিণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য সকল আপনার অধিকারভুক্ত করিতে নিযুক্ত ছিলেন।

শিবজির বয়স যখন দুই বৎসর মাত্র (১৬২৯ খৃঃ), আহম্মদনগরপতি খাঁ জাহান লোদি নামক বিদ্রোহী পাঠান সেনাপতির পক্ষাবলম্বন করিয়া, দিল্লীশ্বরের ক্রোধে পতিত হন। সুলতান মর্ত্তিজা আজিম সাহ মালিক অম্বরের পুত্র প্রধান মন্ত্রী ফতে খাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে বারম্বার পরাভূত হইয়া, কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, তাহাকে মুক্ত করিলেন এবং মন্ত্রীত্বপদে পুনর্নিযুক্ত করিলেন। ফতে খাঁ ক্ষমতা পাইয়াই বৈরনির্য্যাতনের পথ দেখিতে লাগিল এবং সুযোগক্রমে সুলতান এবং প্রধান ওম্‌রাদিগকে বধ করিল। অনন্তর নিজাম-সাহী বংশীয় একটি শিশুকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া দিল্লির অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে বিজয়পুরাধিপতি আহম্মদনগর ধ্বংসে আপনার বিপদ বুঝিয়া সংগ্রাম জন্য প্রস্তুত হইলেন; এবং ফতে খাঁ সেই ষড়যন্ত্রে মিলিত হইলে, মোগল সেনাপতি কুপিত হইয়া তদ্বাসস্থান দৌলতাবাদ সযত্নে অবরোধ পূর্ব্বক অধিকার করিলেন। ফতে খাঁ দিল্লিতে প্রেরিত, এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজকুমার গোয়ালিয়র দুর্গে চিররুদ্ধ হইল। সাহজি ইহার পরে প্রায় চারি বৎসরকাল নিজামসাহী রাজ্যের পতন নিবারণার্থে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রধান সহায় মহম্মদ আদিল সাহও মোগলদিগের প্রতাপে প্রপীড়িত হইলেন। তিনি বিজয়পুরের চারিদিকে দশ ক্রোশ মরুভূমি করিয়া বিপক্ষপক্ষের আক্রমণ হইতে আপনার রাজধানী রক্ষা করিলেন বটে; কিন্তু শত্রুদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিতে পারিলেন না। পর্য্যায়ক্রমে জয় পরাজয় ঘটিতে লাগিল; প্রজাদিগের দুঃখের সীমা পরিসীমা রহিল না। পরিশেষে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরপতি মোগলদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিদ্বারা সাহজি বিজয়পুরের রাজসংসারে কর্ম্মগ্রহণ করিবার অনুমতি পাইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন; বিজয়পুরাধিপতি আহম্মদনগরের কিয়দংশ লইয়া সম্রাটকে বৎসরে বিংশতি লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করিলেন; এবং নিজামসাহী রাজ্যের অবশিষ্টাংশ দিল্লিসাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

এইরূপে শিবজির বয়ঃক্রম দশ বৎসর হইতে না হইতেই, মোগল-পাঠানের দ্বন্দ্ব দ্বারা দক্ষিণাপথের একটী মুসলমান রাজ্য বিনষ্ট হইল। বিজয়পুরও এই যুদ্ধে এত হীনবল হইয়াছিল যে, দক্ষিণে রাজ্য বিস্তার করিয়া বলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই সংগ্রাম সময়ে শিবজি কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, ভাল করিয়া জানা যায় না। সমরপ্রারম্ভে (১৬২৯ খৃঃ) সাহজি, লোদির সহিত বিবাদ করিয়া, দিল্লীশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তজ্জন্য সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে

পুনরায় জায়গির সম্বন্ধে একখানি সনন্দপত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মোগল সেনাপতিদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া পুরাতন প্রভু আহম্মদনগরপতির দলে প্রত্যাগমন করেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি কুকাবাই নাম্নী একটী নবীনা কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন; তাহাতে তেজস্বিনী যাদবনন্দিনী জিজিবাই অভিমানিনী হইয়া শিশু শিবজিকে সঙ্গে করিয়া পিত্রালয়ে প্রস্থান করেন। তদবধি নূতন প্রেমের কুহকবশেই হউক বা যুদ্ধের বিরামাভাব প্রযুক্তই হউক, সাত বৎসরকাল সাহজি, শিবজি এবং তজ্জননীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বিজয়পুরে গমন করেন, জিজিবাই তাঁহার সঙ্গে যান এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া শিবজির বিবাহ দেন। অনন্তর সাহজি, পুনা জায়গিরের তত্ত্বাবধারক দাদাজি কর্ণ্দেবসন্নিধানে শিবজি এবং তাঁহার মাতাকে রক্ষণাবেক্ষণার্থে প্রেরণ করিয়া সুলতানের আদেশে কর্ণাট যাত্রা করেন।

দাদাজি কর্ণ্দেব অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও সদ্বিবেচক ছিলেন। তিনি শিবজিকে যোদ্ধার উপযোগী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শিবজি লিখিতে পড়িতে, এমন কি আপনার নাম সাক্ষর করিতেও শিখিলেন না; কিন্তু ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, ভল্ল-প্রহার, তীরনিক্ষেপ, অসিসঞ্চালন প্রভৃতি কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শিক্ষকের যত্নে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিল। তিনি কথকদিগের মুখে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের অমৃতময় কথা শুনিতে ভালবাসিতেন। কবিবর্ণিত প্রাচীন বীরগণের গুণগান শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়-সরোবর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তিনি কল্পনাপথে তাঁহাদিগের দেবতুল্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন, তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য কার্য্য-পরম্পরা নিরীক্ষণ করিতেন এবং তাঁহাদিগের মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে কৃতসংকল্প হইতেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মানুরক্তচিত্তে যবনগণ পুরাকালের পরাক্রান্ত দৈত্য রাক্ষসবৎ প্রতীয়মান হইত, এবং কবে তাহাদিগের দারুণ দৌরাত্ম্য হইতে পুণ্যময় ভারতভূমিকে মুক্ত করিতে পারিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর আলোড়িত হইত। যে দেশে রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, বলরাম, ভীমার্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যে দেশে স্বর্গাবতীর্ণা ভাগীরথী প্রবাহিতা, যে দেশ দেবগণের একমাত্র প্রিয়লীলাস্থল, সে দেশের ছিন্ন মুকুট মুসলমান-পদতলে দলিত দেখিয়া তাঁহার তেজস্বী মনে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। তিনি আশ্বাসপ্রদায়িনী আশার বিশ্ববিমোহন বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভাবিতেন, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত যবনগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন, স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিবেন এবং "হরহর ভবানী" ধ্বনিতে হিমাদ্রি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মনদ পর্য্যন্ত, প্রতিধ্বনিত করিবেন।

শিবজি যেস্থানে বাস করিতেছিলেন, সেস্থানও তৎসদৃশ উন্নতমনা বীরধর্ম্মা ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। পুনানগরী সমতল ক্ষেত্র এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত। অনতিদূরেই সহ্যাদ্রি শৈলের শিখরমালা দুই তিন সহস্র হস্ত উর্দ্ধে শিরোত্তোলন করিয়াছে। গিরিশ্রেণী অধিকাংশ স্থলে চির-হরিত-তরুপুঞ্জ পরিশোভিত; কেবল মধ্যে মধ্যে অভ্রভেদী, বন্ধুর, বিশাল, জীবোদ্ভিদপরিশূন্য শৃঙ্গনিকর বিরাজিত। বর্ষাকালে যখন পর্ব্বতপার্শ্বে তরঙ্গের ছটা ছুটিতে থাকে, বৃষ্টির ধারা নাচিতে নাচিতে, খেলিতে খেলিতে, পড়িতে থাকে; বজ্র গর্জ্জিতে, ঝটিকা ঝমকিতে, চপলা চমকিতে থাকে; জলদরাশি কর্ত্তৃক ভগ্ন ও প্রতিবিম্বিত সৌরকিরণলহরীতে সহস্র সহস্র মুহূর্ত্ত পরিবর্ত্তনশীল বর্ণে অচলকুল সাজিতে থাকে; তখন প্রকৃতির মনোহর অথচ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তির চিত্তে না ধর্ম্মজনিত গম্ভীর ভাবের উদয় হয়? আমরা যে সকল পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকি, আমাদিগের অজ্ঞাতসারে তাহারা আমাদিগের মনোবৃত্তি সকলের উপর আধিপত্য করে। ঋষিগণের কানন, ঈশার পর্ব্বত, মহম্মদের গিরিগুহা, মহতী চিন্তার স্থল। কে বলিতে পারে, সহ্যাদ্রি শিবজির পক্ষে তদ্রূপ ছিল না?

সহ্যাদ্রির পথ সকল অতিশয় সংকীর্ণ ও দুরারোহ। স্থানে স্থানে উচ্চ শৃঙ্গ, তন্মধ্যে কোথায় বা উৎকৃষ্ট উৎস আছে; কোথায় বা বর্ষাকালীন জল ধরিয়া রাখিয়া সমুদায় বৎসর চলে। এই সকল শৃঙ্গ অল্প পরিশ্রমেই দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে পরিণত হয়। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এ প্রদেশ আক্রমণ করা অতীব দুঃসাধ্য। তৎকালে এখানে বনজঙ্গল এত বাড়ে, সর্ব্বদা এত বৃষ্টি হয়, বহুসংখ্যক সামান্য সামান্য নদনদী জলপূর্ণ হইয়া এরূপ দুস্তর হয়, এবং যে বায়ু বহিতে থাকে তাহা বিদেশীয়দিগের পক্ষে এত অস্বাস্থ্যকর যে, তখন ইহার ন্যায় দুরাক্রম্য দেশ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

এই পর্ব্বতের উপত্যকাগুলিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা মাওল বলিত। মাওলী বা উপত্যকাবাসীরা দেখিতে কদর্য্যাকৃতি ও নির্ব্বোধ; কিন্তু তাহারা পরিশ্রমী, বিশ্বাসী, কার্য্যদক্ষ, সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। দাদাজি তাহাদিগের অনেককে জায়গিরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত কর্ম্মচারীদিগের সহিত শিবজি গিরিভ্রমণে ও মৃগয়ায় যাইতেন। এইরূপ পর্য্যটন কালে তিনি শৌর্য্য ও মিষ্টভাষিতাগুণে মাওলীদিগের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং ঘাটগিরি ও কঙ্কণের পথ, গিরিসঙ্কট, দুর্গ প্রভৃতির অবস্থা বিলক্ষণরূপে অবগত হইয়াছিলেন।

কিরূপে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য সংস্থাপন করিবেন, কিরূপে আপনার সামান্য শক্তিতে এই মহতী ইচ্ছা ফলবতী করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শিবজির অন্তঃকরণে একটি নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি

ভাবিলেন "কঙ্কণপ্রদেশে একটি বিলক্ষণ পরাক্রান্ত দস্যুদল আছে; আমি সেই দলে মিশিয়া তাহাদিগের রাজা হইব; এবং যে শৌর্য্য তাহারা এক্ষণে সাধুলোকের অপকারার্থে পরিচালিত করিতেছে, সেই শৌর্য্য যবনবলবিনাশার্থে নিয়োজিত করাইব।" শিবজি-সদৃশ ব্যক্তির পক্ষে যে কল্পনা সেই কার্য্য। তিনি দস্যুদলে মিশিলেন। তিনি স্বাধীন রাজা হইবেন এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সময়ে সময়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত কঙ্কণ-প্রদেশে থাকিতেন। দাদাজি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বিবেচনা করিলেন যে, শিবজি অসদনুষ্ঠানেই রত হইলেন; সুতরাং তাঁহাকে অন্যায় বর্ত্ম হইতে সুপথে আনিবার জন্য তাঁহার প্রতি অধিকতর যত্ন দেখাইতে লাগিলেন এবং জায়গির তত্ত্বাবধানের অনেক ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন। এই প্রকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, পুনার নিকটবর্ত্তী ভদ্র মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সর্ব্বদা তাঁহার সাক্ষাৎ হইত; এবং তাঁহার সদাচার ও সদালাপে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন।

সহ্যাদ্রি শৈলে বিজয়পুরাধিপতির অনেকগুলি দুর্গ ছিল। কোন কোন দুর্গে দুর্গাধ্যক্ষ থাকিত, এবং যুদ্ধাশঙ্কা উপস্থিত হইলে তথায় ভাল ভাল সৈন্যও প্রেরিত হইত। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া অধিকাংশ গড়ে মুসলমান সেনা থাকিত না; এবং সেগুলি প্রায় জায়গিরদারদিগের অধীনেই ছিল। বিশেষতঃ দিল্লীশ্বরের সহিত ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হইবার পরে, বিজয়পুরপতি কর্ণাটবিজয়ের অভিলাষে সেই প্রদেশেই উত্তমোত্তম যোদ্ধৃগণ পাঠাইয়াছিলেন; এবং ঘাটপর্ব্বতের দুর্গ সকল প্রথমে অল্পায়াসেই করস্থ হইয়াছিল বলিয়া তাহারা যে দুর্ভেদ্য ও বিশেষ প্রয়োজনীয়, ইহা বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগকে একপ্রকার অরক্ষিতাবস্থায় রাখিয়াছিলেন।

পুনার দশ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে নীরানদীর উৎপত্তিস্থল সন্নিকটে টর্ণা নামে একটি পার্ব্বতীয় দুরাক্রম্য দুর্গ ছিল। শিবজি দুর্গাধ্যক্ষের যোগে ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ঊনবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সে দুর্গটি হস্তগত করিলেন; এবং বিজয়পুরে বলিয়া পাঠাইলেন যে সরকারের লাভ করিয়া দিবেন, এই উদ্দেশেই কেল্লাটি দখল করিয়াছেন, এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ তজ্জন্য তৎ প্রদেশস্থ দেশমুখাপেক্ষা অধিক রাজস্ব দিতে অঙ্গীকার করিলেন। টর্ণার নাম প্রচণ্ডগড় রাখিলেন, এবং তাহাকে অধিকতর দুরাক্রম্য করিবার নিমিত্ত নূতন প্রাচীরনির্ম্মাণ ও পুরাতন প্রাকারাদির সংস্কার করাইতে লাগিলেন। দুর্গের মধ্যে একটি স্থান খনন করিতে করিতে সহসা স্বর্ণরাশি দৃষ্ট হইল। কাহার সঞ্চিত দ্রব্য কাহার ভোগে আইল! শিবজি এই ঘটনায় ভগবতী ভবানীর কৃপা দেখিলেন, এবং উৎসাহ সহকারে দুর্গসংস্কার সমাপন ও অস্ত্র শস্ত্র ক্রয় করিতে প্রযত্নশীল হইলেন। তদনন্তর টর্ণার

দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে মর্ব্বুধ পর্ব্বতোপরি একটি দুর্গ নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিলেন ; এবং সমাপ্ত হইলে তাহার নাম রাজগড় হইল (১৬৪৭)।

রাজগড় নির্ম্মাণ সম্বাদ বিজয়পুরে পৌছিলে, সুল্‌তান সাহজিকে ভয়প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিলেন। সাহজি তখন বিজয়পুরপতি-প্রদত্ত বাঙ্গালোর সন্নিহিত জায়গিরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি পুত্রের কার্য্যের ছন্দাংশ কিছুই জানেন না, সুল্‌তানকে এই মর্ম্মে উত্তর পাঠাইলেন ; এবং শিবজি ও কর্ণ্দেবকে লিপিদ্বারা যৎপরোনাস্তি অনুযোগ করিলেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দাদাজি শিবজিকে অনেক বুঝাইলেন ; বলিলেন "বিজয়পুরে তোমার পিতার যেমন মান সম্ভ্রম, বিশ্বস্তভাবে সুলতানের চাকরী করিলে তুমি একজন বড়লোক হইবে। আর যেরূপ কর্য্যে তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহাতে পদে পদে শঙ্কা ও বিপদ্ সম্ভাবনা।" শিবজি মিষ্ট কথায় আপনার বশ্যতা জানাইলেন ; কিন্তু বৃদ্ধ কর্ণ্দেব বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সংকল্প অনুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হইল না। দাদাজি একে পীড়ায় ও জরায় জীর্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে প্রভুবংশের বিপদাশঙ্কায় জর্জ্জরিত হইয়া আর অধিক দিন প্রাণধারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি শিবজিকে নিকটে ডাকাইলেন ; এবং সেই অন্তিম শয্যায় পূর্ব্বপ্রদর্শিত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন "বাছা, তুমি স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন চেষ্টায় বিরত হইও না ; গো, ব্রাহ্মণ ও কৃষকদিগকে রক্ষা করিও ; দেবমন্দির অপবিত্র করিতে দিও না ; এবং লক্ষ্মী তোমায় যে পথে লইয়া যান সেই পথেই অগ্রসর হইও।" অনন্তর শিবজির হস্তে আপনার পরিবারবর্গকে সমর্পণ করিয়া গতাসু হইলেন।

সেই বৃদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাগুরু ও প্রতিপালকের পরলোক গমনকালীন বাক্যগুলি স্বধর্ম্মানুরক্ত স্বাধীনতাপ্রিয় তেজস্বী যুবার অন্তঃকরণে দৈববাণীর ন্যায় অঙ্কিত রহিল। তিনি যে পথ অবলম্বন করিতেছিলেন, সে পথ তাঁহার এবং জায়গিরের কর্ম্মচারীদিগের চক্ষে পবিত্রভাব ধারণ করিল। শিবজির বাল্যকাল শেষ হইল ; তাঁহার জীবনের কার্য্য স্থিরীকৃত হইল।

এ সময়ে শিবজির বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর। তিনি ঈদৃশ অল্প বয়সেই দুইটী দুর্গের অধিকারী হইয়া রাজ্যসংস্থাপন করিবার সূত্রপাত করিয়াছেন। একবার সমালোচনা করিয়া দেখা যাউক তাঁহার ভাবী উন্নতির কি কি উপকরণ ছিল।

প্রথমেই দৃষ্ট হইতেছে যে, শিবজির পিতা বীরপুরুষ এবং মাতাও শূরকন্যা। জনকজননীর গুণ যে সন্তানে বর্ত্তে, তাহা অনেকেই জানেন। যেমন বাহ্য আকারে পিতামাতার সহিত সন্তানের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যেমন পীড়ার বীজ পিতামাতার শরীর হইতে সন্তানে যায়, তেমনই পিতামাতার ন্যায় মনোবৃত্তি সন্তানগণ প্রাপ্ত

হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? পর্য্যালোচক মাত্রেই অবগত আছেন যে, কোন কোন বংশে কোন কোন ক্ষমতা বা প্রবৃত্তির অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। রোমের ইতিহাস যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি কি ক্লডিয়াস বংশের দাম্ভিকতা এবং ফেবিয়াস বংশের ধীরতা ভুলিতে পারেন ? যে বংশে পাইসিস্ট্রেটস্, সোলন ও পেরিক্লিস্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রীসদেশীয় আল্‌কমিওনীয় বংশ যে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত কে না বলিবে ? যে কুল হইতে ফিলিপ্, আলেকজণ্ডর, পিরহাস ও টলেমিদিগের উৎপত্তি, সে কুলের যে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রতিভা ছিল, কে অস্বীকার করিবে ? কার্থেজের হামিল্কার ও হানিবল্ বিভূষিত বার্কা বংশ, ইংলণ্ডের বিজয়ী উইলিয়মের বংশ, প্রুসিয়ার বিখ্যাত ফ্রেড্রিকের বংশ, রুসিয়ার মহাত্মা পিটরের বংশ, ভারতবর্ষের ঔরংজেব পর্য্যন্ত বাবর বংশ প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে শৌর্য্য কোন কোন কুলের অনুগামী। ভোঁসলা এবং যাদব দুই শূর বংশ সংযোগে শিবজির জন্ম; সুতরাং তিনি শৌর্য্যপ্রভা লইয়াই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শিবজি যে কেবল স্বভাবতঃ বীরতা-প্রতিভাবিশিষ্ট ছিলেন, এমত নহে; বাল্যকালে তিনি একপ্রকার বীরত্ব বায়ুতে আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহার তিন হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সাহজির আহম্মদনগর রক্ষার্থে যুদ্ধ। এই সময়ে শিবজি কতবার শত্রুহস্তে পতিত হইতে হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। পরে যখন নিজামসাহী রাজ্য উচ্ছিন্ন হইল, মোগল সম্রাটের সহিত আদিলসাহী সুলতানের সন্ধি হইল, তখন বিজয়পুরপতির সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়া সাহজি কর্ণাট সমরে জয়পতাকা তুলিলেন। তদবধি অহরহঃ পিতার শৌর্য্যকথা ও বিজয়বার্ত্তা কর্ণদেব প্রভৃতির মুখে শিবজি শুনিতে পাইতেন; এবং জনকের যোগ্য পুত্র হইবেন, এরূপ বাঞ্ছা তাঁহার হৃদয়ে কেননা বলবতী হইবে ? বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি যেসকল ধর্ম্মগ্রন্থের উপাখ্যানসমূহ তিনি শ্রবণ করিতে ভাল-বাসিতেন, সে সমুদয়ও বীররসপরিপ্লুত! আর যে মাওলীরা তাঁহার চিরসঙ্গী, তাহারাও সাহসী ও সংগ্রামপ্রিয়। বীরবীর্য্যে যাঁহার জন্ম, বীরকন্যার স্তন্যে যাঁহার বালদেহ বর্দ্ধিত, বীররূপী পিতার বিজয়সংবাদ দিন দিন যাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইত, বীর যাঁহার উপাস্যদেবতা এবং বীর যাঁহার সহচর, সেই শিবজি কেননা বীরধর্ম্মা হইবেন ?

এই বীরের সম্মুখে দক্ষিণাপথের বিচ্ছিন্ন মুসলমান রাজ্যগুলি পড়িল। তাঁহার শৈশবেই আহম্মদনগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বিজয়পুর মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুর্ব্বল হইয়াছিল, এবং দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারে ব্যস্ত থাকিয়া শিবজির প্রথম উদ্যম বিফল করিতে পারিল না। কিন্তু রাজ্যের প্রথম সোপানগুলি সংস্থাপন কালেই বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করা যায়; ক্ষমতা একবার বদ্ধমূল হইলে

তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করা অতীব দুষ্কর। অধিকন্তু বিজয়পুরের প্রধান অবলম্বন মহারাষ্ট্রীয়গণ। তাহারা শিবজির স্বজাতি ও সমধর্ম্মা; সুতরাং ইহাও একটী সুলতানের দৌর্ব্বল্য ও শিবজির বলের কারণ। হিন্দুধর্ম্মের পতকা উড্ডীন করিলেই শিবজির অনুচরবর্গের উৎসাহবৃদ্ধি এবং বিপক্ষপক্ষের শক্তিহানি হইল।

এস্থলে আর একটি কথা বলাও অসঙ্গত হইতেছে না। দিল্লীশ্বরের দক্ষিণাপথ আক্রমণ শিবজির উন্নতির একটী প্রধান পরোক্ষ হেতু। এই আক্রমণে মোগলদিগের এবং দাক্ষিণাত্য ভূপালবর্গের বিস্তর বলক্ষয় হয়; মুসলমানগণের গৃহবিচ্ছেদ বাড়ে এবং ধর্ম্মবন্ধন অনেকদূর শিথিল হইয়া যায়; নিজামসাহী রাজ্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যবন-প্রভাবের বিলক্ষণ হ্রাস উপস্থিত হয়; এবং মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুদিগের প্রতিপত্তি, সমরকুশলতা ও স্বাবলম্বন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যদি দক্ষিণে আহম্মদনগর, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ড সম্মিলিত থাকিত এবং যদি দিল্লিপতি তাহাদিগকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন পূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্তে স্বীয় ক্ষমতা বিশেষরূপে বদ্ধমূল করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে মুসলমানদিগের প্রতাপ এত প্রবল হইত যে, কোনক্রমে কেহই তাহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিত না। ভগ্নালয়ে বৃষ্টিধারাও প্রবেশ করে; বিরোধবিভক্ত অনৈক্যজীর্ণ মুসলমান সাম্রাজ্য কেননা নবীন হিন্দুশক্তি প্রভাবে বিদীর্ণ হইবে?

শিবজি-জীবনের প্রথমাঙ্ক লিখিত হইল। যেরূপ রঙ্গভূমে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেরূপ অবস্থায় তাঁহার নিত্যনবস্ফূর্ত্তিশালী প্রতিভার প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, যেরূপ জ্ঞান ও কার্য্যমণ্ডলে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, একপ্রকার বর্ণিত হইল। সময়ান্তরে এই প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ লিখিবার বাঞ্ছা রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রম

"সোনার বরণ হলো কাল
গুণ দেখে মোর মন হারাল।"

কোথা হইতে কে এই গীত গাইতেছিল, তাহা কেবল বৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষের উপর বসিয়া একটি চিল জানিতে পারিতেছিল। বৃক্ষের সন্নিকটে উচ্চ স্তূপোপরি একটি শিবের মন্দির; তাহার পশ্চাদ্ভাগ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন; এবং তাহার চারিদিকে অতি নিবিড় বন। সেস্থল মনুষ্যসমাগম চিহ্নমাত্র রহিত। নিকটে অতি বৃহৎ প্রান্তর—বৃক্ষহীন, জনহীন, পশুহীন, শোভাহীন প্রান্তর। তন্মধ্য দিয়া গ্রাম্য পথ। কদাচিৎ সে পথে মনুষ্য যাইত; যদি কেহ যাইত তবে ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে মনুষ্য থাকিলে তাহাকে তাহার দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না।

সন্ধ্যাকাল; মেঘাচ্ছন্ন; অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। সেই ভগ্ন প্রকোষ্ঠ মধ্যে লুকাইয়া দশ বার জন মনুষ্য। তাহারই মধ্যে একজন মৃদু মৃদু গান করিতেছিল, তিন্তিড়ী বৃক্ষারূঢ় পক্ষিভিন্ন আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিল না। অকস্মাৎ গান বন্ধ হইল, গায়ক কহিল, "কে আসিতেছে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "যে আসিবার সে আসিতেছে!"

ইতিমধ্যে খর্ব্বাকৃতি অথচ বলিষ্ঠ এবং মল্লবেশী এক ব্যক্তি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রকোষ্ঠস্থ ব্যক্তিরা তাহাকে ব্যগ্রতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সম্বাদ আনিলে?"

আগন্তুক কহিল, "ঠিক সন্ধ্যার সময় বাবু পাল্কীতে উঠিবে।"

"এই পথ দিয়া যাবে?"

"হাঁ, এই পথ দিয়া।"

"সঙ্গে কয় জন বেহারা ?"

"বার জন।"

"আর কোন লোক সঙ্গে আস্‌বে ?"

"তা বুঝলুম না।"

"বেহারাদের কেমন দেখ্‌লে ?"

"দিব্বি কালো কালো নন্দঘোষের মত, কাহারও কাহারও বোকা ছাগলের মত দাড়ি আছে।"

"আহা! তামাসা ছাড়, বলি আমরা দশ জনে বার জন বেহারার মোহাড়া নিতে পার্‌বো ?"

"পার্‌বে, আমাদের চীৎকার শুন্‌লেই তাহারা মোহ যাবে।"

ইত্যবসরে দূরনিঃসৃত অস্ফুট ভ্রমর গুণ গুণবৎ শিবিকাবাহকদের কোলাহল নৈশগগন ভেদ করিয়া শ্রুতিগোচর হইল। রজনী ঘনান্ধকার, নিকটের মানুষ লক্ষ্য হয় না সুতরাং শিবিকা কোন্ পথ দিয়া আসিতেছিল তাহা দৃষ্ট হইল না। সমস্ত দিবস বৃষ্টি হওয়াতে প্রান্তরপথ অতি দুর্গম হইয়াছিল, তজ্জন্য বাহকদিগের পা মধ্যে মধ্যে পিছলিয়া যাইতেছিল। বাহকেরা দেবতাকে, মাঠকে এবং কখন কখন শিবিকারোহীকে গালি আরম্ভ করিল; কিন্তু ইহাদিগকে গালি দিয়া তৃপ্তিলাভ না হওয়াতে, কেহ কেহ সমভিব্যাহারী বাহকের সহিত কলহ আরম্ভ করিল। এইপ্রকার বিবাদ করিতে করিতে বনমধ্যে ভগ্নমন্দির নিকটবর্ত্তী হইল, কিন্তু এইখানে শুষ্ক স্থান পাইয়া কাঁধ বদলাইতে শিবিকা থামাইল। একজন বাহকের পা আর একজনের পায়ের উপর পড়াতে দুইজনে বচসা হইতে লাগিল। ইতি-মধ্যে অলক্ষ্যে বেহারাদিগের উপরে শ্রাবণের ধারাবৎ যষ্টির আঘাত হইতে লাগিল। বাহকেরা প্রথমতঃ চমকিত ও বিহ্বল হইল। পরে আপনাদিগের দলের মধ্যে যষ্টিহস্ত অপরিচিত লোক দেখিয়া শিবিকা রাখিয়া পলায়ন করিল, এবং তাহাদিগের দেখাদেখি শিবিকারক্ষক দুইজন হিন্দুস্থানি মল্লবেশীও পলায়ন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দেবমন্দির

দস্যুরা এক্ষণে নির্জ্জন দেখিয়া শিবিকার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখিল, উহার মধ্যে রজনী বাবুর পরিবর্ত্তে একজন অবগুণ্ঠনবতী রমণী রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে দস্যুবর্গ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও বিস্ময়বিহ্বল হইয়া রহিল। তৎপরে শিবিকারোহী রমণী বলিল—"তোমরা যদি টাকার জন্য আমার পাল্কী ধরিয়া থাক তবে ভুল

করিয়াছ—আমার সঙ্গে টাকা নাই, গাত্রেও অলঙ্কার নাই, আমি বিধবা। কিন্তু যদি আমাকে সুবর্ণপুরে আমার বাটী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দাও তা হলে আমি পুরস্কার দিব ও এই ঘটনা গোপন করিব—"

একজন দস্যু কহিল, "তোমার বাড়ী সুবর্ণপুরে ?"

রমণী। হাঁ।

দস্যু। তোমাদের কোন্ বাড়ী, রজনীবাবুদের বাড়ী ?

রম। হাঁ সেই বাড়ীই বটে।

দস্যুরা চুপি চুপি পরামর্শ করিতে লাগিল। একজন কহিল, "ওরে গোবরা, আমাদের বড় ভুল হয়েছে, রজনীবাবুর সুবর্ণপুর হইতে আসিবার কথা, কিন্তু এ পাল্কী ঠিক উল্টাদিক্ দিয়া এসেছে, এ পাল্কী সুবর্ণপুরে যাবে ; সুবর্ণপুর থেকে ত আস্‌ছিল না। আমাদের ঠিকে ভুল হয়েছে।"

একজন প্রবীণ দস্যু কহিল, "যা হবার হয়েছে এখন কি পরামর্শ।"

গোবরা কহিল, "মেয়েমানুষটা বোধ হয় রজনীবাবুর বোন, উহাকে রজনীর বদলে আমাদের বাবুর নিকট নিয়ে গেলে বোধ হয় কাজ হবে, কি বলিস্ রে ?"

দস্যুগণ সকলেই এই পরামর্শ সঙ্গত বিবেচনা করিয়া চারিজন দস্যু দ্বারা শিবিকাসহিত রমণীকে লইয়া চলিল। রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে অতিশয় অন্ধকার হইয়াছে। দস্যুরা প্রান্তর পার হইয়া গ্রাম্যপথ ত্যাগ করিয়া অন্য এক পথ ধরিল ; দেখিয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কোথায় যাইতেছ ? এ ত সুবর্ণপুরের পথ নয়—"

দস্যুরা উত্তর করিল না দেখিয়া রমণী চিন্তিত হইলেন ; কিন্তু তাহাদিগের অনুনয় বিনয় অথবা ভয়প্রদর্শন বৃথা বোধে আপনার অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া মৌনাবলম্বনে রহিলেন। দস্যু বাহকগণ রমণীর এইপ্রকার নির্ভীকতা দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "বাবুরা হলে এতক্ষণ কত কাঁদিত, কত আমাদের পায়ে পড়িত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! এ ছুঁড়ি একবার চেঁচালে না।" ক্রমে শিবিকার দুই পার্শ্ব গাঢ় অন্ধকারময় হইল। রমণী বুঝিল যে, শিবিকা কোন নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কিছুক্ষণ এই প্রকার অন্ধকারময় নিবিড় অরণ্য অতিবাহিত করিয়া এক স্থানে শিবিকা থামিল, এবং পরক্ষণেই একজন দস্যু কহিল, "বেরিয়ে এসগো ঠাকুরুণ—"

রমণী শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড মন্দির, চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার, এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিতেছে। তখন আদেশ মত একজন দস্যুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কুমুদিনী

রমণী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গৈরিকবসনপরিহিত, শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল, এক যুবা সম্মুখে পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি পূজা করিতেছেন। রমণী গাঢ় অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণের পর তাঁহার সমভিব্যাহারী দস্যু কহিল, "বাবু মহাশয়!" পূজক কিঞ্চিৎ বিলম্বে দস্যুদিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, সফল হইয়াছে?"

দস্যু উত্তর না করিয়া হঠাৎ চমকিতনেত্রে রমণীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। তাহার কারণ এই যে পূজকের কণ্ঠস্বরে অবগুণ্ঠনবতী হঠাৎ অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। পূজকও দস্যু যেদিকে চমকিতনেত্রে চাহিতেছিল, সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "এ কে, এ যে স্ত্রীলোক!"

দস্যু। আজ্ঞে, একটা ভ্রম হয়েছে, তাঁহাকে ধরিতে গিয়া একটা স্ত্রীলোককে ধরে ফেলেছি।

পূজক ক্ষণকাল অবগুণ্ঠনবতীকে আপাদ মস্তক অবলোকন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?" কিন্তু স্ত্রীলোক কোন উত্তর না করাতে পূজক পুনরপি কহিলেন, "আপনি ভীতা হইবেন না। স্বচ্ছন্দে পরিচয় দিন, কোন ভয় নাই। রমণী অবগুণ্ঠন হইতে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি কারণে দস্যুদ্বারা আমায় ধৃত করিলেন?"

উত্তর। আমার চিরশত্রুকে ধরিতে গিয়া ভ্রমক্রমে আপনাকে ধরিয়াছে। আপনার কোন আশঙ্কা নাই।

র। কোন আশঙ্কা নাই তাহার বিশ্বাস কি?

উত্তর। বিশ্বাস এই যে আমি এই ইষ্টদেবতার সম্মুখে অসত্য কথা কহিব না বা অন্যায় কার্য্য করিব না।

অবগুণ্ঠনবতী দস্যুকে মন্দির হইতে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "কিন্তু যখন এই ইষ্টদেবতার সম্মুখে বন্দী করিবার অভিলাষে রজনীকান্তকে ধৃত করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন তখন আপনাকে বিশ্বাস কি?

যেমন নিকটস্থ কোন বস্তুতে বজ্রাঘাত হইলে পথিক চমকিত ও বিহ্বল হয়, পূজক সেই প্রকার হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

রমণী দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার অগ্রজের পত্নী কুমুদিনী।"

পাঠক এতক্ষণে বোধ হয় শ্মশ্রুবিশিষ্ট পূজককে চিনিতে পারিয়াছেন। তিনি রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রজনীকান্তের পিতার দ্বারা হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া উদাসীন

হইয়াছেন। তিনি ক্ষণেক নীরব রহিলেন; পরে বিহ্বলের ন্যায় অস্ফুটস্বরে স্বগত বলিতে লাগিলেন "ইনি এখানে কেন?"

কুমুদিনী কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে কহিলেন, "তুমিই আমায় ধরিয়া আনাইয়াছ?"

রতিকান্ত অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "আপনার কি আমার এ অবস্থা দেখিয়া দয়া হয় না, এখনও ভৎর্সনা!"

কুমুদিনী উত্তর করিলেন না, কিন্তু রতিকান্ত বুঝিতে পারিলেন যে, কুমুদিনী কাঁদিতেছেন, তাঁহার পাষাণ নির্ম্মিত হৃদয় আর্দ্র হইল, চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কুমুদিনী কম্পিত স্বরে বলিলেন, "এ দুঃখ কি জন্য? কেন স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছ? এস, গৃহে চল, তাহাদিগকে লইয়া সংসার করিবে চল।"

রতি। গৃহে যাইয়া কি খাইব?

কুমু। আমার বহুমূল্যের অলঙ্কার আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া খাইবে।

রতিকান্তের পুনরায় কঠিন হৃদয় দ্রব হইল, নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল।

রতি। আমি আপনার অনুরোধে গৃহে যাইতে পারি, কিন্তু আমার পৈতৃক ঐশ্বর্য্য যে রজনীকান্ত আমার সম্মুখে ভোগ করিবে তাহা আমার অসহ্য হইবে!

কুমু। রজনীকান্ত ধর্ম্মভীত লোক—সবিশেষ জানিতে পারিলে তোমার পৈতৃক সম্পত্তি তোমাকে ফিরিয়া দিতে পারেন।

রতিকান্তের হঠাৎ ভাবান্তর হইল এবং অতি রুষ্টভাবে কহিলেন, "কি! ভিখারীর ন্যায় রজনীকান্তের দ্বারস্থ হইব, আর সে আমাকে দ্বারবান্ দ্বারা বহিস্কৃত করিবে!"

কুমু। রজনীকান্ত আমার ভগিনীপতি, আমি অনুরোধ করিলে তোমার সহিত কুব্যবহার করিবেন না।

রতিকান্ত ক্ষণেককাল ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিলেন, তৎপরে কহিলেন, "আমার স্মরণ ছিল না যে, রজনী আপনার সম্পর্কীয় ও এত আত্মীয়—আপনি আমার অন্তরের অতি গুহ্য কথা জানিতে পারিয়াছেন, এক্ষণেই উহা রজনীকান্তকে জ্ঞাত করাইবেন।"

কুমু। এ অতি অন্যায় কথা, আমার রজনীও যেমন তুমিও তেমন, আমি দিবারাত্র কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি যেন নাইতেও তোমার মাথার কেশ ছেঁড়ে না।

রতি। আপনি যাহা বলিতেছেন সকলি সত্য, কিন্তু আমি অতি পাষণ্ড, আমি পৃথিবীর উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি। আপনি এই দেবীর পদস্পর্শ করিয়া

শপথ করুন যে, রজনীর প্রতি আমার যে অভিপ্রায় তাহা গোপন রাখিবেন।

কুমুদিনী উত্তর করিলেন না, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে অতি কঠিন স্বরে বলিলেন, "আমি তোমার কে, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ ?"

রতি। আপনি আমার ভ্রাতৃজ্জায়া, তাহা বিস্মৃত হই নাই, কিন্তু রজনী যে আপনার ভগিনীপতি তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

কুমু। তবে আমার সহিত এমত কুব্যবহার করিতেছ কেন ?

রতি। কেবল আত্মরক্ষার্থ।

কুমু। আমার দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা কেন, আমি কি তোমার শত্রু ?

রতি। আমার শত্রু নন, কিন্তু রজনীর ত মিত্র।

কুমু। ছি! তোমার অন্তঃকরণ অতি কুৎসিত হইয়াছে।

রতি। শপথ করুন।

কুমু। আমি শপথ করিব না।

রতি। রজনীকে সকল জ্ঞাত করাইবেন ?

কুমু। তাঁহার বিপদ্ তাঁহাকে জানাইব।

রতি। শুনুন, যদি আপনি শপথ না করেন, তবে অদ্য রাত্রেই আপনার ভগিনী স্বর্ণপ্রভাকে বিধবা করিব।

কুমু। আচ্ছা, তবে আমি চলিলাম।

রতিকান্ত দ্বারদেশে দুই হস্ত বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যতক্ষণ না রজনীর মৃত্যু হয় ততক্ষণ আপনি এই ঘরে বন্দী রহিলেন।"

কুমু। তুমি আজিও এমন পাষণ্ড হও নাই, এ সকল কার্য্য তোমার দ্বারা অসম্ভব।

র। তবে দেখুন।

এই বলিয়া রতিকান্ত, দস্যুদিগের দলপতিকে আহ্বান করিয়া মন্দিরের সোপানের নিকট দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কি বলিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, কুমুদিনী তথায় নাই। আশ্চর্য্য হইয়া আলোক লইয়া মন্দিরের চতুষ্কোণ ও অন্যান্য স্থান অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন সমূহ বিপদ্ বিবেচনা করিয়া দস্যুদিগের সহিত স্বয়ং যাত্রা করিলেন।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত

"ওরে রে চপল মন, কতই কর ভ্রমণ,
পাতাল পর্য্যন্ত এস ঘুরে।
কভু ভ্রম দিঙ্‌মণ্ডলে, কখন বা নভঃস্থলে,
উল্লঙ্ঘিয়া যাও স্বর্গপুরে॥
কিন্তু তব অভ্যন্তরে, লীন ব্রহ্ম পরাৎপরে,
ভ্রমেও না করহ স্মরণ।
যিনি সন্নিকট হেন, বল ভাই কেন কেন,
তাঁর প্রতি বিরতি এমন॥"

শান্তি শতক

হিংসাহীন যত্নাভাবে সুলভ্য অশন
সর্পগণ হেতু বিধি সৃজিলা পবন॥
পশুকুল তৃণাঙ্কুর ভোগে পুষ্টকায়।
ভূমিতে শয়ন করি সুখে নিদ্রা যায়॥
কিন্তু এ সংসারসিন্ধু লঙ্ঘন কারণে।
দিয়াছেন উপযুক্ত বুদ্ধি নরগণে॥
অন্বেষণ করিলেই যে বুদ্ধির বলে।
সকল প্রকার গুণ ন্যস্ত করতলে॥

বৈরাগ্য শতক

কই সে মুখারবিন্দ মধুর অধর।
কোথায় আয়ত সে কটাক্ষ কটুতর॥
কোথা সে কোমল কথা শ্রুতি সুখকারী।
ভুরুর ভঙ্গিমা, স্মরধনু দর্পহারী॥
এযে অস্থি পঞ্জরেতে প্রকট দশন।
মঞ্জু মঞ্জু গুঞ্জরিছে তাহে সমীরণ॥
মহা মোহ জালরূপ শবের কপাল।
রাগান্ধের মত হাসে হেরিতে করাল॥

শান্তি শতক

কি প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্য্যসাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনকদুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্য্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধা নায়িকাগণ—সীতার অনুকরণ মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আর্য্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা বলিতেছি না—কিন্তু সীতানুবর্ত্তিনী নায়িকারই বাহুল্য। আজিও, যিনিই সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাদিতে বিদ্যাপ্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন।

ইহার কারণও দুরানুমেয় নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এইপ্রকার স্ত্রীচরিত্রই আর্য্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আর্য্যস্ত্রীগণের এই জাতীয় উৎকর্ষই সচরাচর আয়ত্ত।

মহাভারতকার যে রামায়ণকে একপ্রকার আদর্শ করিয়া কিম্বদন্তীমূলক বা পুরাণকথিত ঘটনা সকলকে ইতিহাসসূত্রে গ্রন্থিত করিয়াছেন, এই বঙ্গদর্শনে পূর্ব্বপ্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এমত কথার আভাস দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রধান নায়িকা সম্বন্ধে মহাভারতকার নিতান্ত নিরপেক্ষ। মহাভারতে নায়ক-নায়িকার ছড়াছড়ি—অতএব সীতাচরিত্রানুবর্ত্তিনী নায়িকারও অভাব নাই কিন্তু দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে, মহাভারতকার অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।

সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন, কেননা, কবির অভিপ্রায় এই যে, পতি এক হৌক, পাঁচ হৌক, পতিমাত্র ভজনাই সতীত্ব। উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুণ্ণমতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা

এবং গুরুজনের বাধ্য। কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ; দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতার স্ত্রীজাতির কোমল গুণগুলিন পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন গুণ সকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা জায়া, দৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্যা বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদীহরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।

দ্রৌপদী-চরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দুরূহ; কেননা মহাভারত অনন্ত সাগরতুল্য, তাহার অজস্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ কোথায় যায়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ কে করিতে পারে। তথাপি দুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত্ন করিতেছি।

দ্রৌপদীর সয়ম্বর। দ্রুপদরাজার পণ যে, যে সেই দুর্বেধনীয় লক্ষ্য বিঁধিবে, সেই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে। কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, ঋষিগণ সমবেত। এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারী কুসুম শুকাইয়া উঠে। সেই বিশোষ্যমাণা কুমারী লাভার্থ দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীর সকল লক্ষ্য বিঁধিতে যত্ন করিতেছেন। একে একে সকলেই বিন্ধনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। হায়! দ্রৌপদীর বিবাহ হয় না।

অন্যান্য রাজগণ মধ্যে সর্ব্ববীরশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার এখানে কি করিতেন বলা যায় না—কেননা এটি বিষম সঙ্কট। কাব্যের প্রয়োজন, পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিলে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্যবিন্ধনে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন। কিন্তু মহাভারতের মহাকবি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ণের বীর্য্য, তাঁহার প্রধান নায়ক অর্জ্জুনের বীর্য্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অর্জ্জুনহস্তে পরাভূত বলিয়াই অর্জ্জুনের গৌরবের এত আধিক্য; কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্য্য করিলে অর্জ্জুনের গৌরব কোথা থাকে? এরূপ সঙ্কট, ক্ষুদ্রকবিকে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন যে, তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই—কর্ণকে না তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষতি হয় তাহা তিনি বুঝিবেন না—সকল রাজাই যেখানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী লোভে লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণই যে কেন একা উঠিবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই।

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময় এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী। তিনি অবলীলাক্রমে কর্ণকে লক্ষ্যবিন্ধনে উত্থিত করিলেন, কর্ণের বীর্য্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, এবং

সেই অবসরে, সেই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত করিলেন। যেদিন জয়দ্রথ দ্রৌপদীকর্ত্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন দুর্য্যোধনের সভাতলে দ্যূতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামী হইতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বলিয়াছি, সেই প্রচণ্ড প্রতাপ সমন্বিতা মহাসভায় কুমারী কুসুম শুকাইয়া উঠে। কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে, রাজমণ্ডলী, বীরমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলীমধ্যে, দ্রুপদরাজ তুল্য পিতার ধৃষ্টদ্যুম্নতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া কর্ণকে বিদ্ধনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষহাস্যে সূর্য্যসন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এই এক কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এস্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না— দ্রৌপদীকে তেজস্বিনী বা গর্ব্বিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজদুহিতার দুর্দ্দমনীয় গর্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল।

ইহার পর দ্যূতক্রীড়ায়, বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগর্ব্বিত, তেজস্বী এবং বলধারী ভীমার্জ্জুন দ্যূতমুখে বিসর্জ্জিত হইয়াও, কোন কথা কহেন নাই, শত্রুর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এস্থলে তাঁহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা কর্ত্তব্য? স্বামিকর্ত্তৃক দ্যূতমুখে সমর্পিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আর্য্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রতিকামীর মুখে দ্যূতবার্ত্তা এবং দুর্য্যোধনের সভায় তাঁহার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন, "হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমন পূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও। ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।" দ্রৌপদীর অভিপ্রায়, কূটতর্ক উপস্থিত করিবেন।

দ্রৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, ধর্ম্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রাকৃত নহে। মহাভারতকার এই দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন; ভীমসেনে, অর্জ্জুনে, অশ্বত্থামায় এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়চরিত্রে এতদুভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায় এবং অর্জ্জুনে ও অশ্বত্থামায় অর্দ্ধমাত্রায় দেখা যায়। দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দ্দেশ করিতেছি না; মানসিক

তেজস্বিতাই আমাদের নির্দ্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অর্জ্জুনে এবং অভিমন্যুতে ইহা আত্মশক্তিনিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেনে ইহা বলবৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল; কেবল দ্রৌপদীতেই ইহা ধর্ম্মানুরাগ অপেক্ষা প্রবল। নহিলে তিনি স্বয়ম্বর সভাতলে পিতৃসত্যের ব্যতিক্রম করিয়া বলিতেন না যে, "আমি সূতপুত্রকে বিবাহ করিব না।" তা না হইলে দুর্য্যোধনের সভায় স্বামীর পণ ব্যতিক্রম করিয়া কূটপ্রশ্ন করিতেন না। এটি স্বভাবসঙ্গতই হইতেছে, স্ত্রীলোকের গর্ব্ব, সহজে ধর্ম্মকে অতিক্রম করে। এত সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে দ্রৌপদী-চরিত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্বিতা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি দুঃশাসনকে বলিলেন, "যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না।" স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বসমীপে মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" ভীষ্মাদি গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই।" কিন্তু অবলার তেজঃ কতক্ষণ থাকে! মহাভারতের কবি, মনুষ্যচরিত্র-সাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলিল, দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না—ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশ! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি—আমাকে উদ্ধার কর।" এস্থলে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ।

বলিয়াছি যে, দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প এত প্রবল যে, তাহাতে সময়ে সময়ে ধর্ম্মজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও অসামান্য—যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্ম্মানুরাগিনী আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্ম্মানুরাগই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ। এই অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ, এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্ম্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্য, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার বরগ্রহণ কালে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সে স্থানটি এত সুন্দর যে, যিনি তাহা শতবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অসুখী হইবেন না। এজন্য সেই স্থানটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—

"হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়, কেননা প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্ত্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,"হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উঁহারা পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।"

এইরূপ ধর্ম্ম ও গর্ব্বের সুসামঞ্জস্যই দ্রৌপদীচরিত্রের রমণীয়তার প্রধান উপকরণ। যখন জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণ মানসে কাম্যক বনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে ধর্ম্মাচারসঙ্গত অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্ন করেন; পরে জয়দ্রথ আপনার দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই তেজোগর্ব্ব বচন পরম্পরা পাঠে মন আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভীমার্জ্জুনের পত্নী এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তাঁহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সিন্ধু সৌবীরাধিপতি ভূতলে পতিত হয়েন।

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্ব্বার বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন; তখন দ্রৌপদী যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিনী বীরনারীর কার্য্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও চীৎকার কিছুই করিলেন না; অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় একবারও অনবধান এবং বিলম্বকারী স্বামীগণের উদ্দেশে ভৎর্সনা করিলেন না; কেবল কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন

তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্ব্বিত বচনে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলীলাক্রমে স্বামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধারের যোগ্য।

দ্রৌপদী কহিলেন, "রে মূঢ়! তুমি অতি নিদারুণ আয়ুঃক্ষয়কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ঐ সকল মহাবীরের পরিচয় লইয়া কি করিবে? উঁহারা সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন; আজি তোমাদিগের মধ্যে কেহই জীবিতাবশিষ্ট থাকিবে না। এক্ষণে অনুজগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার সকল ক্লেশই অপনীত হইল; আমি তোমা হইতে আর কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করি না। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি ধর্ম্মরোধে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি; শ্রবণ কর।

যাঁহার ধ্বজাগ্রভাগে নন্দ ও উপানন্দ নামক সুমধুর মৃদঙ্গদ্বয় নিনাদিত হইতেছে। যাঁহার বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় গৌর, নাসা উন্নত ও লোচনদ্বয় আয়ত, উনিই আমার পতি, কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। কুশলাভিলাষী মনুষ্যেরা ধর্ম্মার্থবেত্তা বলিয়া উঁহার অনুসরণ করিয়া থাকে। উনি শরণাগত শত্রুরও প্রাণদান করেন; অতএব তুমি যদি আপনার শ্রেয় ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবিলম্বেই উঁহার শরণাপন্ন হও।

যিনি শাল বৃক্ষের ন্যায় উন্নত, যাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, আনন ভ্রূকুটী-কুটিল ও ভ্রূদ্বয় পরস্পর সংহত, যিনি মুহুর্ম্মুহু ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছেন, উনি আমার পতি, মহাবীর বৃকোদর। আয়ানেয় নামক মহাবল অশ্বেরা প্রফুল্ল মনে উঁহারে বহন করিয়া থাকে। উঁহার কর্ম্ম সকল অলোকসামান্য এবং উঁহার ভীম এই সার্থক নামটি পৃথিবীতে সুপ্রচার হইয়াছে। উঁহার নিকট অপরাধী হইলে অতি বলবতী জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। ইনি শত্রুতা কদাচ বিস্মৃত হন না এবং শত্রুর প্রাণান্ত না করিয়া অন্তঃকরণে অণুমাত্র শান্তিলাভ করেন না।

ইঁহার নাম যশস্বী অর্জ্জুন। ইনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও প্রিয় শিষ্য; ভয়, লোভ বা কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন না এবং নৃশংসাচারেও নিরত নহেন। ইনি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, সর্ব্বধর্ম্মার্থবেত্তা এবং ভয়ার্ত্তের ত্রাতা; ইঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য ত্রিলোকে প্রথিত আছে। অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ সততই এই প্রাণপ্রিয় অর্জ্জুনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এই মহাবীরের নাম নকুল; ইনি আমার পতি। ইনি খড়্গযুদ্ধে অদ্বিতীয়; আজি দৈত্যসৈন্য মধ্যবর্ত্তী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রণস্থলে ইঁহার অদ্ভুত কর্ম্ম সমুদায় প্রত্যক্ষ করিবে। ইনি মহাবল পরাক্রান্ত, মতিমান্ ও মনস্বী এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিরন্তর সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। আর যাঁহারে সূর্য্যসম তেজঃসম্পন্ন দেখিতেছ, উনি আমার পতি,

সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব, উঁহার তুল্য বুদ্ধিমান্ ও বক্তা আর নাই। উনি অনায়াসে প্রাণত্যাগ বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন; তথাপি অধর্ম্ম ব্যবহারে কদাচ প্রবৃত্ত হন না এবং কিছুতেই অপ্রিয় সহ্য করিতে পারেন না। উনি আর্য্যা কুন্তীর প্রাণ-প্রিয় পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে একান্ত নিরত।

যেমন অর্ণবমধ্যে রত্নপরিপূর্ণ নৌকা মকরপৃষ্ঠে আহত হইলে চূর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া যায়, এক্ষণে আমি সৈন্যগণমধ্যে তদ্রূপ বিক্ষোভিত ও অসহায় হইয়াছি। তুমি মোহাবেশপরবশ হইয়া যাঁহাদিগকে এইরূপ অবমাননা করিতেছ, সেই পাণ্ডবেরা তোমারে অবিলম্বে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন; কিন্তু অদ্য যদি তুমি ইঁহাদিগের নিকট পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তোমার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।"*

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকীয় উক্তি

দেবীবর ঘটক বিষয়ে যে প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, তাহা শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত "সম্বন্ধ-নির্ণয়" নামক উৎকৃষ্ট অভিনব পুস্তকের এক অংশ। ঐ পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বে বিদ্যানিধি মহাশয় তদংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে ঐ প্রবন্ধটি যন্ত্রস্থ হইয়া প্রস্তুত ছিল, কিন্তু নানা বিঘ্ন বশতঃ বঙ্গদর্শন প্রচারে বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে মূল পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।

---

* এই প্রবন্ধ, যাহা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে।

চতুর্থ বর্ষ ঃ ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রথম অধ্যায়

(চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা)

মানব সমাজের প্রকৃতি মানবদেহের ন্যায়। দেহ যেরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—প্রাচীন মাংস, রক্ত, মজ্জা, অস্থি, শিরা, ধমনী ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে ও নূতন মাংস, রক্ত, মজ্জা, অস্থি, শিরা ও ধমনী তৎস্থলাভিষিক্ত হইতেছে, মানব সমাজও সেইরূপ প্রতি মুহূর্ত্ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে—প্রাচীন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, কৌশল, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্ম উঠিয়া যাইতেছে ও নূতন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, কৌশল, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে। তোমার অদ্য যে দেহ দৃষ্ট হইতেছে সাত বৎসর পরে তাহার কিছুই থাকিবে না কিন্তু তুমি পরিণতবয়স্ক, তোমার আকারগত অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়াও এত সৌসাদৃশ্য থাকিবে যে, তোমাকে চিনা যাইবে ; কিন্তু তুমি যে ভাগিনেয়ের মুখে অন্নপ্রাশন কালে অন্ন দিয়াছিলে, দশ বৎসর পরে তাহাকে দেখিলে কি চিনিতে পার? মানবসমাজ সম্বন্ধেও অবিকল ইহাই ঘটিয়া থাকে। বর্দ্ধিত অর্থাৎ সভ্যসমাজ যদিও পরিবর্ত্তশীল, তথাপি ২।১ শতাব্দীর মধ্যে তাহার গঠনগত বিশেষ রূপে পরিবর্ত্তন হয় না। পক্ষান্তরে অসভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য সমাজে কোন বিশেষ উন্নতির কারণ নূতন প্রবর্ত্তিত হইলে, স্বল্পকাল মধ্যে উক্ত সমাজকে এত বিপর্য্যস্ত করে যে, ঐ সমাজের সঙ্গে পূর্ব্বতন সমাজের কোনই সৌসাদৃশ্য থাকে না। ভারতের আধুনিক অবস্থা প্রথমোক্ত স্থলের উদাহরণ এবং ইদানীন্তন জেপান সাম্রাজ্য শেষোক্ত স্থলের উদাহরণ।

মানব সমাজের এইরূপ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ব্যতীত সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ কারণে শরীরের ব্যাধিগত পরিবর্ত্তের ন্যায় একএকটী বিশেষ পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে ব্যাধিগত শারীরিক পরিবর্ত্ত নিরবচ্ছিন্ন মন্দ, আর এইরূপ সামাজিক বিপ্লবঘটিত পরিবর্ত্তে সমাজ সময়ে সময়ে যে জন্য অপকৃত হয় আবার সময়ে সময়ে সেজন্য উপকৃতও হইয়া থাকে।

যেমন শরীরে অদ্য যে ব্যাধি অনুভূত হয়—অনুসন্ধান করিলে জানা যায় তাহার কারণ অনেক পূর্ব্বে (হয়ত জন্ম কালেই) উদ্ভাবিত হইয়াছে। সেইরূপ ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও জানা যায়, যে বিপ্লব অদ্য সমাজকে আলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত করিতেছে তাহার কারণ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে উদ্ভাবিত হইতেছিল। বাস্তবিক বিবেচনা করিলে বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নহেন। যে দিন ব্রাহ্মণগণ ভারতে একাধিপত্য করিলেন, ভারতের মান-মর্য্যাদা, বিদ্যা-বুদ্ধি, সুখ-সম্পত্তি এবং পরিণামে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত একচাটিয়া করিয়া লইলেন, সেই দিনই ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল, মহাত্মা শাক্যসিংহ সেই সকল অগ্নি একত্রিত করিয়া, তাহাতে নবীন আহুতি দিয়া, যে অগ্নি জ্বালিলেন তাহা সমুদয় ভারত, সমুদয় আসিয়া আলোকিত করিল।

এই সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া আমরা কোনমতে চৈতন্যদেবকর্ত্তৃক বঙ্গসমাজের পরিবর্ত্তন হঠাৎ অর্থাৎ কোন বিশেষ কারণমূলক নহে একথা বলিতে পারি না। দৃষ্টিনিরপেক্ষ যুক্তিতে ও অতীত কালের দৃষ্টান্তে যাহা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, বঙ্গ সমাজের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও তাহাই জাজ্বল্যমান প্রমাণিত হইবে। এই আন্দোলনের কারণও বহুকাল হইতে সঞ্চিত হইতেছিল।

সাধারণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে, চৈতন্যদেব কেবল মাত্র ধর্ম্ম সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ কখন বা জ্ঞানকাণ্ড কখন বা কর্ম্মকাণ্ড প্রধান হইয়াছিল; কিন্তু তিনি বঙ্গের সমুদয় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ভক্তির বীজ বপন করিয়াছিলেন। সত্য বটে ভক্তি মাহাত্ম্য প্রচারই চৈতন্যদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা বঙ্গের কি সামাজিক অবস্থা, কি সাহিত্য, কি গার্হস্থ্য সকল বিষয়কেই নব আলোক ও নব জীবনে রঞ্জিত করিয়াছিল। জাতিভেদ রহিত, অসবর্ণে বিবাহ, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি যে সমুদয় সামাজিক পরিবর্ত্তনের* জন্য উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকগণ সর্ব্বদা চীৎকার ও অনেক "টেবল থাবড়াইয়াও," সত্য বলিলে, কিছুই করিতে পারিতেছেন না; চৈতন্য এ সকল কর্ত্তব্যবিশেষের জন্য কিছুমাত্র যত্ন না করিয়া একমাত্র ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক বঙ্গসমাজের আন্দোলন ধর্ম্মমূলক হইয়াও কেবল মাত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলন নহে। এই জন্য উক্ত আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বঙ্গসমাজের সকল শাখা প্রশাখার অবস্থাই পর্য্যালোচন আবশ্যক।

*ইহার সকল গুলিনকে আমরা প্রকৃত উন্নতি জ্ঞান করি না এই জন্য উন্নতি আখ্যা প্রদান না করিয়া পরিবর্ত্তন মাত্র বলিলাম। শ্রীক্ব—

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গীয় আর্য্যোপনিবেশীদিগের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তে যায়। শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজকর্ম্মচারী, সৈনিক পুরুষ প্রভৃতি অনেকেই হিন্দু ছিলেন। দাস-রাজের সেনাপতি বখ্‌তিয়ার বঙ্গে প্রবেশ করিলে, রাজসভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রোদ্ঘাটন করিয়া রাজাকে বলিলেন, "বঙ্গে যবনাধিকার অনিবার্য্য যে হেতু শাস্ত্রে লেখা আছে।" বখ্‌তিয়ার ১৭ জন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া রাজধানী প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে, শাস্ত্রের বচন অখণ্ড্য। রাজা যুদ্ধ করিলে নিশ্চয় পরাজয় হইবে স্থির বুঝিয়া বিজ্ঞের কার্য্য করিলেন—সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে পলায়ন করিলেন। আজন্ম অশীতি বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজত্বের প্রতি মমতা এতাধিক! বঙ্গদেশাধিপতির এত বীর্য্য ও তেজস্বিতা! পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এরূপ হাস্যজনক রাজপরিবর্ত্ত আর প্রায় দেখা যায় না। যে দেশে এত নিস্তেজ ও আত্মাভিমানশূন্য রাজা নিরাপদে রাজত্ব করিতে পারেন, তথাকার অধিবাসিগণ কত দুর্ব্বলপ্রকৃতি ও অভিমানশূন্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

তেজস্বিতাশূন্য জাতির উচ্চাভিলাষ বা ঐহিক মান সম্ভ্রমের প্রতি বিশেষ আস্থা নাই, পক্ষান্তরে মানব মন কদাপি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। এই জন্য যে মনুষ্যের অথবা যে জাতির মান সম্ভ্রম প্রভৃতি বীরজনোচিত গুণ না থাকে তাহারা স্বতঃই ধর্ম্মপরায়ণ অথবা সামাজিক আন্দোলনপ্রিয় হইয়া উঠে। বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে কৌলীন্য প্রথা প্রচলন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, বৌদ্ধধর্ম্ম দূরীকরণে তান্ত্রিক মত প্রচার, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১২০৬ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরেই বঙ্গদেশ যবন শাসনাধীন হইল। এই সময়ে কঠোর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লোকের পদকে দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ব্রাহ্মণ নামে ধর্ম্মযাজক কিন্তু কার্য্যে সর্ব্বে সর্ব্বা। বিদ্যা তাঁহার, বুদ্ধি তাঁহার, ভোগ তাঁহার, ক্ষমতা তাঁহার, মান তাঁহার, সমুদয় দান তাঁহার, নিমন্ত্রণে অগ্রে আহার তাঁহার, ধর্ম্ম তাঁহার, ঈশ্বর তাঁহার। শূদ্র তাঁহার দাস, বৈশ্য তাঁহার কৃষক, বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসক। এরূপ উপদ্রব লোকে কয়দিন সহ্য করিতে পারে? নিতান্ত অক্ষম না হইলে কে চিরকাল কাহার দাস হইয়া থাকিতে বাসনা করে? এতদিন কতক ধর্ম্মশাসনে ও কতক রাজশাসনে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু রাজ পরিবর্ত্ত হইল। যবন সিংহাসনাধিরূঢ় হইল। আর সে প্রাধান্য কোথায়? লোকের মন বহুকাল যে নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, রাজবল দূর হইলে, আপনা হইতে তাহা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল। হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে

লাগিল। জাতিভেদের বন্ধন শিথিল হইল। ব্রাহ্মণ শূদ্র অনেকাংশে সমান হইল। তখন বঙ্গবাসিগণ দেখিল পৃথিবী কেবল তাহাদিগের দৃষ্টি মধ্যগত নহে—ইহার আরও অনেক বিস্তৃতি আছে—এমন অনেক লোক আছে যাহারা তাঁহাদিগের ন্যায় পরলোকের চিন্তা করে কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রের দ্বারা তেমন জ্বালাতন হয় না, ধর্ম্মের জন্য ঐহিকের সুখে একেবারে জলাঞ্জলি দেয় না, প্রতি পাদবিক্ষেপে—আহারে, বিহারে, শয়নে, উত্থানে, প্রতি মুহূর্ত্তে শাস্ত্রের ব্যবস্থা লইয়া চলে না, স্বেচ্ছানুরূপ অনেক সুখ সম্ভোগ করিতে পারে অথচ পরলোকের হানি হয় না। এই সকল দেখিয়া কেহ কেহ প্রকাশ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল এবং পরোক্ষে জাতিসাধারণের অনেকে ক্রমশঃ স্বধর্ম্মের প্রতি গতরাগ হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের সত্য বিশেষের পক্ষপাতী হইতে লাগিল।

যবনাধিকারে বঙ্গদেশে যেমন এই সুফল উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ আবার তাহাদিগের বিলাসপ্রিয়তা, সুখলিপ্সা ও ব্যভিচার অনেক পরিমাণে লোককে পাপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।

একদিকে জাতিভেদ রহিত ও বিলাস বাসনার চরিতার্থতা এবং অপরদিকে আর্য্যজাতির বহুকাল বর্দ্ধিত ঈশ্বরস্পৃহা, পরলোকভীতি যখন মনুষ্যের মনকে আকর্ষণ করিতেছিল তখনই তন্ত্রের * মত ক্রমশঃ উদ্ভূত হইল। ষোড়শ শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে সর্ব্ববিদ্যা (১) উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববঙ্গে আবির্ভূত হইয়া অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বলে বঙ্গদেশের অনেক স্থলে তন্ত্রের মত প্রচার করিলেন। তন্ত্র যদিও হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত শিবের উক্তি বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে তন্ত্রোক্ত আবরণ দ্বারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল ; এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বন্ধন কথঞ্চিৎ শিথিল না হইলে তন্ত্র কখন রচিত হইতে পারিত না।—

প্রবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণাদ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥

ইত্যাকার তন্ত্রোক্ত বচনোচিত আচরণ যে জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল এবং ইত্যাকার বচন যে জাতিভেদ প্রথা কথঞ্চিৎ শিথিল না হইলে রচিত হয় নাই এ কথাতে কে সন্দেহ করিবে?

সামাজিক পরিবর্ত্ত ক্রমশঃ ও অননুভূত। মনুষ্য হঠাৎ চির অভ্যস্ত প্রথার বিপরীত আচরণ করিতে বা চির সংস্কারের বিপরীত বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। অদ্য আমার যে আচরণ বা সংস্কার আছে আমার বিজ্ঞতা অনুযায়ী অল্প অধিক

---

* অবশ্য এ স্থলে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে না।

(১) ইঁহার নাম আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি নাই।

বা অনেক অধিক দিবসে তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সুতরাং তন্ত্রের দ্বারা জাতিভেদ প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল না হইলে চৈতন্য কদাপি এক জীবনে আচণ্ডাল * ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেন না এবং

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বাপদাধমঃ॥

এইরূপ পুরাণোক্ত বচন কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না।

যদিও বঙ্গদেশের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু অনতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নরপতিগণ বঙ্গের সিংহাসনাধিরূঢ় ছিল। ইহাদিগের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্ম এতদূর নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়াছিল যে, পরবর্ত্তী সেনবংশীয় আদি ভূপতি আদিশূর কোন যাজ্ঞিক কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কুলকালিমার গ্রন্থকার ও আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত বল্লালসেন প্রভৃতি সেনবংশীয় কোন কোন ভূপতিকেও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বর্ণন করেন। বল্লাল বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কি না—তদ্বিষয় অনুসন্ধান করার আবশ্যক নাই। "তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন" ইহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ থাকাতেই অনুভূত হয় সেনবংশীয় ভূপতিদিগের সময়েও এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে অপ্রচলন হয় নাই। কালে ভারতবিখ্যাত পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্য ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধ মত বিচারে পরাভূত ও সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ হইলে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় তাহা বঙ্গদেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হয়। বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম দূর হইল, তথাপি লোকের আচার আচরণ ও সংস্কারের উপর তাহার বহুশতাব্দী ব্যাপক ফল কোথায় যাইবে? অদ্যপর্য্যন্ত অনেক বাঙ্গালির মুখে শুনা যায় অহিংসা পরমো ধর্ম্ম। কেহ ভ্রমেও একথা মনে করেন না, এবাক্য হিন্দু শাস্ত্রে নাই, বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে। যদিও চৈতন্য দেবের জন্মের কিছুদিবস পূর্ব্বে বৌদ্ধমত বঙ্গ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, তথাপি বহুকাল প্রচলিত থাকায় লোকে—

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশুঘাতনং।
অত স্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥

প্রভৃতি শাস্ত্রীয় মতের উপর গতরাগ হইয়াছিল এবং সর্ব্বজীবে সমদয়া প্রভৃতি নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। সত্য বটে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য সময়ে পান ভোজন সম্বন্ধে যারপরনাই প্রতিবন্ধক ছিল; এবং তাহার অভ্যুদয় হইলে, ধর্ম্মাচরণ ভাণে লোকে স্বতঃই অপরিমিতাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। (এই জন্যই তন্ত্রে ঈদৃশ

* কেবল চণ্ডাল কেন চৈতন্য সকলকেও স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছেন।

ব্যভিচারের আধিক্য দৃষ্ট হয়।) তথাপি সর্ব্বজীবে সমদয়া প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের প্রধান নীতি বঙ্গে একদা বৌদ্ধমতাধিক্য থাকার অন্যতর ফল।

যখন বঙ্গদেশের একদিকে পৌত্তলিকতা, * অপরদিকে ইস্‌লাম ধর্ম্মের একেশ্বরবাদ লোকের মনকে আকর্ষণ করিতেছিল এবং দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৈষ্ণব মতাবলম্বী রামানুজ আচার্য্য সংস্থাপিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যখন বঙ্গে একদিকে বৌদ্ধ মত প্রচলন থাকার ফলস্বরূপ অনেক উচ্চ নীতি প্রচার হইতেছিল, অপর দিকে মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তে ও তন্ত্রের উপদেশে লোকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃ ব্যভিচার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখনই বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের মত † সূক্ষ্ম ভাবে দুই একজনের মনে উদয় হইতেছিল। ক্রমে উহা তাঁহাদিগের মনে দৃঢ় হইল এবং তাঁহারা তৎপ্রচার জন্য যত্নশীল হইলেন। কয়েকজন কবি (জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস) এই মতের পক্ষপাতী হইয়া কৃষ্ণ রাধার প্রেম (১) বর্ণন করিতে লাগিলেন। এই সকল কবির লেখা লোকের চিত্তকে বিগলিত করিল। আরও অনেক লোক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এইরূপে কিছুদিন চলিয়া আসিতে আসিতে, ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের জন্মের কিছু পুর্ব্বে অনেক প্রকৃত বৈষ্ণব বঙ্গের বিবিধ স্থান বিশেষতঃ নবদ্বীপ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী শান্তিপুর প্রভৃতি আলোকিত করিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

আগে অবত বিলা যে গুরু পরিবার,
সংক্ষেপে কহি যে কহা না যায় বিস্তার।
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধব পুরী,
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বর পুরী।
অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীব্যাস।
আচার্য্য রত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস॥
শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সম্মুখ প্রধান॥
সপ্ত মিশ্র তার পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥

* হিন্দুধর্ম্মে একেশ্বর বাদও আছে, কিন্তু তাহা তৎকালে বঙ্গে প্রচলিত ছিল না।

† সংক্ষেপতঃ ঈশ্বরে প্রেম ভক্তি ও জীবে দয়া।

(১) বৈষ্ণবদিগের মূলগ্রন্থ ভাগবত, এ গ্রন্থে কৃষ্ণরাধিকার প্রেমচ্ছলে ভক্তিমাহাত্ম্য বর্ণন আছে। অনেক বৈষ্ণব তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণ রাধার প্রেম বর্ণন শ্রবণই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করিল।

জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর।
নন্দ বসুদেব পূর্ব্বে সদ্গুণ সাগর॥
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী॥
রাঢ় দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিতগুপ্ত মুরারি মুকুন্দ॥
অসংখ্য ভক্তের করিয়া অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্র কুমার॥*

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যখনই কোন দেশে কোন নবীন সত্য প্রচার হয়, বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই তত্তৎ দেশে তাহার সূত্রপাত হয়। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম্ম, সকল বৈষয়িক সত্য প্রচারই এই সাধারণ নিয়মান্তর্গত। ইসার জন্মের পূর্ব্বে জোহান প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারক, মার্টিন লুথারের পূর্ব্বে উইক্লিফ প্রভৃতি সংস্কারক, পূর্ব্বসংস্কারযুক্ত স্বাধীনচেতা পণ্ডিত পার্কারের পূর্ব্বে রামমোহন রায় প্রভৃতি আত্মপ্রত্যয়মূলক ধর্ম্মবাদী এবং চৈতন্যের পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য, ভারতী গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভূমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী মহাত্মা যে সত্য প্রচার করিবেন, তাহার পথ কথঞ্চিৎ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। কেবল ধর্ম্মে কেন? বিজ্ঞানেও অবিকল সেইরূপ হইয়াছে। নিউটনের বহুকাল পূর্ব্বেই লোকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আভাস বুঝিয়াছিলেন। নিউটনের জন্মের পূর্ব্বেই পণ্ডিতবর গালিলীও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়মাদি পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তবে ঐ নিয়ম যে বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে পত্র স্খলিত হইলে ভূপতিত হয় সেই নিয়মেই সমুদয় বিশ্বের গ্রহ উপগ্রহ যথাস্থানে রক্ষিত হয় একথা নিউটনের পূর্ব্বে কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছিল।

ইহার কারণ কি? কোন মতের প্রথম উদ্ভাবক বা প্রবর্ত্তক কেন তাহা প্রতিপালন করিতে বদ্ধপরিকর হন না? কিজন্য উইক্লিফ রাজা কর্ত্তৃক ধৃত হইলে আপনার মত পোপের বিরোধী নহে এরূপ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন? পক্ষান্তরে কি জন্য পরবর্ত্তী ঐ মতাবলম্বী কাল্বিন ক্রাম্মোর প্রভৃতি সংস্কারকগণ কোনরূপ অত্যাচারেও পোপের অধীনতা স্বীকার করেন নাই? ইহার কারণ এই যে, যখন কেহ প্রথমতঃ কোন নবীন সত্য আবিষ্কার করে, প্রথম সময়ে তাহা তাঁহার মনে অপরিস্ফুট ভাবে অবস্থান করে, হয়ত পক্ষাবলম্বী লোক একটীও থাকে না। সুতরাং তদনুযায়ী আচরণ করিতে হইলে লোকের প্রতিকূলাচরণ একাকী সহ্য করিতে হয়। এদিকে উক্ত সত্য চিরপ্রসিদ্ধ মতবিরোধী হওয়ায় সাধারণ

* কৃষ্ণ। ইহাকে বৈষ্ণবগণ পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলেন।

লোকে তৎপ্রতিপালকের উপর যারপরনাই অত্যাচার করে। কিন্তু ঐ সত্য কিছুকাল প্রচারিত হইলে অনেকে উহার উৎকৃষ্টতা অনুভব করিয়া তন্মতাবলম্বী হয় এবং জনসাধরণও স্বাভাবিক সত্যানুরাগবশতঃ কিয়দংশে তাহার পক্ষগত হয়। এইজন্য কোন নবীনসত্য প্রচারের কিছুকাল পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ, কালে যেরূপ উৎপীড়নের গূঢ়ত্ব ও উৎপীড়কের সখ্যার হ্রাস হয়, সেইরূপ তন্মতাবলম্বীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় অনেকে একত্র হইয়া উৎপীড়ন সহ্য করে সুতরাং তাহার ভার অপেক্ষাকৃত লঘু হয়। (একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, দুঃখ ভার একক বহন করা অপেক্ষা দশজনে একত্র হইয়া বহন করা সহজ।) এই জন্যই যথার্থ প্রচারকের পূর্ব্বে তন্মতাবিষ্কারক ও উদ্ভাবক জন্ম পরিগ্রহ করেন।

বস্তুতঃ বিধাতা তাঁহাদিগকে তদ্রূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট করেন না, কিন্তু দেশকাল ও পাত্রানুযায়ী প্রথম উদ্ভাবক আপনার মত সম্যক্‌রূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না এবং তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্য সেই মত অশেষবিধ অত্যাচার ও ত্যাগস্বীকার সহ্য করিয়াও জীবনে পরিণত করে। এই জন্য কোন ধর্ম্ম সংস্কারক অথবা কোন নবধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাবের আবশ্যক হইলে, অগ্রে কয়েকজন সাধারণ অথবা সাধারণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রধান লোক জন্মপরিগ্রহ করিয়া তত্তৎ সত্য কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। পরিশেষে একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া তাহা সাধারণ্যে বিশেষরূপে প্রকাশ করে। পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির জন্ম ও পরে চৈতন্যের জন্ম দ্বারা এই সত্য বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টে উপেন্দ্র মিশ্র পুরন্দর নামক জনৈক বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার তনয় জগন্নাথ মিশ্র স্বীয় পত্নী শচীর সহিত নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের ক্রমে আট কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া গতাসু হয়। তৎপরে বিশ্বরূপ নামক এক পুত্র জন্মে। বিশ্বরূপের পর শচী আর এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন—ঐ সন্তানই অদ্যকার শিরোণামাঙ্কিত মহাত্মা **চৈতন্যদেব**।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(বাল্যকাল)

চৈতন্য ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৌদশত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলা শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ॥

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন ॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন ॥
জগত ভরিয়া লোকে করে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌরচন্দ্র ভূমি অবতরি ॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

চৈতন্যের জন্মকালে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল সুতরাং ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ প্রথানুযায়ী জনসাধারণ হরিনাম কীর্ত্তন, ও হরি! হরি! ধ্বনি ও নানারূপ দানধর্ম্ম ও জপতপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল। যদিও এই সকল অনুষ্ঠান অন্য কারণে হইয়াছিল, শিশুর আত্মীয়গণ মনে করিল এরূপ পবিত্র সময়ে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে অবশ্য কোন শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ হইবেক। কালে হয়ত ইহাও চৈতন্যের জীবনকে বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ দশজনে একজন লোকের সুখ্যাতি করিলে, তাঁহার প্রশংসিত গুণ থাক বা না থাক, অন্ততঃ প্রশংসাকারীদিগের সম্মুখে ভাল করিয়া বলা মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ। অনেক স্থলে প্রশংসিত লোক বস্তুতঃ সে সকল গুণ জীবনে পরিণত করেন। সুতরাং চৈতন্য কালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে লোকমুখে এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহার সার্থকতার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন তাহাতে বিচিত্র কি? পক্ষান্তরে যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। একান্ত হৃদয়ে যত্ন করিতে করিতে যথার্থই মানবসমাজে একজন মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি?

অতি প্রাচীনকাল হইতেই, জীবনচরিত লেখকগণ আলোচ্য ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু, বাল্যাবস্থা প্রভৃতি ঘটিত নানা রূপ অলৌকিক ঘটনা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যের জীবনচরিত লেখক বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই চিরন্তন পদ্ধতি অতিক্রম করিয়া চলেন নাই। চৈতন্যকে তাঁহার মাতা ত্রয়োদশমাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য ভূমিষ্ঠ হইবার সময়—

হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥
প্রসন্ন হইল দশদিক্ নদীজল।
স্থাবর জঙ্গম * হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

কথিত আছে শৈশবাবস্থায় চৈতন্যের হস্তপদে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ছিল। এই সকল চিহ্ন মহাপুরুষের লক্ষণ।

* কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব কাব্য হইতে এই ভাব লওয়া।

বৈষ্ণবগণ তাহা দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহিণী লক্ষ্মীদেবী নবদ্বীপে আসিয়া এরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত শিশু দর্শন করিয়া পরমানন্দিতা হইলেন এবং দীন দুঃখীদিগকে বিস্তর অর্থদান করিলেন। লক্ষ্মীদেবী শিশুর নাম নিমাই রাখিলেন। ডাকিনীর হস্ত হইতে শিশুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এইরূপ কুৎসিত নাম * রাখা হইয়াছিল।

বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের বাল্যাবস্থা ঘটিত বিস্তর অলৌকিক ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন। শৈশবাবস্থায় একদা চৈতন্য গৃহাভ্যন্তরে ক্রীড়া করিতে করিতে মাটি খাইতেছিলেন, ইহা দেখিয়া শচী তাঁহাকে অনুযোগ করিলেন। শিশু বলিল, "সমুদয় বস্তুই মাটি, যেহেতু মাটি বিকৃত হইয়া উদ্ভিদাদি হয়। সুতরাং উদ্ভিদাদির ন্যায় মাটি আহার করায় দোষ কি?" শচী বলিলেন, "বস্তু মাত্রের স্বাভাবিক ও বিকৃতাবস্থা সমগুণ বিশিষ্ট নহে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া চৈতন্য দৌড়িয়া মাতার অঙ্কে উঠিয়া বলিলেন "মা! আর আমি মাটি খাইব না, আমি তোমার স্তন্যপান করিব।" অন্য দিন একজন ব্রাহ্মণ জগন্নাথের আলয়ে অতিথি হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভক্ষ্যদ্রব্য রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিলেন, নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন, নিমাই আহার করিতেছেন। জগন্নাথ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুত্রকে নানারূপ তাড়না করিয়া গলবস্ত্রে ব্রাহ্মণকে পুনর্ব্বার রন্ধন করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার রন্ধন করিলেন। রন্ধনান্তে যখন পুনর্ব্বার বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে বসিয়া চক্ষুমুদিত করিলেন, অমনি নিমাই পুনর্ব্বার আহার করিতে বসিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ হওয়ায় ব্রাহ্মণ পরিণামে বুঝিতে পারিলেন নিমাই সামান্য শিশু নহে—বিষ্ণুর অবতার। তখন সানন্দচিত্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ও নিমাইকে নানারূপ স্তবস্তুতি করিয়া বিদায় হইলেন।†

চৈতন্য বাল্যকালে বড় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। স্নান করিতে গিয়া ঘাটে বয়স্য-দিগের সহিত কলহ করিতেন ও কুমারী দিগের আনীত দেবপূজার্থ নৈবেদ্যাদি অপহরণ করিয়া আহার করিতেন।

ক্রমে চৈতন্যের বিদ্যারম্ভের কাল উপস্থিত হইল। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে নবদ্বীপনিবাসী প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ করিলেন। তথায়, চৈতন্য স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে অত্যল্পকালেই ব্যাকরণ সমাধা করিলেন।

এদিকে জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ কৌমারাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। জগন্নাথ বিশ্বরূপের বিবাহের জন্য

* অদ্যাপি অস্মদ্দেশীয় অনেক স্ত্রীলোক মৃতবৎসার সন্তানের এইরূপ শ্রুতিকটু নাম রাখেন।

† ভাগবতে কৃষ্ণের বাল্যকাল ঘটিত এইরূপ একটি বর্ণন আছে। হয়ত বৃন্দাবন-দাস চৈতন্যের প্রাধান্য বিস্তার জন্য তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন।

অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্বরূপ সংসারে যারপরনাই নির্লিপ্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা মনে মনে সন্ন্যাস ধর্ম্মের উৎকর্ষ চিন্তা করিতেন। পিতা বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, বিশ্বরূপ নিভৃতে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া, জনক-জননীকে ত্যাগ করিয়া, আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বৃদ্ধ জনক-জননী অপত্যবিরহে অনেক রোদন করিলেন। হাঃ! নিষ্ঠুর বিধাত! তোমার অন্তর পাষাণময়! অন্যথা সৃষ্টিতে কিজন্য একজনের কর্ম্মফল অন্য জনে ভোগ করে; একজনের কৃত অপরাধ জন্য অন্য জনে দণ্ড পায়।

বৃদ্ধ জনক-জননী অনেক রোদন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইল? তাঁহাদিগেরই শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল। কাল সর্ব্বসংহর্ত্তা। কালে যেমন সুরম্য হর্ম্ম্য ভগ্ন হইয়া ধূলিসাৎ হয়, দিগন্তব্যাপী বৃহৎ রাজ্যের নাম লোপ পায়, সেইরূপ আবার মরুময় স্থান বৃহৎ অট্টালিকাশোভিত হয় এবং অপত্য-বিরহবিধুর অনেক পরিমাণে শোক বিস্মৃত হইয়া শান্তি লাভ করে। যদি প্রিয়জনবিরহ শোকের তীব্রতা কালে লঘু না হইত, তাহা হইলে সংসারে আর কে সুখ পাইত? কেই বা তাদৃশ শোকভারবাহী জীবনভার বহন করিতে পারিত? কারণ কে না প্রিয়জন হারাইয়াছে? এই কালের মোহিনী শক্তিতে জগন্নাথ ও শচী, চৈতন্যের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া বিশ্বরূপের কথা কিয়দংশে ভুলিয়া গেলেন। কেনই বা না ভুলিবেন, চৈতন্যের ন্যায় গুণবান্ এক পুত্র সহস্র পুত্র অপেক্ষা প্রার্থনীয়। এদিকে বালস্বভাব চৈতন্য অপত্য-বিরহবিধুর-জনক-জননীর দুঃখ দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। নানারূপ সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন। এবং স্বয়ং যাবজ্জীবন তাঁহাদিগের চরণ সেবা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

চৈতন্যের বিদ্যাভ্যাস সমাধা হইতে না হইতে জগন্নাথ মিশ্র মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

পিতৃবিয়োগের এক বৎসর পর একদা চৈতন্য চতুষ্পাঠি হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলেন এমন সময়ে পথিমধ্যে বল্লভাচার্য্যের কন্যা পরম রূপবতী লক্ষ্মী দেবীকে নয়নগোচর করিয়া বিমোহিত হইলেন। দৈবে বনমালী ঘটক (ইনি বোধ হয় নবদ্বীপে আধুনিক ঘটকদিগের ন্যায় বিবাহের ঘটক ছিলেন) সেই পথে গমন করিতেছিলেন। ঘটকবর সহজেই চৈতন্যের প্রণয়লক্ষণ বুঝিতে পারিলেন এবং উভয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন। ত্বরায় মহানন্দে চৈতন্যদেব লক্ষ্মী দেবীর * সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হইলেন।

গুণবতী লক্ষ্মী দেবীকে গৃহে আনিয়া চৈতন্য পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

* বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন লক্ষ্মী রাধার অবতার স্বরূপ।

বিশ্ব বিভিন্ন অংশে বিভক্ত অথচ কয়েকটী সাধারণ নিয়মান্তর্গত। পরিবর্ত্তনশীলতা সাধারণ নিয়ম। এই প্রকাণ্ড বিশ্বের যে দিকেই নেত্রপাত কর এমন কিছুই দেখিতে পাইবে না যাহা এই নিয়মাতীত। তোমার সম্মুখে যে বস্তু রহিয়াছে, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ, ক্ষয় অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তোমার সম্মুখে যাহা নাই তাহারও এই দশা। যদি বল একথার প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসর সহস্র সহস্র মনুষ্য এইরূপ দেখিয়াছে—কেহই ইহার ব্যভিচার দেখে নাই, অথবা শুনে নাই। তুমিও আজীবন ইহাই দেখিয়াছ এবং শুনিয়াছ এবং কখন ইহার ব্যভিচার দেখ নাই, অথবা শুন নাই। সুতরাং যাহা কদাপি হয় নাই, বিশ্বের নিয়ম পরিবর্ত্তন না হইলে তাহা কিরূপে হইবে?

তোমার দেহ প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সাত বৎসরে আর কিছুই থাকিবে না। তোমার গৃহ প্রতিনিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, কয়েক বৎসরে জীর্ণতা-নিবন্ধন ভগ্ন হইয়া যাইবে। কেবল সামান্য সামান্য পদার্থ কেন জ্যোতির্ব্বিদেরা অনেক গ্রহ উপগ্রহেরও গতি পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসবর্ণন করিয়াছেন। আমাদিগের শাস্ত্রকর্ত্তারা এই প্রলয়ের কথা অনেক বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে বসুমতীর প্রলয় হইবে এবং প্রলয়কালে দ্বাদশাদিত্য উদয় হইবে। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত; এ সকল ছুট করিয়া উড়াইয়া দেও। যদি শাস্ত্রের কথা শুনিতে ইচ্ছা না কর, শ্রবণ কর বিজ্ঞান কি বলে,—"নাক্ষত্রিক প্রলয় প্রত্যক্ষ বিষয়; কাল্পনিক বা আনুমানিক নহে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে হইতে হর্শেল সাহেব ৪২ বর্জিনিস্‌কে দেখিতে পান নাই। কখন কখন একেবারে কতকগুলি তারকা দৃষ্টিগোচর হইয়া এক কালেই প্রলীন হইয়া গিয়াছে। এই সকল ব্যাপার নূতন নহে। অতি প্রাচীন কালেও অনেক পণ্ডিত এরূপ নাক্ষত্রিক প্রলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১২০ খৃষ্টাব্দে হিপ্পর্কস এইরূপ একটী প্রলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৩৮৯খৃঃ অব্দে আলফা আকুইলি নামক নক্ষত্রের নিকট আর এক অভিনব তারকা

হঠাৎ দেখা যায়; তাহা তিন সপ্তাহ কাল শুক্রগ্রহের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল পরে একেবারে অদৃশ্য হইল। ১০৬ খৃঃ অব্দে ১০ই অক্টোবর তারিখে স্বর্ণপুঞ্জের মধ্যে এক অতীব উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়; তাহা একবৎসর যাবৎ দেখা গিয়াছিল। ১৬৭০ অব্দে হংসপুঞ্জের শীর্ষদেশে এক অভিনব নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহা কিছুদিন পরে অদৃশ্য হয়; পুনর্ব্বার দেখা যায়। তখন বিবিধরূপ আলোক পরিবর্ত্তন দেখাইয়া দুই বৎসর পরে যে কোথায় গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। এ পর্য্যন্ত এইরূপে যত নক্ষত্রকে প্রলীন হইতে দেখা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১৫৭২ খৃঃ অব্দে কাসীও পিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে যে এক তারকা দেখা গিয়াছিল, তাহার বিবরণ অধিকতর বিস্ময়কর। সেই নক্ষত্র শীঘ্র শীঘ্র সমধিক ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিতে লাগিল—এমন কি শেষে বৃহস্পতি অপেক্ষাও উজ্জ্বল হইয়াছিল। ক্রমে তাহার জ্যোতির হ্রাস হইতে লাগিল। দাহ্যমান পদার্থের যে সকল বর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়, সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনই উক্ত নক্ষত্রে ক্রমে ক্রমে লক্ষিত হইয়াছিল এবং এক বৎসর চারিমাস পরে স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়াই একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। যে নক্ষত্রদাহন এতদূর হইতে এরূপ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় সে দাহন কিরূপ ভয়ঙ্কর, আমাদিগের কল্পনাও তাহা ধারণা করিতে পারে না। আমাদিগের বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহদ্বয়ের কক্ষার মধ্যে, কতকগুলিন্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে। অনেক বিজ্ঞানবিৎ অনুমান করেন—ধূমকেতুর আঘাতে কোন গ্রহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভগ্ন হওয়ায় এরূপ হইয়াছে।”

যখন আমরা বিশ্বের সমুদয় অংশই পরিবর্ত্তনশীল দেখিতেছি, তখন কি মনে করিতে পারি, আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা বসুমতীই এক মাত্র চিরকাল সমান থাকিবে। এই বসুমতীর অতীত কালের ইতিহাস † অনুসন্ধান করিলেও জানা যায়, পৃথিবী সৃষ্ট হওয়া অবধি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর যে আকার আমরা অদ্য দেখিতেছি, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা বহুকালে গঠিত হইয়াছে এবং সেই সকল কারণ অদ্যাবধি বিরাজিত থাকায় এক্ষণে যে আকার রহিয়াছে, নিশ্চয় অনুভব হয়, তাহা ভবিষ্যতে থাকিবে না। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চির উষ্ণ তরল পদার্থের উপর দুগ্ধের সরের ন্যায় আবরণ নিরন্তর পুষ্ট হইতেছে এবং তজ্জন্য পৃথিবীর স্থলভাগও ক্রমশঃ পুষ্টতালাভ করিতেছে। ভূতত্ত্ববিদেরা আরও বলেন, আদৌ ভূমণ্ডলে আগ্নেয়গিরির ‡ বহুল পরিমাণে আধিক্য ছিল। সেই সকল আগ্নেয়গিরিসমুত্থিত কর্দ্দম ও ধাতুনিস্রব হইতে

---

† ভূতত্ত্ব বিদ্যা।

‡ একথার প্রমাণ স্বরূপ আমরা এই বলিতে পারি অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যত আগ্নেয়গিরি ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহার অধিকাংশই শীতল হইয়াছে।

স্থলবিভাগ পুষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়াছে ও সাগর বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়াছে। পৃথিবী স্তরে স্তরে রচিত। বিভিন্ন স্তর বিভিন্নরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট। যে কারণে এক স্তরের উপর আর এক স্তর সঞ্চারিত হইয়াছে, সেই কারণ অদ্যাবধি বর্ত্তমান থাকায় নিশ্চয় অনুভব হয়, বসুমতীর বর্ত্তমান স্তরের উপর আর কত স্তর হইবে তাহার অন্ত নাই। বস্তুতঃ কারণের বিনাশ না হইলে কদাপি কার্য্যের বিনাশ হইবে না। সুতরাং এই সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিতে কদাপি বসুমতীর পরিবর্ত্তনশীলতার অন্যথা হইবে না।

সর্ব্বদেশ প্রচলিত জনশ্রুতি বলিয়া থাকে,—এক কালে পৃথিবী একেবারে জলমগ্ন হইয়াছিল। একথা সম্পুর্ণ অসম্ভব বোধ হয় না। যদি কোন কালে কোন কারণ বশতঃ এরূপ তাপাধিক্য হয় যে, পৃথিবীতে যত তুহিন সঞ্চিত আছে তাহা এককালে বিগলিত হইয়া যায়, তাহা হইলে হয়ত পৃথিবীর অতি উচ্চতম স্থলভাগও জলমগ্ন হইয়া যাইবে। যদিও এরূপ তাপাধিক্যের কোনই সম্ভাবনা নাই যেহেতু তাপাধিপতি সূর্য্য প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ক্রমশঃ শীতল হইতেছে। তথাপি ভবিষ্যতে ক্রমশঃ চাপ ও তদুপরি বর্ত্তমান সময়ের সূর্য্য-রশ্মিপতন বশতঃ কোন বৃহৎ তুহিনখণ্ড বিগলিত হইয়া এক দেশ বা নগর ধ্বংস করিতে পারে, এ কথাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই।*

হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতোপরি অদ্যাবধি সাগরবাসী প্রাণীর অবশেষ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হওয়ায় বোধ হয়, পৃথিবীর উচ্চতম প্রদেশ হিমালয়ও এক কালে সাগরগর্ভস্থিত ছিল। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ এমগুিলক বলেন,—জলপ্লাবনে পৃথিবীর সকল অংশ জলমগ্ন হয় নাই, কেবল জলভাগ স্থল ও স্থলভাগ জলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভূমিকম্প অথবা কোন কারণ বশতঃ জোয়ারের আধিক্য হইলে সময়ে সময়ে সাগর এত স্ফীত হইয়া উঠে যে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নগর সমুদয় ধ্বংস হইয়া যায়। এরূপেও এক্ষণে বসুমতীর যে আকার আছে তাহার অনেক পরিবর্ত্ত হইতে পারে।

বিশ্বের কোনই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় নাই সুতরাং একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে, এরূপ জলপ্লাবন আর হইবে না। যদি এরূপ জলপ্লাবন পুনর্ব্বার হয় তাহা হইলে বসুন্ধরার বর্ত্তমান অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইবে।

* সার জন হর্শেলের পিতা, পূর্ব্বসূর্য্যের তাপাধিক্য ছিল একথা বিশ্বাস করিতেন। পুত্রও বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগে পিতার বাক্য অসম্ভব নহে একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন।

যে বায়ু প্রবাহিত হয়, যে তুহিন সঞ্চিত হইয়া পরিণামে নদীরূপে পরিণত হয় অথবা বাষ্পাকারে আকাশে উড্ডীন হইয়া করকা বা বৃষ্টিরূপে ভূপতিত হয়, যে নদী নিম্নস্থ ও সম্মুখস্থ বালুকা ও কর্দ্দম আত্মসাৎ করিয়া ক্রমশঃ প্রবাহিত হইতে হইতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়, যে তরঙ্গমালান্বিতা নদী প্রতিনিয়ত তীরকে সবেগে আঘাত করিয়া * সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহাতে প্রতিনিয়তই বসুমতীর একস্থলের মৃত্তিকা অন্যস্থলগত হয়। কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বৃহৎ বৃহৎ নদীর তীরে এবং সাগরের তীরে এইরূপে কত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। † চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বসুমতীসহ আধুনিক বসুন্ধরার তুলনা করিলে (এই সকল কারণ বশতঃ) অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। যদি প্রতিদিন বসুমতীর এক একতিল পরিবর্ত্ত হয়, কাল অনন্ত এবং বসুমতী সীমাবদ্ধ এই জন্য নিশ্চয়ই এককালে বসুমতী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে। একদিন বা দুইদিনে হইবে না। এক সহস্র বা দুই সহস্র বৎসরে হইবে না। কিন্তু কোটি কোটি বৎসর গেলেও কালের সীমা হইবে না। সুতরাং এককালে বসুমতীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়।‡

* এই জন্য পদ্মানদী প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নদীর তীরে নিয়ত জমি পয়োস্তি ও শিকস্তি হয়।

† বাদা, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

‡ ভাবী বসুমতীর জীব জন্তুর প্রকৃতি বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা থাকিল।
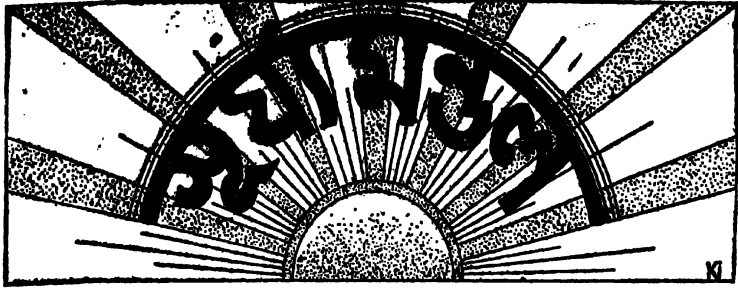
"—তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

অসীম বিশ্বমণ্ডলে যতকিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় চিত্তাকর্ষক আর কিছুই নাই। অতি প্রাচীন কালাবধি ইহা লোকের মনঃ ও নেত্র আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন আর্য্যগণ, প্রাচীন পারসিকগণ—প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতিই অত্যুজ্জ্বল প্রভাপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিয়া, ইহাকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ স্বীকার করিয়া উপাসনা করিতেন। বাস্তবিক, যদি প্রাকৃতিক কোন পদার্থদ্বারা জগদীশ্বরের মহিমা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হয়, তবে সূর্য্যই সর্ব্বপ্রধান। সুতরাং সরলচিত্ত প্রাচীন লোকেরা সূর্য্যকে স্রষ্টার প্রতিরূপ কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতেন তাহা বড় বিস্ময়কর নহে।

এরূপ অতীব বিস্ময়কর সূর্য্য সম্বন্ধে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতানুসরণ করিয়া কতকগুলি কথা বলিব—

সুতপ্ত সোণার থালার ন্যায় গোল সূর্য্য প্রতিদিন আকাশমার্গে গমন করিয়া আমাদিগকে কিরণ দান করিতেছে, ইহা সকলেই দেখিতেছেন। এই সূর্য্য আয়তনে যে সৌরজগৎস্থ গ্রহ উপগ্রহগণ অপেক্ষা বড়, তাহা আজিকালি সামান্য পাঠশালার ছাত্রেরাও অবগত আছে। সূর্য্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা ১১১গুণ বড়; অর্থাৎ তাহার পরিমাণ ৮৮২০০০ মাইল। এই পরিমাণের স্থান কতখানি, তাহা বোধ হয় এইরূপে সহজে বুঝা যাইতে পারে। কোন রেলগাড়ী যদি প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল হিসাবে চলে, তবে উক্ত গাড়ির সূর্য্যমণ্ডলের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে তিন বৎসর সাতমাসেরও অধিক সময় লাগিবে। কিম্বা যদি পৃথিবীকে লইয়া সূর্য্যমণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থলে রাখা যায়, তবে পৃথিবীর চারিপার্শ্বে সূর্য্যমণ্ডলের এত স্থান থাকিবে যে, এক্ষণে চন্দ্র পৃথিবী হইতে যতদূরে থাকিয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছে, ততদূরে থাকিয়া বেষ্টন করিলেও, চন্দ্রের কক্ষার বহিঃস্থ স্থান, চন্দ্র হইতে পৃথিবীর দূরত্ব অপেক্ষা অতি অল্প কম হইবে।

সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় গোলাকার কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক বড়। দূরবীক্ষণ সাহায্যে সূর্য্যের উপরিভাগে কতকগুলি অস্থির কৃষ্ণচিহ্ন দেখা যায়। সেগুলি সূর্য্যমণ্ডলের একপার্শ্ব হইতে অন্যপার্শ্বে গমন করে। তাহাতে জানা যায় যে, গ্রহ উপগ্রহগণের ন্যায়, সূর্য্যও আপনার মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে। এরূপ একবার আবর্ত্তন করিতে আমাদের ২৫ দিন পরিমাণ সময় লাগে।

সূর্য্য, তাপ আর আলোকের আকর। সূর্য্যমণ্ডল হইতেই সৌরজগৎস্থ গ্রহ ও চন্দ্রগণ তাপ আর আলোক পায়। পৃথিবীর যে পার্শ্ব যখন সূর্য্যাভিমুখে .থাকে, তখন সেই পার্শ্ব তাপ আর আলোক পায়; আর তাহার বিপরীত দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। এই আলোক ও অন্ধকারের নামান্তর দিন ও রাত্রি। সূর্য্য হইতে পৃথিবী উপরে নিপতিত তাপ আর আলোকের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া একজন পণ্ডিত কহিয়াছেন যে,—কোন স্থানে ৫৫৬৩টা মমবাতি একসঙ্গে জ্বালিলে, তাহার একফুট দূরে যত আলো হয়, সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উপরে লম্বভাবে পতিত রশ্মির আলোক-পরিমাণ তত। আর একটী মাত্র বাতি জ্বালিলে, তাহার ১২ফুট দূরে যে আলো হয়, চন্দ্রালোকের পরিমাণ তত; সুতরাং চন্দ্রালোক অপেক্ষা সূর্য্যালোক প্রায় ৩০০০০০ গুণ অধিক।

সূর্য্য অপরিমিত প্রচণ্ড তাপের আধার। সূর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি নাই; সূর্য্য-মণ্ডলে দিবস-রজনীরূপ আলোক ও অন্ধকারের পরিবর্ত্তন ঘটে না; ঋতু পরিবর্ত্তন নাই এবং স্থল জলাদিরূপ কোন বিভাগ নাই। তাপের আধিক্য এত যে কোন প্রকার কঠিন পদার্থ, স্বীয় কাঠিন্য রক্ষা করিতে পারে না। সোণা, প্লাটিনম, বা অন্য কোন কঠিন ধাতু সূর্য্যমণ্ডলে নীত হইলে, বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। সূর্য্য-মণ্ডলের প্রতি বর্গফুট হইতে এত তাপ নির্গত হয় যে, তাহা অতি প্রচণ্ডতম কৃত্রিম অগ্নিকুণ্ডের প্রতি বর্গফুট হইতে নির্গত তাপের সাতগুণ অধিক। পৃথিবী সূর্য্যাভিমুখে ১২ ঘণ্টাকাল মাত্র থাকে; আর বাকি ১২ ঘণ্টা শীতল হইতে থাকে; এবং সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ৯৫,০০০০০০মাইল, (দূরত্ব অনুসারে তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহা এস্থলে স্মরণ করা উচিত;) তথাপি পৃথিবীর উপরি-ভাগের প্রতি বর্গফুটে বার্ষিক এত তাপ পড়ে যে, সেই তাপে ৫৫০০ পাউণ্ড বরফ দ্রব হইতে পারে।

সূর্য্যের ভৌতিক রচনা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের নানা মতভেদ আছে। তাঁহাদের সেই মতগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—এক মতের প্রথম প্রচারক গালিলীয়, এবং প্রধান সমর্থনকারী কার্চ্চহফ। আর দ্বিতীয় দলের প্রধান নেতা সার উইলিয়ম হর্শেল। আমরা এইক্ষণে বলিয়া রাখিব যে, অধুনাতন

নব্যপণ্ডিতগণ পুনরায় সূর্য্যমণ্ডল বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, উৎকৃষ্টতর যন্ত্রের সাহায্যে এবং উৎকৃষ্টতর গণনাদি দ্বারা যেসকল নূতন মত প্রচার করিতেছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে উপরোক্ত দুইটী মতের একটীও যে প্রচলিত থাকিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। যাহাহউক, আমরা সার উইলিয়ম হর্শেল প্রচারিত মতের কথাই সংপ্রতি বলিব। পরে নূতন যেসকল মত প্রচারিত হইতেছে, তাহারও কথা কিছু বলা যাইবে। সার উইলিয়মের মতে সূর্য্য তেজোময়; কিন্তু তদন্তর্গত সমুদায় পদার্থ তেজোময় নহে। স্থির হইয়াছে যে, সূর্য্যের শরীর তেজোময় নয়; তাহা অন্ধকারসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ গোলক। তাহার দুইটী আবরণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ ঠিক সূর্য্যশরীরের উপরিভাগস্থ আবরণটীই তেজোময়। এই তেজোময় আবরণ কখন কখন ছিন্ন হইয়া যায়; সেই সময়ে সেই ছিদ্রান্তরাল দিয়া সূর্য্যের প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণ শরীর দেখা যায়। এই কারণে সূর্য্যশরীরকে কৃষ্ণ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সূর্য্যের উপরিভাগে পরিদৃশ্যমান যে সমস্ত কৃষ্ণচিহ্নের কথা বলা গিয়াছে, সেগুলি সূর্য্যাবরণের ছিদ্রান্তরাল দিয়া দৃশ্যমান সূর্য্যশরীরের অংশ মাত্র। দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্যকে দেখিলে, তাহার উপরিভাগে এক অথবা ততোধিক কাল দাগ দেখা যায়। কখন কখন এরূপ কতকগুলি দাগ একস্থানে পুঞ্জীকৃত দেখা যায়। তখন চাই কি সহজ চক্ষুতেও সেগুলিকে দেখা যাইতে পারে। একখণ্ড কাচকে দীপশিখাতে তাতাইয়া তাহাতে কালী পড়িলে, তাহার ভিতর দিয়াও সূর্য্যকে দেখা যাইতে পারে। অথচ চক্ষুর কোন কষ্ট হয় না। এই কৃষ্ণ দাগ সকলের কৃষ্ণত্ব প্রায় মধ্যস্থলে সমান থাকে; কিন্তু তাহার পার্শ্বের কৃষ্ণত্ব তত থাকে না। যখন এই কাল ছিদ্রসকল সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে দেখা যায়, তখন উক্ত ছিদ্রবেষ্টনকারী ঈষৎ কৃষ্ণস্থান সকলকে গোলাকার এবং সর্ব্বত্র সমবিস্তৃতি-বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন সেগুলি সূর্য্যের পার্শ্বে গিয়া পড়ে, তখন সেই অল্প কৃষ্ণ পার্শ্বের বহির্দ্দেশ সুস্পষ্ট দেখা যায় না; এবং তাহার ছায়াতে কৃষ্ণতম অংশও আবৃত হইয়া পড়ে। সর উইলিয়ম হর্শেল এরূপ একটি কৃষ্ণচিহ্ন দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এ বিষয় ভালরূপ বুঝা যাইতে পারে;—"১৩ অক্টোবর ১৭৯৪। গত দিবস সূর্য্যমণ্ডলে আমি যে চিহ্নটী দেখিয়াছিলাম, অদ্য তাহা কিনারার এত নিকটস্থ হইয়াছে যে, তাহার পশ্চাদর্দ্ধের উচ্চদিকে সমস্ত কৃষ্ণতম অংশটুকুকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; তবুও সেই গহ্বরটাকে দেখা যাইতেছে, এত সুন্দর দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণতম চিহ্নের নিম্নে এবং কালীম পার্শ্বদেশের উচ্চতা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে।"

অপিতু এই ছিদ্র সমূহকে সূর্য্যমণ্ডলের একস্থানে সর্ব্বদা দেখা যায় না। তাহাদের স্থান পরিবর্ত্তন ঘটে। সূর্য্যের যে অংশ বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে ৩০

ডিগ্রির মধ্যগত, সেই অংশেই এই চিহ্নগুলিকে সচরাচর দেখা যায়।—এই অংশের মধ্যে সেগুলি বিচলিত হইয়া বেড়ায়। অপর ইহারা সময়ে সময়ে স্বস্ব আকারও পরিবর্ত্তন করে।—প্রতি ঘণ্টায় এপ্রকার আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যেখানে দুঃসহ চাকচিক্যময় জ্যোতিঃ পরিপূর্ণ ছিল, সেখানে হঠাৎ একটী ছিদ্র উৎপন্ন হয়। সেই ছিদ্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, পুনরায় কুঞ্চিত হইয়া ছোট হইয়া যায়; এবং শেষে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কখন কখন এইরূপ অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে একটী রন্ধ্র ভাঙ্গিয়া গিয়া, ছোট ছোট কতকগুলি রন্ধ্র হইয়া পড়ে। এইরূপ আকৃতি পরিবর্ত্তন দ্বারা এই অনুমান হয় যে, তাহারা তরল পদার্থ হইতে উৎপন্ন। কখন কখন কোন ছিদ্রের সীমা বৃদ্ধি পাইয়া ১০০০ মাইল বেগে অন্য কোন রন্ধ্রের নিকটবর্ত্তী হয়। তরল পদার্থ নহিলে আর কোন পদার্থের এরূপ গতি অসম্ভব।

সূর্য্যের বিষুব রেখার উভয়পার্শ্বস্থ অংশে এইরূপ গোলমাল দেখিয়া এই অনুমান করা যায় যে, সূর্য্যের গতির সহিত উক্ত চিহ্নসকলের উৎপত্তির অতি নিকট সংস্রব আছে। কেন না কোন আবর্ত্তনকারী গোলকের মধ্যস্থলের পদার্থ সকল সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগে আবর্ত্তন করে। সুতরাং সেই আবর্ত্তনের ফল গোলকের মধ্যস্থলেই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। এই জন্য এরূপ অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর উষ্ণ-কটীবন্ধের অন্তর্গত প্রদেশসমূহ যেরূপ মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড বাত্যাতাড়িত হইয়া থাকে সেইরূপ সূর্য্যেরও মধ্যস্থলে মহা প্রচণ্ড সৌরবাত্যা সকল উত্থিত হইয়া, তাহার (সূর্য্যের) উপরিভাগের আবরণকে স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়; এবং সেই কারণে ঐসকল চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের ভিতর দিয়া সূর্য্যের নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ শীতল শরীর দেখা যায় বলিয়া, ঐ ছিদ্রসকল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিতেরা জ্যোতির্ম্ময় আবরণকে বাষ্পাকৃতি তরলপদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। সেই আবরণের উপরিভাগ সর্ব্বত্র সমান-ভাবে উজ্জ্বল নহে। রন্ধ্রস্থ স্থান সকল অধিকতর উজ্জ্বল রেখাদ্বারা পরিবেষ্টিত। এই রেখানিচয় আবার বক্রাকৃতি এবং শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। এই রেখাগুলিকে কেহ কেহ জ্যোতির্ম্ময় আবরণের প্রবলতর তরঙ্গমালা বলিয়া জ্ঞান করেন। সূর্য্যমণ্ডলে কি মহা প্রচণ্ড অদ্ভুত অন্দোলনই ঘটিয়াছে!

পৃথিবী যেমন বায়ুর দ্বারা পরিবেষ্টিত, সূর্য্যও সেইরূপ আর একটী অসম্পূর্ণ স্বচ্ছ বাষ্পাকৃতি পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বিতীয় আবরণটী প্রথম আবরণের উপরিভাগে থাকিয়া সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাহাকে "সৌরবায়ু" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় এই অর্দ্ধস্বচ্ছ সৌরবায়ু সূর্য্যের চারিদিকে প্রতিভাত হয়। এই বায়ু আছে বলিয়াই, সূর্য্যের মধ্যস্থল অপেক্ষা চারিপার্শ্ব অপেক্ষাকৃত অল্প তেজোময় দেখায়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কার্চ্চহফ উপরোক্ত মতের বিপরীতবাদী। তিনি বলেন, সূর্য্যের শীতল শরীর পরিবেষ্টনকারী এপ্রকার প্রচণ্ডতম উজ্জ্বল সৌর আবরণের অস্তিত্ব অনুমান করা, কেবল অলীক কল্পনা মাত্র; কেননা, তাহা ভৌতিক নিয়মের বিপরীত। তিনি আপনার মত সমর্থনের জন্য যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই;—সৌর-কৃষ্ণচিহ্ন সকলের উৎপত্তি আদির কারণ বুঝাইবার জন্য সূর্য্যের ভৌতিক রচনাসম্বন্ধে উপরোক্ত যে মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অভ্রান্ত ভৌতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এমন কি যদিও উপরোক্ত মতে কৃষ্ণচিহ্ন সকলের উৎপত্তি ভিন্ন অন্য কোন কারণ আমরা না দেখাইতে পারি, তথাপি সূর্য্যের ভৌতিক গঠন সম্বন্ধে উক্তমত কখনই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। উক্ত মতাবলম্বীদিগের কল্পিত জ্যোতির্ম্ময় আবরণ যদি বাস্তবিকই থাকে, তবে তাহার তেজঃ অবশ্য চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইবে; সূর্য্যের শীতল শরীরের দিকেও যেমন যাইবে, বহিঃস্থ সৌরজগতের দিকেও তেমনই ভাবে আসিবে। তাহা হইলে প্রকৃত সূর্য্যশরীর নিজে শীতল এবং যত অধিক কেন হউক না, শীতলতম আবরণে আবৃত থাকিলেও, কালে উক্ত আবরণ এবং সূর্য্যশরীর উত্তপ্ত হইয়া, তেজঃ এত অধিক হইবে যে, সূর্য্যশরীর জ্বলদগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। সুতরাং শীতল অন্ধকারময় সূর্য্যশরীর জ্বলন্ত অনলবৎ তাপ আর আলোক বিকীরণ করিবে। ইহা অসম্ভব।

বড় বড় পণ্ডিতগণের এরূপ বিবদমান মত সমূহ পাঠ ও আলোচনা করিলে, মন কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা, তাহা ভাবিতে ভাবিতে বিচলিত হয়। বাস্তবিকও আমাদের সৌরজগতের পরিচালক সূর্য্য অতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি সমভাবে বিস্ময়কর হইয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে অত্যদ্ভুত কি সকল ভৌতিক কাণ্ড চলিতেছে এবং তাহার শারীরিক রচনাদি কি প্রকার, তাহার ধ্রুব ও অভ্রান্তমত অদ্যাপি প্রচারিত হয় নাই। উপরে যে দুই মতের কথা বলা গেল, সংপ্রতি আর একজন পণ্ডিত আবার সেই দুই মতই খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এবং যদিও আধুনিক পণ্ডিতবর্গ প্রথমে তাঁহার নবপ্রচারিত মতে বিশ্বাস করিতে কিছু কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আবার অনেকে তাহাতে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছেন। পণ্ডিতবর ন্যাসমিথ বলেন যে, সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় আবরণ উইলো পত্রাকৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে বিরচিত। উক্ত পত্রাকৃতি পদার্থসকল অনবরত সূর্য্যশরীরের উপরিভাগে নৃত্য করিতেছে, এবং পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সমস্ত সূর্য্য-শরীরকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই বিচিত্র পত্রাকৃতি পদার্থ গুলিকে, যেখানে আলোকরশ্মি কৃষ্ণচিহ্ন সকলের মধ্য দিয়া সেতু আকারে পড়িয়া থাকে, সেইখানে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। আবার সেগুলিকে অতীব বিস্ময়জনক প্রচণ্ডবেগে নাচিতে

এবং পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতে দেখা যায়। এই নূতন আবিষ্কৃত পদার্থসমূহের উৎপত্তি ও রচনা সম্বন্ধে কোন কথা কল্পনাও বলিতে সাহস করে না। †

সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যমণ্ডলের বহির্দ্দেশে যে সুন্দর লোহিত বর্ণ উচ্চ প্রতিকৃতি সকল দেখা যায় এবং যাহারা কখন কখন সূর্য্যের শরীরের উপরিভাগে ৪০ সহস্র মাইল পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়া থাকে, সূর্য্যের ভৌতিক গঠন সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যত মত প্রচারিত হইয়াছে, উক্ত শোণিতবর্ণ আকৃতিসমূহের উৎপত্তির, সেই সকল মতের সহিত কোনরূপে সামঞ্জস্য হয় না। সূর্য্যমণ্ডল কত আশ্চর্য্য অপরিজ্ঞাত কাণ্ডেরই আকর! (ক্রমশঃ)

† "Mr. Nasmyth (1862) described the spots as gaps or holes, more or less extensive in the luminous surface or photosphere of the Sun. These exposed the totally dark bosom or nucleus of the sun. Over this appears the mist surface ;—a thin, gauze-like veil spread over it. Then came the penumbral stratum, and, over all, the luminous stratum, which he had the good fortune to discover was composed of a multitude of very elongated, lenticular-shaped, or, to use a familiar illustration, willowleafshaped masses, crowded over the photoshere, and crossing one another in every possible direction......These elongated, lens-shaped objects he found to be in constant motion relatively to one another. They sometimes approached, sometimes receded, and sometimes they assumed a new angular position, by one end either maintaining a fixed distance or approaching its neighbour, while at the other end they retired from each other. These objects, some of which were as large in superficial area as all Europe, and some even as the surface of the whole earth, were found to shoot in thin streams across the spots,......sometimes by crowding in on the edges of the spot they closed it in, and frequently at length thus obliterated it. These objects were of various dimensions, but in length generally were from ninety to one hundred times as long as their breadth at the middle or widest part."—*Meeting of the British Association*—1862,

আপনাকে বড় জ্ঞানই আত্মাভিমান। কেহবা আপনাকে ধনে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে মান সম্ভ্রমে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে বিদ্যা বুদ্ধিতে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে ক্ষমতাতে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে ধর্ম্মেতে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; এবং কেহবা আপনাকে মদ্যপান অথবা অন্য কোন অসৎ কার্য্যে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন। লোকে যেরূপ সৎকার্য্যের জন্য অভিমানী হয় আবার সেইরূপ অসৎ কার্য্যের জন্যও অভিমানী হয়। আমাদিগের উপস্থিত প্রস্তাবে বিবেচ্য এই যে, আত্মাভিমান হইতে কিরূপ ফলোৎপত্তি হয়—আত্মাভিমান কি সুফল প্রসূ, অথবা আত্মাভিমান হইতে মনুষ্য জাতি অবনত হইতেছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আপনাকে বড় জ্ঞানই আত্মাভিমান। আপনাকে বড় বিবেচনা করিলে, তদনুযায়িক আচরণ করিতে প্রয়াসী হওয়া মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। তবে যিনি যে বিষয়ের অভিমানী তিনি তদ্বিষয় রক্ষার্থেই চেষ্টা করেন।

ধনাভিমান

ধনাভিমানী লোক কিরূপে আপনার ধন বৃদ্ধি হইবে তদ্বিষয়ে যত দূর যত্নশীল হয়েন বা না হয়েন কিরূপে ধনগৌরব বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ কিরূপ আচরণ করিলে লোকে ধনী বলিয়া গৌরব করিবে তাহার প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি করিয়া চলেন। ধন শব্দের অর্থ কি? যত্নলব্ধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য অথবা যাহার বিনিময়ে যত্নলব্ধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাকে ধন বলে। কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত পর্য্যন্ত সমুদয়ই ধনসাপেক্ষ। এইজন্যই লোকে ধনের জন্য লালায়িত। পক্ষান্তরে যাহার অধিক ধন থাকে, লোকে ধনপ্রাপ্তি আশয়ে তাহার বশীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত ধন থাকিলে লোকের গৃহাদির এরূপ শোভা হয় যে, স্বতঃই তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য চিত্তকে হরণ করে। ধনশালী লোক যে যে

কারণ বশতঃ লোকের প্রীতিভাজন হয়, তাহা ব্যয়মূলক।* লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইবার আশয়ে ধনাভিমানী লোক ব্যয়শীল হয় এবং তদ্দ্বারা দরিদ্র আত্মীয় বন্ধু, শিল্পী ভিক্ষুক এবং সময়ে সময়ে জনসাধারণে যারপরনাই উপকৃত হয়। বস্তুতঃ এই শ্রেণীস্থ লোক কখন্ নিতান্ত অসাধ্য না হইলে ব্যয়কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং জন সাধারণে তাঁহার হস্তে নানারূপ উপকার লাভ করে। পৃথিবীতে যত সৎকার্য্য সংস্থাপিত † হইয়াছে তাহার অনেক কারণ সত্ত্বেও ধনাভিমান অন্যতর।

সংসারে সকল বস্তুরই দুই দিক আছে, ধনাভিমানের অশেষগুণ সত্ত্বেও দুই একটী কুফল দৃষ্ট হয়।

(১) অবস্থাতীত ধনাভিমান বশতঃ অনেক সময়ে লোকে কুকর্ম্মাসক্ত হয়। এই জন্যই লোকে "গরু মেরে বামুনকে জুতো দান করে।" অভিমানবশতঃ লোকে কতকগুলিন কার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া, তদনুরূপ অবস্থা না থাকিলে, অর্থের জন্য প্রায় কোনরূপ অসৎ কার্য্য করিতেই কুণ্ঠিত হয় না। অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন জমিদারের বংশস্থ কেহ অপেক্ষাকৃত দুরবস্থাগ্রস্ত হইলে যে প্রজাপীড়ক হয়, ইহাই তাহার অন্যতর কারণ।

(২) ধনাভিমান জন্য অনেক সময়ে লোকে অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করে এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া পরিণামে সর্ব্বস্বান্ত হয়। এইরূপে অস্মদ্দেশীয় কত ধনশালী পরিবার যে দরিদ্র হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বস্তুতঃ আমাদিগের দেশে যত ধনশালী বংশ দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই আধুনিক। প্রাচীন ধনী সন্তানগণ প্রায় দরিদ্র হইয়াছেন। ইহার অশেষ কারণ সত্ত্বেও ধনাভিমানমূলক কার্য্য অন্যতর ও প্রধানস্থলীয়। অধুনা আমাদিগের দেশে ইংরাজী সভ্যতার প্রভাবে ধনসহ প্রধানতঃ মান-সম্ভ্রমাদি যুক্ত হওয়ায় লোকে আয়াতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকে। এই জন্যই যাঁহার পিতা-পিতামহ মাসিক একশত‡ টাকা আয় করিয়া ছয় আনার চটী ও চৌদ্দ আনার কাপড় পরিধান করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র ৩।৪ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আশৈশব বিংশতি বৎসর

---

* যাহার গৃহে ধন প্রোথিত থাকে, তাহার দ্বারা সমাজে কেহই উপকৃত হয় না। সে যেমন দানাদি করে না, সেইরূপ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ অথবা অন্য কোন শিল্পজাত পদার্থ দ্বারা গৃহ অথবা শরীরের শোভা সম্বর্দ্ধন জন্য যত্ন করে না। এরূপ প্রকৃতির লোক ধনের অভিলাষ করে না। লোকে তাহাকে ধনশালী বলিলে যারপরনাই চিন্তিত হয়, পাছে দরিদ্র আত্মীয় কুটুম্ব অথবা ভিক্ষুক ধন প্রার্থনা করে, কিম্বা চৌরাদি তাহা অপহরণ করিয়া লয়।

† এ বিষয় যশোভিমান বর্ণন সময়ে সম্যক্ বিবৃত হইবে।

‡ দ্রব্যাদির মূল্য বিবেচনা করিলে তৎকালীন একশত টাকা অধুনাতন ৩০০৲ টাকা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্।

কালেজে ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়া মাসে ৪০।৫০ টাকা আয় করেন এবং ৫৲ টাকা মূল্যের বিনামা ও দশ টাকা মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিয়াও সন্তুষ্টচিত্ত হইতে পারেন না। এই জন্য বর্ত্তমান বংশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় কেহই সঞ্চয়শীল নহে, তন্নিবন্ধন অনেক সময়ে অনেক ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ্য করে এবং সঞ্চয়শীলতা হইতে যে মহান্ উপকার সকল সাধিত হয় তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ বিবেচনা করিলে বর্ত্তনান বংশীয় লোক ধনগৌরব করিয়াই নষ্ট হইতেছে। আমাদিগের আয় অতি অল্প, তথাপি সাহেবদিগের সহিত বাহ্যিক আড়ম্বরে সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করি।

(৩) ধনাভিমানীর মনে সুখ নাই। সর্ব্বদা ধনগৌরব লাভের জন্য ব্যস্ত। এক দণ্ড সুখে কালাতিপাত করিতে পারে না। প্রচুর আয়বান্ না হইলে সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত থাকে এবং তন্নিবন্ধন অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করে। প্রাচীন ধন-শালী ভগ্নাবস্থ লোক ও আধুনিক শিক্ষিত যুবক উভয়েই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

(৪) এই ধনগৌরবাকাঙ্ক্ষা বশতঃ অনেক সময়ে আধুনিক লোকে, যেমন লোকের নিকট অধিক আয়বান্ বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য ঋণ করিয়াও বাহ্যাড়ম্বর করে, সেইরূপ আবার কখন কখন অবস্থা সম্বন্ধে অনৃত বাক্যও প্রয়োগ করে।

এইরূপ ধনাভিমানের যতই কেন দোষ থাকুক না, তাহা কেবল তাহার অযথা পরিমাণোৎপন্ন। পরিমিত সীমা অতিক্রম করিলে সকল বিষয় হইতেই কুফলোৎপত্তি হয়। দয়া মমতা প্রভৃতি মনুষ্য জীবনের ভূষণ—ইহলোকে দেবদুর্ল্ভ গুণাবলীও যদি অযথাপরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে যারপরনাই কুফলোৎপাদন করে। জগতে এমন কিছুই নাই যাহা নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে কুফল প্রসূ হয় না। এই জন্য ধনাভিমানের অযথা পরিমাণোৎপন্ন অনেক কুফল সত্বেও তাহা মানব-সমাজের অপকারী না হইয়া উপকারী পদের বাচ্য।

যশোভিমান

যশোভিমান মনুষ্যের মনে যারপরনাই প্রবল। জগতে যত সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহার অধিকাংশই ইহলোকে চিরস্মরণীয় হওয়ার উদ্দেশ্যমূলক—এ কথা বোধ হয়, যিনি মানবপ্রকৃতি একটু মনোযোগ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া থাকেন তিনিই স্বীকার করিবেন। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া লোকের উপকারের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে—এরূপ দেবপ্রকৃতির কয়জন লোক সংসারে দেখা গিয়া থাকে? দার্শনিকপ্রবর লক অথবা অগস্ত কোমৎ যাহাই কেন বলুন না, সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার কল্পনা-প্রধান বালকের স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। অন্য কোন বিশেষ স্বার্থ বর্জ্জিত হইয়াও সুনাম লাভ আশায় লোকে সদনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যদি সৎকর্ম্মশালী লোককে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উচ্চ উপাধি

দ্বারা সম্মানিত না করিতেন, তাহা হইলে, অস্মদ্দেশে কদাপি সদনুষ্ঠানের এত বাহুল্য হইত না—এত বিদ্যালয়, এত চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়া, লোকের অশেষ উপকার সংশাধিত হইত না, এত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত হইয়া লোকের গতিবিধির ঈদৃশ সুবিধা হইত না।

কেবল সৎকার্য্যানুষ্ঠান নহে, যশোভিমানী লোক অনেক সময়ে সুনাম হানির অভিপ্রায়ে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয়। কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অভিমানী লোক প্রায়শঃ নীচ প্রকৃতি লোকের ন্যায় দুষ্কর্ম্মান্বিত নহে। আমাদিগের ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে পরলোক-ভীতি ও পরমেশ্বরের উপর শ্রদ্ধার ভাব পূর্ব্ববর্ত্তী বংশীয়দিগের অপেক্ষা নিতান্ত অল্প হইয়াছে, তথাপি কে না স্বীকার করিবেন বর্ত্তমান বংশীয়দিগের নীতি পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। অনৃতাচার, অনৃত কথন, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। ইহার অনেক কারণ সত্ত্বেও যশোভিমান অন্যতর।

এই ভাব লোকের মনে এতই প্রবল যে, দার্শনিকবর বার্ণার্ড ডি মাণ্ডীবীল যশোভিমানই লোকের ন্যায়ান্যায় নির্দ্ধারণের উপায় বলিয়া বর্ণন করেন। সকল সুনীতি এই অভিমান (১) অর্থাৎ লোকানুরাগ-প্রিয়তা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান দার্শনিক বেন বলেন, "মনুষ্য নিশ্চেষ্ট ও ভীরুপ্রকৃতিক—কোন বিশেষ ভাব প্রধান নহে। সুতরাং আত্মাভিমান না থাকিলে নিশ্চয়ই আদিম অবস্থা হইতে উন্নত হইতে পারিত না। তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্র লেখকেরা আত্মাভিমানের উপর দোষারোপ করেন। অভিমান নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। আমি বড় নিরভিমানী এই বলিয়াও সময়ে সময়ে অভিমান হয় এবং দুষ্কর্ম্ম করিয়াও লোকে সময়ে সময়ে অভিমানী হয়। আত্মাভিমান অনেক সময়ে মনুষ্যকে সৎকর্ম্মশালী করে। সতীর সতীত্ব, বীরের বীরত্ব অভিমানমূলক।" (২)

(১) "The Moral Virtues are the political offsprings which flattery beget upon pride." Mandeulle's Fable of the Bees.

(২) "Man is naturally innocent, timid and stupid. Destitute of strong passion or appetite, he would remain in his primitive barbarious state were it not for pride; yet all moralists condemn pride, as a vain notion of our superiority. It is a subtle passion not easy to trace. It is often seen in the humility of the humble and the shamelessness of the shameless. It stimulates charity; pride and vanity have built more hospitals than all the virtues together. It is the chief ingredient in the chastity of women and in the courage of men."

Bain.

আমরা মাণ্ডীবীল ও বেন সাহেবের সহিত অনেকাংশে ঐকমত্য প্রকাশ করি। যদিও এই পাপ-পুণ্যময় সংসারে এমন অনেক লোক আছে, ধর্ম্মই যাহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত এবং পরলোক ভয়েই যাহারা সমুদয় সদনুষ্ঠান করে, তথাপি অধিকাংশ সৎকর্ম্মশালী লোকই যে সম্মান প্রত্যাশী এ কথাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

অস্মদ্দেশে এই ভাব এতাধিক প্রবল যে, অখ্যাতি হইবে, দশজনে হাসিবে বা দশজনের কাছে মুখ থাকিবে না—এইরূপ বাক্য আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে সর্ব্বদাই শুনা যায়।

ধনাভিমানের ন্যায় যশোভিমানও অযথা প্রবল হইলে লোকে নানারূপ কুকর্ম্মাসক্ত হয়; যশোলাভ প্রত্যাশায় যারপরনাই অযশের কার্য্য করে। রাজপুত্রগণ একমাত্র বংশমর্য্যাদা রক্ষা হেতুই অনেক স্থলে কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই প্রাণবধ করে।

সময়ে সময়ে লোকে দুষ্কর্ম্মে খ্যাতিলাভের জন্যও ব্যস্ত হয়। মাতাল অধিক পরিমাণে মদ্যপান ও লম্পট দুষ্ক্রিয়াতে চাতুর্য্যলাভ, গৌরবের বিষয় মনে করে। এইরূপে যে যে কার্য্যে রত হয়, সে তাহাতেই বাহবা লোভের জন্য সমিচ্ছুক হয়। মহাবীর আলেকজণ্ডর একমাত্র সম্মান লাভাকাঙ্ক্ষায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন, ও শত শত নগর ও পল্লী লুণ্ঠন করিয়া নির্ধন ও নির্ম্মনুষ্য করিয়াছেন। এবং কর্ত্তেজ, পিজারো মণ্টজুমার একমাত্র সম্মান লাভাকাঙ্ক্ষায় ধর্ম্মের নামে সহস্র সহস্র নিরপরাধী আমেরিকাবাসীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। একমাত্র পৌত্তলিকতা বিনাশ সম্মানাকাঙ্ক্ষায়ই গজনীর মহম্মদ সোমনাথের মন্দির জয় করিলে পাণ্ডাদিগের অনেক অনুরোধ ও অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করিয়াও প্রতিমা ভগ্ন করিয়াছিলেন। এবং একমাত্র সম্মানাকাঙ্ক্ষায় কোন গ্রীক সম্রাট্ মক্ষিকা বধ জীবনের প্রধান কার্য্য করিয়াছিলেন।

সম্মানাকাঙ্ক্ষার এই সকল দোষ দেখিয়া কি আমরা তাহাকে মনুষ্যের অপকারী আখ্যা প্রদান করিব? আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, সম্মানাকাঙ্ক্ষা লোককে কার্য্যে উৎসাহশীল করে। কিন্তু কার্য্য অন্য মূল হইতে উৎপন্ন হয়। যে যে বিষয় ভাল বুঝে, যাহার কল্পনা যে বিষয়োৎপন্ন সুখ বার বার ধ্যান করিয়াছে, সে সেই বিষয়েরই অনুসরণ করে। সুতরাং যাঁহার সম্মানাকাঙ্ক্ষা বশতঃ নীচগামী হন তাঁহাদিগের বুদ্ধি ভ্রমজালে আবদ্ধ। সম্মানাকাঙ্ক্ষার কোনই দোষ নাই।

স্বাভাবিক বুদ্ধি অথবা বিদ্যাভিমান

স্বাভাবিক বুদ্ধির নিমিত্ত অভিমানী লোক সর্ব্বদাই নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার অথবা নূতন মত প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। বস্তুতঃ সংসারে এই সংখ্যক লোক যত

অধিক হয়, মানব সমাজ ততই নূতন মত এবং নূতন তত্ত্ব জানিতে পারে। বুদ্ধির জন্য অভিমান না থাকিলে, কে বহুকাল প্রচলিত সহস্র সহস্র পণ্ডিতানুমোদিত আপামর সাধারণের মতের বিরোধী কথা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইত ? জগতে এমন অনেক বুদ্ধিজীবী লোক আছেন, যাঁহারা অনেক নূতন বিষয়ের চিন্তা করেন, চিন্তা করিয়া অনেক সময়ে অনেক নূতন তত্ত্বও অবধারণ করেন কিন্তু অভিমান না থাকায় তাঁহারা জনসাধারণের বিশ্বাসাতীত মত প্রচার করিতে সাহস পান না। বস্তুতঃ নিরভিমান যে মানব সমাজকে কত নূতন মত সুতরাং তজ্জাত উপকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

পক্ষান্তরে স্বাভাবিক বুদ্ধির অভিমানী লোক অনেক সময়ে যথোচিত চিন্তা না করিয়াই নূতন মত ব্যক্ত করেন এবং তদনুসরণকারীকে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত করেন। অনেক সময়ে গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, অর্থাৎ অন্যের মত গ্রহণ পক্ষে এত উদাসীন হয়েন যে, বিবেচ্য বিষয় সকল ভাবে বিচার করেন না। কিন্তু এজন্য আমরা অভিমানের উপর দোষারোপ করিতে পারি না। স্বাভাবিক বুদ্ধিজীবী লোক যদি অন্যের বুদ্ধি ও মত শুনেন, তাহা হইলে কদাপি তাঁহার বুদ্ধি মলিন হয় না, বরং প্রখর ও মার্জ্জিত হয়। বুদ্ধির নৈসর্গিক অবস্থা পুষ্পকোরকবৎ। যেরূপ সূর্য্যরশ্মি প্রভৃতির অভাবে কোরক প্রস্ফুটিত হইয়া পুষ্পে পরিণত হয় না, সেইরূপ উচিতরূপে চর্চ্চিত ও মার্জ্জিত না হইলে স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হইয়া উচিতরূপে চিন্তা করিতে সক্ষম হয় না। তবে যে স্বাভাবিক বুদ্ধিজীবী লোক অন্যের মতাদি পক্ষে যারপরনাই উদাসীন হয় তাহা প্রকৃত অভিমানমূলক নহে—তাহা তাঁহাদিগের মনঃসংযোগাভাবের ফল।

বিদ্যাভিমানী লোক নিরন্তর গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন এবং তন্নিবন্ধন স্বয়ং অনেক উন্নতিলাভ এবং মানব সমাজকেও অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেন। কিন্তু স্বাধীন-চিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বদা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যক্ষমতা হারাইতে হয় এবং অস্মদ্দেশীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের ন্যায় সাধারণ বুদ্ধি হারাইয়া পশুবৎ হইতে হয়। অধুনা অনেক বিদ্বান্ লোক জন্ম পরিগ্রহ করিতেছেন। প্রাচীন কালাপেক্ষা বিদ্যালোক কত অধিক পরিমাণে বিকীর্ণ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেক লোকেই স্বীকার করিবেন, চিন্তা-শীলতা ও মৌলিকতার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। প্রাচীনকালের শিক্ষিত ও চিন্তাশীলের অনুপাত অধুনাতন শিক্ষিত ও চিন্তাশীলের অনুপাত অপেক্ষা অনেক অধিক একথাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বস্তুতঃ অধিক অধ্যয়ন ও অল্প চিন্তাবশতঃ এরূপ ঘটিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমুদয় কুফল প্রত্যক্ষ করিয়াও আমরা বিদ্যাভিমানকে অপকারী বলিতে পারি না। যাঁহারা চিন্তা

অপেক্ষায় অধিক অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা মনে করেন না যে, তাহাতে বিদ্যার বৃদ্ধি হয় না। মূলে ভ্রান্তিমূলক মতই এই অনিষ্ট প্রসব করিতেছে। বিদ্যাভিমান কদাপি এরূপ করে নাই।

ধর্ম্মাভিমান

ধর্ম্মাভিমান বশতঃ সংসারে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অনেক পরিমাণে অসৎ কার্য্যের নিবৃত্তি হয়। বস্তুতঃ অভিমানশূন্য প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক হইতে সংসারে যত উপকার হয়, ধর্ম্মাভিমানী হইতে তদপেক্ষা অশেষ গুণে অধিক হইয়া থাকে একথা কে সন্দেহ করিবে? কারণ প্রকৃত ধার্ম্মিক লোকাপেক্ষা ধার্ম্মিকাভিমানীর সংখ্যা অশেষ গুণে অধিক। ধর্ম্মাভিমানীর মনে ঈশ্বর চিন্তা ও বিশ্বাস যত দূর প্রবল থাকুক বা না থাকুক সে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত হয় ও তাহার সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানশীলতা প্রবল হয়। এবং তাহা হইতে জনসাধারণে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়। অস্মদ্দেশে যত ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে দীন দুঃখী যে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহার অনেক কারণ সত্ত্বেও ধর্ম্মাভিমান অন্যতর। অস্মদ্দেশে অনেক দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোক একমাত্র ধর্ম্মাভিমানবশতঃ যারপরনাই সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবিষয় সর্ব্বদাই চাক্ষুষ করা যায়। যে মহাপাপী পরম স্বার্থপর বৃদ্ধ মাতা অথবা বনিতার ভরণ-পোষণ ভার বহন করিতে অনিচ্ছুক সেও অনেক সময়ে সাধারণ হিতকর ব্যাপারে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। (১) এরূপ গর্হিত আচরণ আমাদিগের অনুমোদিত বিষয় বলিতেছি না। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য যে, মহা পাপীর মনেও ধর্ম্মাভিমান প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কোন কোন স্থলে সৎকর্ম্মশালী করে।

ধনাভিমান, যশোভিমানের ন্যায় ধর্ম্মাভিমান বশতঃও লোকে অনেক সময়ে অনেক অসৎ কার্য্য ও উন্মত্তবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। ধর্ম্মের জন্য যে উৎপীড়ন হয়, ধর্ম্মাভিমানই তাহার একমাত্র কারণ। নরশোণিততৃষ্ণাবিধুরা মেরী এক মাত্র ধর্ম্মাভিমান বশতঃই কয়েক বৎসর মধ্যে ২৭৭ জন পোপবিরোধী খৃষ্টানের প্রাণ বধ করিয়াছিলেন। বেকেট পোপের পদাভিষিক্ত হইয়া স্বাভাবিক শম প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া তাৎকালীন ঐ পদসুলভ দুর্দ্ধর্ষভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। লুই একদিনে বহুতর লোকের রক্তপাত করিয়াছিলেন। অনেক রুমীয় সম্রাট্

---

(১) আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। এরূপ একজন ব্যক্তির সহিত আমার একদিবস অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। পরিশেষে তিনি বলিলেন "আমি ভগবানের একটি নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি বটে কিন্তু তাহা না করিলে অর্থাৎ পরিবার প্রতিপালনে উচিত রূপ অর্থ ব্যয় করিলে আমি কদাপি ভারতমাতার দুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারিব না।"

প্রথমসাময়িক খৃষ্টানগণের পবিত্র শোণিতে বসুমতীকে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ কত নির্দ্দোষী লোকের প্রাণসংহার করিয়া আপনাদিগের চির কলঙ্ক ঘোষণা করিয়াছেন। ডামাস্কাস আক্রমণ কালে খালেড পবিত্র প্রণয়াবদ্ধ দম্পতির বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন। কত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী নরপতি নিরপরাধী বৌদ্ধদিগের প্রাণহানি ও অশেষবিধ অত্যাচারে অত্যাচারিত করিয়াছিলেন। অধুনা হিন্দুগণ ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানদিগের উপর কত অকথ্য অত্যাচার করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মাভিমান বশতঃ কত লোক কত অমানুষী কঠোর করিয়া জীবন ক্লেশে অতিবাহন করিতেছেন। কেহবা উর্দ্ধহস্তে, কেহবা অধোমুখে, কেহবা শীতকালে বস্ত্রাভাবে, কেহবা দারুণ নিদাঘসন্তপ্ত মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য কিরণে যার-পরনাই ক্লেশ সহ্য করিয়া ইহজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। কেহবা অনশনে শরীর ক্ষয় ও (হয়ত) প্রাণত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্য লোকের দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গবাসী হইতেছেন!!

এই সকল দোষ সত্ত্বেও ধর্ম্মাভিমান মনুষ্যের পরমোপকারী। এসকল ধর্ম্মাভিমানের দোষ নহে। লোকের অজ্ঞতার দোষ অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক অনৈসর্গিক বিষয় সহ ধর্ম্মাভিমান যুক্ত হইয়া এইরূপ কুফল উৎপাদন করে।

বীর্য্যাভিমান

বীর্য্যাভিমান জাতিসাধারণের উন্নতির প্রধান কারণ। বীর্য্যাভিমানপরায়ণ জাতি কখন অন্যের অধীনতা স্বীকার করে না, শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনন্দে প্রাণত্যাগ করে, তথাপি এক জনের দেহে প্রাণ থাকিতেও সমরানল নির্ব্বাণ হইতে দেয় না। যখন সিপীয় কার্থেজ আক্রমণ করিলেন, অধিবাসিগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং দেশের সমুদয় ধন নিঃশেষ হইলে যোষিৎগণ আপনাদিগের গাত্রাভরণ ও মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া যুদ্ধোপকরণ যোগাইতে লাগিলেন। এই বীর্য্যাভিমান আবার লোককে কত সময় কত নিরর্থক সমরে প্রবৃত্ত করায়; কত সময় কত নির্দ্দোষ লোকের প্রাণহানি করে, কত সময় কত সাধুর সর্ব্বস্বান্ত করে, কত সময় কত নিরপরাধী জাতির জীবনের সারসর্ব্বস্ব স্বাধীনতা-রত্ন অপহরণ করিয়া এবং কত সময় দুর্ব্বল ভ্রাতাকে পদে দলিত করিয়া মনুষ্য নামের কলঙ্ক ঘোষণা করে! কিন্তু এসমুদয় বীর্য্যের অযথা ব্যবহার হইতে উৎপন্ন। বস্তুতঃ নির্দ্দোষীর অনিষ্টসাধন প্রকৃত বীরত্ব নহে। অত্যাচারীর হস্ত হইতে দুর্ব্বল ও আপনাকে রক্ষাই প্রকৃত বীরত্বের কার্য্য।

যথার্থ বীরপুরুষ অপমান সহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার চরিত্র কদাপি নীচ হয় না। (পুনঃ পুনঃ অপমানিত হইলে যে হৃদয়ের মহৎ আশয়তা কিয়ৎ পরিমাণে অপনীত হয় তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।) সুতরাং তাঁহার জীবনও প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় হয়। কিন্তু অজ্ঞতা বীর্য্যযুক্ত হইলে মনুষ্য উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করে। এজন্য মধ্য সময়ে সিবাল বিয়াম নাইটগণ মনুষ্যের প্রকৃত উপকার সঙ্কল্প হইয়াও অনেক সময়ে যারপরনাই অত্যাচারী ও অনিষ্টকারী হইয়াছিলেন। এই জন্যই অনেক নাইট ডনকুইস্কটের সঙ্কেপাত্রজার ন্যায় ক্ষিপ্তবৎ আচরণ করিয়া সংসারের বিস্তর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বীর্য্যাভিমানের দোষ নহে—অজ্ঞতার দোষ।

এইখানে আসিলে, সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত, মূর্খ; ধনী, দরিদ্র; সুন্দর, কুৎসিত; মহৎ, ক্ষুদ্র; ব্রাহ্মণ, শূদ্র; ইংরেজ, বাঙ্গালি, এইখানে আসিলে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক, সকল বৈষম্য এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈশা বল, রুসো বল, রামমোহন রায় বল, কিন্তু এমন সাম্য-সংস্থাপক এ জগতে আর নাই। এ বাজারে সব এক দর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাটক লেখক, একই মূল্য বহন করে। তাই বলি, এ স্থান ধর্ম্মভাবপূর্ণ—এ স্থান সদুপদেশপূর্ণ—এ স্থান পবিত্র।

এইখানে বসিয়া একবার চিন্তা করিতে পারিলে, মনুষ্যমহত্ত্বের অসারতা বুঝিতে পারি, অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়, আত্মাদর সঙ্কুচিত হয়, স্বার্থপরতার নীচতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরে হউক, সকলকেই আসিয়া এই শ্মশানমৃত্তিকা হইতে হইবে। যে অমানুষবীর্য্য, যে অহঙ্কার আর পৃথিবী নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে—তুমি আমি কে? যে উৎকট আত্মাভিমান ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সাহঙ্কারে কর চাহিয়াছিল * তাহা এই মাটিতে বিলীন হইয়াছে—তুমি আমি কে? সে দিন যে চিন্তাশক্তি, ঈশ্বরকে স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল, † তাহা এই মাটিতে মিশিয়াছে—তুমি অমি কে? যে রূপের অনলে ট্রয় পুড়িয়াছিল, যে সৌন্দর্য্যতরঙ্গে বিপুল রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে লাবণ্যরজ্জুতে জুলিয়স্ সিজর বাঁধা পড়িয়াছিল, যে পবিত্র সৌকুমার্য্যে এ পাপ হৃদয়ে কালানল জ্বলিয়াছে, সে সুন্দরী, সে দেবী, সে বিলাসবতী, সে অনির্ব্বচনীয়া, এই মাটিতে পরিণত হইয়াছে, —তুমি আমি কে? কয় দিনের জন্য সংসার? কয় দিনের জন্য জীবন? এই নদীহৃদয়ে জলবিম্বের ন্যায়, যে বাতাসে উঠিল, সেই বাতাসেই মিলাইতে পারে।

---

* See Lewes' History of Philosophy. Auguste Comte.

† See J. S. Mill's Three Essays on Religion.

আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া, একজন ভ্রাতাকে চরণে দলিত করিলাম, কিন্তু কালি এমন দিন আসিতে পারে যে, আমাকে শৃগাল কুক্কুরে পদাঘাত করিলেও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব না। কেন অহঙ্কার? কিসের জন্য অহঙ্কার? এ অনন্ত বিশ্বে, আমি কে—আমি কতটুকু—আমি কি? এই মাটির পুতুলে, অহঙ্কার শোভা পায় না। তাই বলিতেছিলাম, এই স্থান মনে উঠিলে সকল অহঙ্কার—বিদ্যার অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার, প্রতিভার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। আর সেই দিন, তাহা অপরিহার্য্য—পলাইয়া রক্ষা নাই। যে ভীরুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণসেণ, জীবনের ভয়ে, যবনহস্তে জন্মভূমি নিক্ষেপ করিয়া মুখের গ্রাস ভোজন পাত্রে ফেলিয়া, তীর্থযাত্রা করিলেন, তিনি এড়াইতে পারিলেন না। শুনিয়াছি স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান। স্বর্গ কি, তাহা জানি না—কখন দেখি নাই, কিন্তু শ্মশানভূমির এই উপদেশ জীবন্ত। এস্থান স্বর্গের অপেক্ষাও বড়। এ স্থান পবিত্র।

আর স্বার্থপরতার, তাহারও ক্ষুদ্রত্ব অনুমিত হয়। সম্মুখে, অসীম জলরাশি অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে; পদতলে, বিপুলা ধরিত্রী পড়িয়া রহিয়াছে; মস্তকোপরি, অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহাতে অসংখ্য সৌরমণ্ডল, অগণনীয় নাক্ষত্রিক জগৎ, নাচিয়া বেড়াইতেছে; সংখ্যাতীত ধূমকেতু ছুটাছুটি করিতেছে, ভিতরে, অনন্ত দুঃখরাশি, ক্ষুব্ধসাগরবৎ, মদমত্ত মাতঙ্গবৎ, দুলিতেছে। যে দিকে দৃষ্টি ফিরাও সেই দিকেই অনন্ত—আমি কত ক্ষুদ্র—কত সামান্য! এই সামান্যের, এই ক্ষুদ্রের, এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রতরের জন্য এত আয়াস, এত যত্ন, এত গোল, এত বিভ্রাট, এত পাপ!—বড় লজ্জার কথা। সেই ক্ষুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে জীবন অতিবাহিত হইল, তাহার মহত্ত্ব কোথায়? কিন্তু তুমি আমি ক্ষুদ্র হইলেও মানবজাতি ক্ষুদ্র নহে। একটি একটি মনুষ্য লইয়াই মনুষ্যজাতি, স্বীকার করি; কিন্তু জাতিমাত্রই মহৎ। বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র, কণা কণা বাষ্প লইয়া মেঘ; রেণু রেণু বালুকা লইয়া মরুভূমি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র লইয়া ছায়াপথ; পরমাণু লইয়া এ অনন্ত বিশ্ব। একতাই মহত্ত্ব—মনুষ্যজাতি মহৎ, মহৎ কার্য্যে আত্মসমর্পণ করায় মহত্ত্ব আছে। স্বীকার করি, ব্যক্তিমাত্রের ন্যায় জাতিমাত্রেরও ধ্বংস আছে। এরূপ প্রমাণ আছে যে, একাল পর্য্যন্ত অনেক প্রাচীন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে এবং অনেক নূতন জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যে দিন মনুষ্যজাতির লোপ হইবে, সে দিন আমিও তাহা দেখিতে থাকিব না, কেননা আমিও মনুষ্য—মনুষ্যজাতির অন্তর্গত। কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি—

এইখানে আসিয়া সকল জিনিষের সমাধি হয়। ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, সব এই পথ দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায়। এ সুখের স্থান। এইখানে শয়ন করিতে পারিলে শোকতাপ যায়, জ্বালা যন্ত্রণা ফুরায়, সকল দুঃখ দূর হয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, সকল দুঃখ দূর হয়।* আবার তাও বলি, এ দুঃখের স্থান। এইখানে যে আগুন জ্বলে, তাহা এ জন্মে নিবে না। তাহাতে সৌন্দর্য্য পোড়ে, প্রেম পোড়ে, সরলতা পোড়ে, ব্রীড়া পোড়ে, কোমলতা পোড়ে, পবিত্রতা পোড়ে, যাহা পুড়িবার নয় তাহাও পোড়ে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, সুখ, উচ্চাভিলাষ, মায়া, সব লুপ্ত হয়। তাই বলি এস্থান সুখেরও বটে, দুঃখেরও বটে—যে চলিয়া যায়, তার সুখ, যে পড়িয়া থাকে তার দুঃখ। এ সংসারেরই ঐ নিয়ম—সবই ভাল, সবই মন্দ। কুসুমে সৌরভ আছে, কণ্টকও আছে; মধুতে মিষ্টতা আছে, তীব্রতাও আছে; সূর্য্যরশ্মিতে প্রফুল্লতা আছে, রোগজনন প্রবণতাও আছে; † রমণীর চক্ষে সৌন্দর্য্য আছে, সর্ব্বনাশের মূলও আছে, রমণীর হৃদয়ে ভালবাসা আছে, প্রতারণাও আছে। ধনে ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যৌননির্ব্বাচনের প্রতিবন্ধকতাও করে।‡ জগতে

---

* দুঃখ ত্রিবিধ;—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই ভাগে বিভক্ত;—শারীর এবং মানস। বাতপিত্তশ্লেষ্মার বৈষম্য নিমিত্ত যে দুঃখ (রোগাদি) তাহার নাম শারীর দুঃখ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, বিষাদ এবং বিষয় বিশেষের অদর্শন নিবন্ধন যে দুঃখ, তাহার নাম মানস দুঃখ। উভয় শ্রেণীরই এ সকল দুঃখ আভ্যন্তরীণ হেতুসমুদ্ভূত বলিয়া, ইহাদিগের নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। বাহ্য হেতুসমুদ্ভূত দুঃখও দ্বিবিধ;—আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। মনুষ্য পশু পক্ষী সরীসৃপ এবং স্থাবর নিমিত্ত যে দুঃখ তাহাই আধিভৌতিক। যক্ষোরাক্ষস বিনায়ক এবং গ্রহাবেশ নিবন্ধন যে দুঃখ, তাহার নাম আধিদৈবিক দুঃখ। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

†Sunstroke. See Tanner's Practice of Medicine. Vol. I. page 37.

‡The Grecian poet, Theognis, who lived in 550 B. C., clearly saw, that wealth of ten checks the proper action of sexul selection. He thus writes:

"But, in the daily matches that we make,
The price is everything ; for money's sake,
Men marry ; women are in marriage given ;
The churl or ruffian, that in wealth has thriven,
May match his offspring with the proudest race ;
Thus everything is mixed, noble and base !
If then in outward manner, form and mind,
You find us a degraded, motley kind,
Wonder no more, my friend ! The cause is plain,
And to lament the consequence in vain."

See Darwin's Descent of Man, Part I. chap II. Also Part III. Chap. XX.

যৌন নির্ব্বাচন,—Sexual Selection.

কোথাও নির্দ্দোষ কিছু দেখিতে পাইবে না। সকলই ভাল মন্দে মিশ্রিত। এই জন্য প্রকৃতি দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলেন, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যে আদিকারণ, সেও ভালমন্দে মিশ্রিত; অথবা দুইটি শক্তি হইতে এ জগৎ সমুৎপন্ন—সেই শক্তির, একটি ভাল, একটি মন্দ; একটি স্নেহ, একটি ঘৃণা; একটি অনুরাগ, একটি বিরাগ; একটি আকর্ষণ, অপরটি প্রতিক্ষেপ।* কিন্তু, কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি—

এই যে সংসার, ইহা এক মহা শ্মশান। চিরপ্রবহমান কালস্রোতঃ, দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলকে পলকে, সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়া বিস্মৃতির গর্ভে ফেলিতেছে। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা দেখিয়াছ, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আর তাহা নাই—প্রাণ দিলেও আর তাহা ফিরিয়া আসিবে না। এইক্ষণে যাহা রহিয়াছে, পরক্ষণে আর তাহা থাকিবে না, অখিল সংসার খুঁজিয়া দেখিলেও, কোথাও পাইবে না। কোথায় যাইবে, কোথায় যায়, তাহা তুমিও যতদূর জান আমিও ততদূর জানি, এবং তুমি আমি যাহা জানি, তাহার অধিক কেহই জানে না। সবই যায়, কিছুই থাকে না—থাকে কেবল কীর্ত্তি। কীর্ত্তি অক্ষয়। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে। সেক্ষপীয়র গিয়াছেন, হামলেট্ আছে। ওয়াসিণ্টন গিয়াছেন, আমেরিকার স্বাধীনতার ধ্বজা আজও উড়িতেছে। রূসো গিয়াছেন, সাম্যের দুন্দুভিনিনাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে। কীর্ত্তি থাকে। অকীর্ত্তিও থাকে। লোকের ভাল, লোকের মন্দ, লোকের সঙ্গে চলিয়া যায়; কীর্ত্তি এবং অকীর্ত্তি জগতে বিচরণ করিতে থাকে। ওয়াসিণ্টনের স্বদেশানুরাগ তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে! সেক্ষপীয়রের চরিত্রদোষও তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। † কিন্তু তাঁহারা লোকের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার সৌরভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই বলি,—

ভাল মন্দ দুই, সঙ্গে চলি যায়ব,
পর উপকার সে লাভ।

* Attraction and Resistance of Matter. This theory originated with Laplace; it has been expounded by Herbert Spencer.

† K. Villemain says :—"Every year, it is stated, he went during the summer to spend some of his time at Stratford with his wife, his children, and his aged father. The poet's taste for the beauties of nature, his vivid impression of the green landscapes of England would alone indicate that he was in the habit of seeking rural repose. In his own time, however another motive was attributed for these frequent voyages; it has been stated that, upon the road to his native place, he was fond of stopping at the Crown in Oxford; the hostess of

ইহাই জগতের সারতত্ত্ব—ধর্ম্মের মূলভিত্তি—পুণ্যের সুবর্ণ সোপান।

এই সংসার এক মহাশ্মশান। যে চিতানল ইহাতে গর্জ্জিতেছে, তাহাতে না পোড়ে এমন জিনিষ নাই। জড়প্রকৃতি কাহারও মুখ তাকায় না; যাহা সম্মুখে পড়ে তাহাই পোড়াইয়া, সমান জ্বলিতে জ্বলিতে, সমান হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। ঐ যে নক্ষত্রনিচয় অল্পান্ধকারে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ও সকল এই বিশ্বব্যাপী মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র। এ সংসারে কোথায় অনল নাই? নির্ম্মল চন্দ্রিকায়, প্রফুল্ল মল্লিকায়, কোকিলের রবে, কুসুমের সৌরভে, মৃদুল পবনে, পাখীর কূজনে, রমণীর মুখে, পুরুষের বুকে—কোথায় অনল নাই? কিসে মানুষ পোড়ে না? ভালবাস, পুড়িতে হইবে; ভালবাসিও না, তদধিক পুড়িতে হইবে। পুত্রকন্যা না হইলে, শূন্যগৃহ লইয়া পুড়িতে হইবে; হইলে, সংসারজ্বালায় পুড়িতে হইবে। শুদ্ধ মনুষ্য কেন, সমস্ত জীবই পুড়িতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, যৌন নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, সামাজিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, পরস্পরের অত্যাচারে পুড়িতেছে। কে পোড়ে না? এ সংসারে আসিয়া, সুস্থমনে, অক্ষত শরীরে, কে গিয়াছে? আবার দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, এ পাপ সংসারে সহৃদয়তা নাই, সহানুভূতি নাই, করুণা নাই। এই অনন্ত জীবসমূহ, এই মহাবহ্নিতে হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হইতেছে;—জড়প্রকৃতি কেবল ব্যঙ্গ করে মাত্র। শশধরের সদা হাসি হাসি মুখে কখন কি বিষাদ চিহ্ন দেখিয়াছ? নক্ষত্র রাজির সোহাগের মৃদু কম্পনে কখন কি হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়াছ? কল্লোলিনীর কল নিনাদে কখন কি স্বরবিকৃতি দেখিয়াছ? নবকুসুমিতা ব্রততীর দোলনিতে কখন কি তালভঙ্গ দেখিয়াছ? আমরা পুড়িতেছি—কিন্তু ঐ দেখ, বৃক্ষরাজি করতালি দিয়া নাচিতেছে—ঐ শুন সমীরণ হাসিতেছে—হো—হো—হো।

হায়! এমন করিয়া আর কতদিন পুড়িব? কতদিনে এ যন্ত্রণা ফুরাইবে? আর কখন কি তোমায় পাইব না? আজি হউক, কালি হউক, দশদিন পরে হউক, জন্ম জন্মান্তরে হউক, যুগ যুগান্তরে হউক—আর কখন কি তোমায় পাইব না? না পাই, ভুলিতেও কি পাইব না?

---

which, remarkable for her elegance and beauty, became the mother of the poet Davenant. Shakespeare, who was an intimate guest, was godfather to his child, who was said to belong to him by a closer tie, and who subsequently took a singular pride in boasting of this descent. We are better able to understand, after this, the zeal of the royalist Davenant for the republican Milton. It was doubtless in his eyes a double debt of poetic parentage."

See Alfonse de Lamartine's Biographies and Portraits of some Celebrated People. vol. I. Essay on Shakespeare & William Davenant.

মনে মনে একটা বিশ্বাস আছে যে, যে দিন এই সৈকতশয্যায় শেষনিদ্রায় নিদ্রিত হইব, সেই দিন হয় ত তাহাকে ভুলিতে পারিব—হয় ত এ সায়াহ্নসমীরণ থামিবে—হয়ত এ অনল নিবিবে—হয়ত তাহাকে ভুলিব। এইরূপ একটা বিশ্বাস আছে বলিয়া সময়ে সময়ে মরিতে সাধ হয়। আবার তাও বলি, তাহাকে ভুলিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ মিটিমে, এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়াই মরিতে পারি না। এজন্মের শোধ সে যে চক্ষের বাহির হইয়াছে, তাহা ত জানি; কিন্তু অন্তরের অন্তরে ত জাগিতেছে। সে যেখানে আছে, সেস্থান পবিত্র—সে মন্দির সাধ করিয়া ভাঙ্গিব কেন? তাহা কি প্রাণ ধরিয়া ভাঙ্গা যায়? সে যতক্ষণ চিন্তার বিষয়, সেই যখন আমার একমাত্র চিন্তা, তখন চিন্তা থাক্। বড় যন্ত্রণা পাই, তা বলিয়া কি করিব? তাহার জন্য যদি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিলাম, তবে মনুষ্যজন্মে ধিক্!—এ ছাই ভালবাসায় ধিক্! ধিক্ এ প্রাণে! ধিক্ এ ছার প্রণয়ে! ধিক্ পরিণয়ে! কিন্তু—

হয়ত আবার তাহাকে পাইব। হয়ত পরলোকে, তাহাতে আমাতে আবার এক হইব। জাগতিক পরিবর্ত্তন পারম্পর্য্যে, হয়ত সেই মাটিতে এই মাটিতে একত্রে মিশিতে পারে—সেই বরবপুর পরমাণুর সঙ্গে, এই পোড়া মাটির পরমাণুর সঙ্গতি ঘটিতে পারে। দুই দেহের বিশ্লিষ্ট উপকরণের পুনঃসমবায় হইয়া, নূতন এক সত্তা সৃষ্ট হইতে পারে। পরলোকে তাহাতে আমাতে আবার হয়ত এক হইব। বম্ ভোলানাথ! তাহাতে আর আমাতে—প্রাণের যে প্রাণ, জীবনের যে জীবন, নয়নের যে নয়ন, হৃদয়ের যে হৃদয়, তাহাতে আর আমাতে—সংসারের যে কুহক, জীবনের যে ভেল্কি, গৃহের যে আকর্ষণী শক্তি, আমার যে সেই, তাহাতে আর আমাতে—সংসারান্ধকারে যে চাঁদ, জীবন মরুভূমে যে ওয়েসিস্, ভবসাগরে যে তরণী, জীবনের পথে যে পান্থশালা, তাহাতে আর আমাতে—পৃথিবীর যে সার, স্বর্গের যে নমুনা, ইহলোকের যে সর্ব্বস্ব, পরলোকের যে ততোধিক, তাহাতে আর আমাতে—গৃহকুঞ্জের সেই সুখলতা, চিন্তাসরোবরের সেই প্রফুল্ল নলিনী, আশালতার সেই সংশ্রয়তরু, তাহাতে আর আমাতে—সংসার প্রবাহের সেই স্নেহময়ী সঙ্গিনী, জীবন মরুভূমের সেই শীতল সরোবর, ভূতভবিষ্যতের অন্ধকারের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র, হৃদয়কাননের সেই বিকচ কুসুম, তাহাতে আর আমাতে—আশায় যে বিশ্বাস, মায়ায় যে মোহ, ভালবাসায় যে কবিত্ব, দুঃখে যে সান্ত্বনা, সুখে যে সে-যা-তাই, তাহাতে আর আমাতে—হয়ত আবার মিলিত হইব। সে মরিয়া মাটি হইয়াছে, আমি মরিয়া মাটি হইব;—দুই মাটিতে এক হইবে। আমার দেহের পরমাণুতে, তাহার দেহের পরমাণুতে সংঘটন ঘটিবে। তাহাতে আমাতে এক হইয়া এক নূতন সত্তার অভ্যুদয় হইবে। যাহা হইবে, তাহা মন্দ সামগ্রী হইলে

হইতে পারে, কিন্তু কি সুখের মিলন! কি সুখের সংঘটন! আদরের সেই আদরিণী, সোহাগের সেই সোহাগিনী, অতীতের কোমলাকাশের সেই ইন্দ্রধনু, উপস্থিতের আঁধার গগনের সেই সৌদামিনী—কেমন বুকভরা মিলন! দুইজনে এক হইয়া এক নূতন সত্তা হইব—আমরিরে! কি সুখের সমবায়! জীবের দেহান্তর-প্রাপ্তিতে কোন্ মূর্খ সন্দেহ করে? আত্মার শরীর পরম্পরাবস্থান অসম্ভব কিসে? পিথাগোরাস্ পূর্ব্বজন্মে এজাক্স্ ছিলেন, ইহা বিচিত্র কি? যে ভীরু বাঙ্গালি সাহস করিয়া দেশের বাহির হইতে পারে না, তাহার শরীরে একিলিস্ অথবা সেকেন্দরের, সিজর অথবা হানিবলের, নেপোলিয়ন অথবা ইপামিনণ্ডাসের, ব্রাসিডাস্ অথবা লাইসাণ্ডারের, ভীমের অথবা অর্জ্জুনের দেহাংশ থাকিতে পারে। রামের শরীরে, হয়ত কালডেরন্ অথবা লোপ্ ডি ভেগার, গেটে অথবা শীলারের, পিটার্ক অথবা ডাণ্টের, কর্ণেলি অথবা রেসাইনের, সেক্ষপীয়র অথবা কালিদাসের, হোমর অথবা বর্জ্জিলের, ব্যাস অথবা বাল্মীকির আত্মা আছে। এই হৃদয় যাহার জন্য লালায়িত, এই হৃদয়ে হয়ত সেই আছে। মনুষ্যদেহের আণবিক পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি সাতবৎসরে নবকলেবর ধারণ করে। সেই নিয়ত প্রবহমান পরিবর্ত্তপ্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া, হয়ত সেই দেহের পরমাণু এই দেহে মিশিতেছে। জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। জগতে সকলই আশ্চর্য্য। যে গিয়াছে বলিয়া জগৎসংসার আঁধার হইয়া গিয়াছে, সে আবার ফিরিয়া আসিতে পারে—যুগ যুগান্তরে হউক, কল্প কল্পান্তরে হউক, সেই অকলঙ্কচাঁদ আসিয়া আবার এ গগনে দেখা দিতে পারে। পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব নহে। তাহাতে—সেই অমূল্য নিধিতে—যাহা যাহা ছিল, সে সকলই আছে। কিছুই একেবারে বিলুপ্ত হয় না। সবই আছে, কেবল একত্রে নাই। সেই সকল উপকরণ জগতে বিরাজমান রহিয়াছে; যেদিন তাহাদের একত্র সংঘটন ঘটিবে, সেই দিন—মনে করিতে হৃদয় নাচিয়া উঠে, প্রাণের ভিতর রোমাঞ্চ হয়—সেই দিন আবার সংসারমরুভূমে সেই সুকুমার, সেই মনোহর, সেই সুন্দর-কুসুম ফুটিবে—দশদিক্ আলো করিয়া, জগৎ হইতে জগদন্তর পর্য্যন্ত সৌরভতরঙ্গ ছুটাইয়া, বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পবিত্রতাস্রোতে ধৌত করিয়া, ফুটিয়া উঠিবে। পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব নয়। জীবের দেহপরম্পরাশক্তি অসম্ভব নয়। হিন্দুধর্ম্মে এমন কোন কথা নাই, যাহা একেবারে ভ্রান্ত—এমন কোন মত নাই, যাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। যে চিন্তাশীল সে চিরকাল বলিবে, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি কোন ধর্ম্ম মানিবার উপযুক্ত হয় ত সে হিন্দুধর্ম্ম।

সে আবার আসিতে পারে। যে গিয়াছে—জগতের মাধুরী হরণ করিয়া, হৃদয়ের পরতে পরতে আগুন জ্বালিয়া দিয়া, সোণার সংসার ছারখার করিয়া দিয়া,

সুখের পাত্রে গরল ঢালিয়া দিয়া, অন্তরে বাহিরে নৈরাশ্য মাখিয়া দিয়া যে পলাইয়াছে, সে আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু আমি কি পাগল হইলাম না কি? কোথায় সে? কেথায় আমি? কোথায় সে ভালবাসা? কোথায় সে সুন্দর সংসার? কোথায় সে চিরপ্রেমোচ্ছ্বাস পরিপ্লুত হৃদয়? হায়, কেন মরিলাম না? চক্ষে ধূলা দিয়া সে যখন পলাইল, কেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম না? যখন মৃত্যুর বিকট ছায়া সেই মুখে লাগিল, তখন কেন গরল খাইলাম না? সেই যে চিতা, নৈশান্ধকার দগ্ধ করিয়া, ভাগীরথী সৈকত আলো করিয়া জ্বলিয়াছিল, কেন তাহাতে শুইলাম না? সেই সোণার দেহের দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি যখন পাষাণে বুক বাঁধিয়া ভাসাইয়া দিলাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে কেন জলে ঝাঁপ দিলাম না? কেন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলাম না?

হৃদয় মথিত হইল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। কাতরস্বরে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে, ডাকিলাম,—"প্রাণাধিকে, কোথায় তুমি? আমার অন্তরের আলোক, আমার বাহিরের অন্তর, আমার নয়নের মণি, আমার সকলের সব, আমার সবের সকল—জীবনসর্ব্বস্ব তুমি আমার কোথায়?"—অপর পার হইতে কঠোর প্রতিধ্বনি কঠোর স্বরে, অমনি মুখের উপর ডাকিয়া বলিল—আর কোথায়। আকাশে সেই কঠোর স্বর নাচিয়া নাচিয়া বলিল—আর কোথায়। দূরে সেই কঠোর স্বর মিলাইতে মিলাইতে বলিল—আর কোথায়। স্তম্ভিত হইলাম। মুহূর্ত্তেকের জন্য অন্তর-জগতের অস্তিত্ব লোপ হইল। হায়! প্রতিধ্বনি সৃজন করিতে, পোড়া বিধাতাকে কে বলিয়াছিল?

ভাবী পতি রাজোন্নতি নিকেতন শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ প্রিন্‌স অফ
ওয়েল্‌স বাহাদুরের প্রতি

ভূমিকা

"পঞ্চানামপি ভূভানাম্ উৎকর্ষং পুপুষুর্গুণাঃ।
নবে তস্মিন্ মহীপালে সর্ব্বং নবমিবাভবৎ।"

কালিদাস।

"নরেন্দ্র মূলায়তনাদনন্তরং।
তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজ সংজ্ঞিতম্॥
অগচ্ছ দংশেন গুণাভিলাষিণী।
নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্॥"

কলিদাস।

কে বলে ভারত-ভূমি বয়সে জরতী।
অপ্সরা আকারা নিত্য নবীন যুবতী॥
যথা কতশত গত দেব পুরন্দর।
একা শচী নিত্য নব, স্বর্গে নিরন্তর॥
মন্দার কুসুম সম লাবণ্য-নিলয়।
কাল কালসর্প শ্বাসে ম্লান নাহি হয়॥
আর যথা প্রভাতে প্রভাত কমলিনী।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা সম প্রদোষে মলিনী॥
পুনরায় প্রভান্বিতা ভানুর উদয়ে।
ললিত লাবণ্যময়ী—তিমির অত্যয়ে॥
সেরূপ ভারতভূমি সময়ে সময়ে।
ম্লান মাত্র দুর্গতি-তামসী-তমোচয়ে॥
সুদিনঃউদয়ে পুন নব ভাবান্বিতা।
পুঞ্জ পুঞ্জ প্রমোদ-প্রভায় প্রভান্বিতা॥

ইংরাজের অভ্যুদয়ে বিভা-বিভাসিতা।
অদ্যাপি ছিলেন মাত্র অর্দ্ধবিকসিতা॥
যুবরাজ সমাগমে সীমা নাই সুখে।
আনন্দ মঙ্গলরব প্রস্ফুটিত মুখে॥

গীতি

১

কহিছে ভারতভূমি, এসো এসো নাথ তুমি,
মহামান্যা মহিষীর প্রথম নন্দন।
কিবা পিতা কিবা মাতা, কিবা পতি কিবা ভ্রাতা,
বহুদিন হেরে নাই দাসীর নয়ন॥
ওহে মম মনোচোর, তুমি ত হইবে মোর,
জাতি কুল ধন মান প্রাণের ঈশ্বর।
এসো এসো হৃদে বস, হেরি মুখ তামরস,
সরস হউক মম মানস ভ্রমর॥
জরাজীর্ণ বটি আমি, তোমায় নিরখি স্বামি,
পুনরায় পাইলাম নবীন যৌবন।
পূর্ব্বাপূর্ব্ব রত্নাকর, আমার যুগল কর,
প্রসারিত পাইবারে প্রেম আলিঙ্গন॥
হের ওহে প্রিয়তম, হিমাদ্রি কপোলে মম,
ঝর ঝর আনন্দাশ্রু ঝরে অনুক্ষণ।
নিরখি তোমার মুখ, দূরে গেল সব দুখ,
করে বুক ধুক্ ধুক্ না সরে বচন॥
যত কুলবধূ ধনি, দেহ হুলাহুলী ধ্বনি,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন॥
হৃদয়-রঞ্জন মম নয়ন-অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব-ভঞ্জন॥

২

তুমি মম নহ পর, গত শত সম্বৎসর,
তব মাতামহ কুলে পরিণীতা আমি।
তব অগ্রে যশোধন! মম পতি চারিজন,
একে একে সকলে হলেন স্বর্গগামী।

শোকানলে দহে গাত্র, পরিণীতা নামে মাত্র
দেখি নাই তাঁহাদের শ্রীমুখমণ্ডল।
পলাসীর যুদ্ধজয়, যেই দিবসেতে হয়,
সেই দিনে ভগ্ন মম দাসিত্ব-শৃঙ্খল॥
জয় ভেরী ঘোরধ্বনি, বিবাহ বাজনা গণি,
মম দেহে গোরোচনা যবন-রুধির।
কামান আতস-বাজী, বিজয়-পতাকা-রাজী
প্রমোদ-পবনে কিবা হইল অস্থির॥

তারপর বারত্রয়, হইয়াছে পরিণয়,
হয় নাই কভু কিন্তু শুভ-দরশন।
সে আশা পূরিল আজ, এসো এসো যুবরাজ
লও হে প্রণয়-পুষ্প ভকতি-চন্দন॥

যত কুলবধূ ধনি, দেহ হুলাহুলী ধ্বনি,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন॥

হৃদয়-রঞ্জন মম নয়ন-অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব-ভঞ্জন॥

৩

সুখের দিবস আজ, রোদনের কিবা কাজ
তবু কিছু শ্রীচরণে করি নিবেদন।
সত্যনিষ্ঠাতপোদানে, আর্জব অমিত জ্ঞানে,
ভূষিত ছিলেন মম পূর্ব্বপতিগণ॥

পুরূরবা কার্ত্তবীর্য্য, রাম নাম মহা বীর্য্য,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিক্রম তপন।
তাঁহাদের নাম স্মরি, হৃদয় বিদরে মরি,
আর কি হইবে সেই সুদিন ঘটন॥

তারপর এলো কাল, এলো সে যবন কাল,
ঘোরী ঘোর শত্রু আর গজনীদুর্জ্জন।
মৎসরতা-মদে ভোর, রুধির শুষিল মোর,
নন্দন-নিকরে কত করিল নিধন॥

মধ্যে কিছুদিন ভাল, প্রসন্ন হইল ভাল,
রামরাজ্য আকবরের সুখের শাসন।

এসো এসো যুবরাজ, সে সুখ পেলাম আজ,
নিরখিয়া নাথ তব চারু চন্দ্রানন ॥
যত কুলবধূ ধনি, দেহ হুলাহুলী ধ্বনী,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন ॥
হৃদয়-রঞ্জন মম নয়ন-অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব-ভঞ্জন ॥

শুন ওহে ভাবী বর, গুণের সাগরবর,
কৃতাঞ্জলি ভিক্ষা এই ও রাঙ্গা চরণে।
দীনা ক্ষীণা সুপ্রাচীনা বলিয়া দাসীরে ঘৃণা,
করোনা করোনা প্রিন্স রেখো হে স্মরণে ॥
ছেলেগুলি বটে কালো, কিন্তু পিতৃভক্তি-আলো
সমুজ্জ্বল তাহাদের হৃদয় কমল।
কালো বলে অবহেলা, করনা প্রভুত্ব বেলা,
ক্ষুধা হলে খেতে দিও অন্ন আর জল ॥
জননীর কাছে গিয়ে, বলিবে হে বিবরিয়ে,
ভকতিবৎসলা তিনি করুণার খনি।
আমার যাতনা যত, সকলি ত অবগত
আছেন ইন্দিরারূপা ইণ্ডিয়াজননী ॥
এক কথা আছে বাকি, এ কথাটী সত্য নাকি,—
তুমি মোরে স্বপনে করিতে দরশন?
একথা শুনিয়া আর, সুখের নাহিক পার,
আনন্দের পারাবারে মগ্ন মম মন ॥
এসো যত কুলবালা, সাজায়ে বরণ ডালা,
ঘন হুলাহুলী রবে ছাও হে গগন।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন ॥
হৃদয়-রঞ্জন মম নয়ন-অঞ্জন।—
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব-ভঞ্জন ॥

অনুপম বেশভূষায় অনুপমরূপিণী কত শত চাপল্যে নৃত্য করিতেছে; যেন আপনার সৌন্দর্য্যে আপনিই বিভোর হইয়া পরিবেষ্টমান অসংখ্য দর্শকদিগকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা অকাতরে বিতরণ করিতেছে; যেন মুগ্ধা অসীমোৎসাহে নারী-সুলভ কৃপণতা হারাইয়াছে—বহুরূপিণী অসংখ্য চক্ষুগণে নিমেষ পরিবর্ত্তমান নব নব লক্ষচ্ছবি নিমেষে নিমেষে বিলাইতেছে—নানাভঙ্গী মধুর নানারূপের নানা জ্যোতি দেখাইতেছে—প্রফুল্ল উৎসের ন্যায় চারিদিকে সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিতেছে। আসরের মধ্যস্থলে নর্ত্তকী; রমণীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া চারিদিকে মণ্ডলাকারে লোকের শক্ত জমাট বাঁধিয়াছে। নর্ত্তকীর করদ্বয়ে, ডমরুবেণুরব-প্রোৎসাহিত গম্ভীর-ভুজঙ্গ-ফণায় ধীর মৃদুচাপল্য একবার অভিনীত হইল। পরক্ষণেই বাহুদ্বয়ে, উড্‌ডয়নচতুর ক্রীড়মান পক্ষীর পক্ষের নানা প্রকার লীলাবিধুনন অভিনীত হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধাঙ্গে মন্দ বাতান্দোলিত বল্লরী গদগদ বিলাসে খেলিতে লাগিল। নর্ত্তকী কভু নারীর পুষ্পাবচয়ন অভিনয় করিল, কভু লজ্জাবতীর দেহের সলজ্জভাব, চরণের সলজ্জগতি, কভু যুবতীবিলাসিনীর বিলাস ভাব, বিলাসগতি, কভু খণ্ডিতার ক্রোধ, কভু নবযৌবন চপলার নানাচ্ছন্দে বক্ষলগ্ন করতল শয্যাশায়ী শিশুসোহাগ অভিনয় করিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাবিহীন ভঙ্গীজীবন মূকের অভিনয় তাললয়বদ্ধ, যেমন কথা-জীবন কাব্য নাটক ছন্দে বদ্ধ। ভঙ্গীসকল তাল লয়ে আঁটা না হইলে ভাঁড়ের শিথিল ভাঁড়ামী হইত, নৃত্য হইত না। তাল লয়ের মধুর বন্ধনে বন্দিনী সুন্দরী নানাচ্ছন্দে নাচিতেছে; যেন ভুজঙ্গ-বিলোল-বিদ্যুচ্চপলার দেহের ভার নাই, মাংসাস্থি নাই; যেন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ মাটি মাড়াইতেছে না, দর্শকদিগের নেত্রে নেত্রে নাচিতেছে। সাবাস্ সাবাস্! এইবার নর্ত্তকীর পৃথুল কলেবরের তরতর মণ্ডলগতি হইতেছে; যেন চতুর্দ্দিকের অসংখ্য চক্ষুতারকার আকর্ষণে, কামুকের ইহলোক বিপুল ভূমণ্ডল শন শন ঘুরিতেছে। এই কলেবর ঘূর্ণনের সৌন্দর্য্য কি? গমন কালে গজগামিনীর অঙ্গবিশেষ ধিকি ধিকি ঘুরিয়া থাকে, এই অঙ্গদোলন মৃদুমন্থরচলন এতদ্দেশে

বড়ই রমণীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত ; বাজারের প্রয়োজন বুঝিয়া মনোজ্ঞভঙ্গীসঙ্কলনকারী নৃত্য এই দোলনি অনুকরণ করিতে শিখিল ; অনুকরণে এই মন্দান্দোলন কেবল তাল লয়ে বদ্ধ করা হইল না, আর বিস্তর পারিপাট্য বর্দ্ধিত করা হইল—স্বভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধিকি ধিকি ঘুরে, ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীর মৃদুমন্থর গতিও হইতে থাকে, কিন্তু অনুকরণ নৃত্যে তত্তদঙ্গ শন শন ঘুরিতে লাগিল অথচ নর্ত্তকীর ঈষদপি গতি হইল না। অদ্বিতীয় ইন্দ্রজাল ! অদ্বিতীয় নয়ন ছলনা ! অতি দ্রুত গতিবোধক অঙ্গ ঘূর্ণন হইতেছে বস্তুতঃ কিন্তু গতি নাই—চমৎকার ! চমৎকার !! স্বভাবকে অত্যন্ত চাঁচা ছোলা করিতে গেলেই এইরূপ বিকৃতি ঘটিয়া উঠে ; কবির অতি নৈপুণ্যে নৈষধাদি কাব্যও এইরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে ;—আপাদমস্তক মূর্চ্ছনালঙ্কৃত, গিটকারীতে বিভূষিত ; যে অতি ওস্তাদী দেখাতে যায় তাহার গীতও এই রূপ অতি ভূষণে কদাকার হইয়া পড়ে। নৃত্যকালে নর্ত্তকীকে পুরুষকর্কশা স্বৈরিণী জ্ঞান করিলে দর্শকের মনে মধুর ভাবতরঙ্গ উঠিতে পায় না, অভিনয়কালে শকুন্তলাকে যেমন ওপাড়ার বেহায়ে ছোঁড়া ভাবিলে ভ্রান্তিসুখের ব্যাঘাত পড়ে ; কারণ নৃত্য, ভঙ্গীব্যক্ত অভিনয় বিশেষ, নৃত্যাভিনয়ে নারীর নানামূর্ত্তি ক্রমান্বয়ে বিকসিত হইতে থাকে। উপরোক্ত নারী-নৃত্যের গূঢ় সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে কিন্তু সাদা চোকে সে সৌন্দর্য্য দেখা যায় না, কামমদোন্মত্ত চক্ষু চাই—করুণাচক্ষে, স্নেহ চক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায় না—জলাবরণে চক্ষু ঢাকিয়া আসে—সূক্ষ্মদৃষ্টি চলে না।

হায় নারি ! তুমি এতগুণে গুণবতী বিশ্বার্দ্ধ হইয়াও গুণগ্রাহী পুরুষের কাছে তোমার এত অপমান কেন ? কামনয়নে তোমায় দেখা আদর করা নয়, তোমার অপমান করা। তাল লয় শূন্য ভঙ্গী—ভাঁড়ামী, আবার সতাল ভঙ্গী ব্যঞ্জনা বিহীন অর্থাৎ কোন প্রকার মনোভাব, মনোবৃত্তি ব্যঞ্জক না হইলে নৃত্য, ছন্দে গাঁথা কসলৎ হইয়া পড়ে ;—যেমন উড়িষ্যায় "গুটি পোর" (একটি ছেলের) নাচ, দেশীয় যাত্রায় ভিস্তীর নাচ, উপরোক্ত অতি নৈপুণ্যবিকৃত ঘূর্ণ্যমান নারীঅঙ্গ স্পন্দন।

এখনকার অনেক কাব্যও ছন্দে গাঁথা কস্‌লৎ। মার্জ্জিতরুচি সহৃদয়দিগের মনোজ্ঞ হইতে নৃত্যের ভঙ্গী সকল সুপরিস্ফুটরূপে মনোভাব ব্যঞ্জক হওয়া আবশ্যক।

ব্যক্ত মনোবৃত্তির তারতম্যে দর্শকের অহ্লাদের তারতম্য হয়—লাস্যে নারীর কামোন্মাদ-সূচক ভঙ্গীগুলি অপেক্ষা লজ্জাবিনয় অমায়িকতা সূচক ভঙ্গীগুলি, সহৃদয়ের কাছে নিঃসন্দেহ অধিকতর মনোহর। এতদ্দেশীয় নৃত্যের প্রধান অভাব এই—বালক বালিকার নৃত্য নাই, পুরুষের নৃত্য নাই—বালক বালিকার নির্ম্মল কোমলানন্দ ভঙ্গীগুলি অভিনীত হয় না—পুরুষের দর্প, বীর্য্য, প্রেমাবেশ প্রভৃতি

নানা ভাবব্যঞ্জক কোন ভঙ্গীই অভিনীত হয় না। প্রাচীন নৃত্যের পুরুষনৃত্য তাণ্ডবভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে ঊর্দ্ধলাস্যভাব আধমরা হইয়া আছে। এখন পুরুষকে নৃত্য করিতে হইলে নারী সাজিতে হয়, নহিলে পুরুষের ভাব ভঙ্গী অভিনয় অসংলগ্ন উপহাস ও বিরক্তিজনক হইয়া পড়ে।

বালিকা-নর্ত্তকীর নৃত্য দেখিলে, এই ক্ষুদ্রপ্রাণী এত শিখিয়াছে ভাবিয়া বিরক্তি হয় না বটে, কিন্তু হাসিতে হাসিতে প্রাণ যায়, এমনি বয়স্থার উপযুক্ত অসঙ্গত অঙ্গভঙ্গী করে, যেন যুবতীদিগকে ব্যঙ্গ করিতেছে বোধ হয়। শেষে পাকামী আর সহে না বলিয়া উঠিয়া পলাইতে হয়। এতদ্দেশীয় নৃত্যের পুঁজিপাটা কেবল মাত্র কতিপয় স্ত্রীভঙ্গী। তাহাও অধিক নয় এবং তাহার অধিকাংশই বিলাস ভঙ্গী—অতি মাননীয় নারী চিত্তের স্বর্গীয় ভাবসূচক বিশুদ্ধ ভঙ্গী নাই বলিলেও বলা যায়। কেহ বলিতে পারেন জ্ঞান গাম্ভীর্য্যের প্রতিকৃতি ; পুরুষের নৃত্যই অসঙ্গত—নাচুক স্বল্পমতি বালক, নাচুক চপলতরলমতি রমণী, নাচুক শরীরসর্ব্বস্ব ইংরাজ, নাচুক মূঢ়মতি সাঁওতাল, তা বলিয়া কি মহামতি আর্য্যসন্তান নাচিবে? ভেলা, ডোঙ্গা, ডিঙ্গী স্বল্প তরঙ্গে নাচে সত্য, কিন্তু সময়ে সময়ে মহত্তরঙ্গ ত উঠে ; তখন ভাসমান গ্রামরূপী অর্ণব পোতেরাও নাচিতে থাকে। যোগি-শ্রেষ্ঠ, নির্ব্বিকার শূলপাণি নাচিতেন ; তাঁরই নৃত্যের নাম তাণ্ডব। দিগ্বিজয়িজিৎ নিমাই পণ্ডিত, জ্ঞানপ্রতিম চৈতন্যদেবও সগণে সেদিন নাচিয়াছেন। মহোল্লাস স্রোতে সুস্থির থাকে কোন মর্ত্ত্যের সাধ্য ? ইংরাজদের ন্যায় আবাল-বৃদ্ধের নৃত্যশিক্ষা, নৃত্যচর্চ্চা অতি কর্ত্তব্য এত দূর প্রতিপন্ন করিতে আমরা এত কথা কহিলাম না—পুরুষের নৃত্য, পৌরুষের ভঙ্গী অভিনয় অসঙ্গত নয়, এই মাত্র আমাদের বলিবার অভিপ্রায়। যেমন নারীচিত্তের মধুর মার্দ্দবব্যঞ্জক ভঙ্গীগুলি নটী তাললয়ে অভিনয় করে, তেমনি পুরুষের মধুর বীর্য্য গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জক ভঙ্গীগুলি নটে অভিনয় করিলে, দেশীয় নৃত্যের সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য সাধিত হয়—আমাদের শেষ কথা গুলির এই মাত্র লক্ষ্য।

পুরুষের নৃত্য এত অসঙ্গত বোধ হইবার আর এক কারণ এই ; আশৈশব দেখিয়া দেখিয়া নৃত্য নামের সঙ্গে আর হাত ঘুরাণ, অঙ্গ দুলান প্রভৃতির সঙ্গে মনে মনে যে দৃঢ় সম্বন্ধ বাঁধিয়া আছে, সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা, একটু স্থির-কল্পনার কাজ।

গ্রন্থে বর্ণিত কৃষ্ণনাচ, যাত্রার কৃষ্ণনাচ এবং আর আর কথা দ্বিতীয়বারে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

স্বর্ণপ্রভা

"আজ কেন আমার মন এত অস্থির হইয়াছে।" সুবর্ণপুরের গগনস্পর্শী এক অট্টালিকার একটি সুসজ্জিত শয়নকক্ষে এক অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা, পর্য্যঙ্কশায়ী একটি যুবা পুরুষের মুখ প্রতি চাহিয়া এই বাক্য বলিল, "আজ কেন আমার মন এত অস্থির হয়েছে?" শয়ন কক্ষে দীপালোক অতি ক্ষীণ জ্বলিতেছিল। রাত্রি ঘনান্ধকার, প্রায় দ্বিতীয় প্রহর; পৃথিবী নিঃশব্দ; কেবল নিকটস্থ জলাশয় হইতে বর্ষার অনুচরবর্গের কলরব, আর এই নিভৃত কক্ষে দুইটী স্ত্রীপুরুষের কথোপকথন হইতেছিল।

যুবক এই বাক্য শুনিবামাত্র উঠিয়া বসিয়া বামহস্ত বালিকার বামস্কন্ধে আরোপণ করিয়া দক্ষিণহস্তে তাঁহার বদন ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন স্বর্ণ, কি জন্য তোমার মন এত অস্থির হইয়াছে?"

"তা জানিনে" বলিয়া স্বর্ণপ্রভা রজনীকান্তের বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"কেন কেন, কি হইয়াছে?" রজনী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্বর্ণপ্রভা মুখ তুলিয়া রজনীর মুখপ্রতি দৃষ্টি করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কেবলই মনে হইতেছে যেন আর তোমাকে দেখিতে পাইব না।" বলিয়া আবার রজনীর বক্ষঃস্থলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুই এক ফোঁটা নয়নবারি রজনীকান্তের চক্ষু হইতে আস্তে আস্তে স্বর্ণপ্রভার গণ্ডদেশে পড়িল। অমনি স্বর্ণপ্রভা চমকিয়া উঠিয়া রজনীর চক্ষে হস্ত দিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রজনীর গলা ধরিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন, "আমার মন সুস্থির হইয়াছে সব অসুখ সেরে গিয়াছে, আর কাঁদিব

না।" এই বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার রজনীর ক্রোড়ে অবোধ বালিকার ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। রজনী দুঃখিত হইয়া এই দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার অনুরাগ চিন্তা করিতেছিলেন। দুঃখিত হইবার কারণ এই যে, এই গাঢ় প্রেমের পরিবর্ত্তে স্বর্ণপ্রভাকে কেবল মাত্র তিনি কৃতজ্ঞতা দিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রণয় দিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, সে প্রণয় কেবল মাত্র তিনি কুমুদিনীর জন্য রাখিয়াছিলেন। এবম্বিধ চিন্তা করিতে করিতে রজনী অন্যমনস্ক হইলেন। পৃথিবী নিঃশব্দ, স্বর্ণপ্রভা নিঃশব্দে তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ক্ষীণ দীপালোকের প্রতি চাহিয়া আছেন। অকস্মাৎ রজনীকান্ত সাবধানসূচক রমণীকণ্ঠে "বিধু বিধু" বলিয়া খিড়কী দ্বারদেশে কে ডাকিতেছে, শুনিতে পাইলেন। রজনীকান্ত চমকিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। স্বর্ণপ্রভাও রজনীর ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিয়া রজনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে পুনঃপুনঃ উভয়েই সেই মৃদুস্বরে "বিধু বিধু" বলিয়া ডাকিতে শুনিতে পাইলেন। এই ভীষণ গভীর তিমিরাবৃত যামিনীতে সেই স্বর শুনিয়া স্বর্ণপ্রভার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বালস্বভাবসূচক উহাকে অনৈসর্গিক জ্ঞান করিলেন। রজনীকান্ত আস্তে আস্তে উঠিয়া কক্ষদ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক ছাদের উপর আসিলেন। স্বর্ণপ্রভা দৃঢ় মুষ্টিতে রজনীর করধারণপূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। যে ছাদ হইতে খিড়কী দ্বার নিকট, উভয়ে সেই ছাদে আসিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না—অনন্ত অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন, গগনমণ্ডল অনন্ত মেঘান্ধকারে আবৃত, কেবল কোথাও দুই একটি বৃক্ষ, অসংখ্য খদ্যোতমালায় হীরক খচিত বৃক্ষের ন্যায় জ্বলিতেছিল, আর নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে বর্ষার অনুচরগণের কলরব শুনা যাইতেছিল। রজনীকান্ত খিড়কীর নিকটস্থ ছাদে আসিয়া পুনঃপুনঃ সেই ডাক শুনিতে পাইলেন, কিন্তু মনুষ্যাবয়ব দেখিতে পাইলেন না। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" কোন উত্তর পাইলেন না—স্ত্রীলোক বোধ করিয়া স্বর্ণপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেগা তুমি?" স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন, "আমি কুমুদিনী। শিগ্‌গির দোর খুলে দিতে বল।" স্বর্ণপ্রভা অতি কাতর স্বরে রজনীকে কহিলেন, "ঐ দেখ আজ কি বিপদ্ ঘটিয়াছে। নহিলে দিদি কেন এত রাত্রে এখানে আসিবে?" তৎপরে বিধুকে জাগরিত করিয়া তাহাকে সবিশেষ অবগত করাইয়া খিড়কী দ্বার খুলিতে অনুমতি করিলেন। বিধু পূর্ব্বে স্বর্ণপ্রভার পিত্রালয়ের পরিচারিকা ছিল। এক্ষণে রজনীকান্তের সংসারে ঐ পদাভিষিক্ত। বিধু চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া "বড়দিদি এখানে কেন" বলিতে বলিতে খিড়কির দ্বার খুলিয়া দিল। কুমুদিনী অতি দ্রুত গৃহপ্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বিধু, শীঘ্র আয়, স্বর্ণ কোথায়?"

বিধু। দিদি কি হয়েছে?

কুমু। "বল্‌চি, তুই শীঘ্র স্বর্ণ কোথা দেখাবি আয়।" দুই জনে অতি দ্রুত চলিলেন। বিধু খিড়কি দ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গেল, কিঞ্চিৎ দূরে স্বর্ণপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুমুদিনী স্বর্ণপ্রভাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কানে কানে কি বলিলেন। স্বর্ণপ্রভা ওমা কি হবে বলিয়া, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রজনীকান্তের নিকট গিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "পলাও, ওগো পলাও।" রজনী বিস্মিত হইয়া স্বর্ণের মুখপ্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পলাইব কেন, কি হইয়াছে?" স্বর্ণপ্রভা তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তোমায় খুন করিতে আসিতেছে—"

র। কে?

স্ব। তোমার শত্রু।

র। রতিকান্ত?

স্ব। হ্যাঁ।

র। তা ভয় কি, আসুক না কেন।

স্ব। সে অনেক লোক নিয়ে আসিয়াছে, ওগো পলাও।

র। ছি!

ইত্যবসরে উভয়েই রমণীকণ্ঠনিঃসৃত চীৎকার অতি নিকটে শুনিতে পাইলেন। রজনী স্বর্ণপ্রভার নিষেধ না শুনিয়া সেইদিকে আসিয়া দেখিলেন যে, দুইটি স্ত্রীলোক অচেতনপ্রায় প্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে, এবং প্রাঙ্গণের দ্বার দিয়া অসংখ্য দস্যু একে একে প্রবেশ করিতেছে। যৌবনকালের উষ্ণ শোণিতের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রযুক্ত রজনীকান্ত নিকটস্থ দ্বার হইতে একটি অর্গল লইয়া পতঙ্গবৎ সেই অগ্নিতুল্য দস্যুদলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া প্রথম ব্যক্তিকে ভূমিশায়ী করিলেন। তৎপরে তিন চারিজন দস্যু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অনেকক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বর্ষাকালে প্রাঙ্গণ পিচ্ছিল হওয়াতে যেমন পদস্খলিত হইয়া ভূপতিত হইলেন অমনি একজন দস্যু অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। কিন্তু অসি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শও করিল না, চকিতের ন্যায় পশ্চাৎ হইতে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া রজনীকান্তের দেহ আবরণ করিয়া আপনার অঙ্গে সেই অসির আঘাত গ্রহণ করিল, অমনি রজনী চীৎকার করিয়া বলিল, "স্বর্ণ কি করিলি, আপনাকে নষ্ট করিলি!" অভাগিনী স্বর্ণ "এখনও শীঘ্র পলাও," এই কথা বলিতে বলিতে আর কথা কহিতে পারিল না। পাষণ্ড দস্যু এই ঘটনা দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিল, তৎপরে যখন পুনরায় রজনীকে আঘাত অভিপ্রায়ে অসি উত্তোলন করিল—তখনি পশ্চাৎ হইতে দস্যুগণের মধ্যে ভীষণ

চীৎকার শুনিতে পাইয়া সেইদিকে চাহিয়া দেখিল, বহুসংখ্যক পুলিস কর্ম্মচারী ও রজনীর দ্বারবান্‌দিগের দ্বারায় দস্যুগণ বেষ্টিত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং মুহূর্ত্তেক মধ্যে আক্রমণকারীর উত্তোলিত হস্ত দুইখণ্ড হইয়া এক খণ্ড অসি সহিত ভূপতিত হইল। রজনীকান্ত দেখিলেন যে, তাঁহার সমবয়স্ক অতিসুন্দর এক যুবাপুরুষ আসিয়া তাঁহার দ্বিতীয় বার প্রাণরক্ষা করিল। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আস্তে আস্তে স্বর্ণপ্রভার দেহ বক্ষে করিয়া আপনার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন এবং সযত্নে সেই রক্তাক্ত দেহ আপন শয্যায় রক্ষণ করিয়া তাহার বদনচুম্বন করিলেন এবং দ্বারদেশে একজন পরিচারিকা রক্ষক রাখিয়া "স্বর্ণকে বুঝি হারাইলাম, কিন্তু কুমুদিনীকে যদি না বাঁচাইতে পারি তবে এ ছার জীবন রাখিয়া কি সুখ!" এই বলিয়া একখান তরবারি হস্তে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন যে, দস্যুরা পলায়ন করিয়াছে এবং পুলিসকর্ম্মচারিগণ তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে, প্রাঙ্গণে কেবলমাত্র চারি পাঁচটি আহত ব্যক্তি আর দুইটি স্ত্রীলোক পতিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক পূর্ব্বস্থান হইতে অন্য একস্থানে একটি যুবা পুরুষের বাম-হস্তে মস্তক রাখিয়া পতিত রহিয়াছে। রজনী চিনিলেন যে, স্ত্রীলোকটি কুমুদিনী, আর যুবা পুরুষটি তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। একজন নিকটস্থ আহত পুলিসকে জিজ্ঞাসা করাতে জানিলেন যে, দস্যুরা পলায়ন সময়ে কুমুদিনীকে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে ঐ যুবক আসিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে কুমুদিনীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু ঐ সময়ে দস্যুদিগের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় কুমুদিনীর সহিত ঐ স্থানে পতিত হইলেন। রজনী দ্রুত বারি আনিয়া কুমুদিনীর মুখে সিঞ্চন করাতে তিনি সংজ্ঞা-লাভ করিলেন এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে রজনীকে দেখিয়া মস্তকে অঞ্চল টানিতে টানিতে অতি মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বর্ণ, স্বর্ণ কোথায়?" রজনী তদ্রূপ মৃদু স্বরে বলিলেন, "স্বর্ণ শয়ন করিয়া আছে।"

রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দস্যুরা আপনাকে কোনস্থানে কি আঘাত করিয়াছে?"

কু। না—কেবলমাত্র পড়িয়া যাওয়ায় মস্তকে আঘাত পাইয়াছি, তাহা কিছুই নয়। তৎপরে কুমুদিনী উঠিবার উপক্রম করিতে গিয়া দেখিলেন যে, এক যুবা পুরুষ তাহার নিকট পতিত রহিয়াছে এবং তাঁহার হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া তিনি পতিত ছিলেন। কুমুদিনী চমকিত হইয়া সলজ্জে উঠিয়া বসিলেন এবং রজনীকান্তের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। রজনী বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "উনি কে, তাহা জানি না। কিন্তু দস্যুরা যখন তোমাকে লইয়া পলায়ন করে, তখন উনি তোমাকে পরিত্রাণ করিতে গিয়া তাহাদিগের দ্বারা আহত হইয়া, তোমাকে লইয়া এইস্থানে পতিত হয়েন।" তৎপরে কুমুদিনী প্রাঙ্গণ হইতে উঠিয়া গেলেন।

যাইতে যাইতে দুই একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই অপরিচিত যুবার মুখপ্রতি অবগুণ্ঠন হইতে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

আর স্বর্ণপ্রভা? সে ক্ষুদ্র প্রদীপের অল্প তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছিল— আজিকার প্রচণ্ড বাত্যায় তাহা নিবিয়া গেল। সে ক্ষুদ্র ভেলা অগাধ সাগরে পড়িয়াছিল—এ ঘোর তরঙ্গে তাহা ডুবিল। আজিকার প্রচণ্ড তাপে স্বর্ণকুসুম শুকাইল;—স্বর্ণসৌদামিনী মেঘে লুকাইল—শুধু বজ্রাঘাত রহিল। স্বর্ণ সেই অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চম খণ্ড

(লবঙ্গলতার উক্তি)

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি জানিতাম শচীন্দ্র একটা কাণ্ড করিবে—ছেলে বয়সে অত ভাবিতে আছে! দিদি ত একবার ফিরে চেয়েও দেখেন না—আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া আমার কথা গ্রাহ্য করে না। ও সব ছেলেকে আঁটিয়া উঠা ভার। এখন দায় দেখিতেছি আমার। ডাক্তার বৈদ্য কিছু করিতে পারিল না—পারিবেও না। তারা রোগই নির্ণয় করিতে জানে না। রোগ হলো মনে—হাত দেখিলে, চোখ দেখিলে, জিহ্বা দেখিলে তারা কি বুঝিবে? যদি তারা আমার মত আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া আড়িপেতে ছেলের কাণ্ড দেখ্‌ত, তবে একদিন রোগের ঠিকানা করিলে করিতে পারিত।

কথাটা কি? "ধীরে, রজনি!" ছেলে ত একেলা থাকিলেই এই কথাই বলে। রজনী কি করিয়াছে? তা জানি না, কিন্তু রজনীর সঙ্গে এ চিত্তবিকারের কোন সম্বন্ধ নাই কি? না থাকিলে সর্ব্বদা রজনীর নাম করে কেন? ভাল, রজনীকে একবার রোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলে হয় না? কই, আমি রজনীর বাড়ী গিয়াছিলাম সে ত, সেই অবধি আমার বাড়ী একবারও আসে নাই! তাহার যে অহঙ্কার হইয়াছে, একথা সম্ভব নহে। বোধ হয়, লজ্জায় আসে না। ডাকিয়া পাঠাইলে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া আমি রজনীর গৃহে লোক পাঠাইলাম—বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার আসিতে বলিও।

দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল রজনী গৃহে নাই। অনেক দিন হইল স্থানান্তরে গিয়াছে। অমরনাথ বাড়ী আছে।

শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। স্থানান্তরে কোথায় গিয়াছে, কবে আসিবে, দাসী তাহা কিছুই বলিতে পারিল না। পরের ঘরের কথা, অত জিজ্ঞাসা করিয়া

পাঠাইতেও পারি না। মনেও বড় সন্দেহ হইল। স্থূল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইলাম। কাহার নিকট জানিব ?

স্বয়ং অমরনাথ ভিন্ন আর কাহার নিকট জানিব ?

কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, অমরনাথকে কোথায় পাইব ? তাহার গৃহে স্ত্রীলোক নাই—আমি তাহার গৃহে যাইতে পারিব না। তবে কৌশলে অমরনাথকে আমাদিগের গৃহে আনা যায়। সেই কৌশলের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মনে করিলাম, আগে একবার শচীন্দ্রের কাছে রজনীর কথা পাড়িয়া দেখি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের পীড়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না ? সে সম্বন্ধ কি ? বোধ হয়, আমাদিগের এই বর্ত্তমান দারিদ্র্য দুঃখজনিত মানসিক ক্লেশই শচীন্দ্রের এই মানসিক পীড়ার কারণ। রজনীই এই দারিদ্র্য দুঃখের মূল। অতএব রজনীর নাম শচীন্দ্রের মনে সর্ব্বদা জাগরূক হইবে বিচিত্র কি ? যদি, এই সিদ্ধান্তই যথার্থ হয়, তবে অমরনাথকে ডাকাইয়া কি করিব ?

অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য শচীন্দ্রের কাছে গিয়া বসিলাম। এ কথা ও কথার পর রজনীর প্রসঙ্গ ছলে পাড়িলাম। আর কেহ সেখানে ছিল না। রজনীর নাম শুনিবামাত্র বাছা অমনি, চমকিত হংসীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি যত রজনীর কথা বলিতে লাগিলাম, শচীন্দ্র কিছুই উত্তর করিল না, কিন্তু ব্যাকুলিত চক্ষে, আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। ছেলে বড় অস্থির হইয়া উঠিল—এটা পাড়ে, সেটা ভাঙ্গে এইরূপ আরম্ভ করিল। আমি পরিশেষে রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম ; সে অত্যন্ত ধনলুব্ধা, আমাদিগের পূর্ব্বকৃত উপকার কিছুমাত্র স্মরণ করিল না। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া শচীন্দ্র অপ্রসন্ন ভাবাপন্ন হইল, এমন আমার বোধ হইল, কিন্তু কথায় কিছু প্রকাশ পাইল না—শচীন্দ্র সে কথা ঢাকিয়া প্রসঙ্গান্তর উত্থাপিত করিল।

একটা কথা স্থির হইল—রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের মনের ভাব যাহাই হৌক—তাহার রাগ নাই। রাগ নাই, তবে কি—অনুরাগ ? তাও কি সম্ভবে ? অন্ধের প্রতি ? আবার এত দিনের পর ? যখন রজনী নিকটে ছিল—সুপ্রাপণীয়া ছিল, তখন ত ইহার কোন লক্ষণ দেখি নাই—এখন কেন হইবে ?

যাহা হৌক, একবার রজনীকে আনিয়া বাছাকে দেখাইতে হইতেছে। উপায় কি ? তখন, কর্ত্তার কাছে গেলাম। তাঁহাকে আমার মনের সন্দেহ সকল আভাস ইঙ্গিতে নিবেদন করিলাম। রজনীর যে সন্ধান করিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহাও বলিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে উপায় কি ? আমি বলিলাম, "অমরনাথ ভিন্ন সবিশেষ সন্ধান আর কেহ বলিতে পারিবে না। তুমি

তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আন।” তিনি প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু আমার কথা কতক্ষণ ঠেলিবেন ? তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে স্বীকার করিলেন।

অমরনাথও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, যদি উঁকি ঝুঁকি মারিয়া আমাকে একবার দেখিতে পান, সে লোভ ছিল। পরদিন প্রাতে আসিয়া, অমরনাথ সশরীরে আমাদিগের ক্ষুদ্র গৃহে দর্শন দিলেন। আমি স্বামীকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার কাছে অনুমতি লইয়া অমরনাথের মনের সাধ পুরাইবার জন্য—তাঁহার আহারের নিকট পূতনা হইয়া বসিলাম। পূতনা—কেননা বিষপান করাইবার ইচ্ছা বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু যেখানে বাক্য-বিষ আছে সেখানে অন্য বিষের প্রয়োজন কি ?

নারীজন্ম যেন কেহ গ্রহণ করে না। না করিতে হয় এমন কাজ নাই। যাহাতে মনের বড় বিরাগ, হাসিতে হাসিতে তাহাও করিতে হয়। বিষ, অমৃত উভয়ই প্রয়োগ করিতে হয়। সর্পী আমাদিগের অপেক্ষা ভাল—তাহার অমৃত নাই—কেবল বিষ আছে। সে ইচ্ছাধীন বিষপ্রয়োগ করে। লোকে সর্পীকে চিনে, তাহার নিকট দিয়া কেহ পথ হাঁটে না। নারী-সর্পীর অমৃত আছে—সেই লোভে তাহার নিকটে আসিয়া, মূর্খ পুরুষজাতি অনায়াসে দংশিত হয়—বিশ্বাসঘাতিনী নারী অনায়াসে দংশন করে। হায় ! লবঙ্গসর্পীর কি হইবে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনী কোথায়?"

এটি যেন হুম্ করিয়া কামান দাগিলাম। অমরনাথ বিত্রস্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কথা কও না যে?"

অমর। এ কথা জিজ্ঞাসা কর কেন?

আমি। রজনীর সঙ্গে জানাশুনা ছিল, তাহাকে ভালবাসিতাম—না জিজ্ঞাসা করিব কেন?

অমর। স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাকে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ—সে কোথায় এ কথা জিজ্ঞাসা কেন?

আমি। রজনী তোমার ঘরে নাই, ইহা আমার কাছে বিশেষপ্রসিদ্ধ; কাল লোকের দ্বারা খবর আনিয়াছি, এজন্য জিজ্ঞাসা করি।

অমর। তবে সে স্থানান্তরে গিয়াছে।

আমি। কোথায় সে স্থানান্তর?

অমর। আমি যদি না বলি?

আমি। আমি যদি সকল কথা বলি?

অমর। তাহা হইলে আমার অনিষ্ট হইবে। তুমি এতদিন আমার যে অনিষ্ট কর নাই, এখন যে তাহা করিবে ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। তুমি আমাকে কেবল ভয় দেখাইতেছ, ইহা বুঝিয়াছি।

আমি। এখন তুমি আমার অনিষ্ট করিতেছ, আমি তোমার অনিষ্ট না করিব কেন?

অমরনাথ চমকিয়া উঠিল—"তোমার অনিষ্ট আমি কখন স্বপ্নেও কামনা করি না। তবে রজনীর বিষয়োদ্ধারের কথা যদি বল—"

আমি হাসিলাম। অমরনাথ বলিল, "তা জানি। সে অনিষ্টের জন্য তোমাদিগের রাগ নাই। তবে তোমার কি অনিষ্ট?"

আমি। আমার পুত্রের অনিষ্ট।

অ। শচীন্দ্র বাবুর? বিষয়ক্ষতি ভিন্ন আর কি অনিষ্ট করিয়াছি?

আমি। যদি তুমি মনোযোগ দিয়া সকল কথা শুন, তবে আমি বিশেষ বৃত্তান্ত বলি।

অ। এক্ষণে আহারে আমার বিশেষ মনোযোগ।

আমি। আমি যাহা বলিব তাহাতে তোমার আহার বন্ধ হইয়া যাইবে।

অ। এমন কথা কেন এখন বলিবে? নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আহারের বিঘ্ন করা অন্যায় কাজ হয়।

অমরনাথকে ব্যঙ্গপরায়ণ দেখিয়া আমি ক্রুদ্ধ হইলাম। বলিলাম, "আমিও রহস্য জানি। একটি রহস্যের কথা বলি শুন। প্রথম যৌবনকালে লোকে আমাকে রূপবতী বলিত—"

অ। এটা যদি রহস্য তবে সত্য কোন্ কথা?

আমি। পরে শোন। সেই রূপ দেখিয়া এক চোর মুগ্ধ হইয়া, আমার পিত্রালয়ে, যে ঘরে আমি এক পরিচারিকা সঙ্গে শয়ন করিয়াছিলাম, সেই ঘরে সিঁধ দিল।

এই কথা বলিতে আরম্ভ করায়, অমরনাথ গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। আহার ত্যাগ করিয়া বলিল, "ক্ষমা কর।"

আমি বলিতে লাগিলাম, "আহারে মনোযোগ কর না? সেই চোর সিঁধ পথে, আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আমি চোরকে চিনিলাম। ভীতা হইয়া পরিচারিকাকে উঠাইলাম। সে চোরকে চিনিত না। আমি তখন অগত্যা, চোরকে আদর করিয়া, আশ্বস্ত করিয়া পালঙ্কে বসাইলাম।"

অমর। ক্ষমা কর, সে ত সকলই জানি।

আমি। তবু একবার স্মরণ করিয়া দেওয়া ভাল। ক্ষণেক পরে, চোরের অলক্ষ্যে আমার সঙ্কেতানুসারে পরিচারিকা বাহিরে গিয়া দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া লইয়া সিঁধমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও সময় বুঝিয়া, বাহিরে প্রয়োজন ছলনা করিয়া নির্গত হইয়া বাহির হইতে একমাত্র দ্বারের শৃঙ্খল বন্ধ করিলাম। মন্দ করিয়াছিলাম?

অমরনাথ বলিল, "এ সকল কথা কেন?"

আমি। পরে চোর নির্গত হইল কি প্রকারে বল দেখি? ডাকিয়া পাড়ার লোক জমা করিলাম। বড় বড় বলবান্ আসিয়া চোরকে ধরিল। চোর লজ্জায়

মুখে কাপড় দিয়া রহিল, আমি দয়া করিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না, কিন্তু স্বহস্তে, লোহার শলা তপ্ত করিয়া তাহার পিঠে লিখিয়া দিলাম,

"চোর"!

অমর বাবু অতিগ্রীষ্মেও কি আপনি গায়ের জামা খুলিয়া শয়ন করেন না?

অ। না।

আমি। লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে। আজি আমার স্বামী চারি জন পাহারাওয়ালা আমার বাড়ীতে উপস্থিত রাখিয়াছেন; প্রয়োজন হয়, তাহারা আজ আমার হাতের লেখা পড়িবে।

অমরনাথ হাসিল এবং বলিল, "ধমক চমক কেন? কাজটা কি করিতে হইবে সহজে বলনা? রজনীর সন্ধান বলিয়া দিতে হইবে?"

আমি। তাহা হইলে এক্ষণে যথেষ্ট হইবে।

অমর। সহজ কথা; সে এক্ষণে কাশীবাস করিতেছে। বাঙ্গালিটোলা গোপাল অধিকারীর বাড়ীতে আছে।

আমি। একথা যদি মিথ্যা হয়?

অ। যদি মিথ্যা হয়, তবে তুমি আমার কি করিবে?

আমি। এই কলিকাতা নগর মধ্যে রাষ্ট্র করিব যে, অমরনাথ চোর—চোর বলিয়া তাহার পিঠে লেখা আছে। পুলিস গিয়া, কামিজ খুলিয়া, পিঠ দেখিবে।

অ। তুমি কি তাহাতে রজনীকে পাইবে?

আমি। না।

অ। তবে?

আমি। তাইত! আহার কর।

অমরনাথ আহার সমাপন করিয়া আচমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আচমনান্তে অমরনাথ বলিল, "সত্য কথা তোমাকে বলি নাই। ধমক চমকে সত্য কথা আমি বলিব না—তত কাপুরুষ নই। তুমি আমার অনিষ্ট করিতে পার সত্য; তাহাতে তোমার লাভ হইবে না—আমার ক্ষতি হইবে। সত্য সত্য তুমি আমার অনিষ্ট করিবে কি? একথা সত্য বলিও—আমি আন্তরিক সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমিও আন্তরিক সরলভাবে উত্তর দিও।"

অমরনাথ অতি বিনীতভাবে, সরল, মধুরভাবে এই কথা বলিল। আমিও আর কপটতা করিতে পারিলাম না—আমি বলিলাম, "না—তোমার অনিষ্ট করিব

না—অনেক অনিষ্ট করিয়াছি—একথা আন্তরিক বলিতেছি। তুমি আমার উপকার করিলে না—না কর, আমি তোমার অনিষ্ট করিব না।"

অমরনাথের চক্ষে জল আসিল। গদগদ স্বরে অমরনাথ বলিল, "লবঙ্গলতা, তুমিই জিতিলে। আমি আবার হারিলাম। আমায় বিশ্বাস কর। আমায় কি বিশ্বাস করিতে পার?"

সেত কঠিন কথা! যে তেমন গুরুতর অবিশ্বাসের কাজ করিয়াছিল, তাহাকে আবার বিশ্বাস করিব কি প্রকারে? কিন্তু সংসার অবিশ্বাসে চলে না। কেহ চিরদিন বিশ্বাসী নহে—কেহ চিরদিন অবিশ্বাসী নহে। কেন আবার অমরনাথকে বিশ্বাস করিব না? তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম —দেখিলাম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সরল বিশ্বাসভূমি। আমি বলিলাম, "তোমায় বিশ্বাস করিব। শোন, যাহা আমার বলিতে বাকি আছে, বলি।"

এই কথা বলিয়া আমি তখন শচীন্দ্রের এই রোগের বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিলাম। শচীন্দ্র যে সর্ব্বদা প্রলাপ কালে রজনীর নাম করে, তাহাও তাহাকে বলিলাম। যে জন্য রজনীর সন্ধান করিতেছিলাম, তাহাও বলিলাম। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অমরনাথ অনেকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "আজ আমি চলিলাম—আবার একদিন আসিতেছি, শীঘ্রই আসিব। আসিলে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ত?"

আমি। হইবে।

অমর। এইরূপ নির্জ্জনে?

আমি। যদি আবশ্যক হয়, তবে তাহাও পারি।

অমর। তাহাতে তোমার স্বামী তোমার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না ত?

আমি চমকিয়া উঠিলাম। সন্দেহ? গুরুদেব জানেন। দ্রৌপদী সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন, প্রদ্যুম্ন শাম্ব তোমার পুত্র সম্বন্ধ হইলেও স্বামীর অসাক্ষাতে তাহাদের কাছে থাকিও না—আমি অমরনাথের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গোপনে সাক্ষাৎ করিলে তিনি অবিশ্বাস না করিবেন কেন? বিশেষ আমি সপত্নীর ঘর করি। আমি যুবতী, আমার স্বামী বৃদ্ধ, অমরনাথ যুবা, আবার পূর্ব্ব হইতে আমাতে অনুরক্ত—কেন সন্দেহ করিবেন না? আমি আপনিই কেন সন্দেহ করিতেছি না? অমরনাথ আজি আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেলিয়াছে—আমিও তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছি। দোষ নাই বটে, কিন্তু পাপ ছদ্মবেশেই প্রথম প্রবেশ করে। আমি কুলের বউ—ঘরের ভিতর থাকাই ভাল।

এই ভাবিয়া অমরনাথকে বলিলাম, "যদি সে কথা মনে করিলে, তবে আমার সঙ্গে তোমার আর সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। যতদিন তোমাকে অবিশ্বাস করিয়াছি—ততদিন দেখা সাক্ষাতে ক্ষতি ছিল না—আজি তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি—আজি হইতে তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য নহে।"

এই কথা বলিয়া, আমি অমরনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম—মনে করিলাম বুঝি সে বলিবে, যে, "তোমার বিশ্বাস তুমি ফিরাইয়া লও।" অমরনাথ তাহা বলিল না—আমি সন্তুষ্ট হইলাম—এবং বুঝিতে পারিলাম যে, অমরনাথও আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইল।

অমরনাথ বলিল, "সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য নহে, আমি যেমন করিয়া হয়, তোমার কার্য্য সিদ্ধ করিব। তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব—আমার একটি ক্ষুদ্র ভিক্ষা আছে—এখন বলিব কি?"

আমি। কি?

অমর। না এখন না—আর একবার দেখা দিও—সেই সময় বলিব।

অমরনাথ প্রসন্নচিত্তে বিদায়গ্রহণ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন কোথা হইতে সেই পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। কে তাঁহাকে শচীন্দ্রের পীড়ার সম্বাদ দিল তাহা কিছু বলিলেন না।

শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিলেন। পরে শচীন্দ্রের কাছে বসিয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রণাম করিবার জন্য আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। প্রণাম করিয়া, মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর বলিলাম, "মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ; না জানেন, এমন তত্ত্বই নাই। শচীন্দ্রের কি রোগ, আপনি অবশ্য জানেন।"

তিনি বলিলেন, "উহা বায়ুরোগ। অতি দুশ্চিকিৎস্য।"

আমি বলিলাম, "তবে শচীন্দ্র সর্ব্বদা রজনীর নাম করে কেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বালিকা, বুঝিবে কি? (কি সর্ব্বনাশ, আমি বালিকা! আমি শচীর মা!) এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ লুক্কায়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠে। শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিদ্যা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে, আমি এক বীজমন্ত্রাঙ্কিত যন্ত্র লিখিয়া তাঁহার উপাধানতলে রাখিয়া দিলাম, বলিয়া

দিলাম যে, যে তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। শচীন্দ্র রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভালবাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল। কিন্তু রজনী অন্ধ, এবং ইতর লোকের কন্যা, ইত্যাদি কারণে সে অনুরাগ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। অনুরাগের লক্ষণ স্বহৃদয়ে কিছু দেখিতে পাইলেও শচীন্দ্র তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন নাই। পরে অমরনাথের গৃহে রজনীকে যে অবস্থায় শচীন্দ্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতেই সেই পূর্ব্বরোপিত বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন রজনী পরস্ত্রী, শচীন্দ্র সে ভাবকে মনে স্থান দেন নাই। তাহার লক্ষণ দেখিবামাত্র দমন করিয়াছিলেন। ক্রমে ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখ তোমাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা শচীন্দ্রই তাহাতে গুরুতর ব্যথা পাইলেন। অন্য মনে, দারিদ্র্যদুঃখ ভুলিবার জন্য শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। অনন্যমনা হইয়া বিদ্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বিদ্যালোচনার আধিক্য হেতু, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহাতেই এই মানসিক রোগের সৃষ্টি। সেই মানসিক রোগকে অবলম্বন করিয়া রজনীর প্রতি সেই বিলুপ্তপ্রায় অনুরাগ পুনঃপ্রস্ফুটিত হইল। এখন আর শচীন্দ্রের সে মানসিক শক্তি ছিল না যে, তদ্দ্বারা তিনি সেই অবিহিত অনুরাগকে প্রশমিত করেন। বিশেষ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সকল মানসিক পীড়ার কারণ যে যে গুপ্ত মানসিক ভাব বিকশিত হয়, তাহা অপ্রকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। শচীন্দ্রের সেইরূপ এ বিকার।"

আমি তখন কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "ইহার প্রতীকারের কি উপায় হইবে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তারদিগের দ্বারা এ রোগ উপশম হইতে পারে কি না তাহা বিশেষ বলিতে পারি না। কিন্তু ডাক্তারেরা কখন এ সকল রোগের প্রতীকার করিয়াছেন, এমত আমি শুনি নাই।"

আমি বলিলাম যে, "অনেক ডাক্তার দেখান হইয়াছে, কোন উপকার হয় নাই।"

স। সচরাচর বৈদ্য চিকিৎসকের দ্বারাও কোন উপকার হইবে না।

আমি। তবে কি কোন উপায় নাই?

স। যদি বল, তবে আমি ঔষধ দিই।

আমি। আপনার ঔষধের অপেক্ষা কাহার ঔষধ? আপনিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। আপনি ঔষধ দিন।

স। তুমি বাড়ীর গৃহিণী। তুমি বলিলেই ঔষধ দিতে পারি। শচীন্দ্রও তোমার বাধ্য। তুমি বলিলেই সে আমার ঔষধ সেবন করিবে। কিন্তু কেবল ঔষধে আরোগ্য হইবে না। মানসিক পীড়ার মানসিক চিকিৎসা চাই। রজনীকে চাই।

আমি। রজনী আসিবে, আমি এমত ভরসা পাইয়াছি।

স। কিন্তু রজনীর আগমনে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহাও বিবেচ্য। এমন হইতে পারে যে, রজনীর প্রতি এই অপ্রকৃত অনুরাগ, রুগ্নাবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ হইলে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরস্ত্রীর প্রতি স্থায়ী অনুরাগের অপেক্ষা কষ্টকর মহাপাপ আর কি আছে?

আমি। রজনীর আসা ভাল হউক মন্দ হউক তাহা বিচার করিবার আর সময় নাই। ঐ দেখুন রজনী আসিতেছে।

সেই সময়ে একজন পরিচারিকা সঙ্গে রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথ স্বয়ং তাহাকে সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, এবং আপনি বহির্ব্বাটীতে থাকিয়া, পরিচারিকার সঙ্গে তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রজনী অনিষ্টকারিণী কি ইষ্টকারিণী হইয়া আসিল, তাহা বলিতে পারি নাই, কিন্তু আমি যে অমরনাথকে বিশ্বাস করিয়া ভুল করি নাই, ইহা বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম।

অমরনাথ অবিশ্বাসী থাকিলেই আমার পক্ষে ভাল হইত? কোন্ মূর্খে একথা বলিবে? কন্দর্পের রূপ আর হরিশ্চন্দ্রের সত্যপরায়ণতা একত্রিত হইলেও ললিতলবঙ্গলতা ললিতলবঙ্গলতাই থাকিবে। ইহলোকে লবঙ্গলতার এই গর্ব্ব।

কোপ ভয় প্রভৃতি অনুভবের ন্যায় লজ্জা সুখের অনুভব নয়, লজ্জা দুঃখময়ী। ক্রোধ ব্যতীত আর সকল প্রকার দুঃখের অনুভবে অনুভাবীর শরীর যেমন জড় সড় কুণ্ঠিত হয়, সেইরূপ লজ্জারও বাহ্য লক্ষণ শরীরের জড়তা ; বাড়ীর বাহিরে চলিতে হইলেই লজ্জাবতী কুলকামিনীর চরণে চরণ বাধে। লজ্জার প্রকোপে হেঁট মস্তক, বসিলে উঠা যায় না, উঠিলে চলা যায় না। কখন কখন লজ্জায় আমরা অতি তীব্র দুঃখ সহিয়া থাকি ; ইচ্ছা হয় যে পৃথিবী দ্বিধা ভগ্ন হউক্, ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া লজ্জার উৎপীড়ন হইতে এড়াই ; ইচ্ছা হয় সূর্য্য চিরদিনের জন্য নিবিয়া যাউক্, যেন কেহ মুখের এ কলঙ্ককালিমা না দেখিতে পায়। লজ্জা নম্রতা নয়, লজ্জা অনুভববিশেষ, নম্রতা জ্ঞানবিশেষ। লজ্জায় নম্রতায় উভয় অবস্থায়ই মনুষ্যের দীনভাব বটে, কিন্তু সলজ্জাবস্থায় আমরা দুঃখী, নম্রতায় সুখী। অভিমানীর লজ্জা, নিরভিমানীর নম্রতা। লজ্জাগ্রস্ত লজ্জা ঝাড়িয়া ফেলিতে যত্নবান্ হন, বিনয়ী ঘোর আয়াসে নম্রতা ধরিয়া রাখেন। নম্রতায় দীক্ষিত হইয়াই ধার্ম্মিক সদানন্দ হইতে শিখেন, জ্বালাময় জগৎরূপী রৌরবে থাকিয়াও চর্ম্ম দেহ অক্ষত রাখিতে পারেন, সশরীরে স্বর্গভোগ করেন। লজ্জা যদি নম্রতা না হইল, লজ্জায় যদি এত দুঃখ, তবে এ অনুভব চিরকালই এত লোকপ্রিয় কেন ? সমাজ-শাসন-বিধি দোষীর প্রিয় নয়, যাহাদের সুখের জন্য শাসনগুলি বিধি-বদ্ধ হইয়াছে তাহাদেরই প্রিয়। লজ্জা, লজ্জাবান্‌কে লোকের মন যোগাইয়া চালায় ; বৈদিক-কালে ভীরু আর্য্যকে লজ্জা, অসিচর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে দিত না, এখন ভারতীয় আর্য্যকুলতিলক প্রখরবুদ্ধি বঙ্গীয় যুবক, মহোৎসাহে উৎসাহিত হইলেও লজ্জায় অসিচর্ম্ম ধরিতে পারেন না। লোকের মন যোগাইয়া চালাইলে, শুদ্ধ লোক-সামান্য প্রচলিত ধর্ম্ম রক্ষা হয় ; অতএব অলোক-সামান্য অপ্রচলিত ভদ্রতানুশীলন করাইতে লজ্জা নিতান্ত অক্ষম ; পবনসহায়ে পক্ষীর অনন্ত উন্নতি হয় না, যাবৎ পবনের প্রতাপ তাবৎ উঠিয়া থাকে।

লজ্জার শাসনে সম্পূর্ণ উপকার হয়ই না ত, সর্ব্বদা অপকারও হইয়া থাকে ; নবীন সৌখীন ইয়ার ছিন্ন মলিনবসনে বাজারে যাইতে পারিলেন না, বর্ষীয়সী জননী সেদিন অনাহারে রহিলেন ; কুম্ভীরে আসিয়া বঙ্গ-বধূর বসন ধরিল, ভয়ে বিহ্বলা হইয়া বধূ বস্ত্র ফেলিয়া নদীকূলে উঠিলেন, বিবসনা, উঠিয়াই দেখেন, সম্মুখে ওপাড়ার পাঁচুঠাকুরপো, এবার লজ্জায় বিহ্বলা হইয়া সলিলবসন পরিবার জন্য লজ্জাবতী জলে ঝাঁপ দিলেন ; নক্র বলিল, "এ লজ্জা সলিলবসনে ঢাকে না, এস, তোমায় উদরে লুকাইয়া রাখি।" দেখা গেল যে লজ্জার শাসন অসম্পূর্ণ আবার অপকারক ; তবে লজ্জার এত আদর কেন ? এখন প্রায় সর্ব্বলোকব্যাপী শাসন আর নাই বলিয়া। গর্ব্বের শাসন সর্ব্বব্যাপী হইলে কি হয় ? ইহা অধিকতর অসম্পূর্ণ এবং অধিকতর অপকারক।

একমাত্র উৎকৃষ্ট শাসন, প্রেমানুভবের শাসন, কিন্তু এ শাসন আজও সর্ব্ব-লোকব্যাপী হইয়া উঠে নাই ; জগতের দুই চারিটি মাত্র লোক যথার্থ প্রেমিক, প্রেমের শাসনে শাসিত। সেই সকল লোক অপকর্ম্ম করিতে পারেন না, কারণ, প্রেমে তিরস্কার করে, অন্যায় করিলেই প্রেমের তাড়নায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে হয়। কবে যে প্রেমের শাসন সর্ব্বলোকব্যাপী হইবে বলা যায় না, তবে এটি নিশ্চয় যে, সর্ব্বলোকে প্রেমানুভব বলবান্ হইয়া উঠিলে লজ্জার আর আদর থাকিবে না। কবি আর* "Fie! for Godly shame!" বলিয়া, লজ্জা-প্রভুর নামোল্লেখ করিয়া, লজ্জার ভয় দেখাইয়া কর্ত্তব্যে অনাবিষ্ট মনকে উৎসাহ দিবেন না। সৈন্যাধ্যক্ষ আর লজ্জার দোহাই দিয়া সেনাগণকে উত্তেজিত করিবেন না। উত্তেজিত করিবেন না —কারণ, যে হৃদয়ের অধিপতি প্রেম, সে হৃদয়ে লজ্জার প্রভুত্ব চলে না। তখন সকলেই প্রেমের দোহাই দিবেন ; আর সুষুপ্ত মন জাগিয়া নাচিয়া উঠিবে। লজ্জাবতীর অভিধানে তখন সুখ্যাতি করা হইবে না ; নির্লজ্জ বলিলে তখন আর নিন্দা করা হইবে না। এই মহদ্বিপর্য্যয়ের কারণ আমরা ক্রমে পরিস্ফুট করিতেছি।

যীশুখৃষ্ট, চৈতন্য, কবীর, সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার, নানক প্রভৃতি প্রেমের দাস হইয়া অবধি লজ্জা খোয়াইয়াছিলেন। শুদ্ধ বাল্যলীলায় চৈতন্যদেবকে কখন কখন লজ্জিত হইতে দেখা যায়, আর নয়। কেহ বলিতে পারেন লজ্জার যন্ত্রণা ইঁহাদের কখন সহিতে হয় নাই, কারণ, কখন অন্যায় কাজ করেন নাই। এ কথা মিথ্যা ; পুণ্যময় জগদীশ ব্যতীত অন্যায় সকলেই করিয়া থাকেন ; তবে আমাদের অন্যায় একরূপ, এই সকল মনুষ্য-দেবতাদের অন্যায় একরূপ। সেণ্ট জেভিয়ার ভাবিলেন—কি অন্যায় করিতেছি—পল্লীস্থ, গ্রামস্থ, দেশস্থ গুটিকতক মাত্র লোককে

* *Troilus and Cressida.* Act II Scene II.

ঈশ্বরের মহিমা বুঝাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া আছি, আর এসিয়ার কোটি কোটি লোক আজ পর্য্যন্ত যীশুখৃষ্টের নামও শুনিল না; ধন-দাস পোর্ত্তুগিস্ বণিকেরা দস্যুভয় করিল না, কুৎসিত দেশের নারকীয় জল বায়ুর ভয় করিল না, আমি ঈশ্বরের দাস হইয়া ভীত হইব! ছি! ছি! আমায় ধিক্! আমার ভণ্ড প্রেমে ধিক্! এই অন্যায় দেখিবার জন্য আজও আমাদের চোক্ ফুটে নাই। বস্তুতঃ অন্যায় দেখিবার চোক্ অনন্ত কাল পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হইতে থাকে। ইহলোকে দর্পান্ধ হইয়া আমরা দুই চারিটি মাত্র অন্যায় দেখিতে পাই। যত ধার্ম্মিক হওয়া যায়, ততই পাপ দেখিবার চক্ষু ফুটে। রামপ্রসাদ যে গাইতেন "ওমা পাপ করেছি রাশি রাশি" এ শুধু নম্রতার কথা নয়, রামপ্রসাদের হৃদয়ের কথা। তারপর, লজ্জার যন্ত্রণা সহিতে অন্যায়ই যে করিতে হয় এমন নহে, অন্যায় না করিয়াও লোকে লজ্জিত হয়; ঠাকুর-ঝি আসিয়া বলিলেন—"বৌ, তুমি নাকি আজ বড় গলা বার করে্য গান করেছ? ওঁরা সব্বাই বল্‌ছেন।" বৌ যদি মুখরা গর্ব্বিতা হন, তাহলে রাগ করিবেন, কোমোর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে ধাইবেন, আর, সুশীলা হইলে, "ওমা কোথায় যাবো আমি উঠিয়া পর্য্যন্ত ভাঁড়ারে" ইত্যাদি বলিবেন, আর সেদিন লজ্জায় কাহারও সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিবেন না। মিথ্যাপবাদ শুনিয়াও লজ্জা হয়, কারণ, অভিমান সুখের অবসানে লজ্জা দুঃখের উদয়, এবং সুখ্যাতিই অভিমানের জীবন। যখন ধর্ম্মের ক, খ, গ ধরিলেই অভিমান প্রথমে ভাঙ্গিতে হয়, তখন উপরোক্ত মনুষ্য-দেবতাদের লজ্জা থাকিবে কেন?

কবীরের দোঁহা—"নিন্দুক্ বেচারা থা ভলা মনকা ময়লা ধোয়।
অ্যায়সা ইয়ার মর্ গেয়া কবীর বৈঠ্‌কে রোয়॥"

চৈতন্যের অহরহ জপ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যীশুখৃষ্টের মুখের বুলি—

"For the meek is the Kingdom of Heaven."

শুদ্ধ এঁদের কেন, ধার্ম্মিক মাত্রেরই এই এক বুলি। অতএব ধার্ম্মিক মাত্রেই নির্লজ্জ। কিন্তু প্রেমিক না হইয়া নির্লজ্জ হইলে দুই কূল যায়; উভয় শাসনের বহির্ভূত থাকিয়া, সমাজের কণ্টকস্বরূপ মহা অত্যাচারী হইয়া পড়িতে হয়। নির্লজ্জ হওয়া কেবল প্রেমিকদেরই সাজে, আত্মম্ভরি স্বার্থপরের নয়। "মন বাক্সের লজ্জা তালা" খুলিয়া লইতে হইলে অন্য আর একটি দৃঢ়তর তালা লাগান চাই। হৃদয় প্রেমাধিকৃত হইলে কোপ, ভয়, লজ্জা, দর্প প্রভৃতি সকল অনুভবই অন্তর্হিত হয়; একেশ্বর হইয়া, হৃদয়ে প্রেম রাজত্ব করিতে থাকে। যথার্থ প্রেমিক একানুভাবী

প্রেমময় চৈতন্যের অর্থ, চৈতন্যের প্রেম ব্যতীত অন্য কোন অনুভব ছিল না; চৈতন্য প্রেমের প্রতিমা। কেহ বলিতে পারেন যে, চিত্তের এই একাবস্থতা বিকৃতি মাত্র। এখানে ইহার প্রতিবাদ করিতে গেলে মূলকথা ঢাকিয়া পড়ে, এইজন্য আমরা প্রবন্ধান্তরে ইহার খণ্ডন করিব। বাইবেল বলেন (3rd *Conesis—The punishment of Adam*) পাপরূপা লজ্জার সঞ্চার হইয়াই, আদম ইবের স্বচ্ছ হৃদয় প্রথম কলুষিত হয়। কেন? মহাপুস্তক বাইবেল এমন অযৌক্তিক কথা কেন কহিলেন? লজ্জায় আবার দোষ কি? সে কি? খ্রীষ্টান কবি, খ্রীষ্টান সৈন্যাধ্যক্ষ, খ্রীষ্টান নারী, খ্রীষ্টান আবালবৃদ্ধ সকলেই যে, পদে পদে লজ্জার দোহাই দিয়া থাকেন, তবে লজ্জা কলঙ্কিনী কেন? সত্য সত্যই লজ্জা কলঙ্কিনী। যাঁদের উপাস্য পুস্তকে লজ্জা সর্ব্বনাশিনী বলিয়া বর্ণিত, তাঁরাই যে লজ্জার দোহাই দিবেন বিচিত্র নয়, কারণ, খ্রীষ্টানেরা খ্রীষ্টানী উপদেশ-রত্নগুলি আজকাল চক্‌চকে বাইবেলবাক্সে বদ্ধ করিয়াই রাখেন, তবে, স্বার্থসাধন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া কলাপের সময় কখন কখন ব্যবহার করেন। বাইবেলের আদম ইবের উপকথা সমীচীন ইতিহাস জ্ঞান করিয়া আমরা বাইবেলের প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না; কিন্তু গল্পটি সত্যমূলক অতি সুন্দর রূপক বলিয়া বিশ্বাস করি। বাইবেলের ইডেন নামক পার্থিব স্বর্গের বর্ণন; নির্ম্মাত, নিষ্পিত, অতএব জনকজননী ঈশ্বরে নিতান্ত নির্ভর, অক্ষম, অহিংসক, কাল্পনিক আদি-জীব শৈশবের বর্ণন মাত্র, (কারণ, প্রবীণ বিজ্ঞানের মতে প্রকৃত ঘটনার বর্ণন হইতে পারে না)। তখন, শার্দ্দূল-শিশু, মেষ-শিশু, মহিষ-শিশু, মনুষ্য-শিশু, সকল শিশুই সচ্ছন্দে একত্রে বাস করিতে পারে। তারপরই জ্ঞান সঞ্চার বর্ণিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বন, স্বাধীনতা, অভিমান, লজ্জা, পাপ; শেষে পাপের তরঙ্গ দেখা দিল। শিশুর যেমন আত্মতা, স্বাধীনতা থাকে না, জনকজননীর যা ইচ্ছা শিশুরও সেই ইচ্ছা, ঈশ্বরভক্তেরা আত্মতা, স্বাধীনতা তেমনি বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরের কাছে শিশু হইতে চান। তাই, শৈশবের ছবি দেখিয়া, প্রায়ই স্বর্গের ছবি চিত্রিত হইয়া থাকে। লজ্জার মূল দূষিত; লজ্জা অভিমানপূর্ব্বা। জগতে দুঃখমাত্রই পাপের ফল, লজ্জা দুঃখ, লজ্জাও পাপের ফল। লজ্জা অভিমান পাপের ফল। অভিমানে লজ্জায় আলোকান্ধকার সম্বন্ধ; একের আবির্ভাবে অপর অন্তর্হিত হয়। অভিমানে সুখের অনুভব; কিন্তু ক্ষণিক সুখ স্থায়ী নয়, অভিমান ভগ্ন হইবেই হইবে। কেহ বলিতে পারেন—যদি অভিমানসুখের অন্তর্দ্ধানে লজ্জা-দুঃখের উদয় হয়, তাহলে অভিমান যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইতে পারে, সেই চেষ্টাই ধর্ম্ম। দিবার ন্যায় অভিমানকে ঘোর আয়াসেও বহুক্ষণ ধরিয়া রাখিবার যো নাই, অন্ধকার আসিবেই আসিবে; প্রতিদিন এ কথার পরীক্ষা হইতে পারে; শুদ্ধ তর্কেও ইহার যাথার্থ্য

প্রতিপন্ন হয়। তাই এই চির-অবিশ্বাসী মিত্রকে পরিত্যাগ করাই সুখ এবং ধর্ম্ম। তারপর, অভিমানে আত্মোন্নতি এবং পরোপকার দুই হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয় এবং সর্ব্বদাই অপকার ঘটিয়া থাকে।

প্রেমময়ী মিরাণ্ডার (Miranda) চরিত্র-বৈচিত্র্য, চরিত্র-মাধুর্য্য এই যে, তাঁহাকে আশৈশব বনে রাখিয়া, সংসারের নানাপ্রকার অভিমান শিখিতে দেওয়া হয় নাই ; অন্তর্যামী কবিও তাঁহাকে লজ্জাবিহীনা করিয়াছেন।

ঠকিয়া ঠকিয়া শেষ বেলায়, মানব কতক মত বুঝেন যে, অভিমানে পদে পদে অনিষ্ট, পদে পদে অসুখ। স্বভাবমত নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা মত চলাই সুখ। সূর্য্যকিরণ ধরিয়া চাঁদ সাজা, আর পরের সুখে সুখী হওয়া কিছুই নয়, বড় বিড়ম্বনা বুঝিয়া বৃদ্ধ কতক মত নির্লজ্জ হইয়া পড়েন। নির্লাজ দেখিয়া, বৃদ্ধের তরুণ তরুণী স্বজনেরা সর্ব্বদা মনে মনে বড়ই বেজার হইয়া থাকেন।

লজ্জার স্বরূপ পরিস্ফুট করিবার জন্য আমরা অভিমান সম্বন্ধে দুই চারি কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। জ্ঞানে অভিমানের ধ্বংস, অজ্ঞানেই অভিমানের উদয়, স্থিতি, প্রাদুর্ভাব। ময়ূরপুচ্ছচূড়, উল্কিচিত্রিতানন অসভ্য দলপতি আহার্য্য অন্বেষণে দ্বীপের যে পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই কতিপয় যোজনমেয়া সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও আপনার অপেক্ষা বলশালী দেখিতে পান না ; অজ্ঞানময় দর্প কিয়ৎপরিমাণেও ভাঙ্গিবার জন্য দেশান্তরের শৌর্য্য অবিদিত ; আবার, মনুষ্যমাহাত্ম্য মাপিতে বলবীর্য্য ব্যতীত, অন্যরূপ মানদণ্ডও যে হইতে পারে তাহাও অজ্ঞাত ; অতএব, অসভ্য দলপতি অক্ষুন্ন-মহিষগর্ব্বে, অভগ্ন আশীবিষতেজে বিঘ্নকারী উগ্রগতি বায়ুকেও আক্রমণ করিতে তেজ করিয়া উঠেন। কুমারসম্ভবে তারকাসুরের কথায়, এই আসুরিক গর্ব্বের অতি সুন্দর রূপক বর্ণনা আছে। অবাধ্য হইলে এ গর্ব্ব-বিষধর, পুত্রকেও হস্তীপদতলে নিক্ষেপ করেন ; বরদ হইলে, অভীষ্ট দেবের পূজা করিবেন, বিঘ্নকারী হইলে, দেবতার প্রতিও রক্তচক্ষে খড়্গাহস্ত হইতে কুণ্ঠিত নন ; শরীরের কোন অঙ্গও যদি অসুস্থ হইয়া কথা না শুনে, কোপোন্মাদে তাহাকেও কাটিতে উদ্যত ; প্রশংসার জন্য লালায়িত হন। স্তুতিগীতে ইহাকে ঈষত্তুষ্ট করা যাইতে পারে, বাধ্য করা যাইতে পারে না। ভাবেন, স্তুতিসায়ক কর্ত্তব্যই করিতেছে, বাধ্য, চরিতার্থ হইব কেন ? পর-প্রশংসা সহিতে পারেন না, শুনিলে, রাগে জ্বলিয়া উঠেন ; নিজগর্ব্বানুভব সুখেই পরিতৃপ্ত, গদগদ ; ইন্দ্রিয় আর দম্ভসুখ ব্যতীত অন্য সুখ জানেন না ; আজ্ঞাকারী, সুখদ বলিয়া কন্যাপুত্র চান, ভৃত্য বলিয়া অপরকে চান। এই শুম্ভ-নিশুম্ভ-কংস-রাবণ-হিরণ্যকশিপুর রাক্ষসগর্ব্ব কদাপি ক্ষুন্ন হইলে লজ্জা হয় না, লজ্জা-দুঃখের পরিবর্ত্তে ক্রোধ-দুঃখ হয়। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আসুরিক দর্প সমাজ হইতে

অন্তর্হিত হইতে থাকে। সভ্য-সমাজ হইতে কিন্তু অদ্যাপিও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। তবে তমসাচ্ছন্ন অসভ্য সময়ের মত এখন তেমন প্রচণ্ড নয়, আভাঙ্গা কেউটার মত তেমন ভীষণ নয়।

এখন এই গর্ব্ব, যৌগিক পদার্থের মূল ভূতের ন্যায় মিশ্রাবস্থায় নির্জ্জীব হইয়া আছে। জলীয় হইয়া পড়িয়াছে, তেমন খাঁটি দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও কেহ কেহ দর্প ভাঙ্গিলে ক্ষণিক লজ্জা ভোগ করিয়াই কুপিত হয়। এখনও কেহ কেহ পরপ্রশংসা শুনিলে গর্ব্বনেশা ছুটিয়া যাইবার আশঙ্কায় বিরক্ত হন। অভিমান ক্ষয়ে লজ্জার উৎপত্তি, ইহা এই আসুরিক দম্ভ সম্বন্ধেই খাটে না। অভিধানে, অভিমান শব্দের প্রতিবাক্য গর্ব্ব, দম্ভ হইলেও প্রচলিত প্রাকৃতে অভিমানের যেরূপ কোমল অর্থ, প্রায় সেইরূপ কোমল অর্থে আমরা এই প্রবন্ধে অভিমান কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। সেন্টিগ্রেড্ চিত্তোত্তাপ-মানের (গরিমা-তাপমানের) শূন্য অংশে অভিমান, শততম অংশে আসুরিক গর্ব্ব। গর্ব্বিতের গর্ব্ব ক্ষয়ে ক্রোধ উপস্থিত হয়, অভিমানীর অভিমান ক্ষয়ে লজ্জা উপস্থিত হয়। গর্ব্ব অভিমান দুই সুখ, কোপ লজ্জা দুই দুঃখ। অভিমান মৃদু সামগ্রী, গর্ব্ব অতি তীব্র উগ্র-পদার্থ। অভিমান, লোকের কথা শুনিয়া লোকের মনোমত হইয়া চলে। পাছে কেহ অক্ষম, হীন, ছোট বলে, এই ভয়ে গর্ব্ব, লোকের কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না, সকল লোককে নীচ ভাবে, আপনার শুয়ারে গোঁ মত চলে। অভিমানী আপন গুণসংখ্যার অসম্পূর্ণতা দেখিতে পান, দেখিয়া, হয় ঢাকিয়া রাখেন, নয় পরিপূরণ করিতে চেষ্টা করেন; গর্ব্বিত, আপন গুণসংখ্যার অসম্পূর্ণতা দেখিতে পান না। লজ্জা মনের লুক্কায়িত অভিমান দেখাইয়া দেয়, ক্রোধ লুক্কায়িত দম্ভ দেখাইয়া দেয়। ক্রোধ গর্ব্বের জ্বলন্ত চিহ্নস্বরূপ। সেইজন্য, কতক মত জ্ঞানবান্ হইলেই, আমরা পিতা মাতা গুরুজনের সমক্ষে সাধ্যমত ক্রোধ প্রকাশ করি না এবং প্রকাশিত কোপ লজ্জিত হইয়া সম্বরণ করিয়া লই। গুরুজনের সমক্ষে রাগ করিলেই গর্ব্ব দেখান হয়, গুরুজনের ক্ষমতা ঠেলিয়া ফেলিয়া আপন ক্ষমতা প্রকাশ করা হয়, গুরুজনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়।

(গড়ের মাঠের ইডেন পার্ককে কানন হইতে উঠাইয়া আনিবার সময়)

মরি কার নয়ন জুড়াইতে
এত রূপের ছড়াছড়ি—বনস্থলি!

যাই চল রাজ-স্থানে,
নেচে বালক যুবতী যুবা সম্ভাষিবে গানে গানে
যাই চল রাজ-স্থানে॥
বংশীধ্বনি উঠবে কত,
হেসে বালক যুবতী যুবা প্রদক্ষিণে যাবে যত
ভেরীধ্বনি উঠবে কত।

শুধু সঙ্গে নে তোর পাখীগুলি,
তোর হার্ম্মোনিয়া মধুর-বুলি;
এমনি মাখবে তারা পুষ্পধূলি॥
শুধু সঙ্গে নে তোর গুল্ম গুলা,
যেন নানা রঙের ছত্র খুলা,
কিবা আপনি বাঁধা ফুলের তোড়া,
যেন পুষ্প ভরা সবুজ ঝোড়া॥
মরি সঙ্গে নে তোর পাদ্য-জল
তনু স্রোতস্বতী নিরমল,
চরণতলে সাপিনী ছলে
থাকবে পোড়ে অবিরল,
যেন ভূমি-তড়িৎ অচঞ্চল॥

আরো সঙ্গে নে তোর তুঙ্গ শাখায়
গুচ্ছ ফুলের লাল চূড়া;
ও তোর লতায় গাঁথা ফুলের দড়া॥
শুধু সঙ্গে নে তোর ফল ফুল,
সেথা বসাইব অলিকুল॥

আমাদেরও শশী আছে—
দিন দিন ফুল ফলে সিনানিতে বিন্দুজলে;
আমাদেরও বায়ু আছে—
তোর পক্কপাতা পাকা চুলে তরেতরে ফেলবে তুলে

আমাদেরও শশী আছে—
রাত্রে অলি জুটাইতে ফুল কুলে হাসাইতে;
আমাদেরও ভানু আছে—
বসাইতে শিশুফলে পড়াইতে পাখীদলে।
মরি কার নয়ন জুড়াইতে
এত রূপের ছড়াছড়ি—বনস্থলি!
যাই চল রাজ-স্থানে,
নেচে বালক যুবতী যুবা সম্ভাষিবে গানে গানে
যাই চল রাজ-স্থানে॥

তৃতীয় প্রস্তাব। স্ত্রীজাতি।

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট—ইহাই সাম্যনীতি। স্ত্রীগণও মনুষ্য জাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকার-শালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে, স্ত্রীপুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে; পুরুষ বলবান্, স্ত্রী অবলা; পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু; পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা; ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেননা, যে যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী হইতে পারে না।

ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথাটি সাম্যতত্ত্বের মূলোচ্ছেদক। দেখ, স্ত্রী-পুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ-বাঙ্গালিতেও সেইরূপ। ইংরেজ বলবান্, বাঙ্গালি দুর্ব্বল; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গালি ভীরু; ইংরেজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙ্গালি কোমল; ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকার বৈষম্য ন্যায্য হইত, তবে আমরা ইংরেজ-বাঙ্গালি মধ্যে সামান্য অধিকার-বৈষম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালি দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত হইবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে অধিকার-বৈষম্য দেখা যায় সে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। বিখ্যাতনামা জন ষ্টুয়ার্ট মিলকৃত এতদ্বিষয়ক বিচারে, এই বিষয়টি সুন্দররূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সে সকল কথা এখানে পুনরুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন।*

* *Subjection of Women.*

স্ত্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী। যে দেশে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া না রাখে, সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং সর্ব্বপ্রকারে আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া মন যোগাইয়া থাকিতে হয়।

এই প্রথা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে চিরপ্রচলিত থাকিলেও, এক্ষণে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায় সমাজতত্ত্ববিদ্‌ ইহার বিরোধী। তাঁহারা সাম্যবাদী। তাঁহাদের মত এই যে, স্ত্রী ও পুরুষে সর্ব্বপ্রকারে সাম্য থাকাই উচিত। পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে অধিকার, স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাতেই অধিকার থাকাই উচিত। পুরুষে চাকরি করিবে, ব্যবসায় করিবে, স্ত্রীগণে কেন্‌ করিবে না? পুরুষে রাজ সভায়, ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হইবে, স্ত্রীলোকে কেন হইবে না? নারী পুরুষের পত্নী মাত্র, দাসী কেন হইবে?

আমাদের দেশে যে পরিমাণে স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার শতাংশও নহে। আমাদিগের দেশ অধীনতার দেশ, সর্ব্বপ্রকার অধীনতা ইহাতে বীজমাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া, উর্ব্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এখানে প্রজা যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে অশিক্ষিত যেমন শিক্ষিতের আজ্ঞাবহ, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে যেমন শূদ্রাদি ব্রাহ্মণের পদানত, অন্যত্র কেহই ধর্ম্মযাজকের তাদৃশ বশবর্ত্তী নহে। এখানে যেমন দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, অন্যত্র তত নহে।

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতাস্বরূপ; দেবতাস্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এতদূর যে, পত্নীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসাস্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্নীগণেরও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।

এই আর্য্য-পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম অতি সুন্দর; ইহার জন্য আর্য্যগৃহ স্বর্গতুল্য সুখময়। কিন্তু পাতিব্রত্যের কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্যা, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রতিবাদী।

অস্মদ্দেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটী বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজমধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে। সে কয়টি বিষয় এই—

১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা হইয়া থাকে।

২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অধিকারী। কিন্তু স্ত্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে; বরং সর্ব্বভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে বাধ্য।

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকে গৃহ-প্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে না।

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামিগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী বর্ত্তমানেই, যথেচ্ছা বহুবিবাহ করিতে পারেন।

প্রথম তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ লোকেরও একটু মত ফিরিয়াছে। সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাঁহারা, পুত্রটি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কন্যাটি কথামালা সমাপ্ত করিলেই চরিতার্থ হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম, এ পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেক মাত্রও মনে স্থান দেন না। যদি কেহ, তাঁহাদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে তবে, অনেকেই প্রশ্নকর্ত্তাকে বাতুল মনে করিবেন। কেহ প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, "মেয়ে অত লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে? চাকরি করিবে না কি?" যদি সাম্যবাদী সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলেন, "কেনই বা চাকরি করিবে না?" তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা হরিবোল দিয়া উঠিবেন। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উত্তর করিতে পারেন, ছেলের চাকরিই যোটাইতে পারি না, আবার মেয়ের চাকরি কোথায় পাইব? যাঁহারা বুঝেন যে, বিদ্যোপার্জ্জন কেবল চাকরির জন্য নহে, তাঁহারা বলিতে পারেন, "কন্যাদিগকে পুত্রের ন্যায় লেখাপড়া শিখাইবার উপায় কি? তেমন স্ত্রী-বিদ্যালয় কই?"

বাস্তবিক, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্ত্রীগণকে পুরুষের মত লেখা-পড়া শিখাইবার উপায় নাই। এতদ্দেশীয় সমাজমধ্যে সাম্যতত্ত্বান্তর্গত এই নীতিটি যে অদ্যাপি পরিস্ফুট হয় নাই—লোকে যে স্ত্রীশিক্ষার কেবল মৌখিক সমর্থন করিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রচুর প্রমাণ। সমাজে কোন অভাব হইলেই তাহার পূরণ হয়—সমাজ কিছু চাহিলেই তাহা জন্মে। বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত।

সেই উপায় দ্বিবিধ। প্রথম, স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়—দ্বিতীয়, পুরুষবিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা।

দ্বিতীয়টির নাম মাত্রে বঙ্গবাসিগণ জ্বলিয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহ মনে বিবেচনা করিবেন যে, পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই

কন্যাগণ বারাঙ্গণাবৎ আচরণ করিবে। মেয়েগুলা ত অধঃপাতে যাইবেই, বেশীর-ভাগ ছেলেগুলাও যথেচ্ছাচারী হইবে।

প্রথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপত্তি ঘটে না বটে, কিন্তু আপত্তির অভাব নাই। মেয়েরা মেয়েকালেজে পড়িতে গেলে পর, শিশুপালন করিবে কে? বালককে স্তন্যপান করাইবে কে? গৃহকর্ম্ম করিবে কে? বঙ্গীয় বালিকা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মাতা ও গৃহিণী হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে যে লেখাপড়া শিখা যাইতে পারে তাহাই তাহাদের সাধ্য। অথবা তাহাও সাধ্য নহে—কেননা ত্রয়োদশ বর্ষেই বা কুলবধূ বা কুলকন্যা, গৃহের বাহির হইয়া বই হাতে করিয়া কালেজে পড়িতে যাইবে কি প্রকারে?

আমরা এ সকল আপত্তির মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নই। আমরা দেখাইতে চাই যে, যদি তোমরা সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ব-বিষয়ক সাম্যের ব্যবস্থা করিতে পার, ততদিন কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে পারিবে না। সাম্যতত্ত্বান্তর্গত সমাজনীতি সকল পরস্পরে দৃঢ় সূত্রে গ্রন্থিত, যদি স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বত্র সমাধিকার বিশিষ্ট হয়, তবে ইহা স্থির যে কেবল শিশুপালন ও শিশুকে স্তন্যপান করান স্ত্রীলোকের ভাগ নহে, অথবা একা স্ত্রীরই ভাগ নহে। যাহাকে গৃহধর্ম্ম বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ। একজন গৃহকর্ম্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইবে, আর একজন গৃহকর্ম্মের দুঃখে অব্যাহতি পাইয়া বিদ্যাদিশিক্ষায় নির্ব্বিঘ্ন হইবে, ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্যসঙ্গত নহে। অপরঞ্চ পুরুষগণ নির্ব্বিঘ্নে যেখানে সেখানে যাইতে পারে, এবং স্ত্রীগণ কোথাও যাইতে পারিবে না, ইহা কদাচ সাম্যসঙ্গত নহে। এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বলিয়াই বিদ্যাশিক্ষাতেও বৈষম্য ঘটিতেছে, বৈষম্যের ফল বৈষম্য। যে একবার ছোট হইবে, তাহাকে ক্রমে ছোট হইতে হইবে।

কথাটি আর একপ্রকার বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে।

স্ত্রীশিক্ষা বিধেয় কি না? বোধ হয় সকলেই বলিবেন "বিধেয় বটে।"

তারপর জিজ্ঞাস্য, কেন বিধেয়? কেহ বলিবেন না যে চাকরীর জন্য।* বোধ হয় এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন যে, স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা জ্ঞানোপার্জ্জন এবং বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখা-পড়া শিখান উচিত।

তারপর, জিজ্ঞাস্য যে, পুরুষগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে হয় কেন? দীর্ঘ-কর্ণ দেশী গর্দ্দভশ্রেণী বলিবেন, চাকরির জন্য, কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তর গণনীয়ের

* সাম্যবাদী বলিবেন, চাকরীর জন্যও বটে।

মধ্যে নহে। অন্যে বলিবেন, নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং বুদ্ধি মার্জ্জনের জন্যই পুরুষের লেখাপড়া শিক্ষা প্রয়োজন। অন্য যদি কোন প্রয়োজন থাকে তবে তাহা গৌণ প্রয়োজন, মুখ্য প্রয়োজন নহে। গৌণ প্রয়োজনও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান।

অতএব বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই অধিকারের সাম্য স্বীকার করিতে হইল। এ সাম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ উপরিকথিত বিচারে অবশ্য কোথাও ভ্রম আছে। যদি এখানে সাম্য স্বীকার কর, তবে অন্যত্র সে সাম্য স্বীকার করনা কেন? শিশুপালন, যথেচ্ছা ভ্রমণ, বা গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধে সে সাম্য স্বীকার কর না কেন? সাম্য স্বীকার করিতে গেলে, সর্ব্বত্র সাম্য স্বীকার করিতে হয়।

উপরে যে চারিটি সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয়। বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ নহে। তবে, ইহা বলিতে পারি যে, কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না? আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর, সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবা-গণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্র-স্বভাববিশিষ্টা, স্নেহময়ী, সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। কিন্তু যদি কোন বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্ব্বার পতি গ্রহণে অধিকারিণী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, "যদি পুরুষ পুনর্ব্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রীবিয়োগান্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ উচিত?" উচিত, অনুচিত স্বতন্ত্রকথা; ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার আছে যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।

অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এদেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করেন না। যিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়। তবেই, এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সাম্যাত্মক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কারণ বুঝা যায়; বিধানের কর্ত্তা পুরুষ জাতি সে সকলের প্রচলনে আপনা-দিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, কিন্তু এই নীতি এ সমাজে কেন প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াসসাধ্য নহে, কাহারও অনিষ্টকর নহে এবং অনেকের সুখবৃদ্ধিকর। তথাপি ইহা সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়।

আর একটি কথা আছে। অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধনে হিন্দু মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। হিন্দু স্ত্রীমাত্রেই জানেন যে, এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্যসুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয় তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হও। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?

তুমি বিধানকর্ত্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর, এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বৈষম্য।

কিন্তু পুরুষের যতপ্রকার দৌরাত্ম্য আছে, স্ত্রীপুরুষে যতপ্রকার বৈষম্য আছে, তন্মধ্যে আমাদিগের উল্লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ, স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা, নিষ্ঠুর জঘন্য, অধর্ম্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গ মর্ত্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ,

ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে। কেন ? হুকুম পুরুষের।

এই প্রথার ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ অমর্য্যাদা ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্যে চর্ম্মচক্ষে দেখিবে! কি অপমান! কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বন্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই ? কিছু লজ্জা নাই ? যদি না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ দেখিয়া, আমি লজ্জায় মরি!

জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন করিবার তোমার কি অধিকার ? তাহারা কি তোমারই মান রক্ষার জন্য, তোমারই তৈজসপত্রাদিমধ্যে গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ করিয়াছিল ? তোমার মান অপমান সব, তাহাদের সুখ দুঃখ কিছু নহে ?

আমি জানি, তোমরা বঙ্গাঙ্গনাগণকে এরূপ তৈয়ার করিয়াছ যে, তাহারা এখন আর এই শাস্তিকে দুঃখ বলিয়া বোধ করে না। বিচিত্র কিছুই নহে। যাহাকে অর্দ্ধভোজনে অভ্যস্ত করিবে, পরিশেষে সে সেই অর্দ্ধভোজনেই সন্তুষ্ট থাকিবে, অন্নাভাবকে দুঃখ মনে করিবে না। কিন্তু তাহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা মার্জ্জনীয় হইল না। তাহারা সম্মত হৌক, অসম্মতই হৌক, তুমি তাহাদিগের সুখ ও শিক্ষার লাঘব করিলে, এজন্য তুমি অনন্ত কাল মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইবে।

আর কতকগুলি মূর্খ আছেন, তাঁহাদিগের শুধু এইরূপ আপত্তি নহে। তাঁহারা বলেন যে, স্ত্রীগণ সমাজ মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিলে দুষ্টস্বভাব হইয়া উঠিবে, এবং কুচরিত্র পুরুষগণ অবসর পাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবে। যদি তাঁহাদিগকে বলা যায় যে দেখ ইউরোপাদি সভ্য সমাজে কুলকামিনীগণ যথেচ্ছা সমাজে বিচরণ করিতেছে, তন্নিবন্ধন কি ক্ষতি হইতেছে ? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করেন যে, সে সকল সমাজের স্ত্রীগণ, হিন্দু মহিলাগণ অপেক্ষা ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং কলুষিত-স্বভাব বটে।

ধর্ম্ম রক্ষার্থ যে স্ত্রীগণকে পিঞ্জর নিবদ্ধ রাখা আবশ্যক, হিন্দু মহিলাগণের এরূপ কুৎসা আমরা সহ্য করিতে পারি না। কেবল সংসারে লোক সহবাস করিলেই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, পুরুষ পাইলেই তাঁহারা কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার পিছু পিছু ছুটিবে, হিন্দু স্ত্রীর ধর্ম্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ নহে। যে ধর্ম্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ, সে ধর্ম্ম থাকা না থাকা সমান—তাহা রাখিবার জন্য এত যত্নের প্রয়োজন কি ? তাহার বন্ধন ভিত্তি উন্মূলিত করিয়া নূতন ভিত্তির পত্তন কর।

আমরা যে চতুর্থ বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ পুরুষগণের বহু বিবাহ অধিকার, তৎসম্বন্ধে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বঙ্গবাসী হিন্দুগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন যে, এই অধিকার নীতিবিরুদ্ধ। সহজেই বুঝা যাইবে যে এস্থানে স্ত্রীগণের অধিকার বৃদ্ধি করিয়া সাম্য সংস্থাপন করা সমাজ-সংস্কারকদিগের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; পুরুষগণের অধিকার কর্ত্তন করাই উদ্দেশ্য, কারণ মনুষ্যজাতি মধ্যে কাহারই বহু বিবাহে অধিকার নীতিসঙ্গত হইতে পারে না।* কেহই বলিবে না যে, স্ত্রীগণও পুরুষের ন্যায় বহু বিবাহে অধিকারিণী হউন; সকলেই বলিবে, পুরুষেরও স্ত্রীর ন্যায় একমাত্র বিবাহে অধিকার। অতএব, যেখানে অধিকারটি নীতিসঙ্গত, সেইখানেই সাম্য অধিকারকে সম্প্রসারিত করে, যেখানে কার্য্যাধিকারটি অনৈতিক, সেখানে উহাকে কর্ত্তিত এবং সঙ্কীর্ণ করে। সাম্যের ফল কদাচ অনৈতিক হইতে পারে না। সাম্য এবং স্বানুবর্ত্তিতা এই দুই তত্ত্ব মধ্যে সমুদায় নীতিশাস্ত্র নিহিত আছে।

এই চারিটি বৈষম্যের উপর আপাততঃ বঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা অতি গর্হিত তাহারই যখন কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, তখন যে অন্যান্য বৈষম্যের প্রতি কটাক্ষ করিলে কোন উপকার হইবে এমত ভরসা করা যায় না। আমরা আর দুই একটি কথার উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইব।

স্ত্রীপুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্ব্ব সমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। পুত্র কন্যা, উভয়েরই এক ঔরসে, এক গর্ভে জন্ম; উভয়েরই প্রতি পিতামাতার একপ্রকার যত্ন, এক প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু পুত্র পিতৃমৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাপানাদিতে ভস্মসাৎ করুক, কন্যা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দ্দক পাইতে পারে না। এই নীতির যে কারণ হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই উত্তরাধিকারী; সেটি এরূপ অসঙ্গত এবং অযথার্থ যে, তাহার অযৌক্তিকতা নির্ব্বাচন করাই নিষ্প্রয়োজন। দেখা যাউক, এরূপ নিয়মের স্বভাবসঙ্গত অন্য কোন মূল আছে কি না। ইহা কথিত হইতে পারে যে, স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর ন্যায়ই অধিকারিণী; এবং তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণী, স্বামীর ধনৈশ্বর্য্যের কর্ত্রী, অতএব তাঁহার আর পৈতৃক ধনে অধিকারিণী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি ইহাই এই ব্যবস্থানীতির মূলস্বরূপ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে

---

* কদাচিৎ হইতে পারে বোধ হয়। যথা, অপুত্রক রাজা, অথবা যাহার ভার্য্যা কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত। বোধ হয়, বলিতেছি, কেননা ইহা স্বীকার করিলে রুগ্নের পত্নীর পক্ষেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।

বিধবা কন্যা বিষয়াধিকারিণী হয় না কেন? যে কন্যা দরিদ্রে সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন? কিন্তু আমরা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপত্তি উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক নহি। স্ত্রীকে স্বামী বা পুত্র, বা এবম্বিধ কোন পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। অন্যের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না—পরের দাসী হইয়া ধনী হইবে—নচেৎ ধনী হইবে না, ইহাতেই আপত্তি। পতির পদসেবা কর, পতি দুষ্ট হউক, কুভাষী, কদাচারী হৌক, সকল সহ্য কর—অবাধ্য, দুর্ম্মুখ, কৃতঘ্ন, পাপাত্মা পুত্রের বাধ্য হইয়া থাক—নচেৎ ধনের সঙ্গে স্ত্রীজাতির কোন সম্বন্ধ নাই। পতি পুত্রে তাড়াইয়া দিল ত সব ঘুচিল। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার উপায় নাই—সহিষ্ণুতা ভিন্ন অন্য গতিই নাই। এদিকে পুরুষ, সর্ব্বাধিকারী—স্ত্রীর ধনও তাঁর ধন। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে সর্ব্বস্বচ্যুত করিতে পারেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে কোন বাধা নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং নীতিবিরুদ্ধ।

অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা প্রভাবে স্ত্রী স্বামীর বশবর্ত্তিনী থাকে। বটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষপদমূলে স্থাপিত কর—পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নারীগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারে। জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্ত্তিনী হয়, ইহা বড় বাঞ্ছনীয়, পুরুষগণ স্ত্রীজাতির বশবর্ত্তী হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে সকল বন্ধনে, স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছ, পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবতঃ দুশ্চরিত্র? না রজ্জুটি পুরুষের হাতে বলিয়া, স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন? ইহা যদি অধর্ম্ম না হয়, তবে অধর্ম্ম কাহাকে বলে, বলিতে পারি না।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়, যথা—পতি অপুত্রক মরিলে। এইটুকু হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব। এইরূপ বিধি দুই একটা থাকাতেই আমরা প্রাচীন আর্য্য ব্যবস্থাশাস্ত্রকে কোন কোন অংশে আধুনিক সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্রাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু এটুকু কেবল মন্দের ভাল মাত্র। স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী বটে, কিন্তু দানবিক্রয়াদির অধিকারিণী নহেন। এ অধিকার কতটুকু? আপনার ভরণপোষণ মাত্র পাইবেন, আর তাঁহার জীবনকাল মধ্যে আর কাহাকেও কিছু খাইতে দিবেন না, এই পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার। পাপাত্মা পুত্র সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করুক, তাহাতে শাস্ত্রের আপত্তি নাই, কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় ধর্ম্মিষ্ঠা স্ত্রী কাহারও প্রাণরক্ষার্থেও এক বিঘা হস্তান্তর করিতে সমর্থ নহেন। এ বৈষম্য কেন? তাহার উত্তরেরও অভাব নাই—স্ত্রীগণ অল্পবুদ্ধি, অস্থিরমতি, বিষয়রক্ষণে অশক্ত। হঠাৎ সর্ব্বস্ব হস্তান্তর করিবে,

উত্তরাধিকারীর ক্ষতি হইবে, এজন্য তাহারা বিষয় হস্তান্তর করিতে অশক্ত হওয়াই উচিত। আমরা এ কথা স্বীকার করি না। স্ত্রীগণ বুদ্ধি, স্থৈর্য্য, চতুরতায়, পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। বিষয়রক্ষার জন্য যে বৈষয়িক শিক্ষা, তাহাতে তাহারা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সে পুরুষেরই দোষ। তোমরা তাহাদিগকে পুরমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, বিষয় কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত রাখ, সুতরাং তাহাদিগের বৈষয়িক শিক্ষা হয় না। আগে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, পরে বৈষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা করিও। আগে মুড়ি রাখিয়া পরে পাঁটা কাটা যায় না। পুরুষের অপরাধে স্ত্রী অশিক্ষিতা—কিন্তু সেই অপরাধের দণ্ড স্ত্রীগণের উপরেই বর্ত্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয়!

স্ত্রীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। সম্প্রতি হাইকোর্টে একটি মোকদ্দামা হইয়া গিয়াছে। বিচার্য্য বিষয় এই, অসতী স্ত্রী, বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না। বিচারক অনুমতি করিলেন, পারে। শুনিয়া দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যা! এত কালে হিন্দুস্ত্রীর সতীত্ব ধর্ম্ম লুপ্ত হইল! আর কেহ সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবে না! বাঙ্গালি সমাজ পয়সা খরচ করিতে চাহে না—রাজাজ্ঞা নহিলে চাঁদায় সহি করে না, কিন্তু এ লাঠি এমনি মর্ম্মস্থানে বাজিয়াছিল যে হিন্দুগণ আপনা হইতেই চাঁদাতে সহি করিয়া, প্রিবিকৌন্সলে আপীল করিতে উদ্যত! প্রধান প্রধান সম্বাদপত্র, "হা সতীত্ব! কোথায় গেলি" বলিয়া ইংরেজি বাঙ্গালা সুরে রোদন করিয়া, "ওরে চাঁদা দে!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শেষটা কি হইয়াছে জানিনা, কেননা দেশী সম্বাদপত্র পাঠ সুখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত। কিন্তু যাহাই হোক, যাঁহারা এই বিচার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভাল হয় না, যে-লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে? বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগকে সতী করিতে চাও—সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্ম্মভ্রষ্টা স্ত্রী বিষয় পাইবে না, ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ,—যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্ন, সে সকলই বিষয় পাইবে, কেননা তাহারা পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না, কেননা সে স্ত্রী! ইহা যদি ধর্ম্ম শাস্ত্র, তবে অধর্ম্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষার্থ চাঁদা তোলা যদি দেশবাৎসল্য, তবে মহাপাতক কেমনতর?

স্ত্রীজাতির সতীত্ব-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাঁধন বাঁধিতে পার ততই ভাল, কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? পুরুষ বারস্ত্রীগমন করুক, পরদার নিরত হউক, তাহার কোন শাসন নাই কেন? ভূরি ভূরি নিষেধ আছে সকলেই বলিবে, পুরুষের পক্ষেও এ সকল অতি মন্দ কর্ম্ম, লোকেও একটু একটু নিন্দা করিবে—কিন্তু এই পর্য্যন্ত। স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক দণ্ড নাই। একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয়স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে আসেন, পত্নী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোকসমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ তাঁহার সহিত কোন প্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় না; এবং তাঁহার কোন প্রকার দাবি দাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দে তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন। এই আর একটি গুরুতর বৈষম্য।

আর একটি অনুচিত বৈষম্য এই যে, সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক ভিন্ন, এদেশীয় স্ত্রীগণ উপার্জ্জন করিতে পারেন না। সত্য বটে, উপার্জ্জনকারী পুরুষেরা আপন আপন পরিবারস্থা স্ত্রীগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, কিন্তু এমন স্ত্রী অনেক এদেশে আছে যে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করে এমত কেহই নাই। বাঙ্গালার বিধবা স্ত্রীগণকে বিশেষতঃ লক্ষ্য করিয়াই আমরা লিখিতেছি। অনাথা বঙ্গ বিধবাদিগের অন্নকষ্ট লোকবিখ্যাত, তাহার বিস্তারে প্রয়োজন নাই। তাহারা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারে না, ইহা সমাজের নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। সত্যবটে, দাসীত্ব বা পাচিকাবৃত্তি করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রীকন্যা এ সকল বৃত্তি করিতে সক্ষম নয়—তদপেক্ষা মৃত্যুতে যন্ত্রণা অল্প। অন্য কোন প্রকারে ইহারা যে উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, তাহার দেশী সমাজের রীত্যনুসারে গৃহের বাহির হইতে পারে না। গৃহের বাহির না হইলে উপার্জ্জন করার অল্প সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, এ দেশীয় স্ত্রীগণ লেখাপড়া বা শিল্পাদিতে সুশিক্ষিত নহে; কোন প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত না হইলে কেহ উপার্জ্জন করিতে পারে না। তৃতীয়, বিদেশী উমেদওয়ার এবং বিদেশী শিল্পীরা প্রতিযোগী; এদেশী পুরুষেই চাকরি, ব্যবসায়, শিল্প বা বাণিজ্যে অন্ন করিয়া সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার উপর স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়া কি করিবে?

এই তিনটি বিঘ্ন নিরাকরণের একই উপায়—শিক্ষা। লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এদেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক, তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।

আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়া। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন—তাঁহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয়জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছু হয় নাই। দেশে অনেক এসোশিয়েসন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ক্লাব ইত্যাদি আছে—কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্দ্ধেক অধিবাসী স্ত্রীজাতি—তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই। স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ একটি সম্প্রদায়, দলবদ্ধ হয় না কি? আমরা কয়দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গ সংসাররূপ পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি?

যায় না, কেননা তাহাতে রঙ্-তামাসা কিছু নাই। কিছু করা যায় না, কেননা, তাহাতে রায় বাহাদুরি, রাজা বাহাদুরি, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?

প্র।

যুবরাজের সঙ্গে যে সকল "স্পেশিয়াল" আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন কোন বিলাতীয় সম্বাদপত্রে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। সে বিলাতীয় সম্বাদপত্রের নামের জন্য যদি কেহ আমাদিগকে পীড়াপীড়ি করেন, তবে আমরা নাচার হইব। সম্বাদপত্রের নাম আমরা জানি না, এবং কোথায় দেখিয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই। পত্রখানির মর্ম্ম এই—

যুবরাজের সঙ্গে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ যেরূপ দেখিলাম, তাহা এই অবকাশে কিছু বর্ণনা করিয়া আপনাদিগকে আপ্যায়িত করিব ইচ্ছা আছে। আমি এদেশ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, অতএব আমার কাছে যেরূপ ঠিক সম্বাদ পাইবেন। এমন অন্যের কাছে পাইবেন না। এ দেশের নাম "বেঙ্গল"। এ নাম কেন হইল, তাহা দেশী লোকে বলিতে পারে না। কিন্তু দেশী লোকে এদেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহে, তাহারা জানিবে কি প্রকারে? তাহারা বলে পূর্ব্বে ইহার এক প্রদেশকে বঙ্গ বলিত, তৎপ্রদেশের লোককে এখনও "বাঙ্গাল" বলে, এজন্য এদেশের নাম "বাঙ্গালা"। কিন্তু এদেশের নাম বাঙ্গালা নহে—ইহার নাম "বেঙ্গল"—তাহা আপনারা সকলেই জানেন। অতএব একথা কেবল প্রবঞ্চনা মাত্র। আমার বোধ হয় বেঞ্জামিন গল (Benjamin Gall) সংক্ষেপতঃ বেন্ গল্ নামক কোন ইংরেজ এই দেশ পূর্ব্বে আবিষ্কৃত এবং অধিকৃত করিয়া আপন নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

রাজধানীর নাম "কালকাটা" (Calcutta), "কাল" এবং "কাটা" এই দুইটি বাঙ্গালা শব্দে এই নামের উৎপত্তি। এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কষ্ট নাই, এই জন্যই ইহার নাম "কালকাটা"।

এদেশের লোক কতকগুলি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি কিঞ্চিৎ গৌর। যাহারা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষে বোধ হয় আফ্রিকা হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিল, কেননা সেই কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকেরই কুঞ্চিত

কেশ ; নরতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, কুঞ্চিত কেশ হইলেই কাফ্রি। আর যাহারা কিঞ্চিৎ গৌরবর্ণ, বোধ হয় তাহারা উপরিকথিত বেন্ গল্ সাহেবের বংশসম্ভূত।

দেখিলাম অধিকাংশ বাঙ্গালি মাঞ্চেষ্টরের তন্তুপ্রসূত বস্ত্র পরিধান করে। অতএব স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভারতবর্ষ মাঞ্চেষ্টরের সংশ্রবে আসিবার পূর্ব্বে, বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত ; এক্ষণে মাঞ্চেষ্টরের অনুকম্পায় তাহারা বস্ত্র পরিয়া বাঁচিতেছে। ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি প্রকারে বত পরিধান করিতে হয় তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেহ কেহ আমাদিগের মত পেণ্টুলন পরে, কেহ কেহ তুর্কদিগের মত পায়জামা পরে, এবং কেহ কেহ কাহার অনুকরণ করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বস্ত্রগুলি কেবল কোমরে জড়াইয়া রাখে।

অতএব দেখ, ব্রিটিশ রাজ্য বেঙ্গল দেশে একশত বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য উলঙ্গ জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের যে কি অসীম মহিমা এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের যে কি পরিমাণে ধন এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাহা ইংরেজেই জানে। বাঙ্গালিতে বুঝিতে পারে, এত বুদ্ধি তাহাদিগের থাকা সম্ভব নহে।

দুঃখের বিষয় যে, আমি কয়দিনে বাঙ্গালিদিগের ভাষায় অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি নাই। তবে, কিছু কিছু শিখিয়াছি। এবং গোলেস্তান্ এবং বোস্তান্ নামে যে দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। ঐ দুইখানি পুস্তকের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যুধিষ্ঠির নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মন্দোদরীকে হরণ করিয়াছিল। মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা খেলা করেন। পরিশেষে, তাঁহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন।

আমি কিছু কিছু বাঙ্গালা শিখিয়াছি। বাঙ্গালিরা হাইকোর্টকে হাই কোর্ট বলে, গবর্ণমেণ্টকে গবর্ণমেণ্ট বলে, ডিক্রীকে ডিক্রী বলে, ডিসমিসকে ডিসমিস, রেলকে রেল, ডোরকে দোর, ডবলকে ডবল ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজির একটি শাখা মাত্র।

ইহাতে একটি সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। যদি বাঙ্গালা ইংরেজির শাখাই হইল, তবে ইংরেজেরা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে কোন ভাষা ছিল কি না? দেখ, আমাদিগের খ্রীষ্টের নাম হইতে ইহাদিগের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে, এবং অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের* মতে ইহাদিগের প্রধান পুস্তক

* Dr. Lorinzer &c.

তৎপ্রণীত ভগবৎগীতা বাইবেল হইতে অনুবাদিত। সুতরাং বাইবেলের পূর্ব্বে যে ইহাদিগের কোন ভাষা ছিল না, ইহা একপ্রকার স্থির। তাহার পরে, কবে ইহাদিগের ভাষা হইল, বলা যায় না। বোধ করি, পণ্ডিতবর মক্ষমূলর মনোযোগ করিলে, এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন। যে পণ্ডিত মীমাংসা করিয়াছেন যে, অশোকের পূর্ব্বে আর্য্যেরা লিখিতে জানিত না, সেই পণ্ডিতই এ কথার মীমাংসায় সক্ষম।

আর একটি কথা আছে। সর উইলিয়ম জোন্স হইতে মক্ষমূলর পর্য্যন্ত প্রাচ্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, এদেশে সংস্কৃত নামে আর একটি ভাষা আছে। কিন্তু এদেশে আসিয়া আমি কাহাকেও সংস্কৃত কহিতে বা লিখিতে দেখি নাই। সুতরাং এদেশে সংস্কৃত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই। বোধ হয়, এটি সর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির কারসাজি। তাঁহারা পশারের জন্য এ ভাষাটি সৃষ্টি করিয়াছেন।*

যাহা হৌক, ইহাদিগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিব। তোমরা শুনিয়াছ যে, হিন্দুরা চারিটি জাতিতে বিভক্ত; কিন্তু তাহা নহে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি জাতি আছে, তাহাদের নাম নিম্নে লিখিতেছি—

১। ব্রাহ্মণ। ২। কায়স্থ। ৩। শূদ্র। ৪। কুলীন। ৫। বংশজ। ৬। বৈষ্ণব। ৭। শাক্ত। ৮। রায়। ৯। ঘোষাল। ১০। টেগোর। ১১। মোল্লা। ১২। ফরাজি। ১৩। রামায়ণ। ১৪। মহাভারত। ১৫। আসাম গোয়ালপাড়া। ১৬। পারিয়া ডগ্‌স।

বাঙ্গালিদিগের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বিনা কারণেও মিথ্যা কথা বলে। শুনিয়াছি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র। আমি অনেকগুলিন বাঙ্গালিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তিনি কোন্ জাতি? সকলেই বলিল তিনি কায়স্থ। কিন্তু তাহারা আমাকে ঠকাইতে পারিল না, কেননা আমি সেই পণ্ডিতবর মক্ষমূলরের গ্রন্থে† পড়িয়াছি যে, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রাহ্মণ। দেখা যাইতেছে যে, "Mitra" শব্দ "mitre" শব্দের অপভ্রংশ, অতএব মিত্র মহাশয়কে পুরোহিত জাতীয়ই বুঝায়।

বাঙ্গালিদিগের একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত। যেরূপ লাখে লাখে তাহারা যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যে, ঈদৃশ রাজভক্ত জাতি আর পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই। ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গল করুন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

---

* সাবধান, কেহ হাসিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্ট যথার্থই এই মতাবলম্বী ছিলেন।

† *Chips from a German Workshop.*

বাঙ্গালিরা স্ত্রীলোকদিগকে পরদানিশীন করিয়া রাখে শুনা আছে। ইহা সত্য বটে, তবে সর্ব্বত্র নয়। যখন কোন লাভের কথা না থাকে, তখন স্ত্রীলোক-দিগকে অন্তঃপুরে রাখে, লাভের সূচনা দেখিলেই বাহির করিয়া আনে। আমরা যেরূপ ফৌলিংপিস লইয়া ব্যবহার করি, বাঙ্গালিরা পৌরাঙ্গনা লইয়াও সেইরূপ করে; যখন প্রয়োজন নাই, তখন বাক্সবন্দি করিয়া রাখে, শিকার দেখিলেই বাহির করিয়া তাহাতে বারুদ পোরে। বন্দুকের সিসের গুলিতে ছার পক্ষিজাতির পক্ষ-চ্ছেদ হয়, বাঙ্গালির মেয়ের নয়নবাণে কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে বলিতে পারি না। আমি বাঙ্গালির কন্যার অঙ্গাভরণের যেরূপ গুণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমারও ফৌলিংপিস্‌টিতে দুই একখানা সোনার গহনা পরাইব—দেখি, পাখী ঘুরিয়া আসিয়া বন্দুকের উপর পড়ে কি না।

শুধু নয়নবাণে কেন, শুনিয়াছি বাঙ্গালির মেয়ে নাকি পুষ্পবাণ প্রয়োগেও বড় সুপটু। হিন্দু সাহিত্যোক্ত পুষ্পশরে, আর এই বঙ্গকামিনীগণের পরিত্যক্ত পুষ্পশরে, কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা আমি জানি না; যদি থাকে, তবে বাঙ্গালির মেয়েকে দুরাকাঙ্ক্ষিনী বলিতে হইবে। শুনিয়াছি কোন বাঙ্গালি কবি নাকি লিখিয়াছিলেন, "কি ছার মিছার ধনু ধরে ফুলবাণ;" এখন কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিতে হইবে "কি ছার মিছার ফুল মারে ফুলবাণ।" যাহা হউক, ফুল-বাণ সচরাচর প্রচলিত না হইয়া উঠে। বাঙ্গালায় ইংরেজ টেঁকা ভার হইবে—আমার সর্ব্বদা ভয় করে, আমি এই গরিব দোকানদারের ছেলে, দু'টাকার লোভে সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি—কে জানে কখন, বঙ্গকুলকামিনীপ্রেরিত কুসুমশর আসিয়া, এই ছেঁড়া তাম্বু ফুটা করিয়া, আমার হৃদয়ে আঘাত করিবে, আমি অমনি ধপাস্ করিয়া চিতপাত হইয়া পড়িয়া যাইব! হায়! তখন আমার কি হইবে! কে মুখে জল দিবে!

আমি এমত বলি না যে, সকল বাঙ্গালির মেয়ে এরূপ ফৌলিংপিস্, অথবা সকলই এরূপ পুষ্পক্ষেপণী প্রেরণে সুচতুরা। তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি জনরবে অবগত হইয়াছি। শুনিয়াছি, তাহারা নাকি ভর্ত্তৃনিয়োগানুসারেই এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত। এই ভর্ত্তৃগণ দেশীয় শাস্ত্রানুসারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের যে চারিটী বেদ আছে—তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোক নামক বেদে (আমি এ সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে—

আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি,

ইহার অর্থ এই—'হে পদ্মপলাশলোচনে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার উন্নতির জন্য তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি, তুমি গলায় পর।'

উঠ উঠ রাতি পোহায় ;
শুক্ল-ত্রয়োদশীর সোনার চাঁদ
একলা ফেলে ঐ পালায়।
ভেবে—ঘুমিয়ে আছে বসুমতী
ধীরি ধীরি চোর পালায় ॥
কিবা—বহুরূপী নিশাপতি—
ভানুর যাঁকে অস্ত যায়
ধরিয়ে—ঢল ঢল লাল শোভায়
ভানুর যাঁকে অস্ত যায় ॥
উঠ উঠ রাতি পোহায় ॥

শশী—প্রণয়-কিরণ জাল গুটায়,
ঝাটান—আঁধার রাশি ফের ছড়ায়,
ধরার মুখে কালি মাখায়,
চেয়ে—ম্লানমুখী দেখ ধরায় ॥
উঠ উঠ রাতি পোহায় ॥

জলন্ত—অঙ্গার যেমন তুলে শিখায়,
শেষে—নির্ব্বাণমুখে শিখ গুটায়,
তথাপি—লাল রমণে চোক্ জুড়ায়,
তেমনি—অর্চ্চিহীন দেখ চাঁদায়,
অর্চ্চিহীন দেখ শোভায় ॥

শশধর—অদ্রি চূড়ায় ঐ দাঁড়ায়,
রক্তিম—অঙ্গার যেন গিরি চূড়ায়,
শৈল—অগ্নি-গিরি প্রায় বুঝায়,
এই ছিল যে—গেল কোথায় ॥
উঠ উঠ রাতি পোহায় ॥

হুলু দেয় শৃগালগণে
হেরে—অন্ধকার প্রাণ সখায় ;
গর্জ্জায়—সহায় পেয়ে গিরি গুহায়
বৃক—অকারণে কোপ জানায়, চোক রাঙায়
কর্কশ—আঁধার মাণিক চোক জ্বালায়,
নৃশংসের—ক্ষমতায় রাগ যোগায় ;
হরিণীর প্রাণ শুকায়,
অগ্রপদে চট চটায় ;
নিশাচর—সুপ্তলোভ ফের জাগায়,
বনস্থলী—মরমরায় খসখসায় ;

পক্ষিণী—পাখীর কোলে মুখ লুকায়,
চট নিদ্রায় ;
বাছার মা—কোলে ঢেকে নেয় কুলায়
নিদ্রাচোকে দীন বাছায় ;

নীলগিরিমালা বালেশ্বর হইতে পুরীযাত্রী পন্থার কিয়দ্দূরে পশ্চিমে থাকিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে—এই পথের উপর অশ্ব-শকটে শুক্ল ত্রয়োদশীর তিমিরশেষা রাত্রির প্রভাত বর্ণন।—ছন্দঃ মাত্রাবৃত্ত।

স্ত্রীজাতির—আপন প্রাণের ভয় ভুলায়
মা হোলেই মার মায়ায় ;
বানরপাল—চকিত মনে রয় শাখায়,
কিচির মিচির বাক জুড়ায়
মন্ত্রণা—পেটুক কথার শেষ নিশায়
আধ নিদ্রায়,
কিচির মিচির বাক জুড়ায় ॥
উঠ উঠ রাতি পোহায় ॥

৩

ভানুপ্রিয়া উষা সতী
প্রাচীদ্বারে জল ছিটায়,
শীতল আলোক-জল ছড়ায় ;
গ্রাম্য বৌয়ে কায শিখায় ॥
উঠ উঠ রাতি পোহায় ॥

সাহস—আলোক সাথে এল ধরায় ;
ফুল ফুটায়, বায়ু খেলায়,
কোক মিলায় কুহু ভুলায় ॥
সাহস—কোলাহলে দিক্ জাগায়,
পাখিকুল—কোলাহলে বন মাতায় ॥
এবার—জোলো আলোয় দিক্ ভাসায় ॥

৪

ঐ লাল রতন দিন ফুটায় ॥
ঢেকেছে—দিনমণি কাচ বসনে
সাঁওতাল গিরির নীল আভায় ;
হাসি পায় ল্যাঙ্‌টা গিরির
চিকণ বাসের সভ্যতায় ॥

চলেছে—দলে বলে নীলগিরি
লক্ষ মাথায় উড়িষ্যায়
যেন—তরঙ্গিতা দেখ ধরায় ।
তুলেছে—দেখা দেখি বসুমতী
ঢেউ মালায়
শকটের উল্টা দিকে
মৃত্তরঙ্গে দেশ্ ছুটায় ॥

(৫)

রৌদ্রেন্দ্র—তীক্ষ্ণ প্রভায়
প্রভাত্ কুসুম্ দেখ শুকায় ॥
বসিয়ে—দ্বারদেশে রৌদ্র সাথে
দিনের কায্ তোর অপেক্ষায়
নীরবে—দলে দলে দিনের সাথে
দিনের কায্ তোর্ অপেক্ষায় ॥
উঠ উঠ দিন ফুরায় ॥

পলাশির যুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। এবং পলাশির যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেননা ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার। এই জন্যই বোধ হয়, মেকলে ক্লাইবের জীবনচরিত নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।* যাহা হউক মেকলের সঙ্গে আমাদের এক্ষণে কার্য্য নাই; নবীন বাবুর গ্রন্থের কথা বলি।—

প্রথমসর্গে, নবদ্বীপনিবাসী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি পাঁচজন বঙ্গীয় প্রধান ব্যক্তিরা শেঠদিগের আগারে বসিয়া সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ

* আমরা এরূপ ব্যঙ্গ করিতে বড় ভয় পাই। সময়ে সময়ে এরূপ ব্যঙ্গ করিয়া আমরা বড় অপ্রতিভ হই। এদেশীয় পাঠকেরা সচরাচর, পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিয়া অথবা মূর্খ, পাপিষ্ঠ, নরাধম বলিয়া কাহাকে গালি দিলে, বুঝিতে পারেন যে একটা রহস্য হইল বটে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে যে ব্যঙ্গ হইতে পারে, ইহা আমরা সকলে বড় বুঝিতে পারি না। যে সকল ইংরেজ সমালোচক, যাহা কিছু আর্য্য সাহিত্যে, আর্য্য দর্শনে, আর্য্য ভাস্কর্য্যে, বা আর্য্য বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট দেখেন, তাহাই ইউরোপ হইতে নীত মনে করেন, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, এবং যে সকল দেশী সমালোচক যেখানে সাদৃশ্য দেখেন, সেইখানে চুরি মনে করেন, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, আমরা সেবার লিখিয়াছিলাম যে, শকুন্তলা মিরন্দার যেখানে সাদৃশ্য আছে, সেখানে অবশ্য সেক্ষপীয়র হইতে কালিদাস চুরি করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই ব্যতিব্যস্ত! কি সর্ব্বনাশ! কালিদাস সেক্ষপীয়রের পরবর্ত্তী! আর একখানি গ্রন্থ সমালোচনা কালে, লেখক যেসকল পচা পুরাতন চর্ব্বিত চর্ব্বিত পুনশ্চর্ব্বিত তত্ত্ব লিখিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া, অতিশয় অভিনব বলিয়া পাঠককে উপঢৌকন দিয়াছিলাম। পড়িয়া লেখক বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া, রোদন করিয়া বলিলেন, "আমার লিখিত বিষয় সকলের নবীনত্ব আছে বলিয়া বঙ্গদর্শন আমাকে গালি দিয়াছে!" কি দুঃখ!

এইস্থানে ক্লাইবের জীবনচরিতকে উপন্যাস-গ্রন্থ বলিলাম দেখিয়া, এই সকল পাঠকগণ উপরিকথিত প্রথানুসারে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য বলিয়া রাখা ভাল যে কতকগুলি বাঙ্গালা সম্বাদপত্র যেরূপ উপন্যাস, এও সেইরূপ উপন্যাস।

* পলাশির যুদ্ধ। (কাব্য) শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা। নূতন ভারত যন্ত্র। ১২৮১।

করিতেছেন। এই সর্গ যে কাব্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমত আমাদিগের বোধ হয় নাই; অন্ততঃ ইহা কিছু সংক্ষিপ্ত করিলে কাব্যের কোন হানি হইত না। ইহার দ্বারা কাব্যের প্রধান অংশ সূচিত এবং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং নবীন বাবুর স্বাভাবিক কবিত্বের পরিচয় ইহাতে বিলক্ষণ আছে। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। কৃষ্ণচন্দ্রকৃত সিরাজদ্দৌলার রাজ্য বর্ণন—

"বিরাজিত বঙ্গেশ্বর, বিচিত্র সভায়;—
কামিনী-কোমল-কোল রত্ন-সিংহাসন;
রাজদণ্ড সুরাপাত্র, যাহার প্রভায়
নবাব-নয়নে নিত্য ঘোরে ত্রিভুবন;
সুগোল মৃণালভুজ উত্তরীয় স্থলে
শোভিতেছে অংসোপরে; শুনিছে শ্রবণ
বামাকণ্ঠ-প্রেমালাপ মন্ত্রণার ছলে,
রমণীর সুশীতল রূপের কিরণ
আলোকিছে সভাস্থল, নৃপতি-সদন;
সঙ্গীতে গাইছে অর্থী মনের বেদন।"

রাণী ভবানীর উক্তি অতি সুন্দর, এবং ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে তাঁহারই বাক্যসকল জ্ঞানগর্ভ। তাহা হইতে, হিন্দু যবনে যে সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ক নিম্নোক্ত উপমাটি উদ্ধৃত করিলাম—

নাহি বৃথা জাতি দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের কারণে—
অশ্বত্থ পাদপজাত উপবৃক্ষমত
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত॥

ষড়যন্ত্রে এই স্থির হইল যে ইংরেজের সাহায্যে অত্যাচারী সিরাজদ্দৌলাকে দূর করিতে হইবে—সিরাজের সেনাপতিও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। রাণী ভবানী এই পরামর্শের বিরোধিনী। ইংরেজের সাহায্য যাহা হইবে, তাহা দৈবী বাণীর ন্যায় কথাপরম্পরায় রাণী বুঝাইয়া দিলেন, পরে নিজমত এইরূপ প্রকাশ করিলেন—

"আমার কি মত? তবে শুন মহারাজ!—
অসহ্য দাসত্ব যদি; নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে; যেন পূর্ণ শশী
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে,
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে,
হাসুক উজলি বঙ্গ;—এই অভিলাষে
কোন বঙ্গবাসী-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর? আমি যে রমণী
বহিছে বিদ্যুৎবেগে আমার ধমনী।'
'ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।

পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে ;
সহি কিসে মাতৃদুঃখ ? সত্য সেঠবর !—
'বঙ্গমাতা' উদ্ধারের পন্থ সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন,
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পঙ্কে কর বিচরণ।
প্রগল্‌ভতা মহারাজ ! ক্ষম অবলার,
ভয়ে ভীত যদি, আমি দেখাব—আবার !!"

বলা বাহুল্য যে এ পরামর্শমত কার্য্য হইল না। এইখানে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গে, কাব্যের যথার্থ আরম্ভ। এইখান হইতে কবিত্বের উৎকর্ষ দেখা যায়। দ্বিতীয় সর্গ হইতে এই কাব্যে, কবিত্বকুসুম এরূপ প্রভূতপরিমাণে বিকীর্ণ হইয়াছে যে, কোন্ স্থান উদ্ধৃত করিবে, সমালোচক তাহার কিছুই স্থিরতা পায় না। ইচ্ছা করে সকলই উদ্ধৃত করি। এইরূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে যিনি এ দুর্ল ভ রত্নসকল ছড়াইতে পারেন, তিনি যথার্থ ধনী বটেন।

কাটোয়া হইতে ইংরেজ সৈন্যের নদী পার হওয়ার চিত্র, তপনচিত্রিত ফটোগ্রাফতুল্য—এবং ফটোগ্রাফে যে অদ্ভুত রশ্মি নাই—ইহাতে তাহা আছে। অপরাহ্ন হইয়াছে—

খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে ; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী,
চুম্বি মৃদু কলকলে, মন্দ সমীরণ,—
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটী রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।
অদূরে কাটোয়া দুর্গে ব্রিটিস্-কেতন,
উড়িছে গৌরবে উপহাসিয়া ভাস্করে।
উঠিতেছে ধূমপুঞ্জ আঁধারি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীর্য্য কাটোয়া-সমরে।
সশস্ত্র বৃটিস সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার, অস্ত্র ঝলমলে ;
দূর হতে বোধ হয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে ;
রক্তবস্ত্রে, রণ-অস্ত্রে, রবির কিরণ
বিকাশিছে প্রতিবিম্ব, ধাঁধিয়া নয়ন।
ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চলন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন্,
হ্রেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মন্ত্রবলে ;—কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে ; ধীরপদ ; কভু দ্রুতগতি।
'ড্রমের' ঝর্ঝর রব 'বিপুল' ঝঙ্কার
বিজ্ঞাপিছে ব্রিটিসের বীর অহঙ্কার।

সৈনিকদিগের কেবল বাহ্য দৃশ্য নহে, আন্তরিক ভাবও সুচিত্রিত হইয়াছে। গঙ্গা পার হইয়া, সেনাপতি ক্লাইব তরুতলে বসিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যচিন্তিত। ভাবী ঘটনার অনিশ্চয়তা এবং আপনার দুঃসাহসিকতা পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি শঙ্কিত। এই অবস্থায় ইংলণ্ডীয় রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে আশ্বাসিত করেন। সেই চিত্রটি, যথার্থ কবির সৃষ্টি ; রাজলক্ষ্মীকে কবি এক অপূর্ব্ব মহিমাময় শোভায় পরিমণ্ডিত করিয়াছেন।

কোটি কহিনুর কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-রত্ন, সেই বরাননে;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা বসে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে,
কনক-অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,
অপূর্ব্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত
বামার সুরভি শ্বাস, কুসুম সৌরভ,
ঘ্রাণে মর অমরতা করে অনুভব।

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায় খচিত
জ্যোতি রত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চির-প্রজ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ জিনি মধ্যাহ্ন তপন,
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রিমা,
যেমন প্রখরতেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃত মাখা পূর্ণমধুরিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,
ভুবন-ঈশ্বরী মূর্ত্তি দেখিলা নয়নে।

তাঁহার বাক্যগুলি আকাশপ্রসূত মেঘধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

"রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর;
জেতার উপরে জেতা জিতের সহায়,
আছেন উপরে বৎস! অতি ভয়ঙ্কর!
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্ত্তিমান্ ন্যায়,
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে,

সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে,
সমভাবে সর্ব্বদেশে খেতে ও শ্যামলে
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল
সম্মুখে ভীষণ, বৎস! গণনার স্থল।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের বর্ণনায়, কবির কবিত্ব প্রকাশ। নিম্নোদ্ধৃত ক্ষুদ্র চিত্রটি দেখ—

সজ্জিত তরণী ছিল তীরে দাঁড়াইয়া,
লম্ফ দিয়া যেই বীর তরী আরোহিল;
স্থির ভাগীরথী জল করি উচ্ছ্বসিত,
অমনি ব্রিটিস্ বাদ্য বাজিয়া উঠিল;
ছুটিল তরণী বেগে বারি বিদারিয়া,

তালে তালে দাঁড়ী দাঁড়ে পড়িতে লাগিল;
আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া,
সুনীল আরশি খানি ভাঙিল গড়িল;
একতানে বীরকণ্ঠ ব্রিটিস-তনয়
গায় "জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়—"

ঐ তরণীর নাবিকদিগের গীত অতি মনোহর—বাইরণের যোগ্য। গীতটি শুনিয়া বাইরণকৃত নাবিকদস্যুর গীত মনে পড়ে। *

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি,
অভয়ে আমরা ব্রিটননন্দন;
আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশ দেশান্তরে করি বিচরণ।
নব আবিষ্কৃত আমেরিকা দেশে,
কিম্বা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকার,

ঐশ্বর্য্যশালিনী পূরব প্রদেশে,
ইংলণ্ডের কীর্ত্তি না আছে কোথায়?
পূরব পশ্চিম গায় সমুদয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়।"
সম্পদ সাহস; সঙ্গী তরবার;
সমুদ্র বাহন; নক্ষত্র কাণ্ডারী;

---

* *The Corsair.*

ভরসা কেবল শক্তি আপনার ;
শয্যা রণক্ষেত্র ; ঈষা ত্রাণকারী ।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানলসম বিক্রম বিস্তার ;
আছে কোন্ দুর্গ ? কোন্ অদ্রিপতি ?
কোন্ নদ নদী, ভীম পারাবার ?
শুনিয়া সভয়ে কম্পিত না হয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয় ?"
আকাশের তলে এমন কি আছে,
ডরে যারে বীর ব্রিটিস তনয় ?
কেবল ব্রিটিস-ললনার কাছে,
সে বীরহৃদয় মানে পরাজয় ;
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে,
স্মরিয়া অন্তরে ; চল রণে তবে ;

হায় ! কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শুনে রণবার্ত্তা বামাগণে যবে,
গাবে বামাকণ্ঠ-স্বর করি লয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয় ।"
অতএব সবে অভয় অন্তরে,
চীৎ হয়ে পড়ে দাও দাঁড়ে টান,
ব্রিটনিয়াপুত্র রণে নাই ডরে,
খেলার সামগ্রী বন্দুক কামান ;
ব্রিটিসের নামে ফিরে সিন্ধুগতি,
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্দ্ধপথে রয় ;
কি ছার দুর্ব্বল যবনভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয় ;
গাবে বঙ্গসিন্ধু, গাবে হিমালয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয় ।"

তৃতীয় সর্গের আরম্ভে সিরাজদ্দৌলার শিবিরে নৃত্যগীতের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। এমত সময়ে, সহসা ইংরেজের বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল। পুনশ্চ, বাইরণ কৃত ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রি বর্ণনা স্মরণ পড়ে—

"There was a sound of revelry by night" &c.

নিম্নলিখিত গায়িকার বর্ণনাও বাইরণের যোগ্য—

বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল ;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল ;
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল !

তোপের শব্দে নৃত্যগীত ভাঙ্গিয়া গেল—সিরাজদ্দৌলা ভবিতব্য চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার উক্তিগুলিতে, তাঁহার স্বার্থপর, অধ্যবসায়বিহীন, দুর্ব্বল, ভীত-চিত্ত, অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত প্রকটিত হইয়াছে। এই কাব্যে কবি চরিত্রের আশ্লেষণ* শক্তির তাদৃশ পরিচয় দেন নাই বটে কিন্তু এই স্থলে বিশ্লেষণ† শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন।

* Synthesis.

† Analysis.

নবাব, আপনার কর্ম্মফল ও চরিত্রদোষ চিন্তা করিয়া, ভয়বিমূঢ় হইয়া, মীরজাফরের শরণ লইব বলিয়া দৌড়িলেন কিন্তু ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার একজন স্নেহময়ী মহিষী তাঁহাকে তুলিয়া অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। এদিকে, এক ব্রিটিস্ যুবক—

প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার!

ইত্যাদ্য এক সুমধুর গীতিধ্বনি বিকীর্ণ করিতে লাগিল—এইরূপে রজনী প্রভাতা হইল। তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত হইল।

এই কাব্যের বিশেষ একটি দোষ, কার্য্যের মন্থরগতি। ইহাতে কার্য্য অতি অল্প; যাহা আছে, তাহার গতি অতি অল্পে অল্পে হইতেছে। অল্প ঘটনার বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গসকল পরিপূরিত হইতেছে। প্রথম সর্গে রাজগণ পরামর্শ করিলেন, এই মাত্র; দ্বিতীয় সর্গে ইংরেজসেনা গঙ্গা পার হইয়া পলাশিতে আসিল এই মাত্র; তৃতীয় সর্গে কিছুই হইল না। কিন্তু কবির ওজস্বিনী কবিতার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া এ সকল দোষ লক্ষিত করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

চতুর্থ সর্গে পলাশির যুদ্ধ। যুদ্ধবর্ণনা অতি সুন্দর—

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে,
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।

পাখিগণ কলরব করি ব্যস্তমনে,
পশিল কুলায়ে ডরে;
গাভীগণ ছুটে রড়ে,
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁপাল সঘনে।

আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি,
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিস বাজন।

আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীমরব ফাটিল গগন।

সেই ভীমরবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে, পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝনা।

খেলিছে বিদ্যুৎ এক ধাঁধিয়া নয়ন!
লাখে লাখে তরবার,
ঘুরিতেছে অনিবার,
রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।

ছুটিল একটী গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ভূতলে হইল মিরমদন পতন!

"হুরুরো, হুরুরো" করি গর্জ্জিল ইংরাজ,
নবাবের সৈন্যগণ,
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
পলাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ।

"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ,
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"
গর্জ্জিল মোহনলাল "নিকট শমন?"

তৎপরে মোহনলালের যে বীরবাক্য আছে, তাহা আরও সুন্দর। সত্য ইতিহাসে ইহা কীর্ত্তিত আছে যে, হিন্দুসেনাপতি মোহনলাল পলাশির ক্ষেত্রে ক্লাইবকে প্রায় বিমুখ করিয়াছিলেন, এবং যদি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তবে ভারত সাম্রাজ্য অদ্য কে ভোগ করিত তাহা বলা যায় না। যবন-সেনা পলায়নোদ্যত দেখিয়া মোহনলাল তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিব কি? না, পাঠকের ইচ্ছা হয়, বিরলে বসিয়া আপনি পাঠ করিবেন।

তাঁহার বাক্যে সৈন্য আবার ফিরিল, আবার রণ হইতে লাগিল—কিন্তু এমত সময়ে শঠ মীরজাফরের পরামর্শে নবাব রণস্থগিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। নবাবের সৈন্য তখন রণে নিবৃত্ত হইল। তাহা দেখিয়া ইংরেজ দ্বিগুণ বল করিল—

তেমনি বারেক যদি টলিল যবন,
ইংরাজ শঙ্গিন করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন।

কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারও গলায়
লাগিল; শঙ্গিন ঘায়,
বরিষার ফোটাপ্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ব্রিটিস বাজনা,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা।

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিতে আরক্ত কায়,
অস্ত গেল রবি, হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরবভাস্কর।

ইংলণ্ডের রণজয় হইল—সূর্য্যাস্ত হইল—কবি সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া নিজ-মনের কথা কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু এরূপ উপাখ্যান কাব্যে এতাদৃশ দীর্ঘ মন্তব্য, আমাদিগের বিবেচনায় যথাস্থানে নিবিষ্ট নহে। চাইল্ড হেরল্ডে বাইরণ সচরাচর এইরূপ মন্তব্য পদ্যে বিন্যস্ত করিয়া লোকমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু চাইল্ড হেরল্ড বর্ণন কাব্য, আর পলাশির যুদ্ধ উপাখ্যান কাব্য। যাহা চাইল্ড হেরল্ডে সাজে, পলাশির যুদ্ধে তাহা সাজে না। এই কাব্যে কার্য্যের গতিরোধ করা কর্ত্তব্য হয় নাই। কিন্তু এ কাব্যের কার্য্য অতি মন্দগামী, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পঞ্চম সর্গে জেতৃগণের উৎসব, সিরাজদ্দৌলার কারাবাস ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে।

মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের সহিত এই কাব্যের তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঐ কাব্যদ্বয়ের ঘটনা সকল কাল্পনিক, অতি প্রাচীনকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত এবং সুরাসুর, রাক্ষস বা অমানুষিক শক্তিধর

মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত; সুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া, আপনার অভিলাষ মত সৃষ্টি করিতে পারেন। পলাশির যুদ্ধে ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্যকর্ত্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয়নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নবীন বাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।

তবে, এই কাব্যমধ্যে ঘটনাবৈচিত্র, সৃষ্টিবৈচিত্র সঙ্ঘটন করা, কবির সাধ্য বটে। তৎসম্বন্ধে নবীনবাবু তাদৃশ শক্তি প্রকাশ করেন নাই। বৃত্রসংহারের একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই একখানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে এবং গীতিকাব্য আছে। পলাশির যুদ্ধে, উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প—গীতি অতি প্রবল। নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। সেইজন্য পলাশির যুদ্ধ এত মনোহর হইয়াছে।

এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চরিত্রের আশ্লেষণে দুইজনের একজনও কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই—বিশ্লেষণে দুইজনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে "ঘাত প্রতিঘাত"—দুইজনের একজনের কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্যদিকে দুইজনেই অত্যন্ত শক্তিশালী। ইংরেজিতে বাইরণের কবিতা তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা, বাঙ্গালাতেও নবীনবাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদিগের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাব সকল আগ্নেয়গিরিনিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য। বাইরণ স্বয়ং একস্থানে কোন নায়কের প্রণয়বেগ বর্ণনাচ্ছলে নায়ককে যাহা বলাইয়াছেন, তাঁহার নিজের কবিতার বেগ এবং নবীনবাবুর কবিতার বেগসম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে।

*　　*　　*

But mine was like the lava flood
That boils in Etna's breast of flame.
I cannot prate in puling strain
Of ladye-love and beauty's chain :
If changing cheek and scorching vein,
Lips taught to writhe but not complain,
If bursting heart, and madd'ning brain,

And daring deed and vengeful steel.
And all that I have felt and feel,
Betoken love, that love was mine,
And shown by many a bitter sign.*

নবীনবাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীনবাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে।

বাইরণের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। বাইরণের ন্যায় তাঁহারও শক্তি আছে যে, দুই চারিটি কথায় তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে পারেন। ক্লাইবের নৌকারোহণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু অনেক সময়েই, নবীনবাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।

যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে। পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

উপসংহারকালে, পাঠকদিগকে আমরা একটি কথা বলিব। পলাশির যুদ্ধের আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি। যদি তাঁহারা ইহার যথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, আদ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন। যে, বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালির আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালি জন্ম বৃথা।

---

* The Giaour.

রাধারাণী নামে এক বালিকা, মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল—বড় মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দামা হয়; সর্ব্বস্ব লইয়া মোকদ্দামা; মোকদ্দামাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবা মাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া, ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশলক্ষ টাকার সম্পত্তি, ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, প্রিবিকৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া, কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্ব্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এজন্য কাজে কাজেই তাহার উপবাস; রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথা? কি দিবে?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া, তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোকসকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মূষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষুঃ বারিবর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল—আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘনকৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমত সময়ে অন্ধকারে, অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল—"কে গা তুমি কাঁদ ?"

পুরুষমানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণীর ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল,—"আমি দুঃখীলোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছে।"

সে পুরুষ বলিল, "তুমি কোথা গিয়াছিলে ?"

রা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। কিন্তু অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ী কোথা ?"

রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দিও—আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড় বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমার বয়স কত ?"

রাধা। দশ এগার বছর—

"তোমার নাম কি ?"

রাধা। রাধারাণী।

"হাঁ রাধারাণী! তুমি ছেলেমানুষ একেলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন ?"

তখন সে, কথায় কথায়, মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে লইয়া গিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণও বালিকার হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, "আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর আছে তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত' আমি কিনি।"

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া, হাত ধরিয়া এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি প্রকারে? তা নহিলে, আমার মা খেতে পাবে না; তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী মালা, সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।" সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা? এ যে বড় বড় ঠেক্‌চে।"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না দুইটা বৈ দিই নাই।"

রাধা। তা এ যে অন্ধকারেও চক্ চক্ কর্‌চে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত?

"না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্ চক্ কর্‌চে।"

রাধা। তা, আচ্ছা ঘরে গিয়ে, প্রদীপ জেলে যদি দেখি যে পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে, তাহারা রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়—তারপর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও আমি আলো জ্বালি।"

"আচ্ছা।"

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া, চকমকি ঠুকিয়া, আগুন জ্বালিতে হইল। আগুন জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্ণবদনে, সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল—সকাতরে বলিল—"মা। এখন কি হবে ?"

মা বলিল, "কি হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে। সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি—দানগ্রহণ করিয়া খরচ করি।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় সোরগোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল—মনে করিয়াছিল যে সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন ? পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌সে!

রাধারাণীর মার কুটীর, বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটীরের নিকটেই পদ্মলোচন সাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,—সেই পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্সে—একজোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল। বলিল, "রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ওমা! আমার কিসের কাপড়!"

পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ারমুখো কি না, তাহা আমরা সবিশেষ জানি না,—রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, "কেন' এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়া এসো।"

রাধারাণী তখন বলিল, "ওমা সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁগা, পদ্মলোচন!"—

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেকবারই ইহাদিগের নিকট যখন সুদিন ছিল, তখন, চারি টাকার কাপড়ে শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বার আনা, আর দুই আনা মুনাফা লইয়াছিলেন—

"হাঁ পদ্মলোচন—বলি, সে বাবুটিকে চেন ?" পদ্মলোচন বলিল, "তোমরা চেন না ?"

রাধা। না।

পদ্ম। আমি বলি তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।

যাহা হৌক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাধারাণী, প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মার পথ্যের উত্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া, তৈল আনিয়া, প্রদীপ জ্বালিল। মার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিস্কার করিয়া, মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—"এ কি মা!"

মা, দেখিয়া বলিল—"একখানা নোট!"

রাধারাণী বলিল, "তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।"

মা বলিলেন, "হাঁ। তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, লেখা আছে "রাধারাণীর জন্য।"

রাধারাণী বলিল, "হাঁ মা, এমন লোক কে মা?"

মা বলিলেন, "তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এইজন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।"

পরদিন মাতায় কন্যায়, রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে, বা নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

২

রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া, তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনী লোক ছিলেন, এখন অতি দুঃখিনী হইয়াছিলেন; এই শারীরিক এবং মানসিক দ্বিবিধ কষ্ট, তাঁহার সহ্য হইল না। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার শেষকাল উপস্থিত হইল।

এমত সময়ে বিলাত হইতে সম্বাদ আসিল যে প্রিবিকৌন্সিলের আপীলে তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি পাইয়াছে; তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওয়াশিলাতের টাকা ফেরৎ পাইবেন, এবং তিন আদালতের খরচা পাইবেন। কামাখ্যানাথবাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সম্বাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সুসম্বাদ শুনিয়া, রুগ্নার অবিরল নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল।

তিনি নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া কামাখ্যা বাবুকে বলিলেন, "যে প্রদীপ নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে? আপনার এ সুসম্বাদেও আমার আর প্রাণরক্ষা হইবে না। আমার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে। তবে আমার এই সুখ যে, রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। তাই বা কে জানে? সে বালিকা,

তাহার এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনিই ভরসা। আপনি, আমার এই অন্তিমকালে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন—নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব?"

কামাখ্যাবাবু অতি ভদ্রলোক। এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন। রাধারাণীর মাতা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, যতদিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অন্ততঃ ততদিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব। রাধারাণীর মাতা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামাখ্যাবাবু কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। "আমার এখনও কিছু হাতে আছে—আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইব।" এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। রুক্মিণীকুমারের দান গ্রহণ, তাঁহাদিগের প্রথম ও শেষ দান গ্রহণ।

কামাখ্যাবাবু এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দশা দেখিয়া, কামাখ্যা বাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন। আবার রাধারাণীর মাতা যুক্তকরে তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন, দেখিয়া আরও কাতর হইলেন বলিলেন,—"আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? আপনার যাহা প্রয়োজন, আমি তাহাই করিব।"

রাধারাণীর মাতা বলিলেন, "আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার শ্বশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব রাধারাণী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার ন্যায়, তাহাকে রক্ষা করিবেন। এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।"

কামাখ্যাবাবু বলিলেন, "আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপন কন্যার অধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ কথা কহিলাম, আপনি বিশ্বাস করুন।"

যিনি মুমূর্ষু তিনি, কামাখ্যা বাবুর চক্ষের জল দেখিয়া, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আহ্লাদের হাসি হাসিলেন। হাসি দেখিয়া কামাখ্যাবাবু বুঝিলেন, ইনি আর বাঁচিবেন না।

কামাখ্যাবাবু তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, এক্ষণে আমার গৃহে চলুন। পরে ভদ্রাসন দখল হইলে আসিবেন। রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিদ্রজনিত—এজন্য দারিদ্র্যাবস্থায় তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দারিদ্র্য নাই, সুতরাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যা বাবু, রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সযত্নে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যাবাবু রাধারাণীকে তাঁহার সম্পত্তি দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজবাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন। কালেক্টর সাহেব, রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্য যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যাবাবু বিবেচনা করিলেন, আমি রাধারাণীর জন্য যতদূর করিব, সরকারি কর্ম্মচারিগণ ততদূর করিবে না। কামাখ্যাবাবুর কৌশলে, কালেক্টর সাহেব নিরস্ত হইলেন। কামাখ্যাবাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণা করিতে লাগিলেন।

বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যাবাবু নব্যতন্ত্রের লোক—বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক।

এই ভাবিয়া কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিতা করিলেন।

৩

পাঁচ বৎসর গেল—রাধারাণী পরম সুন্দরী যোড়শবর্ষীয়া কুমারী। কিন্তু সে অন্তঃপুরের মধ্যে বাস করে, তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যাবাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন। তত্ত্ব জানিবার জন্য আপনার কন্যা, বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে রাধারাণীর সখীত্ব। উভয়ে সমবয়স্কা। এবং উভয়ে অত্যন্ত প্রণয়। কামাখ্যাবাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

বসন্ত, সলজ্জভাবে অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে?"

কামাখ্যাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না। তা ত জানি না। কেন?"

বসন্ত বলিল, "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

কামাখ্যা। সেকি? রাধারাণীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কি প্রকারে হইল?

বসন্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল। সে রথের রাত্রের বিবরণ সবিস্তারে রাধারাণীর কাছে শুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল। শুনিয়া কামাখ্যাবাবু রুক্মিণীকুমারের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "রাধারাণীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারাণী একটি মহা ভ্রমে পড়িয়াছে। বিবাহ কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নহে। রুক্মিণীকুমারের নিকট রাধারাণীর কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত; যদি সময় ঘটে, তবে অবশ্য প্রত্যুপকার করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহে রুক্মিণীকুমারের কোন দাবি দাওয়া নাই। তাতে আবার সে কি জাতি, কত বয়স তাহা কেহ জানি না। তাহার পরিবার সন্তানাদি থাকিবারই সম্ভাবনা; রুক্মিণীকুমার বিবাহ করিবারই বা সম্ভাবনা কি?"

বসন্ত বলিল, "সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। কিন্তু সে সেই রাত্রি অবধি, রুক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া, আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে, রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া, প্রত্যহ মনে মনে পূজা করে। এই পাঁচ বৎসর রাধারাণী আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বৎসরে এমন দিন প্রায় যায় নাই, যে দিন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই। আর কেহ রাধারাণীকে বিবাহ করিলে, তাহার স্বামী সুখী হইবে না।"

কামাখ্যাবাবু মনে মনে বলিলেন, "বাতিক। ইহার একটু চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু প্রথম চিকিৎসা বোধ হয়, রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করা।"

কামাখ্যাবাবু, রুক্মিণীকুমারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং কলিকাতায় তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। দেশে দেশে আপনার মোয়াক্কেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সম্বাদপত্রেও বিজ্ঞাপন দিলেন। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ—

"বাবু রুক্মিণীকুমার রায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন—বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে রুক্মিণী বাবুর সন্তোষের ব্যতীত অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইবে না।

শ্রীইত্যাদি—"

কিন্তু কিছুতেই রুক্মিণীকুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, তথাপি কই, রুক্মিণীকুমার ত আসিল না।

ইহার পর, রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইল—কামাখ্যা বাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী ইহাতে অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন, দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইলেন মনে করিলেন। কামাখ্যাবাবুর শ্রাদ্ধাদির পর, রাধারাণী আপন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এবং নিজ সম্পত্তির

তত্বাবধারণা স্বয়ং করিতে লাগিলেন। কামাখ্যাবাবুর বিচক্ষণতা হেতু, রাধারাণীর সম্পত্তি বিস্তর বাড়িয়াছিল।

বিষয় হস্তে লইয়াই, রাধারাণী প্রথমেই দুই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন যে, এই অর্থে তাঁহার নিজগ্রামে, একটি অনাথনিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হৌক—"রুক্মিণীকুমারের প্রসাদ।"

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কে কথা কহিবে? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইল। রাধারাণীর মাতা দারিদ্রাবস্থায় নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া, শ্রীরামপুরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কেননা যে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দরিদ্র হইলে, সেগ্রামে তাহার বাস করা কষ্টকর হয়। তাঁহাদিগের নিজগ্রাম শ্রীরামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর—আমরা সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধারাণী রাজপুরেই বাস করিতেন। অনাথনিবাসও রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল। নানা দেশ হইতে দীন দুঃখী অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

৪

দুই এক বৎসর পরে, একজন ভদ্রলোক, সেই অনাথনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। অবস্থা দেখিয়া, অতি ধীর, গম্ভীর, এবং অর্থশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই "রুক্মিণীকুমারের প্রসাদের" দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী?"

তাহারা বলিল, "এ কাহারও বাড়ী নহে। এখানে দুঃখী অনাথ লোক থাকে। ইহাকে "রুক্মিণীকুমারের প্রসাদ" বলে।

আগন্তুক বলিলেন, "আমি ইহার ভিতরে গিয়া দেখিতে পারি?"

রক্ষকগণ বলিল, "দীন দুঃখীলোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে—আপনাকে নিষেধ কি?"

দর্শক ভিতরে গিয়া সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলিলেন, "বন্দোবস্ত দেখিয়া, আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে। কে এই অন্নচ্ছত্র দিয়াছে? রুক্মিণীকুমার কি, তাঁহার নাম?"

রক্ষকেরা বলিল, "শ্রীমতী রাধারাণী দাসী এই অন্নচ্ছত্র দিয়াছেন।"

দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ইহাকে রুক্মিণীকুমারের প্রসাদ বলে কেন?"

রক্ষকেরা বলিল, "তাহা আমরা কেহ জানি না।"

"রুক্মিণীকুমার কার নাম ?"

"কাহারও নয়।"

"যে রাধারাণী দাসীর নাম করিলে, তাঁহার নিবাস কোথায় ?"

রক্ষকেরা সম্মুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তোমরা বলিতে পার, এই রাধারাণী সধবা না বিধবা ?"

উত্তর—"সধবাও নন্—বিধবাও নন্—উনি বিবাহ করেন নাই। বড়মানুষের মেয়ে—উঁহার কেহ নাই—কে বিবাহ দিবে ?"

প্রশ্ন—"উনি পুরুষমানুষের সাক্ষাতে বাহির হইয়া থাকেন ? রাগ করিও না—এখন অনেক বড়মানুষের মেয়ে মেম লোকের মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে, এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

রক্ষকেরা উত্তর করিল—"ইনি সেরূপ চরিত্রের নন। পুরুষের সমক্ষে বাহির হন না।"

প্রশ্নকর্ত্তা ধীরে ধীরে রাধারাণীর অট্টালিকার অভিমুখে গিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালি ভদ্রলোকের মত ; বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাট্যের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না, কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলিতে একটী হীরকাঙ্গুরীয় ছিল ; তাহা দেখিয়া, রাধারাণীর কর্ম্মকারকগণ অবাক্ হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল, এত বড় হীরা তাহারা কখন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কেহ লোক ছিল না, এজন্য তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, কে ইনি ? মনে করিল বাবু স্বয়ং পরিচয় দিবেন, কিন্তু বাবু কোন পরিচয় দিলেন না। তিনি রাধারাণীর দেওয়ান্‌জির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন, বলিলেন, "এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।"

দেওয়ান্‌জি বলিলেন, "আমার মুনিব স্ত্রীলোক, অবিবাহিতা, আবার অল্প-বয়স্কা। এজন্য তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন অপরিচিত লোকে পত্র আনিলে, আমরা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।"

আগন্তুক বলিলেন, "আপনি পড়ুন।"

দেওয়ান্‌জি পত্র পড়িলেন—

"প্রিয় ভগিনি !

"এ ব্যক্তি পুরুষ হইলেও ইঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিও—ভয় করিও না। যেমত যেমত ঘটে আমাকে লিখিও।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী।"

কামাখ্যাবাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া, কেহ আর কিছু বলিল না—পত্র অন্তঃপুরে গেল।

অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্রবাহক বাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পাইল না—হুকুম নাই।

পরিচারিকা বাবুকে লইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইলেন। রাধারাণীর অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষমানুষ প্রবেশ করিল। দেখিয়া, একজন পরিচারিকা রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর একজন অন্তরালে থাকিয়া আগন্তককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল যে, তাঁহার বর্ণটুকু গৌর—স্ফুটিত মল্লিকারাশির মত গৌর; তাঁহার শরীর দীর্ঘ, এবং ঈষৎ স্থূল; কপাল দীর্ঘ; অতি সূক্ষ্ম পরিষ্কার ঘনকৃষ্ণ সুরঞ্জিত কেশজালে মণ্ডিত; চক্ষু বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, ভ্রূযুগ সূক্ষ্ম, ঘন, দূরায়ত, এবং নিবিড়কৃষ্ণ; নাসিকা দীর্ঘ, এবং উন্নত, ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র এবং কোমল; গ্রীবা দীর্ঘ, অথচ মাংসল; অন্যান্য অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কেবল অঙ্গুলি-গুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি শুভ্র, সুগঠিত এবং একটি বৃহদাকার হীরকে রঞ্জিত। পরিচারিকা মনে মনে বাসনা করিল যে যদি কোন পুরুষ কখন আমাদের মুনিব হন, তবে যেন ইনিই হয়েন।

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকা বিদায় করিয়া দিলেন। রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল—রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আগন্তকের উচিত প্রথম কথা কহা—কেননা তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ—কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছেন কেন? আমি স্ত্রীলোক, কেবল বসন্তের অনুরোধেই আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি।"

আগন্তক বলিলেন, "আমি আপনার সহিত এরূপ সাক্ষাতের অভিলাষী হইয়াছি, ঠিক তা নহে।"

রাধারাণী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তা নয়, বটে। তবে বসন্ত কি জন্য এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। বোধ হয় আপনি জানেন।"

আগন্তক, একখানি অতি পুরাতন সম্বাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধারাণীকে দেখাইলেন। রাধারাণী পড়িলেন; কামাখ্যাবাবুর স্বাক্ষরিত রুক্মিণীকুমারের সেই বিজ্ঞাপন! রাধারাণী দাঁড়াইয়াছিলেন—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নারিকেল পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। আগন্তকের দেবতুল্য গঠন দেখিয়া, মনে ভাবিলেন, ইনিই আমার সেই রুক্মিণীকুমার। আর থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "আপনার নাম কি রুক্মিণীকুমার বাবু!"

আগন্তক বলিলেন, "না।" "না" শব্দ শুনিয়াই রাধারাণী ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—তাঁহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গেল।

আগন্তুক বলিলেন,—"না। আমি যদি রুক্মিণীকুমার হইতাম—তাহা হইলে, কামাখ্যাবাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না। কেননা, তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয় তখনই আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

রাধারাণী বলিলেন, "যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন?"

উত্তরকারী বলিলেন, "একটি কৌতুকের জন্য। আজি আট দশ বৎসর হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম—কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে আপনার নামটি গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক নামটি রুক্মিণীকুমার। আপনি অত বিমনা হইতেছেন কেন?"

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন—আগন্তুক বলিতে লাগিলেন—"যথার্থ রুক্মিণীকুমার নাম ধরে, এমন কাহাকেও চিনি না। যদি কেহ আমারই তল্লাস করিয়া থাকে—তাহা সম্ভব নহে—তথাপি কি জানি—সাত পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম—কিন্তু কামাখ্যাবাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না।"

"পরে?"

"পরে কামাখ্যাবাবুর শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমি কার্য্যগতিকে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি সেই ত্রুটির ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য তাঁহার পুত্রদিগের নিকট আসিয়াছিলাম। কৌতুক বশতঃ বিজ্ঞাপনটি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে উহার কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল? কামাখ্যা বাবুর পুত্র বলিলেন যে, রাধারাণীর অনুরোধে। আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম—এক বালিকা—আমি একদিন দেখিয়া তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। যে মাতার পথ্যের জন্য, আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া—সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে—" বক্তা আর কথা কহিতে পারিলেন না—তাঁহার চক্ষু জলে পূরিয়া গেল। রাধারাণীরও চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। চক্ষু মুছিয়া রাধারাণী বলিলেন, "সে পোড়ারমুখীর কথায় এখন প্রয়োজন কি? আপনার কথা বলুন।"

আগন্তুক উত্তর করিলেন, "তাঁহাকে গালি দিবেন না। যদি সংসারে কেহ সোনামুখী থাকে, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহাকে পবিত্র সরলচিত্ত, এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহারও কথায় অমৃত থাকে, তবে সেই রাধারাণী—যথার্থ অমৃত! বর্ণে বর্ণে অপ্সরার বীণা বাজে, যেন কথা কহিতে বাধ বাধ করে, অথচ সকল কথা, পরিষ্কার সুমধুর,—অতি সরল! আমি এমন কণ্ঠ কখন শুনি নাই—এমন কথা কখনও শুনি নাই!"

রুক্মিণীকুমার—এক্ষণে ইঁহাকে রুক্মিণীকুমারই বলা যাউক—ঐ সঙ্গে মনে মনে বলিলেন, "আবার আজ বুঝি তেমনি কথা শুনিতেছি।"

রুক্মিণীকুমার মনে মনে ভাবিতেছিলেন, আজি এতদিন হইল, সেই বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম কিন্তু আজিও সে কণ্ঠ আমার মনের ভিতর জাগিতেছে! যেন কাল শুনিয়াছি। অথচ আজি এই রাধারাণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সেই রাধারাণীকেই বা মনে পড়ে কেন? এই কি সেই? আমি মূর্খ! কোথায় সেই দীন-দুঃখিনী কুটীরবাসিনী ভিখারিণী, আর কোথায় এই উচ্চপ্রাসাদ-বিহারিণী ইন্দ্রাণী! আমি সে রাধারাণীকে অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, সুতরাং জানি না যে সে সুন্দরী কি কুৎসিতা, কিন্তু এই শচীনিন্দিতা রূপসীর শতাংশের একাংশ রূপও যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে সেও লোকমনোমোহিনী বটে!

এ দিকে রাধারাণী, অতৃপ্তশ্রবণে রুক্মিণীকুমারের মধুর বচনগুলি শুনিতে-ছিলেন—মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি যাহা পাপিষ্ঠা রাধারাণীকে বলিতেছ, কেবল তোমাকেই সেই কথাগুলি বলা যায়! তুমি আজ আট বৎসরের পর রাধারাণীকে ছলিবার জন্য কোন্ নন্দনকানন ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিলে? এত দিনে কি আমার হৃদয়ের পূজায় প্রীত হইয়াছ? তুমি কি অন্তর্যামী? নহিলে আমি লুকাইয়া লুকাইয়া, হৃদয়ের ভিতরে লুকাইয়া তোমাকে যে পূজা করি, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?

এই প্রথম, দুইজনে, স্পষ্ট দিবসালোকে, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দুইজনে, দুইজনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি? এই সসাগরা নগনদীচিত্রিতা জীবসঙ্কুলা পৃথিবীতলে, এমন তেজোময়, এমন মধুর, এমন সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্য অথচ গম্ভীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ব্রীড়াময়, এমন আর আছে কি? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অভিনব মধুরিমাময়, আত্মীয় অথচ অত্যন্ত পর, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব—কখন দেখি নাই, কখন আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি?

রাধারাণী বলিলেন,—বড়কষ্টে বলিতে হইল, কেননা চক্ষের জল থামে না, আবার সেই চক্ষের জলের উপর কোথা হইতে পোড়া হাসি আসিয়া পড়ে—রাধারাণী বলিলেন, "তা, আপনি এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন, আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন, তাত এখনও বলেন নাই।"

হাঁ গা, এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, প্রাণেশ্বর! দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব! চিরবাঞ্ছিত! বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে; আবার যাকে সেই সঙ্গে "হাঁ গা সেই রাধারাণী

পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা" বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে—তার সঙ্গে আপনি মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই সকল কথা নিয়ে কি কথা কহা যায় গা ? তোমরা পাঁচজন রসিকা, প্রেমিকা, বাক্-চতুরা, বয়োধিকা ইত্যাদি ইত্যাদি আছ, তোমরা পাঁচজনে বল দেখি, ছেলেমানুষ রাধারাণী কেমন করে্য এমন করে্য কথা কয় গা ?

রাধারাণী মনে মনে একটু পরিতাপ করিল, কেননা কথাটা একটু ভৎ র্সনার মত হইল। রুক্মিণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তাই বলিতেছিলাম। আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম—রাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু—এতটুকু—অন্ধকার রাত্রে জোনাকির ন্যায় —একটু আশা হইল যে, যদি এই রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয়।"

"**তোমার** রাধারাণী।" রাধারাণী ছল ধরিয়া হাসিলেন।

হাঁ গা, না হেসে কি থাকা যায় গা ? তোমরা আমার রাধারাণীর নিন্দা করিও না।

রুক্মিণীকুমারও মনে ছল ধরিলেন—"তুমি হইয়াছি—আপনি নই।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমারই রাধারাণী। আমি একরাত্রি মাত্র তাহাকে দেখিয়া—দেখিয়াছিই বা কেমন করিয়া বলি—এই আট বৎসরেও তাহাকে ভুলি নাই। আমারই রাধারাণী।"

রাধারাণী বলিলেন, "হৌক, আপনারই রাধারাণী।"

রুক্মিণী বলিতে লাগিলেন, "সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কে ? কামাখ্যাবাবুর পুত্র সবিস্তারে পরিচয় দিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক ছিলেন, কেবল বলিলেন, 'আমাদিগের কোন আত্মীয়ার কন্যা।' যেখানে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, সেখানে আর অধিক পীড়াপীড়ি করিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কেন রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিয়াছিলেন শুনিতে পাই কি ? যদি প্রয়োজন হয় ত বোধ করি, আমি কিছু সন্ধান দিতে পারি। আমি এই কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, 'কেন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না ; আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন ; বোধ করি আমার ভগিনীও জানিতে পারেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে।' এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পত্র দিয়া বলিলেন, আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন যে, 'এই পত্র লইয়া তাঁহাকে স্বয়ং রাধারাণীর কাছে যাইতে বলুন।

স্বয়ং রাধারাণী সন্ধান দিবেন ও লইবেন।' আমি সেই পত্র লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। কোন অপরাধ করিয়াছি কি?"

রাধারাণী বলিলেন, "করিয়াছেন। তাহা পশ্চাৎ বলিব কি? এক্ষণে ইহাই বলি যে, আপনি মহাভ্রমে পতিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন। আপনার রাধারাণী কে তাহা আমি চিনি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিলে বলিতে পারি আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না।"

রুক্মিণী সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন, কেবল নিজদত্ত অর্থ বস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না। রাধারাণী বলিলেন, "এই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যে, যদি আপনি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা সাহস করিয়া বলিব কি? আপনাকে কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, কেননা আপনাকে দয়ালু লোক বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরূপ দয়ার্দ্রচিত্ত হইতেন, তাহা হইলে, আপনি যে ভিখারী বালিকার কথা বলিলেন, তাহাকে অমন দুর্দ্দশাপন্না দেখিয়া অবশ্য তাহার কিছু আনুকূল্য করিতেন। কই, আনুকূল্য করার কথা ত কিছু আপনি বলিলেন না?"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আনুকূল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমি সেদিন নৌকাপন্থে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম—পাছে কেহ জানিতে পারে, এই জন্য ছদ্মবেশে রুক্মিণীকুমার রায় পরিচয়ে লুকাইয়া আসিয়াছিলাম—অপরাহ্ণে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। সঙ্গে যাহা অল্প ছিল, তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম। কিন্তু সে অতি সামান্য। পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদিগের বিশেষ সংবাদ লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই আমাকে কাশী যাইতে হইল। পিতা অনেকদিন রুগ্ন হইয়া রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিতে আমার বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। বৎসর পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটীরের সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।"

রা। আপনি রাধারাণীকে যেরূপ ভালবাসেন দেখিতেছি, তাহার কারণ জানিবার জন্য আমার বড় ব্যস্ততা হইতেছে। স্ত্রীলোকে অমন ব্যস্ত হইয়াই থাকে। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বোধ হয় সে রথের দিন নিরাশ্রয়ে, বৃষ্টি বাদলে, আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন?

রু। অধিকক্ষণ নহে। আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম, তাহা দেখিবার জন্য রাধারাণী আলো জ্বালিতে গেল—আমি সেই অবসরে, তাহার বস্ত্র কিনিতে চলিয়া আসিলাম।

রাধা। আর কি দিয়া আসিলেন ?

রু। আর কি দিব ? একখানা ক্ষুদ্র নোট ছিল, তাহা কুটীরে রাখিয়া আসিলাম।

রাধা। আমার অতি সামান্য একটা প্রয়োজন আছে। আসিতেছি। একটু অপেক্ষা করুন।

সেই নোটখানি রাধারাণী অদ্যাপি যত্নে রাখিয়াছিল—তাহা বাহির করিয়া আনিল। আসিয়া বলিল, "নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই—তাহারা মনে করিতে পারে, আপনি নোটখানি হারাইয়া গিয়াছেন।"

রু। না, আমি পেন্‌সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, "রাধারাণীর জন্য।" তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, "রুক্মিণীকুমার রায়।" যদি সেই রুক্মিণী-কুমারকে সেই রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকে, এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

রাধা। তাই বলিতেছিলাম, আপনি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। যে আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য এত কাতরা, তাহাকে এতদিন দেখা দেন নাই কেন ? সেই রাধারাণী সেই রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিতেছিল কিনা, এই দেখুন।

এই বলিয়া রাধারাণী সেই নোটখানি রুক্মিণীকুমারের হাতে দিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইয়া বলিলেন, "প্রভু, সেদিন তুমি আমাদিগের জীবনদান করিয়াছিলে। এ পৃথিবীতে তুমি আমার দেবতা।"

৬

রাধারাণী যুক্তকরে বলিলেন, "আপনি বলিয়াছেন, আপনার যথার্থ নাম রুক্মিণীকুমার নহে। আমি যাঁহাকে আরাধ্য দেবতা মনে করি, তাঁহার নাম জানিতে বড় ইচ্ছা করে।"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।"

রাধা। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নাম শুনিয়াছি।

রু। লোকে অমন সকলকেই রাজা বলে। কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিলেই আমার যথেষ্ট সম্মান হয়।

রাধা। এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল ; আপনি আমার স্বজাতীয় জানিয়া স্পর্দ্ধা হইতেছে যে, আপনাকে আজি আমার আতিথ্য স্বীকার করিতে বলি।

রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "আমি না ভোজন করিয়া তোমার বাড়ী হইতে যাইব না।"

রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ানজি আসিয়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে বহির্বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। যথাসময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ

ভোজন করিলেন। রাধারাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে রাধারাণী বলিলেন, "বহুদিন হইতে আমার প্রত্যাশা ছিল যে একদিন না একদিন আপনার দর্শন লাভ করিয়া আপনার পূজা করিব। কিছু পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। এই হারছড়াটি অতি সামান্য, কিন্তু আমি দিয়াছি বলিয়া রাণীজি যদি ব্যবহার করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই।" এই বলিয়া, রাধারাণী এক মহামূল্য বহুশত বৃহদাকার হীরকখণ্ডখচিত, গ্রন্থিত নক্ষত্রমালা তুল্য প্রভাশালী হার বাহির করিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন "রাণীজি? রাণীজি কেহ নাই। দশবৎসর হইল আমার পরিবার গত হইয়াছেন। আর আমি বিবাহ করি নাই।"

রাধারাণীর মাথা ঘুরিয়া গেল। বহুকষ্টে, মন স্থির রাখিয়া—মন ঠিক স্থির রহিল, কথা শুনিয়া এমনও বোধ হয় না—রাধারাণী বলিলেন, "যাহা আপনার জন্য গড়াইয়াছি, তাহা আপনাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অনুমতি করেন ত ও হার আপনাকেই পরাইয়া দিই।"

এই বলিয়া রাধারাণী হাসিতে হাসিতে সেই নক্ষত্রমালা তুল্য হার দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ আপনাকে এইরূপ সজ্জিত দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ হার আমারই হইল?"

রাধা। যদি গ্রহণ করেন।

দে। গ্রহণ করিলাম। এখন আমার বস্তু আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিতে পারি?

রা। যাহা আপনার যোগ্য নহে, তাহা অন্যকে দান করাই রাজাদিগের রীতি।

দে। এ হার আমার যোগ্য নহে—অথবা আমি ইহার যোগ্য নহি। তুমিই ইহার যোগ্য—তোমাকেই এ হার দান করিলাম।

এই বলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ সেই হার রাধারাণীর গলায় পরাইয়া দিলেন।

রাধারাণী অসন্তুষ্ট হইলেন না। মুখ নত করিয়া, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন; এক একবার মুখ তুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ বুঝিলেন। বলিলেন, "আমি ও হার লইব না, তাই তোমায় দিলাম। আমায় অন্য একছড়া দাও?"

রাধা। কোন্ ছড়া?

দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার গলায় যে ছড়া আগে হইতে আছে।"

রাধারাণী পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "চিত্রে, ওখানে আছিস্ কি?"

চিত্রা অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। বলিল, "আছি।"

রাধারাণী বলিলেন, "তোর শাঁকটা কোথা ?"

চিত্রা বলিল, "এইখানে আছে।"

রাধা। তবে বাজা।

এই বলিয়া রাধারাণী, আপনার নিজের হার, গলা হইতে খুলিয়া, দেবেন্দ্র-নারায়ণকে পরাইয়া দিলেন।

চিত্রা উচ্চরবে শাঁক বাজাইল।

তারপর রীতিমত বিবাহ হইল কি ? হইল বৈকি। বসন্ত আসিল, তাহার ভাইয়েরা আসিল, রাজা দেবেন্দ্রের কত লোক আসিল—কিন্তু অত কথা আর তোমাদের শুনে কাজ নাই।

সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যা বিলাস

এক্ষণে চৈতন্য নবযৌবনে* পদার্পণ করিলেন। শরীরের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকসিত-প্রায় হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মনের বৃত্তি সমুদয় প্রস্ফুটিত হইয়া সতেজ হইল। নবীন উৎসাহ ও বলে মন বলশালী হইল। কল্পনা ভবিষ্যৎ জীবনের মধুময় চিত্র গঠন করিয়া নানাবর্ণে বিভূষিত করিল। আশা ভরসা ভাবী খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে প্রধাবিত হইল। চৈতন্য একান্ত হৃদয়ে যত্ন ও একাগ্রতাসহ বিদ্যোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এবং শীঘ্রই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিতে সর্ব্বোচ্চস্থানে অভিষিক্ত হইলেন।

হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর সুন্দর।
রাত্রিদিন বিদ্যাভ্যাস নাহি অবসর॥
উষাকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্বশিষ্য করি সাথ॥
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়॥

প্রভু বলে ইথে আছে কোন বড় জন
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন॥
অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঁই পুথি না চিন্তয়

* শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর বেশ মদনমোহন।
ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন॥
চৈতন্য ভাগবত ৬২ পৃঃ।

মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি চতুষ্পাঠীর অন্যান্য শিষ্যগণ চৈতন্যের ব্যাকরণের শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। এবং যদিও চৈতন্য সমপাঠী ছিলেন, তথাপি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লজ্জা নাই।
এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব নবদ্বীপে নাই॥

চৈতন্য ভাগবতে মুরারিগুপ্তের উক্তি।

সমপাঠীদিগের প্রশংসাবাদে চৈতন্যের কর্ণ বধির হইল এবং অহঙ্কারে মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল। চৈতন্য ইঁহাদিগের কতিপয়কে লইয়া মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিলেন। এই নবীন চতুষ্পাঠীতে নবদ্বীপবাসী আরও অনেকে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল।

চৈতন্য কিরূপে সমপাঠীদিগের উপর এতাদৃশ প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র। সুতরাং বোধ হয় ব্যাকরণ ব্যতীত কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি কোন শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন না। চৈতন্য ভাগবত* ও চৈতন্য চরিতামৃতেরণ† কোন কোন স্থলে ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে।

মনুষ্য যাহা সর্ব্বদা দেখে, প্রায় তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু কোন অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিলে, তাহা ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহাতে আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাবত্তা সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু অসামান্য বুদ্ধিমত্তা সেরূপ নহে। চৈতন্য একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক বৃত্তি সাধারণ লোকের অপেক্ষা অশেষগুণে অধিক। চৈতন্য জন্ম হইতে মহাপুরুষ।‡ আবার বাল্যকাল হইতে মনোবৃত্তির বিচালন হওয়ায় তাঁহার স্বাভাবিক তেজস্বিতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সুতরাং এই অলোকসামান্য প্রতিভার তেজে তাঁহাদের মন যে বিমোহিত ও ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আডাম স্মিথ ¶ বলেন, অসাধারণ গুণ অথবা বিভবসম্পন্ন লোক দেখিলে আমরা হতজ্ঞান

* চৈতন্যের প্রতি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের উপদেশ। "তোমার পিতা পিতামহ সকলেই পণ্ডিত ছিলেন, তুমিও বিদ্যোপার্জ্জন কর।"

† দিগ্বিজয়ীর সহিত চৈতন্যের কথোপকথনে চৈতন্য স্বয়ং অনভিজ্ঞতা স্বীকার করেন। কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে দিগ্বিজয়ীকে পরাভব করেন।

‡ জন্মকালে মানসিক ক্ষমতার তারতম্য থাকে। কার্লাইল প্রভৃতি ইউরোপীয় অনেক প্রথম শ্রেণীর চিন্তাশীলব্যক্তি এ বিষয় স্বীকার করেন। অস্মদ্দেশীয় ভাগবত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেরও এই মত। বস্তুতঃ সংসারে একটু দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা মানসিক ক্ষমতার নৈসর্গিক তারতম্য দেখিতে পাই।

¶ *Theory of Moral Sentiments.*

হইয়া, অনন্যোদ্দেশে তাহার নিকট নতশির হই। ইহা মনুষ্যের নৈসর্গিক ধর্ম্ম, এই জন্যই পৃথিবীতে ধর্ম্মসংস্কারক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ একজীবনে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ যে জন্য কার্লাইল মহম্মদের ভক্ত, মিস্ কব পার্কারের ভক্ত উনবিংশ শতাব্দীর দর্শনসমাজ কোম্‌তের ভক্ত, সেই কারণে চৈতন্যের সমপাঠী-সম্প্রদায়ও তাঁহার ভক্ত ও তাঁহার অপূর্ণতাতে অন্ধ।

চতুষ্পাঠী সংস্থাপন হইলে চৈতন্য একমাত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে কালযাপন করিতে লাগিলেন, অনন্যমনা হইয়া একমাত্র বিদ্যাপরায়ণ হইলেন। দিনে দিনে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি বিস্তার হইতে লাগিল। এই সময়ে চৈতন্য জ্ঞানোপার্জ্জনই জীবনের মুখ্য কার্য্য ভাবিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত-মণ্ডলীর সভাজয়, দিগ্বিজয় প্রভৃতি কল্পনা দ্বারা মানসপটে চিত্রিত করিয়া তাহারই মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ, জগন্নাথ মিশ্রের বংশে ভক্তি-বিরহিত পণ্ডিতের জন্মপরিগ্রহ দেখিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন।

দেখি বিশ্বম্ভর রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ বিষাদমনে ভাবে নিরন্তর॥
হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস।
কি করিবে বিদ্যায় করিলে কাল বশ॥

চৈতন্যের মনে কি এপর্য্যন্ত ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হয় নাই? বৈষ্ণবগ্রন্থকারেরা "হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস" এই চরণ দ্বারা স্পষ্টতঃ হয় নাই বলিয়াছেন। কিন্তু স্থানান্তরে "পাষণ্ডী দেখয়ে যেন যমের সমান" এই চরণ দ্বারা চৈতন্যের তাৎকালিক ধর্ম্মের প্রতি আস্থা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা শেষমতেরই পক্ষপাতী, এ বিষয় উত্তরোত্তর এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে। তবে এই মাত্র বোধ হয় বালস্বভাব চৈতন্যের পরিণতবয়স্ক বৈষ্ণবদিগের সহিত বিশেষ আনুগত্য ছিল না; বিশেষতঃ বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার সমধিক সহানুভূতি ছিল এতাবৎ ধর্ম্মের উপর একান্তহৃদয়ে যত্ন ও আস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন না।

একদা একজন দিগ্বিজয়ী বহু দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী জয় করিয়া নবদ্বীপ আগমন করিলেন। চৈতন্য এতাবৎ শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, এ ব্যক্তি নিতান্ত সাংসারিক জ্ঞানশূন্য অন্যথা দিগ্বিজয় করিতে নবদ্বীপ আসিবে কেন। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ এক্ষণে ইহাকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বস্বাপহরণ* করিবে। চৈতন্য এই চিন্তায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। এবং একদা সশিষ্যে গঙ্গাতীরে বসিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহার

* পূর্ব্বকালে দিগ্বিজয়িগণ প্রতিশ্রুত হইত, পরাভূত হইলে সর্ব্বস্ব দিব।

নাম ও বিদ্যাবত্তা পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দর্শনমাত্র সাদর সম্ভাষণে বসিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষণেক পরে চৈতন্য দিগ্বিজয়ীকে গঙ্গার একটি স্তব পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। দিগ্বিজয়ী গঙ্গার স্তবণ† পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, চৈতন্য তাঁহার ব্যাখ্যায় দোষারোপ করিলেন। দিগ্বিজয়ী চৈতন্যের আপত্তির যাথার্থ্যানুভব করিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। এইরূপে যত প্রস্তাব উপস্থিত হইল দিগ্বিজয়ী চৈতন্যের নিকট পরাভূত হইয়া হতবুদ্ধি হইলেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ হাসিতে উদ্যত হইলে, চৈতন্য ইঙ্গিতে নিবারণ করিলেন। কোমলহৃদয় চৈতন্য দিগ্বিজয়ীকে মনঃক্ষুণ্ণ দেখিয়া যারপরনাই অনুতপ্ত হইলেন এবং নানারূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রফুল্লচিত্ত করিলেন। দিগ্বিজয়ীকে জয় করিয়া চৈতন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে বিখ্যাত হইলেন। অনেক পণ্ডিত তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করিতে আসিয়া পরাভূত হইলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ বলেন চৈতন্য সকল পণ্ডিতকে জয় করিলেন। আমরা এ বাক্যে বিশ্বাস করি না, যেহেতু তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে অধিকার রঘুনাথ শিরোমণির তুল্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের তুল্য থাকার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে তিনি যেরূপ ধর্ম্মবিষয়ে একাধিপত্য করিয়াছেন উপরোক্ত মহাপুরুষদ্বয়ও দর্শন ও স্মৃতিতে তদ্রূপ করিয়াছিলেন।

চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে, দিগ্বিজয়ী পরাভূত হইয়া একদিন নিশিযোগে স্বপ্ন দেখিলেন, বাগ্‌দেবী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন তুমি যাহার নিকট পরাজিত হইয়াছ সে মনুষ্য নহে, **অখিলনাথ**। বিপ্রবর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চৈতন্যের নিকট আসিয়া গলবস্ত্রে নানারূপ স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। একথা সত্য হউক বা না হউক দিগ্বিজয়ী গৌড়, তিরহুত, দিল্লী, কাশী, গুজরাট, লাহোর, কাঞ্চিপুরী, হেলঙ্গ, তৈলঙ্গ, উড্র প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতসমাজ জয় করিয়া যে একজন বালকের নিকট পরাভূত হইলেন, তাহাকে অলোকসামান্য জ্ঞান করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? চৈতন্য দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন, বৃথা বিদ্যাবলে মোক্ষ হইবে না, তুমি যাবজ্জীবন কৃষ্ণের চরণ সেবা কর।

যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি মনোবৃত্তি রয়॥

---

† চৈতন্যচরিতামৃত ১ম খণ্ড।

চৈতন্য মঙ্গল।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্ম্মভাবের অঙ্কুর

বালকের কোমল মন আর্দ্র মৃত্তিকাবৎ, যেরূপ ইচ্ছা গঠিত হইতে পারে। যাহা দেখে তাহারই অনুকরণ করে—ভাব সংসর্গগুণে তাহারই হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। বহুদর্শন নাই। জ্ঞান ও চিন্তার বিষয় অতি অল্প। পক্ষান্তরে মন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। বহুবিষয়াভাবে এক বিষয় লইয়াও সর্ব্বদা আন্দোলিত হয়। বালকের বুদ্ধিবৃত্তি নৈসর্গিক অবস্থায় অবস্থিত, পরিমার্জ্জিত নহে। বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত না হইলে, প্রায় কার্য্য করিতে পারে না। সংসারে কে না দেখিয়াছেন মার্জ্জিতবুদ্ধির লোক ব্যতীত অন্যে বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ পরিচালন করে না, কিন্তু কল্পনা সেই অভাব পূরণ করে। এইজন্যই অপরিণতবয়স্ক বালক কল্পনাপরায়ণ। ভাব সংসর্গগুণে যাহা মনোমধ্যে বিদ্ধ হয় কল্পনা তাহা লইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করে। নানারূপ চিত্র বিচিত্র প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। কতবার নির্জ্জন প্রান্তরের হরিৎবর্ণ শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে, নিদাঘসন্তপ্ত শরীরে সায়ংকালীন সমীরণ সেবন করিতে করিতে, কল্পনা তাহাতে কত সুখের চিত্র আঁকে। কতবার নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া নদীর মধুমাখা সঙ্গীত রব শ্রবণ করিতে করিতে কল্পনা তাহাতে কত দূরাগত সুখরব শুনিতে পায়। কত বার গভীর রজনীতে নিদ্রিত হইলে, কল্পনা কত মনোহর চিত্র দেখিতে পায়। কালে যুবক এই বিষয়ে একেবারে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়া উঠেন। নিষ্ঠুর বিরুদ্ধাভিজ্ঞান ইহার অলীকতা প্রত্যক্ষ প্রমাণ না করিয়া দিলে, কদাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। যখন সেই কল্পনা পারলৌকিক সুখ সহ যুক্ত হয়, তখন মনুষ্য কদাপি তদনুসরণ জীবদ্দশাতে ত্যাগ করিতে পারে না, যেহেতু তাহার সত্য মিথ্যা এজীবনে প্রত্যক্ষ হয় না। এই জন্যই ধর্ম্মানুসরণকারীদিগের ন্যায় অন্য পথাবলম্বী তাদৃশ বদ্ধপরিকর হয় না। কলম্বস প্রথম যাত্রায় হয়ত পশ্চিম প্রদেশে বৃহৎ দ্বীপ আবিষ্কারের ভাব ত্যাগ করিতে পারিতেন কিন্তু মার্টিন লুথর জীবন থাকিতে পোপের বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। চৈতন্যের কল্পনা ধর্ম্মসহ যুক্ত হওয়ায় অবিকল ইহাই ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বক্ল * বলেন "আমার কার্য্যের জন্য আমা অপেক্ষা আমি যে সমাজে বাস করি সেই সমাজ অধিক পরিমাণে দায়ী।" বস্তুতঃ যে জন্য ইংলণ্ডীয়গণ স্বাধীনতাপ্রিয়, বারাঙ্গণাত্মজা অলীক হাস্যকৌতুকপ্রিয় সর্ব্বদেশীয় কামিনীবৃন্দ বস্ত্রালঙ্কারপ্রিয়, কামরূপবাসী শক্তিভক্ত, সেইজন্যই যেমন মিলের

---

* Buckle's History of Civilisation, Vol. I.

তনয় জন্ মিল দর্শনাসক্ত এবং জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের তনয় বিশ্বরূপের কনিষ্ঠ পরম বিষ্ণুভক্ত ও সংসারে গতরাগ। শৈশবে পিতার ও সহোদরের ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া চৈতন্য অবশ্যই মনে করিয়াছিলেন, ধর্ম্মই মনুষ্যজীবনের সার, ইহলোকের অকিঞ্চিৎকর ভোগ সুখাপেক্ষা অশেষগুণে প্রার্থনীয়। ধর্ম্মজনিত সুখ নিত্য আর বিলাসসুখ অনিত্য। বিশেষতঃ যখন দেখিলেন, ধর্ম্মের জন্য জ্যেষ্ঠ ইহলোকের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জনকজননী ত্যাগ করিয়া, সংসারের বিলাসবাসনা ভোগ ত্যাগ করিয়া, সংসারের খ্যাতি প্রতিপত্তির অভিলাষ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস করিয়াছেন, তখন তাঁহার মন ধর্ম্মচিন্তায় অবশ্যই বিচলিত হইয়াছিল। যদিও জনকজননীর অপত্য-বিরহজনিত অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন এবং তাহার কারণ ধর্ম্মের উপর কথঞ্চিৎ গতরাগ হইয়াছিলেন, তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে, অগ্রজের সন্ন্যাস তাঁহার মনে সংসারের ভোগবাসনা সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিবার বীজ বপন করিয়াছিল। তবে তাহা দীর্ঘকালে অঙ্কুরিত হইয়া পুষ্ট হয়।

চৈতন্য পিতা মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমি চিরদিন আপনাদিগের নিকট থাকিয়া চরণ সেবা করিব।"

এই সকল ঘটনা বশতঃ চৈতন্য বাল্যকাল হইতেই ক্রমশঃ ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া আসিতেছিলেন। কেবল প্রথম যৌবনে জ্ঞানচর্চ্চায় মনোভিনিবেশ করিয়া তৎপ্রতি অযথা আসক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর মাত্র। এই সময়ে একদিন শিষ্যবর্গ সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে পথে শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীবাস তাঁহাকে বৈষ্ণববিদ্বেষী বলিয়া জানিতেন; তাঁহার মুখদর্শন পাপ বিবেচনা করিয়া সহসা অন্যদিকে গমন করিলেন। চৈতন্য শিষ্যদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্যগণ বলিল "শ্রীবাস কার্য্যান্তরে ঐ পথে গিয়াছে।" চৈতন্য বলিলেন "তাহা নহে, আমাকে পাষণ্ড বিবেচনা করিয়া শ্রীবাস আমার মুখদর্শন করিবে না, এজন্য অন্য পথে গেল।"

এই ঘটনা চৈতন্যকে প্রথমতঃ ধর্ম্মের দিকে লইয়া যায়। বস্তুতঃ একটী ঘটনা বা একটী উপদেশ সময়ে মনুষ্যের মনে যুগান্তর উপস্থিত করে। সময়ে একটী সামান্য ঘটনা দেখিয়া যেমন কোন বিষয় মনে বিদ্ধ হয়, সহস্র গ্রন্থ অধ্যয়ন অথবা সহস্র উপদেশ শ্রবণ করিলে তাহা হয় না। ঘোর অবিশ্বাসী নাস্তিকও হঠাৎ কোন বিপদে পতিত হইয়া অথবা প্রিয়জন হারাইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে। চৈতন্যের জীবনেও শ্রীবাসের এই আচরণ এইরূপ ফলোৎপাদন করিয়াছিল। চৈতন্য তখনই হৃদয়ের সহিত বলিলেন।—

এমন বৈষ্ণব মুই হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন ভাই সব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুই সর্ব্ব বিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া যে যে সকলে পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায়॥

এই সময়ে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বৈষ্ণবগণ নাম সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাষণ্ডেরা তাঁহাদিগকে যারপরনাই উপহাস করিতে আরম্ভ করিল। বৈষ্ণবগণ মহাদুঃখিত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট সমুদয় বর্ণন করিলেন। অদ্বৈত বলিলেন শীঘ্রই আমাদিগের দল পুষ্ট হইয়া দুঃখনিবৃত্তি হইবে। ইহার কিছুদিন পরে, ঈশ্বরপুরী নামক জনৈক মহাপণ্ডিত ও ভাগবত শান্তিপুরে অদ্বৈতের আলয়ে আগমন করিলেন। বৈষ্ণবগণ ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। ঈশ্বরপুরী কিয়দ্দিবস শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া নবদ্বীপ গমন করিলেন এবং তথায় গোপীনাথ আচার্য্যের আলয়ে অবস্থান করিলেন। চৈতন্যদেব ঈশ্বর-পুরীর সহিত আনুগত্য করিয়া প্রতিদিন ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী চৈতন্যের অসাধারণ রূপলাবণ্য, অসামান্য প্রতিভা ও আন্তরিক ঈশ্বরনিষ্ঠা দেখিয়া যারপরনাই প্রীত হইলেন।

একদা ভারতী মহাশয় কৃষ্ণের চরিত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া চৈতন্যকে দোষগুণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চৈতন্য বলিলেন "ভক্ত যাহা বলে ভগবান্ তাহাতেই সন্তুষ্ট অতএব গ্রন্থের দোষগুণ বলা নিরর্থক।"

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্ত সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

ভক্তি মাহাত্ম্য প্রতিপাদক চৈতন্যের এই প্রথম বচন। প্রাচীন আর্য্যদিগের শাস্ত্রাদি কর্ম্ম ও জ্ঞান কাণ্ডপ্রধান, যদিও ভাগবত প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে ভক্তি মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি বৈষ্ণবদিগের* বিশেষতঃ চৈতন্যের পূর্ব্বে তাহা প্রায়ই কেহ প্রকৃষ্টরূপে জীবনে পরিণত করেন নাই।

অদ্যাপি চৈতন্য অধ্যয়ন অধ্যাপন ও বিচার এই ত্রিবিধ পণ্ডিতের কার্য্য পরিহার করেন নাই। মুকুন্দ কবিরাজ, গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সহিত ক্রমে চৈতন্যের পরিচয় ও বিচার হইল। সকলই তাঁহার অলোকসামান্য বিদ্যা-বুদ্ধিতে মোহিত হইলেন।

---

* রামানুজ আচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তিপ্রধান, কিন্তু চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বে ভক্তি সাধারণ্যে পরিগৃহীত হয় নাই

একদা প্রদোষকালে চৈতন্যদেব গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া শিষ্যদিগকে শাস্ত্রোপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে কয়েকজন বৈষ্ণব তথায় সমাগত হইয়া ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইলেন এবং এরূপ মহাপুরুষ কৃষ্ণভক্তি বিরহিত এজন্য নানারূপ মনোদুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন চৈতন্যের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—

——হের শুন নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যায় কি কাজ কৃষ্ণ ভজহ তুরিত॥
পড়ে কেন লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥

চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন—

তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণ ভজিবার

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

এই সময়ে চৈতন্যের জীবন নূতন বেশ ধারণ করিয়াছে এবং যে ভক্তিভাবে সমুদয় ভারত মোহিত হইয়াছিল তাহার অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। একদা চৈতন্য ভক্তিরসে আর্দ্রমনা হইয়া গৃহে রহিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার দশা * উপস্থিত হইল। তিনি ক্ষণ নৃত্য, হুঙ্কার, তর্জ্জন, গর্জ্জন ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আত্মীয় বন্ধু বায়ুরোগ বিবেচনা করিয়া মস্তিষ্কে নারায়ণ তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তথায় আসিয়া বলিলেন, এ বায়ুরোগ নহে প্রেম-বিকার। ক্ষণেক পরে চৈতন্য প্রকৃতিস্থ হইলেন। চৈতন্যের এই প্রথম দশা।

দশা ভঙ্গ হইলে চৈতন্য নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া নবদ্বীপের প্রত্যেক ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিতে গেলেন। নবদ্বীপের আপামর সাধারণ সকলেরই আলয়ে ভ্রমণ করিলেন। এইরূপ শিষ্টতা ও অলোকসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি ও রূপলাবণ্যে ক্রমে চৈতন্য আবালবৃদ্ধবণিতার প্রতিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন। হিন্দু মুসলমান স্ত্রী পুরুষ সকলেই চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

নবধর্ম্মসংস্থাপক ও প্রতিষ্ঠাকারকদিগের জীবনী সম্বন্ধে এইরূপই হইয়া থাকে। নানক, মহম্মদ প্রভৃতি সকলেই সাধারণ প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ বাক্যোচ্চারণ করিয়া উৎপীড়িত হওয়ার পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের যারপরনাই প্রিয় ছিলেন। বস্তুতঃ সকল ধর্ম্মের মূল এক। সত্যকথন, ন্যায়ব্যবহার ও পরোপকার সকল ধর্ম্মের মূল কথা, সুতরাং নিতান্ত বিরুদ্ধাচরণ (যথা ইদানীন্তন হিন্দুর পক্ষে গো মাংস ভক্ষণ) না দেখিলে, কেন তাদৃশ সদ্‌গুণশালী মহাপুরুষের প্রশংসা করিবে না।

* প্রেম ভক্তিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হওয়া।

এই সময়ে চৈতন্য সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু তত বাহুল্যের সহিত নহে। অদ্যাপি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনই জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। প্রধান পণ্ডিতদিগের ন্যায় চৈতন্য গৃহীদিগের নিকট নানারূপ ভেট ও বিদায় পাইতে লাগিলেন, তাহাতে প্রচুর অর্থাগম হইতে আরম্ভ হইল। এদিকে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইল। নানা আত্মীয় বন্ধু ও অতিথিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং রন্ধন করিয়া সকলকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। এইরূপ গার্হস্থাশ্রমই গৃহী বৈষ্ণবদিগের আদর্শ। বৈষ্ণব মাত্রেই অতিথিপরায়ণ, আখড়াধারিগণ ভিক্ষা করিয়া অতিথি সৎকার করেন। চৈতন্য বলেন,

তৃণানি ভূমি রুদকং বাক্‌চতুর্থীচ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গৃহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

* * *

সত্যবাক্যে করিবেক করি পরিহার।
তথাপি অতিথি শূন্য না হয় তাহার॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার* সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব লিখিবার সময়ে আমরা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে আমরা পুনর্ব্বার এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনেক দিন, আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে নিম্নপরিচিত গ্রন্থখানির সাহায্যে প্রোক্ত বিষয়ের পুনরালোচনায় সাহসিক হইলাম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত এই গ্রন্থখানি, ইউরোপে প্রচারিত হইলে, একটা কোলাহল বাঁধিয়া উঠিত; বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত; এবং অন্ততঃ কিছুকাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শুনা যাইত। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুরদৃষ্টক্রমে তিনি বাঙ্গালি, বাঙ্গালা দেশে বসিয়া, বাঙ্গালা ভাষায়, এই পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালি সমালোচকের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রশংসা দূরে থাক্—কিছু সুসভ্য গালি গালাজ খান নাই, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য।

বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ; বাঙ্গালি লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না। আমরা সেই সকল বিষয় বা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সম্বন্ধনির্ণয়, কেবল ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্তবিষয়ক নহে। কায়স্থাদি শূদ্রগণ ও বৈদ্যগণের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ বিশেষ পর্য্যালোচনীয়, অন্য জাতির বিবরণ তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র।

আমরা "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে উত্তর ভারতে অন্যান্যাংশে যত কাল ব্রাহ্মণের

---

* সম্বন্ধ নির্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

অধিকার এদেশে ততকাল নহে—সে অধিকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহুশত বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এমত বিবেচনা না করিবার অনেক কারণ আছে।

মনুসংহিতাদি-প্রদত্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিচারে, ইহাই স্থির হইয়াছে যে আর্য্যগণ প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার ও অবস্থান করিয়া কাল-সাহায্যে ক্রমে পূর্ব্বদিকে আগমন করেন। সর্ব্বশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আগমন কিরূপ, তাহার একটু বিচার আবশ্যক হইয়াছে।

প্রথমতঃ একজাতিকৃত অন্যজাতির দেশাধিকার দ্বিবিধ।

(১) আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকা ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইংরেজগণ আমেরিকা কেবল অধিকৃত করেন, এমত নহে, তথায় বাস করিয়াছিলেন। ইংরেজসম্ভূত বংশেরাই এখন আমেরিকার অধিবাসী; আমেরিকা এখন তাঁহাদিগের দেশ।

পুনশ্চ, সাক্ষণ জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল। তাহারাও ইংলণ্ডের অধিবাসী হইয়াছিল।

আর্য্যেরাও পশ্চিমাঞ্চল—আমরা যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বলি—বিজিত করিয়া তথাকার অধিবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজাধিকৃত আমেরিকা ও সাক্ষণাধিকৃত ইংলণ্ডের সঙ্গে আর্য্যাধিকৃত পশ্চিমভারতের প্রভেদ এই যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসিগণ জেতৃগণ কর্ত্তৃক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আর্য্যবিজিত আদিম অধিবাসিগণ জেতৃ-বশীভূত হইয়া শূদ্র নাম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের সমাজ-ভুক্ত হইয়া রহিল।

(২) পক্ষান্তরে, ইংরেজেরা ভারত অধিকৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের অধিবাসী নহেন। কতকগুলি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা এদেশে বিদেশী। ভারতবর্ষ ইংরেজের রাজ্য কিন্তু ইংরেজের বাসভূমি নহে।

সেইরূপ রোমকবিজিত রাষ্ট্রনিচয় রোমকদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু রোমকদিগের বাসভূমি নহে। গল, আফ্রিকা, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ তত্তদ্দেশীয় প্রাচীন অধিবাসিগণেরই বাসস্থল রহিল; অনেক রোমক তত্তদ্দেশে বাস করিলেন বটে, কিন্তু রোমকেরা তথাকার অধিবাসী হইলেন না।

অতএব আমেরিকাকে ইংরেজভূমি, উত্তর ভারতকে আর্য্যভূমি বলা যাইতে পারে। আধুনিক ভারতকে ইংরেজভূমি বলা যাইতে পারে না। মিশরাদিকে রোমকভূমি বলা যাইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য বঙ্গদেশকে আর্য্যভূমি বলা

যাইতে পারে? মগধ, মথুরা, কাশী প্রভৃতি যেরূপ আর্য্যগণের বাসস্থান, বঙ্গদেশ কি তাই?

ভারতীয় আর্য্যজাতি চতুর্ব্বর্ণ। যেখানে আর্য্যগণ অধিবাসী হইয়াছেন, সেইখানেই চতুর্ব্বর্ণের সহিত তাঁহারা বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই।

ক্ষত্রিয় দুইচারি ঘর, যাহা স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাঁহারা ঐতিহাসিক কালে, অধিকাংশই মুসলমানদিগের সময়ে আসিয়াছেন। দুই একটী রাজবংশ অতি প্রাচীনকালে আসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রাজাদিগের কথা আমরা বলিতেছি না, সামাজিক লোকদিগের কথা বলিতেছি।

বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ। মুর্শিদাবাদে যখন মুসলমান রাজধানী, তখন জনকয়েক বৈশ্য আসিয়া তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশ আছে। এইরূপ অন্যত্রও অল্পসংখ্যক বৈশ্যগণ আছেন—তাঁহারা আধুনিক কালে আসিয়াছেন। সুবর্ণবণিক্‌দিগকে বৈশ্য বলিলেও—বৈশ্যেরা সংখ্যায় অল্প। বাণিজ্য স্থানেই কতকগুলি সুবর্ণবণিক আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত করিবার কারণ নাই।

যখন আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। অদ্যাপি সেই আদিম ব্রাহ্মণদিগের সন্ততিগণকে সপ্তশতী বলে। আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে ৯৯৯ সম্বতে আনয়ন করেন। সে খৃঃ ৯৪২ শাল। অতএব দেখা যাইতেছে যে দশম শতাব্দীতে গৌড় রাজ্যে সাড়ে সাত শত ঘরের অধিক ব্রাহ্মণ ছিল না। এ সংখ্যা অতি অল্প; এক্ষণে অতি সামান্য পল্লীগ্রামে ইহার অধিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। এক্ষণে যে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাস করেন, তাঁহারা এই দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনটি আর্য্যজাতি। ইহারাই উপবীত ধারণ করে। শূদ্র অনার্য্য জাতি। যেখানে দেখিতেছি, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় আইসে নাই, বৈশ্যগণ কদাচিৎ বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণও একাদশ শতাব্দীতে অতি বিরল, তখন বলা যাইতে পারে যে এই বাঙ্গালা, নয়শত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভূমি ছিল না, অনার্য্যভূমি ছিল, এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সম্বন্ধ বাঙ্গালার সহিত আর্য্যদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল।

এক্ষণে দেখা যাউক, কতকাল হইল বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তজ্জন্য আদিশূর ও বল্লালসেনে যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহা দেখা আবশ্যক।

আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তাঁহাদিগের বংশসম্ভূত কয়েক ব্যক্তিকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে বল্লালসেন, আদিশূরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা। কিন্তু এ কিম্বদন্তী যে অমূলক, এবং সত্যের বিরোধী, ইহা বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্ব্বেই সপ্রমাণীকৃত করিয়াছেন। এক্ষণে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাহা পুনঃ প্রমাণিত করিয়াছেন। ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন শ্রীহর্ষ। তিনি মুখোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। বল্লালসেন তাঁহার বংশে উৎসাহকে কৌলীন্য প্রদান করেন। উৎসাহ শ্রীহর্ষ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ। * আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে দক্ষ এক জন। দক্ষ চট্টোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। তাঁহার বংশোদ্ভূত বহুরূপকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। বহুরূপ দক্ষ হইতে অষ্টম পুরুষ।† ভট্টনারায়ণ ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন। বল্লালসেন তদ্বংশীয় মহেশ্বরকে কৌলীন্য প্রদান করেন। মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ। ইত্যাদি।

আদিশূর যাঁহাদিগকে কান্যকুব্জ হইতে আনিয়াছিলেন, বল্লাল তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা হইলে কখন তাঁহাদিগের অষ্টম, দশম বা ত্রয়োদশ পুরুষ দেখিতে পাইতেন না। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্র হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। ইহাই সম্ভব।

ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে যে ৯৯৯ অব্দে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন যে, এই অব্দ শকাব্দ নহে, সম্বৎ; কিন্তু সম্বতের সঙ্গে খৃষ্টাব্দের হিসাব করিতে গিয়া তিনি একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লেখেন—

"আদিশূর খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন; এবং খৃঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১০৫৬ অব্দে পুত্রেষ্টি যাগ করেন।

প্রমাণ, এক্ষণে সম্বৎ——১৯৩২
ঐ —খৃষ্টীয় শক——১৮৭৫

——————

সম্বতের সহিত খৃঃ অন্তর————৫৭

* (১) শ্রীহর্ষ, (২) শ্রীগর্ভ, (৩) শ্রীনিবাস, (৪) আরব, (৫) ত্রিবিক্রম, (৬) কাক, (৭) ধাঁধু, (৮) জলাশয়, (৯) বানেশ্বর, (১০) গুহ, (১১) মাধব, (১২) কোলাহল, (১৩) উৎসাহ।

† (১) দক্ষ, (২) সুসেন, (৩) মহাদেব, (৪) হলধর, (৫) কৃষ্ণদেব, (৬) বরাহ, (৭) শ্রীধর, (৮) বহুরূপ।

এখন দেখা যাইতেছে যে, ৯৯৯ সংবৎ অর্থাৎ যে বর্ষে পুত্রেষ্টি যাগ হয় সে বৎসর খৃ ১০৫৬।"—১৬১ পৃষ্ঠা।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের ভুল এই যে, সংবতে ৫৭ বৎসর যোগ করিয়া খৃষ্টাব্দ বাহির করিতে হয় না; কেননা খৃঃঅব্দ হইতে সংবৎ পূর্ব্বগামী, সংবৎ হইতে ৫৭ বৎসর বাদ দিয়া খৃঃঅব্দ পাইতে হইবে। যোগ করিলে, এখন ১৯৩২+৫৭=১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ হয়। বাদ দিলেই ১৯৩২—৫৭=১৮৭৫ খৃঃঅব্দ পাওয়া যায়। সেইরূপ ৯৯৯ সংবতে ৯৯৯—৫৭=৯৪২ খৃষ্টাব্দ। এই ভুল বিদ্যানিধি মহাশয় স্থানান্তরে সংশোধিতও করিয়াছেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন তাঁহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে "সামান্যাকারে অব্দ শব্দ লিখিত আছে। সুতরাং ঐ অব্দ পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাইতে পারে।" বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, উহা সংবৎ ধরিতে হইবে, কিন্তু তিনি এইরূপ অভিপ্রায় করার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তত পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত না হইলেও, কথাটি ন্যায্য বোধ হয়। এস্থলে, আমাদিগকে অভ্রান্ত পুরাণ-তত্ত্ববিৎ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিচার নির্দ্দোষ হইতে পারে।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময় প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে বল্লালসেন, দানসাগর নামক গ্রন্থের ১৯১৯শকে রচনা সমাপ্ত করেন। ১০১৯ শকাব্দ ১০৯৭ খৃঃঅব্দ। তাদৃশ বৃহদ্‌গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাগিয়া থাকিবে। অতএব বল্লালসেন তাহার পূর্ব্বে অনেক বৎসর হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা করা যায়। আইন আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানা যায় বল্লালসেন ১০৬৬ খৃঃঅব্দে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরীর কথা ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় ঐক্য দেখা যাইতেছে।

আদিশূরের সময়, রাজেন্দ্রলাল বাবু নিজবংশের পর্য্যায় হিসাব করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার গণনায় ৯৬৪ হইতে ১০০০খৃষ্টাব্দ আদিশূরের সময় নিরূপিত হইয়াছে। এ গণনা ক্ষিতীশবংশাবলীর ৯৯৯ সঙ্গে ঠিক মিলিতেছে না। অন্ততঃ ২২ বৎসরের প্রভেদ হইতেছে; কেননা ৯৯৯ সংবতে ৯৪২ খৃষ্টাব্দ। এ প্রভেদ অতি অল্প। এদিকে শকাব্দ ধরিলে ৯৯৯ শকাব্দে ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ পাই। তখন, বল্লাল সিংহাসনারূঢ় ইহা উপরে দেখা গিয়াছে। সুতরাং শক নহে সংবৎ।

অতএব আদিশূরের পুত্রেষ্টি যাগার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন হইতে, বল্লালের গ্রন্থ সমাপন পর্য্যন্ত ১৫৫ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। উপরে বলা হইয়াছে যে

বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ; তাহা হইলে আদিশূর হইতে বল্লাল নবম পুরুষ। আদিশূরের সমকালবর্ত্তী দক্ষ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্ত্তী বহুরূপ অষ্টম পুরুষ। আদিশূরের সমকালবর্ত্তী বেদগর্ভ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্ত্তী শিশু ৮ম পুরুষ; তদ্রূপ ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর ১০ম পুরুষ; এবং শ্রীহর্ষ হইতে উৎসাহ ১৩শ পুরুষ। কেবল ছান্দড় হইতে কানু ৪র্থ পুরুষ। গড়ে আদিশূর হইতে বল্লাল পর্য্যন্ত নয় পুরুষই পাওয়া যায়।

প্রচলিত রীতি এই যে ভারতবর্ষীয় ঐতিহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৮ বৎসর পড়তা করা হইয়া থাকে। তাহা হইলে নয় পুরুষে ১৬২ বৎসর পাওয়া যায়। আমরা অন্য হিসাবে বল্লাল ও আদিশূরে ১৫৫ বৎসরের প্রভেদ পাইয়াছি। এ গণনার সঙ্গে সে গণনা মিলিতেছে। অতএব এ ফল গ্রাহ্য। বল্লাল আদিশূরের সার্দ্ধেক শতাব্দী পরগামী।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায় যে, যখন বল্লাল কৌলীন্য সংস্থাপন করেন, তখন আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের বংশে একাদশ শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। দেড়শত বৎসরে ঈদৃশ বংশবৃদ্ধি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি বিবেচনা করা যায় যে তৎকালে বহুবিবাহ প্রথা বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ইহা বিস্ময়কর বোধ হইবে না। বহু বিবাহ যে বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল, তাহা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পুত্রসংখ্যার পরিচয় লইলেই বিশেষ প্রকারে বুঝা যাইবে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের কৃত মিশ্র গ্রন্থের বচনে দেখা যায় যে, ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র, দক্ষের ১৬ পুত্র, বেদগর্ভের ১২ পুত্র, শ্রীহর্ষের ৪ পুত্র, এবং ছান্দড়ের ৮ পুত্র। মোটে ৫ পাঁচ জনে বাঙ্গালায় ৫৬ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। এই ৫৬ পুত্র ৫৬টি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন, সেই ৫৬ গ্রাম হইতে রাঢ়ীয়দিগের ৫৬টি গাঁই। যখন দেখা যাইতেছে যে একপুরুষ মধ্যে, ৫ ঘর হইতে ৫৬ ঘর অর্থাৎ ১১গুণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তখন নয়পুরুষের শতগুণ বৃদ্ধি নিতান্ত সম্ভব। বরং অধিক, কেননা পঞ্চ ব্রাহ্মণ অধিক বয়সে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা বাঙ্গালায় সুব্রাহ্মণ বৃদ্ধি করিবার তাদৃশ সময় পান নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের বংশাবলী কৈশোর হইতে পিতৃত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা সহজে অনুমেয়।

সুবিখ্যাত ফুলের মুখটি নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় কত বিস্তৃত, তাহা রাঢ়ীয় কুলীনগণ জানেন। এক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামেও পাঁচ সাতঘর পাওয়া যায়; কোন কোন বড় গ্রামে, তাঁহাদিগের সংখ্যা অগণ্য। যে বলিবে

যে, সমগ্র বাঙ্গালায় একাদশ শত ঘর মাত্র নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তান বাস করে, সে অন্যায় বলিবে না। কিন্তু কয় পুরুষ মধ্যে এই বংশবৃদ্ধি হইয়াছে? বহুসংখ্যক নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের পরিচয়, বন্ধুত্ব এবং কুটুম্বিতা আছে। তাঁহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ সপ্তম, কেহ অষ্টম, কেহ নবম পুরুষ। যদি সাত আট পুরুষে, এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি, এক জন হইতে হইতে পারে, তবে দেড় শত বৎসরে ৫জন হইতে একাদশ শত ঘর হওয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা নহে।

এক্ষণে বোধ হয়, চারিটি বিষয় বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্থির হইতেছে।

১ম। আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনিবার পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত ঘর ব্যতীত ব্রাহ্মণ ছিল না।

২য়। ৯৪২ খৃঃ অব্দে আদিশূর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন।

৩য়। তাহার দেড় শত বৎসর পরে বল্লালসেন ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য প্রচলিত করেন।

৪র্থ। এ দেড় শত বৎসরে ঐ পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণে এগার শত ঘর হইয়াছিল।

যদি দেড়শত বৎসরে পাঁচজন ব্রাহ্মণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, তবে কত কালে বঙ্গদেশের আদিম ব্রাহ্মণগণের বংশ সাড়ে সাত শত ঘর হইয়াছিল।

যদি, সপ্তশতীদিগের আদি পুরুষও পাঁচজন ছিলেন এবং যদি তাঁহারাও কান্যকুব্জীয়দিগের ন্যায় বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা বিবেচনা করা যায় তবে বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণদিগের আগমন কাল হইতে শত বৎসর মধ্যে, তাঁহাদের বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের জন্ম অসম্ভব নহে।

সপ্তশতীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা অনুমানে দোষ হয় না। কেন না বহুবিবাহ তৎকালে বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে। তবে এমন হইতে পারে যে কান্যকুব্জীয়গণ বিশেষ সুব্রাহ্মণ বলিয়া সপ্তশতীগণও তাঁহাদিগকে কন্যাদানে উৎসুক হইতেন এই জন্য তাঁহারা অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; সপ্তশতীগণের পূর্ব্বপুরুষের তত বিবাহ করিবার কোন কারণ ছিল না। তেমন এদিকে পাঁচজন মাত্র যে তাঁহাদিগের আদিপুরুষ ইহা অসম্ভব। বরং ব্রাহ্মণ আসিতে একবার আরম্ভ হইলে ক্রমে ক্রমে একত্রে বা একে একে, রাজগণের প্রয়োজনানুসারে, বা রাজপ্রসাদ লাভাকাঙ্ক্ষায় অধিকসংখ্যক আসাই সম্ভব।

অতএব, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে দুই এক শত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম বাস, বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্যভূমি ছিল। পূর্ব্বে কদাচিৎ কোন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে যদি আসিয়া বাস করিয়া থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে নহে। অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসমাজ ছিল না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আদিশূরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ দেখিতেছ, তাহার কারণ এমত নহে যে, ব্রাহ্মণেরা স্বল্পদিন মাত্র বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যই ব্রাহ্মণ সংখ্যার অল্পতার কারণ। কিন্তু বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যেরূপ প্রাবল্য ছিল, মগধ কান্যকুব্জাদি দেশেও তদ্রূপ বা তদধিক ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু যদি বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ সংখ্যা স্বল্পীভূত হইয়াছিল, তবে সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই কারণে ব্রাহ্মণবংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে। কোন কোন আপত্তিকারী তাহাও স্বীকার করিতে পারেন। বলিতে পারেন যে, তখন সমস্ত ভারতেই অল্প ব্রাহ্মণ ছিল—এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, যদি পূর্ব্ব হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তবে আদিশূরের পূর্ব্বকালজাত কোন গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? বরং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তথায় ব্রাহ্মণের বাস না থাকারই নিদর্শন পাওয়া যায় কেন? † আমরা পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, অষ্টম শতাব্দীর বা আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বঙ্গবাসী গ্রন্থকারের নাম তাঁহারা স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন? কুল্লুকভট্ট, জয়দেব, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, হলায়ুধ, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি যাঁহার নাম করিবেন সকলেই আদিশূরের পরবর্ত্তী। ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ তাঁহার সমকালিক। প্রাচীন আর্য্যজাতি যেখানে বাস করিয়াছেন, সেই খানেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের চিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তখনকার প্রণীত পুস্তকাদিও নাই।

আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বেও আর্য্য রাজকুল বাঙ্গালায় ছিল, এবং তাঁহাদিগের আনুষঙ্গিক ব্রাহ্মণও থাকিতে পারেন। সেরূপ অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ আমাদিগের আলোচনার বিষয় নহে। সেরূপ সকল জাতিই সকল দেশে থাকে। কালিফর্ণিয়াতেও অনেক চীন আছে।

আমরা যে কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্ন পাইয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে অনেকেই মনে করিবেন যে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালির বড় লাঘব হইল।

---

† বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রথম প্রস্তাব দেখ।

আমরা আধুনিক বলিয়া বাঙ্গালিজাতির অগৌরব করা হইল। আমরা প্রাচীন জাতি বলিয়া আধুনিক ইংরেজদিগের সম্মুখে স্পর্দ্ধা করি—তা না হইয়া আমরাও আধুনিক হইলাম।

আমরা দেখিতেছি না যে অগৌরব কিছু হইল। আমরা সেই প্রাচীন আর্য্যজাতি সম্ভূতই রহিলাম—বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্য্য। বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আর্য্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎ কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই—আর্য্যকীর্ত্তিভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা সে কীর্ত্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী। সেই কীর্ত্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। দোবে, চোবে, পাঁড়ে, তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আর্য্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে।

আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে। আদিশূরের সময়ে মোটে সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। বল্লালের সময় সেই সাড়ে সাত শত ঘরের বংশ এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ একাদশ শত ঘর ছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এখনও যখন অতি অল্প সংখ্যক, তবে তখন যে আরও অল্প সংখ্যক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালের দেড় শত বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গ জয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্য্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অনুমেয়। তখনও তাঁহারা এদেশে ঔপনিবেশিক মাত্র। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহীকর্ত্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্য্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে।

তখনও বঙ্গীয় আর্য্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই। এখন সে সময় বোধ হয় উপস্থিত। বাহুবলে না হউক, বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালি অচিরে পৃথিবীমধ্যে যশস্বী হইবে, তাহার সময় আসিতেছে।

আমরা উপরে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কায়স্থগণ সম্বন্ধেও তাহা বর্ত্তে। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন কায়স্থগণ সৎশূদ্র, অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর নহে। আমাদিগের বিবেচনায় তাহারা বর্ণসঙ্কর বটে। তদ্বিষয়ে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সঙ্করতা হেতু কায়স্থগণ আর্য্যবংশসম্ভূত বটে। আদিশূরের সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থও কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে যেমন বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল, সেইরূপ কায়স্থও ছিল, কিন্তু অল্পসংখ্যক। এক্ষণে কায়স্থগণ বঙ্গদেশের অলঙ্কারস্বরূপ।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

(অমরনাথ বক্তা)

এ ভবের হাট হইতে, আমার এই মনিহারির দোকানখানি উঠাইতে হইল। লোক ঠকাইয়া—আপনি ঠকিয়া, কোন সুখ নাই। মনে করিয়াছিলাম, নানাবর্ণের সুশোভন কাচে, এ সাধের বিপণী সাজাইব—অমূল্য মণিমাণিক্য মনে করিয়া, খরিদদার বহুমূল্যে আমার সেই কাচ কিনিবে। কিনিবে না কেন? কিনিয়া বিনিময় দেয় কি? অসার কাচ লইয়া, অসার কাচ দেয়। অসার কথা—অসার স্তব—অসার তোষামোদ, অসার বন্ধুত্ব, অসার আমোদ,—খল হাসি, শঠ প্রবৃত্তি, নীচ আশয়, বিনিময়ে ইহাই দেয়। কাচের বিনিময়ে কাচ লইয়া, এতকালে আমার কি তৃপ্তি হইল? এ দগ্ধ হৃদয়ের কোন্ জ্বালা থামিল? এ অনন্ত, অনিবার্য্য পিপাসার কি শমতা হইল? এ হাট ভাঙ্গিব, এ ব্যবসা ছাড়িব—যিনি ছল জানেন না, কপট জানেন না, যাঁহার কাছে খল কপট চলে না, যাঁহার কাছে কাচ বিক্রয় হয়, যিনি বিনিময়ে খাঁটি সোনা ভিন্ন দেন না, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

প্রভো, তোমায় অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি? দর্শনে, বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃদ্‌পদ্মই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি এ মনিহারির দোকান ভাঙ্গিব—যিনি সকল খরিদদারের বড় খরিদদার, বিনামূল্যে সকলই তাঁহাকে বিক্রয় করিব।

তুমি নাই? না থাক, তোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং, তস্মৈ নমঃ বলিয়া, এ কলঙ্কলাঞ্ছিত দেহ

উৎসর্গ করিব। তুমি যাহা দিয়াছ, তুমি কি তাহা লইবে না? তুমি লইবে, নহিলে এ কলঙ্কের ভার আর কে পবিত্র করিবে?

প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল কে, তুমি না আমি? আমি যে অসৎ, অসার, দোষ আমার না তোমার? আমার এ মনিহারির দোকান সাজাইল কে, তুমি না আমি? যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যাবসা আর রাখিব না।

সুখ! তোমাকে সর্ব্বত্রে খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই—তবে আশায় কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে?

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জ্জন দিব। একবার ললিতলবঙ্গলতার মুখে হাসি দেখিয়া, এ সংসার হইতে যাইব।

আমি পরদিন শচীন্দ্রকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম শচীন্দ্র অধিকতর স্থির—অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম আমার উপর যে বিরক্তি, শচীন্দ্রের মন হইতে তাহা যায় নাই।

পরদিন পুনরপি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যহই তাঁহাকে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। শচীন্দ্রের দুর্ব্বলতা ও ক্লিষ্টভাব কমিল না; কিন্তু ক্রমে স্থৈর্য্য জন্মিতে লাগিল। প্রলাপ দূর হইল। ক্রমে শচীন্দ্র আপনার প্রকৃতিস্থ হইলেন।

রজনীর কথা একদিনও শচীন্দ্রের মুখে শুনি নাই। কিন্তু ইহা দেখিয়াছি যে, যেদিন হইতে রজনী আসিয়াছিল, সেইদিন হইতে তাঁহার পীড়া উপশমিত হইয়া আসিতেছিল। এক কথা লবঙ্গ আমাকে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে নাই, কি প্রকারে বলিবে, কেন না রজনী আমারই পত্নী বলিয়া পরিচিতা—কিন্তু আমার বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল যে শচীন্দ্র রজনীর প্রতি অনুরক্ত। এই অনুরাগের বিকৃতিতে তাঁহার বায়ুরোগ, অথবা বায়ুরোগের বিকারেই এই অনুরাগ।

একদিন, যখন আর কেহ শচীন্দ্রের কাছে ছিল না, তখন আমি ধীরে ধীরে বিনা আড়ম্বরে রজনীর কথা পড়িলাম। ক্রমে তাহার অন্ধতার কথা পড়িলাম, অন্ধের দুঃখের কথা বলিতে লাগিলাম, এই জগৎ-সংসারসুখ দর্শনে সে যে বঞ্চিত, প্রিয়জন দর্শনসুখে সে যে আজন্ম মৃত্যুপর্য্যন্ত বঞ্চিত, এই সকল কথা তাঁহার সাক্ষাতে বলিতে লাগিলাম। দেখিলাম শচীন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল।

অনুরাগ বটে।

তখন বলিলাম, "আপনি রজনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি সেইজন্যই একটি কথায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। রজনী একে বিধাতাকর্তৃক পীড়িতা, আবার আমাকর্তৃক আরও গুরুতর পীড়িতা হইয়াছে।"

শচীন্দ্র আমার প্রতি বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি যদি সমুদায় মনোযোগ পূর্ব্বক শুনেন তবেই আমি বলিতে প্রবৃত্ত হই।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "বলুন।"

আমি বলিলাম, "আমি অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপর। আমি আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য, তাহাকে আপনার স্ত্রী পরিচয়ে আপনার গৃহে রাখিয়া ছিলাম। রজনীর সম্মতিক্রমেই রাখিয়াছিলাম। সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেইজন্য আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করার সহায়তা করিতে সম্মত হইল। কিন্তু আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে, সে আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মতা হইয়া, আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।"

শ। তারপর বিবাহ হইল কি প্রকারে ?

আমি বলিলাম, "বিবাহ হয় নাই। রজনী আমার স্ত্রী নহে।"

শচীন্দ্র প্রথমে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, তাহার পর তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

আমি তখন শচীন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া কথা আরম্ভ করিলাম। যে প্রকারে রজনীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ, যে প্রকারে তাহাকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা বিবৃত করিলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্রও আমার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলেন। বলিলেন, "অপনি বলিলেন রজনী আপনাকর্তৃক পীড়িতা হইয়াছে। পীড়িতা নহে বিশেষ উপকৃতাই হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "পরে শুনুন।" তখন আমি অবশিষ্ট কথা বলিলাম। যে প্রকারে রজনীর উত্তরাধিকারিণীত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম, যে প্রকারে রজনীর সন্ধান পাইয়াছিলাম, যে প্রকারে তাহার বিষয় উদ্ধারের জন্য যত্ন করিয়াছিলাম, যে প্রকারে সে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া আমার মতে সম্মত হইয়া, আমার স্ত্রী পরিচয়ে আমার গৃহবাসিনী হইয়া রহিল, তাহাও বলিলাম। তাহার পর যে প্রকারে রজনী আমাকে বিষয় দান করিয়া, আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মতা হইয়া, আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও বলিলাম।

শুনিয়া শচীন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "মহাশয়, এ সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন?" আমি বলিলাম, "আমি যে ধনসম্পত্তির আকাঙ্ক্ষী তাহা আমার হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে রজনী আশ্রয়শূন্যা। তাহার কোন উপায় আমি করিতে পারিতেছি না।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "সেজন্য আপনি কাতর হইবেন না। যে অন্ধ অবলা স্ত্রী বঞ্চক কর্ত্তৃক বঞ্চিত, তাহাকে আশ্রয়দানে আমার পিতা অদ্যাপি অক্ষম হয়েন নাই, অথবা বিমুখ হইবেন না।"

আমি বলিলাম, "আশ্রয় যেখানে সেখানে পাইতে পারে। কিন্তু আমার দোষে তাহার বিবাহের পথ বন্ধ হইয়াছে। যাহাকে লোকে আমার পত্নী বলিয়া জানে, এখন আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয়, এমন লোক পাওয়া ভার। যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে, সেইজন্য আপনাকে এত কথা বলিতেছি।"

শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিলেন, "যদি আপনার কথা সত্য হয়, তবে রজনীর পাত্রের অভাব নাই। কিন্তু আপনার কথা সত্য কি না, তাহা কি প্রকারে জানিব? রজনী ত এসকল কথা এতদিন কিছু বলে নাই।"

আমি বুঝিলাম, রজনীর বরপাত্র কে। বলিলাম, "রজনীকে আজি জিজ্ঞাসা করিবেন। আপনি স্বয়ং জিজ্ঞাসা না করিয়া, আপনার বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিবেন। বলিবেন, আমি সকল কথা প্রকাশ করিতে অনুমতি করিতেছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন, আবার মিত্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম। লবঙ্গলতাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইব। এক্ষণে সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিব না—তিনি আমার শিষ্যা, আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব।

লবঙ্গলতা ইঙ্গিত বুঝিল। আমার সহিত পূর্ব্বাঙ্গীকার মতে, পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি?"

ল। শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয় পাষণ্ড।

আমি। সে কথা কে অস্বীকার করিতেছে? কিন্তু আমার কথায় বিশ্বাস হয় কি?

ল। কেবল তোমার কথায় বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু রজনীকে জিজ্ঞাসা করায়, সে সমুদায় বলিয়াছে। তাহার কথায় বিশ্বাস করি।

আমি। তাই বা কেন কর? মনে কর তাহাকে আমি এ সকল কথা শিখাইয়া আনিয়াছি।

ল। কি অভিপ্রায়ে তুমি শিখাইবে?

আমি। মনে কর আমাদের যথার্থ বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে উভয়ে উভয়ের উপর বিরক্ত। উভয়ে উভয়কে ছাড়িতে চাই। বিবাহ অস্বীকার ভিন্ন ইহার আর উপায় কি?

লবঙ্গলতা ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "যে চুরি করে, সে গৃহস্থকে ডাকিয়া বলে না যে আমি চুরি করিতেছি।"

আমি। চোরের অনেক কৌশল।

ল। তুমি অনেক কৌশল জান বটে, কিন্তু রজনী তত জানে না। রজনী যে প্রকারে বলিল, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইল। সত্য কথা না হইলে, সে তত সবিস্তারে বলিতে পারিত না।

আমি। শিখাইলে বিচিত্র কি? আদালতে সাক্ষি জোবানবন্দী দেয় কি প্রকারে? শিখিলে সকলেই মিথ্যা কাহিনী সবিস্তারে বলিতে পারে।

ল। রজনী তোমার শিক্ষামতে কখন পারে না। কেন না, তুমি শিখাইলে, কোন না কোন কথায় আমি বুঝিতে পারিতাম যে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি শিখাইয়াছে। রজনী যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম যে, অন্ধ অন্ধের জ্ঞানমত সকল বলিতেছে।

আমি। তুমি দ্বিতীয় বেন্থাম বোধ হয়। সত্য সত্যই কি তুমি একথা বিশ্বাস করিয়াছ?

ল। সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়াছি।

আমি। শচীন্দ্র?

ল। তার আরও বিশ্বাস।

আমি। ভালই হইয়াছে। এক্ষণে রজনী আমার গৃহে যাইতে অসম্মত। তাহার বিবাহ সুকঠিন। আমি কি তোমাদিগকে নিঃস্ব করিয়া, রজনীকেও তোমাদিগের গলায় ফেলিলাম না কি?

ল। তুমি বিশেষ দয়ালু ব্যক্তি দেখিতে পাই। বিশেষ আমাদিগের ধন সম্পত্তির উপর তোমার বড় মায়া! কিন্তু রজনীর জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না, সে আমাদিগের গলায় পড়িবে না।

আমি। তবে তাহার কি উপায় করিবে? জিজ্ঞাসায় রাগ করিও না। আমার একটু প্রয়োজন আছে।

ল। আমরা তাহার বিবাহ দিব।

আমি। সে বড় কঠিন। তোমাদের কথায় তাহাকে কুমারী মনে করিয়া বিবাহ করিবে, এমন লোক কি আছে ?

ল। আছে।

আমি। থাকিতে পারে। এমন অনেক লোক আছে যে তাহাদের অন্য প্রকারে বিবাহ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সে প্রকারের লোককে কি রজনী বিবাহ করিবে ?

ল। যে পাত্র স্থির হইয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে রজনী রাজি হইয়াছে।

আমি। বটে ? কে সে ?

ল। আমার পুত্র শচীন্দ্র।

আমি। কাণাকে।

ল। কাণাকে। যাহাতে অমরনাথবাবু অনিচ্ছুক ছিলেন না, তাহাতে অন্যেও ইচ্ছুক হইতে পারে।

আমি বিস্মিত হইলাম না, কেন না শচীন্দ্র যে রজনীতে অনুরক্ত তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। আমি নীরব হইয়া রহিলাম। তখন অবসর পাইয়া লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার সঙ্গে আর একবার সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছিলে কেন ? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ ?"

অ। যাইব।

ল। কেন ?

অ। তোমার স্বামীর পাহারাওয়ালার ভয়ে। রাজধানী অন্ধকার করিয়া চলিলাম কি ?

ল। প্রায়। বোধ হয় এখন পুলিস আপিস উঠিয়া যাইবে।

অ। বোধ হয়। আর কেহ সুখী হউক না হউক, তুমি হইবে।

লবঙ্গ চুপ করিয়া রহিল।

আমি তখন ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া লবঙ্গকে বলিলাম, "আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই তোমার সঙ্গে এ সাক্ষাতের প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমি সরলান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিব, তুমিও সরলান্তঃকরণে উত্তর দিবে। আমি এই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তুমি কি যথার্থই সুখী হও ?"

ল। সরলান্তঃকরণেই উত্তর দিব—যথার্থই সুখী হই। কেন না, তোমাকে যেমন করিতে চাহি, তুমি সেরূপ হইলে না। অতএব তোমাকে না দেখিলেই ভাল থাকি।

অ। তুমি আমাকে কিরূপ দেখিতে চাও ?

লবঙ্গ, কয়েকটা কথায় এক ঋষির চিত্র আঁকিল—জিতেন্দ্রিয়, অস্বার্থপর, পরোপকারী, বৈরাগী,—আমি বলিলাম, "আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল করিতে চাও? আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল না দেখিলে দুঃখিত হও?"

ল। তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছু বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, "যদি লোকান্তর থাকে তবে?"

লবঙ্গলতা বলিল, "আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।"

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, "আমি সে কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু একটী কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্য এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন? এ যে মুছিলে যায় না—কখন মুছিলে যাইবে না।"

লবঙ্গ অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল, "তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকা বুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার করিবেন,—আমি বিচারের কে? এখন সে অনুতাপে আমার—কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে?"

আমি। তুমি না বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কি? উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না—আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু তুমি কখন যদি ইহার পরে শোন যে অমরনাথ আর কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অণুমাত্র—স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

আমি। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

ল। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

আবার "ইহলোকে।" এই কথা আর সেই কথা—আমি যেমন তোমায় চাই—তুমি তেমন নও। যাক—আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না।

আমি বলিলাম, "আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে তাহা বলিয়া যাই। রজনী আমাকে তাহার সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিল। সে দানপত্র এই। আমি রজনীর বিষয় পরিত্যাগ করিতেছি। এই সে দানপত্র তোমারই সম্মুখে নষ্ট করিতেছি।

আমি সেই দানপত্র, বাহির করিয়া, লবঙ্গের সম্মুখে বিনষ্ট করিলাম।

লবঙ্গ বলিল, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আমি তোমাকে অনর্থক বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু এ দানপত্র রেজিষ্টরী হইয়াছিল কি?"

আমি। হইয়াছিল।

ল। শুনিয়াছি, রেজিষ্টরী হইলে আর একটা নকল সরকারিতে থাকে।

আমি। এ দানপত্রেরও তা আছে। এইজন্য আমি আর একখানা দানপত্রে কাল দস্তখত করিয়া রেজিষ্টরী করিয়া আনিয়াছি। ইহার দ্বারা আমার সমুদায় স্থাবরসম্পত্তি আমি দিতেছি।

ল। কাহাকে?

আমি। যে রজনীকে বিবাহ করিবে তাহাকে।

ল। তোমার সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি?

"হ্যাঁ।"

ল। রজনী যাহা তোমাকে দিয়াছিল তাহা তোমার তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়াই উচিত। এক্ষণে তোমার মতি ফিরিয়াছে বলিয়া, তুমি তাহার বিষয় তাহাকে ফিরাইয়া দিতেছ। ইহা আমার পক্ষে বিস্ময়কর বটে, কিন্তু তবু বুঝিতে পারি। কিন্তু আমি জানি তদ্ভিন্ন, তোমার নিজেরও অনেক জমীদারী আছে। তাহাও রজনীর স্বামীকে দিতেছ কেন?

আমি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম, "তুমি এই দানপত্র এক্ষণে তোমার কাছে অতি গোপনে রাখিবে। যতদিন না রজনীর বিবাহ হয়, ততদিন ইহার কথা প্রকাশ করিও না। বিবাহ হইয়া গেলে রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও। যদি ইহার অন্যথা কর, তবে তোমার স্বামীর শপথ লাগিবে।"

এই কথা বলিয়া, ললিতলবঙ্গলতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, দানপত্র আমি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। আমি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম—আমি আর বাড়ী গেলাম না। একবারে ষ্টেসনে গিয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে কাশ্মীর যাত্রা করিলাম।

· দোকানপাট উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহার দুই বৎসর পরে, একদা ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ভবানীনগর গেলাম। শুনিলাম যে মিত্র বংশীয় কেহ তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন। কৌতূহল প্রযুক্ত আমি দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শচীন্দ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া, নমস্কার আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া উত্তমাসনে বসাইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম, যে তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে রজনীর যথার্থই বিবাহ হইয়াছিল, পাছে কলিকাতার লোক কেহ এইরূপ মনে করে, এই ভাবিয়া, তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে বাস করিতেছেন। ভবানীনগরেও কতকগুলি লোক তাঁহাকে লইয়া আহার করে না, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত নহেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন।

আমার নিজ সম্পত্তি, এবং রজনীর সম্পত্তির কিয়দংশ প্রতিগ্রহণ করিবার জন্য শচীন্দ্র আমারে বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না। শেষে শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমারও সে ইচ্ছা ছিল। শচীন্দ্র আমাকে অন্তঃপুরে রজনীর নিকট লইয়া গেলেন।

রজনীর নিকট গেলে, সে আমাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি দেখিলাম, যে ধূলিগ্রহণ কালে, পাদস্পর্শ জন্য, অন্ধগণের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সে ইতস্ততঃ হস্তসঞ্চালন করিল না, এককালেই আমার পাদস্পর্শ করিল। কিছু বিস্মিত হইলাম।

সে আমাকে প্রণাম করিয়া, দাঁড়াইল। কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিল। আমার বিস্ময় বাড়িল। অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুর্গত নহে। চক্ষে চক্ষে মিলনজনিত যে লজ্জা তাহা তাহাদিগের ঘটিতে পারেনা বলিয়া, তাহারা দৃষ্টি লুকাইবার জন্য মুখ নত করে না। একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, দেখিলাম—নিশ্চিত দেখিলাম—সে চক্ষে কটাক্ষ।

জন্মান্ধ রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায়? আমি শচীন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে শচীন্দ্র আমাকে বসিবার আসন দিবার জন্য রজনীকে আজ্ঞা করিলেন। রজনী একখানা কারপেট লইয়া পাতিতেছিল—যেখানে পাতিতেছিল সেখানে অল্প একবিন্দু জল পড়িয়াছিল; রজনী আসন রাখিয়া, অগ্রে অঞ্চলের দ্বারা জল মুছিয়া লইয়া আসন পাতিল। আমি বিলক্ষণ

দেখিয়াছিলাম যে, রজনী সেই জলস্পর্শ না করিয়াই আসন পাতা বন্ধ করিয়া জল মুছিয়া লইয়াছিল। অতএব স্পর্শের দ্বারা কখনই সে জানিতে পারে নাই যে, সেখানে জল আছে। অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনী এখন তুমি কি দেখিতে পাও?"

রজনী মুখ নত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ।"

আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম। শচীন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় না হইতে পারে, এমন কি আছে? আমাদিগের ভারত-বর্ষে চিকিৎসা সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসা বিদ্যায় কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই একজন সন্ন্যাসী, উদাসীন প্রভৃতির কাছে, সে সকল লুপ্তবিদ্যার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 'শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে? কন্যা যে অন্ধ।' আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্বের আরোগ্য করুন।' তিনি বলিলেন, 'করিব—এক মাসে।' ঔষধ দিয়া, তিনি একমাসে রজনীর চক্ষে দৃষ্টির সৃজন করিলেন।"

আমি আরও বিস্মিত হইলাম, বলিলাম, "না দেখিলে, আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে, ইহা অসাধ্য।"

এই কথা হইতেছিল, এমত সময়ে এক বৎসরের একটি শিশু, টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া, রজনীর পায়ের কাছে দুই একটা আছাড় খাইয়া, তাহার বস্ত্রের একাংশ ধৃত করিয়া টানাটানি করিয়া উঠিয়া, রজনীর হাঁটু ধরিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া, উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার পরে, ক্ষণেক আমার মুখ পানে চাহিয়া, হস্তোত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল, "দা!" (যা!)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে এটি?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "আমার ছেলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার নাম কি রাখিয়াছেন?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "অমর প্রসাদ।"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

সমাপ্ত

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

উন্মাদিনী

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে লিখিত ঘটনার দুই একদিবস পরে সুবর্ণপুর গ্রাম অন্ধকারময় হইল। রাজপন্থে জনমানব দেখা যায় না—কেবল কখন কখন পুলিশ কর্ম্মচারিগণ গ্রামের এখানে ওখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামবাসীরা তাহাদিগের ভয়ে বাটীর দ্বার খুলিতে সাহস করেন না, কিছুদিনের জন্য হাট বাজার বন্ধ হইল। তন্নিবন্ধন গ্রামবাসীদিগের ক্রমে ক্রমে আহারও বন্ধ হইতে লাগিল। সুবর্ণপুর গ্রামের প্রান্তবাহিনী জাহ্নবীও কিছুদিনের জন্য শোভাহীনা হইল। যে সকল যুবতী সর্ব্বদা গ্রীবানিমজ্জিত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে রাজহংসীর ন্যায় বিচরণ করিত, তাহাদিগের আর সে জাহ্নবীকূলে দিবসে দেখিতে পাওয়া যায় না—তবে যে সকল কুলকামিনীগণ সূর্য্যদেবকে মুখ দেখাইতে লজ্জা পান, এবং যাঁহারা তজ্জন্য যামিনী প্রভাত না হইতে হইতেই স্নান করিয়া থাকেন কেবলমাত্র তাঁহারাই এক্ষণে জাহ্নবীর শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এমত অবস্থায় একদা অতি প্রত্যূষে দুইটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী একটি পরিচারিকা সমভিব্যাহারে অতি দ্রুতপাদবিক্ষেপে ভাগীরথী তীরাভিমুখে কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতেছিল।

"বিনোদিনী এখনও রাত আছে?"

হ্যাঁ এখনও ঢের রাত, আমার গা ছম্‌ছম্ করুচে—ঐ দেখ এখন সুখতারাও উঠেনি। চন্দ্র দিদি ফিরে যাই চল।"

"দূর হ! এতদূর এসে আবার ফিরে যাবি কেন—ভয় কি লো।"

বি। (চুপি চুপি) আজ বড় দিদির ঘরে গামছা আন্‌তে গিয়ে এক ভয়ানক বিকটাকার মানুষ দেখে আমার সেই অবধি বড় ভয় হয়েছে—

চ। সে কি? কুমুদিনীর ঘরে—

বি। হ্যাঁ।

চ। কখন দেখিলি ?

বি। এই মাত্র।

চ। এতক্ষণ বলিস্‌নি যে ?

বি। বড় দিদি বল্‌তে নিষেধ করেছিল।

চ। তবে বল্লি যে।

বি। বল্‌তে কি চন্দ্র দিদি, যতক্ষণ এই কথাটা আমার পেটের ভিতর ছিল তত-ক্ষণ আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল—আমার মাতা খাস কাকেও বলিস্‌নে, আমার ভগিনীপতিকেও না—

চ। না তা বল্‌ব না—তুই কাকে দেখ্‌লি—

বি। আমি তাকে চিনি না—কিন্তু মুখ দেখে বোধ হইল যেন তাকে কখন কোথায় দেখেচি।

চ। কেমনতর দেখ্‌তে।

বি। দেখতে সন্ন্যাসীর মত—বুক পর্য্যন্ত পাকা দাড়ি। খুব বড় বড় চোক, গেরুয়া বসন পরা—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

চন্দ্র। কি করিতেছিল ?

বি। বড় দিদির শিওরে বসে মাথায় হাত বুলাইতে ছিল; আমি ঢুকিবামাত্র চমকিয়া উঠিয়া অন্য দ্বার দিয়া পলাইল।

চন্দ্র। কুমুদিনী কি করিতেছিল ?

বি। তাঁর এখন একটু জ্বর ছেড়েচে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম দিদি ও কে ? তিনি বলিলেন এক সন্ন্যাসী আমার চিকিৎসা করিতেছেন, জ্বর বিশ্রাম কালে আমাকে দেখিতে এসেছিলেন, তারপর আমি যখন গামছা লইয়া ফিরে আসি তখন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিনোদ, যে সন্ন্যাসীকে এখানে দেখিলি, কাহাকেও বলিসনে, কাকাও যেন না জানতে পারেন।"

চন্দ্রমুখী। "বাবারে বলিতে নিষেধ করিয়াছে।" এই বলিয়া চন্দ্রমুখী অন্যমনস্ক হইল। কিয়ংক্ষণ পরেই যুবতীদ্বয় গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীর শোভা দেখিয়া দাঁড়াইল। বিশালহৃদয়া জাহ্নবী নক্ষত্র-কিরণে ঝিক্‌মিক্‌ করিতে করিতে দূরপ্রান্তে ধূমময়ে মিশিয়াছে। নদীর অপর পারে রজনীর অস্পষ্ট আলোকে অন্ধকারময় দেখাইতেছিল। অদূরবর্ত্তিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী হইতে দীপালোক নদীজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, আর শীতল নৈশবায়ু নদীহৃদয় আন্দোলিত করিয়া, যুবতীদ্বয়ের স্বেদবিজড়িত অলকাগুচ্ছের চাঞ্চল্য বিধান করিতেছিল। যুবতীদ্বয় বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া কিছুক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া দূরে একটি ক্ষুদ্র তরী হইতে কে গায়িতেছিল তাহাই শুনিতেছিল—তৎপরে আস্তে আস্তে ঘাটে নামিল।

তাহাদিগের পুর্ব্বে দুই একটি স্ত্রীলোক আসিয়া ঘাটে স্নান করিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে বাচাল প্রাচীনা চন্দ্রমুখীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমুদিনী কেমন আছে ?"

চন্দ্র। কুমু এখন ভাল আছে। এই মাত্র জ্বর ছেড়েছে।

প্রাচী। আর সে বাবুটি কেমন আছে ?

চন্দ্র। তা বিশেষ জানি না—শুনিয়াছি বড় জ্বর—দিবারাত্রি বেহুঁসে আছে।

প্রা। আচ্ছা, কুমুদিনীর ও বাবুটির এক সময় জ্বর হোল কেন ?

চন্দ্র। (ক্রুদ্ধভাবে) কেন তা কে জানে—কুমুদিনীর জ্বর হোল স্বর্ণের শোকে, বাবুটির জ্বর হোল ডাকাতেরা মাথায় মেরেছিল বলে।

প্রা। বাবুটি তোমাদের বাটীতে কেন ?

চন্দ্রমুখী উত্তর করিল না।

বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, "ও গো সে বাবুটি আর কেহ নয়—আমাদের রমণপুরের খুড়ীর জামাই, তা আমাদের বাড়ী থাক্‌বে না তো কোথা যাবে ?"

প্রা। কার, প্রমদার স্বামী ?—আহা প্রমদা মোরে গেছে—ছোঁড়া কি আবার বিয়ে করেছে ?

চন্দ্রমুখী বলিল, "বিয়ে হয় নি কিন্তু হবে—"

প্রা। কার সঙ্গে ?

চন্দ্র। তোমার সঙ্গে।

প্রা। (হাসিয়া) তা তোমরা এমন সব যুবতী শ্যালী থাক্‌তে আমার সঙ্গে কেন। কুমুদিনী এমন সুন্দর কড়ে রাঁড়ি, তাতে আবার বাপ বিধবা বিয়ে না দিতে পেরে বিবাগী হয়েছে। কেন কুমুদিনী বিয়ে করুক্ না, তা হলে বাপ ঘরে ফিরে আস্‌বে।

চন্দ্রমুখী উত্তর করিলেন না—বিনোদিনী "পোড়ার মুখ তোমার" বলিয়া জলে নামিলেন কিন্তু পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগের পরিচারিকা চুপি চুপি প্রাচীনার কানে কানে বলিল, "তা আশ্চর্য্য নয়।"

প্রাচীনাও তদ্রূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "কেন লো ?"

পরিচারিকা উত্তর করিল "জামাই বাবু প্রলাপে দিবারাত্র বড়দিদির কথা বলে থাকেন এবং বড়দিদিও জ্বর ত্যাগ হল্যে, জ্ঞান হলেই জামাইবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করে।"

"তাতে বিয়ে হবে কেমন করে জান্‌লি ?"

পরিচারিকা বলিল, "তা তুমি বুঝে নাও।"

প্রাচীনা বলিল, "তাত বুঝলুম এখন চুপ কর।" তৎপরে উচ্চৈঃস্বরে পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বিধু তুই কি রজনীবাবুর বাড়ীতে আর থাকিস্ না?"

বি। আর কার জন্যে থাকিব। যে স্বর্ণের জন্য ছিলাম সে গলিয়া অঙ্গার হইয়াছে—এখন আবার সাবেক মুনিব বাড়িতে আছি। এই বলিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল। বিনোদিনী ও চন্দ্রমুখী স্বর্ণকে মনে পড়াতে অবিশ্রান্ত নয়ন বারি জাহ্নবীর জলে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রাচীনা অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "আহা স্বর্ণ কি সুন্দর মেয়ে ছিল যেমন রূপ তেমনি গুণ—অমন মেয়ে কলিতে হয় না—আপনার প্রাণ দিয়া স্বামীকে বাঁচালে।"

বিধু বলিল, "আর তেমনি উপযুক্ত পাত্রে পড়েছিল, রজনী বাবুর মতন বাবু দেখিনি।"

পশ্চাৎ হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "চুপ কর হারামজাদি! রজনীর মতন বাবু দেখিস্‌নি? সে আবার বাবু? কে তাকে বাবু কল্লে, কে তাকে এত ধনের অধিপতি কল্লে? সেও আমি। পাষণ্ড! নেমকহারাম! এখন আমায় চিন্‌তে পারে না, বলে আমি পাগল হু! হু হু! আমি পাগল! হি! হি! হি!"

রমণীগণ দেখিল তটোপরি দাঁড়াইয়া গলিতবসনা আলুলায়িত রুক্ষ কেশা মধ্য-বয়সী সুন্দরী, একটি স্ত্রীলোক রোষভরে হাসিতেছে। সেই অবিরত বায়ুতাড়িত তরঙ্গিনীর উপকূলে অস্পষ্ট উষালোকে সেই উন্মাদিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া রমণীগণ চমকিত হইল। বিনোদিনী ভীতা হইয়া চন্দ্রমুখীর অঞ্চল ধরিয়া তাহার পশ্চাৎ লুকাইল।

উন্মাদিনীর হাসি থামিল। কিছুকাল সকলেই নিস্তব্ধ, তৎপরে উন্মাদিনী সেই অন্ধকারময় জাহ্নবীর উপকূল আলোড়িত করিয়া অতি মধুর স্বরে গায়িতে লাগিল—

ডুবিতে এসেছি আমি জাহ্নবী সলিলে।
কি কাজ জীবনে মম চিরদিন ভাবিলে॥
ধন জন ছিল যত প্রিয়তম পতি সুত।
একে একে সবে আসি ডুবে গেছে জলে॥

উন্মাদিনীর চাঞ্চল্য দেখিয়া বয়ঃকনিষ্ঠা বিনোদিনী ভীতা হইল এবং তাহার ব্যস্ততা হেতু চন্দ্রমুখী তাহার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যখন বিনোদিনী উন্মাদিনীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন তখন উন্মাদিনী তাহাকে দেখিয়া বলিল, "হু হু! তুমি বড় সুন্দরী—সাবধান তোমার বড় বিপদ!" বিনোদিনী ভীতা হইয়া চন্দ্রমুখীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—পরে কূল হইতে উপরে গিয়া বলিল, "চন্দ্রদিদি মাগি কি ভয়ানক পাগল! কিন্তু কি সুন্দরী ছিল, এখনও কত রূপ রয়েছে।"

রমণীগণ চলিয়া গেল, কেবল ঘাটে একাকিনী পূর্ব্বোল্লিখিতা প্রাচীনা রহিল ; আর উপকূলে উন্মাদিনী ছিল। প্রাচীনা আস্তে আস্তে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "হাঁগা রজনীকে কেমন করে তুমি বড় মানুষ কল্লে ? সে যে তার বাপের বিষয়ে বড়মানুষ হয়েছে।"

উন্মাদিনী উচ্চহাসি হাসিয়া বলিল, "তার বাপ! তার বাপ্ কে ? রমাকান্ত! হু হু! না না! সে কেবল আমি জানি। হি! হি!" এই বলিয়া উন্মাদিনী বেগে সেস্থান হইতে পলায়ন করিল। বর্ষীয়সী চমকিত হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেই সন্ন্যাসীর পরিচয়

ডাকাতি হাঙ্গামা কিছুদিন পরে নিবিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে আর একটি নূতন ঘটনা উপস্থিত হইল। তাহা লইয়া সুবর্ণপুরে পাড়ায় পাড়ায় গণ্ডগোল হইতে লাগিল। এই আখ্যায়িকার প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে কুমুদিনী অতি শৈশবে বিধবা হওয়াতে তাঁহার পিতা হরিনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার তাঁহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে উদ্যোগে সফল হইতে না পারিয়া উদাসীন হইয়াছিলেন। এক্ষণে হঠাৎ হরিনাথ মুখোপাধ্যায় সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রচার করিলেন যে, তাঁহার কন্যা কুমুদিনীর পুনরায় বিবাহ দিবেন।

বোধ হয় বলা বাহুল্য, বিনোদিনী যে সন্ন্যাসীকে কুমুদিনীর শিয়রে বসিতে দেখিয়াছিলেন তিনি হরিনাথ মুখোপাধ্যায়। অপত্যস্নেহের অনুরোধে সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়াও আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া কুমুদিনীকে গোপনে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কুমুদিনী প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া স্বর্ণের শোক ভুলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার পিতাকে সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিতে নানা প্রকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে প্রতিদিন রাত্রে হরিনাথ মুখো কুমুদিনীকে গোপনে দেখিতে আসিতেন, এবং প্রতিদিন রাত্রেই কুমুদিনী তাঁহাকে ঐরূপ অনুরোধ করিতেন। তৎপরে কুমুদিনী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলে একদিন রাত্রে হরিনাথ, কুমুদিনী ও তাহার জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার গৃহিণীকে বলিলেন, "দেখ সংসারে আমার দুই কন্যা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। যদিও তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম, তথাচ আমি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। সেজন্য যাহা কিছু ঈশ্বরের উপাসনা করিতাম তাহা এ অঞ্চলে

থাকিয়া করিতাম, কিন্তু যে দিবস হইতে শুনিলাম যে আমার সোনার প্রতিমা স্বর্ণপ্রতিভাকে হারাইয়াছি—"বলিতে বলিতে হরিনাথ মুখোর কণ্ঠরোধ হইল—স্ত্রীলোকগণও কাঁদিয়া উঠিলেন, তৎপরে সকলে কিঞ্চিৎ স্থিরতা লাভ করিলে সন্ন্যাসী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "যে দিবস শুনিলাম স্বর্ণপ্রভাকে হারাইয়াছি, সেই দিবস হইতে ঈশ্বরোপাসনায় আর মন নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। সর্ব্বদা ইচ্ছা হইতে লাগিল যে কুমুদিনীকে দেখি, এবং কুমুদিনীর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া সে ইচ্ছা বলবতী হইল। কুমুকে গোপনে দেখিতে আসিলাম, প্রতিরাত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম, আমি অপত্যস্নেহের যে বাঁধ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা ভাসিয়া গেল—আমার এখন আশ্রমবাসী হইতে ইচ্ছা হয়—" এইকথা বলিবামাত্র কুমুদিনী এবং তাহার জননী উভয়ে সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুমুদিনী বলিল, "বাবা আমাদের আর কেহ নাই—"

সন্ন্যাসীর দরবিগলিত নয়নাশ্রু কুমুদিনীর মস্তকে পড়িতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর বলিল, "আমি আর তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। যদি তোমরা আমার একটি অনুরোধ রাখ।" কুমুদিনী বলিলেন, "বাবা কি অনুরোধ—তোমার অনুরোধ রাখ্‌ব না! বাবা তুমি যে আমাদের সব!" হরিনাথ তাঁহার পত্নীকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, "আমি কুমুদিনীর পুনরায় বিবাহ দিব, তোমরা কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না।" কুমুদিনীর মাতা বলিলেন, "তোমার মেয়ে, তুমি বিবাহ দিবে, কেহ আপত্তি করিবে না। আমি একবার আপত্তি করিয়া তোমায় হারাইয়াছিলাম—এজন্মে তোমার মতে অমত করিব না।" হরিনাথ বলিলেন "আমার কন্যার এবিষয়ে মত জানতে চাই।" কুমুদিনী লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন। মুখ রক্তিমাবর্ণ হইল—মস্তকে ঈষৎ অঞ্চল টানিলেন—কোন উত্তর করিতে পারিলেন না কিন্তু সন্ন্যাসী পুনঃপুনঃ উত্তর চাওয়াতে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন "বাবা যদি প্রাণ দিলেও তুমি ঘরে ফিরে এস, তবে তাও আমি দিব।" হরিনাথের আহ্লাদের সীমা রহিল না; কাঁদিতে কাঁদিতে কুমুদিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—সে রাত্রেই গৃহস্থাশ্রমী হইলেন। কোন গোপনীয় কারণেই হউক আর পিতৃস্নেহ বশতঃই হউক কুমুদিনী অগত্যা বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

তৃষিত চাতক—করকাভিঘাতী মেঘ

হরিনাথ বাবুর গৃহে প্রত্যাগমন ও কুমুদিনীর বিবাহের সংবাদ এক দিবস অপরাহ্নে গ্রাম্যপ্রান্তে একটি উদ্যানে বসিয়া—রজনীকান্ত শুনিলেন। এই সংবাদ

শুনিবামাত্র তাঁহার মনোমধ্যে ভয়মিশ্রিত আশার সঞ্চার হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি চিন্তা? তাঁহার কুমুদিনী ভিন্ন কি অন্য চিন্তা ছিল? এই নূতন সংবাদে আজ সেই চিন্তা অতি গাঢ়তর হইল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল তথাপি রজনী সেইখানে বসিয়া ভাবিতেছেন—উদ্যানের পশ্চাতে একটী অতি বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড; তন্মধ্যে দশ বারটি গাভি বিচরণ করিতেছে। একটী রাখাল বিচিত্র স্বরে গাভিদিগের গৃহে প্রত্যাগমনের সঙ্কেত করিতেছে। রজনীকান্ত সেই মাঠ প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি হইল—চন্দ্রোদয় হইল—পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া যামিনী মধুর হাসি হাসিয়া অন্ধকারের কালো সাড়ী—খাসা ফুলদার সেই কেরেপের সাড়ী অপসৃত করিয়া, ঘোম্‌টা খুলিয়া, মুখ তুলিয়া হাসিল—সে কাণ্ড দেখিয়া, রজনীর বাগানের ফুল, গামের পাতা, মাঠের ঘাস, সরোবরের জল, সকলেই সকলের মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া হাসিয়া উঠিল। তৎসহিত রজনীর হৃদয়ও হাসিল, কিন্তু চিন্তা আরও গাঢ়তর হইল। ক্রমে রাত্রি এক প্রহর হইল, তথাচ তাঁহার সংজ্ঞা নাই, একজন পরিচারক কি বলিতে আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আস্তে আস্তে পলাইল। রজনী যে কি চিন্তা করিতেছিলেন তাহা আমাদের পর্য্যায়ক্রমে অনুসরণ করিয়া প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে তিনি শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার শ্বশুর হরিনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করা এবং সেই উপলক্ষে যদি কুমুদিনীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে পারেন তবে তাহা কর্ত্তব্য। কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কেমন করিয়া কথা কহিবেন এবং কি কথা কহিবেন আর কি প্রকারেই বা তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন সেই চিন্তায় এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। মনের ব্যস্ততাহেতু সেই রাত্রেই হরিনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত বিবেচনা করিলেন। রজনী দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিলেন, অতি অল্পক্ষণেই হরিনাথ বাবুর গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। একজন দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড়বাবু কোথায়?" সে বলিল "বড়বাবু ও শরৎবাবু খিড়কির বাগানে বেড়াইতেছেন।" রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন "শরৎবাবু কে?" দ্বারবান উত্তর করিল "শরৎ বাবু বাবুদের সম্বন্ধে জামাতা—আপনার বাড়ীতে যিনি ডাকাইতের দ্বারা আহত হইয়াছিলেন।" এই কথা শুনিয়া রজনী খিড়কির উদ্যানাভিমুখে চলিলেন। উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে দেখিলেন, একটি পুষ্করিণীর প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলীর একটী সোপানে তাঁহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দুই ব্যক্তি বসিয়া চন্দ্রালোকে কথোপকথন করিতেছিল। পুষ্করিণীর চারিধারে বৃহৎ কামিনীবৃক্ষের কেয়ারি ছিল। রজনী পুষ্করিণীর ঘাটের নিকট আসিয়া দেখিলেন দুইজনের একজন কুমুদিনী আর অন্য জন এক যুবাপুরুষ। যে যুবা, সেই রাত্রে ডাকাতদিগের হস্ত হইতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল সেই যুবা। রজনী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় এক কামিনী-

বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেইস্থানে যাহা শুনিলেন তাহাতে তিনি প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুনিলেন যে যুবক অতি ব্যগ্রতাসহকারে কুমুদিনীকে কি বলিতেছে; কিন্তু তিনি তাহার কিছুই উত্তর করিতেছেন না—শরৎকুমার কুমুদিনীকে বলিল, "তবে কেন—কেন তুমি এই তিনমাস ধরিয়া পীড়িত অবস্থায় আমার জন্য যত্ন প্রকাশ করিতে—কেন তুমি আমায় প্রতিদিবস দেখা দিতে—তুমি কি জানিতে না তোমার সৌন্দর্য্য দেখিবা মাত্র লোকে মোহিত হয়—তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন আমার এ দুর্দ্দশা করিলে? কেন আমায় চির অভাগা করিলে? ইহার দায়ী তুমি—কুমুদিনী বল—বল,—বল, আমায় বিবাহ করিবে কি না—"

উত্তর নাই; কুমুদিনী মুখাবরণ করিয়া সোপান প্রান্তে বসিয়া আছেন। শরৎকুমার পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "কুমুদিনী আমার অল্প বয়স—২২ বৎসর মাত্র—আমার আরও বহুকাল বাঁচিবার আশা আছে কিন্তু তোমার এক কথায় বহুকাল বাঁচিবার আশা একেবারে ঘুচিবে—একবার তুমি বল আমি সংসারে থাকিব কি না।" কুমুদিনী আর থাকিতে পারিলেন না—অস্ফুটস্বরে মুখাবনত করিয়া বলিলেন, "থাক" এবং তৎক্ষণাৎ লজ্জায় বেগে সে স্থান হইতে উদ্যানের অন্যদিকে গেলেন। শরৎকুমারের হৃদয় সুখে উছলিয়া উঠিল। শরৎকুমার কুমুদিনীর পশ্চাৎ অনুসরণ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, গৃহাভিমুখে চলিল। হাসিতে হাসিতে চলিল—আর কামিনী বৃক্ষের তলায় রজনীকান্ত দাঁড়াইয়া কি করিল? হাসিতে লাগিল?

তিনি বজ্রাঘাতব্যথিত ব্যক্তির ন্যায় মুমূর্ষু হইয়া, কামিনী বৃক্ষের একটি ডাল অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সে স্থান অসহ্য হইল, ভগ্নহৃদয় হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। আসিতে আসিতে উদ্যানের মধ্যে তাঁহার সেই মনোহারিণীর দেখা পাইলেন; পুনরায় প্রস্তরবৎ সেইখানে দাঁড়াইলেন। কুমুদিনী গজেন্দ্র গমনে চন্দ্রালোকে হাসিতে হাসিতে আসিতেছিল। রজনী দেখিলেন কুমুদিনী কোন অসীমসুখে চঞ্চল হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার লাবণ্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে রূপ দেখিয়া রজনী চক্ষু মুদিলেন। ইচ্ছা হইল কুমুদিনীর সম্মুখে সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হয়—কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে তাহার নিকট আসিল। রজনী মুখ নত করিয়া রহিলেন—সে লাবণ্য তাঁহার অসহ্য হইল। কুমুদিনী অতি মধুর স্বরে বলিল ভগিনীপতি, এস গৃহে চল; এই বলিয়া হস্ত ধরিল। রজনীর শরীর কাঁপিয়া উঠিল, হস্ত কাঁপিতে লাগিল, কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল ভগিনীপতি কাঁপিতেছ কেন? রজনী উত্তর করিলেন না, কি উত্তর করিবেন? কুমুদিনী উত্তর না পাইয়া তাঁহার মুখপ্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন, মুখ অতি ম্লান, দৃষ্টি মৃত্তিকার প্রতি। কুমুদিনী অতি কোমল স্বরে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেন, ভগিনীপতি কাঁপিতেছ কেন? শরীরে কি কোন অসুখ হয়েছে?" রজনী সে আদরের স্বরে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—এবং বিকৃতস্বরে বলিলেন, "শারীরিক অসুখে, না তা নয়।"

কুমু। তবে কেন কাঁপিতেছ?

রজ। কেন কাঁপিতেছি তোমায় কি বলিব কুমুদিনী?

কুমুদিনী পুনরায় সেইরূপ কণ্ঠস্বরে আদর করিয়া বলিল, "ভগিনীপতি, আমায় বলিবে না ত কাকে বলিবে—আমার মাথা খাও আমায় বল।"

রজ। তুমি কি বুঝিবে কুমুদিনি! তুমি ত কখন নারী রূপের মহিমা দেখিয়া ভুল নাই—যদি কখন জন্মজন্মান্তরে পুরুষ জন্ম ধারণ করিয়া কোন যুবতীর রূপ দেখিয়া মোহিত হও তবে তখন বুঝিতে পারিবে আমি কাঁপিতেছি কেন।"

কুমুদিনি হাসিয়া বলিল, "ভগিনীপতি যাহারা স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া ভুলে, তাহাদিগের কি দিবারাত্র এই প্রকার হাত কাঁপে। তোমার কি দিবারাত্র এই প্রকার হাত কাঁপে?"

রজনী। কুমুদিনি, আজ এক বৎসর যে স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছি—যাহার রূপ দিবারাত্র শয়নে স্বপনে ধ্যান করিয়া থাকি, সেই আদর করিয়া আজ আমার হাত ধরিয়াছে। এক্ষণে বুঝিলে কুমুদিনি কেন আমার হাত কাঁপিতেছে? হাত কি কুমুদিনী—আমার হৃদয় কাঁপিতেছে।" কুমুদিনী রজনীর হস্ত ত্যাগ করিলেন, লজ্জায় মুখ রক্তিমাবর্ণ হইল, গৃহে যাইতে দুইএক পদ অগ্রসর হইলেন। রজনী পথ অবরোধ করিলেন, যেন আর কি বলিবেন, কিন্তু কুমুদিনী বলিতে দিল না—অতি মধুর, অতি স্থির, কাতর, অথচ গম্ভীরস্বরে বলিল, "তুমি আমার ভগিনীপতি ছিলে—আছ—চিরকাল থাকিবে—কেন না আমার স্বর্ণ আজিও আমার পক্ষে মরে নাই—কখন মরিবে না—এ হৃদয়ে চিরকাল জাগিবে। আমি কি স্বর্ণের স্বামী কাড়িয়া লইব? ছি! যদি আর এ কথা বলিবে, তবে এই কুসুমিত কামিনীর ডালে এই আঁচল গলায় বাঁধিয়া, তোমরই সম্মুখে মরিয়া স্বর্ণের কাছে গিয়া আশ্রয় লইব।"

রজনী কাঁচা ছেলে। যদি আমাদের মত, বিজ্ঞ লোকের কাছে পরামর্শের জন্য আসিত, তবে আমরা পরামর্শ দিতাম যে বাপু, যা হলো তা হলো, এখন আর ঘেঁটিয়ে কাজ নাই—এখন চখের জল মুছিয়া, ঘরে গিয়া সকাল সকাল আহার করিয়া, শয়ন কর। কাল সকালে আর কোন একটা সুন্দরী কন্যার সন্ধান করা যাইবে। কিন্তু রজনী কাঁচা ছেলে, অত বিবেচনা না করিয়া বলিয়া বসিল, "আমি এ উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।"

কু। যদি তোমার প্রতি আমার কি প্রকার স্নেহ বুঝিতে পারিয়া এ উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিলে, তবে—কেন আপনার মনে ওরূপ ভাবকে আশ্রয় দিয়াছিলে—

রজ। আমি এতদিন এরূপ উত্তর প্রত্যাশা করি নাই কিন্তু এখন করিয়াছিলাম।

কু। কেন—এখন কিসে?

রজ। আমি আগে বুঝিতে পারি নাই যে আমা হইতে শরৎ কুমার তোমার অনুগ্রহের পাত্র—

কু। (অতি কঠিন স্বরে) আমি জানিতাম রজনী বাবু ভদ্র লোক, কিন্তু তিনি যে ইতরের ন্যায় আড়ি পাতিয়া লোকের গোপনীয় কথা শুনেন তাহা জানিতাম না—বেশ করেছেন—কিন্তু আমার সঙ্গে আর কখন যেন সাক্ষাৎ না হয়।" এই বলিয়া কুমুদিনী ক্রোধে গৃহাভিমুখে চলিলেন; রজনী বিস্মিত হইয়া সেইখানে রহিলেন। তৎপরে আত্মস্মৃতি লাভ করিয়া দৌড়িয়া কুমুদিনীর সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "আমার একটা শেষ কথা শুন—এ কথা তোমার শুনিবার কোন আপত্তি নাই। আমায় যে কটূক্তি করিলে তাহার আমি যোগ্য নহি; আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদিগের গোপনীয় কথোপকথন শুনি নাই; আমায় দ্বারবানেরা বলিল যে তোমার পিতা এই উদ্যানে আস্‌ছেন; আমি তদনুসারে এখানে আসিলাম। কামিনী বৃক্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া তোমাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিলাম। শুনিয়া আমি স্তম্ভিত ও চলৎশক্তিহীন হইয়াছিলাম—কেন তাহা আর বলিতে চাহি না। সুতরাং তোমার শেষ কথাও শুনিতে পাইলাম—আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদের কথা শুনি নাই—আমি অভদ্র নহি—আমি ইতর নহি—তুমি আমায় এ প্রকার স্বভাবান্বিত মনে করিলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমার সহিত আর তোমার সাক্ষাৎ হইবে না। তুমি আমার সব। তোমার সম্মুখে শপথ করিতেছি আর দেখা দিয়া তোমায় যন্ত্রণা দিব না।"

এই বলিয়া রজনীকান্ত বেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কুমুদিনী দেখিলেন যে রজনী এই কথা যখন বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার চক্ষে দুই এক ফোঁটা বারিবিন্দু পড়িয়াছিল—কুমুদিনী ব্যথিতা হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।
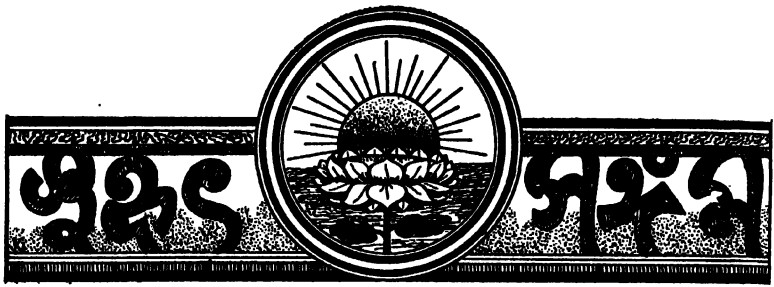
[কলেজ রিউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মিলন উপলক্ষে।*]

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(১)

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ দেখি বীণা আনন্দের সঙ্গে,
খেলায়ে হৃদয়ে সুখের তরঙ্গে,
ভাসা দেখি তায় আশার ফুল।

(২)

শুনিয়া প্রাচীন "অর্ফিউস" গান
পাইল চেতন অচল পাষাণ,
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায়ে কূল॥

(৩)

তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃত-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল ?

(৪)

"কোথা বাল্য-সখা—" বলি একবার
ডাক্ দেখি সুখে মিলে সব তার,
"আয় রে শৈশব-সুহৃৎ আবার
আশার কাননে খেলাতে যাই।"

(৫)

বল্, বীণা বল্, "নবীন জীবনে
খেলিলে আনন্দে যাহাদের সনে,
হাসিলে, কাঁদিলে, মিলিলে স্বপনে,—
আজ কি তাঁদের স্মরণে নাই।"

(৬)

"স্মরণে কি নাই সে সৌরভময়
শৈশবের প্রিয় পাদপ নিচয়,
তড়াগ, প্রাঙ্গণ, সেতু, শিক্ষালয়,
জড়ালে যাহাতে শিশুর মায়া।

(৭)

"ভুলিলে কি সেই উৎসাহলহরী,
ভাসায়ে যাহাতে জীবনের তরী
তরঙ্গ তুফান্ হেয় জ্ঞান করি
উড়াতে নিশান বিচিত্র-কায়া॥

(৮)

"পড়ে নাকি মনে কত দিন হায়,
'মা'—'মা' বলি প্রবেশি আলয়
কত সুখে খেতে সখায় সখায়
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা।

* লেখকের নিয়োগানুসারে বঙ্গদর্শনে এই কবিতা প্রকাশিত হইল। ইহা রি-উইনিয়নে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল

(৯)

"সেইরূপে পুনঃ করিয়া উৎসব
জীবন-মধ্যাহ্নে এসো সখা সব
লভি একদিন—যে সুখ দুর্লভ
সংসার-তুফানে ডুবেছে আহা॥

(১০)

"নবীন প্রবীন এসো সবে মেলি
পরাণে জড়াই পরাণ-পুতলি,
যে ভাবে শৈশবে, যৌবনেতে কেলি
করেছি প্রাণের কপাট খুলে।

(১১)

"লঘু আশা, হায়, লঘু তৃষা লয়ে
শিশুকালে যদি উনমত্ত হয়ে
বাঁধিতে পেরেছি হৃদয়ে হৃদয়ে
স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ সকলি ভুলে।

(১২)

"তবে কি এখন নারিব মিলিতে?
গাঢ় চিন্তা, আশা যখন হৃদিতে
তুলেছে তরঙ্গ প্রবল গতিতে—
বাসনা ঝটিকা বহিছে যবে?

(১৩)

"করিলে যে আগে এত সে কামনা,—
ধরিলে যে হৃদে এত সে বাসনা—
শুধু কি সে সব শিশুর জল্পনা
ছিন্ন তৃণ সম বিফল হবে?

(১৪)

"চেয়ে দেখ, সখে, রয়েছে তেমতি
পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পথি,
তেমতি সুঠাম সুন্দর মূরতি
সেই স্তম্ভশ্রেণী হাসিছে হায়।

(১৫)

"আমরাও তবে হাসিব না কেন?
হাসিতাম সুখে আগে সে যেমন
অইখানে যবে করেছি ভ্রমণ
ভানু, বৃষ্টি-ধারা ধরি মাথায়॥

(১৬)

"অই গৃহ, মাঠ, পথ, সরোবর,
অহে কত দিন দেখ কত বার,
ভেবেছ কি কভু কত রত্ন তার
করাল কৃতান্ত করেছে চুরি?

(১৭)

"কোথা সে আজি রে ক্ষণজন্মা ধীর
"দ্বারিক" সুহৃৎ বঙ্গের মিহির!
কোথা "অনুকূল" মলয় সমীর!
"দিনবন্ধু" বঙ্গ-সাহিত্য-সুরি!

(১৮)

"শ্রীমধুসূদন" কোথা সে এখন!
তার তরে আর কে করে ক্রন্দন
সহপাঠী তার?—এবে অদর্শন
বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত তারা?

(১৯)

"হে বঙ্কিম, সখে তোমরাও সবে
ক্রমে ক্রমে লীন হইবে এ ভবে,
নাম, গন্ধ, শোভা কিছুই না রবে—
কালেতে হইবে সকলি হারা।

(২০)

"তাই বলি তাই এসো একবার
সম্বৎসরে সুখে মিলি হে আবার,
সহাস্য বদনে হৃদয়ের দ্বার
খুলিয়া দেখাই, দেখি আনন্দে।

(২১)

"আর কত দিন বাঁচিব সে বল—
বাঙ্গালির ক্ষুদ্র জীবন-সম্বল
কবে সে ফুরাবে—ছাড়িয়া সকল
ভুলিতে হইবে এ মকরন্দে!

(২২)

"এ শোকের ছায়া ছিল না যখন—
পড়ে নাই ঢাকি হৃদয় দর্পণ,
সুখপূর্ণ মহী, সুখপূর্ণ মন—
সকলি সুন্দর মাধুরীময়।

(২৩)

"সবে সখা-ভাব—ছিল না বিচার
ধনাঢ্য, কাঙ্গাল, রাজপুত্র আর,
একি সে আসন, পঠন সবার—
আনন্দে হৃদয় মগন রয়॥

(২৪)

"সেই সুখময় সুহৃতের বেলা,
পেয়েছ আবার কর সবে খেলা,
সুখের সাগরে ভাসাইয়া ভেলা
খেলাইতে যথা শৈশবকালে।

(২৫)

"বাজ ।, এবে মিলি সব তার,
মৃদুল মৃদুল করিয়া ঝঙ্কার,
প্রণয় কুসুম ফুটারে সবার,
সরস মধুর জলদ তালে॥"

[কোরাস্]

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ্‌ বীণা বেগে আনন্দের সঙ্গে,
খেলায়ে হৃদয়ে সুখের তরঙ্গে,
ভাসারে তাহাতে আশার ফুল।

শুনিয়া প্রাচীন গায়কের গান
পাইল চেতন অচল পাষাণ,
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায়ে কূল॥

তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুনত-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল!

সম্বাদ পত্রের প্রথা আছে, নববর্ষ প্রবৃত্ত হইলে গত বর্ষের ঘটনা সকল সমালোচনা করিতে হয়। বঙ্গদর্শন সম্বাদ পত্র নহে, সুতরাং বঙ্গদর্শন বর্ষ-সমালোচনে বাধ্য নহে। কিন্তু আমাদের কি সাধ করে না? যেমন অনেকে রাজা না হইয়াও রাজকায়দায় চলেন, যেমন অনেকে কালা বাঙ্গালি হইয়াও সাহেব সাজিবার সাধে কোট পেণ্টেলুন আঁটেন, আমরাও তেমনি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা হইয়াও, দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্বাদ পত্রের অধিকার গ্রহণ করিব ইচ্ছা করিয়াছি।

কিন্তু মনুষ্যজাতির এমনই দুরদৃষ্ট যে, যে যখন যে সাধ করে, তাহার সেই সাধে তখন বিঘ্ন ঘটে। নূতন বৎসর গিয়াছে পৌষ মাসে, আমরা লিখিতেছি অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন! সর্ব্বনাশ, এ যে রাম না হইতে রামায়ণ! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে বঙ্গদর্শন রচনাসম্বন্ধে কোন নিয়মই মানে না—অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। অতএব আমরা, মনের সাধ মনে না মিটাইয়া, সে সাধে বিষাদ ইত্যাদি অনুপ্রাসের লোভ সম্বরণ করিয়া, অগ্রহায়ণ মাসেই ১৮৭৫ সালের সমালোচন করিব। অতএব হে গতবর্ষ! সাবধান হও, তোমাকে সমালোচন করিব।

গতবৎসরে রাজকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, যে এই বৎসরে তিনশত পঁয়ষট্টি দিবস ছিল, একদিনও কম হয় নাই। প্রতি দিবসে ২৪টি করিয়া ঘণ্টা, এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬০টি করিয়া মিনিট ছিল। কোনটির আমরা একটিও কম পাই নাই। রাজপুরুষগণ ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে। অনেকে বলেন যে এ বৎসরে গোটাকত দিন কমাইয়া দিলে ভাল হইত; আমরা এ কথার অনুমোদন করি না; দিন কমাইলে কেবল চাকুরিয়াদিগের বেতন লাভ, এবং সংবাদ পত্র লেখকদিগের

শ্রমলাঘব ; সাধারণের কোন লাভ নাই ; (আমরা মাসিক, ১২ মাসে বারখানি কেহ ছাড়িবে না।) তবে, গ্রীষ্মকালটি একেবারে উঠাইয়া দিলে, ভাল হয় বটে। আমরা কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি, বারমাসই শীতকাল থাকে এমন একটি আইন প্রচারের চেষ্টা দেখুন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এ বৎসর সকলেরই এক এক বৎসর পরমায়ু চুরি গিয়াছে। কথাটায় আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমাদের ৭১ বৎসর বয়স ছিল, এ বৎসর ৭২ হইয়াছে। যদি পরমায়ু চুরি গেল, তবে এক বৎসর বাড়িল কি প্রকারে ? নিন্দক সম্প্রদায়ই এমত অযথার্থ প্রবাদ রটাইয়াছে।

এ বৎসরে যে সুবৎসর ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, এ বৎসর অনেকেরই সন্তান জন্মিয়াছে। টিষ্টিমেষ্টেল ডিপার্টমেণ্টের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ বিশেষ তদন্তে জানিয়াছেন, যে কাহারও কাহারও পুত্র হইয়াছে, কাহারও কন্যা হইয়াছে, এবং কাহার গর্ভস্রাব হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এ বৎসর কতকগুলি মনুষ্য, অধিক নহে, রোগাদিতে মরিয়াছে। শুনিয়াছি যে এদেশীয় কোন মহাসভা পার্লিমেণ্টে আবেদন করিবেন যে, এই পুণ্যভূম ভারতরাজ্যে, মনুষ্য না মরিতে পায়। তাঁহারা এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, যদি কাহারও নিতান্ত মরা আবশ্যক হয়, তবে সে পুলিসে জানাইয়া অনুমতি লইয়া মরিবে।

এ বৎসরে ফাইন্যান্‌সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের কাণ্ড অতি বিচিত্র—আমরা শ্রুত হইয়াছি যে গবর্ণমেণ্টের আয়ও হইয়াছে, ব্যয়ও হইয়াছে। ইহা বিস্ময়কর হউক বা না হউক, বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের টাকা হয় কিছু উদ্বর্ত্ত হইয়াছে, নয় কিছু অকুলান হইয়াছে, নয় ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছে। আগামী বৎসর (৭৬ শালে) টেক্স বসিবে কি না, তাহা এক্ষণে বলা যায় না, কিন্তু ভরসা করি ৭৭ শালের এপ্রিল মাসে আমরা একথা নিশ্চিত বলিতে পারিব।

এবার বিচারালয় সকলের কার্য্যের আমরা বিশেষ সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। সত্য বটে যে, যে নালিশ করিয়াছে, তাহার বিচার হইয়াছে, বা হইবে এমন উদ্যোগ আছে, কিন্তু যাহারা নালিশ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কোন বিচার হয় নাই। আমরা ইহা বুঝিতে পারি না ; যেখানে সাধারণ বিচারালয়, সেখানে, নালিশ করুক বা না করুক, বিচার চাই। কেহ রৌদ্র চাহুক, বা না চাহুক সূর্য্যদেব সর্ব্বত্র রৌদ্র করিয়া থাকেন, কেহ বৃষ্টি চাহুক বা না চাহুক, মেঘ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং কেহ বিচার চাহুক বা না চাহুক,

বিচারকের উচিত গৃহে গৃহে ঢুকিয়া বিচার করিয়া আসেন। যদি কেহ বলেন, যে বিচারকগণ এরূপ বিচারার্থ গৃহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে গৃহস্থগণের সম্মার্জ্জনী সকল অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সম্মার্জ্জনীকে তাদৃশ ভয় করেন না—সম্মার্জ্জনীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হাকিমদিগের বিলক্ষণ পরিচয় আছে, এবং প্রায় প্রত্যহ ইহার সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হইয়া থাকে। যেমন ময়ুর সর্পপ্রিয় ইঁহারাও তেমনি সর্ম্মার্জ্জনীপ্রিয়—দেখিলেই প্রায় ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা এমনও শুনিয়াছি যে গবর্ণমেণ্টের কোন অধস্তন কর্ম্মচারি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যেমন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের পুরস্কারের জন্য "অর্ডর অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" সংস্থাপিত করা হইয়াছে, সেইরূপ নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের জন্য "অর্ডর অব দি ব্রুম্‌ষ্টিক্" সংস্থাপিত করা হউক। এবং বিশেষ বিশেষ গুণবান্ ডিপুটি এবং সবজজ প্রভৃতিকে বাছিয়া বাছিয়া লাকলাইনের দড়িতে এই মহারত্নটিকে বাঁধিয়া তাঁহাদিগের গলদেশে লম্বমান করিয়া দেওয়া হউক। তাঁহাদের চাপকান চেন চাদর বিভূষিত সদা কম্পবান্ বক্ষে ইহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে। রাজপ্রসাদ স্বরূপ প্রদত্ত হইলে ইহা যে সাদরে গৃহীত হইবে, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। আমাদের কেবল আশঙ্কা এই যে এত উমেদওয়ার যুটিবে যে ঝাঁটার সঙ্কুলান করা ভার হইবে।

গতবৎসর সুবৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বত্র সমান হয় নাই। ইহা মেঘদিগের পক্ষপাত বটে। যে সকল দেশে বৃষ্টি হয় নাই, সে সকল দেশের লোকে গবর্ণমেণ্টে এই মর্ম্ম আবেদন করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যাহাতে সর্ব্বত্র সমান বৃষ্টি হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভূত হউক। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার সদুপায় নিরূপণ জন্য একটি কমিটি সংস্থাপিত করা উচিত। কোন কোন মান্য সহযোগী বলেন যে, যদি সরকার হইতে মেঘদিগের বারবরদারি বরাদ্দ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের কোন দেশেই যাইবার আর আপত্তি থাকে না। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতেও সুবিধা হইবে না—কেননা বঙ্গদেশের মেঘ সকল অত্যন্ত সৌদামিনীপ্রিয়—সৌদামিনীগণকে ছাড়িয়া টাকার লোভেও দেশ দেশান্তরে যাইতে স্বীকার করিবে না। আমরা প্রস্তাব করি যে মেঘ সকল এবালিশ করিয়া দিয়া, ভিস্তীর বন্দোবস্ত করা হউক। ক্ষেত্রে এক একজন চাপরাশী বা সুযোগ্য ডিপুটি এক একজন ভিস্তীকে দীর্ঘ বংশ খণ্ডে বাঁধিয়া উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া তুলিয়া ধরিবেক, ভিস্তী তথা হইতে ক্ষেত্রে জল ছড়াইয়া পারে ত নামিয়া আসিবে। ভাল হয় না ?

আমাদের দেশের কামিনীগণ যে দেশহিতৈষিণী নন্—নহিলে ভিস্তীর প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা যদি প্রাত্যহিক সাংসারিক কান্নাটা মাঠে গিয়া কাঁদিয়া আসেন, তাহা হইলে অনায়াসেই কৃষিকার্য্যের সুবিধা হয়, ও মেঘ ডিপার্টমেণ্ট এবালিশ করা যাইতে পারে। তবে আমরা লোকের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলার্থ বলি যে, আকাশবৃষ্টির পরিবর্ত্তে নারীনয়নাশ্রুর আদেশ করিতে গেলে একটু পাকা রকম পুলিসের বন্দোবস্ত করা চাই। মেঘের বিদ্যুতে অধিক প্রাণী নাশ হয় না, কিন্তু রমণীনয়নমেঘের কটাক্ষ বিদ্যুতে, মাঠের মাঝখানে, চাষা ভুষোর ছেলেদের কি হয় বলা যায় না—পুলিস থাকা ভাল।

শুনিলাম শিক্ষাবিভাগে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়াছি অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক একটা কাণমাপা কাটি প্রস্তুত করিয়াছে। তাহা দের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—তাহারা বলে, অধ্যাপকদিগের শ্রব-নেন্দ্রিয়গুলি মাপিয়া দেখিব—নহিলে তাঁহাদিগের নিকট পড়িব না। আমরা ভরসা করি মাপা কাঠি ছোট পড়িবে, এমত সম্ভাবনা কোথাও নাই।

যাহা হউক, দুর্ব্বৎসর হউক, সুবৎসর হইক, তিনটি নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা স্থির জানিতে পারিতেছি—তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

প্রথম, বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে মতান্তর নাই।

দ্বিতীয়, বৎসর গিয়াছে, আর ফিরিবে না। ফিরাইবার জন্য কেহ কোন উদ্যোগ পাইবেন না। নিষ্ফল হইবে।

তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে, পাঠক! আপনার ও আমার পক্ষে সমান কথা, কেন না, আপনার ও আমার, পঁচাত্তরেও ঘাস জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস জল। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ঘাস জলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

চীন, ভারতবর্ষ, কাল্‌ডিয়া, মিসর এবং গ্রীস দেশে খ্রীষ্টাব্দের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনার সূত্রপাত হয়। চীনেরা এই শাস্ত্র রাজনীতি এবং হিন্দু ক্যাল্‌ডিয় ও মিসর জাতিরা ধর্ম্মনীতির ন্যায় অপরিবর্ত্তসহ বিবেচনা করিতেন। কিন্তু গ্রীসে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি অথবা ফলিত জ্যোতিষের সহিত সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের কোনরূপ সংস্রব না থাকায় উক্ত দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। হিপার্কস্‌ এবং টলেমি কর্ত্তৃক যে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয়, নিউটন্‌ এবং লাপ্লাসের দ্বারা তাহারই পরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। কোন্‌ সময়ে চীন, ভারতবর্ষ, ক্যাল্‌ডিয়া এবং মিসর দেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রালোচনার আরম্ভ হয় তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন; এবং আধুনিক কৃতবিদ্য মহোদয়গণ জাতিবিশেষের গৌরব রক্ষার্থ যত্নবান্‌ হওয়াতে এই বিষয়ের মীমাংসা অতীব দুরূহ হইয়াছে। যাহা হউক, ক্যাল্‌ডিয়া এবং মিসর দেশের জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে প্রতীতি হইবে যে তদ্দেশে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের বহুকালব্যাপী অনুশীলন হয় নাই।

চীন

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের বিবরণ হইতেই চীন দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, চীনের সম্রাট্‌ ফোহির রাজত্ব সময়ে চীন দেশে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের আলোচনার সূত্রপাত হয়। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে ফোহি এবং নোয়া ব্যক্তিবিশেষের নামান্তর মাত্র। ফোহি জ্যোতিষিক তালিকা প্রস্তুত করেন, এবং গগনবিহারীদিগের আকৃতি নিরূপণেও বহুবিধ যত্ন করিয়াছিলেন। হোয়াংটীর রাজত্ব সময়ে (প্রায় খৃঃ পূঃ ২৬৯৭ অব্দে) যুসি উপমেরু নক্ষত্র, এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি অচল এবং সচল বৃত্ত সম্বলিত একটী গোলক নির্ম্মাণ করেন, এবং চারিটী প্রধান দিঙ্‌নিরূপণোপযোগী যন্ত্রের (যাহা কেহ

দিগদর্শন যন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গব্রিল সাহেব লিখিয়াছেন যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে চীনেরা অপমণ্ডলের তির্য্যক্তা এবং গ্রহণের প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিয়াছিলেন; এবং ইহার বহুকাল পূর্ব্বে সৌর বৎসরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য এবং শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা সৌর মাধ্যাহ্নিক উন্নতি অবধারিত করিয়া সূর্য্যের ক্রান্তি নির্ণয়, এবং মেরুর উন্নতি প্রভৃতি নিরূপণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। গব্রিল আরও লিখিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে প্রণীত চীন দেশীয় কতকগুলি জ্যোতিষিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চীনেরা সূর্য্যের এবং চন্দ্রের প্রাত্যহিক গতি, এবং গ্রহগণের পরিভ্রমণকাল নিরূপণ করিয়াছিলেন। ডিউহোগু বলিয়াছেন যে চিউন কং নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রায় ১০০০ বৎসর খৃঃ পূঃ নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পুঞ্জে নক্ষত্রগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয়

হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্গণ নাক্ষত্রিক বর্ষের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিবস, ৬ ঘণ্টা, ১২ মিনিট, ৩০ সেকেণ্ড; এবং সৌর বৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিবস, ৫ ঘণ্টা, ৫০$\frac{১}{২}$ মিনিট নিরূপণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গণনানুসারে বিষুবদ্বয় প্রতি বৎসর ৫৪″ পুরোগমন করে। তাঁহারা অপমণ্ডল নিরক্ষবৃত্ত ছেদ করিয়া যে কোণ উৎপন্ন করেন তাহা ২৪০ পরিমিত; চন্দ্রকক্ষ ও নিরক্ষবৃত্ত পরস্পর তির্য্যগভাবে ছিন্ন করিয়া যে কোণ উৎপাদন করেন তাহা ৪° ৩০′ পরিমিত; বুধ, শুক্র এবং শনির কক্ষাবনতি ২° মঙ্গলের কক্ষাবনতি ১°৩০′ এবং বৃহস্পতির কক্ষাবনতি ১° পরিমিত বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহারা কক্ষ-পরিধি যোজন দ্বারা পরিমাণ করিতেন। কোল্‌ব্রুক্ বলিয়াছেন যে আর্য্যভট্ট পৃথিবীর পরিধি ৩৩০০ যোজন নিরূপণ করিয়াছিলেন। ৩৩০০ যোজনে ২৫,০৮০ মাইল; অথবা এক অংশে ৬৯·৭ মাইল গণিত হয়। কোল্‌ব্রুক্ আরও বলিয়াছেন যে গ্রহগণের পাতবিন্দু, নিকট বিন্দু, ও দূর বিন্দুর গতি বিষয়ক হিন্দু সিদ্ধান্ত, চন্দ্রের পাতবিন্দু, নিকট বিন্দু ও দূর বিন্দুর সাদৃশ্য হইতে অনুমিত হইয়াছে। টলেমি প্রচারিত মতের যে অংশ হিপার্কস কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয়, তাহাও হিন্দুদিগের অবিদিত ছিল না। ইঁহারা লঙ্কার যাম্যোত্তর বৃত্ত হইতে দ্রাঘিমা গণনা করিতেন। সৌরবৎসর, চান্দ্রমাস এবং বিষুবতের পুরোগমন এই তিন বিষয়ে হিন্দু জ্যোতিষিক গণনা যে হিপার্কস্ অথবা টলেমির গণনা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রাচীন হিন্দুরা আপনাদিগের পর্য্যবেক্ষণ ফল মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য দশটি নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্যথা (১) গোল,

(২) নাড়ীবলয়, (৩) যষ্টি, (৪) শঙ্কু, (৫) ঘটী, (৬) চক্র, (৭) চাপ, (৮) বৃত্তপাদ, (৯) ফলক, (১০) ধীযন্ত্র। * ইহা ব্যতীত সূর্য্যসিদ্ধান্তে নরযন্ত্র † সসূত্র রেণু-গর্ভাখ্য ‡ যন্ত্রের উল্লেখ আছে।

হিন্দুরা ৪৩২,০০০ বৎসরে একযুগ এবং দশযুগে অথবা ৪,৩২০,০০০ বৎসরে এক মহাযুগ, এবং এক সহস্র মহাযুগে এক কল্প অথবা ব্রহ্মার একদিবস গণনা করিতেন। এই সুদীর্ঘ কালের সহিত জ্যোতিষিক কালচক্রের সম্বন্ধ নিরূপণার্থ পণ্ডিতেরা নানাবিধ যত্ন করিয়াছেন বটে কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। §

হিন্দু জ্যোতিষিক গ্রন্থে বরাহ মিহির এবং ব্রহ্মগুপ্তের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। উজ্জয়িনী নগরীর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে ব্রহ্মগুপ্ত ৬২৮ খৃঃ অব্দে, এবং কোল্‌ব্রুক সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে তিনি খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দ শেষে বর্ত্তমান ছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত "ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত" অথবা "ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কোল্‌ব্রুক্ বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থে গ্রহগণের সমগতি ও তাহাদিগের প্রকৃত স্থান সন্নিবেশ নিরূপণ বিষয়ক গণনা, সাময়িক সম্পাদ্য, ভূপৃষ্ঠে স্থান নিরূপণের উপায়, সৌর এবং চান্দ্র গ্রহণ গণনা, গ্রহগণের উদয়াস্ত কাল নির্ণয়, শঙ্কুদ্বারা উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ, গ্রহগণের পরস্পর এবং নক্ষত্রগণের সহিত সংযোগ, চান্দ্র এবং সৌর গ্রহণের কারণ, এবং গোল প্রভৃতি নির্ম্মাণের উপায়, বর্ণিত আছে।

এই সকল স্বীকৃত বিষয় হইতে কোল্‌ব্রুক্ এবং উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অনুমান করিয়াছেন যে—বরাহমিহির খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের শেষে আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বরাহমিহির ফলিত-জ্যোতিষ বিষয়ক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন এবং "বৃহৎসংহিতা" প্রণয়ন করেন। উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ খৃঃ ২০০ অব্দে অপর এক বরাহমিহিরের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণে জনশ্রুতি আছে যে বরাহমিহির রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার একটী রত্ন ছিলেন। তাহা হইলে তিনি যে খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দে জীবিত ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। $

---

* সিদ্ধান্ত শিরোমণি ১১অ ২।

† সূ সি ১৩ অ ১৪।

‡ সূ সি ১৩ অ ২২।

§ এ বিষয়ে একটি কথা আমাদিগের মনে হয়। বিষুবদ্বয় প্রতিবৎসর ৫৪ পুরোগমন করে তাহা হইলে ৩৬০° [সম্পূর্ণ মণ্ডল] ২৪০০০ বৎসরে পুরোগমন করিতে পারে। ইহারই অষ্টাদশ গুণ ৪৩২০০০। কিন্তু আমরা স্বীকার করি ইহাকে বলে, "গোঁজা মিলন।" প্রাচীন আর্য্যঠাকুরেরা এইরূপ গোঁজা মিলন দিয়াছিলেন কি না কে জানে?— বং সং

$ বিক্রমাদিত্যও অনেকগুলি ছিলেন। বং সং

আর্য্যভট্ট, (আরবেরা যাহাকে আর্য্যবাহার বলে,) খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। আর্য্যভট্ট জ্যোতিষ এবং বীজগণিত বিষয়ক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন।

পুলিষ এবং পরাসর প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ আর্য্যভট্টের সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ইহাদিগের বিরচিত কোন গ্রন্থই এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভাস্করাচার্য্য "লীলাবতী," "বীজগণিত," "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষিক গ্রন্থ "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহার নিশ্চয় নাই। অতি প্রাচীন গ্রন্থ সকলেও এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এক্ষণে যে গ্রন্থ "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" নামে প্রসিদ্ধ, প্রাচীনকালে সেই গ্রন্থেরই নাম "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" ছিল কি না তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। হিন্দুরা সময়ে সময়ে আপনাদিগের প্রাচীন গ্রন্থের ভ্রম সংশোধন করিতেন, কিন্তু গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিতেন না। সম্ভবতঃ প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইয়াছে।

বেণ্টলী সাহেবের মতে বরাহমিহির "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" প্রণেতা ; কিন্তু কোলব্রুক্ এই মতের অপলাপ করিয়াছেন।

হিন্দু এবং ব্রহ্মদেশীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে রাহু নামক গ্রহদ্বারা সূর্য্য এবং চন্দ্র গ্রস্ত হওয়াতে গ্রহণ হইয়া থাকে। গ্রহগণের গতি, অবস্থান, বক্রগমন প্রভৃতি পাতবিন্দু এবং সংযোগবিন্দু অধিষ্ঠিত দেবতাদিগের প্রভাবেই হইয়া থাকে। আর্য্যভট্ট গ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ; এবং পৃথিবীর আহ্নিকগতিও নির্ণয় করিয়াছিলেন ; এবং এই আহ্নিকগতির কারণ "প্রবাহ" নামক প্রবল বায়ু নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত এই মতের অপলাপ করিয়া বলিয়াছেন যে এইরূপ হইলে উপরিস্থিত সকল পদার্থই ভূপৃষ্ঠে পতিত হইত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের টীকাকার পৃথূদক স্বামী ব্রহ্মগুপ্তের এই আপত্তি খণ্ডন করিয়াছিলেন।

১৬৮৭ খৃঃ অব্দে লৌবেরী শ্যামরাজ্যে রাজদৌত্যে প্রেরিত হন। স্বদেশ প্রত্যাগমনকালে তিনি শ্যামদেশীয় কতকগুলি জ্যোতিষিক তালিকা লইয়া যান। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে ডিউষাম্প নামক খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারক কর্ণাট দেশস্থ কৃষ্ণ বৌরাম বা কৃষ্ণ বা রাম নামক নগর হইতে ইউরোপ খণ্ডে কতকগুলি জ্যোতিষিক তালিকা প্রেরণ করেন। এই সময়ে পাটোইলেট নামক অপর একজন প্রচারক ও মসলিপত্তনের নিকটবর্ত্তী নর্শপুর নামক স্থান হইতে অন্যান্য জ্যোতিষিক তালিকা

সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে লা-জেন্‌টিস্ যিনি শুক্র গ্রহের সূর্য্যাতিক্রম পর্য্যবেক্ষণ মানসে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ত্রীবেলোর হইতে কতকগুলি জ্যোতিষিক তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে শ্যামদেশীয় তালিকা খৃঃ ৬৭৮ অব্দে, কৃষ্ণ বৌরামের তালিকা খৃষ্টীয় ১৪৯১ অব্দে, নর্শপুরের তালিকা খৃঃ ১৫৫৯ অব্দে ট্রীভ্যালোরের তালিকা খৃঃ পূর্ব্ব ৩১০২ অব্দে, অর্থাৎ কলিযুগের প্রারম্ভে প্রস্তুত হইয়াছিল।

অতি প্রাচীন কালেই হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল, গ্লেফেয়ার এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। লেস্‌লী এই মতের অপলাপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোল্‌ব্রুক্ লেস্‌লির মত প্রমাদপূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন খৃষ্টীয় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা জ্যোতির্ব্বিদ্যার সম্যগালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ডিলামব্রী গ্রীক্‌দিগের জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে গ্রীক্‌জাতিই সিদ্ধান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রণেতা।

হিন্দু জ্যোতিষিক গ্রন্থসমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা, প্রথমতঃ যে সকল গ্রন্থ দেবদত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ যে সকল গ্রন্থ সুবিখ্যাত পুরাতন ঋষিদিগের দ্বারা প্রণীত; তৃতীয়তঃ যে সকল গ্রন্থ কোন অনির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক রচিত, চতুর্থতঃ যে সকল গ্রন্থের প্রণয়ণ কাল এবং রচয়িতার নাম আমরা অবগত হইয়াছি।

ব্রহ্ম, সূর্য্য, সোম, বৃহস্পতি এবং নারদ সিদ্ধান্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত—ইহা "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" পুরাণের অন্তর্গত।

২। সূর্য্যসিদ্ধান্ত—কথিত আছে যে সূর্য্যদেব ময় নামক দানবকে* কৃত † যুগাবসানে এই শাস্ত্রে উপদেশ দেন।‡ সুতরাং হিন্দু গণনানুসারে এই গ্রন্থ ২১৬৪৯৭৬ বৎসর$ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। বেন্টলী সাহেব গণনা দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত খ্রী ১০৯১ অব্দে রচিত হয়; কিন্তু এই মত প্রমাদপূর্ণ, সুতরাং গ্রহণীয় নহে।

* সূর্য্যসিদ্ধান্ত—১ অধ্যায়—৪।৫।

† কৃত—কৃ-করা+ত।

‡ আবুর রেহান, যিনি গজ্‌নিপতি মামুদের সহিত ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ১০৩১ খৃ অব্দে ভারতবর্ষ বৃত্তান্ত নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি "লাত" নামক ব্যাক্তিবিশেষকে সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ওয়েবার সাহেব ব্রহ্মগুপ্ত বর্ণিত "লাধ" এবং "লাত" এক ব্যাক্তিরই স্বতন্ত্র নাম মাত্র অনুমান করিয়াছেন।

$ ত্রেতার (ত্র-রক্ষা-ইত-আ) বৎসর সংখ্যা—১২৯৬০০০ দ্বাপরের (দ্বি-পর)—বৎসর সংখ্যা—৮৬৪০০০ কলির (কল-গণনা) অতীত বৎসর সংখ্যা—৪৯৭৬।

৩। সোমসিদ্ধান্ত—সোম (চন্দ্র) এই গ্রন্থ প্রণেতা। বেণ্টলী সাহেব বলিয়াছেন যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতই এই গ্রন্থে অবলম্বিত হইয়াছে।

৪। বৃহস্পতিসিদ্ধান্ত—ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেবগুরু বৃহস্পতি প্রণীত এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে এই গ্রন্থ অতি আদরণীয় ছিল।

৫। নারদসিদ্ধান্ত—ইহা দেবর্ষি নারদ প্রণীত।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। গর্গসিদ্ধান্ত—এই গ্রন্থ এক্ষণে অপ্রাপ্য হইয়াছে; কেবল হিন্দু জ্যোতিষিক গ্রন্থে কখন কখন গর্গসিদ্ধান্ত হইতে উদ্ধৃত অংশ মাত্র দৃষ্ট হয়।

২। ব্যাসসিদ্ধান্ত।

৩। পরাশরসিদ্ধান্ত—বেণ্টলী সাহেব বলেন যে আর্য্যসিদ্ধান্তের দ্বিতীয় অধ্যায় পরাশর প্রণীত সিদ্ধান্ত লিখিত গ্রহগণের সমগতি বিষয়ক প্রস্তাব উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪। পৌলিষসিদ্ধান্ত—কোল্‌ব্রুক্ এবং বেণ্টলী এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এবং আর্য্যসিদ্ধান্তের মত পরস্পর বিরোধী।

৫। পুলস্তসিদ্ধান্ত।

৬। বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত—বেণ্টলী এবং কোল্‌ব্রুক্ সাহেব বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বেণ্টলী আরও বলিয়াছেন যে বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তে অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। আর্য্যসিদ্ধান্ত—আর্য্যভট্ট "আর্য্যাষ্টশতক" এবং "দশগীতক" নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন। বেণ্টলী সাহেব "আর্য্যসিদ্ধান্ত" এবং "লঘুআর্য্যসিদ্ধান্ত" নামক যে দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় উক্ত দুইখানি গ্রন্থেরই নামান্তর হইবেক।

২। বরাহসিদ্ধান্ত—বরাহমিহির ব্রহ্ম, সূর্য্য, পৌলিষ, বশিষ্ঠ এবং রোমক সিদ্ধান্তের সার সংগ্রহ করিয়া "পঞ্চ সিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৩। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত—ব্রহ্মগুপ্ত রচিত। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম "ব্রহ্ম-স্ফুটসিদ্ধান্ত।" ভাস্করাচার্য্য এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "সিদ্ধান্তশিরোমণি" রচনা করেন।

৪। রোমকসিদ্ধান্ত—কৃষ্ণ বশিষ্ঠসিদ্ধান্তের মতাবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বরাহমিহির প্রণীত সিদ্ধান্তে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

৫। ভোজসিদ্ধান্ত—খ্রীষ্টীয় দশ বা একাদশ শতাব্দে ধাররাজ ভোজদেবের রাজত্ব সময়ে এই জ্যোতিষিক গ্রন্থ রচিত হয়।

নিম্নলিখিত গ্রন্থ পাঁচ খানি চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে ভাস্করাচার্য্য "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শাণ্ডিল্য গোত্রোদ্ভব ভাস্কর ১০৩৬ শকে* মহেশ্বরের ঔরসে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সহ্য পর্ব্বত নিকটবর্ত্তী কোন নগর ইঁহার পৈতৃক বাসভূমি ছিল।†

২। খৃ ষোড়শ শতাব্দারম্ভে জ্ঞানরাজ "সিদ্ধান্তসুন্দর"; ১৪৪২ শকে (১৫২০ খৃ অব্দে) গণেশ "গ্রহলাঘব" এবং ১৬২ খৃ অব্দে কমলাকর "তত্ত্ব-বিবেক" বা "সিদ্ধান্ত-তত্ত্ববিবেক" রচনা করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের সুবিখ্যাত টীকাকার রঙ্গ-নাথের পুত্র মুনীশ্বর "সিদ্ধান্তসার্ব্বভৌম" নামক জ্যোতিষিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং সিদ্ধান্ত শিরোমণির একটী টীকাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ মধ্যে "সূর্য্যসিদ্ধান্ত," "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" এবং "গ্রহলাঘব" মুদ্রিত হইয়াছে।

কালডীয়

মাসিদনাধিপতি বিখ্যাত বীর আলেকজণ্ডার খৃঃ পূঃ ৩৩২ অব্দে বাবিলন আক্রমণ করেন। কথিত আছে ইহার ১৯০৩ বৎসর পূর্ব্বে বাবিলোনীয়দিগের কতকগুলি জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণ ফল কালিস্ থেনিস কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধনামা আরিষ্ট-টলের নিকট প্রেরিত হয়, সুতরাং খ্রীষ্টীয় শকের ২২৩৪ বৎসর পূর্ব্বে কালডীয় দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু টলেমী খৃঃ ৭২০ বৎসর পূর্ব্বে কালডীয় পর্য্যবেক্ষণের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। যদিও কালডীয়দিগের গ্রহণ গণনা করিবার প্রথা, যাহা টলেমী প্রণীত আলমাজেষ্ট নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে, তাদৃশ উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, তথাচ এই প্রথা অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্য জাতিরা সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের বর্ত্তমান উন্নতি করিয়াছেন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কালডীয় জাতি রাশিচক্র দ্বাদশ সমান অংশে, প্রত্যেক অংশ ৩০° এবং প্রত্যেক (.) ৬০ বিভক্ত করিয়াছিল; এবং রাশি চক্রের বহিঃস্থ চতুর্ব্বিংশতি নক্ষত্র-পুঞ্জের অবস্থানও নিরূপণ করিয়াছিল। হেরোডোটস্ নামক জগদ্বিখ্যাত

* "The years of the era of Salivahana are, according to Warren, solar years; their reckoning commences after the lapse of 2179 complete years of the Iron age or early in April A.D. 78.

The years of this era are generally cited as Saka or Saka years." Burgess's *Surya Siddhanta, add. notes* 12.

† সিদ্ধান্ত শিরোমণি—১৩ অ—৫৮।৬১।

ইতিহাস রচয়িতা লিখিয়াছেন যে কালডীয় জাতি শঙ্কু এবং পোলস্ নামক যন্ত্রের স্বষ্টিকর্ত্তা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে চীন দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শঙ্কু ব্যবহৃত হয়। পোলস যন্ত্রের দ্বারা বোধ হয় কালডীয়েরা অয়নবিন্দু নিকটবর্ত্তী সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক উন্নতির পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিত। ঘটীই ইহাদিগের কালমান-যন্ত্র স্বরূপ ছিল।

আপলোনিয়স্ মিনডিয়স্ নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত কাল্‌ডীয় আচার্য্য হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। অ্যাপেলোনিয়স্ বলিয়াছেন যে ক্যালডীয় জাতি গ্রহগণ এবং ধূমকেতুগণ এক জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিত এবং এই গগণ-বিহারীদিগের গতির নিয়মও নিরূপণ করিয়াছিল। আপলেনিয়সের বিবরণ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ক্যাল্‌ডীয় জাতি যে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের সমধিক অনুশীলন করিয়াছিল তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিবার নহে।

জেমিনস্ লিখিয়াছেন, কাল্‌ডীয় জাতি যে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সম্যগালোচনা করিয়াছিল তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে তাহাদিগের গণনানুসারে চন্দ্র ৬৫৮৫১/৩ দিবসে সূর্য্য সম্বন্ধে ২২৩ বার, আপন কক্ষের নিকট বিন্দু ও দূরবিন্দু সম্বন্ধে ২৩৯ বার, এবং আপন পাতবিন্দু সম্বন্ধে ২৪১ বার আবর্ত্তন করে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কালডীয় জাতি অতিশয় যত্ন সহকারে গ্রহগণ, বিশেষতঃ শনৈশ্চর গ্রহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল।

মিসরীয়

পূর্ব্বকালে মিসরদেশবাসীরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ডীওডোরস্ সিকুলস্ বলিয়াছেন যে মিসরীয়েরা গ্রহণ গণনা করিতে পারিত; এবং ডীওজেনিস লেয়ার্‌সিউস্ মিসর দেশে পর্য্যবেক্ষিত ৩৭৩ সৌর এবং ৮৩২ চান্দ্র গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে যে কোনন্ (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দ) মিসরীয় সমস্ত সূর্য্য-গ্রহণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং আরিসটট্‌ল লিখিয়াছেন যে কালডীয় এবং মিসরীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে সকল জ্যোতিষিক গণনা করিয়াছিলেন তাহাতে ভ্রম মাত্র নাই।

মিসরীয়েরা ৩৬৫ দিবসে বৎসর গণনা করিত বটে, কিন্তু ৩৬৫১/৪ দিবসে বৎসর গণনা যে অপেক্ষাকৃত সঙ্গত, তাহাও অতি প্রাচীনকাল হইতেই অবগত ছিল। ডাও ক্যাসিয়স্ বলিয়াছেন যে মিসরীয়েরা সপ্তাহ গণনা করিবার প্রথা প্রচলিত করে; এবং গ্রহগণের নামানুসারে সপ্তাহান্তরর্গত দিবস সংখ্যার নাম নির্দ্দেশ করে। হিন্দু পুরাণেও এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, সুতরাং এই মত অত্যন্ত প্রাচীন বলিতে হইবেক।

মিসর জাতি পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র জ্ঞান করিত। তাহাদিগের ধারণা ছিল যে শুক্র এবং বুধ গ্রহ সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, এবং সূর্য্য উক্ত পরিভ্রমণকারী গ্রহদ্বয়ের সহিত পৃথিবী পরিভ্রমণ করে। সুতরাং শুক্র এবং বুধ কখন বা সূর্য্যাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী, কখন বা তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী, হয়। ম্যাক্রোবিয়স এই মত বিশুদ্ধ মিসরীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কথিত আছে যে ২৫০০ খৃঃ পূঃ মিসরীয়েরা রাশিচক্র এবং দ্বাদশ রাশির নাম ও অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল। লাপলাস্ প্রভৃতি কতিপয় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতেরা এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীঃ
সাং ভবানীপুর।

ইউরোপীয়েরা কবিত্বের উপর অনেকটা হতাদর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহ এবং যত্ন বিজ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত। কাব্যের এইরূপ অযথা অনাদর দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। সে দিবস একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিতেছিলেন—বিজ্ঞানের অনুশীলন কর, তাহা বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তাই বলিয়া জড়-প্রকৃতিকে সারসর্বস্ব করিয়া তুলিতেছ কেন? মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, সুতরাং যেমন বুদ্ধি-বৃত্তির, তেমনি হৃদয়েরও অনুশীলন হওয়া কর্ত্তব্য। ইউরোপে তাহা হইতেছে না।

আমাদিগের দেশেও তাহা হইতেছে না। ইউরোপ একদিকে ছুটিতেছে; আমরা তাহার বিপরীত দিকে যাইতেছি। প্রাচীন গ্রীসে যে কয়েকটি রস-কাব্যের আধার বলিয়া পরিগণিত ছিল, আধুনিক ইউরোপেও তাহাই আছে; কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের পাঁচটি ভূতের স্থানে এক্ষণে পঁয়ষট্টিটী দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। প্রাচীন ভারতে যে পাঁচটি ভূত ছিল, এখনও সেই ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম আছে, কিন্তু রসের যারপরনাই ছড়াছড়ি। মূলরসের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই বটে, কেননা যাহা প্রাচীন এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাহার উপর বাক্যব্যয় করা হিন্দুসন্তানের পক্ষে পঞ্চ মহাপাতক মধ্যে গণ্য; কিন্তু শাখা প্রশাখার বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে নয়টি রস ছিল। শান্তিরস তাহার মধ্যে একটি। সেই শান্তিরসের একটি শাখা ভক্তিরস। আমাদের দেশে এখন একা ভক্তিরসই চৌষট্টিবিধ।* ইউরোপীয়েরা প্রাচীন রসেই সন্তুষ্ট; যত কারিগরি, তাহা ভূতের উপর। আমরা প্রাচীন ভূতেই সন্তুষ্ট; কারিগরি কেবল রস লইয়া। ইউরোপে কেবল বিজ্ঞান—কেবল অম্লজন, জলজন, আর যবক্ষারজন; আমাদের দেশে কেবল রস, কেবল কল্পনা, কেবল কবিত্ব—কেবল নির্ম্মল চন্দ্রিকা আর প্রফুল্ল মল্লিকা,

* হরিভক্তিরসামৃত সিন্ধু দেখ।

কোকিলের কূজন আর ভ্রমরের গুঞ্জন, কবরীভূষণ আর কাঁচলিকষণ, বিরহিণী বালা আর যৌবনের জ্বালা।

কল্পনার এইরূপ অযথা অনুশীলন এবং বুদ্ধিবৃত্তির এইরূপ অযথা অনাদর দেখিয়া অনেকে ভীত। বিজ্ঞান ২ করিয়া অনেকে মাথা কপাল ভাঙ্গিয়া মরিতেছেন, তবু বিজ্ঞান হয় না। আবার 'কল্পনায় আর প্রয়োজন নাই, অনুগ্রহ করিয়া ইতি কর' বলিয়া গলা ভাঙ্গিতেছেন, তবু কল্পনা ফুরায় না—কাব্যের উপর কাব্য, নাটকের উপর নাটক, উপন্যাসের উপর উপন্যাস, তাহার উপর নবন্যাস—কল্পনার ছড়াছড়ি। যে কেহ দুই একখানা পুস্তকের দুই এক পাতা উল্‌টাইয়াছেন কি না উল্‌টাইয়াছেন, অমনি সাহিত্যের আসরে নামিয়া 'সখিরে সখি' করিতে বসেন।

কেহ না মনে করেন যে, আমরা কাব্যের নিন্দা করিতেছি। নিন্দা করা দূরে থাক, কাব্যের আমরা বিশেষ পক্ষপাতী এবং কবিদিগকে আমরা যারপরনাই ভক্তি করিয়া থাকি। ইহা আমাদের বিশ্বাস আছে যে, হোমর এবং বর্জ্জিল যত লোকের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইয়া থাকেন, এত আর কেহ না। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যকে পাপ হইতে বিরত রাখিতে, পুণ্যের পথে উৎসাহিত করিতে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধনে, পশুভাবের সংযমনে, কবির ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে আর কেহই পারেন না। ধার্ম্মিকের ধর্ম্মোপদেশ প্রায় ভাসিয়া যায়—প্রায় এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া যায়; কিন্তু কবির কথা হৃদয় ভেদ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি উপদেশ দেন যে, 'বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, নরকভোগ করিতে হইবে,' তাহা হয় ত শুনিয়াও শুনি না, কেননা ধর্ম্মোপদেশকের মুখে নরকটা কেবল কথার কথা মাত্র—নরকের ভাব মনোমধ্যে স্পষ্টীকৃত করা ধর্ম্মোপদেশকের সাধ্যাতীত। কিন্তু কবির উপদেশ সেরূপ নহে। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে নরকে যাইতে হইবে, এরূপ অকার্য্যকর অর্থবিহীন বাক্য কবি প্রয়োগ করিলেন না; সেই নরকের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইলেন। আমরা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে, ভীতিসংকুচিতচিত্তে দেখিলাম,—গভীর নিশায় পৃথিবীর লোক ঘুমাইতেছে, কিন্তু স্কট্‌লণ্ডের রাজ্ঞীর চক্ষে ঘুম থাকিয়াও নাই; তেমন নিদ্রার অপেক্ষা জাগরণ ভাল। গভীর নিশায় লেডি ম্যাক্‌বেথ দীপ হস্তে করিয়া, চক্ষে নিদ্রা আছে অথচ চলিয়া বেড়াইতেছেন, নিদ্রায় তাঁহার শান্তি নাই, কেননা তিনি বিশ্বস্তের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, নিদ্রিতকে জোর করিয়া চিরনিদ্রিত করিয়াছেন। কবির সঙ্গে, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সেই হত-ভাগিনীর পাপ-আশীবিষদংশিত মনের উদ্‌ভ্রান্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ শুনিলাম—ভীত হইলাম। পার্শ্বে চিকিৎসক ছিলেন, তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, হায়! হায়!

যাহা তুমি জানিয়াছ তাহা তোমার জানা উচিত ছিল না,—রোমাঞ্চ হইল। সামান্য পরিচারিকা, সে উঠিয়া বলিল, "সমস্ত শরীরের গৌরবের জন্যও আমি এমন হৃদয় বক্ষের ভিতর চাহি না"—দাসীর মুখের কথা শুনিয়া হৃদয়ের ভিতর হৃদয় ডুবিয়া গেল।* কবির নিকট বিদায় লইলাম, কিন্তু এ অপূর্ব্ব নরকচিত্র হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিল। এমন জীবন্ত উপদেশ স্মৃতি থাকিতে ভুলা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, পাপের কদর্য্যতা দেখাইতে এবং পুণ্যের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে, কবি অদ্বিতীয়। কাব্য ভাল।

কাব্য ভাল, কিন্তু কথা কি জান, কোন বিষয়েরই বেজায় বাড়াবাড়ি ভাল নহে। সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং। কাব্য ভাল, কাব্য থাক, কিন্তু তাই বলিয়া আর কিছু না থাকিবে কেন? সকলই কিছু কিছু চাই, নতুবা সংসার চলে না। কেবল কোমলতা ভাল নহে—স্ত্রীলোকের সংসারে বাতাসের ভর সহে না; কেবল কাঠিন্যও ভাল নহে—পুরুষের সংসারে বিলিব্যবস্থা থাকে না। স্ত্রীলোকে পুরুষে যে সংসার গঠিত তাহাই ভাল, তাহাই চলে। সমাজেও তাই জগতের একই নিয়ম; যে নিয়মবলে ফলটি খসিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, অখিল সংসার সেই নিয়ম জোরে বাঁধা! যে নিয়ম ক্ষুদ্র পরিবারে, সেই নিয়ম বৃহৎ সমাজেও। স্পার্টা কেবল পুরুষের সমাজ, কেননা স্পার্টার স্ত্রীলোকেরাও পুরুষ—স্পার্টান সমাজ চলিল না; বিদ্যুতের ন্যায়, ক্ষণেকের জন্য জ্বলিয়া অমনি নিবিয়া গেল। বঙ্গদেশ কেবল স্ত্রীলোকের সমাজ, কেননা বঙ্গদেশের পুরুষেরাও স্ত্রীলোক, সুতরাং বাঙ্গালার অদৃষ্টে কি আছে তাহা ভাবিতে গেলে পেটের ভাত চাল হইয়া যায়। স্ত্রীলোকে পুরুষে মিলিয়া যে সমাজ গঠিত হয়, সেই সমাজই চলে। কোমলে কঠিনে মিলন হইলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইল। সৌন্দর্য্যের সহিত বলের সামঞ্জস্যই প্রকৃতির চরম উন্নতি। যৌননির্ব্বাচনের সাহায্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, প্রকৃতিকে সেইদিকে লইয়া যাইতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সংসার বলীয়ান্ হইতেছে; যৌননির্ব্বাচন সংসারকে সুন্দর করিতেছে। যাহা সুন্দর এবং বলীয়ান্, তাহাই চলে, কেবল সুন্দর চলে না, কেবল বলীয়ান্ও চলে না। কেবল সৌন্দর্য্য লইয়া ইতালি মারা গিয়াছে—কবির দুঃখ এই যে, ইতালি তুমি এত সুন্দর হইয়াছিলে কেন? কেবল সৌন্দর্য্য লইয়া ভারতবর্ষ মারা গিয়াছে—ভারতীয় কবিও এই দুঃখ করিতে পারেন। কেবল সৌন্দর্য্য লইয়া ওয়াণ্টার স্কটের কাব্য সকল মারা গিয়াছে—তাহাতে প্রচুর সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু বল নাই, সুতরাং সে সকলের বড় একটা আদর নাই। আবার কেবল বল লইয়া স্পার্টা মারা গিয়াছে, কেবল

---

*Macbeth. Act. v. scene I.

বল লইয়া ক্ষত্রিয়েরা মারা গিয়াছেন। কেবল বল লইয়া কবিকঙ্কণ মারা গিয়াছেন। দুই চাই। ইহাই প্রকৃতির উপদেশ; এবং প্রকৃতির উপদেশ সকলেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; নতুবা মঙ্গল নাই। আমরা প্রকৃতির উপদেশ গ্রহণ করিতেছি না; যাহাতে বল হইবে তাহার কোন অনুষ্ঠানই নাই, সুতরাং আমাদের মঙ্গল নাই। কিন্তু গ্রহণ যে করিতেছি না, তাহার কি কোন কারণ নাই? জগতে কিছুই নিষ্কারণ নহে; আমাদের কবিত্বপ্রবণতার কি কোন কারণ নাই? অবশ্য আছে; এবং সে কারণ কি, তাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একটা কথার মীমাংসা করা উচিত। কবি কাহাকে বলা যায়?

কবিত্বের প্রধান উপকরণ, অনুভাবকতা এবং কল্পনা। অনুভাবকতা সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে কেহ কোন ভাবের বেগ, ভাবের তরঙ্গ হৃদয়মধ্যে অনুভব করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ ভালবাসিয়াছেন অথবা ঘৃণা করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ এক দিন দুঃখ ভাবিয়া মনে২ বলিয়াছেন 'আজিকার রজনী যেন আর পোহায় না,' যে কেহ সুখ ভাবিয়া একদিন মনে মনে বলিয়াছেন, 'সূর্য্যদেব তোমার পায়ে পড়ি, একটু শীঘ্র২ পাটে গিয়ে বসো বাপু,' তিনিই কবি। যে কেহ হাসিয়াছেন অথবা কাঁদিয়াছেন তিনিই কবি; এবং এ সুখদুঃখের সংসারে কে হাসে নাই—কে কাঁদে নাই? অতি পরিষ্কার আকাশেও কালো মেঘ দেখা যায়, আবার নিবিড় জলদের কোলেও সৌদামিনী হাসে; তেমনি সহস্র সুখের মধ্যেও একটু দুঃখ থাকে, আবার সহস্র দুঃখের মধ্যেও একটু সুখ থাকে। সুতরাং অন্তরে অন্তরে কবি সকলেই। তা ঠিক; তবে কিনা যার হৃদয় কঠিন তার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে না—সে ব্যক্তি ভাব অনুভব করে বটে কিন্তু তার হৃদয়ে তরঙ্গ নাই, কেননা তরঙ্গ কাঠিন্যের ধর্ম্ম নহে। আর যার হৃদয় কোমল, যার হৃদয় তরল, ভাবের বাতাস বহিলেই তার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে, কেন না তরঙ্গ তরলতারই ধর্ম্ম—তরলতার ভঙ্গী বিশেষের নামই তরঙ্গ। এই তরঙ্গ যার উঠে এবং ইহার মূর্ত্তি ভাষার বর্ণে যে আঁকিতে পারে, সেই প্রকাশ্যে কবি। যে পারে না, সে কবি হইয়াও কবি নহে। সেই জন্য সকলে কবি নহে। বাঙ্গালির হৃদয় কোমল, বাঙ্গালিহৃদয় তরল, এইজন্য বাঙ্গালি কবি। আবার অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাধিপত্য। বাঙ্গালি অশিক্ষিত, অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি, কুসংস্কারান্ধ, সুতরাং বাঙ্গালির কল্পনাও প্রবল, সুতরাং বাঙ্গালি কবি। কিন্তু এ কল্পনা, এ অনুভাবকতা কোথা হইতে আসিবে?

প্রাচীন আর্য্যগণ ধর্ম্মের বন্ধনে হিন্দুসমাজকে অষ্টপৃষ্ঠে ললাটে বাঁধিলেন। বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য স্বাধীন ভাবে হইতে থাকিলে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য থাকে না, সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিকেও সেই বন্ধনে বাঁধিতে হইল। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি পাকাইয়া২

বৃহৎ এক রজ্জু নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে ভারতবর্ষকে বাঁধিয়া, রজ্জুর দুই মুখ স্বহস্তে ধরিয়া বসিলেন। যদি কেহ কখন বন্ধন মুক্ত হইবার উপক্রম করিল, অমনি রজ্জু টানিয়া তাহাকে ব্যথিত করা হইল—তাহার মান গেল, কুল গেল, সম্ভ্রম গেল, জাতি গেল, ইহলোক গেল, পরলোক গেল। অগত্যা সকলকে বন্ধন স্বীকার করিতে হইল। শাস্ত্রের উপর, অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাক্যের উপর বাক্যব্যয় করা পঞ্চমহাপাতক তুল্য গণ্য হইল। যাহা কিছু শাস্ত্রে লেখা আছে তাহাই সত্য; তাহাতে শতসহস্র জাজ্বল্যমান ভ্রম থাকিলেও তাহা অভ্রান্ত। দুইটী কথা, যাহা সরল বাঙ্গালা ভাষায় বুঝিতে পার, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকিলেই দুইটিই সত্য হইয়া দাঁড়াইল। সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে, নচেৎ নিরয়ে পচিতে হইবে। যে সকল স্থল বুঝিতে পার না; তাহাও বিশ্বাস কর। বুঝিতে যে পার না, সে তোমার বুদ্ধির দোষ; তন্নিবন্ধন শাস্ত্রের অগৌরব কেন করিবে? সব মিটিয়া গেল। ষোল কলা সম্পূর্ণ হইল।

কালে বিশ্বাস আসিল, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহাই শাস্ত্রে আছে, এবং যাহা কিছু শাস্ত্রে আছে, তাহাই সত্য। যাহা শাস্ত্রে নাই তাহাই মিথ্যা। এরূপ বিশ্বাসে সুফল ফলে না। এইরূপ বিশ্বাসে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার পুড়িয়াছিল।* আরিস্ততলের উপর এইরূপ অচলা ভক্তি ছিল বলিয়া স্কুলমেন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেতর জাতিরা বিদ্যাসাম্রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত। কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্যানুশীলন ছিল। কিন্তু নূতন সত্যের পথ বন্ধ, জ্ঞাতব্য সত্যের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট; সুতরাং ব্রাহ্মণের বুদ্ধির প্রাখর্য্য কেবল কথার মারপেঁচে পরিণত হইল। বুদ্ধির প্রাখর্য্য যে ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু তাহাতে কার্য্য হইল না। তমাস্ আকুইনাস্, দনস্কোতস্ প্রভৃতি প্রখর বুদ্ধিশালী হইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। সূচির তীক্ষ্ণাগ্রভাগে কয়জন এঞ্জল নাচিতে পারে?—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে এঞ্জেলেরা মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃতি পার না হইয়া যাইতে পারে কি না?—ঈশা যখন মেরির গর্ভে ছিলেন, তখন বসিয়াছিলেন, কি শুইয়া ছিলেন, না দাঁড়াইয়াছিলেন? এইরূপ বৃথা তর্কে তাঁহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইল, কেননা আরিস্ততলের উপর বাক্যব্যয় করা মহাপাপ। ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের বুদ্ধি এইরূপে নষ্ট করিলেন। পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। যে শৃঙ্খল পরের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কালে আপনারাও তাহাতে বাঁধা পড়িলেন। বুদ্ধির পথে কাঁটা পড়িল;

*উক্ত পুস্তকাগার দাহের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। প্রচলিত বিশ্বাস এস্থলে প্রকটিত হইবে।

কল্পনার পথ মুক্ত—সুতরাং মনের চাঞ্চল্য সেই পথে নিযুক্ত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

কবির চক্ষে কিছুই নির্জীব নহে। পৌরাণিক অবস্থায় (Mythological stage or volitional stage) মিল বলেন লোকে প্রাকৃতিক কার্য্যমাত্রকেই ইচ্ছাবিশিষ্ট জীবের কার্য্য বলিয়া বোধ করে। এইজন্য সে সময়ে সকলেই কবি। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি সকলকেই তাঁহারা সজীব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আমরা যেমন মনে করি, সূর্য্য উদয়াস্ত হইতে বাধ্য—আমাদের নীরস, শুষ্ক চিন্তায় যেমন সকলই নিয়ম, সকলই নিয়তি, তাঁহাদের তেমন ছিল না; সুতরাং যখন পশ্চিম গগন সায়াহ্নের সৌখীন শোভায় শোভিত হইত, তখন বৈদিক আর্য্য অস্তগমনোন্মুখ দিনমণিকে করজোড়ে বলিতেন,—আবার এসো হে; আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলে, আবার কখন্ দেখা পাব হে! এইরূপ বিশ্বাস ছিল বলিয়া, তাঁহারা সকলেই কবি। যাহা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে তাহাই কবিত্ব পরিপূর্ণ; যাহা কবিত্ব পরিপূর্ণ তাহাই মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। এই কারণে বালক মাত্রেই কবি, কেন না বালক সকলকেই সজীব বলিয়া বিশ্বাস করে। আমাদের ধর্ম্ম আমাদিগকে বালক করিয়া রাখিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, মেঘ, বিদ্যুৎ, বায়ু, অগ্নি, ক্ষিতি, অপ্, বৃক্ষ, লতা সকলকেই সজীব মনে করিতে আমরা বাধ্য, কেন না সকলেই আমাদের দেবতা। জননীর স্তন্যের সঙ্গে এই বিশ্বাস পান করিয়াছি, বাল্যকালে এই বিশ্বাসে দীক্ষিত হইয়াছি, শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, মানসিক বৃত্তিনিচয়ের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে ইহা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পরিণত বয়সে বিজ্ঞানের সাহায্য পাই নাই;—মেঘকে দেবতা বলিয়াই বোধ থাকিল, বাষ্পরাশি মনে করিতে পারিলাম না; অগ্নিকে ব্রহ্মা বলিয়াই পূজা করিলাম, রাসায়নিক ক্রিয়া মাত্র মনে করিতে পারিলাম না; ক্ষণপ্রভাকে চিরকাল দেবেন্দ্রানুসৃতা পলায়মানা দেবী মনে করিলাম, তড়িল্লতা মনে করিতে পারিলাম না। সুতরাং চিরকাল কল্পনার কার্য্য হইল। যে স্থলে কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধির বিরোধ উপস্থিত হইল, সে স্থলে কল্পনা, শাস্ত্রের সাহায্য পাইল, ধর্ম্মের সাহায্য পাইল, বিশ্বাসের সাহায্য পাইল, আর দশজন লোকের সাহায্য পাইল, সুতরাং কল্পনার জয় চিরকাল হইল। প্রত্যেক কলহে জয়লাভ করিয়া কল্পনা বলশালিনী হইল; হারিয়া হারিয়া বুদ্ধি নিস্তেজ, স্ফূর্ত্তিবিহীন, অবসন্ন, বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল। কবিত্বের প্রধান উপকরণ কল্পনা, সুতরাং কবিত্ব বাড়িল অথবা বুদ্ধিপ্রবণতা পুষ্ট হইল।

সুখের শরৎ কালে শরৎসুন্দরী-পূজা বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। কেবল শাক্ত, কেবল ভক্ত বলিয়া নহে, বঙ্গদেশে এ উৎসব সর্ব্বজনীন; এবং এ উৎসব

কবিত্ব পরিপূর্ণ। এক প্রতিমাতেই কবিত্বের সীমা নাই। দশভুজা দশহস্তে দশ প্রহরণ ধরিয়া চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিতেছেন, বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে বাগ্‌দেবী সুকুমার পঙ্কজের উপর তদধিক সুকুমার চরণসরোজ বিন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উভয়ের পার্শ্বে কার্ত্তিকেয় এবং গজানন—সুন্দরের চরম এবং কুৎসিতের চরম। নিম্নে মহাদৈত্য মহিষাসুর বীরদর্পে বিকট দর্শনে অধর দংশিয়া অসি উত্থিত করিতেছে—দুর্জ্জয় সিংহ তাহাকে ভীম পরাক্রমে আক্রমণ করিতেছে। মস্তকোপরি দেবাসুরের অপূর্ব্ব যুদ্ধের অপূর্ব্ব চিত্র। অঙ্গনে ছাগ শোণিতের ধারা; সেই শোণিতে বিভূষিত হইয়া ভক্তিভাব-পরিপ্লুত ভক্ত নাচিতেছে। এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলে হৃদয় মধ্যে মহান্ ভাবের তরঙ্গ বহে না, এমন নীরস, শুষ্ক হৃদয় কার আছে? এ উৎসবে যে একবার মাতিয়াছে—কোন্ বাঙ্গালিসন্তান মাতে নাই?—মিল্‌টন পড়ার কাজ তাহার হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর আবার আনুষঙ্গিক কবিত্ব আছে। বালকেরা স্নানাহার ভুলিয়া গিয়াছে, যুবকেরা আনন্দে মাতিয়াছেন; নববিকসিতা কুসুমরূপিণী বঙ্গকুলবধূ সুন্দর অলঙ্কারে সুন্দর দেহ সুন্দর করিয়া সাজাইয়া, বহু দিনের পর প্রিয়সম্মিলন হইবে এই আনন্দে চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন; প্রবাসী, এক বৎসরের দাসত্বযন্ত্রণা ভুলিবার আশায় ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ছুটিতেছেন। বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্যের উপর উৎসাহ চাপা দিয়া আবার যুবা হইয়া উঠিয়াছেন। বঙ্গের আনন্দের সীমা নাই; বিচিত্র অট্টালিকায় এবং পর্ণকুটীরে, রাজপথে এবং অন্তঃপুরে, কেবল আনন্দধ্বনি উঠিতেছে, কেবল হৃদয়ানুভূত উৎসাহ-তরঙ্গ খেলিতেছে। পিতার কাছে পুত্র আসিতেছে, পুত্রের কাছে পিতা আসিতেছেন, প্রণয়িনীর কাছে প্রণয়ী আসিতেছে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব একত্র সমবেত হইতেছে—আনন্দের সীমা কি? এক মাস পূর্ব্ব হইতে বঙ্গবাসী যে দিনের আশাপথ চাহিয়াছিল, সেই দিন আসিয়াছে—এক মাস পূর্ব্ব হইতে যে ভাবের বহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, আজি তাহা একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কেবল ভক্তের বলিয়া নহে, সমস্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়সাগরে, ভাবের প্রবল বাতাসে উচ্চ তরঙ্গ উঠিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে কেহ যে কোন ভাবের বেগ হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন, তিনিই কবি। দুর্গোৎসব বাঙ্গালিকে কবিত্বের পথে অনেকটা অগ্রসর করিয়াছে। বাঙ্গালির বারমাসে তের পর্ব্ব আছে; দুর্গোৎসব সর্ব্বপ্রধান বলিয়া কেবল ইহারই উল্লেখ করিলাম। বুদ্ধিমান্ পাঠককে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। আমরা এক্ষণে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালিকে যতটা কোমল করিয়াছে এত বোধ হয় আর কিছুতেই নহে। এ ধর্ম্ম কোমলতাপূর্ণ, প্রণয়পূর্ণ, মধুপূর্ণ—যশোদার বাৎসল্য, রাধিকার

উগ্র অনুরাগ, কৃষ্ণের লীলা, ব্রজরাখালদিগের ভ্রাতৃভাব, গোপাঙ্গনাদিগের বিলাস চেষ্টা, বৈষ্ণবদিগের যে অংশ দেখ তাহাতেই মধু আছে। আর বৈষ্ণবধর্ম্মে যে সকল ভাব আছে, সে সকলই জীবন্ত—তাহাতে তরঙ্গ আছে, বেগ আছে, চাঞ্চল্য আছে। যশোদার বাৎসল্য জীবন্ত বাৎসল্য, কেন না হাজার হইলেও কৃষ্ণ নিজের পুত্র নহে। সুতরাং এ বাৎসল্যের সঙ্গে আশঙ্কা আছে। যশোদা পুত্রহীনা, কৃষ্ণ তাঁহার বহু আরাধনার ধন—বহু আরাধনায় যাহা লাভ হয় তাহার জন্য আশঙ্কাও অধিক। জন্মান্ধ যদি চক্ষু পায়, তাহার পক্ষে চক্ষু বড় আদরের ধন। অন্ধকারের মধ্যে যে আলোক পাইয়াছে, তাহার আলোক বড় অমূল্য। গোপাঙ্গনাদিগের অনুরাগ জীবন্ত, কেন না এ রস পরকীয়, * সুতরাং উগ্র, তীব্র এবং বেগবান্। রাধিকার ভালবাসাও জীবন্ত, কেন না এ প্রণয়ের ভিতর ভয় আছে, লজ্জা আছে, বিপদ্ আছে, কলঙ্ক আছে, লুকাচুরি আছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্গত সকল ভাবই জীবন্ত। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, আগা গোড়া সবই মধুর, সবই কোমল। বঙ্গীয় কবিকুলতিলকগণ এই রসে মজিলেন; এই তরল ধর্ম্মের উপর কবিত্বের তরলতা ঢালিলেন—যাহা মধুর, সুন্দর, কোমল, তাহার উপর আরও মাধুর্য্য, আরও সৌন্দর্য্য, আরও কোমলতা চাপাইলেন; চাপাইয়া, কৃষ্ণরাধিকার প্রণয়ে এক অপূর্ব্ব মোহিনীশক্তি দিলেন। রাধিকার ত কথাই নাই, কৃষ্ণও এক অপূর্ব্ব জিনিষ হইয়া উঠিলেন। কখন যোগী সাজিয়া রাধিকার কুঞ্জে প্রেমভিক্ষা করিলেন, কখন রাধিকার মুখ রাখিবার জন্য শ্যামা সাজিলেন, এবং স্বয়ং রোগী হইয়া স্বয়ংই বৈদ্য হইলেন; আবার কখন মনের বেগে পায়ে ধরিয়া কাঁদিলেন,—

ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং

রাধিকা কখন গুরুমানে মাতিয়া কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিলেন,—

হরি হরি! যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদং
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদং।

কখন আবার প্রেমে বিভোর হইয়া আদর করিলেন, তুমি আমার—

পরাণ অধিক, হিয়ার পুতলী,
এ দুটি আঁখির তারা।

---

* পূর্ব্বতন আলঙ্কারিকেরা স্বকীয় নায়িকাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব আলঙ্কারিকদিগের মতে পরকীয়াই প্রধান স্থলাভিষিক্ত।

'অলঙ্কারকৌস্তভ' দেখ।

একজন কবি, অনুপম মধুকর-নিকর-করম্বিত, কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীর সাজাইলেন, তাহার চতুর্দ্দিক্ সরস বসন্তের শোভাপূর্ণ করিলেন, তাহার ভিতর ললিত-লবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল-মলয়-সমীরকে মৃদু মৃদু সঞ্চালিত করিলেন—হরি এইখানে বসন্তোৎসব করিবেন। হরি বসন্তোৎসব করিলেন না, প্রণয়োৎসবে ভঙ্গ দিয়া দূরে গেলেন। কৃষ্ণপ্রেম পাগলিনী সেই কোমল-মলয়-সমীরের অধিক নৈরাশ্য-কাতর স্বরে কাঁদিলেন—

কহত কহত সখি, বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন দেশ রে
নাগরী পাইয়া, নাগর সুখী ভেল,
হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ, প্রণয়িযুগলকে এইরূপে হাসাইয়া, এইরূপে কাঁদাইয়া, এইরূপ ভাল-বাসাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে এক অপূর্ব্ব রস করিয়া রাখিলেন। সে রস যদিও দেব-দেবী লইয়া, তবু তাহা সাধারণ লোকের সম্বন্ধকক্ষাতীত নহে, কেন না অমন সুখ, অমন দুঃখ, অমন হাসি, অমন কান্না সকলেরই আছে। দেব দেবীর নাম মাত্র, নতুবা বৈষ্ণব কবিরা মানব-হৃদয়ের ভঙ্গী সকল চিত্রিত করিয়াছেন। যে বেগ বৈষ্ণব কবিদিগের কাব্যে, সে বেগ তোমার আমার হৃদয়েও আছে, তবে কি না আমরা তেমন করিয়া বলিতে জানি না। সকল হৃদয়ে আছে বলিয়া; সকলেই সে রস বুঝে, সকলের সঙ্গেই ইহার সম্বন্ধ আছে। চৈতন্যদেব আসিয়া সেই রসের তরঙ্গ তুলিলেন এবং সেই তরঙ্গে সমস্ত বঙ্গদেশকে নাচাইলেন। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, পাড়ায় পাড়ায়, গৃহে গৃহে, সেই রসের বিস্তার হইল। পৌত্তলিকতা মাত্রই কবির ধর্ম্ম। যে দেশে পৌত্তলিকতা আছে সেই দেশেরই লোক কিয়ৎপরিমাণে কবি। যে দেশে পৌত্তলিকতার অল্পতা অথবা অভাব লক্ষিত হয়, সেই সেই দেশেই পরিমাণানুযায়ী কবিত্বের অল্পতা অথবা অভাব দেখা যায়। কোন মনুষ্যই একেবারে কবিত্বে বঞ্চিত হইতে পারে না; আজি পর্য্যন্ত সংসারে এমন কোন ধর্ম্মও প্রচারিত হয় নাই, যাহার ভিতর পৌত্তলিকতা নাই অথবা কালে পৌত্তলিকতায় পরিণত হয় নাই। বলিয়াছি ত, পৌত্তলিকতা কবির ধর্ম্ম; তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় কবিত্ব পরিপূর্ণ ধর্ম্ম যে দেশে প্রচলিত, সে দেশের লোক যে কিয়ৎপরিমাণে কবি হইবে তাহার বৈচিত্র কি?

আবার বৈষ্ণবধর্ম্ম অনুভাবকতামূলক, কেন না উহা ভক্তিপ্রধান। বঙ্গ-দেশের অন্যান্য সকল ধর্ম্মই প্রায় জ্ঞানপ্রধান অথবা কর্ম্মপ্রধান। চৈতন্য-

দেবকে ভক্তিমাহাত্ম্যের উদ্ভাবন কর্ত্তা বলিতেছি না ; বোপদেব কৃত শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিপ্রধান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্যে রামানুজস্বামী এই রসের বিস্তার করিয়াছিলেন, তবে কি না চৈতন্যদেব ভক্তিরসকে ঘরে ঘরে চালাইলেন। চৈতন্যের বাহাদুরী এই পর্য্যন্ত। জ্ঞানকাণ্ড অথবা কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্গে অনুভাবকতার সম্বন্ধ অল্প ; কিন্তু ভক্তির সহিত উহার অতি নিকট সম্বন্ধ, কেন না ভক্তি অনুভাবকতারই মূর্ত্তিবিশেষ। অনুভাবকতার সঙ্গে কবিত্বের সম্বন্ধ অতি নিকট; সুতরাং অনুভাবকতার অনুশীলন যাহাতে হয়, তাহাতেই কবিত্বের লাভ আছে। অতএব বাঙ্গালি যে কবি, তাহার অনেকটা নিন্দা-প্রশংসায় বৈষ্ণবধর্ম্মের দাবি আছে।

ক্রমশঃ
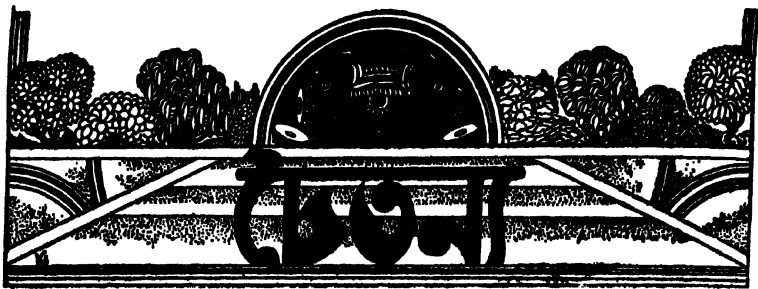
পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্গদেশ দর্শন

১৪২৬ অথবা ২৭ শকে* উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে চৈতন্য বঙ্গদেশে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীহট্টে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাটী, (শ্রীহট্ট বঙ্গদেশের অন্তঃপাতি) সুতরাং পৈতৃক বাসস্থান দেখিতে কৌতূহল জন্মিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? যদিও এ যাত্রায় শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছিলেন না তথাপি, বোধ হয় পৈতৃক বাসস্থান সন্দর্শনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

চৈতন্য বঙ্গদেশাভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিয়া পদ্মাবতীর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। কিয়দ্দিবস অবস্থান করিলেন। পদ্মাবতী জঙ্গীপুরের ৬।৭ ক্রোশ উত্তর ছাপঘাটী হইতে গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া ২২ কোদালী মোকামে ব্রহ্মপুত্রসহ মিলিত হইয়াছে। ছাপঘাটী মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত, ২২ কোদালী ঢাকা। এই বিস্তীর্ণ পদ্মানদীর উপকূলের কোন্ স্থানে তিনি অবস্থিত হইয়া-

* বৎসর গণনা বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ ও যুক্তি উভয়ানুসরণ করিয়া নির্ণীত হইল। চৈতন্য ২৩ বৎসর ১১ মাস বয়ঃক্রম কালে গৃহত্যাগ করেন।

চব্বিশ বর্ষের শেষে যেই মাঘ মাস
তবে শুক্ল পক্ষে প্রভু কৈলা সন্ন্যাস।

তাঁহার জন্ম ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে হয়—১ম অঃ দেখ।

আবার চৈতন্য ভাগবতে ও চৈতন্য চরিতামৃতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, চৈতন্য বঙ্গ হইতে প্রত্যাগত হওয়ার অব্যবহিত পরেই গয়াধামে যাত্রা করেন এবং গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া চারি বৎসরকাল গৃহে অবস্থান করেন। বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি আর একটী কার্য্য করেন অর্থাৎ দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ। তীর্থযাত্রা ও বিবাহ ন্যূনাধিক ১ বৎসর ও গৃহে অবস্থান চারি বৎসর, ২৩ বৎসর ১১ মাস হইতে বাদ দিলে ১৮ বৎসর ও কয়েক মাস হয় এবং তাঁহার জন্ম ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাস। এই জন্য উক্তকাল ১৪২৬ অথবা ২৭।

ছিলেন, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে অথবা কোন নাটকাদিতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না।

অস্মদীয় প্রমাণাবলম্বন করিলে জানা যায়, অধুনা পদ্মাতীরে যত গ্রাম আছে তন্মধ্যে শাদিখাঁরদিয়াড়”* ও তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রাম ও তাহার অপর পারস্থিত মিরগঞ্জ † ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী গ্রাম সমধিক বৈষ্ণবপ্রধান এবং হয়ত শাদিখাঁরদিয়াড়েই তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রেমতলী এবং খেতরী সমধিক বৈষ্ণবপ্রধান স্থান বটে, কিন্তু অধুনা পদ্মার নিকটবর্ত্তী হইলেও তৎকালে নিকটে ছিল না। যে হেতু বিগত ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেই প্রেমতলী হইতে পদ্মা ৩ ক্রোশের অধিক ব্যবধান ছিল, এবং প্রেমতলী পার হইয়া অপর পারে ক্রমাগত ৮।১০ ক্রোশ গমন করিলেও তাহা পদ্মার চর বোধ হয়। সুতরাং বোধ হয়, এককালে পদ্মা প্রেমতলী হইতে অনেক দূরে ছিল। বিশেষ প্রেমতলীর ২০০।৩০০ হস্ত পরেই, খেতরীর গ্রাম ক্রোশার্দ্ধ অগ্র হইতে ভূবীন্দ্র। পদ্মা, ভূবীন্দ্রের তাদৃশ নিকটস্থ থাকিতে পারে না। যেহেতু পদ্মার তীরের দিয়াড় এবং ভড় অতিক্রম করিলে ভূবীন্দ্র পাওয়া যায়। অপর প্রেমতলী নিকটে কুমারপুরে অদ্যাপি মুসলমান ও বঙ্গের প্রাচীন পালবংশীয় ভূপালদিগের যে সকল ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তদ্দৃষ্টে নিশ্চয় অনুভূত হয় যে, সে সকল পদ্মার তীরে গঠিত হয় নাই এবং তৎকালে পদ্মা কুমারপুর, প্রেমতলী প্রভৃতি গ্রাম হইতে দূরে ছিল। তবে যে এ সকল গ্রাম বৈষ্ণবপ্রধান তাহার কারণ, অন্যূন ১০০ বৎসর অতীত হইল গড়ের হাট পরগণার রাজা বৈষ্ণব চূড়ামণি নরোত্তম অবস্থান করিতেন, এবং গোবিন্দ দাস কবিরাজ (কবি গোবিন্দ দাস) রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ (যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তীয়-দিগের অবতার বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।) তথায় অনেক সময় বাস করিতেন। নরোত্তম দাসের পূর্ব্বে প্রেমতলী প্রভৃতি ঘোর শক্তিপ্রধান ছিল। সুতরাং চৈতন্যদেবের তথায় অবস্থান যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না, শাদিখাঁরদিয়াড় অথবা মিরগঞ্জই তাঁহার বঙ্গদেশে অবস্থানের স্থান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মিরগঞ্জে অদ্যাপি চৈত্রমাসে গঙ্গাস্নানের দিবসে “দধি চিঁড়ার ফলার” করা বৈষ্ণবদিগের ও তৎপ্রদেশীয় সাধারণ লোকদিগের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বোধ আছে। সাধারণ্যে বিশ্বাস, চৈতন্য ঐ দিবসে তথায় “দধি চিঁড়ার ফলার” করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে পথিক লোকই “দধি চিঁড়ার ফলার” করিয়া থাকে, এজন্য মিরগঞ্জে চৈতন্য পথিকও শাদিখাঁরদিয়াড়ে অবস্থিত হইয়াছিলেন ইহাই অনুভূত হয়। তবে যদি কেহ কেহ এ আপত্তি করেন শাদিখাঁরদিয়াড় পদ্মাতীর হইতে ৪ ক্রোশ ব্যবধান, ইহার উত্তর-

* জেলা মুরশিদাবাদে স্থিত।
† জেলা রাজসাহীস্থিত।

স্থলে এই প্রস্তাব-লেখক বলিতে পারেন যে, ১৮।১৯ বৎসর অতীত হইল তিনি শাদিখাঁরদিয়াড় হইতে পদ্মা, ক্রোশ ক্রোশ ব্যবধান দেখিয়াছিলেন, এই ১৮।১৯ বৎসর এপার ভাঙ্গিয়া অপর পারে ২ ক্রোশ চর প্রশস্ত হইয়াছে। সুতরাং এককালে যে তাহা পদ্মাতীরস্থ ছিল তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষ দিয়াড় নামই তাহার অমোঘ প্রমাণ।

চৈতন্য বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিয়া মহানন্দে পদ্মার জলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পদ্মার শোভা গম্ভীর ও ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার মন আরও প্রশস্ত হইল, কল্পনা উদ্দীপ্ত হইল, স্ফূর্ত্তি দ্বিগুণিত হইল।

এদিকে, নবদ্বীপ হইতে একজন পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া তদ্দেশীয় বিদ্যা ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত ও বিদ্যা ব্যবসায়ী বালকগণ, যাহারা বিদ্যোপার্জ্জন জন্য নবদ্বীপ যাইতে উদ্যত ছিল, তথায় চৈতন্যের সহিত মিলিত হইল। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের মতে নিমাঞি পণ্ডিতের নামে সকলে আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় নিমাঞি পণ্ডিতের নামে হউক বা না হউক নবদ্বীপের পণ্ডিতের নামে বটে।

চৈতন্য, বিদ্যা ও ধর্ম্ম যুগপৎ প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও সরল ধর্ম্মের ভাবে সকলেই মোহিত হইলেন। তাঁহার ছাত্রসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইল।

একদা একজন ব্রাহ্মণ পরমার্থ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া তথায় আগমন করিলেন। চৈতন্য বলিলেন,—

সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুঃ ত্রেতায়াং যযতে মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
তথাহি—হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অথমহামন্ত্র—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমের অঙ্কুর হয় এবং ঈশ্বরে প্রেমিক হইলে পরম তত্ত্ব লাভ হইল। এইরূপে কিছুকাল বঙ্গদেশে অবস্থান করিয়া চৈতন্য গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

এদিকে লক্ষ্মীদেবী স্বামিবিরহজনিত ক্লেশে নিতান্ত কাতর হইয়া চৈতন্যের বঙ্গে অবস্থান কালে প্রাণত্যাগ করিলেন। চৈতন্য গৃহে প্রত্যাগত হইলে বন্ধুবান্ধবগণ

তাঁহারে দেখিতে আসিলেন। চৈতন্য মাতার চরণবন্দনা করিতে যাইয়া দেখেন, তিনি যারপরনাই বিষাদিতা ও তাঁহার মুখে বাক্যব্যয় নাই। সুতরাং বুঝিলেন, নিশ্চিত বিশেষ অমঙ্গল হইয়াছে। পরে শচী বলিলেন, বধূমাতা পীড়িতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। চৈতন্য কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া জননীকে বলিলেন—

কস্য কে পতি * * * মোহ এবহি কেবলং।

*　　　　*　　　　*　　　　*

"ভবিতব্য যে আছে তাহা খণ্ডিবে কেমনে।
অতীত যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
সে হইল আর কি কার্য্য দুঃখে তায়॥"

সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চৈতন্যের এই প্রথম উক্তি। চৈতন্য ভবিতব্যবাদী ছিলেন, সুতরাং ইচ্ছা স্বাধীন বিশ্বাস করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি ঈশ্বর ইচ্ছাময় স্বীকার করিতেন, সাংখ্যদর্শনকারের ন্যায় উদাসীন বলিতেন না।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস।

(এই শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে পুরাতন নীতিজ্ঞ কবিকুলরচিত কবিতাকলাপ অনুবাদিত হইবে। কোন গ্রন্থ বিশেষ পর্য্যায়ানুক্রমে অনুবাদিত হইবে না—শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণেতিহাস কাব্য প্রভৃতিতে যখন যে মনোজ্ঞ-হিতকথা নয়নপথে পতিত হইবে, তখন তাহারই মর্ম্মানুবাদ সঙ্কলন করা অভিপ্রায় মাত্র)

প্রথম অঞ্জলি।

১

ভয়াবহ ভবতরু বটে বিষময়।
কিন্তু তাহে আছে সুধাসম ফলদ্বয়॥
তার এক কাব্যামৃত-রস-আস্বাদন।
অন্যতর সদালাপ সহিত সজ্জন॥

২

দ্রুমালয়, ভক্ষ্য ফল দল, পেয় জল।
তৃণনিচয়েতে শয্যা, বসন বল্কল॥
বনে ব্যাঘ্র-গজ-সেবা বরং মঙ্গল।
এ ভবে বিভবহীন জীবন বিফল॥

৩

মাণিক কুগ্রহফলে, লুটায় চরণ তলে,
কাঁচ যদি উঠে বা মাথায়।
মাণিক মাণিক রবে, কাঁচে লোক কাঁচ কবে,
থাক্ তারা যথায় তথায়॥

৪

কাক কৃষ্ণবর্ণধর, কৃষ্ণবর্ণ পিকবর,
উভয়েই একবর্ণধৃত।
হইলে বসন্তোদয়, জানা যায় পরিচয়,
কেবা কাক কেবা পরভৃত॥

৫

ইতর পাপের ফলভোগের কারণ।
যেইরূপ ইচ্ছা তব কর নিয়োজন॥
কিন্তু অরসিকে যেন কবিত্বে ভজনা।
লিখনা ললাটে ধাতা লিখনা লিখনা॥

৬

ভয়ানক ভাবধর, করিরাজ কুম্ভবর,
ভেদকারী কথা সুনিশ্চয়।
বায়ু চেয়ে বেগগতি, গিরিগুহা গৃহপতি,
তবু সিংহ পশু বই নয়॥

৭

বায়সের যদি হয় চঞ্চুটি সুবর্ণময়,
মাণিকে মণ্ডিত পদদ্বয়।
প্রতিপক্ষে গজমতি, প্রকাশে বিমলজ্যোতি,
তবু কাক রাজহংস নয়॥

৮

কোকিল গর্ব্বিত নহে চূতরস পিয়ে।
ভেক মক্ মক্ করে কর্দ্দম খাইয়ে॥

৯

রোহিত রহিত-দর্প গভীর পুষ্করে।
একাঙ্গুল জলে পুঁঠী ছট্‌ফট্ করে॥

১০

মেঘাগমে স্তব্ধ যত পরভৃতগণ।
ভেক ভায়া যথা বক্তা, মৌনই শোভন

১১

শিখরেতে থাকে শিখী, গগনে নীরদ।
লক্ষান্তরে দিনকর জলে কোকনদ॥
কুমুদবান্ধব কত লক্ষান্তরে রয়।
যে যাহার বন্ধু হয় কভু দূর নয়॥

১২

মাতা নিন্দাপরায়ণ, পিতা প্রিয়বাদী নন,
সোদর না করে সম্ভাষণ।
ভৃত্য রাগে কহে কত, পুত্র নহে অনুগত,
কান্তা নাহি দেন আলিঙ্গন॥
পাছে কিছু চাহে ধন, এই ভয়ে বন্ধুগণ,
কিছুমাত্র কথা নাহি কয়।
ওরে ভাই একারণ, কর ধন উপার্জ্জন,
ধনেতেই সব বশ হয়॥

১৩

ধনেতেই অকুলীন, কুলীন কুমার।
ধনেতেই পায় লোক আপদে নিস্তার॥
ধন চেয়ে এসংসারে বন্ধু কেহ নয়।
তাই ভাই কর কর ধনের সঞ্চয়॥

১৪

ব্রহ্মহত্যা করি লোকে, পুজ্যপাদ হয় লোকে
যদি তার প্রচুরার্থ থাকে।
শশিতুল্য সুকুলীন, যদি হন ধনহীন,
কেবা বল গ্রাহ্য করে তাকে॥

১৫

অতিশয় চলচিত্ত, চপল যে কিছু বিত্ত,
সুচঞ্চল জীবন যৌবন।
সকলই চলাচল, যার আছে কীর্ত্তিবল,
তার মাত্র অচল জীবন॥

১৬

সেই জন সজীবন, যেই জন যশোধন,
সজীব যে জন কীর্ত্তিমান্।
অযশ অকীর্ত্তি যার, জীবন কোথায় তার,
বেঁচে থাকা মৃতের সমান॥

১৭

কখন সন্তুষ্ট, কখন বা রুষ্ট,
তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে।
হেন মতিচ্ছন্ন, হলেও প্রসন্ন
ভয়ঙ্কর মানি মনে॥

১৮

গ্রন্থগত বিদ্যা, পরহস্তগত ধন।
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হলে প্রয়োজন।

১৯

উদ্যোগী পুরুষসিংহে লক্ষ্মীর আসন।
কাপুরুষে কহে দৈব ধনদাতা হন॥
দৈব দূর করে, আত্ম-শক্তি কর সার।
যত্নে সিদ্ধ না হইলে দোষ বল কার॥

২০

সম্পদে কর্কশ, খলের মানস,
আপদেই সুকোমল।
সুশীতল পয়,* সুকঠিন হয়,
কিন্তু মৃদু তপ্ত জল॥

২১

গুণীর যে গুণ তাহা জানে গুণধর।
অন্যে কভু নাহি জানে সে গুণনিকর॥
মালতী মল্লিকা পুষ্প গন্ধ বিমোহন।
নাসিকাই জানে কভু না জানে লোচন॥

২২

ক্ষোভের যাতনা সহে সাধুশীল নর।
সহিতে না পারে কভু ইতর পামর॥
মহা শাণ ঘর্ষণেতে হীরাই সক্ষম।
চড়াইলে চূর্ণ হয় চামড়া অধম॥

২৩

স্বজাতীয় বিনা বৈরি পরাভূত নয়।
হীরাতেই ছিদ্র করে মণি মুক্তাচয়॥

২৪

অতিশয় ক্ষুদ্র নরে, যে হিত সাধনা করে,
মহতেও তাহা নাহি পারে।
পান করি কূপপয়, প্রায় তৃষা শান্ত হয়,
বারিধি কি পিপাসা নিবারে?

২৫

এক ভূমি জাত, ঐক্য কাণ্ড আর দলে।
কেবা শালি, কেবা শ্যামা, পরিচয় ফলে॥

২৬

মুখভরি অন্ন দিলে কে না বশ হন।
মৃদঙ্গে মধুর ধ্বনি অর্পিলে ক্ষীরণ॥

২৭

রত্নাকরে আছে রত্ন তাহে কিবা হয়।
তাহে বা কি বিন্ধ্যাচলে আছে করিচয়॥
কি ফল মলয়াচলে চন্দন কানন।
পরের হিতেই শুদ্ধ সাধুজন-ধন॥

২৮

বিকসিত বকুল মুকুলে যেই জন।
তৃষাতেও না করিত চরণ চারণ॥
আহা আহা হা বিধাতা সেই মধুকরী।
বিপদে পড়িয়া সার করিলা বদরী।

২৯

পিপাসায় গিয়ে আমি সিন্ধু সন্নিধান।
শুদ্ধ এক গণ্ডূষ করিনু জল পান॥
জলধির দোষমাত্র তাহে কিছু নাই।
আমারি কর্ম্মের ফল ফলিয়াছে ভাই॥

৩০

কি ফল নির্ব্বাণ দীপে তৈল দান করা।
চোর গতে সাবধান কিসে যায় ধরা॥
কি ফল কামিনী-কেলি সমাগতে জরা।
কি ফল প্রবাহ-গতে আলী বন্ধ করা॥

৩১

বরং অসিধারে কিম্বা তরুতলে বাস।
বরং ভিক্ষা করা ভাল, কিম্বা উপবাস॥
বরং শ্রেয় ঘোরতর নরকে পতন।
তথাপি লয়োনা গর্ব্বী জাতির শরণ॥

---

* কর্পূর প্রভৃতি।

৩২

কুজনের সেবা আর কুগ্রামে নিবাস।
কুভোজন, ক্রোধমুখী ভার্য্যা সহ বাস॥
বিধবা তনয়া আর বিদ্যাহীন সুত।
অনল বিরহে তনু করে ভস্মীভূত॥

৩৩

পশ্চিমে উদিত যদি হন দিনকর।
শিখরাগ্রে ফুটে যদি কমল নিকর॥
অচল সচল হয় অনল শীতল।
তবু সজ্জনের বাক্য না হয় বিফল॥

৩৪

যথা নারিকেল ফল, গর্ভে সঞ্চরয়ে জল,
সেরূপ লক্ষীর আগমন।
গজভুক্ত কথ্‌বেল, সেরূপ লক্ষীর খেল,
পলায়ন করেন যখন॥

৩৫

অতি রমণীয় কার্য্যে পিশুন যে জন।
সবিশেষ যত্নে করে দোষ অন্বেষণ॥
যথা অতি রমণীয় চারু কলেবরে।
ব্রণ অন্বেষণ করে মক্ষিকা নিকরে॥

৩৬

সদগুণীর যত গুণ, বর্ণনায় সুনিপুণ,
যিনি হন সাধু সদাশয়।
নব চুতাঙ্কুররস, পান করি হয়ে বশ,
কোকিল ললিত কুহরয়॥

৩৭

সত্যের সদ্‌গুণ, দুর্জ্জন পিশুন,
ক্ষণেকে দূষিত করে।
যথা ধূম রাশি, বিমলতা নাশি,
মলিন করে অম্বরে॥

৩৮

যত্র দোষচয়, প্রকটিত হয়,
বিভাত না হয় গুণ।
চন্দ্রে মৃগরেখা, স্পষ্ট যায় দেখা,
প্রসন্নতা তাহে ন্যূন॥

৩৯

কাম ক্রোধজাত দোষ বিবেকে বিলয়।
ভানুর কিরণে মাত্র নিশাতমঃ ক্ষয়॥

৪০

উপদেশ উপযুক্ত পাত্র বুদ্ধিমান।
বিফল নির্ব্বোধ জড়ে উপদেশ দান।
কুসুম সুরভি তিল করে আকর্ষণ॥
যব তাহে ক্ষমবান্ নহে কদাচন।

৪১

মরণেই সদ্‌গুণীর গুণের প্রচার।
পুড়িলে চন্দন কাষ্ঠ সৌরভ বিস্তার॥

৪২

দুষ্টের দৌর্জ্জন্য চয়, কখন কি গত হয়,
কি করে বা উত্তম আকরে।
জনমিয়া রত্নাকরে, প্রাণিগণ প্রাণ হরে,
কালকূট বিষ ভয়ঙ্করে।

৪৩

উদ্যোগ বিহনে ধন না হয় অর্জ্জন।
ক্ষীরোদ মথিয়া সুধা পিয়ে সুরগণ॥

৪৪

আপদেও অবিকৃত স্বভাব সাধুর।
পাবকে পড়িয়া গন্ধ বিতরে কর্পূর॥

৪৫

আপৎ সময়ে সাধু আরো শোভাকর
রাহুগ্রস্ত সুধাকর দ্বিগুণ সুন্দর ॥

৪৬

যদি এজগৎ কভু পদ্মশূন্য হয়।
আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ হয় বিশ্বময় ॥
তবে কি মৃণালভোজী রাজহংসগণ
কুক্কুটের প্রায় করে মল অন্বেষণ ॥

৪৭

মদ-যুক্ত মাতঙ্গের মস্তক উপরে।
সিংহ শিশু পড়ে গিয়া মহা ঘোর স্বরে
প্রকৃতিতে জাত এই স্বত্ব মহাধন।
বয়সের ধর্ম্ম ইহা নহে ত কখন ॥

৪৮

সিংহের প্রতি শূকরের উক্তি।

দশব্যাঘ্র সপ্তসিংহ, তিন হস্তী সনে।
অবহেলে পরাভূত করিয়াছি রণে ॥
তোমাতে আমাতে অদ্য হইবে সমর
দেখুন দেখুন আসি যতেক অমর ॥

শূকরের প্রতি সিংহের উক্তি।

যা রে যা বিহিত দূরে শূকর নন্দন।
সিংহজয়ী বলি বৃথা কর আস্ফালন ॥
সিংহ শূকরের বলে ভেদ কতদূর।
ভালমতে জ্ঞাত যত পণ্ডিত ঠাকুর ॥

ক্রমশঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিদ্রাগ্রামে একঘর বড় জমীদার ছিলেন। জমীদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী ; তাঁহার জমীদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জ্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া ধনোপার্জ্জন করেন। উভয় ভ্রাতায় পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমত সন্দেহ কস্মিনকালে জন্মে নাই যে, তিনি অপর কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমীদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটী পুত্র জন্মিয়াছিল—তাহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটীর জন্মাবধি, রামকান্ত রায়ের মনে মনে সঙ্কল্প হইল যে উভয়ের উপার্জ্জিত বিষয়, একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার লেখাপড়া করা কর্ত্তব্য। কেন না যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে কৃষ্ণকান্ত কখন প্রবঞ্চনা অথবা তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার সম্ভাবনা নাই তথাচ কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে তাহার নিশ্চয়তা কি ? কিন্তু লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না—আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজন বশতঃ তালুকে গেলে সেইখানে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

যদি কৃষ্ণকান্ত এমত অভিলাষ করিতেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধন পক্ষে এখন আর কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমান ভাবে প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন। এবং উইল করিয়া, আপনাদিগের উপার্জ্জিত সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশ ন্যায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র, আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরলাল ; কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল, কন্যার নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে তাঁহার পরলোকান্তে, গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিনী এক আনা, আর শৈলবতী এক আনা, সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন।

হরলাল বড় দুর্দ্দান্ত। পিতার অবাধ্য এবং দুর্ম্মুখ। বাঙ্গালির উইল কখন গোপনে থাকে না। উইলের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল, "এটা কি হইল ? গোবিন্দলাল অর্দ্ধেক ভাগ পাইল আর আমরা তিন আনা ?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "ইহা ন্যায্য হইয়াছে। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি।"

হর। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্যটা কি ? আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সে লইবার কে ? আর মা বহিনকে আমরা প্রতিপালন করিব—তাহাদিগের বা এক এক আনা কেন ? বরং তাহাদিগকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী বলিয়া লিখিয়া যান।

কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাপু হরলাল! বিষয় আমার, তোমার নহে। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া যাইব।"

হর। আপনার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে—আপনাকে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দিব না।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে চক্ষু আরক্ত করিয়া কহিলেন, "হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে তবে আজি তোমাকে গুরুমহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।"

হর। আমি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের দাড়ি পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।

কৃষ্ণকান্ত রায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বহস্তে লিপিকৃত উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্ত্তে নূতন একখানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্ত্রী এক আনা, শৈলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনা মাত্র পাইলেন।

রাগ করিয়া হরলাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গেলেন, তথা হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই।

"কলিকাতার পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি মানস করিয়াছি যে একটি বিধবা বিবাহ করিব। আপনি যদ্যপি উইল পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে ॥০ আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র রেজিষ্টরি করেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাগ করিব নচেৎ শীঘ্র একটী বিধবাবিবাহ করিব।"

হরলাল মনে করিয়াছিলেন যে কৃষ্ণকান্ত ভয়ে ভীত হইয়া উইল পরিবর্ত্তন করিয়া হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া দিবেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের যে উত্তর পাইলেন তাহাতে সে ভরসা রহিল না। কৃষ্ণকান্ত লিখিলেন, "তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।"

ইহার কিছু পরেই হরলাল সম্বাদ পাঠাইলেন যে তিনি বিধবাবিবাহ করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নূতন উইল করিবেন।

পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে একজন নিরীহ ভালমানুষ লোক বাস করিতেন। কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে একটু দূর-সম্বন্ধ ছিল, এজন্য ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণকান্তকে জেঠা মহাশয় বলিতেন। এবং তৎকর্ত্তৃক অনুগৃহীত এবং প্রতিপালিতও হইতেন।

ব্রহ্মানন্দের হস্তাক্ষর উত্তম। এসকল লেখা পড়া তাঁহার দ্বারাই হইত। কৃষ্ণকান্ত সেইদিন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "আহারাদির পর এখানে আসিও। নূতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে।"

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, "আবার উইল বদলান হইবে কি অভিপ্রায়ে?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শূন্য পড়িবে।"

বিনোদ। ইহা ভাল হয় না। তিনিই যেন অপরাধী। কিন্তু তাঁহার একটী পুত্র আছে—সে শিশু, নিরপরাধী। তাহার উপায় কি হইবে।

কৃষ্ণ। তাহাকে এক পাই লিখিয়া দিব।

বিনোদ। এক পাই বখরায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। আমার আয় দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে একজন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না।

বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কর্ত্তা কোন মতে মতান্তর করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মানন্দ স্নানাহার করিয়া নিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন, এমত সময়ে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন, যে হরলাল রায়। হরলাল আসিয়া তাঁহার শিওরে বসিলেন।

ব্রহ্মা। সে কি, বড় বাবু যে? কখন বাড়ী এলে?

হর। বাড়ী এখন যাই নাই।

ব্র। একেবারে এইখানেই? কলিকাতা হইতে কতক্ষণ আসিতেছ?

হর। কলিকাতা হইতে দুই দিবস হইল আসিয়াছি। দুইদিন কোন স্থানে লুকাইয়াছিলাম। আবার কি নূতন উইল হইবে?

ব্র। এই রকম ত শুন্‌তেছি।

হর। আমার ভাগে এবার শূন্য।

ব্র। কর্ত্তা এখন রাগ করে তাই বল্‌ছেন কিন্তু সেটা থাকবে না।

হর। আজি বিকালে লেখা পড়া হবে? তুমি লিখিবে?

ব্র। কি কর্‌ব ভাই? কর্ত্তা বলিলে ত না বলিতে পারি না।

হর। ভাল, তাতে তোমার দোষ কি? এখন কিছু রোজগার করিবে?

ব্র। কিলটে চড়টা? তা ভাই মার না কেন?

হর। তা নয় হাজার টাকা।

ব্র। বিধবা বিয়ে করে নাকি?

হর। তাই।

ব্র। বয়স গেছে।

হর। তবে আর একটী কাজ বলি। এখনই আরম্ভ কর। আগামী কিছু গ্রহণ কর।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দের হাতে হরলাল পাঁচ শত টাকার নোট দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ নোট পাইয়া উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দেখিল। বলিল, "ইহা লইয়া আমি কি করিব?"

হর। পুঁজি করিও। দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও।

ব্র। গোয়ালা ফোয়ালার কোন এলেকা রাখি না। কিন্তু আমার করিতে হইবে কি?

হর। দুইটি কলম কাট। দুইটি যেন ঠিক সমান হয়।

ব্র। আচ্ছা ভাই—যা বল তাই শুনি। এই বলিয়া ঘোষজ মহাশয় দুইটি নূতন কলম লইয়া ঠিক সমান করিয়া কাটিলেন। এবং লিখিয়া দেখিলেন যে দুইটিরই লেখা এক প্রকার দেখিতে হয়।

তখন হরলাল বলিলেন, ইহার একটি কলম বাক্সতে তুলিয়া রাখ। যখন উইল লিখিতে যাইবে এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতে উইল লিখিবে। দ্বিতীয় কলমটি লইয়া এখন একখানা লেখা পড়া করিতে হইবে। তোমার কাছে ভাল কালি আছে?

ব্রহ্মানন্দ মসীপাত্র বাহির করিয়া লিখিয়া দেখাইলেন। হরলাল বলিতে লাগিল,—"ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।"

ব্র। তোমাদিগের বাড়ীতে কি দোয়াত কলম নাই যে আমি ঘাড়ে করিয়া নিয়া যাব?

হর। আমার কোন উদ্দেশ্য আছে—নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলাম কেন?

ব্র। আমিও তাই ভাবিতেছি বটে—ভাল বলেছ ভাইরে।

হর। তুমি দোয়াত কলম লইয়া গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পারে আজি এটা কেন? তুমি সরকারী কালিকলমকে গালি পাড়িও তাহা হইলেই শোধরাইবে।

ব্র। তা সরকারি কালিকলমকে শুধু কেন? সরকারকে শুদ্ধ গালি পাড়িতে পারিব।

হর। তত আবশ্যক নাই। এক্ষণে আসল কর্ম্ম আরম্ভ কর।

তখন হরলাল দুইখানি জেনেরল লেটর কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন,—"এযে সরকারি কাগজ দেখিতে পাই।"

"সরকারি নহে—কিন্তু উকীলের বাড়ীর লেখাপড়া এই কাগজে হইয়া থাকে। কর্ত্তাও এইরূপ কাগজে উইল লেখাইয়া থাকেন, জানি। এজন্যে এই কাগজ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। যাহা বলি তাহা এই কালিকলমে লেখ।"

ব্রহ্মানন্দ লিখিতে আরম্ভ করিল। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই। কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করিতেছেন। তাঁহার নামে যত সম্পত্তি আছে তাহার বিভাগ কৃষ্ণকান্তের পরলোকান্তে এইরূপ হইবে। যথা, বিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই; গৃহিনী এক পাই; শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অবশিষ্ট বার আনা।

লেখা হইলে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "এখন ত উইল লেখা হইল—দস্তখত করে কে?"

"আমি।" বলিয়া হরলাল ঐ উইল কৃষ্ণকান্ত রায়ের এবং চারিজন সাক্ষির দস্তখত করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "ভাল, এ ত জাল হইল।"

হর। এই সাঁচ্চা উইল হইল, বৈকালে যাহা লিখিবে সেই জাল।

ব্র। কি সে?

হর। তুমি যখন উইল লিখিতে যাইবে তখন এই উইলখানি আপনার পিরানের পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে। সেখানে গিয়া এই কালি কলমে তাঁহাদের ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগজ, কলম, কালি, লেখক একই; সুতরাং দুই খানই উইলই দেখিতে একপ্রকার হইবে। পরে উইল পড়িয়া শুনান ও দস্তখত হইয়া গেলে শেষে তুমি স্বাক্ষর করিবার জন্য লইবে। সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দস্তখত করিবে। সেই অবকাশে উইলখানি বদলাইয়া লইবে। এইখানি কর্ত্তাকে দিয়া কর্ত্তার উইলখানি আমাকে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল। বলিল, "বলিলে কি হয়—বুদ্ধির খেল্‌টা খেলোছ ভাল।"

হর। ভাবিতেছ কি?

ব্র। ইচ্ছা করে বটে কিন্তু ভয় করে। তোমার টাকা ফিরাইয়া লও। আমি কিন্তু জালের মধ্যে থাকিব না।

"টাকা দাও।" বলিয়া হাত পাতিল। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট ফিরাইয়া দিল। নোট লইয়া হরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ব্রহ্মানন্দ তখন আবার তাহাকে ডাকিয়া বলিল,

"বলি ভায়া কি গেলে?"

"না" বলিয়া হরলাল ফিরিল।

ব্র। তুমি এখন পাঁচশত টাকা দিলে। আর কি দিবে?

হর। তুমি সে উইলখানি আনিয়া দিলে আর পাঁচশত দিব।

ব্র। অনেকটা—টাকা—লোভ ছাড়া যায় না।

হর। তবে তুমি রাজি হইলে?

ব্র। রাজি না হইয়াই বা কি করি। কিন্তু বদল করি কি প্রকারে? দেখিতে পাইবে যে।

হর। কেন দেখিতে পাইবে? আমি তোমার সম্মুখে উইল বদল করিয়া লইতেছি তুমি দেখ দেখি টের পাও কি না।

হরলালের অন্য বিদ্যা থাকুক না থাকুক, হস্ত-কৌশল বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন উইলখানি পকেটে রাখিলেন, আর একখানি কাগজ হাতে লইয়া তাহাতে লিখিবার উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে হাতের কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ হাতে কি প্রকারে আসিল, ব্রহ্মানন্দ তাহা

কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ হরলালের হস্তকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরলাল বলিলেন, "এই কৌশলটি তোমায় শিখাইয়া দিব।" এই বলিয়া হরলাল সেই অভ্যস্ত কৌশল ব্রহ্মানন্দকে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন।

দুই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দের সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল। তখন হরলাল কহিল যে আমি এক্ষণে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বাকি টাকা লইয়া আসিব। বলিয়া সে বিদায় হইল।

হরলাল চলিয়া গেলে ব্রহ্মানন্দের বিষম ভয় সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে তিনি যে কার্য্যে স্বীকৃত হইয়াছেন তাহা রাজদ্বারে মহাদণ্ডার্হ অপরাধ—কি জানি ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইতে হয়? আবার বদলের সময়ে যদি কেহ ধরিয়া ফেলে? তবে তিনি একার্য্য কেন করেন? না করিলে হস্তগত সহস্র মুদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ থাকিতে নয়।

হায়! ফলাহার! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়াছ! এদিকে সংক্রামক জ্বর প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার উপস্থিত! তখন, কাংস্যপাত্র বা কদলীপত্রে সুশোভিত, লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ প্রভৃতির অমলধবল শোভা সন্দর্শন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে না আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্ক বিতর্ক করেন তথাপি তিনি এই কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না—এই মীমাংসা করিতে না পারিয়া—অন্যমনে—পরদ্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবেন।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ মহাশয়ের ঠিক তাই হইল। হরলালের এ টাকা হজম করা ভার—জেলখানার ভয় আছে; কিন্তু ত্যাগ করাও যায় না। লোভ বড়, কিন্তু বদ্ হজমের ভয়ও বড়! ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পারিল না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মত উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দ উইল লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন যে হরলাল আসিয়া বসিয়া আছেন। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?"

ব্রহ্মানন্দ একটু কবিতাপ্রিয়। তিনি কষ্টে হাসিয়া বলিলেন,

"মনে করি চাঁদ ধরি হাতে দিই পেড়ে।
বাবলা গাছে হাত লেগে আঙ্গুল গেল ছিঁড়ে॥"

হর। পার নাই নাকি ?

ব্র। ভাই কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল।

হর। পার নাই ?

ব্র। না ভাই—এই ভাই তোমার জাল উইল নাও। এই তোমার টাকা নাও। এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাক্স হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। ক্রোধে এবং বিরক্তিতে হরলালের চক্ষু আরক্ত এবং অধর কম্পিত হইল। বলিলেন, "মূর্খ, অকর্ম্ম! স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমা হইতে হইল না। আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও যদি তোমা হইতে এই কথার বাষ্প মাত্র প্রকাশ পায় তবে তোমার জীবন সংশয়।"

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "সে ভাবনা করিও না; কথা আমার নিকট প্রকাশ পাইবে না।"

এই কথার পর হরলাল বিদায় হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইলে পর একটি স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরলাল তাঁহাকে অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও ?"

স্ত্রীলোকটী দুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, "দাসী।"

হর। কে ও রোহিণী ?

স্ত্রীলোকটী বলিল, "আজ্ঞে।"

রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্কন্যা। তাহাকে যুবতী বলিতে হইবে। তাহার বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে বিংশতিবৎসর মাত্র দেখাইত। রোহিণী পরমাসুন্দরী বলিয়া পল্লীতে তাহার খ্যাতি ছিল। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পান খাইত, নির্জ্জল একাদশী করিত না। পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে সে মাছও খাইত। যখন পাড়ায় বিধবাবিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।

পক্ষান্তরে তাহার অনেক গুণও ছিল। রন্ধনে সে দ্রৌপদী বিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সুচের কাজে তুলনা রহিত। চুল

বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। পল্লীর মেয়েরা যেখানে লুকিয়ে চুরিয়ে গানের মজলিস করিত, রোহিণী সেখানে আখ্‌ড়াধারী—টপ্পা, শ্যামাবিষয়, কীর্ত্তন, পাঁচালি, কবি, রোহিণীর কণ্ঠাগ্রে। শুনা গিয়াছে, রোহিণী "ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র" অনেক জানিত। সুতরাং মেয়েমহলে রোহিণীর পশারের সীমা ছিল না। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত। ব্রহ্মানন্দের গৃহ শূন্য ; রোহিণী তাঁহার ঘরের গৃহিণী ছিল।

দুই চারিটী মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কাকার কাছে যে জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?"

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন "কি জন্য আসিয়াছিলাম ?"

রোহিণী হাসিয়া মৃদু মৃদু শ্লোক বলিল,

> যাও যাও আর কেলেসোনা, কাজ কি সোহাগ বাড়িয়ে।
> শুনেছি সব মনের কথা, বেড়ার গোড়ায় দাঁড়িয়ে॥

হরলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বটে! তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। এখন কি একটা নূতন রোজগারের পন্থা হইল ?"

রো। হইল বই কি।

হর। কার কাছে—কর্ত্তার কাছে এ কথা যাবে না কি ?

রো। রোজগার বড় বাবুর কাছেই হবে।

হর। কিরূপে ?

রো। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।

হরলাল বিস্মিত হইলেন ; বলিলেন "সে কি রোহিণী ?" পরে কহিলেন, "আশ্চর্য্যই বা কি! তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা তুমি কি প্রকারে উইল বদলাইবে ?"

রো। সে কথাটা আপনার সাক্ষাতে নাই বা বলিলাম। না পারি আপনার টাকা আপনি ফেরৎ লইবেন।

হর। ফেরৎ ? তবে কি টাকা আগামী দিতে হবে নাকি ?

রো। সব।

হর। কেন, এত অবিশ্বাস কেন ?

রো। আপনিই বা আমায় অবিশ্বাস করেন কেন ?

হর। কবে এটা পারবে ?

রো। আজিকেই। রাত্র তৃতীয় প্রহরে এইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

হরলাল বলিলেন, "ভাল," এই বলিয়া তিনি রোহিণীর হাতে হাজার টাকার নোট গণিয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐ দিবস রাত্র ৮টার সময়ে কৃষ্ণকান্ত রায় আপন শয়ন মন্দিরে পর্য্যঙ্কে বসিয়া উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া শটকায় তামাক টানিতেছিলেন, এবং সংসারে একমাত্র ঔষধ!—মাদক মধ্যে শ্রেষ্ঠ! অহিফেণ ওরফে আফিমের নেশায় মিঠে রকম ঝিমাইতেছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে খেয়াল দেখিতেছিলেন যেন উইলখানি হঠাৎ বিক্রয় কোবালা হইয়া গিয়াছে। যেন হরলাল তিনটাকা তের আনা ছকড়া ছক্রান্তি মূল্যে তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার যেন কে বলিয়া দিল, যে না এ দানপত্র নহে, এ তমসুক। তখনই যেন দেখিলেন যেন ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিম্ কর্জ্জ লইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন—মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এমত সময়ে, রোহিণী ধীরে ধীরে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা কি ঘুমাইয়াছ?"

কৃষ্ণকান্ত রায় ঝিমাইতে ঝিমাইতে কহিলেন, "কে নন্দী? ঠাকুরকে এইবেলা ফোরক্লোজ করিতে বল।"

রোহিণী বুঝিল যে, কৃষ্ণকান্তের আফিমের আমল আসিয়াছে। হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, নন্দী কে?"

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় না তুলিয়া বলিলেন, "হুঁম্! ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনে গোয়ালা বাড়ী মাখম খেয়েছে—আজও তার কড়ি দেয় নাই।"

রোহিণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণকান্তের চমক হইল, মাথা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কে ও, অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী?"

রোহিণী উত্তর করিল, "মৃগশিরা আর্দ্রা পুনর্ব্বসু পুষ্যা।"

কৃষ্ণ। অশ্লেষা মঘা পূর্ব্বফল্‌গুনী।

রো। ঠাকুরদাদা, আমি কি তোমার কাছে জ্যোতিষ শিখ্‌তে এয়েছি!

কৃষ্ণ। তাইত! তবে কি মনে করিয়া? আফিঙ্গ চাই না ত?

রো। যে সামগ্রী প্রাণ ধরে দিতে পার্‌বে না, তার জন্যে কি আমি এসেছি! আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি।

কৃ। এই এই! তবে আফিঙ্গেরই জন্য!

রো। না, ঠাকুরদাদা, না; তোমার দিব্য আফিঙ্গ চাই না। কাকা বল্‌লেন যে, যে উইল আজ লেখা পড়া হয়েছে, তাতে তোমার দস্তখত হয় নাই।

কৃষ্ণ। সে কি, আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে আমি দস্তখত করিয়াছি।

রো। না, কাকা কহিলেন যে তাঁহার যেন স্মরণ হচ্ছে তুমি তাতে দস্তখত কর নাই; ভাল, সন্দেহ রাখায় দরকার কি? তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ না।

কৃষ্ণ। বটে—তবে আলোটা ধর দেখি, বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানের নিম্ন হইতে একটী চাবি লইলেন। রোহিণী নিকটস্থ দীপ হস্তে লইল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে একটি ক্ষুদ্র হাত বাক্স খুলিয়া বিচিত্র একটি চাবি লইয়া পরে একটা চেষ্ট ড্রয়ারের একটী দেরাজ খুলিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐ উইল বাহির করিলেন। পরে বাক্স হইতে চস্‌মা বাহির করিয়া, নাসিকার উপর সংস্থাপনের উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু চস্‌মা লাগাইতে লাগাইতে দুইচারিবার আফিঙ্গের ঝিমকিনি আসিল—সুতরাং তাহাতে কিছুকাল বিলম্ব হইল। পরিশেষে চস্‌মা সুস্থির হইলে কৃষ্ণকান্ত উইলে নেত্রপাত করিয়া দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "রোহিণী, আমি কি এতই বুড় হইয়াছি? এই দেখ আমার দস্তখত।"

রোহিণী বলিল, "বালাই বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর করিয়া নাতিনী বল বই ত না। তা ভাল, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি গিয়া।"

রোহিণীর যে অভিপ্রায় তাহা সিদ্ধ হইল। কৃষ্ণকান্তের উইল কোথায় আছে, তাহা জানিয়া গেল। রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়ন মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * * * * * * *

গভীর নিশাতে কৃষ্ণকান্ত নিদ্রা যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, তাঁহার শয়নগৃহে দীপ জ্বলিতেছে না। সচরাচর সমস্ত রাত্র দীপ জ্বলিত কিন্তু সে রাত্রে দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে দেখিলেন। নিদ্রাভঙ্গকালে এমতও শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল যে, যেন কে একটা চাবি কলে ফিরাইল। এমতও বোধ হইল যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে। মানুষ তাহার পর্য্যঙ্কের শিরোদেশ পর্য্যন্ত আসিল—তাঁহার বালিশে হাত দিল। কৃষ্ণকান্ত আফিঙ্গের নেশায় বিভোর, না নিদ্রিত, না জাগরিত, বড় কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ঘরে যে আলোক নাই—তাহাও ঠিক বুঝেন নাই, কখন

অর্দ্ধ নিদ্রিত—কখন অর্দ্ধ সচেতন—সচেতনেও চক্ষু খুলে না। একবার দৈবাৎ চক্ষু খুলিয়া কতকটা অন্ধকার বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন মনে করিতেছিলেন যে, তিনি হরিঘোষের মোকদ্দমায় জাল দলিল করায়, জেলখানায় গিয়াছেন। জেলখানা ঘোরান্ধকার। কিছু পরে হঠাৎ যেন চাবি খোলার শব্দ অল্প কানে গেল—একি জেলের চাবি পড়িল? হঠাৎ একটু চমক হইল। কৃষ্ণকান্ত শট্‌কা হাতড়াইলেন, পাইলেন না—অভ্যাস বশতঃ ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত অন্তঃপুরে শয়ন করিতেন না—বহির্ব্বাটীতেও শয়ন করিতেন না। উভয়ের মধ্যে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরে শয়ন করিতেন। সেখানে হরি নামক একজন খানসামা তাঁহার প্রহরী স্বরূপ শয়ন করিত। আর কেহ না। কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, "হরি!"

হরি তখন মতি গোয়ালিনীর গৃহে সেই বহুবিলাসিনী সুন্দরীকে কেবল হরিমাত্র পরায়ণা মনে করিয়া তাহার সতীত্বের প্রশংসা করিতেছিল। সেও রোহিণীর কৌশল। নহিলে দ্বার খোলা থাকে না। এদিকে কৃষ্ণকান্ত বারেক মাত্র হরিকে ডাকিয়া, আবার আফিমে ভোর হইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আসল উইল, তাঁহার গৃহ হইতে সেই অবসরে অন্তর্হিত হইল। জাল উইল তৎপরিবর্ত্তে স্থাপিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুপ্তা সুন্দরীর প্রথম নিদ্রাভঙ্গে নয়নোন্মীলনবৎ, পৃথিবী মণ্ডলে প্রভাতোদয় হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠতলে রোহিণীর সহিত হরলাল কথোপকথন করিতেছিল—যেন পাতালমার্গে, অন্ধকার বিবর মধ্যে সর্পদম্পতি গরল উদগীর্ণ করিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের যথার্থ উইল রোহিণীর হস্তে।

হরলাল বলিলেন, "তারপর, আমাকে উইলখানি দাও না।"

রোহিণী। সে কথা ত বলিয়াছি, উইলখানি আমার নিকট থাকিবে।

হরলাল তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তোমার পুরস্কার তোমাকে দিয়াছি। এখন ও উইল আমার।"

রো। আপনারই রহিল, কিন্তু আমার কাছে থাকুক না কেন? আমি ত চিরদিন আপনারই আজ্ঞাকারী। ইহা আর কাহারও হস্তে যাইবে না বা আর কেহ দেখিতে পাইবে না।

হর। তুমি স্ত্রীলোক—কোথায় রাখিবে কাহার হাতে পড়িবে, উভয়েই মারা যাইব।

রো। আমি উইল এমত স্থানে রাখিব যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি না দিলে আপনিও সন্ধান পাইবেন না।

হর। তোমার ইচ্ছা যে তুমি ইহার দ্বারা আমাকে হস্তগত রাখ—না, কি গোবিন্দলালের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ কর।

রো। গোবিন্দলালের মুখে আগুন। আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না।

হর। আর যদি কোন প্রকারে আমি কর্ত্তাকে জানাই যে রোহিণী তাঁহার ঘরে চুরি করিয়াছে।

রো। আমি তাহা হইলে কর্ত্তার নিকট এই উইলখানি ফিরাইয়া দিব। আর বলিব যে আমি এই উইল ব্যতীত কিছুই চুরি করি নাই। তাও বড় বাবুর কথায় করিয়াছি। তাহাতে বড় বাবুর উপকার কি অপকার হইবে তাহা আপনিই বিবেচনা করুন্। স্মরণ করিয়া দেখুন আসল উইলে আপনার শূন্য ভাগ; আমাকে থানায় যাইতে হয় আমি মহৎ সঙ্গে যাইব।

হরলাল ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া রোহিণীর হস্তধারণ করিলেন। এবং বলে উইল খানি কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। রোহিণী তখন উইল তাঁহার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ইচ্ছা হয় উইল লইয়া যাউন। আমি কর্ত্তার নিকট সম্বাদ দিই যে তাঁহার উইল চুরি গিয়াছে—তিনি নূতন উইল করুন্।"

হরলাল পরাস্ত হইলেন। তিনি ক্রোধে উইল দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, "তবে অধঃপাতে যাও।"

এই বলিয়া হরলাল সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রোহিণী উইল লইয়া নিজালয়ে প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নিশাচরদ্বয়

একদা রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে এক ব্যক্তি দ্রুতপাদবিক্ষেপে সুবর্ণপুর গ্রামের যে পল্লীতে হরিনাথ মুখো বাস করেন, সেই পল্লীতে যাইতেছিলেন। মাঘ মাস, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাত্র অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না—অতি প্রবল উত্তর বাতাসে পথিক শীতপীড়িত হইয়া মধ্যে মধ্যে গাত্রবসন দ্বারা মুখের কিয়দংশ আবরণ করিতেছিলেন। পথিক কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া রাজপথ ত্যাগ করিয়া একটি অতি অপ্রশস্ত গলি পথ দিয়া চলিলেন। পথ এমত অপ্রশস্ত যে পথিকের গাত্রবসন দুইপার্শ্বস্থিত বৃতি স্পর্শ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পথি-পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ থাকাতে সেই পথে অন্ধকার আরও গাঢ়তর বোধ হইতে লাগিল। অতি প্রবল নৈশবায়ু মধ্যে মধ্যে পথিককে কাঁপাইতে লাগিল, তজ্জন্য পথিক আরও দ্রুত চলিলেন। এক স্থানে একটি বাদাম বৃক্ষতলে গাঢ় অন্ধকারে অতি বেগে পথিকের মস্তকে একটি স্থির পদার্থ লাগিল। পথিক যন্ত্রণায় উঃ করিয়া উঠিলেন, পথিক পদার্থকে মনুষ্য বিবেচনা করিয়া, রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও?" পদার্থও তদ্রূপস্বরে উত্তর করিল, "তুমি কে?" পথিক স্বর চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "কে দেবনাথ মুখুয্যা মহাশয়! আপনি, তা আমি জানিতে পারি নাই—কি সম্বাদ?—" দেবনাথ আঘাত যন্ত্রণায় গাল ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আরে রেখে দেও তোমার সম্বাদ—আগেই সম্বাদ—আগে প্রাণ না আগে সম্বাদ—যাহার জন্য আমি এত রাত্রে এই শীতে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া—সেই আমার সর্ব্বনাশ করিল।" রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে পথিক রতিকান্ত ভিন্ন আর কেহ নহে) বলিল, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার আমি কি সর্ব্বনাশ করিলাম?" দেবনাথ অতি ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "মনুষ্যের ইহা অপেক্ষা কি সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তুমি আমার সম্মুখের এই দাঁতটী ভাঙ্গিয়াছ।" এই বলিয়া দেবনাথ মুখো রোদনোন্মুখ হইলেন।

রতিকান্ত হাস্যের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তাহাতে দেবনাথ আরও রাগান্ধ হইয়া বলিল, "রতিকান্ত বাবু তুমি আজ আমার যে অনিষ্ট করিলে এ অনিষ্ট আমি মরিলেও ভুলিব না।" মুখোপাধ্যায়ের সেই সময়ে মনে পড়িতেছিল যে, তাঁহার ঝুনা নারিকেল দিয়া চাল ভাজা খাওয়ার সাধ ইহ জন্মের মত ঘুচিল—ইক্ষু, কেশুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল তাঁহার কাছে এখন হইতে গোমাংস তুল্য হইল—হায়! এখন কি হইবে? তাম্বুল চর্ব্বনের জন্য কি এখন ব্রাহ্মণীকে অনুরোধ করিতে হইবে? তা ত প্রাণ থাকিতে হইবে না—নথ নাড়া, নথের ভিতর হইতে বাঁকা হাসি, প্রাণ থাকিতে সহিবে না। নথের কথা মনে হইবামাত্র মুখোপাধ্যায় অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন, "আজ হইতে তুমি আমার চিরশত্রু হইলে, আমি তোমার জন্য যে রজনীর সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলাম সে আমার কখন কোন অনিষ্ট করে নাই; কিন্তু তুমি আজ আমার সর্ব্বনাশ করিলে! হায় ঝুনা নারিকেল রে!—আমি তোমার সহিত মিত্রতা করিতে যে ভৈরবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিলাম, সে শপথ তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলাম—হে মা কালী, কোন অপরাধ লইও না—হায় বিলাতি কুল, বাতরাজ আলু, শসা পিয়ারা বাদাম পেস্তা রে!" এই বলিয়া দেবনাথ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একবার ধ্যান করিল। গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল ভাসিয়া পড়িতে লাগিল! ইহাতে রতিকান্তের হাস্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল কিন্তু অতি কষ্টে উহা সম্বরণ করিয়া অতি বিনীতস্বরে বলিলেন, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি অতি বিজ্ঞ হইয়াও কেন এরূপ অন্যায় রাগ করিতেছেন। আপনি আমার পরম সুহৃদ, আপনার সাহায্যে আমি কার্য্যোদ্ধার করিব, আমি কি জানিয়া শুনিয়া আপনার দাঁত ভাঙ্গিতে পারি? আর বিশেষতঃ আপনি কি জানেন না যে গো হাড়ের ন্যায় দুইটা দাঁতের পরিবর্ত্তে কালই দু'টা সোণার দাঁত বসান যাইতে পারে? তাহাতে মুখের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়—এবং ঝুনা নারিকেল কি ছাই, চকমকির পাথরও তাতে চিবানো যায়।"

মুখো। যায়?

রতি। কলিকাতার মনোহর বাবু সোণার দাঁতে এক জোড়া লোহার হাতা বেড়ি চিবাইয়া খাইয়াছিলেন। কালই আপনার সোনার দাঁত বসাইব—

দেব। কি বল্লে ভাই—হাতা বেড়ি? আমার সোনার দাঁত বসিয়ে দিবে?—তা কি হয়?

রতি। দিব। দুই দিনের মধ্যেই দিব। আপনি এখানে দাঁড়াইয়া কেন?

দেব। তোমারই জন্য, সেই উন্মাদিনীর সন্ধানে বেড়াইতেছি।

রতি। উন্মাদিনীর সন্ধানে এ অন্ধকারে বাদাম তলায় দাঁড়াইয়া কেন?

দেবনাথ উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। রতিকান্তও উত্তরের অপেক্ষায় নীরব হইয়া রহিলেন কিন্তু ক্ষণকাল উভয়েই নীরব, ইতিমধ্যে দেবনাথের পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র জঙ্গল হইতে হঠাৎ মলের ঠুন ঠুন শব্দ রতিকান্তের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া উহার অনুসন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু দেবনাথ মুখো অগ্রসর হইয়া হস্ত ধরিলেন এবং বলিলেন "ভাই, জঙ্গলে কত রকম জন্তু আছে—কামড়াইতে পারে। ওখানে যাওয়া উচিত নহে।" রতিকান্ত দেবনাথ মুখোর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "কামড়াইতে পারে বটে। ও সকল ঘোড়ার কামড়—মেঘ না ডাকিলে ছাড়ে না—কার মাথায় হাত বুলাইলে ?"

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া বলিলেন, "ভাই কথায় কাজ কি ? সকলেরই শরীরে একটা না একটা দোষ আছে। দেখ ঐ দাঁতপড়ার কথাটা বলিতেছিলাম—ওটা তামাসা—দাঁত আমার যেমন তেমনিই আছে।" এই বলিয়া মুখোপাধ্যায় ভগ্ন দন্তটি জঙ্গলে ফেলিয়া দিলেন। রতিকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "তার লুক-চুরিতেই বা কাজ কি ? তোমার সোণার দাঁত হলে তুমি ও ঠুনঠুনে মল ছুই গাছও চিবাইতে পারিবে।" এই বলিয়া, রতিকান্ত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন—কিঞ্চিৎ দুর যাইয়া মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত একটী গৃহদ্বারে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়াতে গৃহপশ্চাতে একটী গবাক্ষে সেইরূপ আঘাত করিতে লাগিলেন। ভিতর হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কেও, রতি বাবু ?" উত্তর, "হাঁ আমি। দ্বার খোল বড় শীত।" রতিকান্ত পুনরায় দ্বারদেশে আসিলেন। একটী প্রাচীনা আসিয়া দ্বারোদঘাটন করিল। প্রাচীনা পাঠকদিগের নিকট অপরিচিতা নহেন, ইনি সে দিবস প্রত্যূষে গঙ্গাতীরে উন্মাদিনীর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। প্রাচীনা রতিকান্তকে শীতার্ত্ত দেখিয়া গৃহাভ্যন্তরে আসিতে কহিল। রতিকান্ত গৃহমধ্যে একটী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া কহিলেন, "কোন সন্ধান পাইলে কি ?" প্রাচীনা উত্তর করিল, "তাহার সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই।"

রতি। কেন ?

প্রাচীনা। সুযোগ হইল না, সেস্থলে অনেক লোক তাঁহার পাগলামি দেখিতেছিল।

রতি। কোথায় দেখিয়াছিলে ?

প্রা। এই পাড়ায় সন্ধ্যাকালে বেড়াইতেছিল।

রতি। তবে বোধ হয় এ রাত্রে এই গ্রামেই আছে ?

প্রা। আছে বই কি।

রতি। বোধ হয় গ্রাম অনুসন্ধান করিলে তাঁহার দেখা পাইতে পারি ?

প্রা। পারেন।

ইহার পর রতিকান্ত প্রাচীনার হস্তে পাঁচটি রৌপ্য মুদ্রা দিয়া উঠিলেন। প্রাচীনা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাও ?"

রতি। তাঁহার অনুসন্ধানে।

প্রা। সেকি! এত রাত্রে তাহারে কোথায় পাইবে ?

র। যদি এই গ্রামে থাকে তবে পাব বই কি।

প্রা। কাহার বাটীতে অনুসন্ধান করিবে ?

র। পাগলী কাহারো বাটীতে আশ্রয় লয় না—

এই বলিয়া রতিকান্ত অতি দ্রুত প্রাচীনার বাটী ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল যে উন্মাদিনীকে মধ্যে মধ্যে গ্রামপ্রান্তে মাঠে এবং বাগানে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার এক প্রকার প্রতীতি হইল যে পাগলীকে উহার মধ্যে কোন স্থানে না কোন স্থানে দেখিতে পাইবেন।—এমত বিবেচনা করিয়া রতিকান্ত চলিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নিশাচরীদ্বয়

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। হুঃ হুঃ করিয়া শীতল নৈশ বায়ু বহিতেছে। রতিকান্ত অন্ধকারে কাঁপিতে কাঁপিতে একাকী চলিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া গ্রাম অতিক্রম করিয়া একটী বৃহৎ অন্ধকারময় আম্রকাননে আসিলেন। প্রবাদ ছিল যে এই কাননে ভূতযোণি বিরাজ করিত। কিন্তু রতিকান্ত যে দুঃসাহসিক শপথ করিয়া রজনীকান্তের সর্ব্বস্বাপহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা নৃশংসের কায আর কি ছিল ? রতিকান্ত অকুতোভয়ে আম্রকাননে প্রবেশ করিলেন। কাননের মধ্যস্থলে একটি ইষ্টকনির্ম্মিতঘাট-বিশিষ্ট সরোবর ছিল। বৃক্ষের বিচ্ছেদে নক্ষত্রালোকে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ঐ স্থান কিঞ্চিৎ আলোকময়। রতিকান্ত দেখিলেন যে ঐ ঘাটের একটি সোপানে কে এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল। একবার রতিকান্তের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হঠাৎ দাঁড়াইলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার চলিলেন। তাঁহার পদশব্দজনিত শুষ্ক পত্রের মরমরশব্দে সে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে দুই এক পদ অগ্রসর হইলে রতিকান্তও সম্মুখে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃৎকম্প হইল। যাঁহাকে বহুকাল মৃত বিবেচনা করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে এ জন্মে কখন দেখিবার সম্ভব ছিল না, রতিকান্ত সেই অন্ধকারময় বিজন আম্রকাননে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! ভয়ে তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু আম্রকাননবিহারিণী স্ত্রীলোক আর এক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিল, "রতিকান্ত ভয় নাই—আমি প্রেতিনী নহি। তোমরা শুনিয়াছিলে আমি মরিয়াছিলাম—কিন্তু সে মিথ্যা জনরব মাত্র।" রতিকান্তের এক্ষণে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কেন?" উত্তরে স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?"

র। কোথায় যাইব?

স্ত্রী। কেন, তোমার কি ঘর দ্বার নাই?

র। আপনি কি জানেন না যে রজনীকান্ত আমার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়াছে।

স্ত্রী। তোমার মিথ্যা কথা—যদি কেহ তোমার কিছু অপহরণ করিয়া থাকে, তবে সে তাহার পিতা রামকান্ত। অকারণে তুমি তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টায় বেড়াইতেছ।

র। আপনি কিরূপে আমার অভিপ্রায় জানিলেন?

স্ত্রী। তোমার অভিপ্রায় গোপন নাই—সকলেই এখন উহা জানিতে পারিয়াছে। বলিতে বলিতে স্ত্রীলোকটি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি কিছু পীড়া আছে?" স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমি উৎকট রোগে পীড়িতা—আমার শেষদশা বলিয়া, তোমাদের দেখিতে আসিয়াছি।"

র। এখানে কোন গ্রামের ভিতরে চলুন। সেখানে কোন গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লইবেন চলুন—এ পীড়িত অবস্থায় এখানে থাকা উচিত নহে—

স্ত্রী। গ্রামে কোন গৃহস্থের বাটী আমি তিন দিবস ছিলাম। কিন্তু গৃহস্থের প্রতিবাসী একজন চিনিতে পারিয়া আমায় প্রেতিনী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। আমি সেইজন্য সেস্থান ত্যাগ করিয়া এই বাঁধা ঘাটে শয়ন করিয়া আছি।

র। একাকী এই রুগ্ন অবস্থায় কেমন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন—হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা হইতে পারে—

স্ত্রী। আমি একাকী নহি; আমার একজন সমভিব্যাহারী আছে—আমি সে জন্য তোমায় ব্যস্ত করিব না।

র। আমাদের ব্যস্ত করিবেন না ত কাহাকে ব্যস্ত করিবেন; আমরা কি আপনার পর—

স্ত্রী। তুমি আমার পর নহ কিন্তু তোমার যত্নে আমার তৃপ্তি হইবে না—

এই কথোপকথন হইতে হইতে সেই গভীর তমিস্র নৈশগগন ভেদ করিয়া আম্রকানন কাঁপাইয়া সঙ্গীতধ্বনি হইল। রতিকান্তের শরীর কণ্টকিত হইল। পীড়িতা রমণীও চমকিত হইলেন এবং কহিলেন, "তুমি এস্থান হইতে যাও, আমার সঙ্গিনী আসিতেছে; তাহার চিত্ত স্থির নহে—তোমাকে দেখিলে তাহার মনের চাঞ্চল্য

আরও বৃদ্ধি হইতে পারে।” রতিকান্ত কোন উত্তর না করিয়া সে স্থান হইতে অপসৃত হইলেন, কিন্তু দূরে যাইয়া একটী তিন্তিড়ী বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া দেখিলেন যে দূর হইতে একটি মধ্যবয়সী রমণী চঞ্চলগমনে আসিতেছে—তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে চিনিলেন যে পীড়িতা রমণীর সঙ্গিনী আর কেহ নহে; সেই উন্মাদিনী—যাঁহার অনুসন্ধানে তিনি এই ভীষণ অন্ধকারে বনে বনে বেড়াইতেছেন। রতিকান্তের সেই জন্যই অনুধাবন হইল যে তাঁহার জ্ঞাতি রজনীকান্তের সম্বন্ধে যে অতি গূঢ় গোপনীয় কথা উন্মাদিনী গঙ্গাতীরে ব্যক্ত করিয়াছিল—তাহার সহিত এ পীড়িতা রমণীর কোন সংশ্রব থাকিবার সম্ভাবনা। অতএব তাহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণাভিলাষে বৃক্ষান্তরালে রহিলেন। কিন্তু দূরবশতঃ, কিছুই শুনিতে পাইলেন না—ক্রমে যামিনী অবসান হইল, পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ আলোকময় হইল, বিহঙ্গমকুল কলকল রব করিয়া উঠিল। পীড়িতা রমণী উন্মাদিনীর স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া অতি মৃদুপাদবিক্ষেপে আম্রকানন হইতে নির্গত হইলেন। রতিকান্তও অলক্ষ্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। রমণীদ্বয় গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, হরিনাথ মুখোর বাটীর সন্নিকটে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত কুটীরে প্রবেশ করিলেন। রতিকান্ত উহা দেখিয়া অদৃশ্য হইলেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ

কুমুদিনী রাত্রে যাহা দেখিল

রজনীকান্ত যেমন কুমুদিনীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, আমরা যদিও মোহিত হই নাই, তথাচ তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে ভালবাসি। অনেক দিন তাঁহাকে দেখি নাই; চল পাঠক, যদি তোমাদের গৃহিণীরা রাগ না করেন তবে আজ একবার তাঁহাকে গিয়া দেখি। প্রস্ফুটিত পদ্ম কুসুমবৎ কুমুদিনী সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিয়া বেড়াইতেছেন। শৈশব হইতে তিনি পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, আজ সেই অকৃত্রিম স্নেহের তিনি অধিকারিণী—সেই মধুর আদরে আদরিণী। আবার সংসারী হইবেন—শৈশবে যখন তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তখন বিবাহ কাহাকে বলে জানিতেন না, এবং সেই অর্থ না বুঝিতে বুঝিতে বিধবা হইয়াছিলেন; এ অবস্থায় তাঁহার বিবাহ হইবে,—আবার মনোমত পাত্রের সহিত বিবাহ—তাঁহার কি আর সুখের সীমা আছে? এই অসীম সুখ বাহিরে অব্যক্ত, অথচ তাঁহার পিতামাতা বুঝিতে পারিলেন—পারিয়া, তাঁহার জনক জননী জগদীশ্বরের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাদিগের ঐই একমাত্র কন্যাকে যেন দীর্ঘায়ু করেন

—কুমুদিনীও মনে মনে প্রার্থনা করিলেন তাঁহার ভাবী পতি শরৎকুমারকে ও তাঁহার পিতামাতাকে যেন দীর্ঘায়ু করেন। কুমুদিনী সুখের সময়ে তাঁহার দুঃখে দুঃখী তাঁহার সুখে সুখী রজনীকান্তকে ভুলিলেন না, তাঁহাকে যে অকারণে রূঢ়বাক্য দ্বারা মনস্তাপ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে শেলবৎ মধ্যে মধ্যে আঘাত করিত, এবং সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেন যে আর একবার রজনীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিষ্ট আলাপ করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ রজনীকান্তের আর সাক্ষাৎ লাভ হইল না। এই চিন্তা মেঘবৎ মধ্যে মধ্যে কুমুদিনীর হৃদয় অন্ধকার করিত— এবম্বিধ চিন্তায় এক দিবস সন্ধ্যা-কালে কুমুদিনী তাঁহাদের খিড়কির উদ্যানের পুষ্করিণীর ঘাটের একটি সোপানে বসিয়া আছেন, এমত অময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া দেখিলেন, আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত উন্মাদিনী তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহাকে কি সঙ্কেত করিতেছে। কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?" পাগলিনী কোন উত্তর না করিয়া পুনরায় অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। কুমুদিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, তোমার ঠাকুরাণী ত ভাল আছেন?" পাগলিনী মাথা নাড়িয়া বলিল "উঁহু"। কুমুদিনী চমকিত হইয়া পাগনীর হস্ত ধরিয়া অতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পীড়া কি বৃদ্ধি হইয়াছে?" পাগলিনী উত্তর না দিয়া কেবল অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহাকে তাহার সমভিব্যাহারে যাইতে সঙ্কেত করিতে লাগিল। কুমুদিনী পাগলিনীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। খিড়কির দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া অনতিদূরে একটি ভগ্নকুটীরে প্রবেশ করিলেন। কুটীরের এক কোণে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত দীপাধারে একটি ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। তাহার সন্নিকটে এক জীর্ণ ও গলিত শয্যায় একটি প্রাচীনা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা রমণী শয়ন করিয়া আছেন। ইনি আমাদিগের অপরিচিতা নহেন, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে রতিকান্তের সহিত যামিনীযোগে আম্রকাননে ইঁহারই সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল—এবং রতিকান্ত ইঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই কুটীর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। কুমুদিনী কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে পীড়িতা রমণী মুমূর্ষুপ্রায়; মধ্যে মধ্যে মুখে বারিসিঞ্চনের দ্বারা ও অনেক যত্নে তাঁহার সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হইল। পীড়িতা রমণী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া নিকটে কুমুদিনীকে দেখিয়া ক্ষণিক হর্ষান্বিত হইলেন। নয়নে দুই এক বিন্দু বারি পড়িল, এবং অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "মা এসেছিস,— কুমুদিনী তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার কে ছিলে—নতুবা এজন্মে চরমকালে তুমি আমার পুত্রের ন্যায় কাজ করিতেছ কেন?" কুমুদিনী অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে বলিলেন, "স্থির হউন, নতুবা রোগ বৃদ্ধি পাইবে।"

পীড়িতা রমণী উত্তর করিল,"রোগের আর কি বৃদ্ধি পাইবে—মা—আজ রাত্রি আমার কাটিবে না। তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে; আমি সেইজন্য তোমাকে ডাকিয়াছি।"

কুমু। কি, বলুন।

পীড়িতা। আমার ভিক্ষা এই যে বহুদূর হইতে মরিতে মরিতে যাহাকে দেখিতে আসিয়াছি একবার তাহাকে দেখাও—মা আমার আর কেহ বন্ধু নাই যে, এ উপকার করে—

কুমু। কে, কাকে দেখিতে চাও ?

পীড়িতা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে আমার পূর্ব্বপরিচয় দিব, তা নহিলে তুমি বুঝিতে পারিবে না। আমায় একটু জল দাও বড় তৃষ্ণা—" বলিতে বলিতে পীড়িতা অচেতন হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কুমুদিনী রাত্রে যাহা শুনিল

কুমুদিনী একটি মৃৎপাত্রে জল আনিয়া তাহার মুখে সিঞ্চন করিলেন, এবং তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে উহা পান করিতে দিলেন। পীড়িতা রমণী কিঞ্চিৎ বলাধান হইলে বলিতে লাগিলেন, "তোমাদিগের প্রতিবাসী রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সোণামণিকে বিবাহ করেন। পিতা মাতা দরিদ্র বিধায়ে আমি তাহার সমভিব্যাহারে আসিয়া রমাকান্ত বাবুর বাটীতে বাস করিতে লাগিলাম। কখন স্বামীর ঘর করি নাই, স্বামী একজন মহৎ কুলীন—বিবাহ তাহার উপজীবিকা—আমাকে দরিদ্রের কন্যা বিবেচনা করিয়া কখন তিনি আমাদের বাটী আসিতেন না। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন যে আমি বিখ্যাত ধনাঢ্য রমাকান্ত বাবুর সংসারে বাস করিতেছি, তখন মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিলেন। আমি ভগিনীর সসংারে সুখে থাকিলাম। প্রথমতঃ—মধ্যে মধ্যে স্বামীকে দেখিতে পাইতাম, দ্বিতীয়তঃ—এই সংসারে কর্ত্রী স্বরূপা হইয়া রহিলাম। ভগিনীর ক্রমে বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইল। রমাকান্ত বাবুর প্রথমা স্ত্রীর তিন কন্যাসন্তান মাত্র ছিল, কিন্তু রমাকান্ত বাবু একটি পুত্রসন্তান না হওয়াতে সর্ব্বদাই দুঃখিত। আমার ভগিনী সোনামণি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইলেন। অনেক যাগ্ যজ্ঞ আরম্ভ হইল অবশেষে ভগিনী অন্তঃস্বত্বা হইলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় আমিও ঐ সময়ে অন্তঃস্বত্বা হইলাম। নবম মাসে এক দিবস প্রাতে ভগিনী একটি সুকুমার প্রসব করিলেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ! আমিও সেই দিবসে

সন্ধ্যাকালে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলাম। আমরা দুই ভগিনী এক সময়ে পুত্র প্রসবিনী হওয়াতে আহ্লাদের আর সীমা রহিল না—রমাকান্ত বাবুর বিপুল বৈভবের অধিকারী জন্মিল। সুবর্ণপুর আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠিল। আমাদিগের সন্তান দুইটির তাহাদিগের মাতুলের ন্যায় মুখাবয়ব হইল। উভয়ে হৃষ্ট পুষ্ট এবং একই প্রকার দেখিতে হইল, দুই জনকে একত্রে রাখিলে সর্ব্বদাই ভ্রম হইত। ভগিনী সন্তানটির নিতান্ত অনুরক্তা হইলেন, ক্ষণকালের জন্য ক্রোড় হইতে ভূমিতে রাখিতেন না; এমন কি সন্তানটি এক মাসের হইলে একদিবস তাহারা বাল্‌সা হাওয়াতে সোণামণি মনের চাঞ্চল্য হেতু মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং সেই অবধি ক্রমে ক্রমে রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। রমাকান্ত বাবু সোণামণিকে অতিশয় ভালবাসিতেন—তাহার পীড়া দেখিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। দেশ দেশান্তর হইতে কত চিকিৎসক আনাইলেন। তাহারা একমাস ধরিয়া চিকিৎসা করিল কিন্তু বিশেষ কোন ফল দর্শিল না—অবশেষে তাহারা স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিল। নিলারপুরে আমাদের পিত্রালয়। নিলারপুরের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, অতএব শেষ স্থির হইল কিছু দিনের জন্য ভগিনীদ্বয়ে পিত্রালয়ে গিয়া বাস করি। এক শুভদিনে নিলারপুরে যাত্রা করিলাম,—রমাকান্ত বাবু বৃদ্ধ বয়সে সোণামণির অতিশয় বাধ্য হওয়াতে আমাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন,—উঃ বড় তৃষ্ণা, জল—" বলিতে বলিতে রমণী আর বলিতে পারিলেন না, বাক্‌শক্তি রহিত হইল। কুমুদিনী দ্রুত জল আনিয়া দিলেন। রমণী উহা পান করিয়া ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন, পুনরায় যখন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কুমুদিনী নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "আজ স্থির হইয়া থাকুন, কাল বলিবেন।" রমণী বলিলেন, "আমি ত কাল পর্য্যন্ত বাঁচিব না; আজ না বলিলে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব না।" এই বলিবা পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"পিত্রালয়ে কিছুদিন বাস করিয়া সোণামণি কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল। রমাকান্তের ইচ্ছা যে মাস ছয় সাত সেখানে থাকিয়া সোণামণি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করে। এইরূপে কিছুদিন পরে যখন আমাদিগের শিশুদিগের আড়াই মাস বয়ঃক্রম হইল তখন এক দিবস জনরব উঠিল যে, পূর্ব্বাঞ্চল হইতে একদল ছেলেধরা স্ত্রীলোক আসিয়াছে। তাহারা দুই চারি মাসের শিশুদিগের চুরি করিয়া লালন পালন করিয়া চার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে ব্যবসাদারদিগের নিকট বিক্রয় করে এবং তাহারা অন্য দেশে বালকদিগের গোলাম বলিয়া বিক্রয় করে—এই সংবাদে প্রসূতিদিগের মনে কি প্রকার ভয় হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। আমার ভগিনী সোণামণি উন্মত্তের ন্যায় হইলেন, পীড়া আরও বৃদ্ধি হইল, তাঁহার শিশুকে কাহারও নিকট বিশ্বাস করিয়া দিতেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে আমিই সে বিশ্বাস

ভাজন হইতাম। এক দিবস সন্ধ্যার সময় সোণামণি আমার নিকট তাঁহার সন্তানকে দিয়া গঙ্গায় গা ধুইতে গিয়াছিলেন। আমার পিতার বাটীর পশ্চাতেই একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর ছিল, আমি বিষম গ্রীষ্ম-যন্ত্রণায় প্রান্তরের দিকে একটি দ্বার খুলিয়া শিশুকে লইয়া শয়নে ছিলাম। ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভয়েতে চমকিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্যস্ত হইয়া শিশুকে কোলে টানিতে গিয়া দেখিলাম, শিশু নাই—চীৎকার করিয়া আছাড়িয়া পড়িলাম, তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে— আমার চীৎকারে ভগিনীপতি দৌড়িয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে সবিশেষ বলিলাম। তিনি চতুর্দ্দিকে ভৃত্যবর্গকে পাঠাইয়া আমার নিকট আসিয়া আমার দুই হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'দেখ আমি অনেক লোকজন পাঠাইয়াছি এক্ষণেই তাহারা শিশু ফিরাইয়া আনিবে; কিন্তু ইতিমধ্যে তোমার ভগিনী যদি বাটী আসিয়া তাঁহার সন্তানকে দেখিতে না পান তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণত্যাগ হইবে। অতএব তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য আপাততঃ তোমার পুত্রকে তাঁহার বলিয়া তাঁহাকে দেওয়া আবশ্যক। তোমার পুত্র ও আমার পুত্র যমজের ন্যায়, কোন প্রভেদ নাই। সোণামণি সহজেই ভুলিবেন—তাহার পর আমার শিশুপুত্র প্রাপ্ত হইলে সকল বজায় থাকিবেক।' আমি এই পরামর্শে সম্মত হইলাম—কেননা সোণামণি বাটী আসিয়া তাঁহার শিশুকে না দেখিতে পাইলে নিশ্চয় মরিবে, তাহা জানিতাম। বিশেষতঃ যতদিন না সোণামণির শিশু পাওয়া যায় ততদিন আমার শিশু আমারি নিকট থাকিবে, এই বিবেচনা করিয়া পরিচারিকা:কমলমণির (এক্ষণে এই উন্মাদিনী) নিকট হইতে আমার শিশু আনিয়া পূর্ব্ববৎ সেইস্থানে শয়ন করাইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। ভগিনী পথিমধ্যে এ সংবাদ পাইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িয়া আসিতেছিলেন, এবং আমার শিশুকে তাহার বিছানা হইতে ক্রোড়ে লইয়া পাগলের ন্যায় হাসিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সকলে জানিল যে আমার শিশু হারাইয়াছে এবং তাহা আর পুনঃপ্রাপ্ত হইল না।

"কিছুদিন পরে সোণামণি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে রমাকান্ত বাবু তাঁহাকে লইয়া সুবর্ণপুরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমিও যাইতে উদ্যত হইলাম—কিন্তু তিনি নিষেধ করিলেন, বলিলেন, 'তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা কাশী যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের সঙ্গে একজন অভিভাবক থাকা আবশ্যক। তুমি ভিন্ন আর কে সঙ্গে যাইতে পারে? আমি সকল খরচপত্র দিব।' আমি যাইতে অস্বীকৃত হইলাম, বলিলাম, 'আমার সন্তান ফিরাইয়া দাও, আমি যাইব।' কিন্তু পাষণ্ড বলিল 'তোমার সন্তান চুরি গিয়াছে আমি কোথায় পাইব'—আমি বলিলাম 'তুমি চুরি করিয়াছ'—সে উত্তর করিল, 'কে এখন বিশ্বাস করিবে যে, তোমার সন্তান তোমার অজ্ঞাতসারে আমি চুরি করিয়া তোমার

ভগিনীকে দিয়াছি? একথা শুনিলে তোমাকে বাতুল মনে করিবে; একথা আর মুখে আনিও না।' আমায় মাথার বজ্রাঘাত হইল। পাষণ্ড যাহা বলিল তাহা সঙ্গত বিবেচনা হইল, কিন্তু আমি অনেক কাঁদিয়া বলিলাম আমি তাহার বাটীতে বাস করিব—কেননা তাহা হইলে আমার পুত্রকে দিবারাত্র দেখিতে পাইব। কিন্তু পাষণ্ড কোন মতেই রাজি হইল না—এখন আমি কোথায় যাই, সুতরাং পিতামাতার সহিত কাশী যাওয়া স্থির করিলাম—রমাকান্ত আমার প্রাণের পুত্র চুরি করিয়া সোণামণি সমভিব্যাহারে সুবর্ণপুরে গেল। আমার শিশু সন্তানের পরিচর্য্যার্থে কমলমণিকে সঙ্গে লইয়া গেল। কাশী যাইবার কিছুদিন পুর্ব্বে এক দিবস এক জন পুলিশ কর্ম্মচারী আমার পিতার নিকট আসিয়া বলিল, একদল স্ত্রীলোককে ছেলেধরা সন্দেহ করিয়া পুলিশে ধৃত করিয়াছে এবং তাহাদিগের নিকট হইতে দুইটী শিশুসন্তান পাওয়া গিয়াছে—তন্মধ্যে একটি হাকিমের নিকট তাহাদিগের এজাহারে প্রকাশ হইল যে তোমার দৌহিত্র, তোমাকে গিয়া উহাকে চিহ্নিত করিয়া আনিতে হইবে। বৃদ্ধ পিতা আহ্লাদে তাহার সমভিব্যাহারে গিয়া সোণামণির শিশু ফিরিয়া আনিলেন। আমি আহ্লাদে গলিয়া গেলাম। আপনার শিশুর ন্যায় তাহাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এই সংবাদ রমাকান্তকে লিখিলাম, আরও লিখিলাম আমার শিশু আমাকে ফিরাইয়া দিবেন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া কাশী যাত্রা করিব। রমাকান্ত প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, 'তোমার শিশু ফিরিয়া পাইয়াছ শুনিয়া বড় সুখী হইলাম, তোমার পুত্র দীর্ঘায়ু হউক—কিন্তু পুত্র ফিরিয়া দিবার কথা কি লিখিয়াছ বুঝিতে পারিলাম না—তুমি কি পাগল হই-য়াছ?' আমি পত্রখানি অঞ্চলে বাঁধিলাম। চক্ষের জল চক্ষে মারিলাম, দুঃখের কথা আপনার হৃদয়ে গোপন করিলাম। সোণামণির শিশুসন্তান লইয়া কাশী যাত্রা করিলাম—সেখানে তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কমলমণি সোণামণিকে ত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিল, তাহার বুদ্ধির কিছু বিশৃঙ্খলা দেখিলাম। রমাকান্তের প্রতি তাহার বিশেষ রাগ, বোধ হয় যেন রমাকান্ত তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সে যাহা হউক কমলমণি শেষে উন্মত্ত হইল। সোণামণির পুত্র আমার নিকট থাকিয়া কৃতবিদ্য হইল। রমণপুরের শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে কাশীবাস করিতেন, তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যা প্রমদার সহিত সোণামণির পুত্র শরৎকুমারের বিবাহ দিলাম—"

এই সময়ে কুমুদিনী চমকিয়া উঠিলেন—এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "কি! আপ-নার প্রতিপালিত সোণামণির পুত্রের নাম শরৎকুমার?" পীড়িতা রমণী উত্তর করিল "হাঁ।" কুমুদিনী ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর?" "তার পর বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শরৎকুমার কৃতবিদ্য হইয়া কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টা

করিতে আসিতে ইচ্ছুক হইল। এই সময়ে তাহার শ্বশুর শ্রীনাথবাবু বাটী আসিতেছিলেন। শরৎকুমার তাঁহার সহিত আসিল। রমাকান্তের সহিত তাহার অথবা আমার যে কোন সম্পর্ক ছিল, তাহা শরৎকুমারকে কখন বলি নাই। কেননা রমাকান্তের নাম মুখে আনিতে আমার ঘৃণা হইত—শরৎ এদেশে আসিলে পর আমার পিতামাতার মৃত্যু হইল, এবং আমিও রোগগ্রস্ত হইলাম। এ সংবাদ রমাকান্ত জানিতে পারিল, এবং সকলের নিকট প্রকাশ করিল যে আমারও মৃত্যু হইয়াছে। আমি দিন দিন অতিশয় পীড়িত হইলাম এবং নিশ্চয় বিবেচনা হইল আর অধিক দিন বাঁচিব না। মনে মনে আপনার পুত্রকে দেখিতে বড় সাধ হইল। মরিতে মরিতে ঐ উন্মাদিনী সমভিব্যাহারে এ দেশে আসিলাম। শুনিলাম আমার ভগিনী ও রমাকান্তের মৃত্যু হইয়াছে। পুত্র রজনীকান্ত তাহাদের বিষয়াধিকারী হইয়াছে। এক দিবস উন্মাদিনী আমার রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল এবং কি বলিয়াছিল তাহা জানি না। রজনী তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছিল। রজনী তাহাকে চিনিত না—কিন্তু তাহার শত্রু রতিকান্ত চিনিত। তাহার সহিত কাশীতে এক দিবস সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুমুদিনী আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সব শুনিলে, এক্ষণে একবার রজনীকান্তকে এইখানে আনাও, আমি দেখে প্রাণত্যাগ করি।"

কুমুদিনী এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন। পরে পীড়িতা পুনঃ পুনঃ কাতরোক্তি করিতে লাগিল দেখিয়া, তিনি ধীরে উঠিলেন এবং প্রতিবাসী এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি রজনী বাবুকে একবার এইখানে শীঘ্র আসিতে বল।" তৎপরে পুনরায় কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে রমণী অচেতন। চেতন করিতে বহু যত্ন করিলেন কিন্তু সফল হইলেন না। রমণীর মৃত্যু হইয়াছে—কুমুদিনী তাঁহার শিয়রে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিতে লাগিল। রমণী তাহার কে ছিল? কেহ না—কিন্তু অনাথিনী বলিয়া পীড়িতা অবস্থায় তাহার শুশ্রূষা করাতে মায়া জন্মিয়াছিল। ইতিমধ্যে রজনীকান্ত সেই কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া কুমুদিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রজনী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মৃতব্যক্তি কে?" কুমুদিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "তোমার জননী।" বলিয়া মনে মনে অতিশয় ক্ষোভিত হইলেন, লজ্জায় অঞ্চল দিয়া মুখাবরণ করিলেন।

রজনী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি? তুমি কি আমায় চেন না? আমি রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র।"

কুমু। অন্তব্যক্তি তাঁহার পুত্র।

রজ। কে?

কুমু। শরৎকুমার।

রজ। যাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে?

এই কঠিন তিরস্কারে কুমুদিনী লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, অত্যন্ত ক্রোধে পুরুষমানুষের মত তীব্রদৃষ্টিতে রজনীর প্রতি চাহিলেন। আবার তখনই স্ত্রী-লোকের মত চক্ষু দুটিকে নত করিয়া, ক্রমে ক্রমে জলে পরিপূর্ণ করিয়া একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন। রজনী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "আমি তা বলি নাই। তবে কথাটা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। তুমি একথা কেন বলিতেছিলে?"

কু। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে?

এবার রজনীর দৃষ্টিতে তিরস্কার ব্যক্ত হইল। রজনী বলিলেন, "কবে তোমার কথায় অবিশ্বাস করিয়াছি? তোমার কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করি বলিয়াই তোমার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ নাই।

কুমুদিনী আবার লজ্জায় মুখ নত করিলেন। পরে বলিলেন, "বিশ্বাস কর না কর, আমার যা কর্ত্তব্য তা আমি করি। তুমি মনোযোগ দিয়া শোন।"

তখন সেই অন্ধকার নিশীথে, সেই বিজন কুটীর মধ্যে, সেই সত্তবিমুক্ত প্রাণ মনুষ্য দেহপার্শ্বে বসিয়া, সেই যুবতী, রজনীকান্তের কাছে বলিতে লাগিল। সেই ভীষণ সর্ব্বস্বান্তকর কথা, কুমুদিনী যেমন মৃতার নিকট শুনিয়াছিলেন, তেমনি বলিতে লাগিলেন; ক্ষুদ্র, নিস্তেজ দীপের ক্ষীণালোক কুটীরমধ্যে কাঁপিতেছিল,—মধ্যে মধ্যে কুটীর ভিত্তির উপর ভৌতিক ছায়া সকল প্রেতবৎ নাচিতেছিল—কুমুদিনীর অশ্রুসমুজ্জ্বল চক্ষে বিদ্যুৎ ঝলসাইতেছিল;—নিকটস্থ বৃক্ষশাখায় কদাচিত কোন অতি মৃদু, কি ভীষণ মৃদু রব হইতেছিল—দূরে কদাচিৎ কোন বিকট পশু রব করিতেছিল। সেই সময়ে, সেই আলোকে কুমুদিনী, ধীরে ধীরে, অস্ফুটস্বরে, গম্ভীরভাবে সেই সর্ব্বস্বান্তকারিণী কাহিনী রজনীকে শুনাইলেন। মেঘ বলিল, চাতক শুনিল,—যা শুনিল, তা—বজ্রাঘাত!

চতুর্থ বর্ষ ঃ দশম সংখ্যা

পালিভাষা ও তৎসমালোচনা

পালি অতি প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃত ইহার জননী সত্ত্বেও পালিব্যাকরণ-কর্ত্তা কচ্ছয়ণ* কহেন "এই ভাষা সকল ভাষার মূল, এই কল্পারম্ভে ব্রাহ্মণ ও অন্য বর্ণের ব্যক্তিগণের ইহা মাতৃভাষা ছিল, এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং এই ভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন, ইহাকে মাগধী ভাষা বলে, যথা—

সমাগধী মূল ভাষা
নরেয় আদি কপ্পিক
ব্রাহ্মণ সস্সুট্ঠল্লাপ
সম বুদ্ধচ্চাপি ভাষরে ॥

পুনশ্চ "পতি সম্বিধ অত্থুয়" নামক পালি গ্রন্থে লিখিত আছে "এই ভাষা দেবলোকে, নরলোকে, নরকে, প্রেতলোকে এবং পশুজাতির মধ্যে সর্ব্বস্থলেই প্রচলিত। কিরাত, অন্ধক, যোণক, দামিল প্রভৃতি ভাষা পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু মাগধী, আর্য্য ও ব্রাহ্মণগণের ভাষা এজন্য অপরিবর্ত্তনীয়—চিরকাল সমানরূপে ব্যবহৃত। বুদ্ধদেব স্বয়ং মাগধী ভাষা সুগম ভাবিয়া পিটক নিচয় এই ভাষায় সর্ব্ব সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।"

লিখিবার ও কথোপকথনের (গৃহধর্ম্মের) ভাষা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার, এবং এই দ্বিবিধ প্রকার ভাষা চিরকালই প্রসিদ্ধ। "নম্নেদিত বে নামা ভ্রংশিতটে" এই শ্রুতি-বাক্য আর "যএব শব্দা লোকে তএব বেদে," "লোকবেদয়োঃ সাধারণ্যাৎ" ইত্যাদি আর্ষ বাক্য এবং "যজ্ঞযজ্ঞীয়ং বাচং বদেৎ" এই বেদবাক্য এবং "ঘাত ঘামঞ্চ যন্তবেৎ" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অতি প্রাচীনকালেও দ্বিবিধ ভাষা প্রচলিত ছিল। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে লিখিত আছে, "ততো ভাষাশ্চ সসৃজে পঞ্চাশৎ ষট্চ সংখ্যয়া। তজ্‌জ্ঞানায়চ বালানাং তত্তদ্ব্যাকরণানিচ।" বিধাতা ৫৬টী ভাষার সৃষ্টি করিলেন এবং তত্তদ্ভাষার ব্যাকরণও করিলেন "এ কথা যতদূর সত্য হউক, তাহার অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত ভারতবর্ষে ১৮টী শাস্ত্রীয় ভাষা প্রচলিত। ইহা ভিন্ন ব্যবহারিক ভাষা নানা প্রকার আছে। ফল শাস্ত্রীয় ভাষা প্রধানতঃ

* কাত্যায়ন।

দ্বিবিধ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত। শিক্ষা গ্রন্থে ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন, "প্রাকৃতে সংস্কৃতে বাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বয়ম্ভুবা।" স্বয়ম্ভু স্বয়ং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শাস্ত্র বলিয়াছিলেন, এতাবতা শাস্ত্রীয় ভাষা দ্বিবিধ হইতেছে এবং তাহার প্রভেদ অষ্টাদশ প্রকার ; যথা—(১) সংস্কৃত (২) প্রাকৃত, এই প্রাকৃতের ভেদ উদাচী (৩) মহারাষ্ট্রী (৪) মাগধী (৫) মিশ্রার্দ্ধ মাগধী (৬) শকাভীরী (৭) শ্রবন্তী (৮) দ্রাবিড়ী (৯) ওড্রীয়া (১০) পাশ্চাত্যা (১১) প্রাচ্যা (১২) বাহ্লিকা (১৩) রন্তিকা (১৪) দাক্ষিণাত্যা (১৫) পৈশাচী (১৬) আবন্তী (১৭) শৌরসেনী (১৮) এতন্মধ্যে অষ্টম স্থানে শ্রবন্তী ভাষা আছে, উহাই পালি ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শাক্যসিংহ যে সময় শ্রবন্তীস্থ জেত বনে বাস করিয়া ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, সেই সময়েই ঐ বৌদ্ধ ভাষার সংস্কার হয় এবং সেই সংস্কার প্রাপ্ত ভাষা পালি নামে প্রখ্যাত হয়। কহ্লন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "বৌদ্ধ ভাষা মজানানো মাহেশ্বর তয়া নৃপঃ ;" এতদ্দারা তাঁহার বৌদ্ধ ভাষার ভিন্নতা দেখান প্রধান উদ্দেশ্য। হম্বীর টীকায় উক্ত হইয়াছে "সংস্কৃতা শিষ্ট ভাষা চ শ্রবন্তী বাক্ বিনায়কাঃ" অর্থাৎ শিষ্টদিগের ভাষা সংস্কৃত আর বিনায়কদিগের ভাষা শ্রবন্তী। বিনায়ক শব্দে বৌদ্ধ বুঝায়। এই ১৮ প্রকার ভাষার উদাহরণ "প্রাকৃতলঙ্কেশ্বরব্যাকরণে" আছে, ঐ সকল উদাহরণ পর্য্যালোচনা করিলে পালি ভাষার সহিত শ্রবন্তীভাষার সাম্য দৃষ্ট হইবে।

পালি শব্দের প্রকৃত অর্থ শ্রেণী, যথা—"মহাবংশ (মূল পালি) অস্ত পালি ব্যাধনম্ তদা অসি নিবেসিত" অর্থাৎ সেই সময় রাজার ব্যাধগণের নিমিত্ত এক শ্রেণী বাটী নির্ম্মিত হইল। আমাদিগের সংস্কৃত সূত্র ও তন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধদিগের শ্রেণীবদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় পালি নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল, এক্ষণে সাধারণতঃ সেই মাগধী ভাষায় রচিত গ্রন্থনিচয়ের ভাষানুসারে পালি একটি স্বতন্ত্র বৌদ্ধ ভাষা হইয়াছে। অধ্যাপক চাইল্‌ডার্শ অনুমান করেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থনিচয় খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণের ১০০ বা ২০০ বর্ষ পরে পালি গ্রন্থ নামে প্রচলিত হইয়াছিল, কারণ কেবল আধুনিক কতিপয় পালি গ্রন্থে পালি যে কেবল বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থকে বুঝায় তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যথা "সামান্যকালসূত্রঅত্থ কথা নেবা পালিয়ম্ ন অত্থ কথায়ম্ দীশতি" অর্থাৎ ইহা মূল বা অর্থ-কথায় অর্থাৎ টীকায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না ; যথা লঘু পদ্ম পুণ্ডরীক "পালিয়ম পান বুদ্ধতি কেন অত্থেন" অর্থাৎ তাঁহাকে মূল গ্রন্থে কি জন্য বুদ্ধ বলা যায় ? পুনশ্চ যথা মহাবংশ "পিটকত্ত্যয় পালিন স তস অত্থকথান" অর্থাৎ মূল ত্রিপেটক এবং তাহার অর্থ-কথা ইত্যাদি আধুনিক পালিগ্রন্থের ভূরি ভূরি উদাহরণ দ্বারা পালিমূল বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের একটী বিখ্যাত নাম তাহা সপ্রমাণ হইবেক। পালি ভাষায় মূল ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত বলিয়া পালি শব্দ মূল গ্রন্থকে বুঝাইত এবং ইহার টীকা অন্য ভাষায় রচিত,

তাহা উপরের লিখিত প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সাধারণতঃ পালি মগধ দেশীয় ভাষা, এই প্রাকৃত ভাষার নাম মাগধী, কিন্তু ইহা দৃশ্য-কাব্যের প্রাকৃত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে "পালি ভাষা" এই নামের পরিবর্ত্তে মাগধী ভাষা এই নামে পালি ভাষা বুঝাইত। পালি ভাষায় বুদ্ধদেব বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্ট জন্মের ৬০০শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা মগধ দেশের ভাষা ছিল, তখন ইহাকে মাগধী বলিত, পরে সিংহল দ্বীপে ইহা পালি নামে খ্যাত হইল। এক্ষণে পালি ভাষা কথোপকথনের এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের মূল প্রাকৃত ভাষাকে বুঝাইতেছে, এজন্য ইহাকে আর মাগধী ভাষা বলা যায় না, তাহা দৃশ্য-কাব্যের স্বতন্ত্র ভাষা। ভট্ট লাসেন কহেন পালির সহিত সৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রীর সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাহা হইলে ইহাকে মাগধী বলা যাইতে পারে না, এজন্য আমরা তাঁহার কথা অপ্রামাণ্য বোধ করিলাম। বররুচির প্রাকৃত প্রকাশের মহারাষ্ট্রী ও সৌরসেনীর সহিত পালি ভাষার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। বৌদ্ধগণের ৩টী প্রাকৃত ভাষা; যথা—প্রথম গাথা, দ্বিতীয় প্রস্তরের খোদিত কীর্ত্তিস্তম্ভের ভাষা, ও ৩য় পালি ভাষা। আমাদিগের মতে অশোকের লাটের ভাষার সহিত আধুনিক পালির সহিত অতি অল্প মাত্র ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ললিত বিস্তারের গাথা, নেপালীয় বৌদ্ধ ভাষা।

শাক্যসিংহ মাগধী অর্থাৎ পালিভাষায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ এই সকল উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া উহা প্রাকৃত ভাষায় প্রচার করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। পালি ভাষায় কর্কশ শব্দ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের বাক্য সুমধুর করিবার জন্য এই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ইহার সংস্কৃত ভাষার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইবেক, যথা—

সংস্কৃত	পালি
অভিধর্ম্ম	অভিধম্ম
অমৃত	অমত
অর্হত	অরহ
অর্থকথা	অত্থকথা
শ্রুতি	শুতি
মন্ত্র	মন্তো
মার্গ	মাগ্গো
ম্লেচ্ছ	মিলাক্খো
নির্ব্বাণ	নিব্বানম্

বর্ণ	বন্নো
যবন	যোন
পর্ব্বত	পব্বত
অশ্ব	অসো
রক্ত	রত্ত
বৃক্ষ	রুক্ষ
শিষ্য	শিষণ
সর্প	সপ্প
সিংহ	সিহো

মগধরাজ মহা মহেন্দ্র ৩০৭ খৃঃ পূঃ সিংহল দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই সময় তাঁহার দ্বারা পালিভাষা তথায় প্রচলিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৫০০ শতাব্দীতে বুদ্ধ ঘোষ মগধ দেশ হইতে সিংহল দ্বীপে গমন করিয়া তথায় পালি ভাষার বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পালিভাষায় রচনা করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কচ্ছয়ণকৃত পালি ব্যাকরণ অতি প্রসিদ্ধ। আমাদিগের পাণিনি ব্যাকরণের ন্যায় বৌদ্ধগণ এই গ্রন্থের মান্য করিয়া থাকেন। সিংহল দ্বীপের সকল বৌদ্ধমঠে উহা সাদরে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহা বৌদ্ধ স্থবিরগণ একাল পর্য্যন্ত বহু পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অনেকগুলি পালি ব্যাকরণ আছে, তাহার মধ্যে কচ্ছয়ণকৃত ব্যাকরণ প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট। অধ্যাপক এগ্‌লিং কহেন কচ্ছয়ণের পালি ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কাতন্ত্র রচিত হইয়াছে।

এই পালি ব্যাকরণ ৮ ভাগে বিভক্ত। এই ৮ ভাগ বিবিধ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন, যথা—

সিথান তিলোকমহিতম্ অভিবন্দি জগান
বুদ্ধন চ ধম্ম মমলানৃগণ মুও মঞ্চ
সথ্স তস বচনাত্থ বরান্ সুবোধন্
ব্যাখ্যামি সুত্থহিত মেথ্য সুসন্ধিকপান্
সোয়ান জিনিরিত নেয়েন বুদ্ধ লভন্তি
তঞ্চপি তসবচনাত্থ সুবোধনেন
অত্থ্যন চ অক্ষর পদেসু অমোহভাব
সিয়থিক পদ্দ মতো বিবেধন শৃন্তের

অর্থাৎ “আমি ত্রিলোক আরাধ্য বুদ্ধদেব, তথা নির্ম্মল ধর্ম্ম, ও স্থবির মণ্ডলীকে বন্দনা করিয়া সন্ধি কল্পের গভীরার্থ সূত্র অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

জ্ঞানিগণ বুদ্ধদেবের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া চির সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যাঁহারা এতাদৃশ যথার্থ সুখের আশা করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের নানা প্রকার বাক্য সংযোগ শ্রবণ করুন।"*

পালি ব্যাকরণের সূত্র, যথা—

১। অথ অক্ষর সন্যাত্তো।

২। অক্ষর পাত্তেয় একচত্তাল্লিশন্

৩। তত্থো উদাত্ত স্বর অথ।

৪। লহু মত্ত তয় রস্ব।

৫। অন্য দীঘ্ঘ।

৬। শেষ ব্যঞ্জন।

৭। বগ পঞ্চ পঞ্চাশ মন্ত।

এইরূপে কচ্ছয়ণ ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি কার্ত্তিক দ্বারা গ্রন্থ ব্যাখ্যা সুগম করিয়াছেন। ইহাতে কোন কোন স্থানে পাণিনি সূত্র অবিকল গৃহীত হইয়াছে, যথা পাণিনি "অপাদানে পঞ্চমী" তথা কচ্ছয়ণ "অপাদানে পঞ্চমী।" এই গ্রন্থে অনেক বৌদ্ধ তীর্থস্থানের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে যথা, শ্রবস্তী, পাটলী, বারানসী ইত্যাদি—

রূপসিদ্ধি এই ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ টীকাকার।

বালাবতার—এখানি সচরাচর প্রচলিত পালি ব্যাকরণ। ইহা কচ্ছয়ণের ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার, এবং এ পর্য্যন্ত সিংহলে এতদ্দেশীয় লঘু কৌমুদীর ন্যায় আদরণীয়। বালাবতার কচ্ছয়ণের ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন নিয়মানুসারে সংকলিত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে সন্ধি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাম, তৃতীয় অধ্যায়ে সমাস, চতুর্থ অধ্যায়ে তদ্ধিত, পঞ্চম অধ্যায়ে অখ্যাত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে কীটক ও উণাদি সূত্র, এবং সপ্তম অধ্যায়ে কারক ও বিভক্তি ভেদ। গ্রন্থারম্ভে গাথা যথা, "বুদ্ধনতি দভিবন্দিত বুদ্ধম্ ভুজবিলোচনন্ বালাবতারণ ভাষিবন্ বালানান্ বুদ্ধি বুদ্ধিয়," অর্থাৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় আনন্দবর্দ্ধক বুদ্ধদেবকে তিনটী প্রণাম করিয়া সুকুমার মতি বালকের জ্ঞানোন্নতি নিমিত্ত বালাবতার রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।†

দেবরক্ষিত নামক সিংহলীয় বৌদ্ধ পুরোহিত ইহার মূল মুদ্রিত করিয়াছেন।

রূপসিদ্ধি। এখানিও কচ্ছয়ণের পালি ব্যাকরণের সারসংগ্রহ, কিন্তু বালাবতারের ন্যায় প্রাঞ্জল ও শিক্ষোপযোগী নহে। যে সময় মহারাষ্ট্র প্রদেশে বৌদ্ধ

---

* এই স্থলে মর্ম্মানুবাদ মাত্র করা হইয়াছে।

† পালি ও গাথাসমূহ এই প্রস্তাবে অক্ষরার্থ অনুবাদ করি নাই, কেবল মর্ম্মানুবাদ করিয়াছি মাত্র।

ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় এই ব্যাকরণ রচিত হয়। গ্রন্থকার কচ্ছায়ণের একজন প্রাচীন সংকলন-কর্ত্তা, তিনি মূলগ্রন্থের বানানাদি হইতে বিস্তর উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—

কচ্ছয়ণন্ চ চরিয়ন্ নমিত্ব
নিশ্রেয় কচ্ছয়ণ বানানাদিন্
বালাপবোধাথ মুজন করিশন
ব্যাখ্যান স্থানন্দন পদরূপসিদ্ধি।

অর্থাৎ "আচার্য্য কচ্ছয়ণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃত বানানাদি পর্য্যালোচনা করতঃ বালকগণের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত, কয়েক কাণ্ডে বিভাগ করিয়া এই পদ রূপসিদ্ধি রচনা করিলাম।

গ্রন্থকার আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন যথা—'বিখ্যাত আনন্দ থেরাভ্-ভয় বর গুরু নাম, তম্ম পাণি ধজানন, শিষো দিপাঙ্করাখ্য দমিল বসুমতি, দিপালধ্যাপ্প কাশ, বালাদিচ্চদি বাসদিত্য মধিবসান, নসনান যোতি ও সোয়ম্ বুদ্ধ পিয়ভো যতি ইমামুজুকান রূপ সিদ্ধিন আকাশী।' অর্থাৎ এই নির্দ্দোষ রূপ সিদ্ধিগ্রন্থ বিখ্যাত আনন্দ শিষ্য তাম্রপনি (সিংহল) প্রদোষের ধ্বজ স্বরূপ ও দামিল দেশের (চোল) দ্বীপ স্বরূপ এবং "বুদ্ধপ্পিয়" (বুদ্ধপ্রিয়) খ্যাত দীপঙ্কর রচনা করেন। তিনি বালাচিদ্দ ও চূড়ামাণিক্য নামক মঠদ্বয়ের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিয়াছিল।

সিংহল দেশীয় প্রবাদ অনুসারে গ্রন্থকার সিংহল দ্বীপবাসী ছিলেন।

মহাবংশে উল্লেখ আছে মহারাজ পরাক্রমবাহু চোল দেশীয় (তাঞ্জোর) একজন স্থবিরের নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয় উক্ত নৃপতির সময় হইতে তাঞ্জোর দেশীয় জ্ঞানী ও নানা শাস্ত্রদর্শী বৌদ্ধগণ সিংহল দ্বীপে ঔপনিবেশ করিয়াছিলেন। রূপসিদ্ধি গ্রন্থকারের মুখবন্ধ শ্লোকানুসারে তাঁহাকে চোল দেশবাসী বোধ হইতেছে।

মৌগ্গল্যায়ণ ব্যাকরণ। এখানি বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরু মৌদগল্যায়ণ প্রণীত। বিনয়াথসমুচ্চয়, পঞ্চীকাপদীপ গ্রন্থে এবং বিখ্যাত আচার্য্য মেধাঙ্করের গ্রন্থে এই গ্রন্থকারের বিশেষ গুণকীর্ত্তিত হইয়াছে। মৌগ্গল্যায়ণ ১১৫৩ হইতে ১১৮৬ খৃঃ অব্দ মধ্যে পরাক্রমবাহুর রাজ্যকালে অনুরাধা পুরের থুপারাম মঠের পুরোহিত ছিলেন। এখানি কচ্ছয়ণকৃত ব্যাকরণ ও সদানীতি হইতে বিভিন্ন প্রকার রীতিতে রচিত। সমুদায় ব্যাকরণ ষষ্ঠ ভাগে বিভক্ত যথা—প্রথম সন্ধি, দ্বিতীয় সিআদি, তৃতীয় সমাস, চতুর্থ নাদি, পঞ্চম খাদি, এবং ষষ্ঠ ত্যাদি। গ্রন্থের প্রারম্ভ বাক্য যথা—

সিদ্ধ সিদ্ধ গুণম সাধু নমাসিত্ত তথাগতম
সধর্ম্ম সঙ্ঘম ভাবিযন্ মগধশব্দ লক্ষণম।

অর্থাৎ প্রথমে বিনীতভাবে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, এবং সঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া, আমি মাগধী ভাষার ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করিতেছি।

গ্রন্থের সমাপ্তি শ্লোক যথা—

তস্ত ভূতি সমাসেন বিপুলাথ পকাশিনী
রচিত পুন তেনেব সগাহ্ন যোত কারিন।

এই কয়েকখানি সচরাচর প্রচলিত ব্যাকরণ ভিন্ন পালিভাষার দীপানি, কচ্ছয়ণ ভেদ টীকা, মহাশব্দনীতি, প্যায়োগসিদ্ধি, গরল দেনীসন্থ, পঞ্চিকা পদীপ, অক্ষত পদ প্রভৃতি ব্যাকরণ আছে।

বুত্তোদয়—এখানি প্রসিদ্ধ পালিচ্ছন্দ গ্রন্থ। ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। এবং পিঙ্গল, বৃত্তরত্নাকর প্রভৃতি প্রামাণিক সংস্কৃত ছন্দ গ্রন্থের আদর্শে লিখিত। গ্রন্থকার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

নামথ্ জন শান্তন তমশান্তন ভেদিনো
ধম্মুজালস্ত রুচিন মুনিন্দোদাতরচিনো
পিঙ্গলাচার্য্য দিহি স্বন্দানম দিতমপুরা
সুদ্ধ মাগধী কানন তন ন সাধিত যথিচ্ছিতম।
ততো মগধ ভাষের সতাবয় বিভেদনন
লক্ষ লক্ষণ সম্যুত্তন পশানথ পদাকমম্
ইদম বুত্তোদয়ন নামা লোকীয়চ্ছন্দ নিশ্চিতম্
অব ভিত্তমহন দানি তেশম সুখ বিবুদ্ধিয়।

অর্থাৎ "মুনীন্দ্রকে নমস্কার, যিনি চন্দ্রের ন্যায় কিরণে ধর্ম্মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করেন, এবং যিনি মানবজাতির মনের তিমির নাশ করেন। পিঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের রচিত ছন্দ গ্রন্থ দ্বারা বিশুদ্ধ মাগধী ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করা যায় না, এজন্য অতি সুগম মাগধী ভাষায় এই বুত্তোদয় রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।" ইহাতে উত্তমরূপ মাত্রা ও বর্ণের প্রভেদ দেখাইয়া, প্রচলিত ছন্দ সমূহের রচনার রীতি উদাহরণ সহকারে প্রদর্শিত হইল। এই গ্রন্থ ৬ অংশে বিভক্ত। গ্রন্থকারের নাম সঙ্গ রক্ষিত।

ধাতু মঞ্জুষা—এখানি শিলাবংশ নামক বৌদ্ধ স্থবির কৃত। পালি ভাষার ধাতু পাঠ। ইহা কচ্ছয়ণের ব্যাকরণ সম্মত গ্রন্থ, এজন্য ইহার অপর নাম কচ্ছয়ণ ধাতু মুঞ্জষা। গ্রন্থের প্রারম্ভ শ্লোক যথা—

নিরুক্তি নিকর পার পারাবারঙ্গগান্ মুনিন্
বন্দিত ধাতু মঞ্জুষান্ ক্রমি পবচনান্ষশান্
সুগত গম মগম তন তন ব্যাকরণানিচ
ইত্যাদি—

অর্থাৎ শব্দ-সমুদ্র পার হইয়াছেন, এতাদৃশ বুদ্ধদেবকে বন্দনা করিয়া সদ্ধর্ম্মের মার্গ স্বরূপ এই ধাতুমঞ্জুষা রচনা করিলাম; বৌদ্ধধর্ম্ম, বিবিধ ব্যাকরণ উত্তমরূপ আলোচনা করিয়া এই ধাতু পাঠ সঙ্কলন করিলাম।

গ্রন্থকার এইরূপ আপনার পরিচয় দিয়াছেন যথা—

"রচিত ধাতুমঞ্জুষা শিলা বংশেন ধীমতা
সধম্ম পঙ্কেরুহ রাজহংস
অসিখ ধামাৎ থিটি শিলাবংশ
যক্কাদিলে নাম্য নিবাস বাসী
যতীশ্বরে সো জমিদান্ আকাশী—"

অর্থাৎ এই ধাতুমঞ্জুষা প্রথম পাঠার্থিগণের শিক্ষার জন্য পণ্ডিতবর শিলাবংশ রচিত। এই শিলাবংশ একজন যক্ক্যাদি লেন মন্দিরের পুরোহিতও তথায় অবস্থিতি করেন; তাঁহার বাসনা বৌদ্ধধর্ম্ম বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া রাজহংসের ন্যায় ধর্ম্ম গ্রন্থরূপ পদ্মবনে বিরাজ করুক।

ধাতুমঞ্জুষা ডন এনড্রিশ সিলভিয়া বাতু বান্ত দেব নামক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত ইহা সিংহল ও ইংরাজী ভাষার অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অভিধান পদীপি—একখানি সংস্কৃত অমরকোষের ন্যায় প্রসিদ্ধ পালি অভিধান। ইহা অমরকোষের প্রণালীতে আদ্যোপান্ত রচিত।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ যথা—

তথাগতো করুণাকরো করো
প্যায়ত্তো মোসঞ্জ সুখাপ পদান্ পদান্
অক পযাথান কলিসম্ ভাব ভাব
নমামি তান্ কেবল দুঃখ করণ্ করণ্

অর্থাৎ আমি দয়ার সিন্ধু তথাগতকে বন্দনা করি, যিনি নির্ব্বাণ আপনার আয়ত্তাধীন বিবেচনা করিয়াও অন্যের সুখবর্দ্ধন করত স্বয়ং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের অপার কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বৃত্তান্ত যথা—

সগ্গ কাণ্ডোচ ভূকাণ্ডো
তথা সামান্ন কাণ্ডকান্

কাণ্ডাট্টত্তান বিত এস
অভিধান পদীপিকা
তিদীব মাহিয়ান ভূজগ বশাখি
সকলাথ সমাভায় দিপা নিয়ান
ইহও কুশল মতীম সনারো
পাতু হোতি মহা মুহা মুনিন বচন

অর্থাৎ এই অভিধান পদী পিকা ত্রিকাণ্ড বিভক্ত যথা স্বর্গ, পৃথিবী ও সামান্য কাণ্ড। ইহাতে স্বর্গ, পৃথিবী এবং নাগদেশের সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে মহামুনির সকল বাক্য অবগত হইবেন। এই গ্রন্থ লঙ্কাধিপতি পরাক্রমবাহুর রাজ্যকালে মোগ্গল্ল্যায়ণ কর্ত্তৃক রচিত। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খৃঃ অঃ রাজ্যারম্ভ করেন। উপরের লিখিত প্রবন্ধে পালিভাষা সম্বন্ধীয় ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, ছন্দোগ্রন্থ, এবং অভিধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইল, এক্ষণে পালিভাষায় অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে সারোদ্ধৃত হইল। আমরা পালি ভাষায় সুপণ্ডিত নহি এজন্য সুবিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ এই প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা বা বর্ণান্তর্গত বা অনুবাদ ঘটিত দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

মহাবংশ—ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় নৃপতি বা কোন মহাত্মার জীবনী কিম্বা কোন দেশের ইতিহাস সঙ্কলনের পদ্ধতি ছিল না, কেবল পুরাণ ও বৃহৎ কথার ন্যায় অলীক গল্প পরিপূর্ণ গ্রন্থে আমাদিগের যাহা কিছু পুরাবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্র সত্য আবিষ্কার করা দূরপরাহত। আমাদিগের সংস্কৃতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত মধ্যে কেবল একমাত্র রাজতরঙ্গিণী প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু তাহাও আধুনিক। রাজতরঙ্গিণী ১১৪০ খৃঃ অঃ সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু পালিভাষায় রচিত সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থনিচয় তাহা অপেক্ষা অতি প্রাচীন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিংহল দেশীয় পালি বৌদ্ধ ইতিহাস সমূহ প্রকৃত পুরাবৃত্তের প্রণালীতে সঙ্কলিত, তাহা হইতে আমরা সিংহল দ্বীপের অনেক বৌদ্ধ ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রাচীন বিবরণ জানিতে পারিতেছি। পালি বৌদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে মহাবংশ অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন। মহাবংশ নামে পালিভাষার দুইখানি পুরাবৃত্ত প্রচলিত, কিন্তু দুইখানি গ্রন্থের বিবরণে পরস্পর অনৈক্য নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থখানি অনুরাধাপুরের উত্তর বিহারের কোন স্থবিরকর্ত্তৃক রচিত, কিন্তু কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার কোন বিবরণ অবগত হইতে পারা যায় না। সিংহলেশ্বর ধাতুসেন এই গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ করিতেন; তিনি ৪৫৯-৪৭৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট

প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রাচীন মহাবংশ গ্রন্থখানি ইহার পুর্ব্বের রচিত। এই গ্রন্থে মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত (৩০২ খৃঃ অঃ) বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ খানি প্রথম গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ। ইহাতেও মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মহানামকৃত। গ্রন্থমধ্যে ৫৪৩ খৃঃ পূঃ হইতে সিংহল দ্বীপের প্রাচীন ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। মহাবংশ এক প্রকার বৌদ্ধদিগের পুরাণ বলিলেও হয়, এজন্য তাহাতে আমাদিগের পুরাণের ন্যায় অনেক অলৌকিক বিবরণ আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে ঐতিহাসিক বিবরণ সমূহ সুপ্রণালী সহকারে বিবিধ প্রাচীন সিংহলদেশীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমাদিগের সংস্কৃত পুরাণের ন্যায় এ গ্রন্থখানি কেবল "কাহিনী" নহে। মহাবংশে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয় নাই। মহানামকৃত মহাবংশ ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে সঙ্কলিত। ইহা একশত অধ্যায়ে বিভক্ত এবং আদ্যোপান্ত পালি কবিতায় গ্রন্থিত। গ্রন্থকার ইহা টীকাসহ রচনা করিয়াছেন।

মহাবংশের আর এক অংশ আছে, তাহার নাম সুলুবংশ। এই অংশে পরাক্রমবাহুর (১২৬৬ খৃঃ অব্দে) রাজ্যশাসন পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কীর্ত্তি শ্রীমহারাজের অনুজ্ঞানুসারে ও তিবত্তবয় দ্বারা রচিত।

জর্জ্জ টরনার মহোদয় দ্বারা মহাবংশ অনুবাদ সহ ৩৭ অধ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

দ্বীপবংশ—মহাবংশের ন্যায় এখানিও সিংহলদেশীয় প্রসিদ্ধ পালি ইতিবৃত্ত। মেং টরনার সাহেব অনুমান করেন এই গ্রন্থ উত্তর বিহারের বৌদ্ধ স্থবিরগণের মহাবংশ গ্রন্থ। দ্বীপবংশ সুপ্রণালী অনুসারে রচিত নহে, এজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন এই গ্রন্থ এক সময়ে এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

পালি ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে অতাঙ্গলু বংশ, দাতা বংশ, ব্রহ্মজালসুত্ত, জাতক (পঞ্চ) ক্ষুদ্দক পাঠ, সুত্ত নিপাত, মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্ত, ধর্ম্মপদ, প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ এবং সিংহল দেশে প্রচলিত।

পালিভাষা এক্ষণে সিংহল দ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। এই ভাষার অনেক গ্রন্থ চাইল্ডার্শ, ফস্‌বুল, ক্লফ, ও কুমারস্বামীর যত্নে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীরামদাস সেন।

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪৯

বিশেষ যত্নের সহ, নিষ্পড়িলে অহরহ,
বালুকায় তৈল পেতে পার।
পান করি মৃগতৃষ্ণা, সলিল পানের তৃষ্ণা,
বুঝি কভু হইবে সংহার॥
কদাচিৎ পর্য্যটন, করিয়া মানবগণ,
শশশৃঙ্গ পাইতেও পারে।
কিন্তু ভাই নিরন্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,
কিছু ফল নাই এ সংসারে॥

৫০

মকরের ভয়মুক্ত, দন্ত থেকে করি মুক্ত,
সন্ত মণি উদ্ধারিয়া লও।
তরঙ্গেতে অনিবার, তরলিত পারাবার,
সন্তরিয়া পার হবে হও॥
রোষযুক্ত বিষধর, ফণা ঘোর ভয়ঙ্কর,
ধর গিয়া কুসুম আকারে।
কিন্তু ভাই নিরন্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,
কোন ফল নাই এ সংসারে॥

৫১

যদবধি ভব, ছিলহে শৈশব,
তদবধি ক্রীড়াসক্ত।
যৌবন রসাল, ছিল যতকাল,
তরুণীতে অনুরক্ত॥

এলো বৃদ্ধকাল, সহ চিন্তাজাল,
সতত রহিলে মগ্ন।
পরম ঈশ্বরে, আপন অন্তরে,
কভু না করিলে লগ্ন॥

৫২

দিবস যামিনী আর প্রদোষ প্রভাত।
শিশির বসন্ত সদা করে গতায়াত॥
কালক্রীড়া রত, গত হইতেছে আয়ু।
তথাপিও না পরিত্যাগ করে আশা-বায়ু।

৫৩

শরীর গলিত, কেশ হইল পলিত।
মুখ থেকে দন্তগুলি হইল স্খলিত॥
করেতে ধরিয়া দণ্ড কাঁপিতেছে কায়।
তথাপি ভণ্ড আশা না ছাড়ে আমায়॥

৫৪

যদবধি ধন, কর উপার্জ্জন,
নিজ পরিজন করয়ে স্নেহ।
যখন জরায়, জর্জ্জর করায়,
তখন ধরায় নাহিক কেহ॥

৫৫

অষ্ট কুলাচল আর সাতটী সাগর।
রুদ্র দিনকর আর ব্রহ্মা পুরন্দর॥

আমি তুমি, তারা কেহই না রবে।
কেন বল মিছামিছি শোক কর তবে॥

৫৬

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিহার
কেবল সক্ষম কর আত্ম আপনার॥
আত্মজ্ঞানহীন যেই, সেইজন মূঢ়।
তাহারেই পচাইবে নরক নিগূঢ়॥

৫৭

দেবতামন্দির কিম্বা তরুমূলে বাস।
ভূমিতল শয্যা, আর মৃগচর্ম্ম বাস॥
সকল প্রকার কর্ম্মভোগ পরিহার।
বৈরাগ্য সুখদ বল না হয় কাহার॥

৫৮

অনর্থের মূল বিত্ত, মনেতে ধেয়াও নিত্য,
নাহিক তাহাতে সুখলেশ।
ধনভাগে পুত্রগণ, নানা দ্রোহে পরায়ণ,
নীতি শাস্ত্র বর্ণিত বিশেষ॥

৫৯

কে তব ললনা, কে পুত্র বল না।
কি আশ্চর্য্য এসংসারে।
তুমি কার ছেলে, কোথা থেকে এলে,
মনে ভাব ভাই আরে॥

ধন জন কি যৌবন, মদে মত্ত হয়ে মন,
কর না কর না অহঙ্কার।
এসব বিভবজাল, দেখিতে দেখিতে কাল,
নিমেষেতে করয়ে সংহার॥
মায়াময় এসংসার, ওরে মন অনিবার,
ভাবনা করিয়া এই সার।
ব্রহ্মপদে আশু মজ, ভজ ভক্তিভাবে ভজ,
তোরে বল কি বলিব আর।

৬১

কমলের দলে জল, সদা করে টলটল,
তার চেয়ে জীবন তরল।
ব্যাধি ঘোর বিষধর, গ্রাসে গ্রস্ত যত নর,
শোকানলে প্রতপ্ত সকল॥

৬২

তত্ত্ব চিন্তা কর ভাই অবিরত চিত্তে।
পরিহার কর চিন্তা বিনশ্বর বিত্তে॥
ক্ষণেক সজ্জন সঙ্গ কর যত্ন করি।
সেই মাত্র ভবসিন্ধু তরিবার তরী॥

৬৩

মদে অন্ধবুদ্ধি করি, কর্ণ অবঘাত করি,
তাড়াইয়া দেয় মধুকরে।
তারি গণ্ড শোভা হত, ভৃঙ্গ গিয়ে মনোমত,
বিকচ কমল বনে চরে॥

৬৪

মৃণাল কমল দল যাহার আহার।
মত্ত মাতঙ্গিনী সহ যে করে বিহার॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রময়ে যেই কন্দর নিকরে।
যাহার পানীয় পয় পর্ব্বত নির্ঝরে॥
সেই বন্য করী নিপতিত নর করে।
তৃণরাশি চিবাইয়া দেহ রক্ষা করে॥

৬৫

গ্রহ-পীড়া প্রাপ্ত নিশাকর দিনকর।
অবরুদ্ধ বিষধর আর করিবর॥
মতিমানে ধনহীন করি বিলোকন।
বিধাতাই বলবান্ জানিনু এখন॥

৬৬

আকাশ একান্তে চরে, বিহঙ্গম পরিকরে,
তারাও আপদ ছাড়া নয়।
সাগরেতে মীনচয়, অগাধ সলিলে রয়,
চতুর চাতরে নষ্ট হয়॥

কি লাভ উত্তম স্থানে, কিবা কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
বিধি-বিধি কে করে লঙ্ঘন।
বিপদ প্রসব করে, বসি কাল দুরান্তরে,
সকলেরে করে আকর্ষণ॥

৬৭

সিংহ নখে বিদারিত, করিকুম্ভ বিগলিত,
রুধিরাক্ত চারু মুক্তা ফলে।
বনে ভিল্লী দেখি ধায়, বদরী ভাবিয়া তায়,
উঠাইয়ে নিল করতলে॥
দেখি তায় শুভ্রতর, সুকঠিন কলেবর,
দূরে ফেলি করিল গমন।
কুস্থানে পড়িলে পর, মনস্বী মনুষ্যবর,
এইরূপ দশা প্রাপ্ত হন॥

৬৮

হে অশোক তরুবর, কিবা কার্য্য নম্রতর
শাখা আর উন্নত মস্তক।
কিকাজ কোমল দল, লীলারসে চলচল,
কমনীয় কুসুম স্তবক॥
যেহেতু তোমার তলে, নিষণ্ণ পথিকদলে,
খিন্ন হবে করি কত স্তব।
মৃদু মধুযুক্ত ফল, না পাইয়ে সুবিকল,
অন্তরেতে প্রাপ্ত পরিভব॥

৬৯

সারহীন হে শিমুল, অতি দূরে তব মূল,
কণ্টকে আবৃত পুন কায়।
ছায়াশূন্য তব দল, যে আছে তোমার ফল
বানরেও নাহি খায় তায়॥
কুসুমেতে নাহি গন্ধ, নাহি মাত্র মকরন্দ,
কোন গুণ নাহিক তোমার।
থাক,থাক, আমি যাই, কিছুমাত্র ফল নাই,
তবাশ্রয়ে থাকাতে আমার॥

৭০

পদ্মবন মনে ভাবি ধায় হংসদল।
সুরভির লালসায় ভ্রমর চঞ্চল॥
স্বাদু ফল ভাবি ব্যস্ত পথিক সকল।
মাংস ভাবি গিধিনী শকুনী সুবিকল॥
দূরে থেকে দেখি সমুন্নত পুষ্পচয়।
সারহীন মিথ্যা সে উন্নতি সুনিশ্চয়॥
ওরে রে শিমুল গাছ বল কি কারণ।
চিরকাল জগতেরে করিছ বঞ্চন॥

৭১

শুকপক্ষীর উক্তি।

কাঞ্চন পিঞ্জরে, থাকি নিরন্তরে,
নৃপতির করে, মার্জিত কোমল কায়।
খাই সুরসাল, দাড়িম্ব পসাল,
পান করি ভাল, পয়ঃসুধা পিপাসায়॥
সমাজেতে হায়, পড়ি অবিশ্রাম,
রাম রাম নাম, তবু কেন হায় হায়।
কানন ভিতরে, কোন তরুপরে,
জনমকোটরে, সদা মম মন ধায়॥

৭২

মিত্রে কর বশীভূত বিমল ব্যাভারে।
রিপুজয় কর যুক্তি বল সহকারে॥
লোভিজন ধনদানে, কার্য্যেতে ঈশ্বরে।
যুবতীরে প্রেমে, দ্বিজগণে সমাদরে॥
সমভাবে বশ কর কুটুম্বনিকরে।
রাগী প্রতি স্তুতি আর ভক্তি গুরুবরে॥
মূর্খে নানা কথা কয়ে, রসিকেরে রস।
শীলতা গুণেতে কর সকলেরে বশ॥

৭৩

নৃপতির নীতি আর গুণীর বিনতি।
যুবতীর লজ্জা, দম্পতির স্থির রতি॥
গৃহের শোভন শিশু, বুদ্ধির কবিতা।
তনুর লাবণ্য, মতি স্মৃতি সমন্বিতা॥
দ্বিজের প্রশান্তি ক্ষমা ক্রোধাসক্ত জনে।
সতের সুস্থতা, গৃহাশ্রম শোভা ধনে॥

৭৪

ছিন্ন হইলেও তরু উঠে পুনরায়।
ক্ষয় পেয়ে পূর্ণ হয় শশাঙ্কের কায়॥
এইরূপ চিন্তা করি সদাশয়গণ।
বিষম বিপদে তপ্ত কদাচ না হন॥

৭৫

কমল আকরে, কমলনিকরে,
দিনকর ফুল্লকরে।
কিবা চক্রবাল, কুমুদিনী জাল,
বিকাশে বিধুর করে॥
প্রার্থনা বিহনে, জলধরগণে,
করয়ে সলিল দান।
বিনা আবাহন, পরার্থে সুজন,
করেন হিত বিধান॥

৭৬

ফলভরে নত হয় বিটপী নিকর।
নবজলে ভূমে নামি পড়ে জলধর॥
অনুদ্ধত সুজনের যদি হয় ধন।
স্বভাবত পরহিতে করেন যোজন॥

৭৭

কৃপণতা হরে যশ, ক্রোধে গুণচয়।
ক্ষুধায় মর্য্যাদা, দম্ভে সত্যনাশ হয়॥
বিপদে স্থৈর্য্যের নাশ, ব্যসনেতে ধন।
বৈধক্রিয়া পরিহারে বিনষ্ট ব্রাহ্মণ॥

৭৮

ক্রূরতায় কুলনাশ, মদেতে বিনয়।
অসাধ্য চেষ্টায় হয় পুরুষার্থ ক্ষয়॥
দরিদ্র দশায় সমাদর পরিগত।
মমতায় আত্মার প্রভাব হয় হত॥

৭৯

বল বল কারে বল, নারীর যৌবন বল
তোষামোদ পর প্রত্যাশীর।
প্রতাপ নৃপতিগণে, সত্য বল সাধুজনে,
সুসঞ্চয় সামান্য ধনীর॥
ঠকেদের বাক্‌ছল, পণ্ডিতের বিদ্যা বল,
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যতি-বল।
কুলের একতা বল, যথা ব্যয়ে বিত্ত ফল,
শান্ত-বল বিবেক কেবল॥

৮০

দলাদলী প্রিয়, হয়ে বিদ্যাবান্ জ্ঞানী!
ধনহীন গৃহী, আর পরাধীন মানী॥
পরবশ সুখী, তথা সধন কৃপণ।
বৃদ্ধ হয়ে নাহি করে তীর্থ পর্য্যটন॥
নৃপতি কুমন্ত্রীবশ, মূর্খ সুকুলীন।
পুরুষ হইয়ে হয় নারীর অধীন॥
সৎক্রিয়া বিহীন ব্রহ্মজ্ঞানী পদ পেয়ে।
কিবা আর হাস্যাস্পদ ইহাদের চেয়ে॥

৮১

উৎপাটিতে যিনি পুন করেন রোপণ।
প্রফুল্ল হইলে পুষ্প করেন চয়ন॥
সুতরুণ তরুগণে পোষেন যতনে!
প্রোন্নতকে নত উন্নয়ন নতগণে॥
ছাড়াইয়া দেন যথা জড়াজড়ি হয়।
বাহির করেন ঘোর কণ্টকী নিচয়॥
যেখানে দেখেন তরু হইতেছে ম্লান।
সেইখানে জলসেচ করেন প্রদান॥
প্রয়োগ নিপুণ হেন মালীর সমান।
সর্ব্বদা থাকুন সুখে রাজা কীর্ত্তিমান্॥

৮২

কুসুম স্তবকাকার, দ্বিপ্রকার ব্যবহার,
প্রাপ্ত হন জ্ঞানবান মনুষ্য নিকরে।
সর্ব্বলোক শিরোপরে, অপরূপ শোভাধরে,
অথবা বিশীর্ণ হন কানন ভিতরে॥

৮৩

অনল শীতল হয়, সলিল সম্পাতে।
ছত্রে ভানুকর, করী অঙ্কুশ আঘাতে॥

গো গর্দ্দভ বশীভূত লাঠির প্রহারে।
ভেষজেতে ব্যাধি, মন্ত্রে গরল নিবারে॥
সর্ব্বত্র ঔষধ শাস্ত্রে সুবিহিত আছে।
সকল ঔষধ ব্যর্থ মূর্খদের কাছে॥

৮৪

সজ্জন-সঙ্গমে বাঞ্ছা, পরগুণে প্রীতি।
পত্নী প্রতি রতি, আর অপযশে ভীতি॥
গুরুজন প্রতি যথা নম্র আচরণ।
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, বিদ্যায় ব্যসন॥
ইন্দ্রিয় দমনে শক্তি, সেই শক্তি সার।
সেই মুক্তি কপট সংসর্গ পরিহার॥
যাঁহাদের আছে হেন চারু গুণগ্রাম।
তাঁহাদের পদে মম সহস্র প্রণাম॥

৮৫

রাজা ধর্ম্মহীন, শুচিবিহীন ব্রাহ্মণ।
সত্যহীন দারা, জ্ঞানহীন যোগিগণ॥
গতিহীন অশ্ব, জ্যোতি বিহীন ভূষণ।
ব্রতহীন তপ, বীরহীন যোদ্ধাগণ॥
ছন্দোহীন গান, স্নেহহীন সহোদর।
ঈশহীন নরে, ত্যজে শীঘ্র সুধিবর॥

৮৬

ক্ষীণ ফল তরু ত্যজে বিহঙ্গনিকর।
সারস ত্যজিয়া যায় শুষ্ক সরোবর॥
পর্য্যুষিত পুষ্প ত্যাগ করে মধুকর।
কুরঙ্গ ছাড়িয়া যায় দগ্ধ বনান্তর॥
বারবধূ ত্যজে নর হইলে নির্ধন।
শ্রীভ্রষ্ট ভূপালে পরিহরে মন্ত্রিগণ॥
ফলত সংসারে কেহ কারু বশ নয়।
কার্য্যবশে সকলেই রমণীয় হয়॥

৮৭

দীনজনে দান নাই তবে কিবা ধন।
সেকি সেবা পরহিতে অভাব যতন॥
কি কাজ বিবাহে যদি না হেরে নন্দনে।
বনিতা বিরহ যদি কি কাজ যৌবনে॥

৮৮

নিত্য ধনাগম আর নিত্য অরোগিতা।
প্রিয়তমা প্রিয়ম্বদা সদা পরিণীতা॥
বশীভূত পুত্র, বিদ্যা অর্থকরী হয়।
এই ছয় গৃহস্থের সুখের নিলয়॥

৮৯

সুত বলি তারে, যে জন পিতারে,
সুখ দেয় সুচরিতে।
সেই ত কামিনী, যে দিবা যামিনী,
চিন্তয়ে পতির হিতে॥
মিত্র সেই হয়, সম ভাবে রয়,
সুসময় অসময়।
বহু পুণ্যফলে, এ জগতী তলে,
এই তিন লাভ হয়॥

৯০

ভোগেতে রোগের ভয়, কুলে ভয় ক্ষয়।
মানে দৈন্য ভয়, আর বলে রিপু ভয়॥
যদি কিছু ধন থাকে সদা ভয় ভূপে।
নিরন্তর ভয় আছে তরুণীর রূপে॥
শাস্ত্রে বাদীভয়, গুণে খলজনে ভয়।
শরীরের ভয় সদা যম মহাশয়॥
এসংসারে কিছুমাত্র ভয়শূন্য নয়।—
কেবল বৈরাগ্যে দেখি নাহি কিছু ভয়।—

৯১

শশাঙ্কে কলঙ্ক রেখা, কণ্টক মৃণালে।
যুবতী যৌবন ক্ষয়, সিতি কেশজালে॥
জলধির জল লোণা, পণ্ডিত নির্ধন।
হা নির্ব্বোধ বিধি! ধনলোভী বৃদ্ধগণ॥

৯২

দিবসেতে সুধাকর, ধূসর বরণ ধর,
বিগলিত যৌবন ললনা।
কমলকুসুমবর, বিহীন কমলাকর,
মুখে পদ্ম নিন্দার কলনা॥

প্রভুধন পরায়ণ, দীন দশা সর্ব্বক্ষণ,
প্রাপ্ত হন যতেক স্বজন।
নৃপতির সন্নিধান, দুরন্ত খলের মান,
এই সাত মনের বেদন ॥

৯৩

দীন যেইজন, শতে আকুঞ্চন,
শতীর হাজারে মন।
হাজারীর লক্ষ্য, হয় এক লক্ষ,
লক্ষেশের রাজ্য পণ ॥
রাজা যেই হয়, তৃষা কৃষা নয়,
সম্রাট্ হইতে চায়।
সম্রাট্ যেজন, চিন্তে অনুক্ষণ,
ইন্দ্রপদ কিসে পায় ॥
সহস্র লোচন, ভাবে মনে মন,
ব্রহ্মত্ব মিলে আমারে।
বিধি গৌরীশ্বর, হরি পদ হর,
কে গিয়াছে আশাপারে ॥

৯৪

পাপ কর্ম্মে রত দেখি করে নিবারণ।
হিতকর কার্য্যে সদা করে নিয়োজন ॥
অতিশয় গুপ্তগুণ করয়ে প্রচার।
আপদে কদাচ নাহি করে পরিহার ॥
সময় পড়িলে করে সাহায্য প্রদান।
সুমিত্র লক্ষণ এই কয় মতিমান্ ॥

৯৫

শুভাশুভ কর্ম্ম ফল কালেতে উদয়।
শরদেই আশু ধান্য, বসন্তে না হয় ॥

৯৬

নীচের সংসর্গে ধনী প্রভা হয় দূর।
তম্ন দহে লশুনাক্ত মাখিলে কর্পূর ॥

৯৭

স্বজাতি-সহায়ে সিদ্ধ কর্ম্ম সুদুষ্কর।
জল দিয়ে কর্ণজল বহিষ্কৃত কর ॥

৯৮

উপভোগে ভোগীদের ভোগেচ্ছা না যায়।
যত লুণ খাও তত তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় ॥

৯৯

স্বভাব-সুন্দরে কিবা কার্য্য সংশোধনে।
মুক্তারে না যুড়ে কেহ শাণের ঘর্ষণে ॥

১০০

ভুবন রঞ্জনকারী শীলতা যাঁহার।
অঙ্গেতে প্রদীপ্ত আছে নিকটে তাঁহার ॥
বহ্নি হয় জল, জলনিধি হয় কূপ।
মৃগপতি মৃগ, মেরু শিলার স্বরূপ ॥
ভুজঙ্গ হইতে হয় পুষ্পমালা সৃষ্টি।
বিষরস হইতে অমৃত হয় বৃষ্টি ॥

১০১

বিদ্যা বিভূষিত খলে পরিহার কর।
মণিমস্ত ভুজঙ্গ কি নহে ভয়ঙ্কর ॥

১০২

খল ক্রূর বটে, আর ক্রূর বিষধর।
কিন্তু খল সর্প চেয়ে হয় ক্রূরতর ॥
মন্ত্র আর ওষধিতে সর্প বশ হয়।
কোনরূপে ক্রূর খল নিবারিত নয় ॥

১০৩

অতি দূর পথশ্রমে হইতে শীতল।
তরুর ছায়াতে বসে পথিক সকল ॥
প্রস্থান করয়ে পুন হইলে শীতল।
কে কাহার ব্যথায় ব্যথিত ভবে বল ॥

ইতি প্রথম অঞ্জলি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আরবীয়

আসিয়া খণ্ডে আরব সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইলে পর, উক্ত জাতি বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ সহকারে গণিতবিদ্যা, বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দ শেষে খালিফা আল্‌মানসুর এবং খালিফা হারুন্‌আল্‌ রাসিদের রাজত্ব সময়ে আরব দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনার সূত্রপাত হয়। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দারম্ভে আল্‌মামুনের অধিকার কালে আরবেরা সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ইবু জৌনিস লিখিয়াছেন যে আল্‌মামুনের রাজত্ব কালে আরব জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অপমণ্ডল তির্য্যগ্‌ভাবে নিরক্ষবৃত্ত ছেদ করিয়া যে সূক্ষ্ম কোণ উৎপন্ন করে তাহা ২৩° ৩৩′, অথবা ২৩° ৩৩′ ৫২″ পরিমিত এবং যাম্যোত্তর বৃত্তের একাংশ পরিমিত গোলীভুজ ৫৬ বা ৫৬⅔ মাইল (৫ অথবা ৬ যবে এক ইঞ্চি, ২৭ ইঞ্চি = ১ হাত, ৪০০০ হস্ত = ১ মাইল) নিরুপণ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় দশম এবং একাদশ শতাব্দে আরব দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

আরব জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে আল বাটেগ্‌নিয়স অথবা আল বাটনী (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দ) সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। আল বাটনী সূর্য্যের দূর-বিন্দুর গতি আবিষ্কার করেন, সৌর কেন্দ্র-বিভিন্নতার ভ্রম সংশোধন করেন, অপমণ্ডল নিরক্ষবৃত্ত ছেদ করিয়া যে কোণ উৎপাদন করে তাহা ২৩°৩৫′ পরিমিত এবং বিষুবৎ ৬৬ বৎসরে একাংশ মাত্র পুরোগমন করে, নিরূপণ করেন। আল-ফ্রেগেন্স বা আলফারগানী (খৃঃ দশম শতাব্দে) একখানি জ্যোতিষিক গ্রন্থ রচনা করেন। থাবেট বিন্‌ কোরা (খৃঃ দশম শতাব্দে) অপমণ্ডলের স্বস্থান পরিবর্ত্তন বিষয়ক মতের পুনরুদ্ভাবন করেন।

ইবন্ জুনিস্ (খৃঃ দশম শতাব্দে) একখানি জ্যোতির্ব্বিবরণ রচনা করেন, এবং কোন স্থির জ্যোতিষ্কের উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা গ্রহণারম্ভ ও মোক্ষকালের নির্ণয় করেন।

স্পেনীয় মুর আর সেচেল, খ্রীষ্টীয় ১০৮০ অব্দে টলেমি প্রণীত তালিকা অবলম্বন করিয়া এক জ্যোতিষিক তালিকা প্রস্তুত করেন।

আর সেচেলের সমসাময়িক আলহাজেন কিরণরশ্মির বক্রীভবন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন।

আবুল হাসেন খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দারম্ভে সিজর জ্যোতিষ্কগণের এক তালিকা প্রস্তুত করেন।

গ্রীকেরা যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতেন, যথা—শঙ্কু, বৃত্তপাদ, গোল ইত্যাদি, আরবেরাও সেই সমস্ত ব্যবহার করিতেন। অধিকন্তু আরবেরা (বোধ হয় ইবন জুনিস) কোন নক্ষত্র অথবা গ্রহের উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সময় নিরূপণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন।

পারসিক

আরব খালিফাদিগের ন্যায় তাতার সম্রাটেরাও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের সম্যগালোচনা করিয়াছিলেন। জেঙ্গিস খাঁর পৌত্র হুলাকু খাঁ পারস্য দেশে একটী পর্য্যবেক্ষণিকা সংস্থাপন করেন, এবং তাঁহার রাজসিংহাসন আরোহণ কালাবধি যাবতীয় জ্যোতিষিক যন্ত্র নির্ম্মিত ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় সংগ্রহ করেন। হুলাকুর রাজত্ব সময়ে প্রায় ১২৭১ খৃঃ অব্দেঃ,—নাসীর উদ্দীন জ্যোতিষিক তালিকা প্রস্তুত করেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে জর্জ ক্রীসোকাস নামক গ্রীক্ চিকিৎসক খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দে প্রণীত কতকগুলি পারস্য জ্যোতিষিক তালিকা অনুবাদ করেন। চিওনিয়াডেস এই সকল তালিকা পারস্য রাজ্য হইতে ইউরোপখণ্ডে আনয়ন করেন।

তৈমুরলঙ্গ বংশীয়েরাও জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করিয়াছিলেন। তৈমুর সাহের পৌত্র উলুগবেগ আপন রাজধানী সমরকন্দ নগরে পর্য্যবেক্ষণিকা সংস্থাপন করেন; এবং গণিতবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণের সাহায্যে ১৪৪৭ খৃঃ অব্দে (হিজরি ৮৪১ শকে) স্থির জ্যোতিষিকদিগের এক তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকার কিয়দংশ মাত্র ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

গ্রীক

ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে গ্রীকেরাই প্রথম জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনুশীলন করেন। গ্রীক্‌ভাষায় প্রথম জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রণেতা অটোলাইকস সচল-গোলক

এবং জ্যোতিষ্কগণের উদয়াস্ত সম্বন্ধীয় দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অটোলাইকস্ খ্রীষ্টাব্দের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

আরিস্তারকস্, শেমস দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং প্রায় ২৮০ বৎসর খৃঃ পূঃ সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি সূর্য্য ও চন্দ্রের আয়তন এবং দূরতা পরিমাণ করিবার প্রথম উদ্যম করিয়াছিলেন। আরিস্তারকস্ খৃঃ পূঃ ৪২০ অব্দে জীবিত ছিলেন।

খৃঃ পূঃ ২৭৬ অব্দে সাইরিণী নগরে ইরাটস্থেনিসের জন্ম হয়। ইরাটস্থেনিস আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীর আয়তন নিরূপণে উদ্যুক্ত হন। প্রবাদ আছে যে তিনি অপমণ্ডল নিরক্ষবৃত্ত ছেদ করিয়া যে কোণ উৎপাদন করে তাহা ২৩°৫′২০″ পরিমিত নির্ণয় করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ১৯৪ অব্দে ইরাটস্থেনিসের মৃত্যু হয়।

সিসিলি দ্বীপে সাইরাকিউস নগরে আর্কিমিডিসের জন্ম হয়। আর্কিমিডিস অয়নবিন্দুদ্বয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যের ব্যাস পরিমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ২১২ খৃঃ পূঃ রোমান সেনাপতি মার্সেলসের জনৈক সৈনিক কর্ত্তৃক আর্কিমিডিস নিহত হন।

আর্কিমিডিসের মৃত্যুর পর হিপার্কস খৃঃ পূঃ ২০০-১২৫ জ্যোতির্ব্বিদ্যার সমধিক আলোচনা করেন। হিপার্কস বিথিনিয়ার অন্তর্গত নাইসি নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিপার্কস বিষুববিন্দুদ্বয়ের পুরোগমন আবিষ্কার করেন, এবং স্থান-সন্নিবেশ নিরূপণার্থ প্রথমতঃ সরল উত্থান এবং ক্রান্তি এবং তৎপরে অক্ষ এবং দ্রাঘিমা ব্যবহার করেন। তিনি সূর্য্য এবং ইহার দূরবিন্দুর গড়-গতি নিরূপণ করিয়াছিলেন। হিপার্কস গ্রহণ গণনা করিতে পারিতেন এবং সূর্য্য বৃত্তকার পথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে—এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। হিপার্কস কর্ত্তৃক সৌরবৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিবস, ৫ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ১২ সেকেণ্ড নির্ণীত হইয়াছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব তারকা দর্শন করিয়া তিনি নক্ষত্রগণের সংখ্যানির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তদভিপ্রায়ে ১০৮১ নক্ষত্রের অক্ষ এবং দ্রাঘিমা নির্ণয় করেন।

মিশরীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা সোসিজেনিস্ খৃঃ পূঃ ৫০ অব্দে রোমাধিপতি জুলিয়স্ সিজরকে পঞ্জিকা-গত ভ্রম সংশোধনে সাহায্য করেন।

লুসিয়স্ মানলিয়স্ সিনেকা স্পেন দেশে কর্দোবা নগরে খৃঃ পূঃ ৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সিনেকা একখানি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান রচনা করেন; এবং ধূমকেতুগণের নৈসর্গিকভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে একপ্রকার গ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৬৫ অব্দে সিনেকার মৃত্যু হয়।

ক্লডিয়স টলেমি খৃঃ প্রথম শতাব্দে মিসর দেশে পিলুসিয়স্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গণিত সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। খলিফা হারুন আল-রসিদের রাজত্ব সময়ে এই গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। আরবেরা ইহাকে "আল মেজেষ্ট" কহে। এই গ্রন্থে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক যে সমস্ত মত উল্লিখিত হইয়াছে তৎসমুদায় যে টলেমি কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত এমত নহে। টলেমি যে মতের পোষকতা করেন তাহার মর্ম্ম এই। পৃথিবী অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বের কেন্দ্রীভূত, এবং গ্রহগণ বৃত্তাকার পথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে। এই মত প্রমাদপূর্ণ হইলেও কোপর্ণিকসের সময় পর্য্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। টলেমি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

টলেমি চন্দ্রোন্নতি এবং আলোকরশ্মির বক্রীভবন আবিষ্কার করেন, ও আকাশকক্ষার নিকটবর্ত্তী সূর্য্য অথবা চন্দ্রমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত দৃশ্যমান বৃহদাকারের কারণ নির্দ্দেশ করেন। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে গ্রহগণ এক এক অতি বৃহৎ স্বচ্ছ গোলাকার বস্তু, এবং তন্মধ্যে এক এক তারকা সন্নিবেশিত আছে। এই মতের সমর্থন জন্যই নিচোচ্চ-বৃত্ত* প্রভৃতি যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। টলেমি সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ ব্যতীত ভূগোল, সঙ্গীত এবং ফলিত জ্যোতিষেরও আলোচনা করিয়াছিলেন।

টলেমি প্রণীত "আলমাজেষ্ট" নামক জ্যোতিষিক গ্রন্থ খৃঃ ১২৩০ অব্দে দ্বিতীয় ফ্রেড্রিকের রাজত্ব সময়ে গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ৬৪০ অব্দে আরবজাতি দ্বারা আলিক্জাণ্ড্রিয়া নগরী ধ্বংস হওয়াতে গ্রীক জাতির জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনা এক প্রকার শেষ হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ আধুনিক ইউরোপ সম্বন্ধীয়। লেখক এতদংশ সুপাঠ্য করিতে পারেন নাই—এজন্য তাহা আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। বং সঃ।

---

* সিদ্ধান্ত শিরোমণি ৫ম অধ্যায় ৪১ শ্লোক

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তুমি, বসন্তের কোকিল! প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে, সময় বুঝিয়া ডাকিবে। সময়ে, অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে। দেখ আমি, বহু সন্ধানে, লেখনী মসীপাত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইয়া, আরও অধিক অনুসন্ধানের পর মনের সাক্ষাৎ পাইয়া, "কৃষ্ণকান্তের উইল" ফাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম —এমত সময়ে তুমি আকাশ হইতে ডাকিলে, "কুহু! কুহু! কুহু!" তুমি সুকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই। যাই হউক, আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এসব স্থানে তোমার ডাকাডাকিতে বড় আসিয়া যায় না। কিন্তু দেখ, যখন নব্যবাবু টাকার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া জমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন, তখন তুমি হয় ত আপিসের ভগ্নপ্রাচীরের কাছে হইতে ডাকিলে, "কুহুঃ"—বাবুর আর জমাখরচ মিলিল না। যখন বিরহসন্তপ্তা সুন্দরী, প্রায় সমস্তদিনের পর অর্থাৎ বেলা নয়টার সময় দুটি ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন, কেবল ক্ষীরের বাটীটী কোলে টানিয়া লইয়াছেন মাত্র, অমনি তুমি ডাকিলে—"কুহুঃ"—সুন্দরীর ক্ষীরের বাটী অমনি রহিল—হয় ত, তাহাতে অন্য মনে লুণ মাখিয়া খাইলেন। যাই হউক, তোমার কুহুরবে কিছু যাদু আছে—নহিলে, যখন তুমি বকুলগাছে বসিয়া ডাকিতেছিলে—আর বিধবা রোহিণী কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল —তখন—কিন্তু আগে জল আনিতে যাওয়ার পরিচয়টা দিই।

তা, কথাটা এই। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ দুঃখী লোক—দাসী চাকরাণীর বড় ধার ধারে না। সেটা সুবিধা কি কুবিধা তা বলিতে পারি না—সুবিধা হউক, কুবিধা হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সম্বাদ, কোন্দল, এবং ময়লা, এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরাণী নামে দেবতা, এই চারিটির সৃষ্টিকর্ত্তা। বিশেষ যাহার অনেক গুলি চাকরাণী, তাঁহার বাড়ীতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—

নিত্য রাবণ বধ। কোন চাকরাণী ভীমরূপিণী, সর্ব্বদাই সম্মার্জ্জনী গদা হস্তে গৃহ রণক্ষেত্রে ফিরিতেছেন—কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণকে ভর্ৎসনা করিতেছেন; কেহ কুম্ভকর্ণ রূপিণী, ছয় মাস করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, নিদ্রান্তে সর্ব্বস্ব খাইতেছেন—কেহ সুগ্রীব, গ্রীবা হেলাইয়া কুম্ভকর্ণের বধের উদ্যোগ করিতেছেন। ইত্যাদি।

ব্রহ্মানন্দের সে সকল আপদ বালাই ছিল না—সুতরাং জল আনা বাসন মাজাটা, রোহিণীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল। বৈকালে, অন্যান্য কাজ শেষ হইলে, রোহিণী জল আনিতে যাইত। যেদিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার পরদিন নিয়মিত সময়ে, রোহিণী কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল। বাবুদের একটা বড় পুকুর আছে—নাম বারুণী—জল তার বড় মিঠা—রোহিণী সেইখানে জল আনিতে যাইত। আজিও যাইতেছিল। রোহিণী একা জল আনিতে যায়—দল বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি, চাল চলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুবিনির্ম্মিতা কাল ভুজঙ্গিনী তুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে; চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ, ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত, মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল, হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিণী সুন্দরী, সরোবর পথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল—এমত সময়ে, নিম্বের ডালে বসিয়া, বসন্তের কোকিল ডাকিল।

কুহুঃ কুহুঃ কুহু! রোহিণী চারিদিক চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীর সেই ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোলকটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই—ক্ষুদ্র পাখিজাতি—তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু পাখীর অদৃষ্টে তাহা ছিল না—কার্য্যকারণের অনন্ত শ্রেণী পরম্পরায় একটি গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই—অথবা পাখীর তত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ছিল না। মূর্খ পাখী আবার ডাকিল—"কুহু! কুহু! কুহু!"

"দূর হ! কালামুখো!" বলিয়া রোহিণী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু কোকিলকে ভুলিল না। আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে কোকিল অসময়ে

ডাকিয়াছিল। গরীব বিধবা যুবতী একা জল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকাটা ভাল হয় নাই। কেন না, কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলা বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইয়া জীবনসর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কে যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

আবার কুহুঃ, কুহুঃ, কুহুঃ! রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌরব, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিশ্রিত, শীতলসুগন্ধ পরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুণগুণে, শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল, সরোবরতীরে, গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ,—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহু রবের সঙ্গে সুর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড় কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ দাম, চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পক রাজি নির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে,—কি সুর মিলিল! এও সেই কুহু রবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল "কু উঃ" তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া, কাঁদিতে বসিল।

কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয় ঐ দুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বারুণী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম—আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ—নীল কাঁচের আয়না

মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারি পাশে বাবুদের বাগান—উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জ াকাল। লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানা বর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা ফলের পাথর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলা এক এক খানা বড় বড় হীরার মত অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপর আকাশ—সেও সেই বাগান ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম আর ঘাসের ফ্রেম, ফুল ফল গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের আয়নায় প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিলটা ডাকিতেছিল। এ সকল এক রকম বুঝান যায়, কিন্তু সেই আকাশ, আর সেই পুকুর, আর সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোহিণীর মনের কি সম্বন্ধ, সেইটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে এই বারুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।

আমিও গোলে পড়িলাম, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল। গোবিন্দলালও সেই কুসুমিতা লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন, যে রোহিণী আসিয়া ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। গোবিন্দলাল বাবু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, এ, পাড়ায় কোন মেয়ে ছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে। আমরা গোবিন্দলালের সিদ্ধান্তে তত ভরাভর করি না। রোহিণী কাঁদিতে লাগিল।

রোহিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ভাবিতেছিল, যে কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না? কোন্ দোষে আমাকে এরূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী—মনে কর ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূর হৌক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?

তা আমরা ত বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভাল নয়। দেখ, এটুকুতে কত হিংসা! রোহিণী লোভী, রোহিণী চোর, তা বলিয়াছি—হরলালের টাকা লইয়া উইল চুরি করিল। রোহিণী ব্যাপিকা, তাও বলিয়াছি, হরলালের সঙ্গে অতি ইতরের ন্যায় কথা বার্ত্তা কহিয়াছিল। রোহিণীর অনেক দোষ—তার কান্না দেখে

কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ, কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।

তা, তোমরা রোহিণীর জন্য একবার আহা বল। দেখ, এখনও রোহিণী, ঘাটে বসিয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে—শূন্য কলসী জলের উপর বাতাসে নাচিতেছে।

শেষে সূর্য্য অস্ত গেলেন; ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল—শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল। গোরু সকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল—অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন—যাইবার সময়ে দেখিতে পাইলেন যে তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া আছে।

এখন, রোহিণী বড় ব্যাপিকা বলিয়া বিখ্যাত। খ্যাতিটা অযোগ্য নহে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। ব্যাপিকা হইলেই আর এক অখ্যাতি, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া যোটে। রোহিণীর সে গুরুতর অখ্যাতিও ছিল। সুতরাং কোন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত না। গোবিন্দলাল কুষ্ঠগ্রস্তবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া, তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ—অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না?

গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলি অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া, তাহার পার্শ্বে চম্পক নির্ম্মিত মূর্ত্তিবৎ সেই চম্পকালোক চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইলেন। রোহিণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণি! তুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিতেছ কেন?

রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন, "তোমার কিসের দুঃখ, আমায় কি বলিবে না? যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি।"

যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে অতি ঘৃণাযোগ্য ব্যাপিকার ন্যায় অনর্গল কথোপকথন করিয়াছিল—কত হাসিয়াছিল, কত ঠাট্টা করিয়াছিল, কত জঘন্য শ্লোক আবৃত্ত করিয়াছিল—গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিছু বলিল না—গঠিত পুত্তলীর মত সেই সরোবরসোপানের শোভা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবর জলে ভাস্করকীর্ত্তি কল্প-মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর! সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন। রোহিণীকে আবার বলিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক কালি হউক, আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পার, তবে আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোক দিগের দ্বারায় জানাইও।"

রোহিণী এবার কথা কহিল, বলিল, "একদিন বলিব। আজ নহে। একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।"

কি কথা রোহিণী? উইল চুরি করিয়া যে গোবিন্দলালের সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তাহার সঙ্গে আবার তোমার কি কথা?

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া গৃহাভিমুখে গেলেন। রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া কলসী ধরিয়া, তাহাতে জল পূরিল—কলসি তখন বক্—বক্—গল্—গল্—করিয়া বিস্তর আপত্তি করিল। আমি জানি, শূন্য কলসীতে জল পূরিতে গেলে কলসী, কি মৃৎকলসী কি মনুষ্য কলসী, এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকে—বড় গণ্ডগোল করে। পরে অন্তঃশূন্য কলসী পূর্ণতোয় হইলে, রোহিণী ঘাটে উঠিয়া, আর্দ্র বস্ত্রে দেহ সুচারুরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া, ধীরে ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল। তখন চলৎ ছলৎ ঠনাক্! ঝিনিক্ ঠিনিকি ঠিন্! বলিয়া, কলসীতে আর কলসীর জলেতে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন হইতে লাগিল। আর রোহিণীর মনও সেই কথোপকথনে আসিয়া যোগ দিল—

রোহিণীর মন বলিল—উইল চুরি করা কাজটা!

জল বলিল—ছলাৎ!

রোহিণীর মন—কাজটা ভাল হয় নাই।

বালা বলিল ঠিন্ ঠিনা—না! তাত না—

রোহিণীর মন—এখন উপায়?

কলসী—ঠনক্ ঢনক্ ঢণ্—উপায় আমি,—দড়ি সহযোগে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোহিণী সকাল সকাল পাককার্য্য সমাধা করিয়া, ব্রহ্মানন্দকে ভোজন করাইয়া, আপনি অনাহারে শয়নগৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রার জন্য নহে—চিন্তার জন্য।

তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতামত ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া, আমার কাছে একটা মোটা কথা শুন। সুমতি নামে দেবকন্যা, এবং কুমতি নামে রাক্ষসী, এই দুই জন সর্ব্বদা মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এবং সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। যেমন দুইটা ব্যাঘ্রী, মৃত গাভী লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করে, যেমন দুই শৃগালী মৃত নরদেহ লইয়া বিবাদ করে, ইহারা জীবন্ত মনুষ্য লইয়া সেইরূপ করে। আজি, এই বিজন শয়নাগারে, রোহিণীকে লইয়া সেই দুইজনে সেইরূপ ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল।

সুমতি বলিতেছিল,—"এমন লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতে আছে?"

কুমতি। হাজার টাকা দেয় কে? টাকায় কত উপকার!

সু। তা, গোবিন্দলালের কাছেও টাকা পাওয়া যায়। তার কাছে ঐ হাজার টাকা লইয়া কেন উইল ফিরাইয়া দাও না?

(N.B.—এই কথাটা সুমতি বলিয়াছিল কি কুমতি বলিয়াছিল, তাহা লেখক ঠিক বলিতে পারেন না।)

কু। টাকা চায় কে? আর গোবিন্দলাল উইল বদল হইয়াছে জানিতে পারিলে, টাকাই বা দিবে কেন? উইল যে বদল হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেই তাহার কার্য্যোদ্ধার হইবে। তখনই সে কৃষ্ণকান্তকে বলিবে, মহাশয়ের উইল বদল হইয়াছে—নূতন উইল করুন। সে টাকা দিবে কেন?

সু। ভাল, টাকাই কি এত পরমপদার্থ? কি হইবে টাকায়? তোমার এত দিন হাজার টাকা ছিল না, তাতেই বা কি ক্ষতি হইয়াছিল—হাজার টাকা কতদিন যাইবে? হরলালের টাকা হরলালকে ফিরাইয়া দাও। আর কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

কু। বাঃ! যখন কৃষ্ণকান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, "এ উইল তুমি কোথায় পাইলে, আর আমার দেরাজে আর একখানা জাল উইল বা কোথা হইতে আসিল," তখন আমি কি বলিব? কি মজার কথা! কাকাতে আমাতে দুজনে থানায় যেতে বল না কি?

সু। তবে সকল কথা কেন গোবিন্দলালের কাছে খুলিয়া বলিয়া, তাহার পায়ে কাঁদিয়া পড় না? সে দয়ালু অবশ্য তোমাকে রক্ষা করিবে।

কু। সেই কথা, কিন্তু গোবিন্দলালকে অবশ্য এ সকল কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে জানাইতে হইবে, নইলে উইলের বদল ভাঙ্গিবে না। কৃষ্ণকান্ত যদি থানায় দেয়, তবে গোবিন্দলাল রাখিবে কি প্রকারে ? বরং আর এক পরামর্শ আছে। এখন চুপ করিয়া থাক—আগে কৃষ্ণকান্ত মরুক, তারপর তোমার পরামর্শ মতে গোবিন্দলালের কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া পড়িব। তখন তাঁহাকে উইল দিব।

সু। তখন বৃথা হইবে—যে উইল কৃষ্ণকান্তের ঘরে পাওয়া যাইবে, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। গোবিন্দলাল সে উইল বাহির করিলে, জালের অপবাদগ্রস্ত হইতে পারে।

কু। তবে চুপ করিয়া থাক—যা হইয়াছে তা হইয়াছে।

সুতরাং সুমতি চুপ করিল—তাহার পরাজয় হইল। তারপরে দুইজনে সন্ধি করিয়া, সখ্যভাবে, আর এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সেই বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রালোক প্রতিভাসিত, চম্পকদামবিনির্ম্মিত দেব মূর্ত্তি আনিয়া, রোহিণীর মানসচক্ষের অগ্রে ধরিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল—দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, কাঁদিল। রোহিণী সে রাত্রে ঘুমাইল না।
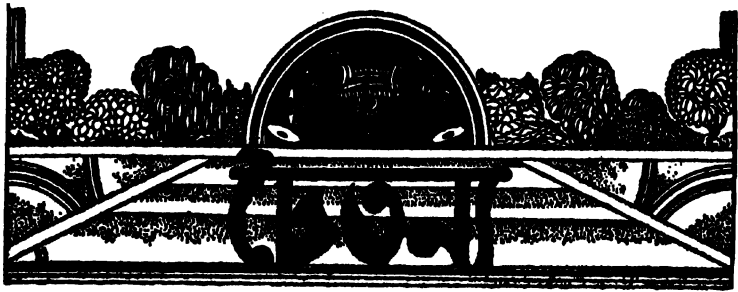
দ্বিতীয় বিবাহ

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূ-বিয়োগবিধুরা জননীকে নানারূপ সান্ত্বনা করিয়া চৈতন্য যথাবিহিত পত্নীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি চৈতন্যের জীবনচরিত লেখকগণ কেহ একথার উল্লেখ করেন না। কারণ (কুশ হস্তে করা অথবা পিণ্ডদান করা বৈষ্ণবদিগের যারপরনাই মতবিরুদ্ধ। অদ্যাবধি অস্মদ্দেশীয় অনেক বৈষ্ণব নিতান্ত সমাজের অনুরোধে আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াও পারতপক্ষে আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণাদি রক্ষা করিতে যায় না।) তথাপি চৈতন্য বণিতার যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদি করিয়াছিলেন ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ ;*

(১) তৎকাল পর্য্যন্ত চৈতন্য কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করেন নাই। এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি যাজ্ঞিক ক্রিয়ায় † যারপরনাই পক্ষপাতী ছিলেন। বোধ হয় বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ আপনাদিগের ভবিষ্যৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধাচরণ এতাবৎ ভ্রমেও মনে করেন নাই। একাদশ ভাগবতের মতে ‡ বৈষ্ণব তিন ভাগে বিভক্ত—উত্তম মধ্যম ও অধম। উত্তম অর্থাৎ নিরাশ্রম সন্ন্যাসী বৈষ্ণব, মধ্যম অর্থাৎ গৃহী সাধু বৈষ্ণব, অধম অর্থাৎ প্রকৃত সংসারী, কপটাচারী—বিষ্ণুভক্ত। রামানুজ স্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও নিরাশ্রম বৈষ্ণব ও গৃহী এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ এতাবৎ গৃহী বৈষ্ণবই ছিলেন।

---

* এই সকল প্রমাণ চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবত হইতে সংগৃহীত।

† ছাত্রগণের মধ্যে যদি কেহ কোন দিন সন্ধ্যাদি না করিয়া চতুষ্পাঠীতে গমন করিত, তাহাকে চৈতন্য যারপরনাই তিরস্কার করিতেন, এবং তৎক্ষণাৎ বাটী যাইয়া নিত্যকর্ম্ম করিতে আদেশ করিতেন।

‡ উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ (যোগতত্ত্ব)।

(২) চৈতন্যের মাতা তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষে ষষ্ঠী পূজাদি সমুদায় করিয়াছিলেন, এবং চৈতন্যও যথা বিহিত বিবাহ করিয়াছিলেন।

(৩) চৈতন্য পত্নীর শ্রাদ্ধ না করিলে, অবশ্যই সমাজচ্যুত হইতেন, সুতরাং দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিতেন না।

পত্নীর শ্রাদ্ধাদি সমাপ্ত হইলে, চৈতন্য প্রতিদিন মুকুন্দ সঞ্জয়ের মণ্ডপে শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এদিকে শচী পুত্রের বিবাহের জন্য যারপর নাই ব্যস্ত হইয়া কন্যা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; একদা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীসনাতন রাজ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশধর ব্রাহ্মণের কুমারী কন্যা লক্ষ্মীদেবীর রূপ লাবণ্য ও বালিকোচিত অবলতা দেখিয়া যারপর নাই মুগ্ধ হইলেন, এবং গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কাশীনাথ মিশ্র নামক জ্ঞাতিকে আহ্বান কবিয়া সনাতন রাজের নিকট সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। চৈতন্যের ১ম পত্নীবিয়োগ হওয়া অবধি, সনাতন চৈতন্যকেই তদীয় কন্যা সমর্পণ করিতে মানস করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিনা যত্নে রত্ন লাভ হইবে জানিতে পারিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। মহা সমারোহে চৈতন্য ও সনাতনরাজের কন্যা লক্ষ্মীর বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইল। এই ক্রিয়া যথাশাস্ত্র নির্ব্বাহ হইয়াছিল।"*

চৈতন্যের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পত্নীর নামই লক্ষ্মী। চৈতন্য ভাগবতে ও চৈতন্য চরিতামৃতে উভয় গ্রন্থেই ইহা স্পষ্টতঃ লিখিত আছে। তথাপি লোকে তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর নাম কিজন্য বিষ্ণুপ্রিয়া † বলিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার বিবিধ উত্তর হইতে পারে।

(১) ১ম হইতে দ্বিতীয় পত্নীর পার্থক্য রাখার জন্য বৈষ্ণবগণ প্রথম পত্নীকে আর্য্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার নাম পরিবর্ত্ত না করিয়া দ্বিতীয়ার নাম পরিবর্ত্ত করিয়াছেন। চৈতন্য বিষ্ণুর অবতার সুতরাং বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার পত্নীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া রাখা অসম্ভব নয় বোধ হয়।

(২) কথিত আছে সনাতন রাজ "বিষ্ণু-প্রীতিকামে" কন্যাদান করিয়াছিলেন। ইহাকেই বৈষ্ণবগণ নিষ্কাম দান বলিয়া থাকেন। চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ সমধিক কর্ম্মকাণ্ড প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল সুতরাং, হয়ত, তাৎকালিক কোন লোকই স্বর্গ কামনা প্রভৃতি কামনাবিরহিত হইয়া কন্যাদান

---

* চৈতন্য ভাগবত দেখ।

† যুবতী ভার্য্যা রাখিয়া পুত্র পরলোকগত হইলে জনক-জননী "বিষ্ণুপ্রিয়া রহিল ঘরে" এই বলিয়া খেদ উক্তি করেন। এরূপ উক্তি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত।

করিতেন না। পক্ষান্তরে সনাতন স্বীয় কন্যা লক্ষ্মীকে বিষ্ণু-প্রীতিকামে দান করিলেন, এইজন্য লক্ষ্মীর নামান্তর বিষ্ণুপ্রিয়া * হইল।

সে যাহাই হউক চৈতন্যের দ্বিতীয় ভার্য্যার প্রকৃত নাম লক্ষ্মী, কিন্তু বঙ্গদেশের সকলেই তাঁহাকে বিষ্ণুপ্রিয়া বলিয়া থাকেন। আমরাও তাঁহাকে বিষ্ণুপ্রিয়াই বলিব।

চৈতন্য এতাবৎ সংসার ত্যাগের অণুমাত্র চিন্তা করিয়াছিলেন না। হায়! ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনুষ্য কি অন্ধ। চৈতন্য যদি একদিন ভ্রমেও মনে করিতেন যে চারিবৎসর পরেই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিবেন তাহা হইলে কি তিনি একজন অবলাকে অনাথা করিতেন।

চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া কয়েক দিবস মাত্র গৃহে অবস্থান করিলেন। এবং মাতৃ অনুমতি গ্রহণ করিয়া পিতৃপুরুষের ঋণ শোধনার্থ সশিষ্যে গয়াধামে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস গয়াধামে † অবস্থান করিয়া যথাশাস্ত্র গয়াতীর্থের সমুদয় কার্য্যাদি সমাপ্ত করিলেন।

একদা চৈতন্য গদাধরের মন্দিরে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে পূর্ব্ব-পরিচিত বৈষ্ণবচূড়ামণি ঈশ্বরপুরীকে দেখিলেন। ঈশ্বরপুরী চৈতন্যকে দেখিয়া যারপরনাই প্রীত হইলেন। উভয়ে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। অধুনা চৈতন্যের ধর্ম্মবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। ঈশ্বরপুরীর ন্যায় ভাগবত শ্রেষ্ঠ সন্দর্শনে তাহাতে যেন নবীন আহুতি পড়িল। চৈতন্য পুরীবরের সহিত আপন গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন—

হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে॥

চৈতন্য কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত হইলেন এবং কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দারণ্য ও মথুরা দর্শন করিতে লালায়িত হইলেন। চৈতন্যের পারিষদ্‌গণ অনেকরূপ বুঝাইয়া তাঁহাকে এ যাত্রা বৃন্দাবনযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। পারিষদ্‌গণ ভাবিয়াছিলেন, হয় ত, চৈতন্য বৃন্দাবন গমন করিলে আর প্রত্যাগমন করিবেন না।

* বিষ্ণুপ্রিয়া—বিষ্ণুপ্রীতি কামনাতে দত্তা হইয়াছে যে।

† অদ্যাবধি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। গয়াতে পিণ্ড দান না করিলে কোন হিন্দু সন্তানই আপনাকে পিতৃঋণ মুক্ত বিবেচনা করেন না।

এই জন্ম সুখের কি দুঃখের বলিতে পারি না, ধর্ম্মোপদেশক এবং নীতিবেত্তৃগণ তাহা নিরূপণ করিবেন, কিন্তু জন্মগ্রহণ করা অতি সুকঠিন। বিধাতার সৃষ্টি যে অসম্পূর্ণ, এবং লোকে যেমন কুশলময় বলে, তেমন কুশলময় নহে, এই কথার উদাহরণ প্রয়োগস্থানে মিল, জীবের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধীয় দুঃখের বিশেষ করিয়া উল্লেখ উত্থাপন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, জঠরযন্ত্রণা। যে জঠরস্থিত তাহার কত যন্ত্রণা তাহা সবিশেষ বলিতে পারি না, কিন্তু গর্ভিণীর যন্ত্রণার শেষ নাই। যত দিন না সন্তান প্রসূত হয়, তত দিন নিত্য পীড়া, নিত্য বিপদ। যদি কোন ক্রমে নিয়মিত কাল অতীত হইল, তবে প্রসবের দিন উপস্থিত।

যদি সুপ্রসব ঘটিল, তবে হয় ত পীড়ার ভয়ানক দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল। নিত্য পীড়া, নিত্য প্রাণ সংশয়। যাঁহারা সামাজিক জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখেন তাঁহারা জানেন যে, যত মনুষ্য, মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হওয়ার অল্পকাল মধ্যে প্রাণত্যাগ করে, এত আর অন্য কোন বয়সে করে না।

এই সকল অমঙ্গলের কোন প্রতীকার হইতে পারে না? পারে। এমন কিছুই নৈসর্গিক অমঙ্গল নাই যে, নৈসর্গিক নিয়ম সকলের আলোচনা করিলে নিতান্তপক্ষে কিয়ংপরিমাণে তাহার প্রতীকার হয় না। এ বিষয়েও নৈসর্গিক নিয়ম সকল অবগত হইলে পীড়া ও মৃত্যুর লাঘব করা যায়। এবং ইউরোপে এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম উত্তমরূপে অধীত হওয়ায় প্রসূতী এবং সূতের একটি উত্তম সুচিকিৎসা প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে। তৎসাহায্যে বহুতর প্রাণীর জীবন রক্ষা এবং পীড়ার নিবারণ অথবা উপশম ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু যে জ্ঞান মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজনীয়, তাহা কেবল চিকিৎসকের অধিকারে গুহানিহিত রত্নের ন্যায় লুকায়িত থাকিলে সংসারের মঙ্গল সুনির্ব্বাহ পায় না। প্রায় রমণী মাত্রকেই গর্ভ ধারণ করিতে হয়; প্রায় গৃহ মাত্রেই প্রসূতি এবং সূত।

ধাত্রীশিক্ষা এবং প্রসূতিশিক্ষা। ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। চুঁচুড়া। ১৮৭৫।

গৃহমাত্রই চিকিৎসকের অধিকৃত নহে। বিশেষ, যে চিকিৎসা একদিনের জন্য নহে, যাহা গর্ভাধান কাল হইতে শিশুর শৈশবাতিক্রম পর্য্যন্ত অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা দুর্লভ, অবসরবিহীন, এবং বেতনভোগী চিকিৎসকের উপর নির্ভর করিলে চলে না। বিশেষ অনেক সময়ে, অকস্মাৎ এমত সঙ্কট উপস্থিত হয় যে চিকিৎসক ডাকিবার সময় থাকে না। আর এতদ্দেশে চিকিৎসক পুরুষ জাতি, চিকিৎসনীয়া লজ্জাশীলা স্ত্রীজাতি; চিকিৎসার প্রয়োজনও লজ্জাবিধ্বংসকর। অতএব প্রতি গৃহে গৃহে, গৃহী ও গৃহিণীগণ এ চিকিৎসা অবগত না থাকিলে মনুষ্যগণের মঙ্গল নাই। যিনি গৃহে গৃহে গৃহস্থগণের এই চিকিৎসা শিখিবার উপায় বিধান করিবেন, তিনি পরম লোকহিতকারী বলিয়া খ্যাত হইবেন সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশে ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই লোকহিতকর ব্রত সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "ধাত্রীশিক্ষা ও প্রসূতী শিক্ষা" গ্রন্থে, গর্ভিণীর শুশ্রূষা হইতে এ চিকিৎসার সমুদায় তত্ত্ব, অতি পরিষ্কাররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যদু বাবু যে প্রণালীতে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে, শিক্ষিতা হউক অশিক্ষিতা হউক স্ত্রীলোক মাত্রেই বিনাগুরূপদেশে এই প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সকল শিখিতে পারেন। যে ভাষায় স্ত্রীলোকেরা সচরাচর পরস্পরের সহিত কথোপকথন করে, সেই ভাষাতেই দুইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথনচ্ছলে ইহা রচিত হইয়াছে। ইহাতে এমন কথাই নাই যে সামান্যা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকে তাহা বুঝিতে পারে না। দুরূহ চিকিৎসা তত্ত্ব এইরূপ পরিষ্কার করিয়া যিনি বুঝাইতে পারেন, তিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় অসামান্য দক্ষতাসম্পন্ন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক ডাক্তার যদুনাথ মুখো-পাধ্যায়, একজন বিখ্যাত সুচিকিৎসক। তিনি এ সকল বিষয়ে যে বিধান দিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিবাদে গ্রাহ্য।

গর্ভে বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য তদ্ব্যতি-ক্রমে অনেক শিশুর শরীর দুর্ব্বল এবং অস্বাস্থ্যপ্রবল হইয়া থাকে। ধাত্রীশিক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে এই একটি মহৎ অনিষ্টের প্রতিবিধান হইতে পারে। এমন কি একজন ভদ্রলোকের সন্তান হইয়া অল্পকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইত। পরিশেষে তিনি যদুবাবুর ধাত্রী-শিক্ষা পুস্তক ক্রয় করিয়া, তাহার নিয়মগুলি প্রসূতী ও সন্তানগণের দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন। সেই অবধি তাঁহার সন্তানগণ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইতে লাগিল। ইহা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন। যে গ্রন্থের এরূপ অপরিমেয় শুভ ফল, তাহা যে কেন বাঙ্গালির গৃহে গৃহে থাকে না, ইহাতে আমরা বিস্মিত হই। যদি শুভদিন দেখিবার জন্য, পঞ্জিকা গৃহে গৃহে রাখিবার প্রয়োজন আছে, তবে জীবনের শুভবিষয়ক এই গ্রন্থও গৃহে গৃহে রাখিবার আব-শ্যকতা আছে।

এই স্থলে আমরা সুবিখ্যাত ডাক্তার চার্লস যদুবাবুকে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইব।

"It gives me much pleasure to be able to inform you that after having had the work critically examined, and selected passages either read to me, or translated for me, I have formed a high opinion of its merits. I consider that the subjects you have taken up are very judicious and your treatment of them most careful. I am convinced that an extensive circulation of the book through the Bengalee districts in the Lower Provinces would do that amount of good which is possible as long as the management of women in labor is entrusted to untrained women who can neither read nor write."

"উপমা কালিদাসস্য"—পৃথিবী বিখ্যাত। যেমন হোমরের যুদ্ধ, যেমন ক্লোদ লোরানের দৃশ্যচিত্র, যেমন পিত্রার্কার চতুর্দ্দশপদী,—তেমনি—ততোধিক —বিখ্যাত, কালিদাসের উপমা। যেমন বিষ্ণুর চক্র, মহাদেবের ত্রিশূল, ইন্দ্রের বজ্র, এবং মন্মথের কুসুমশর—তেমনি কালিদাসের উপমা—অব্যর্থসন্ধান। পৃথিবীতে এমন উপমা-পটু কবি, আর কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠককে, সেই উপমাকুসুমের একছড়া ক্ষুদ্র হার গাঁথিয়া অদ্য উপহার প্রদান করিব।

প্রথমে, উপমার প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই। আমাদিগের বিবেচনায় উপমা দ্বিবিধ।

প্রথম সামান্য উপমা। কতকগুলি উপমাতে, কেবল একটি মাত্র বস্তুর সহিত আর একটি বস্তুর সাদৃশ্য নির্দ্দিষ্ট হয়, যথা চন্দ্রতুল্য মুখ। ইহার নাম সামান্য উপমা দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়, যুক্ত উপমা। যেখানে দুইটি বা তদধিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয়, সেখানে উপমার নাম যুক্ত দেওয়া যাইতে পারে। মেঘ যেমন বারি ব্যয় করে, রাজা দশরথ সেইরূপ ধনব্যয় করিয়াছিলেন। এই উপমায়, একদিকে দশরথ ও ধন, একটি বিশেষ সম্বন্ধবিশিষ্ট—দশরথ ধনের ব্যয়কারী, ধন দশরথকর্ত্তৃক ব্যয়িত। অন্যদিকে, মেঘ ও জল সেইরূপ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট—মেঘ ব্যয়কারী, জল মেঘকর্ত্তৃক ব্যয়িত। মেঘের সঙ্গে দশরথ, এবং জলের সঙ্গে ধন তুলিত। সামান্যতঃ মেঘ ও দশরথে বা ধনে এবং জলে কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু এখানে কথিত সম্বন্ধবশতঃই সাদৃশ্য ঘটিল। অতএব এখানে, সম্বন্ধই উপমেয়। সম্বন্ধবিশিষ্টের তুলনা আনুষঙ্গিক মাত্র।

এইরূপ যুক্ত উপমাই সচরাচর অধিকতর মনোহর হইয়া থাকে; এবং কালিদাসে তাহারই প্রাচুর্য্য। কালিদাস এরূপ উপমাপটু যে, অনেক স্থানে

প্রায় প্রতিশ্লোকেই এক একটি উৎকৃষ্ট যুক্ত উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। এবিষয়ে রঘুবংশের প্রথম স্বর্গ বিখ্যাত। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

বাগর্থাবিবসংপৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ॥
ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতি।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং॥
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥
অথবা কৃতবাগদ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্ব সূরিভিঃ।
মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥

ভেলায় সাগর পার, এবং 'বামন হইয়া চাঁদে হাত' এক্ষণে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে, কালিদাসের সময় তাঁহার উপমা অভিনব ছিল কি না বলিতে পারি না। বোধ হয় ছিল, কেননা কালিদাসের ন্যায় উপমা-পটু কবি রাধু মাধুর ন্যায় চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ কালিদাসের অনেকগুলি উপমা এক্ষণে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত উৎকৃষ্ট উপমা একটি ইহার দৃষ্টান্তস্থল—

ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥

সেই রাজা ভয়ানক অথচ কমনীয় রাজগুণসমূহ দ্বারা আশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে নক্রচক্রসঙ্কুল অথচ রত্নরাজি পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় অনভিভবনীয় এবং আশ্রয়ণীয় ছিলেন।

আর একটি—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্র গুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥

আর একটি—

দ্বেষ্যোপি সম্মতঃশিষ্ট স্তস্যার্ত্তস্য যথৌষধম্।
ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা॥

তিনি প্রজাদিগের উন্নতি নিমিত্তই তাহাদিগের নিকট হইতে রাজকর গ্রহণ করিতেন।

সূর্য্য সহস্রগুণ দান করিবার নিমিত্তই পৃথিবী হইতে রসগ্রহণ করিয়া থাকেন।

রোগীর ঔষধের ন্যায়, শিষ্ট ব্যক্তি শত্রু হইলেও তাঁহার গ্রহণীয়। কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তি প্রিয় হইলেও সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় তাঁহার ত্যাজ্য ছিল।

বশিষ্ঠাশ্রম গমন সময়ে এক রথারূঢ় রাজদম্পতী—

স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব।

শ্রুতিসুখাবহ অথচ গম্ভীর শব্দশালী এক রথারূঢ় সেই দম্পতী, বর্ষাকালীন বারিধরাশ্রিত বিদ্যুৎও ঐরাবতের ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন।

তৎপরে রাজোক্তি শ্রবণে বশিষ্ঠের সচিন্তাবস্থা—

ইতি বিজ্ঞাপিতো রাজ্ঞা ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ।
ক্ষণমাত্র মৃষিস্তস্থৌ সুপ্তমীন ইব হ্রদঃ॥

ঋষি, রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া, ধ্যানে স্থিরনেত্র হইয়া কিছুকাল মীনাহৃতিরহিত হ্রদের ন্যায় অবস্থিত হইলেন।

কুমার সম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে অসুর-পীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন—

তেষামাবিরভূদ্ব্রহ্মা পরিম্লানমুখশ্রিয়াং।
সরসাং সুপ্তপদ্মানাং প্রাতর্দীধিতিমানিব॥

তারকাসুরোৎপীড়নে ম্লানমুখকান্তি সেই দেবতাদিগের সম্মুখে, মুদিতপদ্ম-সরোবর সম্বন্ধে বাল সূর্য্যের ন্যায় বিধাতা আবির্ভূত হইলেন।

ব্রহ্মা দেবগণের তেজোহানি দেখিয়া, বরুণকে বলিতেছেন—

কিঞ্চায় মরিদুর্ব্বারঃ পাণৌ পাশঃ প্রচেতসঃ
মন্ত্রেণ হতবীর্য্যস্য ফণিনো দৈন্যমাশ্রিতঃ॥

শত্রুদুর্ব্বার বরুণের হস্তস্থিত এই পাশাস্ত্র মন্ত্ররুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় শোচনীয়াবস্থা কি জন্য?

আমরা অন্যস্থান হইতে অধিক উপমা সঙ্কলন না করিয়া, কুমারের তৃতীয় সর্গ হইতে কিছু গ্রহণ করিব। কাব্যাংশে কুমারের তৃতীয় সর্গের ন্যায় উৎকৃষ্ট রচনা সাহিত্যসংসারে বড় দুর্লভ এই সর্গে মদন কর্ত্তৃক শিবের ধ্যান ভঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রের উত্তেজনায় মন্মথ, রতিসহায় হইয়া, বসন্ত সমেত সেই মহাসংযমী মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। উমাও তথায় গেলেন। তপঃ-পরায়ণ মহাদেবের বর্ণনা কবিত্বের একশেষ। তাহা হইতে একটি উপমা চয়ন করিব—

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহং
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপং॥

অন্তর্গত বায়ু (প্রাণাদির) নিরোধ হেতু বর্ষণহীন মেঘের ন্যায়, তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায়, বাতাভাবে নিশ্চল প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবাপন্ন।

উমার বর্ণনা কালে—

আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাম্
বাসো বসানা তরুণার্ক রাগং।
পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥

স্তনভরে শরীর যেন ঈষৎ নত হইয়াছে। বালসূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। যেন পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকে নম্র ও নবপল্লবশালিনী লতা বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে।

বসন্ত এবং মদনের কার্য্যে, তপস্বী কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন—

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্য-
শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।

চন্দ্রোদয়ে জলনিধির ন্যায় মহাদেবও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন।

পরে রতিবিলাপ—

ক নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জল সংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥

ভগ্নসেতুবন্ধ জলরাশি যেমন জলাধীন জীবিতা নলিনীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করে, তদ্রূপ ত্বদধীনজীবিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রে প্রণয় ভগ্নপূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিলে।

কামসখ বসন্ত দর্শনে—

গতএব ন তে নিবর্ত্ততে
স সখা দীপই বানিলাহতঃ।
অহমস্তদশেব পশ্য মা-
মবিসহ্য ব্যসনেন ধূমিতাং॥

তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

পরে অনুকূল আকাশবাণী হইল—

ইতি দেহ বিমুক্তয়ে স্থিতাং
রতিমাকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদশোষবিক্লবাং
প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ॥

সরোবর শুষ্ক হইলে বিপন্না শফরীকে প্রথম বৃষ্টি যেমন অনুকম্পা প্রদর্শন করে, সেইরূপ দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয় আকাশবাণী রতিকে অনুগ্রহ প্রকাশ করিল।

পরে ক্ষুণ্ণমনে উমা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তপশ্চারণে অভিলাষিণী হইলেন। তখন জননী মেনকা তাঁহাকে বিরত করিতেছেন—

মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতা-
স্তপঃ ক বৎসে ক চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং নপুনঃ পতত্রিণঃ॥

হে বৎসে! মনোহভীষ্ট দেবতা গৃহেতেই আছেন। তুমি তাঁহাদিগের আরাধনে প্রবৃত্ত হও। কষ্টসাধ্য তপস্যা কোথায়, আর তোমার সুকোমল শরীরই বা কোথায়। কোমল শিরীষ কুসুম ভ্রমরের পদভর সহ্য করিতে পারে কিন্তু অন্য পক্ষীর নহে।

এখন মেঘদূত হইতে কয়েকটি উপমা সঙ্কলন করিব—

তাং জানীথাঃ পরিমিত কথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাং।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশির মথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাং॥

আমি প্রিয়ার সদাই সহচর ছিলাম। কিন্তু দৈবনিগ্রহে এক্ষণে দূরবর্ত্তী। সুতরাং সহচর চক্রবাক্ বিরহিত একাকিনী চক্রবাকী তুল্যা সেই মিতভাষিণীকে আমার দ্বিতীয় জীবিততুল্য জানিবে। আমি অনুমান করিতেছি প্রবল উৎকণ্ঠান্বিতা সেই সুকোমলাঙ্গী বিরহমহৎ এই সকল দিবস অতিক্রান্ত হইতে হইতেই হিমক্লিষ্টা পদ্মিনীর ন্যায় পূর্ব্বাকারের বিপরীতাকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রংপ্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরৌষ্ঠং।
হস্তন্যস্তং মুখমসকল ব্যক্তি লম্বালকত্বা
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি।

হে মেঘ! প্রবল রোদন হেতু উচ্ছুসিত নেত্র, উষ্ণ নিশ্বাসবশতঃ বিবর্ণ অধরৌষ্ঠ, সংস্কারাভাবে লম্বমান কুন্তল হেতু অসম্পূর্ণ প্রকাশিত এবং করতল বিন্যস্ত প্রিয়ার বদনটী তোমারই অবরোধে ম্লানকান্তি চন্দ্রের ন্যায় হইয়াছে।

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্র শেষাং হিমাংশোঃ।

হে মেঘ! মানসিক যন্ত্রণায় কৃশাঙ্গী, বিরহশয্যায় একপার্শ্ব শায়িনী সেই প্রিয়াকে পূর্ব্বদিকে কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রের মূর্ত্তির ন্যায় অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের ন্যায় দেখিবে।

পাদানিন্দোরমৃত শিশিরান্ জালমার্গ প্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যাগতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃখেদাৎ সলিল গুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাং॥

পূর্ব্ববৎ প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া গবাক্ষ পথে প্রবিষ্ট, শীতল চন্দ্ররশ্মির প্রতি নিয়মিত কিন্তু অসহ্য বোধে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত চক্ষু, জলভরগুরু পক্ষ্মদ্বারা আচ্ছাদন করতঃ মেঘাচ্ছন্ন দিনে অবিকসিত অমুদিত স্থলনলিনীর অবস্থা প্রাপ্ত তাঁহাকে দেখিবে।

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপিচ মধুনো বিস্মৃত ভ্রূবিলাসং।
ত্বয্যাসন্নেনয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মীনক্ষোভাকুলকুবলয় শ্রীতুলা মেষ্যতীতি॥

অবিন্যস্ত দীর্ঘালক বশতঃ অপাঙ্গ প্রসরবিহীন, স্নিগ্ধাঞ্জন রহিত, মধুপানাভাবে ভ্রূবিলাসবর্জ্জিত মৃগনয়নীর বাম নয়টী তুমি নিকটবর্ত্তী হইলে উপরিভাগে স্পন্দিত হইয়া মীনচলন বশতঃ চঞ্চলকমলশোভার তুলনা প্রাপ্ত হইবে।

(ক্রমশঃ)

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের বুদ্ধিবৃত্তি

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নানা বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। আর্য্য পণ্ডিতেরা নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। গণিতশাস্ত্র ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথমে উন্নতি লাভ করে। ভারতবর্ষীয়দিগের দর্শনশাস্ত্র ইয়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। ইয়ুরোপীয়েরা সহস্র বৎসর চিন্তার পর যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন তাহার অনেক তত্ত্ব প্রাচীন ঋষি ও পণ্ডিতদিগের গ্রন্থাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল শাস্ত্র আলোচনায় গভীর চিন্তার প্রয়োজন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন ও দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন সে সকল শাস্ত্রই ভারতবর্ষে সমুন্নতি লাভ করিয়াছে।

তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তি

আর্য্য পণ্ডিতেরা শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তিও বিলক্ষণ তেজস্বিনী ছিল। তাঁহাদিগের সাহিত্য, রত্নাকর বিশেষ। উহাতে যে রত্ন চাও তাহাই মিলিবে। কি নৈসর্গিক সামগ্রী, নদ, নদী, পর্ব্বত, কন্দর, কি শিল্প সামগ্রী, প্রাসাদ, বাপী, উপবন, ক্রীড়াশৈল; কি আন্তরিক গভীরভাব হৃদয়-বিদারক শোকপ্রবাহ, কি আনন্দনিস্যন্দিনী প্রণয় বর্ণনা, সকল বিষয়েই আর্য্যকবিগণ আপনাদিগের কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কবিত্বশক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব

কবিদিগের এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে তাঁহারা যদি কোন জঘন্য বা ভয়ানক বস্তু বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন তাহাও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও

এই প্রবন্ধ মহারাজ শ্রীযুক্ত হুলকার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রণীত।

আমাদের আন্তরিক তৃপ্তি হয়। শ্মশান অতি ভয়ানক পদার্থ; কিন্তু ভবভূতি সেই শ্মশান বর্ণনা করিয়াই তাঁহার পাঠকবর্গের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা যদি কোন উৎকৃষ্ট বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন, যাহা লোকে ভাল বাসে এমন কোন বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা যে আরো অধিক প্রীতি উৎপাদন করিবেন, আশ্চর্য্য কি? প্রণয় মনুষ্যহৃদয়ের একটি অমূল্য রত্ন। নারীগণ সেই প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী। সুতরাং কবিগণ সকল দেশে ও সকল সময়েই নারী-চরিত্র বর্ণনা করিয়া মানবমণ্ডলীর আনন্দ সমুৎপাদনের জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন।

আর্য্যকবি কল্পিত নারীচরিত্র

আমাদিগের আর্য্যকবিগণ আপন আপন কল্পনাশক্তি বলে যে নারীগণের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা বিধিনির্ম্মিত রমণীগণাপেক্ষা অনেকাংশে অধিকতর রমণীয় পদার্থ। তাঁহাদের কাহার চরিত্র পাঠ করিলে শোকে হৃদয়ের দ্রবীভাব হয়, কাহার চরিত্র পাঠে হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হয়, কাহার ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিলে আত্মার বৈশদ্য সম্পাদন হয় এবং সকলেরই কথা মনে হইলে আনন্দের সঞ্চার হয়। এক্ষণে সেই সকল প্রধান কবিকল্পনা-সম্ভূত-রমণীগণের মধ্যে কোন্ গুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নির্ণয় করিতে হইবে।

কল্পনাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী কারণ

কবিরা যখন লেখনী ধারণ করেন তখন তিনটি কারণ বশতঃ তাঁহাদের কল্পনাশক্তির সর্ব্বতোমুখী তেজস্বিতা প্রকাশ পাইতে পারে না। ১ম। কবিরা সমসাময়িক অবস্থার বিরোধী কোন বিষয়ের বর্ণনা করিতে সঙ্কুচিত হন। ২য়। তাঁহারা যে দেশের জন্য লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন সেই দেশের যাহাতে প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন সে বিষয়েও তাঁহাদের সচেষ্ট থাকিতে হয়। সুতরাং জাতীয় স্বভাবও কল্পনাশক্তিকে সম্যক্ প্রকাশিত হইতে দেয় না। ৩য়। কবিদিগের নিজ স্বভাবও সময়ে সময়ে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। এই তিনটীর মধ্যে আবার সামাজিক অবস্থাই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। জাতীয় স্বভাব ও কবি স্বভাব সময়ে সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতেও পারে। মিল্টনের মহাকাব্য যে সময়ে লিখিত হয় সে সময়ে জাতীয় স্বভাব অতি জঘন্য ছিল। কিন্তু মিল্টন ভাবিতেন যদিও আমার কাব্য এসময়ে কেহ আদর করিবে না কিন্তু জাতীয় স্বভাব ভাল হইলে অবশ্যই ইহার আদর হইবে।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট নারীচরিত্র বর্ণনা দুরূহ

কবিকল্পিত রমণীচরিত্র অবশ্যই বিধিনির্ম্মিত রমণীচরিত্র হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। কিন্তু কবিদিগকেও আবার পূর্ব্বোক্ত তিনটী কারণের অধীন হইয়া

কার্য্য করিতে হয় সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র Highest Ideal চিত্রিত করা তাঁহাদিগের পক্ষেও দুরূহ।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণীর কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, নির্ণয় করা যায়

যদি কোন গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রতিদ্বন্দী কারণত্রয়কে পরিহার করিয়া স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তি বলে কোন অনন্য-সাধারণ গুণসম্পন্না কামিনীর চরিত্র বর্ণনা করেন তবে সেই রমণীই নারীকুলের প্রধান রত্ন হইবে। তাহার চরিত্রই রমণীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest Ideal হইবে। তাহার সহিত তুলনায়, কবিকল্পিত রমণীগণ অনেকাংশে ন্যূন হইবে। কোন কবিই, এপর্য্যন্ত তাদৃশ রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোন কবিই এপর্য্যন্ত সামাজিক বন্ধন হইতে আপনাকে সম্যক্‌রূপে মুক্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু যদিও এরূপ রমণী সৃষ্টি করা একান্ত কঠিন, যদিও কোন কবি এরূপ রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তথাপি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাদৃশ রমণীর কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক অনুভব করিতে পারেন। তাঁহার কোন্ কোন্ মানসিক বৃত্তি তেজস্বিনী হওয়া উচিত কোন্ কোন্ বৃত্তি নিস্তেজ হওয়া উচিত তাহাও চিন্তা করিলে অবগত হওয়া যায়।

মনুষ্যের মনোবৃত্তি বিভাগ

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মনুষ্যের মানসিকবৃত্তি সকলকে তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম বুদ্ধিবৃত্তি ২য় স্নেহ প্রবৃত্তি ৩য় কর্ম্মনিষ্ঠতা। * যে শক্তিদ্বারা গণিত ও পদার্থ বিদ্যার সমুন্নতি করা হয়, যে শক্তিদ্বারা আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া লওয়া যায়, যাহা দ্বারা রাজমন্ত্রীরা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, সেনাপতিরা সৈন্যব্যূহ রচনা করেন, দার্শনিকেরা কূটার্থ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি। যে শক্তিদ্বারা আমরা সামাজিক লোকের সহিত সদ্ভাব করিয়া চলিতে পারি, যাহা দ্বারা পিতামাতাকে ভক্তি করিতে, পুত্রদিগকে স্নেহ করিতে, দুরবস্থকে দয়া করিতে, বন্ধুগণকে ভাল বাসিতে শিখি তাহার নাম স্নেহ প্রবৃত্তি। স্নেহ প্রবৃত্তি সুখ ও দুঃখের কারণ। মনুষ্যের যে কিছু কোমল মানসিক ভাব আছে সে সকলই এই বিভাগের অন্তর্গত। কর্ম্মক্ষমতা ইচ্ছাশক্তির অপর নাম। শুদ্ধ মানসিক ইচ্ছা থাকিলেই হয় না। যে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়, যাহা দ্বারা লোকে অপার সমুদ্র পার হইয়া, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া, ঈপ্সিত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় সেই যথার্থ কর্ম্মক্ষমতা।

* Intellectual, Emotional and Aetive Powers.

এই তিনটী প্রবৃত্তিই মনুষ্যস্বভাবের নিরন্তর সমভিব্যাহারী। অতি মূর্খ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হটেণ্টটদিগেরও বুদ্ধিবৃত্তি আছে। নরমাংসলোলুপ আণ্ডামানবাসীদিগেরও স্নেহপ্রবৃত্তি আছে এবং জড়প্রায়, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া কাফ্রিদিগেরও কর্ম্মক্ষমতা আছে। তবে পরিমাণগত ইতর বিশেষ মাত্র। আমরা ঈশ্বর ভিন্ন আর কুত্রাপি এই বৃত্তিত্রয়ের যুগপৎ সমুন্নতি ও প্রকর্ষ পর্য্যন্ত (Perfection) কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু এরূপ মনুষ্য কল্পনা করিতে পারি যাহার সকল কয়টীই সতেজ এবং একটী মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব, সমুন্নতি লাভ করিয়াছে।

কাব্যলিখিত পুরুষচরিত্রের প্রকর্ষ্য পর্য্যন্ত

যখন আমরা পুরুষচরিত্রের চরম উৎকর্ষ কল্পনা করি তখন আমরা তাঁহাকে যতদূর পারি কর্ম্মক্ষম করি তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে বিলক্ষণ তেজস্বিনী করি। তাঁহার স্নেহ প্রবৃত্তিকে বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করি। কিন্তু তিনি যদি কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য সেই তেজস্বিনী স্নেহপ্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিতে পারেন তবেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি। রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন, পরশুরাম মাতৃহত্যা করিলেন, দাতাকর্ণ পুত্রকেও বধ করিলেন ; তিনজনই স্নেহপ্রবৃত্তিকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের দ্বারে বলি দিলেন। এবং তিনজনই জগদ্বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইলেন।

তাদৃশ নারীচরিত্র

কিন্তু যখন আমরা ঐরূপ নারীচরিত্র চিত্রিত করিতে বসি তখন আমরা তাঁহাকে পুরুষের ঠিক বিপরীত করিয়া চিত্রিত করি। পুরুষের যেমন, কর্ম্মক্ষমতা সর্ব্বস্ব হইবে নারীর স্নেহপ্রবৃত্তি সেইরূপ। তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সকল সর্ব্বতোভাবে সমুন্নতি লাভ করিবে। প্রণয় তাঁহার জীবন স্বরূপ হইবে। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, অপত্যস্নেহ, সর্ব্বভূতে দয়া, ঈশ্বরপরায়ণতা, প্রভৃতি যাবতীয় কোমল সুন্দর এবং মানস-প্রফুল্লকারী বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে। বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা সম্ভবমত থাকা আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বিনী হইবে : কর্ম্মক্ষমতা তাহা অপেক্ষা ন্যূন হইলেও ক্ষতি নাই। তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা অনেকে প্রধান গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন, অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সমান স্বত্বাধিকারী, সুতরাং সহিষ্ণুতা অপেক্ষা কর্ম্মক্ষমতা তাঁহাদের মতে অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি স্নেহপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া স্বামীর জন্য, পুত্রের জন্য, পিতার জন্য, পরের উপকারের জন্য তাঁহাকে নানাবিধ শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় তবে সে সহিষ্ণুতা অবশ্যই তাহার পক্ষে প্রশংসনীয় হইবে।

নারীচরিত্রে স্নেহ প্রবৃত্তি প্রধান হইবে বলিবার কারণ

অনেক বলিবেন স্নেহপ্রবৃত্তি প্রবল হইলেই যে নারীচরিত্র উৎকৃষ্ট হইবে এরূপ বলিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে আমরা দেখিতে পাই ইতর জন্তুদিগের মধ্যেও নারীর স্নেহপ্রবৃত্তি প্রবল; মনুষ্যদিগের মধ্যেও পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর স্নেহপ্রবৃত্তি বলবতী এবং যে কোন কবিই নারীচরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনি উহার স্নেহপ্রবৃত্তিকেই অধিকতর প্রকাশিত করিতে যত্ন করিয়াছেন। সন্তান লালনপালনের ভার সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের প্রতি অর্পিত হয় এই জন্য স্ত্রীলোকের অপত্যস্নেহ বলবান্ হইয়া উঠে। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল এজন্য স্ত্রীলোককে পুরুষের আশ্রয়ে বাস করিতে হয় সুতরাং যে সকল মনোবৃত্তি থাকিলে সমাজে সদ্ভাবের সহিত চলা যায়; তাঁহার পক্ষে সেগুলির আপনিই প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

অতএব স্থির হইল যে দেশগত কালগত অবস্থাগত বৈলক্ষণ্য পরিহার পূর্ব্বক নারীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest Ideal স্থির করিতে হইলে তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তিকে যতদূর পারা যায় তেজস্বিনী করা আবশ্যক। তাঁহার কর্ম্মণ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিও বিলক্ষণ প্রকাশ থাকা উচিত। কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকিবে। কিন্তু যদি স্নেহপ্রবৃত্তির অনুরোধে তাঁহাকে সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হয় এবং যারপরনাই শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

প্রস্তাবের অবতারণা

পৃথিবীস্থ তাবদ্দেশের কবিগণই এই উৎকৃষ্ট নারীচরিত্রের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সামাজিক নিয়ম জাতীয় স্বভাব ও কবি স্বভাবের অনুরোধে প্রায় কেহই এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর চরিত্র চিত্রিত করিতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। আমাদিগের প্রাচীন কবিগণও পূর্ব্বোক্ত কারণত্রয়ের অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু শকুন্তলাদি সৌভাগ্যবতী কামিনীগণের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে বোধ হয় তাঁহারা নায়িকাকুলের মধ্যে সর্ব্বোচ সিংহাসনে উপবেশন করিবার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। হিন্দুদিগের সাহিত্যমধ্যে যাদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্না পতিপরায়ণা কার্য্যকুশলা রমণীগণের বিবরণ পাঠ করা যায় পৃথিবীর আর কোন দেশীয় কবিগণের গ্রন্থাবলীতে তাদৃশ রমণীচরিত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

এইরূপ উপক্রমণিকার পর দেখা যাউক আর্য্যকবিগণ নারীচরিত্র বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে হইলে প্রথমতঃ তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। যে হেতুক কল্পনাশক্তি যতদূর তেজস্বিনী হউক না কেন, যতই নূতন নূতন পদার্থ নির্ম্মাণে সমর্থ হউক না কেন, উহা কবির সমসাময়িক সামাজিক অবস্থানে আশ্রয় করিয়াই নিজশক্তি প্রকাশে সমর্থ হয়। অতি নৈসর্গিক ঘটনা বর্ণনকুশল কবীন্দ্র মিল্টনের অলৌকিক কাব্যেও তাঁহার সমকালবর্ত্তী কেবালিয়র ও পিউরিটানদিগের প্রতিকৃতি চিত্রিত হইয়াছে। অতএব আমরাও এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব। পরে কালিদাস বাল্মীকি বেদব্যাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোকের চরিত্র সমালোচনা করিব।

সামাজিক অবস্থা জানিবার উপায়

সেই সামাজিক অবস্থা জানিবার নানা উপায় আছে। প্রথমতঃ বেদ, দ্বিতীয় স্মৃতি, তৃতীয় পুরাণ এবং চতুর্থ তন্ত্র। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের কোন স্থানেই স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থা একত্র বর্ণনা নাই। নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। বিশেষতঃ পুরাণের অধিকাংশ আবার কবিকল্পনাসম্ভূত। সুতরাং উহাকে প্রকৃত সমাজ চিত্র কোনরূপেই বলা যায় না। বেদ ও তন্ত্র উপাসনা প্রণালী ও অন্যান্য ধর্ম্ম সংক্রান্ত কথাতেই পূর্ণ, কিন্তু স্মৃতিসংহিতা সকলেই প্রকৃত সমাজের যথার্থ প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায়। বর্ণধর্ম্ম বর্ণন করাই স্মৃতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অতএব উহা হইতে আমাদিগের প্রমাণ প্রয়োগ অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইবে।

১ স্ত্রীলোকের আদি

আমাদিগের দেশীয় বৃদ্ধেরা কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলেই জিজ্ঞাসা করেন ইহার আদি কি ? অর্থাৎ পুরাণ বা স্মৃতিতে কিরূপে ইহার উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছে। সেইরূপ, প্রস্তাবের প্রথমে আমরা জিজ্ঞাসা করি স্ত্রীলোকের আদি কি ? বাইবেলাদি পাশ্চাত্য শাস্ত্রে বলে আদামের পঞ্জর হইতে ইবের উৎপত্তি আর পুরুষের সুখের জন্যই স্ত্রীলোকের উৎপত্তি। ইহাতে স্ত্রীলোক যেন পুরুষের অপেক্ষা অনেক নীচ জাতি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা অনেক অধিক। আমাদিগের সৃষ্টি প্রকরণ প্রধানতঃ দুই প্রকার। ১ম। আদ্যাশক্তি হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকই ব্রহ্মাণ্ডের মূল।

দ্বিতীয় নারায়ণ বা ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং আপন দেহ দুইভাগে বিভক্ত করেন, একভাগে পুরুষ ও অপরভাগে নারীর উৎপত্তি হয়।

"দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোভবৎ অর্দ্ধেন নারী"—মনুঃ।

(ও প্রয়োজন)

আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীলোক ভোগের জন্য নহে, মনু স্ত্রীলোকের তিনটি প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

"উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী নিবন্ধনং॥"

স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না

যদিও স্ত্রীলোক পুরুষের পঞ্জর হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ স্ত্রীলোককে পুরুষের যাবজ্জীবন অধীন করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" ইহা সকল ঋষিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মনু বলেন, "স্ত্রীলোকের অভিভাবকেরা তাহাদিগকে দিন রাত্রি আপনাদের অধীনে রাখিবে। নিয়মমত বিশ্রাম সময়েও স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহাদিগের রক্ষাকর্ত্তার নির্দ্দেশমত কার্য্য করিতে হইবে।" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "পিতামাতা বাল্যকালে, স্বামী যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ইহাদের অভাব হইলে, আত্মীয় বান্ধবেরা উহাদিগের রক্ষা করিবে। স্ত্রীলোক কোন মতেই স্বাধীন হইতে পারিবে না।" বৃহস্পতি বলেন, "শ্বশ্রূ অথবা অন্য কোন প্রাচীনা স্ত্রীলোকে তরুণ-বয়স্ক স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিবে।" নারদ বলেন, "যদি স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হয়, অথবা জ্ঞাতিরা উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়, তবে সে পিতৃকুল আশ্রয় করিবে। পিতৃবংশ নির্ম্মূল হইলে, রাজা স্ত্রীলেকের রক্ষক হইবেন। যদি ঐ স্ত্রীলোক ধর্ম্মবিরুদ্ধ পথগামিনী হয়, তবে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন।" পৈঠিনসী বলেন, "স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবে দেখিও যেন সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হয় না।" (১) এই সকল বচন দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইবে, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা কোন প্রকারেই প্রাচীন ঋষিদিগের সম্মত নহে। কিন্তু মহাভারতে আমারা এক সময়ের কথা শুনিতে পাই, তখন স্ত্রীলোকে পুরুষের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন ছিল। (২)

(১) D. N. Mitra's decision in the great Unchastity Case.

(২) শ্বেতকেতূপাখ্যান।

স্ত্রীলোক অবরোধবর্ত্তিনী ছিল না

যদিও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা বিষয়ে ঋষিরা সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রীলোক যে অবরোধবর্ত্তিনী থাকিতেন তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রত্যুত দেখা যাইতেছে, সীতা রামের সহিত বনগমন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীও পঞ্চ পাণ্ডবের অদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যারা ত কখনই অবরুদ্ধ ছিলেন না ও থাকিতেন না। মহাভারতীয় দেবযানী উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। কাব্য গ্রন্থ সকলে যে "শুদ্ধান্ত," "অন্তঃপুর," "অবরোধ," ইত্যাদি কথা দেখা যায়, তাহাতে এই বোধ হয় যে, ক্ষত্রিয় রাজাদিগের গৃহিণীরাই অবরোধবর্ত্তিনী ছিলেন। যাহারা ৭০০।৮০০ বিবাহ করিবে তাহাদের অবরোধ সুতরাং প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু আর্য্যগণ প্রায়ই একটি মাত্র বিবাহ করিতেন, এবং নির্ম্মল গার্হস্থ্য সুখের অধিকারী ছিলেন। মুসলমানদিগের ন্যায় তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে ভোগার্থ মাত্র বলিয়া মনে করিতেন না। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তাঁহারা সর্ব্বদাই ভাল ব্যবহার করিতেন। মনু বলিয়াছেন, "যে গৃহে স্ত্রীলোকেরা অসন্তুষ্ট থাকে, সেখানে কখনই ভদ্রস্থতা নাই। স্ত্রীলোকেরা যে অবরোধবর্ত্তিনী ছিলেন না তাহার প্রমাণ এই যে অরুন্ধতী সর্ব্বদাই সপ্তর্ষিদিগের সমভিব্যাহারিণী থাকিতেন। রাজাদিগের প্রধানা মহিষী প্রায়ই সিংহাসনার্দ্ধ-ভাগিনী হইতেন। আর "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই এক নিয়ম। প্রায় সকল ধর্ম্ম কর্ম্মেই স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত সভায় উপস্থিত হইতেন। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,—

> "ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং।
> হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥"

অর্থাৎ স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী পরের বাটী যাইবে না কোন সমাজ বা উৎসব স্থলে উপস্থিত হইবে না। তাহা হইলে স্বামী গৃহে থাকিলে, স্বামীর অনুমতি লইয়া স্ত্রী সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পারিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শব্দশাস্ত্র হইতে এই বিষয়ের আর এক প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বৈরিণী বলিলেই ব্যভিচারিণী বুঝায়। যে স্ত্রী আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিত, তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিত সুতরাং স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু কুলটা বলিলে পূর্ব্বকালে দুষ্ট স্ত্রীলোক বুঝাইত না যেহেতু "কুলটার অপত্য" এই অর্থে "কৌলটিনেয়" পদ হইয়া থাকে। যদি দুষ্টা বুঝাইত কৌলটের বা কৌলটার পদ হইত। "ক্ষুদ্রাগোধাভ্যো বৈরারৌ" এই মুগ্ধবোধের সূত্রে ক্ষুদ্রা অর্থাৎ নীচাশয়া বুঝাইলেই এর বা আর প্রত্যয় হয়। অতএব কৌলটিনেয় এই পদ

প্রয়োগ থাকাতেই বোধ হইতেছে এক সময়ে কুলটা শব্দের অসদর্থ ছিল না অর্থাৎ এক সময়ে যাহারা বেড়াইয়া বেড়াইত তাহারা নিন্দনীয় হইত না।*

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" যেমন পুত্রের শিক্ষাদান আবশ্যক সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগেরও শিক্ষাদান আবশ্যক। এই শিক্ষা কিরূপ? দুরূহ শাস্ত্র বেদ ভিন্ন স্ত্রীলোকে সকল শাস্ত্রেই অধিকারিণী। কিন্তু আমরা দেখিতেছি গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক বেদেও সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

এবং একস্থলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীলোকদিগকে বেদে উপদেশ দিতেছেন। বেদ দুই প্রকার, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ইহার মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড অতি দুরূহ কিন্তু গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট জ্ঞানকাণ্ডেই উপদেশ পাইয়াছিলেন। ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকেও দেখা যায় যে একজন তাপসী বেদান্ত অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ড অধ্যয়ন করিবার জন্য বাল্মীকি মুনির আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর গমন করিতেছেন। উক্ত মহাকবির আর একখানি নাটকে কামন্দকী, ভূরিবসু ও দেবরাত নামক দুই জন প্রসিদ্ধ অমাত্যের সহাধ্যায়িনী ছিলেন। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে কামন্দকী বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন তখন তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বিনী ছিলেন না। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পণ্ডিত কৌষিকী স্বকীয় বিদ্যাবত্তা প্রযুক্ত পণ্ডিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে হিন্দু ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং বোধ হইতেছে অতি প্রাচীন কালে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই সমানরূপে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন। আমাদিগের দেশে যে স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা দৃষ্ট হয় তাহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্ব্বতী বাল্যকালেই নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। বিদ্যা বিষয়ে স্ত্রীলোকেরা যে কতদূর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহার কতক অবগত হইতে পারা যায়।

বিশ্বদেবী গঙ্গা বাক্যাবলী নামক একখানি স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন। লক্ষ্মী দেবীর প্রণীত মিতাক্ষরার টীকা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ভাস্করাচার্য্যের পাটীগণিত ও বীজগণিত লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্যের কাব্যে আর একজন প্রসিদ্ধ লীলাবতী ছিলেন। শঙ্করবিজয়

---

* কুলং গ্রামং অটতি গচ্ছতি ভ্রমতি ইতি প্রাচীন ব্যুৎপত্তি কুলমটতি ত্যজতি ইতি নূতন ব্যুৎপত্তি। কুলটাশব্দ সতী অর্থে ব্যবহৃত হয় রামতর্কবাগীশ মুগ্ধবোধের টীকায় লিখিয়াছেন।

গ্রন্থের শেষভাগে শঙ্করাচার্য্য কলিঙ্গদেশে একটি স্ত্রীলোকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কর্ণাটী দেশীয় রাজার মহিষী কালিদাসের কবিত্ববিষয়ে প্রতিদ্বন্দিনী ছিলেন। বল্লালসেনের পুত্রবধূও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

স্ত্রীলোকের বিবাহ

পিতা উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। এইটিই সকল মুনির মত কিন্তু কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে যদি পিতা বিবাহ দিবার কোন উদ্যোগ না করেন তাহা হইলে কন্যা ইচ্ছামত পাত্র মনোনীত করিয়া লইতে পারিবে। (মনু) উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয় নচেৎ নরকে যাইতে হয় এই নিয়ম থাকায় অনুপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান প্রায়ই ঘটিত না। বিশেষতঃ বরের গুণাগুণ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ কঠিন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতেও অপাত্রে কন্যাদান ঘটিয়া উঠা ভার হইত। তিনি বলিয়াছেন—

এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়োবরঃ।
যত্নাৎপরীক্ষিতঃ পুংস্তে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রসিদ্ধ টীকা মিতাক্ষরাগ্রন্থে এই বচনটীর বিশিষ্টরূপ ব্যাখ্যা আছে যথা, "যুবা," অর্থাৎ পিতা অতীতবয়স্ক ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না "ধীমান্" অর্থাৎ জড়মতি বেদার্থ গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তি বিবাহের উপযুক্ত নহে "জনপ্রিয়" অর্থাৎ কর্কশস্বভাব ব্যক্তিকে কন্যাদান নিষিদ্ধ। এই বচন দৃষ্টে তৎকালে বর পরীক্ষার নিয়ম ছিল তাহাও জানা যায়। যদি বর সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রসম্মত হয় তবেই তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে পিতার পুণ্যসঞ্চয় হইবে। মনু আরো বলিয়াছেন যদি শাস্ত্রানুমোদিত বর না পাওয়া যায় তবে বরং কন্যা যাবজ্জীবন পিতৃগৃহে বাস করিবে তথাপি অনুপযুক্ত বরে কন্যাদান করিবে না।

অনেকে বলিতে পারেন বর ও কন্যা পরস্পর মনোনীত না করিয়া লইলে অনেক সময়ে পতি পত্নীর অপ্রণয় নিবন্ধন নানাপ্রকার সাংসারিক কষ্ট হইত এবং ইংরাজ জাতিমধ্যে যেরূপ কোর্টসিপ প্রচলিত এরূপ কোন প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। এরূপ বলা একান্ত ভ্রমের কর্ম্ম। বাস্তবিক আমাদের দেশে স্বামী ও স্ত্রী মনোনীত করিবার যে প্রথা ছিল তাহা কোর্টসিপ অপেক্ষাও সুন্দর। প্রথমতঃ কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কন্যা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারিত এবং যদি বাগ্দানের পর বরের মৃত্যু হয় এবং বরের ভ্রাতার সহিত সম্বন্ধ হয় তবে কন্যার সম্মতি অপেক্ষা করিত। দ্বিতীয় গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত থাকায় বর ও কন্যা

ইচ্ছামত পরস্পর প্রণয় জন্মিলেই বিবাহ করিতে পারিত। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এই বিবাহ অপ্রশস্ত। ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অপ্রশস্ত হইবার কারণ আছে। ব্রাহ্মণদিগের চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ নিষিদ্ধ। গান্ধর্ব্ববিবাহ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চলিত থাকিলে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। আর ইন্দ্রিয়সংযম ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় সংযমও নিরন্তর গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন ভিন্ন হইতে পারে না সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে ইচ্ছামত বিবাহ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধই ছিল। নির্দ্দিষ্ট বয়সের পর তাঁহারা শাস্ত্রসম্মতা কন্যা মনোনীত করিয়া লইতেন। তৃতীয়তঃ অতি প্রাচীন কালে বর ও কন্যা পরস্পর মনোনীত করিবার আর এক চমৎকার প্রণালী ছিল। কন্যার পিতা বিবাহযোগ্য কালে কন্যাকে আহ্বান করিয়া কহিতেন বৎসে তোমার বিবাহ সময় উপস্থিত। তুমি আমার বিশ্বস্ত লোকের সহিত গমন কর। তোমার যাহাকে ইচ্ছা হইবে সে যদি কুলশীলে আমাদের অপেক্ষা নীচ না হয় তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিব। পতিপরায়ণা সাবিত্রী এইরূপে আপন স্বামী মনোনীত করেন। অনেকে মনে করিতে পারেন এরূপ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না কিন্তু সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি সে আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বৎসে এইটাই প্রকৃত আগমোক্ত বিধি এবং এইরূপে বহুতর কন্যা মনোমত পতিলাভ করিয়াছেন। বোধ হয় এরূপ স্বামী মনোনীত করিবার প্রথা পরিণামে স্বয়ম্বররূপে পরিণত হয়। পুরুষেও কন্যা মনোনীত করিবার জন্য বহির্গত হইয়া ইচ্ছানুসারে মনোমত কন্যা বিবাহ করিতেন। দশকুমারচরিতে তাহার এক সুন্দর উদাহরণ আছে। ৪র্থ স্বয়ম্বর প্রথা। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রণালী বোধ হয় আর কুত্রাপি প্রচলিত ছিল না। কন্যার বিবাহ সময় উপস্থিত হইলে সমান কুলশীল ব্যক্তিমাত্রকেই আহ্বান করা হইত। সকলে উপস্থিত হইলে মহসমারোহে এক সভা হইত। কন্যা শিবিকারোহণ পূর্ব্বক সভামধ্যে প্রবেশ করিতেন। একজন প্রগল্‌ভা স্ত্রীলোক একে একে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে শিবিকা লইয়া তাহাদের গুণাগুণ কীর্ত্তন করিত এবং শেষে জিজ্ঞাসা করিত "কেমন, এ বর তোমার মনোনীত হয়!" মনোনীত হইলে কন্যা আপন গলদেশ হইতে মাল্য লইয়া বরের গলায় অর্পণ করিত। অনেক স্থলে স্বয়ংবরের পূর্ব্বেই সকলের গুণাগুণ কন্যাকে শুনান থাকিত। বড় বড় স্বয়ম্বরস্থলে যে কোন পরাক্রান্ত ব্যক্তি বিবাহে নিরাশ্বাস হইয়া কোনরূপ উৎপাত করিবেন তাহার যো ছিল না। কারণ স্বর্গপতি ইন্দ্রের মহিষী স্বয়ম্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিন্তু এরূপ হইলেও বহুলোকসমাগম প্রযুক্ত নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিত এজন্য পণপূর্ব্বক বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হয়। উহাতে যে কোন ব্যক্তি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দুরূহ কার্য্য করিবে

সেই বিবাহ করিয়ে এই পণ থাকিত। মধ্যসময়ে ইয়ুরোপের নাইটেরা লেডিদিগের সন্তুষ্টির জন্য নানাবিধ দুরূহ কার্য্য সাধন করিতেন। এইরূপ নানাবিধ বিবাহ থাকিতেও মুনি ঋষিরা ও রাজারা ইচ্ছামত নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া কন্যা মনোনীত করিতেন। মহর্ষি অগস্ত্য একটি দুই বৎসরবয়স্কা কন্যাকে লইয়া একজন রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন তুমি ইহার লালনপালন ও শিক্ষাকার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবে। পরে সে কন্যা বিবাহযোগ্যবয়স্কা হইলে স্বয়ং আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। অতএব এক্ষণকার অনেকে যে বলেন বর কন্যা পরস্পর মনোনীত করিবার প্রথা ছিল না সে কেবল তাঁহাদের ভ্রম মাত্র।

ডাইভোর্স বা পরিত্যাগ

স্ত্রী যদি শুদ্ধচারিণী ও পতিব্রতা হন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে পতিত হইতে হইবে। ব্যাস বলিয়াছেন, "অদুষ্টাং পতিতাং ভার্য্যাং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ" রঘুনন্দনও শুদ্ধচারিণী স্ত্রী ত্যাগের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পতিত হওয়ার অর্থ আমরা এক্ষণে ভাল বুঝিতে পারি না, কিন্তু পূর্ব্বকালে পতিত ব্যক্তির সহিত কেহ আলাপ করিত না, কেহ উহার মুখ দেখিত না, উহাকে একপ্রকার জীবন্মৃতের ন্যায় থাকিতে হইত। স্ত্রী ত্যাগ করিলে তাহার ঐরূপ ভয়ানক অবস্থা হইত। কিন্তু ঋষিরা নানা কারণে স্ত্রী ত্যাগের বিশেষ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, যথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

> সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
> স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥

মদ্যপায়ী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যা অমিতব্যয়কারিণী অপ্রিয়বাদিনী কন্যাপ্রসবিনী পুরুষদ্বেষিণী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারিবে। মনু প্রভৃতিরও ঐরূপ বচন আছে। এই সকল কারণ বশতঃ যাহাদিগকে ত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে আজীবন প্রতিপালন করিতে হইবে; যেহেতুক যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "অধিবিন্নাস্তু ভর্ত্তব্যা মহদেনোঽন্যথা ভবেৎ" তাহাদিগকে ভরণ না করিলে বড় দোষ হয়। মিতাক্ষরা বলিয়াছেন, ঐ সকল স্ত্রী স্বামীর সহিত সহবাস করিতে পারিবেন না এবং গৃহকর্ত্রী হইতে পারিবেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রকারদিগের বিলক্ষণ বোধ ছিল, স্ত্রীলোক নিঃসহায়, এই জন্য তাঁহারা বলিয়াছেন, ব্যভিচারিণীকেও বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দিয়া, উহাকে নানাবিধ প্রকারে কষ্ট দিয়া যাহাতে উহার চরিত্র সংশোধন হয়, তাহার চেষ্টা করিবে।

হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীং।
পরিভূতামধঃ শয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীং॥

এটিও যাজ্ঞবল্ক্যের বচন। এই পর্য্যন্ত পুরুষের পক্ষে। স্ত্রী কিন্তু পতিত কুষ্ঠরোগী স্বামীকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কেবল পতিত হইলে যত দিন তাহার শুদ্ধি না হইবে, ততদিন উহার সহবাস করিবে না "আশুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যোহি মহাপাতকদূষিতঃ।" এ সকল সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ব্যবস্থা। কলিযুগে স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তরকে বিবাহ করিতে পারিবে।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

অতএব কলিযুগে পুরুষ যেমন কারণ বশতঃ স্ত্রীত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে পারেন, স্ত্রীও তেমনি কারণ বশতঃ স্বামীকে ছাড়িয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার

"পিতা মাতা ভ্রাতা পতি দেবর প্রভৃতি আত্মীয় লোকে যদি ইহলোকে সম্মান ইচ্ছা করেন, তবে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করিবেন। এবং তাহাদিগের বেশ ভূষা করাইয়া দিবেন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করা হয় সেইখানেই দেবতারা সন্তুষ্ট হন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগের অমর্য্যদা করা হয়, তথায় সকল কর্ম্মই নিষ্ফল। যে কুলে স্ত্রীরা শোক করে সে কুল শীঘ্র নাশ পায়। যেখানে উহারা সন্তুষ্ট থাকে, সেখানে সর্ব্বদাই শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব ভূতিইচ্ছুক লোকেরা উৎসবে ও সৎকার্য্যে ভূষণ আচ্ছাদন ও অশন দ্বারা উহাদিগের "পূজা" করিবে। যে কুলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট সে কুলে কল্যাণ হয়।" ইত্যাদি। মনুর এই সকল বচন পাঠ করিলে, বোধ হয় পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকের প্রতি সকলে সদ্ব্যবহার করিতেন। তাহাদিগকে ভূষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেন। মনু আরও বলিয়াছেন। মাতা পিতার অপেক্ষা সহস্র গুণে পূজনীয়া, ভার্য্যা আপনার দেহ। অতএব ইহাদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ কোনরূপেই বিধেয় নহে। এদেশীয় কুলীনদিগের মধ্যে কন্যা হইলে, তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাজপুতানার রাজপুতদিগের মধ্যে বালিকাহত্যা প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মনু বলিয়াছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।" আর এক জন বলিয়াছেন, কন্যা পুত্রে কিছুমাত্র ভেদ নাই বরং কন্যা সৎপাত্রে দান করিলে পরলোকে মঙ্গল হয়। স্ত্রীলোকের শারীরিক কষ্ট দেওয়া মহাপাপ বলিয়া আজিও গণ্য হইয়া থাকে। গরুড় পুরাণে আছে "অবধ্যাঞ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহু স্তির্য্যক্ জাতিগতেষ্বপি" মনু

বলিয়াছেন, পরপত্নীকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, উঁহাদিগকে মাতৃবৎ দেখিবে। স্ত্রীলোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করার প্রথা ছিল, তাহার এক প্রকার উল্লেখ করা হইল।

উপরি লিখিত প্রবন্ধে বোধ হইবে যে, সভ্যজাতীয় লোকেরা স্ত্রীলোকের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণও তাহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তবে যে নানা স্থানে দেখা যায় "স্ত্রীলোক অতি হেয় পদার্থ উঁহার সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। হৃদয়ে ক্ষুরধারাভা মুখে মধুরভাষিণী স্ত্রীর অন্ত পুরাণাদিতেও পাওয়া যায় না অতএব তাহাকে বিশ্বাস করিবে না।" (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ) এ সকল সংসারবিরাগী যোগী প্রভৃতি লোকের উক্তি; তাহাদের মন অন্য দিকে আসক্ত, স্ত্রীলোক পাছে তাঁহাদিগকে সংসারে বদ্ধ করে, এই ভয়ে তাঁহারা বনে বাস করিতেন, অথবা তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া পূর্ব্বকালের মত পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণা করিতেন অথবা তাঁহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেন এরূপ বলা অন্যায়। বরং নিম্নলিখিত যাজ্ঞবল্ক্যবচন দৃষ্টে বোধ হইবে যে, প্রাচীন ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে অতি পবিত্র পদার্থ মনে করিতেন। যাহারা সতী তাহাদের ত কথাই নাই, "যেখানে যেখানে তাহাদের পাদস্পর্শ হয়, সেইখানে সেইখানেই পৃথিবী মনে করেন যে আমার আর ভার নাই আমি পবিত্রকারিণী হইলাম।" (কাশীখণ্ড) কিন্তু সামান্যতঃ পাপচারিণী ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। "সোম তাহাদিগকে শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব তাহাদিগকে মধুরবাক্য প্রদান করিলেন, পাবক তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র করিয়াদিলেন। অতএব যোষিদ্গণ সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র হইল।"

ক্রমশঃ

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম

স্ত্রীলোকের পক্ষে কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামী কাণা হউন খোঁড়া হউন অকর্ম্মণ্য হউন দুষ্ট হউন তথাপি স্ত্রীলোকের তিনিই গুরু, পুজ্য ও ইষ্টদেবতা তাঁহার চরণ সেবা করিলেই স্ত্রীলোকের পরকালে পরম গতি লাভ হইবে। স্বামীর পর শ্বশ্রূ শ্বশুর পিতামাতার সেবা দেবরাদির প্রতিপালন তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি সমস্ত গৃহকার্য্যে দক্ষ হইবেন। ব্যয়ে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত হইবেন, স্বামী পুত্রের বিরহ কখনই কামনা করিবেন না—আপন ইচ্ছাতে কোন কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয়। তাঁহার ব্রত ধর্ম্ম উপাসনা উপবাস কিছুই নাই। শিল্পাদি কার্য্যে দক্ষা হউন, সে তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, গুণের মধ্যে। কিন্তু তাহা দ্বারা যে ধনসঞ্চয় হইবে তাহাতে তাঁহার নিজের কোন অধিকার নাই। সে ধন তাঁহার স্বামীর। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে গৃহকার্য্যে দক্ষ হওয়া তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। সে সকল গৃহ কর্ম্ম কি বহ্নি পুরাণে তাহার এক সংগ্রহ পাওয়া যায় যথা—

> "সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং স্বয়ং।
> প্রাঙ্গনে মণ্ডলং দদ্যাৎ গোময়েন জলেনবা॥
> গৃহকৃত্যং চ কৃত্বাচ স্নাত্বাগত্বাগৃহংসতী।
> স্বয়ং বিপ্রংপতিং নত্বা পূজয়েদ্গৃহদেবতাং॥
> গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী।
> অতিথীন্ পূজয়িত্বাচ স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে সুখং সতী।

এইস্থলে সংক্ষেপে স্ত্রীলোকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম উল্লেখ করা হইল। ইহা ভিন্ন অনেক কর্ম্ম আছে তাহা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে অথচ করিলে তাঁহাদের প্রশংসা হয়। তাহার উল্লেখ তৃতীয় অধ্যায়ে করিব। স্ত্রীলোকের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করা হইয়াছিল জানিতে গেলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি কি জানা

নিতান্ত আবশ্যক। কারণ তাঁহারা ঐ গুলি যদি সুন্দররূপে সমাধা করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের চরিত্র উত্তম বলিতে হইবে। তাহার পর অমায়িকতা সরলতা প্রভৃতি যে সকল গুণে জগতে মাননীয় হওয়া যায় সেই সকল গুণ থাকিলেই তাহাকে অতি উন্নতচরিত্র বলিতে হইবে। অতএব এক্ষণে সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনায় সেই সকল কর্ত্তব্য বিস্তার বর্ণনা না করিয়া সংক্ষেপে করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

স্ত্রীর ধনাধিকার

স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থা যে তত ভাল ছিল না তাহার এক প্রধান প্রমাণ এই যে স্ত্রীলোকের ধনাধিকার নাই। নিজে উপার্জ্জন করিলে স্বামীর হইবে। স্বামী যদি দেন, ২০০০ টাকার অধিক দিতে পারিবেন না। তবে পিতামাতা, কন্যার কষ্ট না হয় বলিয়া যে ধন দিবেন তাহা তাঁহার আপনার। পিতামাতা বা স্বামীর ধনে তাঁহার নিগূঢ় স্বত্ব নাই অর্থাৎ দানবিক্রয় ক্ষমতা নাই। কেবল যাবজ্জীবন ভোগ মাত্র। সে ভোগ আবার সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদি দ্বারা নহে। সে ধন কেবল স্বামীর পারলৌকিক কার্য্য ও অন্যান্য সৎকার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য। পিতার ধন আবার যদি দৌহিত্র থাকে তবেই পাইবেন বন্ধ্যা বা বিধবা হইলে সে ধনে তাঁহার অধিকার নাই। এইরূপে স্ত্রীলোক ধনাধিকার ও ধন উপার্জ্জনে বঞ্চিত। তথাপি তাঁহার পিতৃদত্ত যে নিজ ধন তাহাতে স্বামীরও অধিকার নাই। সে ধন স্বামী লইলে তাঁহাকে সুদ দিতে হইবে। না দিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে। আর সচ্চরিত্রা বিধবার প্রতি যদি কেহ অত্যাচার করে রাজা তাহার শাস্তি দিবেন। স্ত্রীলোকের ধনাধিকার নাই, কারণ তাহার স্বাধীনতা নাই।

বিধবার কর্ত্তব্য

মনুর মতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। স্বামীর ধন পাইলে স্বামীর পারলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। স্বামিকুলে বাস করিবে। স্বামীর বংশে কেহ থাকিতে পিতৃবংশীয়দিগকে ধনদান করিবে না। স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হইলে পিতৃগৃহ আশ্রয় করিবে। সহমরণ মনুর অনুমোদিত নহে কিন্তু মহাভারতের মধ্যে সহমরণ প্রথার বহুল প্রচার দেখা যায়। পাণ্ডু মহিষী মাদ্রী সহগমন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, মৃত বীরেন্দ্র বৃন্দের মহিষীরা অনেকে স্বামীর অনুগমন করেন। বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস এমন কি মনু ভিন্ন প্রায় সকল ঋষিরাই সহমরণের অনুমোদন করিয়াছেন এবং অনুমৃতাদিগের বিস্তর

প্রশংসা করিয়াছেন। একজন বলিয়াছেন "যে স্ত্রী সহমৃতা হয় সে স্বামীর সহস্র পাপ সত্ত্বেও স্বামী সহিত সার্দ্ধ ত্রিকোটী বৎসর স্বর্গ বাস করিবে।" পরাশর (কেহ কেহ বলেন অঙ্গিরা) আর একজন বলিয়াছেন যে, সর্পগ্রাহী ব্যাধ যেমন বলপূর্ব্বক সর্পকে গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করে, সেইরূপ সহমৃতা নারী আপন স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত স্বর্গে আমোদ প্রমোদ করে। (দক্ষ) কিন্তু সহমরণ স্ত্রীলোকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। করিলে পুণ্য ও প্রশংসা হয় মাত্র। আমরা তৃতীয় অধ্যায়েও একথার উল্লেখ করিব। সহমরণ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। উহা ভরতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের পতিপরায়ণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। সত্য বটে সহমরণ পরিণামে অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছিল, সত্য বটে দুষ্ট লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেককে জ্বলচ্চিতায় নিক্ষেপ করিত। কিন্তু এই প্রথা যাঁহাদের দৃষ্টান্তে প্রথম প্রচলিত হয় তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বামীর জন্য, পরলোকেও যাহাতে স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ না হয় সেই জন্য, আপনার জীবন স্বামীর চিতায় সমর্পন করিতেন। কলিযুগে বিধবারা বিবাহ করিতে পারিবেন ব্যবস্থা আছে।

দুষ্ট চরিত্রাদিগের দণ্ড

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীকে স্বামী সদ্যঃ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। স্ত্রী যদি গৃহকার্য্যে অবহেলা করিত বা মুক্ত হস্তে ব্যয় করিত স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। সুরাপায়িনী স্ত্রী পরিত্যাগার্হা। এই সকল স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে হইত। স্ত্রীলোক যদি পিতৃধনগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া স্বামীর অবহেলা করে এবং পুরুষান্তরকে আশ্রয় করে তবে রাজা তাহাকে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবেন এবং তাদৃশ পারদারিক পুরুষকে পোড়াইয়া ফেলিবেন। স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় তবে সে পিতৃধনে অধিকারিণী হইবে না। ব্যাভিচারিণীদিগের ইহকালও নাই পরকালও নাই। তাহারা জারজ পুত্র উৎপাদন করিয়া উভয়কুল অপবিত্র করে।

স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ।
সংকরো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্যচ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্ত পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ। ভগবদ্গীতা

স্ত্রীলোক যদি সমাজনিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করে তাহা হইলে সে ইহকালে পুরুষের ন্যায় দণ্ড পায়। আর পরোলোকে পুরুষাপেক্ষা দ্বাবিংশতি গুণ

অধিক যন্ত্রণা ভোগ করে। কৃত্তিবাস নরক বর্ণনার অবসানে বলিয়াছেন, "এ হতে বাইশ গুণ নারীর যন্ত্রণা"। মনু স্ত্রীলোকদিগের অনেক স্থানে অল্প প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন কিন্তু দুই একস্থলে অধিক ব্যবস্থাও দিয়াছেন। যাহারা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে এবং উহাদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া অধর্ম্ম পথে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করে তাহাদিগের "উত্তম সাহস" দণ্ড হয়। প্রাচীন কালে যত শাস্তি ছিল "উত্তম সাহস" দণ্ডই সর্ব্বপেক্ষা ভয়ানক।

তৃতীয় অধ্যায়

মন্তব্য কথা

পূর্ব্বপ্রস্তাবে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল এক প্রকার সংক্ষেপতঃ উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে বিস্তাররূপে ঐগুলির নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চরিত্রের বিশুদ্ধিই বিশেষ সমাদরণীয় ছিল। কার্য্যকারিণী প্রবৃত্তি অর্থাৎ উন্নতিবিষয়ে তাঁহাদের তাদৃশ আস্থা ছিল না। সর্ব্বপ্রকারে শান্তিসুখ অনুভব করা এবং প্রাণিমাত্রের দুঃখবিমোচন করাই তাঁহাদের মতে মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। শুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেন; প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেরই এই দোষ। পাশ্চত্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও স্বদেশোন্নতি, সমাজোন্নতি প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণেরা যে আপনাদিগের মধ্যে নির্দ্দোষ নির্ম্মল চরিত্রকেই অধিক আদর করিতেন, হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে তাহার আর কোন সন্দেহ থাকে না। তাঁহারা যত নিয়ম করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই কিরূপে পাপ স্পর্শ না হয় তাহারই জন্য। এখন যেমন সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই মনে স্বদেশের বা মনুষ্য সমাজের উন্নতি করিব বলিয়া আকাঙ্ক্ষা হয়, সেরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে অতি বিরল; তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহাতেও এই দোষ। স্ত্রীলোক সর্ব্ব প্রকারে পাপশূন্য হইবে, স্বামীপুত্রের অধীন হইবে, ইত্যাদি শত শত নিয়ম কেবল তাঁহাদের চরিত্রবিশুদ্ধিকামনায় মাত্র। এই সকল নিয়ম এরূপ কঠিন যে তাহা প্রতিপালন করা নিতান্ত দুরূহ। কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টে বোধ হয় যাঁহারা এই সকল কঠিন নিয়মের অধিকাংশ পালন করিয়া উঠিতেন তাঁহাদের গুরুতর দোষ সত্ত্বেও প্রশংসা হইত। তাহার এক প্রমাণ অহল্যা। তিনি চিরদিন স্বামিভক্তা এবং গৃহকার্য্যে সম্পূর্ণ মনোযোগবতী ছিলেন। তাহার পর ইচ্ছাপূর্ব্বক

ব্যভিচার পঙ্কে নিপতিতা হন।* কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এক্ষণে প্রাতঃস্মরণীয়াদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আবার দেখা যায় অনেকে এই দুরূহ নিয়ম সকল যথাযোগ্য রূপে প্রতিপালন করিয়াও স্বীয় বুদ্ধিমত্তাদিগুণে আরো অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন। দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের সেবা ও সমস্ত গৃহকার্য্য করিয়াও পাণ্ডব দিগকে সর্ব্বদাই নীতি শাস্ত্রে পরামর্শ দিতেন। বাস্তবিকও পাণ্ডবদিগের বনবাস সময়ে কৃষ্ণার ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রী আর কেহই ছিল না।

সাধ্বীদিগের শ্রেণীবিভাগ

মুনিরা যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন যাঁহারা সেই সকল নিয়ম সুন্দররূপে প্রতিপালন করিয়াছেন তাঁহারাই আমাদিগের প্রথম চিত্র। যাঁহারা কোনরূপে প্রলোভনে পতিত না হইয়া যশস্বিনী হইয়াছেন তাঁহাদের চরিত্রই আমরা প্রথম পর্য্যালোচনা করিব। তাহার পরে যাঁহারা নানাবিধ প্রলোভনে পড়িয়াও সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের জীবনাবলী বর্ণনা করিব। হিন্দুদিগের মধ্যে এই স্ত্রীস্বভাবের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পাণ্ডববধূ দ্রৌপদী রামগেহিনী সীতা এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান রূপে গণনীয়া। সাবিত্রী শকুন্তলা প্রভৃতি মহিলারা চরিত্র রক্ষার জন্য নানাবিধ কষ্ট পাইয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহাদের প্রলোভন সামগ্রী অল্পই ছিল। তাঁহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর তাঁহারা কেহই নহেন। গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের একজন সুদক্ষ মন্ত্রী হইলেও উইলিয়ম পিট অপেক্ষা অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোক; কারণ পিট অনেক প্রলোভনেও ভুলেন নাই। গ্লাডষ্টোনের সময় সে সকল প্রলোভন একেবারেই নাই।

স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম পতিসেবা। পতি তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব, তাঁহাদিগের দেবতা, তাঁহার সেবাই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য গৃহকার্য্য। গৃহস্থের যত কার্য্য আছে তাহার সমুদয়েরই ভার স্ত্রীলোকের হস্তে। সন্তানপালন স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে কোন স্থলেই উল্লেখ নাই কিন্তু মনু বলিয়াছেন—

---

*কৃত্তিবাস বলিয়াছেন অহল্যা নির্দ্দোষী; সমস্ত দোষ ইন্দ্রের। কিন্তু বাল্মীকি তাহা বলেন না। যদিও বাল্মীকির কবিতা দ্ব্যর্থ করা যায় কিন্তু টীকাকারেরা অহল্যাকেও দোষী করিয়া গিয়াছেন।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী নিবন্ধনং॥

অতএব পুত্রের পালনভারও স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পিত ছিল। ইহার পর কবিদিগের সময়ে স্ত্রীলোকের আরো একটী কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত ভদ্র পরিবারের মহিলারাই উহা শিক্ষা করিতেন। উহার নাম কলা শিক্ষা। ঋষিদিগের সময়ে লোক সকল সরল ছিল। বাবুগিরি উহাদের তত মনোমত ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে স্ত্রীলোকের যে নৃত্য গীতাদি শিখিতে হইত এরূপ কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু কালিদাসাদির সময়ে যখন আর্য্যগণ পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলাসসুখে মগ্ন হইয়াছেন তখন নৃত্যগীত ভদ্র মহিলাদিগের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তখনই কালিদাস লিখিলেন—

গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতং॥ রঘুঃ

কিন্তু মহর্ষি ব্যাস স্বকৃত সংহিতায় লিখিয়াছেন—

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যাভর্ত্তুঃ সদাভবেৎ॥

এই দুইটী বচনের মধ্যে প্রথমটীতে "প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" এই বিশেষণটী অধিক আছে। ইহাদ্বারা বোধ হইল ঋষিদিগের সময়ে নৃত্যগীত শিক্ষা চলিত ছিল না। আবার দ্বিতীয়টীতে "ছায়ে বানুগতা" এই বিশেষণটী আছে। তাহাতে বোধ হইতেছে প্রাচীন ঋষিদিগের সময়ে নারীগণ স্বামীর সহিত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন।

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল পতিসেবা গৃহকার্য্য, এবং ঋষিদিগের পর, নৃত্য-গীতাদিও, স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত ছিল। সংক্ষেপতঃ এই স্থির হইল কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে গেলে আবার সংহিতাকর্ত্তাদিগের শরণ লইতে হইবে। অষ্টাদশ খানি সংহিতার মধ্যে ৮।৯ খানি অতি স্বল্পায়তন, তাহাতে স্ত্রীচরিত্রের কোন উল্লেখ নাই। আর কয়েকখানির মধ্যে, মনু যেরূপ বৃহৎ গ্রন্থ উহাতে স্ত্রীধর্ম্ম তাদৃশ বিস্তারক্রমে কথিত হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য কয়েকটী মাত্র কবিতা গৃহস্থ ধর্ম্মের মধ্যে বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। দক্ষ, ব্যাস ও বিষ্ণু বিস্তার রূপে স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই তিন খানির মধ্যে আবার বিষ্ণুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল। বিষ্ণুর বচনে অর্থ ঘটিত কোনরূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দায়ভাগকার জীমূতবাহন বিষ্ণু সূত্র অবলম্বন করিয়াই অতি দুরূহ অপুত্র

ধনাধিকার অধ্যায় নির্ণয় করিয়াছেন। আমাদেরও সেই বিষ্ণুবচনই প্রধান আশ্রয়। স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে বিষ্ণুর বচন যথা—

১ম। স্ত্রীলোক স্বামীর সমান ব্রতচারিণী হইবেন। বিষ্ণুসূত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার নন্দ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, স্বামী যে সকল বিষয়ে সংকল্প করিবেন স্ত্রীলোকেরও সেই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। এবং স্বমত সংস্থাপন জন্য কাশীখণ্ড হইতে "যত্র যত্র রুচির্ভর্ত্তুস্তত্র প্রেমবতী সদা" এই বচনটী উদ্ধার করিয়াছেন। গোতম বলিয়াছেন ধর্ম্ম কর্ম্মে স্ত্রী স্বাধীন নহেন। বশিষ্ঠও এই কথা বলিয়াছেন এবং এতৎসমর্থক আরো এক বচন আছে যথা, "স্ত্রীভিঃ ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ"॥

২য়। শ্বশ্রূ শ্বশুর দেবতাতিথিদিগের সেবা। টীকাকার লিখিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত গুরুজনের পাদবন্দনাদি দ্বারা সন্তোষ সম্পাদনই সেবা বা পূজা শব্দের অর্থ। দেবতা শব্দে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা নহেন কারণ স্ত্রীলোক ইচ্ছামত দেবোপাসনা করিতে পারিলে ১ম বচনটীর সহিত বিরোধ হয় অতএব উহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন দেবতা "সৌভাগ্যদাত্রী গোর্য্যাদিঃ।" সৌভাগ্যই স্ত্রীলোকের গৌরবের বিষয়। যেমন বিদ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা; বলে ক্ষত্রিয়ের। সেইরূপ সৌভাগ্যে নারীর শ্রেষ্ঠতা হয়। যাহার সৌভাগ্য নাই সে স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে নাই। সৌভাগ্য শব্দের অর্থ স্বামীর ভালবাসা। স্বামী যে স্ত্রীকে ভালবাসেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৩য়। অতিথি সেবা। মনু, গৃহস্থের যে সকল প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে অতিথি সেবা একটি। উহার নাম নৃযজ্ঞ, উহাতে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। কিন্তু গৃহস্থ ত নিজে অতিথি সেবা করিতে পারেন না। উহা তাঁহার গৃহিণীর উপর ভার। গৃহিণী যদি সুন্দররূপে অতিথিসেবা করিতে পারিলেন সে তাঁহার অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। পূর্ব্বকালে গৃহস্থ মহিলারা প্রাণপণে অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। কুন্তী বাল্যকালে অতিথিদিগের সেবা করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া তাঁহার নিকট উত্তপ্ত পায়স ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুন্তী নিতান্ত অতিথি-বৎসলা; তিনি সেই উত্তপ্ত পায়সপাত্র হস্তে করিয়া ঋষিকে খাওয়াইয়া দিলেন। তাঁহার হস্ত দগ্ধ হইয়া গেল তথাপি তিনি কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। দুর্ব্বাসা তাঁহাকে বহুতর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।

৪র্থ। গৃহসামগ্রীর সুসংস্কার। কেশব বৈজয়ন্তীকার এই সূত্রের পোষক শংখ লিখিত একটী সুদীর্ঘ বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভবানীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত শংখলিখিত সংহিতার মধ্যে সে বচনটী পাওয়া যায় না। বচনের অর্থ এই।

প্রাতঃকালে পাকপাত্রের সংস্কার। গৃহদ্বার পরিষ্কার করা। অগ্নিচর্য্যার আয়োজন। গ্রাম্যাদি দেবতার পূজোপহারোদ্যোগ। স্বামীর পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শয়ন সামগ্রীর যত্নপূর্ব্বক রক্ষা। পাকক্রিয়াকৌশল, পরিবারবর্গকে পরিতোষ করিয়া আহার করান ইত্যাদি। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা বহ্নিপুরাণের একটি বচনোদ্ধার করিয়াছি তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ।

৫ম। ৬ষ্ঠ। অভুক্ত হস্ততা ও সুগুপ্ত ভাণ্ডতা। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে স্ত্রীলোকের ধনাধিকার নাই। কিন্তু স্বামীর সমস্ত ধনই তাঁহার। স্বামী সঞ্চিত ধন তিনিই রক্ষা করিবেন। আয় ব্যয়ের তিনিই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার অনভিমতে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। সকল ঋষিই বলিয়াছেন স্ত্রীলোকে ব্যয়কুণ্ঠ হইবেন। "ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া" "ব্যয়বিবর্জ্জিতা" "ব্যয়-পরাঙ্মুখী" সকল সংহিতা মধ্যেই পাওয়া যায়। যদি অধিক ব্যয় করেন স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেন। লক্ষ্মী বলিয়াছেন আমি ব্যয় কুণ্ঠিতা স্ত্রীলোকের গৃহে বাস করি। সুতরাং ব্যায়কুণ্ঠতা স্ত্রীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণিত হইবে। বাস্তবিকও যাঁহারা অল্প আয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহাদের পক্ষে, শুদ্ধ তাঁহাদিগের পক্ষেই কেন গৃহস্থ মাত্রেরই পক্ষে স্ত্রীলোকের ব্যয়কুণ্ঠতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

৭ম। "মূল্য ক্রিয়াস্বনভিরুচিঃ। এই বচনটীর প্রকৃত অর্থ অবগত হওয়া দুর্ঘট। পণ্ডিতবর নন্দকুমার বলিয়াছেন, মূল ক্রিয়ার অর্থ বশীকরণাদি কার্য্য যাহাকে আমরা এক্ষণে ডাকিনীর কর্ম্ম বলিয়া থাকি। কিন্তু বিষ্ণুর সময়ে কি লোকে ডাকিনী যোগিনী বিশ্বাস করিত? ডাকিনী যোগিনী ত তন্ত্র ও পুরাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে কি উহা দ্বারা অথর্ব্ব বেদোক্ত মারণাদি কার্য্য বুঝাইবে? তাহা হইতে পারে না, স্ত্রীলোকের ত বেদে অধিকার ছিল না। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পান, অটন, দিবাস্বপ্ন স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য নহে, করিলে দোষ হয়। বিষ্ণুর বচনে হয় ত তাহাই বুঝাইবে।

৮ম। মঙ্গলাচারতৎপরতা। মাঙ্গল্য দ্রব্য হরিদ্রা কুঙ্কুমাদি ব্যবহার করিবে। এবং বৃদ্ধ স্ত্রীলোকদিগের নিকট যে সকল আচার শিক্ষা করিবে তাহার পালনে সর্ব্বদা যত্নবতী হইবে। এই আচার গুলি শংখ লিখিত বচনে উল্লিখিত আছে। যথা না বলিয়া কাহারও বাটি যাইবে না। কোথাও যাইতে হইলে উত্তরীয় ছাড়িয়া যাইবে না, দ্রুতপদে কোথাও গমন করিবে না, পরপুরুষের সহিত আলাপ

করিবে না। বণিক্‌, প্রব্রজিত, বৃদ্ধ ও বৈদ্যকে নাভি দেখাইবে না। বিস্তৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। অনাবৃত শরীরে কখন থাকিবে না। ইত্যাদি।

৯ম। স্বামী বিদেশে গেলে শরীরসংস্কার ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবে। এস্থলে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—প্রোষিত ভর্ত্তৃকা নারী শরীর সংস্কার বিবাহ ও উৎসবদর্শন হাস্য ও পরগৃহগমন পরিত্যাগ করিবে। মনু বলিয়াছেন :— যদি স্বামী কোনরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া বিদেশে গমন করেন, তবে স্ত্রীলোক অনিন্দনীয় শিল্প কার্য্য দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় টীকাকার সংখলিখিতের একটী সুদীর্ঘবচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে সেটীর অনুবাদ করিলাম না। পরগৃহ শব্দে টীকাকার লিখিয়াছেন, পিতা মাতা ভ্রাতা শ্বশুরাদির গৃহ ভিন্ন অন্য গৃহ বুঝায়। সুতরাং স্বামী স্বদেশে থাকিলে স্ত্রীলোকেরা যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিত তাহার এক প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রোষিত ভর্ত্তৃকাদিগের কি কর্ত্তব্যকর্ম্ম তাহা যিনি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত পাঠ করিয়াছেন তিনিই সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। পতিপ্রাণা যক্ষপত্নী সংবৎসর পর্য্যন্ত একবেণীধরা হইয়া যে কষ্টে সময় যাপন করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে সকলেরই মনে করুণ রসের আবির্ভাব হয়। যখন যক্ষ রামগিরিতে মেঘকে বলিতেছেন"—

"আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলাবা
মৎ সাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুর বচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি।"

তখন বোধ হয় যেন আমরা গবাক্ষ পথে বলিব্যাকুলা দেহলী-দত্ত-পুষ্প-গণনা-তৎপরা আধিক্ষামা সেই যক্ষপত্নীকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার শরীর কৃশ, তিনি বিস্তৃত শয্যার এক পার্শ্বে শয়ানা আছেন, বোধ হইতেছে যেন প্রাচীমূলে এক খণ্ড চন্দ্রকলা রহিয়াছে। উহাতে আকাশের বিশেষ শোভা হইতেছে না, কিন্তু দেখিবামাত্র অন্তঃকরণ শোকে আপ্লুত হইতেছে।

১০ম। দ্বারদেশ গবাক্ষ ইত্যাদি স্থানে অবস্থিতি করা স্ত্রীলোকদিগের অন্যায়। কাশীখণ্ডে ইহার বিস্তার দেখিতে পাওয়া যাইবে।

১১শ। কোন কর্ম্মে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। মনু বলিয়াছেন, বালিকাই হউক, যুবতীই হউক বা বৃদ্ধাই হউক, কোন কর্ম্মেই স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছামত চলিতে পারে না। স্ত্রীলোক তিন অবস্থায় পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের অধীন হইয়া চলিবে। কোন কালেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই।

১২শ। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকে হয় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, না হয় সহগামিনী হইবে। কেশব বৈজয়ন্তী প্রণেতা নন্দকুমার এই স্থলে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়মগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। নন্দকুমার আপন মত সংস্থাপনার্থ কাশীখণ্ড হইতে বচন তুলিয়াছেন। কাশীখণ্ডের ব্রহ্মচর্য্যে ও স্মৃতিকারদিগের ব্রহ্মচর্য্যে অনেক প্রভেদ। ঋষিরা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিকে ব্রহ্মচর্য্য আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠাবস্থায় ব্রাহ্মণেরা যেরূপ শুদ্ধাচারে থাকে বিধবারাও স্বামীর মৃত্যুর পর সেইরূপ শুদ্ধাচারে থাকিবে, এই তাঁহাদের অভিপ্রায়। কিন্তু কাশীখণ্ডকার কহেন, বিধবারা ভূমিশয্যা আশ্রয় করিবে। অসময়ে আহার করিবে। পরিতৃপ্তি করিয়া আহার করিলে, তাহাদিগের নরক দর্শন হইবে ইত্যাদি। ইহার নাম ব্রহ্মচর্য্য নহে। ইহাকে সন্ন্যাস বলিলেও বলা যায়।

বিষ্ণুসংহিতা প্রায়ই সরল গদ্যে লিখিত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কবিতাও দেখা যায়। স্ত্রী ধর্ম্ম নির্ণয়ের উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয় দেখা যায়, যথা:—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপাসনং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাস ব্রতং চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে পত্যুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

এই পর্য্যন্ত বিষ্ণুসংহিতার স্ত্রীধর্ম্ম প্রকরণ শেষ হইল। এই প্রস্তাবের মধ্যে আমরা দক্ষ ও ব্যাস ভিন্ন আর সকল সংহিতারই সমালোচন করিলাম। দক্ষ সংহিতায় স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নির্ণয় নাই। কিসে স্ত্রীলোকের প্রশংসা হয়, তাহা বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে। ব্যাস সংহিতা যদিও বিষ্ণুর ন্যায় প্রাঞ্জল নহে, তথাপি বিষ্ণুর অপেক্ষা অনেক বিস্তারক্রমে স্ত্রীচরিত্র বর্ণনা আছে। আমরা এই দুই সংহিতার বচনগুলি অনুবাদ করিয়া দিয়া, তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপন করিব। পূর্ব্ব প্রবন্ধে কাত্যায়নেরও কোন কথা উল্লেখ করি নাই। কাত্যায়ন সকল সংহিতার পরিশিষ্টস্বরূপ। যে সকল স্থান অন্য সংহিতায় অস্ফুট, কাত্যায়ন তাহার বৈশদ্য সম্পাদন করিয়াছেন। আর অন্য সংহিতায় যাহার উল্লেখ নাই, কাত্যায়ন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রীর কর্ত্তব্যের মধ্যে বিদেশগত স্বামীর অগ্নিরক্ষা একটি প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সৌভাগ্য দ্বারাই স্ত্রীলোকে জেষ্ঠ্যতা লাভ করে। সেই সৌভাগ্য আবার অগ্নিরক্ষা দ্বারা লাভ হয়। আর সৌভাগ্যবতীর মুখ যদি কেহ প্রাতঃকালে দেখে তাহার সমস্ত দিন মঙ্গল হয়। দুর্ভাগার মুখ দেখিলে, সেদিন বিবাদ-বিসংবাদে পড়িতে হয়। বিষ্ণু-

সংহিতার শেষভাগে নারায়ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে লক্ষ্মি! তুমি কোন্ কোন্ স্থানে বাস কর? এই প্রশ্নের উত্তর হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি কীদৃশ স্ত্রীলোকের গৃহে থাকিতে ভালবাস? তাহাতে লক্ষ্মী উত্তর করিলেন—

নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু
অমুক্ত হস্তাসু সুতান্বিতাসু সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু।
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু বলিব্যপেতাষু বিলোলুপাসু
ধর্ম্মব্যপেক্ষিতাসু দয়ান্বিতাসু স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু ॥

উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, ব্যয়কুণ্ঠিতা, পুত্রান্বিতা, অর্থসঞ্চয়ে যত্নবতী, দেবতাদিগের পূজাপ্রিয়া, গৃহ পরিমার্জ্জনতৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহ-বিরতা, বিলোলুপা, ধর্ম্ম কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হৃদয়া, দয়ান্বিতা নারীতে আমি বাস করি। যেমন মধুসূদন আমার প্রিয়, ইহারাও সেইরূপ। অতএব আমরা এই লক্ষ্মীর বাক্যে স্ত্রীচরিত্রের এক অতি সুন্দর চিত্র প্রাপ্ত হইলাম। পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্ত্রীলোকের যে সকল অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিলে ও কলহবিরতা, পুত্রবতী, ইন্দ্রিয়সংযমবতী, দয়ান্বিতা হইলে, লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে চিরদিন বিরাজমানা থাকিবেন। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ যে সময়ে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ সংহিতাকরণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন স্ত্রীচরিত্র অতিশয় উন্নত ছিল। ঐ ঋষিগণ সত্যমাত্র আশ্রয় করিয়াই স্মৃতিসংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীচরিত্র যতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহার উত্তম উত্তম চিত্র দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিকগণ সত্যের প্রতি তাদৃশ আস্থা না করিয়া, অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন। পুরাণসম্মত উন্নত চরিত্র স্ত্রীলোক কেবল কবিদিগের মানসমধ্যে থাকিতে পারে। রক্ত মাংসময় সংসারে সেরূপ রমণী থাকিতে পারে না।

স্মৃতিসংহিতায় আর একটী উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের বিবরণ ব্যাসলিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। আমরা এই স্থলে তাহার সবিস্তার অনুবাদ করিয়া দিব।

"পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞাতি, মাতা, বয়স বিদ্যা ও বংশে সদৃশ বরে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পর পর ব্যক্তি দান করিবেন। সকলের অভাবে কন্যা স্বয়ম্বর করিবেন। * * * পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু আপনার দেহকে দ্বিধাপাটিত করেন। অর্দ্ধের দ্বারা পত্নী ও অপর অর্দ্ধের দ্বারা পতির উৎপত্তি হয়, এই শ্রুতি আছে। যত দিন পর্য্যন্ত বিবাহ না করা যায়, তত দিন পুরুষকে অর্দ্ধ কলেবর বলিতে হইবে। শ্রুতি আছে অর্দ্ধ দেহ জন্মে না কিন্তু জন্মাইতে পারে। * *** বিবাহানন্তর অগ্নি ও পত্নীর সহিত,

গৃহনির্ম্মাণ করত বাস করিবে। আপনার ধনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং বৈতান অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে দিবে না। ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গলাভে স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বদা একমনা হইবে। এবং একরূপ নিয়ম করিয়া চলিবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ত্রিবর্গ সাধনের কোন স্বতন্ত্র পথ নাই। শাস্ত্রবিধির ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়া অথবা অতি দ্বেষ করিয়াও স্বতন্ত্র পথের উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্ত্রী স্বামীর পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার দেহ শুদ্ধি করিবে। শয্যা তুলিয়া রাখিবে এবং গৃহমার্জ্জন করিবে। অগ্নিশালা ও অঙ্গনের মার্জ্জন ও লেপন করিবে। তাহার পর অগ্নি পরিচর্য্যার কার্য্য করিবে ও গৃহ সামগ্রী সকলের তত্ত্বাবধারণ করিবে * * * এইরূপে পূর্ব্বাহ্ন কৃত্য সমাপন করিয়া গুরুদিগের পাদবন্দনা করিবে এবং গুরুজন প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার সকল ধারণ করিবে। কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপরা হইবে। নির্ম্মলচ্ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত থাকিবে। স্বামীর হিতকার্য্যে সখীর ন্যায়, আদিষ্ট কার্য্যে দাসীর ন্যায় নিয়ত তৎপরা হইবে। তাহার পর অন্ন প্রস্তুত করিয়া, স্বামীকে এবং অন্যান্য ভোক্তৃবর্গকে ভোজন করাইবে। পরে স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া অবশিষ্ট যে কিছু অন্নাদি থাকিবে স্বয়ং ভোজন করিয়া দিবসের শেষভাগে আয় ব্যয় চিন্তায় নিযুক্তা থাকিবে। এইরূপ প্রত্যহ করিবে। স্বামীকে উত্তমরূপে আহার করাইবে। আপনি অনতিতৃপ্তরূপে আহার করিয়া গৃহ নীতি বিধান করিবে এবং সাধু শয়ন আস্তীর্ণ করিয়া পতির পরিচর্য্যা করিবে। স্বামী শয়ন করিলে, তাঁহারই নিকটে তাঁহারই পদে মনোনিবেশ করিয়া শয়ন করিবে।" এই পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের নিত্য কর্ম্ম গেল। ইহাতে পূর্ব্ব প্রবন্ধ হইতে কিছুই নূতন নাই। কেবল কিছু বিস্তার আছে মাত্র। ইহার পরে স্ত্রীলোকের কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় গুণের কথা উল্লেখ আছে। যথা—"স্ত্রীলোকের যেন কোন বিষয়ে অনবধানতা না থাকে। তাহার যেন মনে থাকে তাহার নিজের কোন কামনা নাই। ইন্দ্রিয় সংযমে তিনি যেন সর্ব্বদা যত্নশীলা থাকেন। তিনি কখনই উচ্চস্বরে কথা কহিবেন না। অধিক কথা কহা পরুষ বাক্য ব্যবহার ও স্বামীর অপ্রিয় কহা তাঁহার পক্ষে দূষণাবহ। তিনি যেন কাহার সঙ্গে বিবাদ না করেন এবং নিরর্থক প্রলাপ বাক্য ব্যবহার না করেন ব্যয় অধিক না করেন এবং ধর্ম্মার্থ বিরোধী কোন কার্য্য না করেন। সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে প্রমাদ, উন্মাদ, কোপ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য সাহস, চৌর্য্য ও দম্ভ পরিবর্জ্জনীয়। এই সকল পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপরা হইলে ইহকালে যশঃ ও পরকালে স্বামীর সহিত ব্রাহ্ম সালোক্য প্রাপ্তি হয়।"

ব্যাস সংহিতায় এই সুন্দর পরিস্কার দীর্ঘ বর্ণনার পর আমাদিগের আর মন্তব্য প্রকাশ বৃথা। ইহা পাঠ করিলেই স্মৃতি সংহিতাকারেরা স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী অতি বিরল হইলেও ইহার মধ্যে বহুতর গুণশালিনী রমণী প্রাচীন ভারতবর্ষে, এমন কি এখনও অনেক দেখা যায়। কতকগুলি অধুনাতন বাবুদিগের সংস্কার আছে আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম ছিল না সুতরাং এতকাল* স্ত্রীলোকে কেবল দাসীবৃত্তি ও কলহ করিয়া সময়াতিপাত করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগের একবার অন্ততঃ ব্যাস সংহিতার বচন কয়েকটী পাঠ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের হস্তে শুদ্ধ দাসীর কর্ম্ম মাত্রের ভার ছিল না তিনি আয় ব্যয়ের চিন্তা করিতেন তাহার নাম দেও-য়ানী। ব্যাস সংহিতা পাঠ করিয়া বরং বোধ হয় স্ত্রীলোক যদি দেওয়ান হইতে দাসী পর্য্যন্ত সকলেরই কার্য্য করিল পুরুষের কার্য্য কি? স্ত্রীলোকের মানসিক উন্নতি কিরূপ ছিল তাহারও কতক প্রমাণ স্মৃতি শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। ব্যাস স্পষ্ট বলিয়াছেন স্ত্রীলোকে যেন নাস্তিক না হয় এবং আর একজন বলিয়াছেন স্ত্রীলোক যেন হেতুবাদ শাস্ত্র শিক্ষা না করে। হেতুবাদ করিতে বারণ করায় ও নাস্তিক্য নিষেধ করায় স্পষ্ট অবগতি হইবে যে নারীগণ পূর্ব্বকালে হেতুবাদ করিতে শিখিত এবং অতি দুরূহ ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ বিষয়ে সময়ে সময়ে চিন্তা করিত। দক্ষসংহিতা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য বা গুণ নির্ণয়ে যত্ন করেন নাই। তিনি উহাদের প্রধান প্রধান গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। এবং সংক্ষেপতঃ উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের একটী উদাহরণ দিয়াছেন। "পত্নি যদি স্বামীর মন বুঝিয়া চলেন এবং তাঁহার বশানুগা হন তবে গৃহাশ্রমের ন্যায় আশ্রম আর নাই। তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক দ্বারাই ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ ফল লাভ হয়। যদি বর্ত্তমান সময়ে স্নেহবশতঃ স্ত্রীদিগকে স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার হইতে নিবারণ না করা যায় তবে উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় সে পশ্চাৎ কষ্টের কারণ হয়।" স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিবার কথা মনুতে উক্ত আছে আর পুরুষের ন্যায় উহাদিগকে তাড়ন করার কথাও শংখ সংহিতায় আছে। যথা—"লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈবচ। লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী শ্রীর্ভবতী নান্যথা।" এবং এই নিমিত্ত দক্ষও বলিলেন প্রথম অবধি স্ত্রীলোককে শাসন করা কর্ত্তব্য। "অনুকূলকারিণী মিষ্টভাষিণী দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা জিতেন্দ্রিয়া স্বামিভক্তা নারী দেবতা, সে মানুষী নহে।" "যাহার রমণী অনুকূলকারিণী তাহার এইখানেই স্বর্গ * * * এইরূপ পরস্পর গাঢ়ানুরাগ স্বর্গেও

* D. N. Bose's Lecture in the Students' Association.

দুর্লভ। কিন্তু যদি একজন অনুরাগী ও আর একজন অননুরাগী হয় তাহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। গৃহে বাস সুখের জন্য সে সুখের পত্নীই মুল। সেই পত্নীর বিজ্ঞা বিনয়বতী ও স্বামীর বশানুগা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদি রমণী সর্ব্বদা খিন্না হয় এবং যদি উভয়ের একমন না হয়, তাহা অপেক্ষা দুঃখ আর নাই। * * * জলৌকা কেবল রক্ত শোষণ করে কিন্তু দুষ্ট রমণী ধন, বিত্ত, বল, মাংস, বীর্য্য, সুখ শোষণ করিতে থাকে। বাল্যকালে সাশঙ্কা, আর যৌবনে বিমুখী হয় এবং আপনার বৃদ্ধ পতিকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে। অনুকূলা, মিষ্টভাষিণী, দক্ষা, সাধ্বী, পতিব্রতা রমণীই লক্ষ্মী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি নিত্য হৃষ্টমন হইয়া যথাকালে যথাপরিমাণে স্বামীর প্রীতিকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই ভার্য্যা। ইতরা জরা।”

২য় ও ৩য় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তার্থ

এতদূরে স্মৃতিশাস্ত্রীয় স্ত্রীধর্ম্ম সমালোচনা সমাপন হইল। এই সমুদায় পাঠ করিলে প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকদিগের কিরূপ সামাজিক অবস্থা ছিল এবং কি কি গুণ থাকিলে স্ত্রীলোকে প্রশংসনীয়া হইতে পারিতেন তাহা কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যাইবে। প্রথমতঃ অতি প্রাচীন কালে বিবাহের নিয়ম ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ ধৃত শ্বেতকেতু ও দীর্ঘতমার উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। আমাদের সে কথার কোন প্রয়োজন না থাকায় তাহার আলোচনা করি নাই। বিবাহের নিয়ম সংস্থাপন হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত কন্যার উপর বর মনোনীত করিবার ভার থাকিত। এবং যদিও পিতা যাহাকে হয় কন্যাদান করিতে পারিতেন তাঁহাকেও শাস্ত্রকথিত গুণশালী বরকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে হইত। অন্যকে দিলে তাঁহার পাপ হইত ও ইহলোকে অপযশঃ হইত। বর ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকের উপর যে কেবল দাস্য কার্য্য মাত্রেরই ভার থাকিত এমন নহে গৃহস্থের যে গুরুতর কার্য্য, সাংসারিক আয় ব্যয় চিন্তা ও ধনসঞ্চয় তাহার ভারও স্ত্রীর উপর অর্পিত হইত। এবং বিদেশগত স্বামীর অগ্নি রক্ষায় কেবল স্ত্রীরই অধিকার ছিল। যদিও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না তাঁহারা ইচ্ছামত সমাজাদি স্থলে যাইতে পারিতেন। তাঁহারা যদিও সর্ব্বত্র দায়াধিকারিণী হইতে পারিতেন না তাঁহাদের নিজের ধন কেহই কৌশল বা বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে পারিত না; করিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত। স্বামী যদি স্ত্রীর ধন গ্রহণ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হন, তাহা হইলে সুদশুদ্ধ টাকা রাজা দেওয়াইবেন। যদিও শাস্ত্রে কোনস্থানে স্পষ্ট লেখা নাই যে বহুবিবাহ করিও না তথাপি

বহু বিহাহের এত নিন্দা আছে যে বহুবিবাহ না করাই যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড, এক প্রকার বহুবিবাহকারীকে গালি দেওয়ার জন্য বলিলেই হয়। কালিকা পুরাণে চন্দ্রের রাজ যক্ষ্মা রোগোৎপত্তি বহুবিবাহ পাপের প্রতিফল। ধ্রুবোপাখ্যানেও বহুবিবাহের দোষ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বিধবাবিবাহ যদিও কলিযুগের জন্য মাত্র কিন্তু অন্যান্য যুগে ব্রহ্মচর্য্য মাত্র ব্যবস্থা। পৌরাণিক ঋষিরা এবং সংহিতা সমূহের টীকাকার মহাশয়েরা বিধবাদিগের যে কঠোর ব্রত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন প্রাচীন ঋষিরা তাহার দিক্ দিয়াও যান নাই। নিষ্ঠুর সতীদাহ মনুসংহিতায় পাওয়া যায় না. যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে। বোধ হয় সতীদাহ অনার্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের বাড়ী মিথিলায়, মিথিলায় অদ্যাপি অনার্য্য জাতির ভাগ অধিক। তিনি যে দেশের জন্য সংহিতা রচনা করেন, তথায় ইহার প্রচার দেখিয়া, উহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বিষ্ণুসংহিতায় নারায়ণ লক্ষ্মীসমেত দেবদেবী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। মনুর সময়ে বা বেদে বিষ্ণুর নামও নাই। সুতরাং বোধ হয়, মনুর অনেক পরে বিষ্ণুসংহিতা রচনা করা হয়, যখন রচনা হয়, তখন আর্য্য জাতীয়েরা অনেকাংশে অনার্য্যদিগের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা যে লেখা পড়া শিখিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উহাদের উপর অসদ্ব্যবহার করিলে, সে গৃহে লক্ষ্মী থাকেন না। অন্যান্য অনেক জাতির মধ্যে যেমন বিবাহ ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের জন্য, আর্য্যদিগের মতে তাহা নহে, তাঁহারা সন্তানলাভ মাত্রের জন্য বিবাহ করিতেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা অবিবাহিত থাকিতেন, কিন্তু অগস্ত ও জরৎকারু উপাখ্যান পাঠ করিলে বোধ হয়, ইঁহারা কেবল পিতৃবংশ রক্ষার জন্য বিবাহ করিয়াছিলেন।

স্মৃতিসম্মত উৎকৃষ্ট নারী চরিত্র

বিবাহ প্রথা প্রচলিত হওয়ার পর অবধি স্ত্রীলোকে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সহবাস করিতে পারিতেন না। করিলে তাঁহার ইহকালে দুরন্ত শাস্তি-ভোগ করিতে হইত, এবং পরকালে অনন্ত নরকের ভয় থাকিত। স্ত্রীলোকে স্বামীকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন। স্বামীর গৃহকার্য্য, অতিথিসৎকার, দেবপূজা ইত্যাদিতে তাহাদের আসক্ত থাকিতে হইত। স্বামী পতিত বা পলাতক হইলে, অন্য বিবাহ করিবার যদিও বিধি দেখা যায়, সে শুদ্ধ কলিযুগের জন্য। অন্যান্য যুগে স্বামী পতিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেও যে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে, তাহাকে কুক্কুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া

স্ত্রী যদি সরলস্বভাবা দয়ালু গুরুজনে ভক্তিমতী, পুত্রাদিতে স্নেহশালিনী এবং পতিপরায়ণা হইলেন, তবে তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রধানা ও পূজনীয়া বলিয়া পরিগণিতা হইতেন। হেতুবাদ ও নাস্তিক্য স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণা হইবেন। তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং হৈতুকীদিগের অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে হেতুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের ও যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগের সঙ্গ সাধু স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কোনরূপ সাহসকর্ম্মে স্ত্রীলোক কখন প্রবৃত্ত হইবেন না। স্বামী পুত্রাদির হস্ত হইতে আপনাকে স্বাধীন করিতে কখন চেষ্টা করিবেন না। সংস্কৃতে স্বৈরিণী অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী এবং ব্যভিচারিণী এক পর্য্যায়ের শব্দ। কুলটা শব্দ যদিও এক্ষণে দুই অর্থে ব্যবহার হয়, তথাপি অধুনা উহার অসদর্থই বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

অত্যন্ত অভিমান, সকল কার্য্যে অনভিনিবেশ, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ত্যাগ করিলেই স্ত্রীলোক জগতের মাননীয়া হইবেন। বঞ্চনা, হিংসা, অহঙ্কার, স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রকারে পরিহরণীয়। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ, পরদুঃখ দর্শনে কাতর হওয়া ও পরের ছন্দানুবর্ত্তন করা স্ত্রীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণনীয়। পরিষ্কার থাকা প্রাচীন ঋষিরা বড় ভালবাসিতেন। তাঁহাদের ঋষিপত্নিরাও সর্ব্বদা আপন শরীর ও গৃহদ্বার ও তৈজসপত্র পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। অপরিষ্কার ও অশুচি গৃহে লক্ষ্মী কখনই আসেন না এই তাঁহাদের সংস্কার। স্ত্রীলোক যে অলঙ্কারপ্রিয় হয় তাহা ঋষিরা সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের আত্মীয় বান্ধব ও অভিভাবকেরা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে অলঙ্কারাদি দান করিয়া সন্তুষ্ট রাখিবেন। কিন্তু তাঁহারা আরও নিয়ম করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকে নিজে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। ব্যয়কুণ্ঠতা স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ বলিয়া তাঁহারা নানা স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্ম বিষয়ে স্বামী ও স্ত্রীর ঐকমত্য অতীব প্রয়োজনীয়। যদি স্বামী শাক্ত হন ও স্ত্রী বৈষ্ণবী হন, তাহা হইলে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলা ঘটে এদেশীয় কাহারই অবিদিত নাই। এজন্য ঋষিরা নিয়ম করিয়াছেন (এমন কি বিষ্ণুর প্রথম সূত্রই এই) যে, স্ত্রীলোক স্বামীর সমান ব্রতকারিণী হইবেন। যেমন অন্যান্য বিষয়েও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, সেইরূপ ধর্ম্ম বিষয়েও তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। মুনিরা যেমন সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর ভালবাসা স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, লজ্জাশীলা গৃহকার্য্যতৎপরা পতিপরায়ণা স্ত্রীলোকের স্বামী হওয়াও অল্প পুণ্যের বলে হয় না। স্ত্রী যদি বাধ্য ও বশীভূত হইলেন, তবে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে প্রভেদ কি ? যদিও তাঁহারা স্ত্রীলোককে সৎস্বভাব শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু মনু

বলিয়াছেন, সদ্ব্যবহার দ্বারা, যাহাতে স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছায় আপন আপন কার্য্য করিতে যত্ন করে তাহাই করিবে। যদি তাহারা আপন ইচ্ছায় না করে, তবে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক কে সুনীতি শিক্ষা দিতে পারে? "কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধা রমণী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিবেন, সখীর ন্যায় হিত কর্ম্মে তৎপরা হইবেন দাসীর ন্যায় আজ্ঞা পালনে যত্নবতী হইবেন।" কেহ যে বলিয়াছেন কলহ করা আমদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকের কার্য্য সেটী তাঁহার অন্যায় বলা হইয়াছে, যেহেতু শাস্ত্রে কলহবিরতাদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রিয়বাদিনী ও কলহশূন্যা রমণী লক্ষ্মীর আবাস ভূমি।

পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আমাদের দেশে অদ্যাপি ভোগের জন্য বিবাহ করা হয় না; বংশরক্ষাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঋষিগণ স্ত্রী ও স্বামীর সম্বন্ধ আরো দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পাপ পুণ্যের অংশভাগী। এরূপ নিয়ম আর কোথাও নাই। নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর আবার সেই দুই শরীর এক হইয়া যায়। "অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি" এই শ্রুতি। স্বামীর সুকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হয়েন স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন।

প্রথম অধ্যায়ে যেরূপ নারী চরিত্রের তুলনা ঔৎকর্ষ বর্ণনা করা গিয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিলে স্মৃতিকারদিগের নারীচরিত্র কোন অংশেই ন্যূন নহে। স্নেহ প্রবৃত্তির উপর ব্যাসের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। দয়া, পতিভক্তি, পিতৃভক্তি, অপত্য-স্নেহ যতই অধিক থাকিবে ততই তাহাদের চরিত্র অধিক উৎকৃষ্ট হইবে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি বিষয়ে ঋষিরা কোন মতেই অসম্মত নহেন। তাঁহারা সংসারের আয়ব্যয় চিন্তার ভার স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন এবং বহুতর উঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া উঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা বিলক্ষণ উত্তেজিত করিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা নাই। সুতরাং স্বাধীনতা থাকিলে যে সকল মনোবৃত্তির আবির্ভাব হয় তাহার একটীও উঁহাদের নাই। এমন কি ধর্ম্ম বিষয়েও স্ত্রীলোকেরা আপন আপন মতানুসারে কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং যে ধর্ম্মনিষ্ঠতার জন্য বহুতর ইউরোপীয় নারী বিখ্যাতা হইয়াছেন সে প্রবৃত্তি উঁহাদের প্রবল হইতে পায় নাই। জন হাউর্ডের গৃহিণী স্বামীর সহিত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া যেরূপ পরহিত ব্রতে সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছেন তাদৃশ রমণী আমাদের দেশে একটীও দেখা যায় না। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে পারেন না। সুতরাং যে সকল গুণে কুইন এলিজাবেথ বিখ্যাত হইয়াছেন আমাদের দেশীয় রমণীদিগের সে গুণ থাকা অসম্ভব।

কুশী নগরের সন্নিকটস্থ কানন মধ্যে শাক্যসিংহ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত এবং তাহাতে মৃত্যু যন্ত্রণার লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। চতুর্দ্দিকে স্থবিরমণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সকলেরই মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর—দৃশ্যটী দেখিলে বোধ হয় যেন দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কানন নিস্তব্ধ, চরাচর নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিক গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, এমত সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন "ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এবং মার্গ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে তবে তাহা এই সময় ভঞ্জন করিয়া লও," ভগবান বারত্রয় এই কথা বলিলেন কিন্তু কেহই তাহার প্রত্যুত্তর করিল না, ভিক্ষুবৃন্দ নিস্তব্ধে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বুদ্ধদেব পুনর্ব্বার বল্লিলেন, "হে ভিক্ষুবৃন্দ! আমি তোমাদিগকে এই শেষবার উপদেশ দিতেছি যে পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর এজন্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় জীবনক্ষেপ কর।" তিনি এই শেষ বাক্য বলিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসার পরিত্যাগ করিলেন। ভগবানের মৃত্যুর পর অর্হতগণ কহিলেন বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবানের মৃত্যুর বহুকাল পর একদা নাগসেন মগলাধিপতি মহারাজ মিনিন্দকে* কহিলেন "বহুগুণসম্পন্ন ভগবান্ জীবিত আছেন।" তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন "তবে তিনি কোথায়?" আচার্য্য নাগসেন কহিলেন "ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর জন্মগ্রহণ করিয়া ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। তিনি এখানে, সেখানে বা অন্য কোন স্থানেই বর্ত্তমান নাই। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে তাহা কি এখানে বা সেখানে আছে বলা যাইতে পারে? এইরূপ আমাদিগের ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত

---

*ইনি যোন বা যবন রাজ মিনিন্দ (Bactrian King Menander) ভারতবর্ষীয় কোন কোন স্থলে ইনি খ্রীষ্ট জন্মের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য করিয়াছিলেন। দেবামানস্থির (Demetrius) ইহার পারিষদ ছিলেন। মিনিন্দের সহিত নাগসেনের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর পালিভাষায় "মিনিন্দপঞ্হে" লিখিত আছে।

হইয়াছেন। তিনি চিরকালের জন্য অস্তগত হইয়াছেন, আর উদিত হইবেন না। তিনি আর কোন স্থলেই বর্ত্তমান নাই কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্ম্মচক্রে বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার সেই প্রদর্শিত ধর্ম্ম মধ্যেই তিনি সজীব রহিয়াছেন।” আমরা এক্ষণে বুদ্ধদেবের সেই পবিত্র ধর্ম্মের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সারাংশের আলোচনা করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে অন্য অন্য বিষয় আমাদিগের স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে।

ভগবান শাক্যসিংহের প্রধান বিহার স্থান শ্রাবস্তী।* তথা হইতে তিনি সকল লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, এজন্য উহার অপর নাম ধর্ম্মপত্তন। এই স্থলেই সকল লোক তাঁহার উপদেশ-কদম্ব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন কি দেবতারাও তাঁহার ধর্ম্ম ঘোষণা শ্রবণে আনন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে এইরূপ উক্তি দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন।

“উৎপন্নো লোক প্রত্যোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্করঃ।
“অন্ধীভূতস্য লোকস্য চক্ষুর্দাতা রণঞ্জহঃ।”
“ভগবান্ জিতসংগ্রামঃ পুণ্যৈঃ পূর্ণ মনোরথঃ।”
“সম্পূর্ণৈঃ শুক্লধর্ম্মৈশ্চ জগন্তি তর্পয়িষ্যসি।
“চিরম্ সুপ্তমিমং লোকং তমঃস্কন্ধাবগুণ্ঠিতং।”
“ভবান্ প্রজ্ঞা প্রদীপেন সমর্থঃপ্রতিবোধিতুং।”
“চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে।”
“বৈদ্যরাট ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্ব্বব্যাধি প্রমোচকঃ।”
“ভবিষ্যন্ত্যক্ষণাঃ শূন্যাস্ত্বয়ি নাথে সমুদ্গতে।”
“মনুষ্যাশ্চৈব দেবাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুখান্বিতাঃ।”
“পণ্ডিতাশ্চাপ্যরোগাশ্চ ধর্ম্মশ্রেষ্ঠন্তি চেপিতে।” ইত্যাদি

অর্থাৎ “আপনি লোক ভাস্কর, লোকনাথ এবং অন্ধীভূত লোক সকলের চক্ষুদাতা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন, কামজয়ী, পূর্ণ মনোরথ, এবং আপনি এই জগৎ শুক্লধর্ম্ম ‡ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। জগৎ

---

* মহাভারতে লিখিত আছে শ্রাবস্তী ইক্ষাকুবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী। মনুপুত্র ইক্ষাকু হইতে অষ্টম পুরুষ শ্রাবস্তক উহার নির্ম্মাতা যথা মনু—ইক্ষাকু—শশক—ককুৎস্থ—আননাঃ—পৃথু—বিশগশ্ব—অদ্রি—যুবনাশ্ব—শ্রাব—শ্রাবস্তক—এই শ্রাবস্তক রাজা উহা স্বনামে বিখ্যাত করিয়া দক্ষিণ দিকে স্থাপন করেন।

“অদ্রেস্তু যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্তাত্মজোভবেৎ।”
তস্য শ্রাবস্তকো জ্ঞেয়ঃ শ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা।” (বনপর্ব্ব)

‡ শুক্লধর্ম্ম অর্থাৎ অহিংসা ধর্ম্ম। অহিংসা ধর্ম্মের শুক্ল সংজ্ঞা বৌদ্ধ ভাষার অন্তর্গত নহে। ইহা সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত। বেদ হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ ব্যাস, তৎপরে পতঞ্জলি, ইহার ব্যবহার করিয়াছিলেন।

বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞাত নিদ্রায় অভিভূত আছে, তমঃ রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন আছে—আপনি ইহাকে জ্ঞানালোক বিস্তার দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ। এই জীবলোক ক্লেশ ব্যাধিতে প্রপীড়িত আছে দেখিয়া আপনি বৈদ্যরাজ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন আপনার দ্বারাই এই জীবলোকের সকল পীড়ার অন্ত হইবে, এই জীবলোক এতকাল চক্ষুহীন হইয়াছিল, আপনি উদিত হওয়াতে তাহারা সচক্ষু হইবে, কি দেব, কি মনুষ্য সকলেই সুখী হইবে। যাহারা আপনার এই ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করে, তাহারা পণ্ডিত হয় এবং গতব্যাধি হয়।" ইত্যাদি

ধ্যান নিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট শাক্যসিংহ ভাবিলেন, হায় কি কষ্ট! এই জীবলোক কেবল কষ্টময়। জন্মাইতেছে—বাঁচিতেছে—মরিতেছে—চ্যুত হইতেছে ইত্যাদি—লোক সকল এই মহা দুঃখ স্কন্ধের মধ্য হইতে নিসৃত হইতে জানে না এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ নাশক্রিয়া অবগত নহে। এই গভীর চিন্তার পর শাক্যসিংহ ভাবিলেন "কি হেতু জরামরণ হয়। জরামরণং কিং মূলকং?" এই প্রশ্নোদয়ের পরক্ষণেই উদয় হইল "জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণং।" জাতি সত্তাই জরামরণের কারণ। "কিং মূলকং জাতিঃ?" জাতির মূল কি? "জাতির্ভবতি ভব প্রত্যয়া।" ভব অর্থাৎ উৎপত্তিই জাতির মূল। এইরূপ উৎপত্তির বীজ উপাদান, (অর্থাৎ পৃথিবী ধাত্বাদি) উপাদানের মূল তৃষ্ণা—তৃষ্ণার মূল বেদনা—বেদনার মূল স্পর্শ—স্পর্শের বীজ ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের বীজ নামরূপ—নামরূপের বীজ বিজ্ঞান—বিজ্ঞানোৎপত্তির বীজ সংস্কার—সংস্কারের বীজ অবিদ্যা।* দুঃখ স্কন্দের এই হেতু ভাব অবগত হইয়া বোধিসত্ত্ব, ঐ হেতু ভাবের উচ্ছেদ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল যে "অবিদ্যায়া মসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্তি অবিদ্যানিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ। সংস্কার নিরোধাদ্বিজ্ঞাননিরোধঃ। যাবজ্জাতি নিরোধাজ্জরা মরণ শোক পরিদেব দুঃখ দৌর্ম্মনস্যোপায়াংশা নিরুধ্যন্তে। এবমস্য কেবলস্য মহতো দুঃখ স্কন্দস্য নিরোধো ভবতীতি। ইতিহি ভিক্ষবো বোধি সত্বস্য পূর্ব্ব মশ্রুতেষু ধর্ম্মেষুযোৎনিশো মনশিকো বাহুল্যোকারাজ্ঞান মুদপাদি চক্ষুরুদপাদি—বিদ্যোদপাদি ভুবিরুদপাদি—মেধোদপাদি প্রজ্ঞোদপাদি আলোকঃ প্রাদুর্বভূব—অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তি নিরুদ্ধ হয়; এইরূপে ক্রমে সমস্ত দুঃখ স্কন্দ

* পালিভাষার দ্বাদশ নিদানের মতও এইরূপ যথা "অবিজ্য পসসের সখার, সখার পসসের বিন্নানম্, বিন্নানপসসের নামরূপম্, নামরূপপসেসর ষড়ায়তনম, ষড়ায়তন পসসের ফাসসো ফাসসপসেসর বেদনা, বেদনা পসসের তবিণা, তবিণা পসসের উপাদানম্ উপাদান পসসের ভাবো, ভাবপসেসর জাতি, জাতিপসসের জরামরণম্ শোকা পরিদেব দুঃখ" ইত্যাদি।

নিরুদ্ধ হইতে পারে। অতএব দুঃখ নিরোধের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ হইলে সুখ দুঃখাদি থাকে না, আত্মাও থাকে না, একবারে অভাব হইয়া যায়। শাক্যসিংহ এইরূপ চিন্তার চরম ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি "জরা মরণ বিঘাতী ভিষক্বর" বলিয়া খ্যাত হইলেন।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য দার্শনিকদিগের মধ্যে যেমন জগতের মূল তত্ত্ব কোন মতে ২৫, কোন মতে ১৬, কোন মতে ৭—তেমনি পুরাতন বৌদ্ধদিগের মতে জগতের মূলতত্ত্ব ২, চিত্ত ও ভূত। চিত্ত হইতে পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈত্তপদার্থ, ভূত হইতে ভৌতিক পদার্থ, এই উভয়বিধ পদার্থ দ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তর ঘটিত সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে।

"ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্তঞ্চ" (শঙ্করাচার্য্যকৃত বুদ্ধ বাক্যং)

"খর স্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাস্তে পৃথিবী ধাত্বাদয়শ্চত্বারঃ"

বুদ্ধদেবের মতে ভূত ৪টী, ইনি মূল পদার্থকে ধাতু শব্দে উল্লেখ করিতেন। তদনুসারে পৃথিবী ধাতু, আপ্যধাতু, তেজোধাতু, বায়ুধাতু। এই চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণু সত্তা বৌদ্ধদিগের মতে হইতেছে। আকাশ কোন পদার্থ নহে। আবরণাভাব অর্থাৎ যেখানে কিছু নাই, সেই অবকাশময় স্থানের নাম আকাশ, তাহা কোনও পদার্থ নহে।

উক্ত চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণুর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবী ধাতু খর অর্থাৎ কঠিন স্বভাব। পৃথিবীর স্বভাবেই বস্তুতে কাঠিন্য জন্মে। আপ্যধাতু স্নেহ স্বভাবাপন্ন তেজোধাতু উষ্ণস্বভাব বায়বীয় পরমাণু ঈরণ অর্থাৎ চলনশীল "অন্যদপি স্বভাব্যমন্তরা শ্রুতেষাম্" উক্ত ঐ প্রকার স্বভাবাপন্ন ৪ প্রকার ধাতুর অন্য প্রকার স্বভাবও আছে। তাহা আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া ধর্ম্মবত্তাদি অনেক প্রকার। এই ৪ প্রকার পরমাণু রাশির ন্যূনাধিক ও তারতম্য ভাবে সংহত হওয়ার নাম স্থূল সৃষ্টি। ইহা ভূত হইতে জন্মলাভ করে বলিয়া ভৌতিক নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ভূত ভৌতিক সমুদায় জগতের এক অবয়ব। অবশিষ্ট অবয়ব পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈত্ত পদার্থ দ্বারা পূরণ হয়। যথা—

"রূপ বিজ্ঞান বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার সংজ্ঞকাঃ পঞ্চ স্কন্ধাশ্চিত্ত চৈত্তাত্মকাঃ"

(শঙ্করাচার্য্যধৃত বুদ্ধ বাক্য)

সবিষয় ইন্দ্রিয়কে রূপ স্কন্ধ বলে (বিষয় সকল বহিঃস্থ হইলেও অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় দ্বারাই উহার উপলব্ধি।) বাহ্য বস্তু কিছু নাই, সমস্তই অন্তঃস্থ বিজ্ঞান ধাতুর পরিণাম এই মতের উত্থান এই স্থান হইতেই হইয়াছে।

"অহ মহমিত্যালয় বিজ্ঞানং রূপাস্কন্ধ:"

আমি আমি, আমার আমার, এবং প্রকার অহং ভাবাপন্ন সর্ব্বদা উৎপন্ন জ্ঞান প্রবাহের নাম বিজ্ঞান স্কন্ধ। সুখ দুঃখাদির অনুভব হওয়ার নাম বেদনা স্কন্ধ। ইহা গো, ইহা মহিষ, উহা অশ্ব, এই প্রকার ভেদ ব্যবহার সম্পাদক নাম বিশিষ্ট বিকল্পাত্মক প্রতীতির নাম সংজ্ঞা স্কন্ধ। রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ইত্যাদি আন্তরীণ ভাবসমূহকে সংস্কার স্কন্ধ বলে। (বৌদ্ধ মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কেবল চিত্তগত সংস্কার মাত্র)

"বিজ্ঞানস্কন্ধশ্চিত্ত মাত্মাচ অন্যচ্চত্বারস্কন্ধাশ্চৈত্তাচ সকললোকযাত্রা নির্ব্বাহকা:"

উক্ত পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে যেটী বিজ্ঞান স্কন্ধ, তাহার অপর নাম চিত্ত এবং আত্মা। অপর ৪ স্কন্ধের নাম চৈত্ত।

এই মতে আত্মার নিত্যতা নাই, স্থিরতাও নাই। জগতের সকল ভাবই ক্ষণিক, তবে স্থির বলিয়া প্রতীতি হয় তাহা প্রবাহের শক্তিতে। বর্ত্তমান দেহে প্রতিক্ষণেই স্রোতের ন্যায় বিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে। যদি মধ্যে ব্যবধানকাল থাকিত তাহা হইলেই প্রতীতি হইত, ব্যবধান নাই বলিয়াই যেন বাল্য হইতে মরণ পর্য্যন্ত এক আত্মাই ভোগ করিতেছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

"ত্রয়োদন্তং সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ"

(শঙ্করাচার্য্যধৃত বোধিচিত্ত বিবরণ)

আর্য্যদিগের মতে যেমন ভাব বিকার ৬, বৌদ্ধদিগের মতে ভাববিকার বিংশতিরও অধিক। যথা—

"অবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং নামরূপং
ষড়ায়তনং স্পর্শো বেদনাতৃষ্ণোপাদানং
ভবোজগতি জরামরণং শোক:পরিবেদনা
দুঃখং দুর্ম্মনস্তাইত্যেবং জাতীয়কাইতরেতর
হেতুকাঃ—(শঙ্করাচার্য্যধৃত বৌদ্ধ সূত্রম্)

ক্ষণিক বস্তুতে স্থিরত্ব বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। জগতের সকল পদার্থই ক্ষণিক, কিন্তু ও ১০০ বৎসর ও ১০ বৎসর আছে বা থাকিবে ইত্যাদি বুদ্ধিই আমাদের অবিদ্যা (এই অবিদ্যায় রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে—পশ্চাৎ সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কার বিজ্ঞানকে জন্মায়। গর্ভস্থ আলয় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান। এই আলয় বিজ্ঞান ক্রমশঃ শরীরস্থ ৪ প্রকার ধাতু উপযুক্ত তাপে সংহত করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্বভাব প্রকাশ করিয়া পরস্পরকে পরিপাক করে। তৎপরে রূপ

নিষ্পত্তি অর্থাৎ শুক্র শোণিতের নিষ্পত্তি হয়। এইরূপে নামরূপ শব্দে গর্ভস্থ সকল বুদ্বুদপে অবস্থা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপরে ষড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান ৪ ধাতু ও রূপ এই দুইটির সংযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম ষড়ায়তন। নাম, রূপ, ও ইন্দ্রিয় এই তিনের সংযোগ হওয়ার নাম স্পর্শ। স্পর্শ হইতে সুখাকারা বেদনা, বেদনা হইতে বিষয়তৃষ্ণা, বিষয়তৃষ্ণা হইতে প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম, এই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে জাতি অর্থাৎ নানা দেহোৎপত্তি। এতদূরে পঞ্চস্কন্ধ উৎপত্তির কথা বলা হইল। এই উৎপন্ন পঞ্চ স্কন্ধের পরিপাক হয়, সেই পরিপাকের নাম বার্দ্ধক্য (ইহাকে জরাস্কন্ধ বলে।) তৎপরে নাশ হয়। অর্থাৎ যে বলে স্কন্ধ সমুদয় সংহত ছিল সে বলের লয় হইলে সকলই লয় হইল—থাকিল সেই মূল ধাতু মাত্র। ঐরূপ নাশ হইলে তৎপ্রতি স্নেহ ভাবাপন্ন জীবের অন্তর্দাহ জন্মে। এই অন্তর্দাহের নাম শোক। শোক উপস্থিত হইলে "হা পুত্র!" বলিয়া বিলাপ করে। এই বিলাপের নাম পরিবেদনা। যাহা ইষ্ট নয়, অর্থাৎ মনের অনুকূল নয়, তাহার অনুভব হওয়ার নাম দুঃখ। এই দুঃখ হইতে দুমনস্তা অর্থাৎ মনোব্যথা জন্মে। এতদ্ভিন্ন মান অপমান প্রভৃতি বিকারান্তর জন্মিয়া থাকে।

এই সকল গুলি পরস্পর পরস্পরের হইয়া হেতু সদ্ভাবে অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ যেমন অবিদ্যা সংস্কার উৎপত্তির প্রতি হেতু, তেমনি আবার সংস্কারও অবিদ্যান্তর উৎপত্তির হেতু। এইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধগণ জগৎপরীক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভোক্তা আত্মা নাই। বিজ্ঞানই আত্মা এবং বিজ্ঞানই আত্মার ভোগ্য। বিজ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর এজগতে নাই। এই বিজ্ঞান নিরোধের নামই মুক্তি। ক্ষণিকত্ব বুদ্ধি জন্মাইবার নিমিত্ত বৌদ্ধেরা ধ্যান করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগের দর্শন শাস্ত্রীয় ভাষার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৌদ্ধদর্শন	আর্য্যদর্শন (গৌতমাদি)
খর	কাঠিন্য
ধাতু	ভূত
হেতুক	প্রকার
প্রত্যয়	কারণ
আলয় বিজ্ঞান	গর্ভস্থজীবের প্রথম জ্ঞান
পুদ্গল	দেহ

প্রতীত্য প্রতীয় হেতুক	কার্য্য
ভাব উৎপাদ	উৎপত্তি
নিরোধ	ধ্বংস
প্রতিসংখ্যা নিরোধ	হনন
অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ	স্বয়ং বিনাশী
আবরণাভাব	আকাশ
সন্তানী	হেতুক ফলভাব
সন্নিশ্রয়	অধিকরণ
জীব	”
অজীব	ভোগ্য
আশ্রব	বিষয় প্রবৃত্তি
সংবর	যম নিয়মাদি
নির্জ্জর	প্রায়শ্চিত্ত
বন্ধ	কর্ম্ম
মোক্ষ	কর্ম্মনাশ
অস্তিকায়	তত্ত্ব বা পদার্থ
ঘাতিকর্ম্ম	শ্রেয়ঃ প্রতিবন্ধক
ভঙ্গিনয়	যুক্তিরীতি

ইত্যাদি

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর (৫৪৩ খৃঃ জন্ম গ্রহণের পুর্ব্বে) তদীয় কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ শিষ্য অভিধর্ম্ম, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সূত্র, এবং উপালী নামক শূদ্র বিনয় নামক বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। এই "রত্ন ত্রয়ে" শাক্যসিংহের সমুদায় বাক্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধদিগের মূল গ্রন্থ এবং ইহাতেই বুদ্ধদেব সংসার মধ্যে সজীব রহিয়াছেন, এই গ্রন্থ ত্রিতয়ের প্রত্যেক বাক্য ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য বলিয়া সাদরে ভিক্ষুমণ্ডলী গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধ ঘোষ কহেন "এসকল বুদ্ধবচন, এজন্য ইহার সকল অংশই অপরিবর্ত্তনীয় কেন না বুদ্ধদেব ইহার মধ্যে একটী বাক্যও বৃথা ব্যবহার করেন

নাই।" এই "রত্নত্রয়" সূত্র, নিয়ম, অভিধর্ম্ম, ত্রিবিধ গ্রন্থকে ত্রিপিটক কহে, পালিভাষায় উহার নাম 'তিপিটকম্।' ভিল্‌সাস্তুপ গ্রন্থকার কনিংহাম সাহেব কহেন বিনয় ও সূত্রপিটকে শ্রাবক ও সাধারণ বুদ্ধমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল এজন্য উহা প্রাকৃত এবং অভিধর্ম্মপিটক বোধিসত্ত্বগণকে বলা হইয়াছিল, উহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সমুদায় পালেয় বা পালি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, কেননা বুদ্ধদেব মাগধী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন নাই। তিনি ভিক্ষুবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন "আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি,ঠিক সেইরূপ ভাষা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।" সুতরাং ইহা নিঃসংশয় স্থির হইতেছে ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং ইহার টীকাকারও কহেন "বুদ্ধবাক্য সকল সকণিরুত্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত।" মহাবংশের লিখনানুসারে স্বভূতিনামক সিংহল দেশীয় বৌদ্ধাচার্য্য অনুমান করেন ত্রিপিটক্ শ্রুতির ন্যায় পূর্ব্বে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল তৎপরে অনুমান খৃষ্টজন্মের ১০০ একশত বৎসরের পূর্ব্বে ভট্টগমনীয় রাজ্যকালে গ্রন্থবদ্ধ হইয়া লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ৩০৭ খৃঃ পূঃ মহারাজ মহেন্দ্র ত্রিপিটক ও তাহার অর্থ কথা সিংহল দ্বীপে প্রচার করেন এবং তিনি সাধারণ বৌদ্ধগণের জন্য তাহার সিংহলীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সিংহলীয় ভাষায় অনুবাদ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ চারিশত খৃষ্টাব্দে ইহার পুনরায় পালি অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা সিংহল ও ব্রহ্ম দেশে প্রচলিত আছে। বিনয়পিটকে শাক্যসিংহের জীবনচরিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুবৃন্দের নিমিত্ত সর্ব্বসৎকর্ম্ম-পদ্ধতি লিখিত আছে, সূত্রপিটক বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বিবিধ আখ্যান পরিপূর্ণ এবং অভিধর্ম্মপিটকে বিজ্ঞানাদি ঘটিত বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ত্রিপিটকের গ্রন্থ বিভাগ যথা।

বিনয় পিটকম্।

পরাজিকা, পাসিত্তি, মহাবগ্‌গো, স্থূলবগ্‌গো, পরিবারপাঠো।

সুত্ত পিটকম্।

দীঘঘ নিকেয়, মঝ্‌ঝি নিকেয়, সামুত্ত, অঙ্গুত্তর নিকেয়, ক্ষুদ্দক নিকেয়। শেষোক্ত গ্রন্থ নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত—খুদ্দক পাঠো, ধম্মপদম্ উদানমইতিবুত্তকম্ সুত্তনিপাত, বিমানবাথ, পেট বাথ্, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতকম্, নিদ্দেশো, পতিসম্ভিদ মাগ্‌গ, আপাদানম্, বুদ্ধবংশ, সারিয়পিটকম্।

অভিধর্ম্ম পিটকম্।

ধম্মসঙ্গনি, বিভাঙ্গম, কথাবাথ্, পুগগল পান্নত্তি ধাতুকথা, যমকম্, পাঠনম্ ॥

নির্ব্বাণ কামনাই বৌদ্ধজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্যই তাহারা শারীরিক নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে এবং শাক্যসিংহ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, বৌদ্ধগণকে একমাত্র নির্ব্বাণ লাভ করিতে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই কষ্টদায়ক। সাংকার্য্যদ্বারা পুনর্জ্জন্ম না হইয়া নির্ব্বাণ লাভ হয় তাহাই বৌদ্ধগণের পরম সুখ। বৌদ্ধশাস্ত্র কহে—"জিঘ্‌ঘচা চরম রোগ সঙখার পরম দুখ। এতম্ নত্য যথা ভূতম্ নির্ব্বাণম্ পরমম্ সুখম্'। অর্থাৎ যেমন ক্ষুধা রোগ অপেক্ষাও কষ্টদায়ক সেই মত জীবন দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক কিন্তু একমাত্র নির্ব্বাণই পরমসুখ। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত অর্হতগণকে এই সকল গুণবিশিষ্ট হইতে হইবেক যথা দানশীল, কান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বন, প্রণিধি, জ্ঞান, ইহাকে পারমিতা কহে। বৌদ্ধেরা নাস্তিক, তাহাদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থে ঈশ্বরের নামমাত্র উল্লেখ নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থমধ্যে আদিবুদ্ধশব্দের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ তাহার অর্থ ঈশ্বর অনুমান করেন কিন্তু সেটী ভ্রম, উহার অর্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের দীপঙ্করাদিবুদ্ধ। বুদ্ধের নীতি অতি পবিত্র, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। তত্ত্ববিৎ কাণ্ট ও কোমৎ, যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ শাক্য সিংহের মুখ হইতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিনির্গত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জ্যোতি ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক সুসভ্য জাতির হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছিল। একসময় "ওঁ মণি পদ্মেহুঁ" এই মন্ত্রে পৃথিবী কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে যবন জাতি আমাদিগকে এক্ষণে অসভ্য অর্দ্ধশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, সেই জাতির পিতামহ গ্রীকগণ আমাদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতেন।*" আমরা সেই আর্য্য জাতি। এবং ভারতবর্ষের মৃত্তিকা হইতে সকল জ্ঞান বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, কিন্তু সেদিন কোথায়! "তেহি নো দিবসা গতাঃ" সেদিন গত হইয়াছে! আমাদিগের সেই অসীম বুদ্ধিবল কালের তরঙ্গে চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া হৃদয় শোকে আপ্লুত হইয়া উঠিল, সুতরাং অদ্য এই পর্য্যন্ত।—

শ্রীরামদাস সেন।

---

* যোনধর্ম্ম রক্ষিত অল সেনন্দা নগর হইতে ১৫৭ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে সিংহল দ্বীপে ধর্ম্ম প্রচার জন্য গমন করিয়াছিলেন। যথা—মহাবংশ "যোনান নগরা সন্দ যোণ মহাধম্ম রক্ষিতো" ॥*॥—

রম্য উপবনে রম্য জলাশয় ধারে
দেখিনু কে যেন একা রয়েছে বসিয়া
পাগলের মত বেশ
পাগলের মত কেশ
পাগলের মত কর ভূতলে পাতিয়া
একদৃষ্টে বারিপানে রয়েছে চাহিয়া।

কভু কাঁদে কভু হাসে
কভু বা করুণ ভাষে
অনুরাগে গলে যেন সম্ভাষি কাহারে
আপন মনের কথা—
আপন মরম ব্যথা—
কত মতে কত ভাবে জানায় তাহারে।

সহসা সে ভাব গত,
আবার পূর্ব্বের মত,
একদৃষ্টে বারিপানে চাহে হেরিবারে—
না জানি কি খনি-যোনি
অমূল্য রতন-মণি—
না জানি কি বিধি-নিধি সে জল মাঝারে ;—
না মিলে ডুবিলে যাহা সংসার পাথারে।

বিজন প্রদেশ সেই বিজন কানন !—
সকলি পাদপময়—অতি সুশোভন !—
বিটপে বিটপী নত,
তাহে পুষ্প নানা মত,
একটীও ফল কিন্তু না করে ধারণ
একটি মুকুল নাহি হয় কদাচন।

কেবলি কুসুম ফুটে,
কেবলি সুবাস ছুটে,
কেবলি ঝরিয়া পড়ে বনের রতন
কে করে গৌরব তার—কে করে যতন।

বসি পাখী ডালে ডালে
এক সুরে এক তালে
মধুর করুণ কণ্ঠে গায় অনুক্ষণ
বিচিত্র বিহঙ্গ তারা বন আভরণ !—

বন ছাড়ি নাহি যায়,
বনেতেই সুখ পায়,
বনের বরণ পাখী বনের মতন,
সেই তার সুখ-ধাম—সেই নিকেতন।
তথায় সমীর অতি করুণ নিস্বন।—

অবিরত কাঁপাইছে তরুলতা গণ ;—
অবিরত বহিতেছে,
সুসৌরভে ভরিতেছে,
শুষ্কপত্র উড়াতেছে,—
অবিরত নাচাতেছে তড়াগ-জীবন ;—
জলজসুন্দরীদলে দিয়া আলিঙ্গন।

জলের শবদ তথা,
বিহঙ্গ অস্ফুট কথা,
সমীর নিস্বন যথা—
নহে ত স্বতন্ত্র কেহ শুনায় কখন,—
এক শব্দে পরিণত—চিত বিমোহন।

রম্য উপবনে এই জলাশয় ধারে
দেখিনু রয়েছে যুবা একাকী বসিয়া ;—
স্থিরভাবে নত শিরে,
একদৃষ্টে দেখে নীরে,—
জগত সংসার যেন অলে পাসরিয়া
পাগলের মত তথা রয়েছে বসিয়া।

বড়ই কৌতুক মনে জন্মিল তখন
জিজ্ঞাসিনু যুবাবরে করি সম্ভাষণ—
"কহ কে সুজন তুমি
"আসি এ বিজন ভূমি
"একাকী সরসী তীরে বসিয়া এমন
"একদৃষ্টে দেখিতেছ সরসী-জীবন ?"

সুধাইনু বারম্বার,
তবু কথা নাহি তার,—
তবু না উত্তর মোরে করিল অর্পণ
ভাবিনু পাগল বুঝি হবে সেই জন।

তাই ভাবি পুনরায়
জিজ্ঞাসিনু ডাকি তায়
"কেন এ বিচিত্র ভাব করি বিলোকন ?—
কেন এ নিরর্থ কার্য্যে মুগ্ধ তব মন ?"

অমনি ভ্রুকুটি করি
ধ্যান-ধর্ম্ম পরিহরি
রোষ-বিস্ফারিত নেত্রে করি নিরীক্ষণ
দারুণ মনের ভাব জানায় আপন।

ক্ষণপরে পুনরায়
চিত্রিত পুত্তলি প্রায়
সরসী-সলিল ধ্যানে হইল মগন,—
আবার ভুলিল সব জগত-সৃজন।

ক্রমে মম কৌতূহল
হৈল অতি সুপ্রবল,—
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তারে কহিনু বচন ;
অমনি গর্জ্জিয়া উঠি সরোষে সে জন

ধাইল আমার পানে,
অকারণ শত্রু জ্ঞানে ;—
নিকটে আইল যবে করি আস্ফালন
করিনু তাহারে আমি মিষ্ট সম্ভাষণ—

"নহি তব রিপু আমি
আমি তব শুভকামী—
আমি তব অভিলাষ করিব পূরণ,—
কহ মোরে কিবা তব মানস মনন।"

উচ্চ হাসি হাসি যুবা কহিল তখন
"তুমি মোর অভিলাষ করিবে পূরণ !—
"তুমি সে রতন দিবে ?
"কহ কত মূল্য নিবে ?
"কোন সিন্ধু মাঝে কহ তাহার জনন ?

"কাহার কিরীট পরে
সে রত্ন সুষমা ধরে,—
"কোন ভাগ্যবান্ ধনী-হৃদয় শোভন !

"সে রত্ন আকাশে জলে !—
"কিম্বা থাকে বন স্থলে ?—
"অথবা অতল তলে লুকায় বদন !—
"কোন নিধি দিতে তুমি করেছ মনন ?

* * *

"গগন সাগরে পশি—
"তুলিয়া গগন শশী—
"কখন কি তুমি মম করে আনি দিবে !

"এ মনের সাধ তবু
"নারিবে পূরাতে কভু—
"এ বাসনানল তবু কভু না নিবিবে।

"সে রত্ন নাহিক নভে,
"সে রত্ন নাহিক ভবে,
"সে রত্ন রত্নাকরে নাহিক মিলিবে !—

"শুদ্ধ এ আঁখির পাশে—
"ভুবন মোহিনী হাসে,—
"আর ওই জলাশয়ে বামারে হেরিবে।

"সে মণি জলিছে যাই—
"জলাশয়ে শোভা তাই—
"তার অদর্শনে সব আঁধার হইবে!—

"কুমুদ কহ্লার যত
"রক্তপদ্ম শত শত
"আর এ সরজে নাহি কখন ফুটিবে
"আর না মরালকুল কভু সন্তরিবে"।

"এত বলি ধরি করে
"লয়ে মোরে সরোবরে
কহিলেক, "ওই দেখ সরসী-বাসিনী!—

"ওই দেখ হাসে জলে,
"ওই যে কি কথা বলে
"ওই দেখ অশ্রুধারা ফেলে বিষাদিনী"—

বলিতে বলিতে তার
আঁখি জল আপনার
বেগেতে বহিল বক্ষে যেন প্রবাহিনী;
বিষাদে ডুবিল চিত আঁধারে মেদিনী!

"কহ প্রিয়ে কিবা দুঃখ!—
"কেন আজি ম্লান মুখ?—
"কে ডুবালে সুখতরী বিষাদ সাগরে?

"যখনি যে ভাবে চাই;
"তখনি দেখিতে পাই;
"হাসির হিল্লোল সদা খেলে বিম্বাধরে!

"সে হাসি কোথায় আজি
"কোথা কুন্দ দন্তরাজী—
"কি জ্বালা পশিল প্রিয়ে মরম ভিতরে?—

"কহ মোরে কৃপা করি
"এ দুঃখে কেমনে তরি,—
"কোন মন্ত্রে আনি তোমা হৃদয় উপরে?
"জগত সংসার আমি করিনু ভ্রমণ—
"কোথা না পেলাম প্রিয়ে তব দরশন!

"তবে এ জীবন ভার
"কি কাজ বহিয়া আর
"আজি এই বারি মাঝে দিব বিসর্জ্জন"!
এত বলি যুবা জলে হইল পতন।

* * * *

কাঁপিল প্রকৃতি কায়া—
সুন্দর প্রকৃতি মায়া—
দেখিতে দেখিতে সব হইল স্বপন!—

বন শোভা লুকাইল,
জলাশয় শুকাইল,
মরু সম হ'ল সেই রম্য উপবন।

শ্রীগোপাল কৃষ্ণ ঘোষ।

দ্বিতীয় অঞ্জলি

১

কার্য্যকালে জানা যায় ভৃত্য-পরিচয়।
কুটুম্বের পরিচয় ব্যসন-সময়॥
মিত্রের পরীক্ষা হয় বিপদ উদয়ে।
ভার্য্যার পরীক্ষা হয় বিভবের ক্ষয়ে॥

২

চক্ষুর বাহির হলে কার্য্য ক্ষয়কারী।
সম্মুখেতে কথা গুলি মধুমাখা ভারী॥
গরলেতে ভরা কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর।
হেন মিত্রে পরিহার করিবে সুধীর॥

৩

অকালে না মরে জীব, শত শরপাতে।
কাল প্রাপ্তে মরে, কুশ কণ্টক আঘাতে।

৪

বহুগুণ সত্বে এক দোষের কারণ।
নিমজ্জিত শশধর, কহেন যে জন॥
কভু নাহি দেখিলেন সে কবি নিশ্চয়।
দরিদ্রতা দোষ, গুণরাশি-নাশী হয়॥

৫

কৃতকর্ম্মে পুনরায় নাহিক কথন।
মৃত যেই তার পুন নাহিক মরণ॥
সেইরূপ গত বিষয়ের নাহি শোক।
এই তত্ব কন যত বেদবিদ্ লোক।

৬

হেমাচল কিম্বা রজতাচল-সম্ভূত।
তরুগণ কখন স্বভাব নহে চ্যুত॥
প্রণমি মলয়াচলে, যাহার কৃপায়।
শেওড়া, কুড়চী, নিম, চন্দনত্ব পায়॥

৭

সম্পদে কোমল চিত্ত, আপদে কর্কশ।
বসন্তে কোমল পাতা, নিদাঘে নীরস॥

৮

যদি উচ্চ পদলাভে হয় অভিমত।
তবে আগে চিন্তা করি হও তুমি নত॥
কেশরী প্রথমে নত করিয়া শরীর।
মহা তেজে উঠে গিয়া মস্তকে করীর॥

৯

উদার হৃদয়, সুপ্রসন্ন হয়,
ক্রোধ যবে পরিগত।
জলদ্ অঙ্গার, বিভূতি আকার,
ভস্মে যবে পরিণত॥

১০

সজ্জনের গুণবৃদ্ধি সজ্জনেই করে।
কুসুম সুরভি বায়ু দিগন্তে বিস্তরে॥

১১

শীলতাই সদগুণের শোভার ভবন।
যৌবনই যোষাদের ভূষণ শোভন॥

১২

জড়ের প্রভাবে পায় দুঃখ সাধুদলে।
চন্দ্রের উদয়ে পদ্ম সঙ্কুচিত জলে॥

১৩

কারু প্রতি কেহ হয়, বিহিত মঙ্গলময়,
কারু প্রতি দুঃখের আকর।
দিনকর নিজকরে, কমলে প্রফুল্ল করে,
কুমুদের মুখ ম্লানকর॥

১৪

যেখানেই অবস্থিত হোন গুণবান্।
সর্ব্বত্র হবেন তিনি শোভার নিধান॥
দেখ মণি শিরে, গলে, বাহুতে বিরাজে।
পাদপীঠে থাকিলেও অপরূপ সাজে॥

১৫

উৎসব আগতে কত প্রমোদ প্রবাহ।
বিগত হইলে আর না থাকে উৎসাহ॥
কিবা শোভা পায় শশী প্রদোষ সময়।
প্রভাত আগত ক্রমে প্রভাশূন্য হয়॥

১৬

গুণ থাকিলেই লোকে করয়ে পূজন।
শুধু বড় জাতি নহে পূজার ভাজন॥
স্ফাটিকের পাত্র যবে চুরমার হয়।
পাঁচগণ্ডা দিয়ে কেহ নাহি করে ক্রয়॥

১৭

থাকিলে বিভব, না হয় গৌরব,
দুরদৃষ্ট ভয়ঙ্কর।
দেখহ গোময়, কমলা আলয়,
কভু নহে মনোহর॥

১৮

যাতে সমুদ্ভব দোষ, তাতেই নিবারে।
অগ্নিতেই অগ্নিদোষ বিস্ফোটক মারে॥

১৯

পরবুদ্ধি লয়ে যার জীবিকা-বিধান।
বুদ্ধিমান্ বলি তার কেন অভিমান॥
অঙ্গে ধরি পরের প্রদত্ত অলঙ্কার।
কখন কি সমুচিত হয় অহঙ্কার॥

২০

যদি ছোট সন্নিধান, বড় কভু কিছু চান,
তাহে তাঁর নাহি যায় মান।
আরাধিয়ে জলনিধি, কৌস্তুভাদি নানানিধি,
প্রাপ্ত হন বিষ্ণু ভগবান্॥

২১

সাধুগণ স্তবে তুষ্ট, অধমেরা ধনে।
যথা স্তোত্র দেবতার, বলি ভূতগণে॥

২২

পরায়ে জীবন, করিতে যাপন,
বিরত মনস্বিচয়।
বায়স আবলী, লুটে খায় বলি,
পিক তাহে রত নয়॥

২৩

আকস্মিক ধনে, পুরুষের মনে,
সন্তোষ বিলয় পায়।
সরসীর সেতু, ভাঙ্গিবার হেতু,
অচির বর্ষার দায়॥

২৪

এই আত্মা কভু মর্ত্ত্যে, কভু স্বর্গে বাস।
শ্মশান উদ্যান হয়, উদ্যান শ্মশান॥

২৫

নিজাশয় যে প্রকার, অপরের তদাকার,
জ্ঞান করে যত নরগণ।
প্রতিমার মুখশশী, আপন কলঙ্কে অসী,
দীর্ঘরূপে করয়ে ধারণ॥

২৬

পণ্ডিত সমাজে, কভু নাহি সাজে,
গুণহীন লোকচয়।
বিগতে তিমির, আগতে মিহির,
দীপপ্রভা কভু রয়॥

২৭

দুর্গে প্রবেশিলে পরাভূত বীরবর।
গাঢ় পঙ্কে মগ্ন অজ মাতঙ্গ কাঁফর॥

২৮

স্বকার্য্য উদ্ধার তরে, অপরের প্রতি নরে,
সুনিশ্চয় প্রণয় আচরে।
প্রচুর লোমের আশে, গাড়লে নবীন ঘাসে
গাড়লের দেহ পুষ্ট করে॥

২৯

এককালে যেই গুণ হয় অতি মিষ্ট।
সময়ান্তে নহে তাহা সে রস বিশিষ্ট॥
শৈশবের স্বাভাবিক লাবণ্য সুন্দর।
যৌবন সময়ে কভু নহে মনোহর॥

৩০

সুলভ বস্তুতে কভু না থাকে আদর।
স্বদার তেজিয়া পরদারে মজে নর॥

৩১

যেই ধন আহরণ ধর্ম্মের কারণ।
কিম্বা পোষ্যগণের ভরণে প্রয়োজন
আর যেই ধনে হয় আপদ বারণ।
সেই সব ধন সদা হয় ধর্ম্ম-ধন॥

৩২

রূপ, কুল, বিদ্যা, বল, যৌবন, বিভব।
আর ইষ্টলাভে হয় অবজ্ঞা উদ্ভব॥
সেই অবজ্ঞার হয় গর্ব্ব অভিধান।
তদানন্দ মোহ মদ, মদিরা সমান॥

৩৩

বীরত্ব-বিহীন নীতি ভীরুতা বিষম।
নীতি-হীন শৌর্য্য হয় পশুর বিক্রম

৩৪

মহৎ বাড়িলে কভু অপথে না যায়।
সমুদ্রে জোয়ার এলে নদীমুখে ধায়॥

৩৫

তীব্রভয় দেখাইয়া মৃদুরূপে সাজা।
হেন যুক্ত * দণ্ডপ্রদ হইবেন রাজা॥

৩৬

করী জানে কেশরীর বল কতদূর।
সে বল জানিতে ক্ষম না হয় ইন্দুর॥

৩৭

বিদ্যাই নরের হন সমধিক রূপ।
বিদ্যাই প্রচ্ছন্ন গুপ্ত ধনের স্বরূপ॥
বিদ্যা সুখভোগ প্রদা, যশোবিধায়িনী।
বিদ্যাই গুরুর গুরু, কল্যাণ দায়িনী॥
বিদ্যা হন বন্ধুজন বিদেশ গমনে।
পূজনীয়া হন বিদ্যা ভূপতি সদনে॥
পরম দেবতা বিদ্যা, সর্ব্বধন সার।
বিদ্যাহীন যত নর পশুর আকার॥

৩৮

গুণীর যে গুণ জানে যে গুণপ্রবীণ।
গুণিগুণ কেমনে জানিবে গুণহীন॥
বলী যেই সেই জানে বলীর কি বল।
দুর্ব্বল সে বল কিসে জানিবেক বল॥
কোকিল বিশেষে জানে বসন্তে কি রস।
সেই রস অনুভবে অশক্ত বায়স॥

৩৯

গুণগণ গুণীস্থানে গুণগণ রয়।
নিগুণীর স্থানে সেই গুণ দোষ হয়॥
সুমধুর জলে জাত সরিৎ স্রোতসী।
সে পয় অপেয় হয় সাগর পরশি॥

* যুক্তিবিশিষ্ট।

৪০

কি আশ্চর্য্য সাধুগণে, দোষকেও গুণগণে,
দুর্জ্জনের মুখে গুণগণ দোষ হয়।
সাগরের লোণা জল, মিষ্ট করে মেঘ দল,
ক্ষীর পান করি ফণী বিষ বরিষয়॥

৪১

বিবাদের জন্য বিদ্যা, দর্প হেতু ধন।
শক্তি প্রয়োজন পরপীড়ার কারণ॥
খলের এ রীতি, বিপরীত সাধুজনে।
পরিণত জ্ঞান, দান, পর প্রয়োজনে॥

৪২

জ্ঞাতি ভাজ্য নহে, চোরে না করে হরণ
দানে ক্ষয় হীন বিদ্যা রত্ন মহাধন॥

৪৩

সকলেই গুণ খুঁজে, রূপ নাহি চায়।
পুষ্পরাজ * মণি বটে গন্ধ নাহি তায়॥

৪৪

আপনারে ভাবি মনে অজর অমর।
বিদ্যা আর ধন চিন্তা করিবেক নর॥
কেশে ধরি বসিয়াছে মৃত্যু ভয়ঙ্কর।
এই ভাবে ধর্ম্ম সাধে যত সুধিবর॥

৪৫

শরীরের বল চেয়ে বড় বুদ্ধিবল।
তদভাবে হেন দশা প্রাপ্ত হস্তিদল॥
মাহুতে কদাচ করী মারিবারে পারে।
এই কথা গজঘণ্টা ঘোষে বারে বারে॥

৪৬

শ্রুতির শোভন শ্রুতি, কুণ্ডলে না হয়।
করের ভূষণ দান, কঙ্কণেতে নয়॥
পর প্রতি দয়া আর হিত আচরণে।
শরীরের শোভাবৃদ্ধি, নহে ত চন্দনে॥

৪৭

কুলের কল্যাণে একজনে পরিহর।
গ্রামের কল্যাণে কুল পরিত্যাগ কর॥
জনপদহিতে গ্রাম করহ বর্জ্জন।
পৃথিবী করহ ত্যাগ আত্মার কারণ॥

৪৮

স্বজাতীয় বধে মানুষের বাড়ে রঙ্গ।
শিকরে বিহঙ্গ মারে, না মারে ভুজঙ্গ॥

৪৯

গুরু প্রয়োজন, সাধন কারণ,
পূজা আয়োজন, ভক্তির সম্পর্ক নাই।
দুগ্ধের কারণ, সহিত যতন,
গোধন পূজন, ধর্ম্মহেতু নহে ভাই॥

৫০

মত্ত মাতঙ্গের কুম্ভ দলনে চতুর।
কিম্বা সিংহ বধে দক্ষ আছে কত দূর॥
কিন্তু আমি বলি, বলী আছে যত জন।
অশক্ত কন্দর্প দর্প করিতে দলন॥

৫১

যার নাম শুনা মাত্র, সন্তাপেতে দহে গাত্র,
দেখামাত্র উন্মাদ বাড়য়।
পরশিয়া যার কায়, সকলেই মোহ যায়,
তাহারে দয়িতা † কেন কয়॥

৫২

তদবধি কৃতীদের হৃদয়কন্দরে।
বিমল বিবেক দীপ চারু প্রভা ধরে॥
যদবধি কুরঙ্গনয়না বালাগণ।
চঞ্চল অপাঙ্গ নাহি করে সঞ্চালন॥

৫৩

শ্রুতিতে মুখর, পণ্ডিত নিকর,
কেবল বচনে পটু।

* পোখরাজ হিন্দী।

† দয়াবতী।

কহে ছাড় সজ, নারী রতিরঙ্গ,
কার্য্যকালে কিন্তু হটু ॥
নীলাজ নয়না, জঘন শোভনা,
রসনা † মণিমণ্ডিত।
করে পরিহার, শকতি কাহার,
কে আছে হেন পণ্ডিত ॥

৫৪

বিজাতীয় বাক্য কভু শোভিত না হয়।
বিতর্কে বেদের প্রভা কখন না রয় ॥
অধরে অঞ্জন-রেখা কেবল দূষণ।
নয়নের হয় কিন্তু অপূর্ব্ব ভূষণ ॥

---

† চন্দ্রহার।

অষ্টম অধ্যায়

গৃহে নামসংকীর্ত্তন

চৈতন্য যে সময় পুরীবরের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ মাত্র।

শিষ্যদিগের অনুরোধে চৈতন্যদেব গয়া হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে দেখিয়া যারপরনাই প্রীত হইলেন। শচী পুত্রকে দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন। আত্মীয় বন্ধুগণ তীর্থযাত্রার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চৈতন্য আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণন করিতে লাগিলেন। বর্ণন করিতে করিতে ঈশ্বরপুরীর নাম উল্লেখ করামাত্র ভাবসংসর্গ গুণে কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিতহৃদয় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সকলেই বিস্মিত হইলেন। কেহ ভাবিলেন বায়ুর কার্য্য। কেহ ভাবিলেন অপদেবতার দৃষ্টি। বৈষ্ণবগণ তখনই বুঝিলেন, চৈতন্যের জীবনসম্বন্ধে একেবারে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হইয়া তন্ময়ত্ব * প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীমান্ পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ॥
চতুর্দ্দিকে নয়নে বহয়ে অশ্রুধার।
গঙ্গা যেন আসিয়া করিলা অবতার॥
মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার।
এমন ইহারে কভু না দেখি যে আর॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বিভব পথে বা হইল দরশনে॥

---

* বেদান্তসারে ইহাকেই জীবন্মুক্ত বা জীবিতাবস্থায় কর্ম্মজাল সূত্র হইতে মুক্ত বলে। বৈষ্ণবেরা বলেন ইহা প্রেম ভক্তিতে হয়, পক্ষান্তরে বেদান্তের মতে ইহা জ্ঞানে হয়।

প্রভু † বৈষ্ণবদিগকে আগামী কল্য শুক্লাম্বর চক্রবর্ত্তীর গৃহে সমাগত হইতে অনুরোধ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে বৈষ্ণবগণ নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে শুক্লাম্বর চক্রবর্ত্তীর গৃহে সমাগত হইলেন। শুক্লাম্বর তাঁহাদিগকে বলিলেন, নিমাঞি পণ্ডিত গয়া হইতে পরম বৈষ্ণব হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সকলেই যারপরনাই প্রীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে একত্র মিলিত হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে দ্বিজরাজ চৈতন্য তথায় উপস্থিত হইয়া ভাগবতদিগকে একত্র সমাগত দেখিয়া প্রেমে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

প্রভু বলে মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ মোরে নন্দঘোষের নন্দন॥

বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রেম ও সাত্ত্বিকভাব দেখিয়া মোহিত হইয়া প্রেমাবেশে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবমণ্ডলী বিদায় হইলে, শিষ্যগণ অধ্যয়ন করিতে আসিল। তাহাদিগের মধ্যে যে যে শ্লোক উচ্চারণ করিল, চৈতন্য প্রেম-বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণপক্ষে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন।

দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥
পরং ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ মূর্ত্তিময়।
যে শব্দেতে যে বাখানে সেই সত্য হয়॥

চৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড পৃ ১২৮।

ক্ষণেক পরে চৈতন্য বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন, এবং প্রেমবিহ্বল হইয়াছিলেন এজন্য লজ্জিত হইলেন। সে দিবস অধ্যাপনকার্য্য বন্ধ করিয়া সশিষ্যে গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে আহ্নিক সমাপন করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। শচী অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! অদ্য কি বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেছিলে?

চৈতন্য বলিলেন—মাত! অদ্য কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতেছিলাম, মাতঃ ভাগবতে লিখিত আছে—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশকথা-মহোৎসবা সুরেশ লোকোঽপি ন বৈ ন সেব্যতাং॥

† বৈষ্ণবদিগের অনুকরণে আমরা চৈতন্যদেবকে প্রভু অথবা মহাপ্রভু বলিব।

সন্ধঃ সন্ধিঃপথিগূনঃ সিস্নোদর কৃতোচ্চয়ৈঃ।
আস্থিতো মরমত্তে যজ্ঞুরেক বিংশতি পূর্ব্ববৎ॥
অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং।
অনারাধিতগোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥

মাত। চণ্ডাল কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে চণ্ডালত্ব ‡ অতিক্রম করে এবং বিপ্র কৃষ্ণনামবিহীন হইলে বিপ্রত্ব হারায়। কালচক্র কৃষ্ণ-সেবকের নিকটে যায় না। কৃষ্ণসেবক কর্ম্মজাল-সূত্রজনিত পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর যন্ত্রণাতীত। *কৃষ্ণভক্তি বিহীন মনুষ্য স্বীয় কর্ম্মফলে পুনর্ব্বার গর্ভযন্ত্রনা সহ্য করে; গর্ভে সপ্তম মাসে তাহার জ্ঞানোদয় হয় এবং তখন বৃথা দারাসুতের জন্য জীবনে পাপানুষ্ঠান করিয়াছে এজন্য অনুতাপ করে।† কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইলেই মায়াতে সমুদয় বিস্মৃত হয়, পুনর্ব্বার কৃষ্ণবিহীন জীবন যাপন করিয়া গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করে।‡

অতএব মাতঃ

—ভজহ কৃষ্ণ সাধু সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল হরি॥
ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।

চৈতন্যের মাতা ও শিষ্যবৃন্দ এইরূপ ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাদৃশ জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড প্রধান সময়েও ভক্তির পক্ষপাতী হইলেন। এবং অনতি দীর্ঘকালে চৈতন্যের আলয় এক নবীন বেশ ধারণ করিল। অনবরত বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন। কেহ বা ভাগবতাদি গ্রন্থ তাললয়যুক্ত স্বরে উচ্চারণ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করিতেছেন। কেহ বা হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। কেহ বা প্রেমপুলকিত হৃদয়ে লোমাঞ্চিত শরীরে নৃত্য করিতেছেন।

এইরূপে বৈষ্ণবগণ ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া হৃদয়ের আনন্দে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। চৈতন্য কৃষ্ণ ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সকল বস্তুতেই কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন, সকল

---

‡ "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ * *"
এইরূপ শাস্ত্রবাক্য চৈতন্য এতদিনে জীবনে পরিণত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

*চৈতন্যের এই বাক্য বেদান্ত বিরোধী বৈষ্ণবদিগের এই মূলমত ভাগবতমূলক। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন "ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে জ্ঞানমাত্র লইয়া ব্যস্ত, সে যে কৃষ্ণ তণ্ডুল পরিত্যাগ করিয়া তুষমাত্র গ্রহণ করে তাহার তুল্য।"

† এটী পৌরাণিক মত।

‡ চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড।

কথারই উত্তর কৃষ্ণ। শিষ্যগণ পাঠ লইতে আসিল, প্রভু প্রত্যেক শ্লোক ও কথার অর্থ কৃষ্ণপক্ষে ব্যাখ্যা করিলেন। তাহারা ভাবিল প্রভু বাতিকাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ প্রলাপোচ্চারণ করিতেছেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে সমবেত হইয়া পরম গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের* নিকট গমন করিয়া সমুদয় নিবেদন করিল।

গঙ্গাদাস অপরাহ্নে চৈতন্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, বৎস! অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভক্তিতে পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা পণ্ডিত অথচ পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তুমি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্ধভক্তিপরবশ হইয়াছ, অত্যল্প বয়সে ব্যাকরণ মাত্র সমাপ্ত করিয়া চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিলে। তোমার এক্ষণে জ্ঞানোপার্জ্জনের সময় যায় নাই, তুমি অধ্যয়ন কর। চৈতন্য তাঁহার ভর্ৎসনে ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "গুরুদেব! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি অদ্য হইতে জ্ঞানোপার্জ্জনে মনোভিনিবেশ করিব, দেখিব নবদ্বীপে কে আমার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পারে।"

চৈতন্য ক্রমাগত ২।৩ বার একথা বলিলেন। ইহার অর্থ কি? তিনি তরুণ বয়স্ক। নবদ্বীপ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সমাজ। এক একজন আজন্ম বৃদ্ধকাল শাস্ত্রালোচনায় কাটাইয়াছেন। চৈতন্য কি সাহসে তাদৃশ পণ্ডিতগণের সহিত আপনাকে সমকক্ষ মনে করিয়াছিলেন। বোধ হয় ইদানীং তিনি সত্য সত্যই আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি মনে করিয়াছিলেন, এবং সেই সাহসে এরূপ অসমসাহসিক উক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্ধ-বিশ্বাসী লোক যখন কল্পনাবলে ধর্ম্মজগতে বিচরণ করে, তখন কল্পনা তাহাদিগের নিকট যে চিত্র আঁকে তাহারা তাহাই বিশ্বাস করে। চৈতন্যও হয় ত এইরূপ কল্পনাপরায়ণ হইয়া বলিয়াছিলেন "দেখিব নবদ্বীপে কে আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করে।" কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সত্য সত্যই ঈশ্বর ধার্ম্মিক লোকদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রত্যাদেশ করেন বা না করেন, তৎসম্বন্ধীয় চিন্তা ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে করিতে মনোবৃত্তি যেরূপ পরিচালিত হয়, তাহাতে অশেষ উন্নতি হয়। (১)

---

* পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইনি চৈতন্য দেবের শিক্ষক।

(১) সার আর্থর হেল্‌প্‌স্ সংসারী লোক (Man of business) শীর্ষক প্রস্তাবে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

সেই অবধি নিত্য কলসী কক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়; নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সে গোবিন্দলালকে পুষ্পকানন-মধ্যে দেখিতে পায়, নিত্য সুমতি কুমতিতে সন্ধিবিগ্রহ উভয়ই ঘটনা হয়। সুমতি কুমতির বিবাদ বিসম্বাদ মনুষ্যের সহনীয়; কিন্তু সুমতি কুমতির সদ্ভাব অতিশয় বিপত্তিজনক। তখন সুমতি কুমতির রূপ ধারণ করে, কুমতি সুমতির রূপ ধারণ করে। সুমতি কুমতির কাজ করে, কুমতি সুমতির কাজ করে। তখন কে সুমতি কে কুমতি চিনিতে পারা যায় না। লোকে সুমতি বলিয়া কুমতির বশ হয়।

যাই হউক, কুমতি হউক সুমতি হউক, গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়-পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষে—যাক্ আমার পুরাতন কথা তুলিয়া কাজ নাই। রোহিণী, সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে, অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল।

কেন যে এতকালের পর, তাহার এ দুর্দ্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখন তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি—সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ—এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না,—আমি যেমন ঘটিয়াছে তেমনি লিখিতেছি।

রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, এক বারেই বুঝিল যে মরিবার কথা। যদি গোবিন্দ-লাল ঘুণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখন তাহার ছায়া মাড়াইবে না।

হয় ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে, এ কথা বলিবার নহে। রোহিণী অতি যত্নে, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।

কিন্তু যেমন লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল। জীবনভার বহন করা, রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

কত লোকে যে মনে মনে মৃত্যুকামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে? আমার বোধ হয়, যাহারা সুখী, যাহারা দুঃখী তাহাদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিক সরলতার সহিত মৃত্যু কামনা করে। এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও দুঃখময়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে, এই জন্য অনেক সুখিজনে মৃত্যু কামনা করে—আর দুঃখী দুঃখের ভার আর বহিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুকে ডাকে।

মৃত্যুকে ডাকে কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে সুখী, সে মরিতে চাহে না, যে সুন্দর, যে যুবা, যে আশাপূর্ণ, যাহার চক্ষে পৃথিবী নন্দনকানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে আসে না। এদিকে, মনুষ্যের এমনি শক্তি অল্প যে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র সূচীবিদ্ধনে, অর্দ্ধবিন্দু ঔষধভক্ষণে, এ নশ্বর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, এ চঞ্চল জলবিম্ব কালসাগরে মিলাইতে পারে—কিন্তু আন্তরিক মৃত্যুকামনা করিলেও প্রায় কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্দ্ধবিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রোহিণী তাহা পারিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসঙ্কল্প হইল—হরলালের বশীভূত হইয়া গোবিন্দলালকে দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরলালকে দেওয়া হইতে পারে না—জাল উইল চালান হইবে না। ইহার এক সহজ উপায় ছিল—কৃষ্ণকান্তকে বলিলে কি কাহারও দ্বারা বলাইলেই হইল যে মহাশয়ের উইল চুরি গিয়াছে—দেরাজ খুলিয়া যে উইল আছে, তাহা পড়িয়া দেখুন। রোহিণী যে চুরি করিয়াছিল, ইহাও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই—যেই চুরি করুক, কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহমাত্র জন্মিলে তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন—তাহা হইলেই জাল উইল দেখিয়া নূতন উইল প্রস্তুত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তি রক্ষা হইবে, অথচ কেহ জানিতে পারিবে না যে কে উইল চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ—কৃষ্ণকান্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবে যে ইহা ব্রহ্মানন্দের হাতের লেখা—তখন ব্রহ্মানন্দ মহা বিপদে পড়িবেন। অতএব দেরাজে যে জাল উইল আছে উহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

অতএব অর্থলোভে রোহিণী, গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্টসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুলা হইয়াও সে খুল্লতাতের রক্ষানুরোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষ সিদ্ধান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে জাল উইল লইয়া আসিবে। এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া, রোহিণী প্রথমতঃ হরি খানসামাকে হস্তগত করিল।

হরি যথাকালে কৃষ্ণকান্তের শয়ন কক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিয়া যথেপ্সিত স্থানে সুখানুসন্ধানে গমন করিল। নিশীথ কালে, রোহিণী সুন্দরী, প্রকৃত উইলখানি লইয়া সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খিড়কী দ্বার রুদ্ধ; সদর ফটকে যথায় দ্বারবানেরা চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া, অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে অর্দ্ধ রুদ্ধকণ্ঠে, পিলু রাগিণীর পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিল, রোহিণী সেইখানে উপস্থিত হইল। দ্বারবানেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই ?" রোহিণী বলিল, "সখী।" সখী, বাটীর একজন যুবতী চাকরাণী, সুতরাং দ্বারবানেরা আর কিছু বলিল না। রোহিণী নির্ব্বিঘ্নে গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, পূর্ব্বপরিচিত পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেলেন—হরির কৃপায় পথ সর্ব্বত্র মুক্ত। প্রবেশ কালে কাণ পাতিয়া রোহিণী শুনিল, যে অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকাগর্জ্জন হইতেছে। তখন ধীরে ধীরে বিনাশব্দে উইলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দীপ নির্ব্বাপিত করিল। পরে পূর্ব্বমত চাবি সংগ্রহ করিল। এবং পূর্ব্বমত, অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া দেরাজ খুলিল।

রোহিণী অতিশয় সাধবান, হস্ত অতি কোমলগতি। তথাপি চাবি ফিরাইতে খট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

কৃষ্ণকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, কি শব্দ হইল। কোন সাড়া দিলেন না—কাণ পাতিয়া রহিলেন।

রোহিণীও দেখিল, যে নাসিকা গর্জ্জনশব্দ বন্ধ হইয়াছে। রোহিণী বুঝিল কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। রোহিণী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কে ও ?" কেহ কোন উত্তর দিল না।

সে রোহিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা—বোধ হয় একটু ভয় হইয়াছিল—একটু নিশ্বাসের শব্দ হইয়াছিল। নিশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণকান্তের কাণে গেল।

কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার কয় ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলাইলে পলাইতে প্যারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতিকার করা হয় না। রোহিণী মনে মনে ভাবিল, "দুষ্কর্ম্মের জন্য সে দিন যে সাহস করিয়াছিলাম,

আজি সৎকর্ম্মের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন ? ধরা পড়ি পড়িব।” রোহিণী পলাইল না।

কৃষ্ণকান্ত কয়বার হরিকে ডাকিয়া কোন উত্তর না পাইয়া উপাধানতল হইতে অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্ব্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন। শলাকালোকে দেখিলেন, গৃহমধ্যে, দেরাজের কাছে, স্ত্রীলোক।

জ্বালিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ণকান্ত বাতি জ্বালিলেন। স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তুমি কে ?”

রোহিণী কৃষ্ণকান্তের কাছে গেল। বলিল , “আমি রোহিণী।

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, “এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি করিতেছিলে ?” রোহিণী বলিল, “চুরি করিতেছিলাম।”

কৃষ্ণ। রঙ্গ রহস্য রাখ। কেন এ অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম বল। তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, একথা সহসা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোরের অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি।

রোহিণী বলিল, “তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি তাহা আপনার সম্মুখেই করি, দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। আমি ধরা পড়িয়াছি, পলাইতে পারিব না। পলাইব না।”

এই বলিয়া রোহিণী, দেরাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেরাজ টানিয়া খুলিল। তাহার ভিতর হইতে জাল উইল বাহির করিরা, প্রকৃত উইল সংস্থাপিত করিল। পরে জাল উইলখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফাড়িয়া ফেলিল।

“হাঁ হাঁ ও কি কাঁড়! দেখি দেখি।” বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিলেন ; কিন্তু তিনি চীৎকার করিতে করিতে, রোহিণী সেই খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন উইল, অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, “ও কি পুড়াইলে ?”

রোহিণী, “একখানি কৃত্রিম উইল।”

কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন, “উইল! উইল। আমার উইল কোথায় ?”

রো। আপনার উইল দেরাজের ভিতর আছে আপনি দেখুন না।

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, “কোন দেবতা ছলনা করিতে আসেন নাই ত।”

কৃষ্ণকান্ত তখন দেরাজ খুলিয়া দেখিলেন একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। সেখানি বাহির করিলেন, চসমা বাহির করিলেন ; উইলখানি পড়িয়া দেখিলেন, তাহার প্রকৃত উইল বটে। বিস্মিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পুড়াইলে কি ?”

রো। একখানি জাল উইল।

কৃ। জাল উইল! জাল উইল কে করিল! তুমি তাহা কোথা পাইলে?

রো। কে করিল তাহা বলিতে পারি না—উহা আমি এই দেরাজের মধ্যে পাইয়াছি।

কৃ। তুমি কি প্রকারে সন্ধান জানিলে যে দেরাজের ভিতর কৃত্রিম উইল আছে!

রো। তাহা আমি বলিতে পারিব না।

কৃষ্ণকান্ত কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "যদি আমি তোমার মত স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্রবুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিব তবে এ বিষয় সম্পত্তি এতকাল রক্ষা করিব কি প্রকারে! এজাল উইল হরলালের তৈয়ারি। বোধ হয় তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে। তার পর ধরা পড়িয়া, ভয়ে জাল উইলখানি ছিড়িয়া ফেলিয়াছ? ঠিক কথা কি না?"

রো। তাহা নহে।

কৃ। তাহা নহে? তবে কি?

রো। আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয় করুন।

কৃ। তুমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলে সন্দেহ নাই। নহিলে এ প্রকারে চোরের মত আসিবে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিশে দিব না কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আজি তুমি কয়েদ থাক।

রোহিণী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল।

বেদ হিন্দুদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ এবং তাহা হইতেই অন্যান্য শাস্ত্র সংকলিত হইয়াছে। বেদে আর্য্যজাতির অটল বিশ্বাস। আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক সকল কার্য্যই বেদমূলক। বেদ অমান্য করিলে হিন্দুধর্ম্মের জীবন নাশ করা হয়, সুতরাং সনাতন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিগণের বেদ অমান্য করিবার অধিকার নাই। কি জেন্দ আবেস্তা, কি বাইবেল, কি কোরাণ, পৃথিবীর সকল প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে বেদ প্রাচীন এবং শুদ্ধ ভূমণ্ডলের একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ইহার যারপরনাই আদর করিয়া থাকেন।

বিদ ধাতু হইতে বেদ শব্দ, এজন্য ইহার প্রাকৃতিক অর্থ জ্ঞানলাভ অথবা শ্রেয়োলাভ হয় যদ্দারা তাহাকেই বেদ কহে। বেদের অপর নাম ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদ—ঋক, যজু, সাম। ঋগ্বেদে এই তিন বেদের উল্লেখ আছে যথা—

অহে বুধ্নিয় মন্ত্রংমে গোপায়া য ঋষয়
ত্রয়ী বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি॥

ভগবান্ মনু কহেন—

অগ্নিবায়ু রবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞ সিদ্ধ্যর্থমৃগযজুঃ সামলক্ষণং॥

অর্থাৎ—"তিনি (ঈশ্বর) যজ্ঞকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে সনাতন ঋক্ বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন। *

উপনিষদের সময় চারি বেদ প্রচলিত ছিল, যথা—

"তস্যৈতস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো
যজুর্বেদঃ সামবেদোথর্ব্বাঙ্গিরস ইত্যাদি"

অর্থাৎ প্রস্তাবিত পরমাত্মা হইতে নিশ্বাস যেমন পুরুষের প্রযত্ন ব্যতীত বহির্গত হয়, সেইরূপ ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্বাঙ্গিরস প্রভৃতি শাস্ত্রও নির্গত হইয়াছে।

* পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মনুসংহিতা ১২ পৃষ্ঠা।

পৌরাণিক কালে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব চারি বেদই প্রচলিত ছিল, এজন্য মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই চারি বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদসমূহ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক। মন্ত্রগুলি সংহিতা বদ্ধ হইয়া আছে, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ পদ্যে ও ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ বেদের ব্যাখ্যা যথা পাণিনি "ব্রাহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানম্" এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অগ্রে মন্ত্রভাগ ও তৎপরে ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়াছিল, কেন না ব্যাখ্যা পরেই হইয়া থাকে।

বেদবাক্য সকল তিন শ্রেণীভুক্ত। লৌকিক বাক্য সকল যেরূপ পদ্য, গদ্য, গীত, এই তিন প্রকার ভিন্ন চারি প্রকার নাই; বেদেও সেইরূপ পদ্য, গদ্য, গীত এই তিন শ্রেণীর রচনা আছে। পদ্যগুলি ঋক্, গদ্য ভাগ যজুঃ, ও গীত ভাগ সাম যথা—জৈমিনী সূত্র "তেষামৃগয়ত্রার্থবশেনপাদব্যবস্থা" "গীতিষু সামাখ্যা" "শেষে যজুঃ শব্দঃ।" যজুর আর একটি নাম নিগদ অর্থাৎ গদ্য। অথর্ব্ব বেদের স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ নাই, অপর তিন বেদের কোন কোন অংশ লইয়া অথর্ব্ব নামক ঋষি ইহা প্রচার করেন। এই বেদ যাগ যজ্ঞের উপকারী নহে, ইহা সাংসারিক ব্যবস্থার উপকারী "অথর্ব্বো দেবানাং প্রথমঃ সম্ভূব" ইত্যাদি উপনিষৎ চর্চ্চা করিলে প্রতীত হইবেক।

জৈমিনী বেদকে পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষ নির্ম্মিত বলেন না, ঈশ্বর নির্ম্মিতও নহে। তাঁহার মতে বেদের নির্ম্মাতা কেহ নাই। শব্দ অর্থ ও তদুভয়ের সম্বন্ধ (বোধ্য বোধক ভাব) নিত্য। মনুষ্যের কণ্ঠে যে শব্দ হয় তাহা ধ্বনি মাত্র, তাহার নিত্যতা নাই। ধ্বনি সকল অনিত্য। আমরা বাস্তবিক শব্দের রূপ বিশেষ আবির্ভাব করিবার জন্য ধ্বনিমাত্র করিয়া থাকি। এই ধ্বনি দেশ, কাল, পাত্র ও প্রযত্ন ভেদে, মনুষ্যের বাক্ যন্ত্রের তারতম্যহেতু, শব্দ প্রকাশক সঙ্কেত ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া যায়। আমি বলিলাম লবণ, একজন বলিল লুণ, আর একজন ধ্বনি করিল ড়বণ—লক্ষ্য সকলেরই এক। একজন বলিল মাতর্, একজন বলিল মা, আর একজন বলিল "মাতারি," অপরে বলিল "মাদাব," ইহাতে সকলেরই সেই জননীবোধক শব্দ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইল। এই মর্ম্মে জৈমিনী মীমাংসার প্রমাণ পাদে কহিয়াছেন "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেনসম্বন্ধস্তস্যজ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধেতৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ," (১ম পাদ ৫ সূত্র) এই সূত্র হইতে ইহার অনন্তর ৩১ সূত্র পর্য্যন্ত সমুদায় সূত্রে শব্দ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। অপিচ উক্ত প্রকার শব্দের রূপ প্রকাশ করিবার জন্য লোকে নানাবিধ সঙ্কেত কল্পনা করায়, লৌকিক শব্দ অনেক বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই লোককৃত সাঙ্কেতিক শব্দের প্রামাণ্য নাই।

লৌকিক শব্দই পৌরুষেয়, কেন না পুরুষে ইহার সঙ্কেত করিয়াছে। বৈদিক শব্দ কাহারও সঙ্কেত দ্বারা স্থাপিত হয় নাই, কেন না উহার সঙ্কেতকর্ত্তা কেহ দৃষ্ট হয় না, অনুমিতও হয় না। "বৈদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা" (২৭ সূং) "অনিত্য দর্শনাচ্চ" (২৮ সূং) সারস্বতং সূক্তং (অর্থাৎ সরস্বতী প্রণীত) কঠ শাখা—কঠ নামক ঋষি প্রণীত শাখা, এইরূপ পৈপ্‌পলাদক, মোহুল, প্রভৃতি বেদভাগের বক্তা বিবেচনা এবং "ববর প্রবাহণী রকাময়ত," "ঔদ্দালকি রকাময়ত," এই সকল ব্যক্তি ঘটিত আখ্যায়িকা দেখিয়া ব্যক্তি বিশেষের বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত সূত্র দ্বারা বেদ, পুরুষনির্ম্মিত এবং বেদের বিষয় বিশেষ ও অনিত্য অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ ছিল, এখন নাই, এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষ করিয়া পরিশেষে "উক্তস্তু শব্দ পূর্ব্বতং (২৯) "আখ্যা প্রবচনাৎ" (৩০) ইত্যাদি সূত্রে জৈমিনী তাদৃশ বিশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিয়াছেন। এই বিচারের সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে কাঠক প্রভৃতি আক্ষ্যাণ কেবল কঠঋষি উহা প্রথমে বা প্রাধান্য ক্রমে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ সমাখ্যান হইয়াছে। সাংখ্যকার কপিল "নত্রিভির-পৌরুষেয়ত্বাদ্বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ" (৫ অ ৪১ সূ) এই সূত্রে আরম্ভ করিয়া "ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্য সম্ভবাৎ" (৫ অ ৪৬ সূ) এবং অন্যান্য বহুতর সূত্রদ্বারা নানাপ্রকার আশঙ্কা উদ্ভাবন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেদ কোন পুরুষ বুদ্ধি দ্বারা নির্ম্মাণ করে নাই, চিরকালই আছে—তবে কল্পান্ত-কালে যে ব্যক্তি প্রথম শরীরী হন অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা প্রকাশ করেন মাত্র। সুপ্ত ব্যক্তি প্রতিবুদ্ধ হইলে যেমন পুনর্ব্বার তাহার জাগতিক পদার্থ ভাণ হয়, সেইরূপ বেদ তাঁহার ভাণ প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষ যেমন শ্বাস প্রশ্বাস উচ্চারণ করিতে বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষা করে না, সেইরূপ বেদ উচ্চারণ করিতেও তাঁহার বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষিত হয় নাই। বেদান্তও এইরূপ বলেন। গৌতম বলেন বেদ জন্য বটে কিন্তু তাহা প্রমাণ অযোগ্য নহে, কেন না ভ্রম প্রমাদাদি রহিত আপুরুষ ইহার বক্তা। "মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যম্" এই সূত্রদ্বারা বেদের প্রামাণ্য পরিগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখান। "মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ" গৌতম যদিও স্পষ্টাভিধানে ঈশ্বরপ্রণীত বলেন না কিন্তু গতিকে তাঁহার ঈশ্বর প্রণীত বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে তাদৃশ আপুরুষ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নাই। মনু প্রভৃতি ঋষিরও এই মত। আস্তিক আর্য্য গ্রন্থকারদিগের মতে আপৌরুষেয় বাক্যের নাম বেদ, কেহই তাহা মনুষ্যপ্রণীত স্বীকার করেন না।

এ সকল শাস্ত্রীয় তর্ক ত্যাগ করিয়া যুক্তি অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইবেক বৈদিক ঋষিগণই স্তোত্র প্রণেতা। তাঁহারাই আপনার অভীষ্ট সাধনের জন্য দেবতাদিগের নিকট ছন্দোযুক্ত স্তোত্র লইয়া গমন করিয়াছিলেন. যথা—"অর্থ পশ্যব ঋষয়ো

দেবতাশ্চন্দোভিরভ্যধাবন্।" বৈদিক স্তোত্রনিচয় এক সময়ের রচিত নহে, তাহা সময়ে সময়ে ঋষিগণ দ্বারা এক এক অংশ রচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বেদ যাহা আমরা ব্যবহার করিতেছি, ব্যাসের পূর্ব্বে তাহা এরূপ ছিল না। পরাশর নন্দন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কুরু পাণ্ডবদিগের যুদ্ধের পর সমুদায় বেদ সুপ্রণালী বদ্ধ করিয়া প্রচার করেন, এজন্য তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। তিনি চারিজন শিষ্যকে চারি বেদ উপদেশ দিয়াছিলেন যথা—বহ্বৃচ নামক ঋগ্বেদ সংহিতা পৈলকে, নিগদাখ্য যজুর্ব্বেদ সংহিতা বৈশম্পায়নকে, ছন্দোগ নামক সামবেদ সংহিতা জৈমিনীকে, এবং আঙ্গীরসী নামক অথর্ব্ব সংহিতা সুমন্তকে, শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১২ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে "পৈল স্বীয় সংহিতা দুই ভাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রমতিকে ও বাস্কলকে কহিলেন এবং বাস্কল তাহা চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্র এই চারি শিষ্যকে উপদেশ দিলেন। এবং ইন্দ্র প্রমতি ও স্বীয় পুত্র মাণ্ডুকেয় ঋষিকে ও মাণ্ডুকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র সৌভর্য্যাদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে মাণ্ডুকেয়ের পুত্র সাকল্য সেই সংহিতাকে পাঁচভাগ করিয়া বাস্য, মুগদল, শালীয় গোখল্য ও শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে প্রদান করিলেন এবং সাকল্যের শিষ্য জাতকর্ণ স্বীয় সংহিতাকে পাঁচভাগ করিয়া নিরুক্তের সহিত বলাক, পৈল, জাবল ও বিরজ এই চারিজনকে শিক্ষা দিলেন। পরে বাস্কলের পুত্র বাস্কলি উক্ত সর্ব্বশাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া এক খানি বালখিল্য নামক সংহিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং বালায়নি, ভজ্য ও কাশার এই তিন দৈত্য তাহা ধারণ করিল" * ঋগ্বেদ সংহিতার সাকল্য শাখা প্রচলিত। উহা ৮ অষ্টকে বিভক্ত এবং তাহা পুনরায় ৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০৬ বর্গ আছে, তাহাতে ১০৪১৭ ঋচ দৃষ্ট হয়। অন্যমতে ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডলে এবং ১০০ শত অনুবাকে বিভক্ত, তাহাতে ১০০০ এক সহস্র সূক্ত আছে। এই সংহিতায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৩৮২৬ পদ বর্ত্তমান সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শৌনক মুনিকৃত "চরণ-ব্যূহ" গ্রন্থানুসারে বেদের অনেক অধ্যায় এসময় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা লোপ হইয়াছে সুতরাং তাহার উল্লেখ এখানে করা গেল না।

ঋগ্বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ও শাঙ্খ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮ পঞ্চিকায় বিভক্ত, তাহার প্রত্যেকে ৫টী করিয়া অধ্যায় আছে। এই সমুদায় অধ্যায়ে ২৮৫ খণ্ড আছে। শাঙ্খ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ৩০ অধ্যায় আছে। ঋগ্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের টীকাকার মাধবাচার্য্য।

* পণ্ডিতবর ৺আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত।

যজুর্ব্বেদ সংহিতা কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই দুই অংশে বিভক্ত। ইহাকে তৈত্তিরীয় ও বাজসেনেয়ী সংহিতা কহে। ইহার শাখার নাম তৈত্তিরীয়, মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয়, এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের শত পথ ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ও ব্রাহ্মণের টীকাকার মাধবাচার্য্য এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার টীকাকার মহীধর এবং উবাত, ও উহার ব্রাহ্মণের টীকাকার সায়নাচার্য্য।

সামবেদ সংহিতা পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগে বিভক্ত। ইহার শাখার নাম কৌথুম এবং রাণায়ন। সাম বেদের ৮ খানি ব্রাহ্মণ আছে তাহার নাম যথা—প্রৌঢ় বা পঞ্চবিংশ, ষড় বিংশ, সাম বিধান ব্রাহ্মণ, আর্ষেয়, দেবতাধ্যায়, বংশ, এবং সংহিতোপনিষদ ব্রাহ্মণ।—সায়নাচার্য্য এই ৮ খানি ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন সামবেদের অদ্ভুত ব্রাহ্মণ নামক আর একখানি ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম অধ্যায় ১২ স্কন্ধে লিখিত আছে "অথর্ব্ববিৎ সুমন্ত কবন্ধ নামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন, এবং কবন্ধ তাহাকে দুইভাগ করিয়া পথ্য ও বেদদর্শ সংজ্ঞক শিষ্যদ্বয়কে শিক্ষা দিলেন। বেদদর্শের চারি শিষ্য সৌক্লায়নি, ব্রহ্মাবলী, মোদোষ, পিপ্‌পয়নি। পথ্যের তিন শিষ্য কুমুদ, শুনক ও জাজলি ইঁহারা সকলেই অথর্ব্ববিৎ। পুত্র শুনক স্বীয় সংহিতাকে দুই ভাগ করিয়া বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন, সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণি প্রভৃতিরাও পরে তাহা গ্রহণ করিলেন। পরে নক্ষত্রকল্প, শান্তিকশ্যপ ও অঙ্গীরস প্রভৃতি সকলে অথর্ব্ববেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন।" † অথর্ব্ববেদের সৌনক শাখা মাত্র বর্ত্তমান আছে। ইহার ২০ কাণ্ডে ৬০১৫ শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণ।

মহামুনি যাস্কের নিরুক্ত অনুসারে বেদব্যাখ্যা হইয়া থাকে। নিরুক্ত বিরুদ্ধ বেদব্যাখ্যা বুধ মণ্ডলীর অপাঠ্য। যাস্কের পূর্ব্বেও বেদ শব্দের নিরুক্ত বর্ত্তমান ছিল, তাহা যাস্কই বলিয়া গিয়াছেন যথা—"স্থূলোষ্টীবীর্ণরূপয়তি ন স্নেহয়তি —ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়তে ইতি শাক পুণিঃ—ঊর্ণনাভনামকো মুনির্জু হোতি ধাতোরুৎপন্নো হোতৃশ বেদা মন্যতে" স্থূলোষ্টীবি, শাক পূর্ণি, ঔর্ণনাভ প্রভৃতি নিরুক্তকার যাস্কের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা যাস্ক মুনির নিরুক্তের সাহায্যে নিম্নে দেবতা ও বৈদিক শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম।

---

† শ্রীমদ্ভাগবত। ৺আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুবাদিত।

ঋগ্বেদের দেবতা—প্রথমতঃ দেবতা দুই শ্রেণী—যাগাঙ্গ দেবতা এবং স্তোত্রাঙ্গ দেবতা। স্তোত্র বা শস্ত্র * যাহার গুণ মাহাত্ম্যাদি বর্ণনা পূর্ব্বক প্রশংসা করা যায়, সে সকল স্তোত্রাঙ্গ দেবতা। যজ্ঞকালে ঘৃত, মধু, দধি, পাশব মাংস প্রভৃতি যাহাদের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহারা যাগাঙ্গ দেবতা। ঋক্ সংহিতা এবং যজুঃ সংহিতায় বহুতর দেবতার উল্লেখ আছে। ইদানীন্তন কালেও বহুতর অবৈদিক দেবতার নাম রূপ মাহাত্ম্য বর্ণনা দৃষ্ট হয়, ঐ সকল দেবতা না শস্ত্রাঙ্গ না যাগাঙ্গ, কেবল পূজা বা উপাসনার অনুকল্পজ প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত পৌরাণিক সময়ে কল্পিত হইয়াছে। বৈদিক দেবতার সমস্ত নাম সংগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই, কতিপয় নাম সংগ্রহ করা যাইতেছে তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

অগ্নি, † বায়ু, ইন্দ্র বায়ু, মিত্রাবরুণ, আশ্বিন, ঐন্দ্র, বৈশ্বদেব, সারস্বত, মরুৎ, অগ্নি বিষোব, (সুসমিদ্ধ, ইতীধ্ব, সমিদ্ধ বাগ্নি, তনূনপাৎ, নরাশংস, ইল, বহি দেবী, দ্বার, উজ্যসো, নক্তা,) দৈব্য, হোতৃযুগল, প্রচেতা দ্বয়, সরস্বতী, লাভারত্য, ত্বষ্টা, বনস্পতি, স্বাহাকৃতি, বৃহস্পতি, মিত্রাগ্নি, পূষা, ভগ, আদিত্য (সূর্য্য বিশেষ) মরুদগণ, ব্রহ্মাণস্পতি, সোম, সদ সম্পতি, নারাশংসী, দক্ষিণা, ঋভু, সবিতা, দ্য, বিষ্ণু ‡ অপ, ইন্দ্রাণী, পৃথিবী, অস্বায়ী, বরুণানী, বৈষ্ণবী, প্রজাপতি, উলুখল, মূষল, হরিশ্চন্দ্র, অধিধবন, উষঃকাল ইত্যাদি অনেক দেবদেবী আছে। এই সকল দেবদেবীর স্তোত্র মধুচ্ছন্দ, বিশ্বামিত্র, জেতা, মেধাতিথি, শুনঃশেপ, হিরণ্য স্তূপ, সব্য, গোতম, অঙ্গিরস, প্রস্কণ্ব, কণ্ব, (ঘোর ঋষির পুত্র) কুৎস, প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অযুজোবৃহতী, প্রস্তার-পংক্তি, প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। ঋক্বেদের একটী স্তোত্র নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

* স্তোত্র এবং শস্ত্র উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ, যে গীতের উপযুক্ত মন্ত্র দ্বারা যে স্থানে দেবতার প্রশংসাদি করা যায়, সেই স্থানেই স্তোত্র আর যাহা গীতের অনুপযুক্ত মন্ত্র তাহা শস্ত্র।

† "অগ্নির্বৈদেবা তস্যৈতানি নামানি—সর্ব্ব ইতি প্রাচ্য আচক্ষত-ভব ইতি যথা বাহিক পশূনাম্পতি রুদ্রোঽগ্নিরিতি তান্য স্যাসন্তানি নামানি অগ্নীত্যেব সন্তাস্ত্বম্ ইতি শতপথ ব্রাহ্মণ।

‡ অতো দেবা অবন্তুনো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যা সপ্তধামভিঃ। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংসুরে। ঋক্বেদঃ ১ম মণ্ডলং। এই স্তোত্র পৌরাণিক চতুর্ভুজ বিষ্ণু বুঝাইতেছে না। যাস্ক ঋষি ইহার অর্থ করিতেছেন "বিষ্ণুঃ আদিত্যঃ কথমিতি যথাহঃ ত্রিধা নিধায় পদং নিধত্তে পদং নিধানং প।"

ইন্দ্র

১

আকাশের জ্যোতি—ভীম বজ্রধর।
মহামতি ইন্দ্র সর্ব্ব গুণাকর!
তব স্তুতিচয় মোরা নিরন্তর
মধুর সুস্বরে করিব গান।
কোমল, মধুর, নবীন গাথায়
যাহাতে দেবের মানস ভুলায়,
—সহজে যুড়ায় তাপিত প্রাণ।

২

এস এস দেব ছাড়ি সুর পুর
শুনিতে এহেন সঙ্গীত মধুর
যে সঙ্গীতে শোক, তাপ হয় দূর—
এহেন সঙ্গীত কর শ্রবণ।
শুভ্রময় অদ্রি উৎসের সমান
বিমল আনন্দ করিব প্রদান—
শুন—করযোড়ে করি বন্দন।

৩

স্বর্ণময় রথে করি আরোহণ
এস এস ইন্দ্র এমর্ত্ত্য ভবন
করুক সারথি রথ সঞ্চালন
বেগে বজ্রনাদে বিমান পথে।
ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে সুরবালা দলে
বিস্ময় উৎফুল্ল লোচনে সকলে,
হেরিবে তোমায় সুবর্ণ রথে।

৪

বসো স্বর্ণাসনে লও উপহার
অন্ন ব্যঞ্জনাদি বিবিধ প্রকার
গন্ধ দ্রব্য নানা—সোম—সুধাধার—
(দেবের দুর্লভ অপূর্ব্ব ধন)
করযোড়ে মোরা তোমারে আহ্বান,
করিতেছি শুনি এই স্তবগান
বিপক্ষের ভয় কর ভঞ্জন।

৫

অতীব কাতরে আমরা এখন
লয়েছি তোমার চরণে শরণ
কর দেব কর অভীষ্ট সাধন
সুধা-সোম রস করিয়া পাণ।
জয় জয় দেব বজ্রনাদ কর
বিপক্ষের ভয় আমাদের হর—
তব যশ মোরা করিব গান।

রঘুর পুত্র অজ, ঠিক পিতার মত হইলেন

রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্য্যং
তদেব নৈসর্গিক মুন্নতত্বম্ ।
ন কারনাৎ স্বাদ্বিভিদে কুমারঃ
প্রবর্ত্তিতোদীপইব প্রদীপাৎ ॥

সেই উর্জ্জস্বল রূপ, বীর্য্যও সেই, নৈসর্গিক উন্নতত্বও সেই, প্রদীপ হইতে উৎপাদিত প্রদীপের ন্যায় কুমার পিতা হইতে কোন প্রকারে ভিন্ন নহে।

ইন্দুমতী স্বয়ম্বরে, দৌবারিকী ইন্দুমতীকে এক রাজার নিকট হইতে অন্য রাজার কাছে লইয়া যাইতেছে।

তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা
রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায় ।
সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা
পদ্মান্তরং মানসরাজহংসী ॥

সেই বেত্র গ্রহণে নিযুক্তা (দৌবারিকী) ইন্দুমতীকে সমীরণে উত্থিত তরঙ্গলেখা যেমন রাজহংসীকে পদ্মান্তরে লইয়া যায় তদ্রূপ অন্য রাজার কাছে লইয়া গেল।

সেবার সুনন্দা ইন্দুমতীকে অঙ্গেশ্বরের নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

অনেন পর্য্যাসয়তাশ্রুবিন্দুন
মুক্তাফলস্থূলতমান্ স্তনেষু ।
প্রত্যর্পিতাঃ শত্রুবিলাসিনীনা
মুন্মুচ্য সূত্রেণ বিণেব হারাঃ

ইনি শক্রবিলাসিনীদিগের স্তনে মুক্তাফলবৎ স্থূলতম অশ্রুবিন্দু সকল পাতিত করিয়াছেন। যেন তাহাদের মুক্তাহার কাড়িয়া লইয়া সূত্রবিনা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

সুনন্দা ইন্দুমতীকে যে রাজার কাছে লইয়া যায়, ইন্দুমতী তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া যান।

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিম্বরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ॥

কেহ রাত্রিকালে প্রদীপ হস্তে রাজপথস্থিত প্রাসাদাবলীর নিকট দিয়া যাইলে তখনকার প্রদীপের সহিত ইন্দুমতীর তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন।

রাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা রাজমার্গস্থিত অট্টালিকার নিকট দিয়া গমন করিলে পরে সেই অট্টালিকা যেমন ম্লান দেখায়, পতিম্বরা ইন্দুমতী যে যে রাজাকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন, সেই সেই রাজা তদ্রূপ বিবর্ণভাব ধারণ করিলেন।

পরে ইন্দুমতীর সহিত অজের পরিণয় হইলে, তাঁহারা অযোধ্যাগমন করিলেন। কালক্রমে ইন্দুমতীর মৃত্যু সময় উপস্থিত। রাজা অজ এবং রাজ্ঞী ইন্দুমতী পুষ্পোদ্যানে বিহার করিতেছিলেন। এমত কালে দেবর্ষি নারদ দক্ষিণ সমুদ্র তীরে বীণাযন্ত্রযোগে মহাদেবের স্তুতিগান করিতে গমন করিতেছিলেন। স্বর্গীয় কুসুম-দামে তাঁহার বীণাযন্ত্র শোভিত ছিল। দৈবাৎ পবন চালিত হইয়া সেই দিব্য মালা বীণা হইতে স্খলিত হইয়া ইন্দুমতীর স্তনাগ্রভাগে পতিত হইল। সেই মাল্যাঘাতই ইন্দুমতীর মৃত্যুর কারণ হইল।

ক্ষণমাত্র সখীং সুজাতয়োঃ
স্তনয়োস্তামবলোক্য বিহ্বলা।
নিমিমীল নরোত্তমপ্রিয়া
হৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী॥

সুন্দর স্তন যুগলের ক্ষণমাত্র সখী সেই মালা দৃষ্ট করিয়া বিহ্বলা রাজমহিষী রাহুগ্রস্ত চন্দ্রকিরণের ন্যায় নিমীলিত হইলেন।

বপুষা করণোজ্ঝিতেন সা
নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ
ননু তৈল নিষেক বিন্দুনা
সহ দীপার্চ্চি রুপৈতি মেদিনীং॥

ইন্দুমতীর ইন্দ্রিয়চেষ্টাশূন্য শরীর পতিত হইল এবং স্বামীকেও পাতিত করিল। প্রদীপ্ত দীপশিখায় নিষিক্ত তৈলবিন্দু দীপ্তার্চ্চি সহিতই ভূতলে পতিত হইয়া থাকে।

ইন্দুমতীর মৃতদেহ অজের ক্রোড়ে পতিত রহিয়াছে।

পতিরঙ্কনিষণ্ণয়া তয়া
করণাপায় বিভিন্ন বর্ণয়া।
সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাং
মৃগলেখা মৃষসীব চন্দ্রমা॥

প্রাণবিনাশ হেতু ম্লান, ক্রোড়স্থিত সেই ইন্দুমতী কর্ত্তৃক অজ উষাকালে ম্লান মৃগচিহ্নধারী চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

অজ ইন্দুমতী জন্য বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন।

অথবা মৃদুবস্তু হিংসিতুং
মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।
হিমষেক বিপত্তি রত্রমে
নলিনী পূর্ব্ব নিদর্শনং মতা

অথবা প্রজানাশক কাল কোমলবস্তু হিংসাজন্য কোমল বস্তুই অবধারিত করিয়াছেন। হিমপাতে বিনশ্বর কমলই আমার পক্ষে ইহার প্রথমোদাহরণ।

অথবা মমভাগ্য বিপ্লবাৎ
অশনিঃ কল্পিত এষ বেধসা।
যদনেন তরুর্ণপাতিতঃ
ক্ষপিতা তদ্বিটপাশ্রয়ালতা॥

কিম্বা আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বিধাতা এই পুষ্পমালাকেই বজ্র কল্পনা করিয়াছেন। যে হেতু এই বজ্রদ্বারা আশ্রয় বৃক্ষ পাতিত হইল না কিন্তু তদাশ্রিতা লতা বিনষ্টা হইল।

ইদমুচ্ছসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাং।
নিশি সুপ্ত মিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তর ষট্পদস্বনং॥

বায়ুবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত সুতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর গুঞ্জনরহিত একটী পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

ক্রমশঃ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জৈমিনির মতে দেবতা নামক কোনও জৈব পদার্থ নাই। "ইন্দ্র" এই শব্দই দেবতা। তদ্ভিন্ন "ইন্দ্র" এই শব্দের অর্থ সহস্রাক্ষাদি যুক্ত কোন জীব নাই। যাগ কালের দ্রব্য ত্যাগের উদ্দেশ্য ভূত দেবতার "ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্র মাত্র। মীমাংসা দর্শনের ষষ্ঠাধ্যায়ে ইহার একপ্রকার বিচার করা হইয়াছে। "ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ শাস্ত্রং সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দেবতাদিগের যাগযজ্ঞ করার অধিকার নাই, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দেবতাদিগের কোন প্রকার বিগ্রহ নাই। এই অংশে জৈমিনী যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতেছে। ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য যেমন যাগের একটি অঙ্গ, দেবতাও তদ্রূপ একটি যাগের অঙ্গ। যাগকালে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতে হয়, যদি দেবতা শরীরী হন, তবে তাঁহাদিগের আগমকালে যজমানের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, আর যদি তাঁহারা মহিমাবলে আস্মদাদির অপ্রত্যক্ষ হইয়া অবস্থান করেন এমত হয়, তথাপি এক সময়ে বহু লোক যাগ করিতেছে এবং সকলেই এককালে আহ্বান করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার অন্যত্র গমন অসম্ভব এবং শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠান থাকা উচিত কিন্তু তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, আর যদি মন্ত্রই দেবতা হয়, তবে যে যে স্থলে যাগ করুক না কেন, "ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই যজ্ঞ সিদ্ধি হইবেক। "বজ্র হস্তো পুরন্দরঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য সকল স্তুতিবাক্য মাত্র। জৈমিনি এইরূপ দেবতা ও যজ্ঞ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহা আধুনিক রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত, এজন্য গ্রহণ করিলাম না।

সোমলতার উল্লেখ বেদমধ্যে বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋষিগণ সোমের স্তুতি করিয়াছেন, তাহার রস স্বয়ং পান করিয়াছেন, ও দেবতাগণকে অর্পণ করত পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন। বেদে লিখিত আছে, সোমলতার রস তৃপ্তিকর,

হর্ষজনক এবং অতি মধুর। সোমলতা * পার্ব্বতীয় লতা বিশেষ। সামবেদীয় ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে যে, সোমলতা পৃথিবীমধ্যে আর উৎপন্ন হয় না, এজন্য সোম যাগ প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবেক। এক্ষণে পুনা প্রভৃতি স্থান হইতে যে সোমলতা আনীত হয় তাহা বৈদিক কালের প্রকৃত সোমলতা নহে কিন্তু সেই জাতীয় বটে। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ হৌগ সাহেব এই লতার আস্বাদ অতীব তিক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত এবং মত্ততাকারক লিখিয়াছেন * কিন্তু বেদে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে লিখিত আছে সোমলতার রস সুমিষ্ট, মাদক ও অত্যন্ত হর্ষজনক যথা ঋগ্বেদ—"যৎসালোঃ সালুমারুহৎভূর্য্য স্পষ্ট কর্ত্বং। তদিন্দ্রোঽর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণি রেজতি।"

যৎকালে যজমান সকল সোমবল্লী আহরণের নিমিত্ত এক পর্ব্বতশিখর হইতে শিখরান্তরে আরোহণ করেন, তখনই তাহাদিগের সোম-যাগ আরম্ভ করা হয়। ইন্দ্র তৎকালে যজমানের প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে আগমন করেন।

"প্রবো মিয়ন্ত ইদং বোমৎসয়া মাদয়িষ্ণবঃ।
দ্রপ্সা মধ্বশ্চ মূষদঃ।" (১ম, ২৬ ব, ৪ অনুবাক ১৪ সূক্ত)

হে ইন্দ্র আদি দেবগণ! আপনাদের নিমিত্ত উৎকৃষ্টরূপে সোম সম্পাদন করা হইতেছে, ইহা অত্যন্ত তৃপ্তিকর, হর্ষের হেতু, বিন্দু বিন্দু করিয়া নিষ্কাসিত, অতি মধুর এবং চমূ অর্থাৎ পাত্রবিশেষে অবস্থিত আছে। পুনশ্চ "অশ্বিনৌ পিবতং মধু" অর্থাৎ হে অশ্বিনী কুমার মধু মাধুর্য্য গুণবিশিষ্ট সোম পান কর। এইরূপ সর্ব্বত্রই বেদে সোমের মিষ্টতা বর্ণনা আছে, বিশেষ ১৯ বর্গ সোমসূক্ত নামক ঋক্ সমূহে, সোমের মিষ্টাস্বাদ বর্ণনা করা হইয়াছে। সোমের রস দুগ্ধের ন্যায় ও গাঢ় যথা "সন্তে পয়াংসি সমুচন্ত বাজা" অর্থাৎ হে সোম! তোমার পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত পয় অর্থাৎ ক্ষীর সকল তোমাকেই প্রাপ্ত হউক। ইহার বর্গ সম্বন্ধে এই মাত্র উক্ত হইয়াছে "রাজ্ঞোনুতে বরুণস্য ব্রতানি বৃহস্পাতবং তব সোম ধাম—" অর্থাৎ হে সোম! তুমি রাজমান বরুণের ন্যায়, তোমার তেজ অতি বিস্তীর্ণ এবং গাম্ভীর্য্যযুক্ত। ইহাতে এই মাত্র অনুভব হইতেছে যে সোমের বর্ণ জলের ন্যায় শুভ্র। সোমলতার আকার পুতিকা † (পুঁই শাকের মত) লতার সদৃশ হইবার সম্ভাবনা, কেন না সোমলতার অভাবে পুতিকা লতার বিধান আছে—"সাদৃশ্যে প্রতিনিধিঃ" শাস্ত্রকারেরা কোন বস্তুর অভাব হইলে তৎসদৃশ বস্তন্তরের গ্রহণ বিধান করিয়াছেন। সোমাভাবে পূতিকা বিধি যথা—

* Asclepias acida.
* Ait. Br. vol. II, p. 489.
† Guilandina Bonduc.

সোমাভাবে পূতিকানভিষুনুয়াৎ" (শ্রুতিঃ)

ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সোমাভাব স্থলে পূতিকা বিধানের অনেক বাক্য আছে।

সোমতন্তু অর্থাৎ অভ্যন্তরে আঁশযুক্ত লতা যথা—

আপ্যায় স্বমন্দিতম সোম বিশ্বেভিবংশুভিঃ।
ভরানঃ সুশ্র বস্তমঃ সখাবৃধে। (১৪ অ ১৯ সূক্ত)

অর্থাৎ অতিশয় মদযুক্ত সোম! তুমি তোমার সমুদায় তন্তু দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর।

সোমরসের বিবিধ গুণের মধ্যে পুষ্টিকারিতা ও রোগ নাশকত্ব গুণ আছে যথা—

"গয়স্কানো অমিহা বসুবিৎপুষ্টিবর্দ্ধনঃ" (১৪ অ, ২১ সূ)

অর্থাৎ হে সোম! তুমি ধনের বৃদ্ধিকারী, রোগ সমূহের নাশক, শরীর ও মনের পুষ্টিকারক।

আর্য্য কালের ঋষিগণই সোমলতা প্রকাশ করেন যথা—

"ত্বং সোম প্রচিকিতো মনীষত্বং রজিষ্ঠ মনুনেষি পথাং"

অর্থাৎ হে সোম! তুমি আমাদের বুদ্ধি দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছ।

সোমরস কণ্ডন দ্বারা অর্থাৎ কুটিয়া অভিষব অর্থাৎ নিষ্কাসন করা হইত। ইহা রাখিবার পাত্রকে চমূ কহে। এই পাত্র কাষ্ঠ বা গোচর্ম্ম নির্ম্মিত হইত। উহার রস উঠাইবার পাত্র পৃথক, তাহার নাম গ্রহ।

ঋগ্বেদে পুরুরবা যযাতি প্রভৃতি রাজাদিগের নাম পাওয়া যায় যথা "মনুষ্ম দগ্নে অঙ্গিরস্বদাঙ্গিয়ো যযাতি বৎসদনে পূর্ব্ববচ্ছুভে।"

বেদের সংহিতা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে অনেক রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের আখ্যায়িকা আছে, তাহাকে পুরাণ বলা যায়; * ইহা ভিন্ন বৈদিক কালে অন্য পুরাণ ছিল না, তবে মহাভারত, রামায়ণ অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি বেদানুচারী অর্থাৎ অনেকাংশের অবলম্বন পীঠ বেদ। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কাশীর পণ্ডিতগণের তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইলে তিনি বৈদিক আখ্যায়িকাই পুরাণ বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি স্বতন্ত্র পুরাণ মান্য করেন নাই।

ভাবা পার্থিব অবস্থা, মনুষ্যগণের প্রকৃতি এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সমুদয় পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং সহজেই এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, এখন আমরা যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি, অতি পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। কিরূপ ছিল, তাহাও নিরূপণ করা যায় না। তবে কি না পুরাকালের ভাব মনোমধ্যে আবির্ভূত

* "ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ" অথর্ব্ব বেদ।

হইলে অনির্ব্বচনীয় আমোদ উপস্থিত হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ নিরূপণ করিতে ইচ্ছা হয়।

অনুসন্ধেয় বিষয় বহুপ্রকার হইলেও প্রধানতঃ ৪টী বিভাগ স্থির করা গেল। ভাষা (১) পার্থিব অবস্থা (২) জীবপ্রকৃতি (৩) তাহাদের ব্যবহার পদ্ধতি (৪) ইহার স্পষ্টতার জন্যে ৪টী কালেরও উল্লেখ হউক—বৈদিক কাল (১) আর্য্যকাল (২) আচার্য্যকাল (৩) পরাভূত কাল (৪) যে কালে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকল প্রচারিত হয়, তাহাই বৈদিককালের লক্ষ্য। আর্য্যকালের লক্ষ্য মধ্যকাল, (অর্থাৎ যে সময় স্মৃতি ও নানাবিধ পুরাণ প্রকটিত হয়।) এই আর্য্যকাল ও পরাভূত কাল এতদুভয়ের অন্তরাল কালকে আচার্য্য কাল বলিয়া জানিতে হইবে। পরাভূত-কাল, বর্ত্তমানকাল ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা গেল। এই ৪টী কালের সহিত উপরোক্ত ৪টী বিষয়ের প্রত্যেক সম্বন্ধ থাকিবে।

এক্ষণে বৈদিক কালের ভাষাসম্বন্ধে লেখা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা সংস্কৃত। তদ্ভিন্ন অন্য ভাষাও দেখা যাইতেছে। এইরূপ আদিমকালেও ছিল কিনা? অনুসন্ধান করিলে ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। সংস্কৃতের অবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য ভাষা কিরূপ আকারে ছিল, তাহা বুঝা যায় না। বৈদিক গ্রন্থ সকল পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভিন্ন ভাষান্তরেরও প্রচার ছিল, এবং তাহা এক্ষণকার ন্যায় শ্রেণীবিশেষে বিভিন্ন আকারে ছিল। দেবতারা কিম্বা আর্য্যেরা যাহাকে "গৌ" বলিতেন; তৎকালে অসুরেরা তাহাকে "গাবী" "গোনী" "গোপোৎলী" ইত্যাদি বলিত। তাঁহারা শত্রুদিগকে "হে অরয়!" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, অসুরেরা "হে লয়" বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিত। যাহারা আদিমকালের অসুর, তাহারাই মধ্য কালের ম্লেচ্ছ। কেন না, মহর্ষি জৈমিনি "চোদিতন্তু প্রতীয়েত অবিরোধাৎ প্রমাণেন" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ম্লেচ্ছ সাংকেতিক পদার্থকেও যজ্ঞ কার্য্যে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া পুর্ব্বোক্ত আসুরিক বাক্যকে ম্লেচ্ছ বাক্য বলিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। "পিক" "নেম" "সত" "তামরস" প্রভৃতি অনেক গুলি শব্দ এক্ষণে সংস্কৃত ভাষামধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐ সকল শব্দ সংস্কৃতই নহে। ঐ সকল শব্দ তত্তৎ অর্থে পুর্ব্বকালের অসুরেরা বা ম্লেচ্ছরাই ব্যবহার করিত। তাহারা কোকিলকে "পিক," নামকে ও অর্দ্ধ ভাগকে "নেম," পদ্মকে "তাম রস" বলিত। সংহিতা গ্রন্থে যাহাদিগকে অসুর বলা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলা হয়, তদ্দৃষ্টে ম্লেচ্ছ ও অসুর একপ্রকার অবস্থাম্বিত বলিতে হইবে। তবে "ম্লেচ্ছ" এই নামান্তর হইবার জন্য অন্য কারণ দৃষ্ট হয় না। পুরাকালেও এক্ষণকার ন্যায় সাধারণ ব্যবহার্য্য ভাষান্তর ছিল, তাহার আর সন্দেহ

নাই। বিশেষতঃ, "তেঽসুরাহেলয় হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃপরাবভূব তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিত বৈ নাপভাষিত বৈ ম্লেচ্ছোঽবা যদেষ অপশব্দঃ" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যাহারা অসুর, তাহারাই ম্লেচ্ছ এবং সংস্কৃত ভিন্ন নানা-প্রকার অপশব্দ ছিল। "না যজ্ঞিয়াং বাচং বদেৎ" ইত্যাদি মন্ত্র কাণ্ডে ও যজ্ঞকালে অপশব্দ বলিতে নিষেধ থাকাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইতেছে। অতএব সংস্কৃত ভিন্ন অন্য প্রকার ভাষাও ছিল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদের অথবা তৎসমজাতীয় গ্রন্থের সংস্কৃত আমরা বুঝিতে পারি না। তাহার কয়েকটী নিগূঢ় কারণ আছে। প্রথমতঃ বর্ত্তমান কালের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন বেদের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন নয়। (ব্যাকরণই বেদবাক্য অনুসারে রচিত যেহেতু ব্যাকরণ বেদের অনেক পরে) দ্বিতীয়তঃ বাক্যের আকার সংস্থান এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। তৃতীয়তঃ পূর্ব্বে যে সকল শব্দ দ্বারা যে সকল বস্তুকে বুঝাইবার প্রথা ছিল, এক্ষণে আর সেই সকল শব্দ দ্বারা সেই সকল বস্তু বুঝান হয় না এবং শব্দ সকলের সম্বন্ধ ঘটনা এক্ষণকার রীতি বহির্ভূত। মনে করুন—"সত্যং তেষা অমবন্ত ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ। হিম কৃন্বন্ত বাতাং।" (ঋগ্বেদের ১ অং, ১ম অষ্টক, ১ম, ২৮ সূক্ত, ৭ ঋক্) এই ঋক্ পাঠ মাত্রে বোধ হয় কেহই বুঝিবেন না, না বুঝিবার অন্য কিছু কারণ নাই, কেবল ঐ সকল শব্দ ও ঐরূপ রীতি আমরা কখন অনুভব করি নাই। "সত্যং" এই শব্দটী আমরা ব্যবহার করি—উহা বুঝা গেল। তৎপরে "ত্বেষা" বুঝিলাম না, আমাদের বুদ্ধি তু+এষা এইরূপ গ্রহণ করিতেই প্রথমতঃ ধাবিত হইবে, কিন্তু তাহা নহে। আমরা যেরূপ স্থলে "ত্বিষ্" শব্দের ব্যবহার করি—তেমনি স্থলে "ত্বেষা" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। "ত্বেষা" ঐ ত্বিষ্, শব্দই। "অম বন্তঃ" অম শব্দে বল বুঝায়। "অম" এইটী বলের একটী নাম, তাহা আমরা আর শুনিতে পাই না সুতরাং বুঝিতেও পারি না। "ধন্বঞ্চিদা" "ধন্বন্" মরুভূমি "চিৎ" প্রায়শঃ। ইহা বুঝিলেও বুঝা যায় বটে কিন্তু "চিদা" এই চিৎ শব্দের পরে আকার থাকাতেই গোলযোগ। ঐ আকারটীর সহিত "অবাত্যং" শব্দের সম্বন্ধ। আ অবাতাং। আ সমন্তাৎ। এইরূপ অর্থ হইবে। ইত্যাদি পূর্ব্বে ব্যাকরণে ছিল না।

"বৃহস্পতি রিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতি পদোক্তানাং শব্দানাং শব্দ পারায়ণং প্রোবাচনান্তং জগাম।" এই বেদবাক্য দ্বারা প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বকালে চীন দেশীয় বর্ণমালার ন্যায় একটী একটী করিয়া শব্দরাশি শিখিয়া গ্রন্থাধ্যয়ন করিতে হইত। কিছুকাল পরে কিঞ্চিত কৌশল সম্পন্ন প্রণালী নিবদ্ধ হইল—অর্থাৎ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাতন, এই ৪ জাতি শব্দ। "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োঽস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তা সোঽস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো বার রীতি মহো দেবো মর্ত্যাং

আবিবেশ।" শব্দ সমুদ্রের পার প্রাপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপিত হইলে উক্ত রূপক বাক্যটী লোকে আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছিল। বৈয়াকরণিক বস্তুগুলিকে উহাতে বৃষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, এই ৪ প্রকার পদসমূহ ঐ বৃষের শৃঙ্গ। ৩টী কাল তাহার পদ। সুপ ও তিঙ তাহার মস্তক। ৭টী বিভক্তি তাহার হস্ত। উরঃ কর্ণ ও মূর্দ্ধা এই তিন স্থানে ঐ সমুদয় গ্রথিত। এই বৃষ জগতে আবির্ভাব হইবামাত্র শব্দকার্য্য রব করিয়া উঠিল। যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রকাশ করা যায় বলিয়া উহা নানা প্রকার নামে খ্যাত হইল। কিছুকাল পরেই ব্যাকরণ জন্মে। ব্যাকরণ বলিলে যে পাণিনি ব্যাকরণ বুঝিবে তাহা নহে, কেন না, পাণিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং "ব্যাকরণ" এই নামও পাণিনি ব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান ব্যাকরণ, বর্ত্তমান নিরুক্ত গ্রন্থ, বর্ত্তমান কোষ গ্রন্থ, এ সকলের পূর্ব্বেও ঐ ঐ জাতীয় গ্রন্থ ছিল। পাণিনি যেমন পূর্ব্ব ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, নিরুক্তকার যাস্ক মুনিও অন্য নিরুক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। মেদিনী প্রভৃতি কোষ গ্রন্থের পূর্ব্বে "বৃহদুৎপলিনী" "উৎপলিনী" প্রভৃতি কোষ গ্রন্থ ছিল, ঐ সকল এখন আর পাওয়া যায় না। "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা গ্রন্থে ঐ সকল প্রাচীন কোষ হইতে শব্দ পর্য্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব পাণিন্যাদি সম্পূর্ণ আদিম আচার্য্য নহেন। বৈদিকগ্রন্থে বলের নাম ২৮ সংগ্রামের নাম ৪৬ অপত্যের নাম ১৫ বাক্যের নাম ৫৭ ধনের নাম ২৮ ইত্যাদি দেখা যায়। সে সকল নাম এক্ষণে আর ব্যবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না। আদিম কালের কোন বস্তুর নাম ১০ ছিল, এক্ষণে তাহার ২০০ নাম দেখা যায়। আবার কোন বস্তুর নাম ৫০টী ছিল এখন ৫টীও নাই, এতদূর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কতকগুলি শব্দ আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান চলিয়া আসিতেছে। যথা—গো, অশ্ব ইত্যাদি। কতকগুলি ম্লেচ্ছ শব্দ শুনিলে সাধারণে মনে করে পারসী কি ইংরাজী, বস্তুতঃ তাহা নহে। যুধিষ্ঠিরকে বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় গুপ্ত জতুগৃহের কথা বলিয়াছিলেন, এই কথায় সাধারণে মনে করে বিদুর ও যুধিষ্ঠির পারসী জানিতেন, উহা ভ্রম।

ফল ম্লেচ্ছভাষা সম্বন্ধে যেরূপ আর্য্য শাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে এইরূপ অর্থ দাঁড়ায় যে ম্লেচ্ছভাষা আর কিছু নহে, কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বৈয়াকরণিক সম্বন্ধহীন ভাষাই ম্লেচ্ছ ভাষা। ম্লেচ্ছ ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ নির্ণয় আছে।

শুদ্ধ ভাষা তিন প্রকারে রূপান্তর হইয়া ম্লেচ্ছ ভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন স্থলে বর্ণাধিক্য বশতঃ কোথাও বর্ণবিপর্য্যয় বশতঃ কোথাও বা বর্ণ লোপ বশতঃ—স্থল বিশেষে বর্ণ স্বরাদি বিকৃত হইয়া ম্লেচ্ছ ভাষা নামে প্রচলিত

হইয়া যায়। কাম্বশত পথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে উক্তপ্রকার ভাষার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক নাটকাদিতে যেমন ভদ্র ও ইতর লোকের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন, তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থেও দেবতাদিগের ও অসুর ম্লেচ্ছদিগের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন। কাম্বশত পথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্র অসুরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইমাং চিত্রাখ্যাং মদীয়া মিষ্টকামুপধাস্যে"—তোমাদিগের নিমিত্ত আমি এই আমার ইষ্টকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করি। অসুরেরা উত্তর করিল "উপহি" এটী উপধেহি হইলে শুদ্ধ হইত কিন্তু বর্ণ লোপ হওয়াতে তাহা না হইয়া ম্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপ "তেঽসুরা হেলয় ইতি বদন্তঃ পরাবভূবুঃ" এস্থলে "হেলয়" এই শব্দের স্থানে দেবতারা বা আর্য্যেরা "তঽঅবয়ঃ" প্রয়োগ করিয়াছেন। এস্থলে বর্ণ বিপর্য্যয়ানুসারী ম্লেচ্ছভাষা জানিতে হইবেক।

এইরূপ বৈদিক ভাষার আলোচনা করিলেও বৈদিককাল নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এক সময়ে রচিত হয় নাই। বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর হৌগ সাহেব অনুমান করেন বেদের সংহিতা ২৪০০ হইতে ২০০০ খৃষ্ট জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ ভাগ ১২০০ খৃঃ পূঃ রচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও বিপ্র শব্দে পূর্ব্বে বৈদিকমন্ত্রের বক্তা বুঝাইত, এক্ষণে সূত্রধারী ব্রাহ্মণ যেমন এক জাতি হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। যাঁহারা যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং ধর্ম্মের প্রচার করিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে বাচ্য হইতেন, পরে ক্রমে উহা পুত্র পৌত্রাদির একটি ব্যবসা অনুসারে ব্রাহ্মণ এক জাতি হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের বৈদিককাল হইতেই শিখা রাখা প্রসিদ্ধ কিন্তু সে সময় "তরমুজের বোঁটা সম টীকি শোভে শিরে" ছিল না, তাহা শাস্ত্রানুসারে মস্তকের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া থাকিত, এই শাস্ত্রীয় টীকির নাম "বেড়ী।" ইহা ভিন্ন বংশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিখা রাখার পদ্ধতি ছিল যথা—

দক্ষিণ কপর্দা বাশিষ্ঠা আত্রেয়াস্ত্রি কপর্দিনঃ।
আঙ্গিরসঃ পঞ্চচূড়া মুণ্ডা ভৃগবঃ শিখিনোঽন্যে॥

এইরূপ শিখা রাখা কেবল টুপী বা পাগড়ীর প্রতিনিধি। বৈদিককালে টুপী বা পাগড়ী বন্ধন করিতে হইত, তাহা না করিলে লোকসমাজে নিন্দা করিত যথা —মহর্ষি আপস্তম্ব কহিয়াছেন "নসমা বৃত্তাবপেষু বন্যএ বীহারাদিত্যেকে। তথাপি ব্রাহ্মণং এব রিক্তোবাণপিহিতস্তস্যেব তদেব পিধানাং বচ্ছিমো।" অর্থাৎ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মস্তক মুণ্ডন করিবে না, কেন না গৃহস্থ ব্যক্তি মস্তক আবরণ শূন্য

হইলে, সে লোকের নিকট তুচ্ছ হয়। এজন্য যে ব্যক্তি শিখা রাখে তাহার শিখাই ঐ আবরণ স্থানীয়।

বৈদিককালের আর্য্যেরা কৃষিজীবী ছিলেন, তাঁহারা কৃষিকার্য্যেই বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। বেদের মধ্যে গ্রাম ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত পুরের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যজ্ঞবেদী ইষ্টকে নির্ম্মিত হইত, ইহাতে বোধ হয় গৃহাদিও ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত হইত; আদিম কালে অসুরেরাও অসভ্যজাতি দৌরাত্ম্য করিত এবং আর্য্যগণ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেন, আর কোন কোন সময়ে কোন উপায় না দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট তাহাদের দমনের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজার দ্বারা গ্রামাদি শাসিত হইত, ভাব্য প্রভৃতি রাজার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। সে সময় আর্য্যজাতির ব্রীহি (ধান্য) যব, মাষকলাই, তিল, ওষধি (শস্য) বীরুৎ (লতা) করম্ভ (ফল) ("ব্রীহি মথো যব মথো মাস মথোতিলং") প্রধান আহারের দ্রব্য ছিল সময়ে সময়ে তাঁহারা অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক এবং যজ্ঞকার্য্য ভিন্নও মেষ, মহিষ, গো প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিতেন।

সোম রস এবং বিবিধ প্রকার সুরার সে সময় অত্যন্ত ব্যবহার ছিল এবং সুরা বিক্রেতারও অভাব ছিল না। ঋগ্বেদ মধ্যে আর্য্যজাতির নানা প্রকার ব্যবসার উল্লেখ আছে। অধিকাংশ লোকেই ব্যবসা কার্য্য দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আদিম কালে মনুষ্যের আয়ু ১০০ বৎসরের অধিক ছিল না। মনু বলেন সত্য যুগে মনুষ্যের আয়ু ৪০০ বৎসর, ত্রেতায় ৩০০ বৎসর, দ্বাপর ২০০ বৎসর, কলিতে ১০০ বৎসর; এসকল কল্পনা মাত্র; কেন না বেদে দেখা যায় পুরুষের আয়ু শত বৎসর—"ধত্তে শতাক্ষরা ভবন্তি শতায়ুঃ পুরুষঃ—" পুনশ্চ ঋক্ মন্ত্রে দেখা যায় আর্য্যগণ প্রার্থনা করিতেন "জীবেমঃ শরদঃ শতম্,, অর্থাৎ আমি যেন শত বৎসর জীবিত থাকি এবং আশীর্ব্বাদ করিবার সময়েও বলিতেন "দাতা শতং জীবতু"—দাতা শত বর্ষ জীবিত থাকুন। ইত্যাদি। আর্য্য জাতির আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পুনরায় লেখনী ধারণ করিবার ইচ্ছা আছে, এজন্য তৎসম্বন্ধে এস্থলে বাহুল্য আলোচনা করিলাম না।

শ্রীরামদাস সেন।

ভাগীরথী উপকূলে, আছি গো সকল ভুলে,
ছাড়ি দেও মোরে কলিকাতা।
তোমায় স্মরণ হ'লে, অঙ্গ মোর জায় জ্বলে,
গঙ্গে তুমি নিস্তারিণী মাতা॥
পরমা প্রকৃতি তুমি, তোমা-কূল পুণ্য ভূমি,
পাপ যায় তোমা দরশনে।
ত্যজিব যখন প্রাণ, পাদপদ্মে দিও স্থান,
তোমা কূলে কি ভয় মরণে॥
লক্ষ্মী ত্যজিয়াছে বঙ্গে, তুমি ত্যজ নাই গঙ্গে
তুমি মাতঃ অগতির গতি।
সন্তান স্নেহের লাগি, দারুণ দুঃখের ভাগী,
বন্দি কৈল কলির ভূপতি॥
দোধারি তোমার কূলে, তরুরাজী হেলে দুলে,
দেবালয় শোভে জরাজীর্ণ।
ঘাটে ঘাটে দ্বিজগণ, জপ জপে নিমগন,
দুই সন্ধ্যা লোকে লোকাকীর্ণ॥
বারেক পশ্চাৎ ফিরি, ঘাটে নামে ধীরি ধীরি,
কুলবালা সলজ্জ বদনে।
স্নান করি কেশ ঝাড়ে, হেলায় হৃদয় কাড়ে,
আড়ে আড়ে চাহে কতজনে॥
চরণে হৃদয় দলি, যুবতী গেল ত চলি,
পদচিহ্ন রহিল যা পড়ি।
শত শত মনো অলি, বিরহ অনলে জ্বলি,
তাহে যায় খেদে গড়াগড়ি॥
কিকাণ্ড হতেছে পিছু, জানিতে যদি গো কিছু
কোন প্রাণে না চাহিতে ফিরি।
ভুরুরও ভঙ্গিমাটি, মরণ বাঁচন কাটি,
মৃদু হাসি বিষের মিছিরি॥
এসব থাকে না আর, কলে কলে একাকার,
হইয়াছে গঙ্গার দুধার।
গর্জ্জানি ফোঁসানি আর, কালো ধূম উদগার
দশদিক্ করিল আঁধার
এই ত গঙ্গার কূলে, মহোচ্চ পাদপমূলে,
বসিয়াছি পূর্ব্বে এক কালে।
ও পারে জ্বলিল দীপ, যেন কনকের টিপ,
শৈলজার ভুরু অন্তরালে॥
সন্ধ্যা ঘনাইয়া এল, নীল অম্বরের তেলো,
ঝিক্ মিক্ করিতে লাগিল।
কুটির যতেক তরী, সট্ সট্ সট্ করি,
অমনি চলিতে আরম্ভিল॥
সে যে শনিবার রাত্রি যত কুটিয়াল যাত্রী,
ছয় দিনে যাপে ছয় বর্ষ।
পাইয়ে সুখের রাতি, বেড়েছে বুকের ছাতি,
ধরায় ধরে না আর হর্ষ॥
দিব্য তানমান ছাড়ি, সুখে যাইতেছে বাড়ি,
দাঁড় পড়ে ঝপাস ঝপাস।
মনের বেগের কাছে, নৌকাবেগ কোথা আছে
হাঁকে মাঝি "সাবাস সাবাস॥"

যাত্রীর গীত।

ওই যে দাঁড়ায়ে রাই তোমার শ্যাম চাঁদ।
ওই সে অধরে হাসি মদন ব্যাধের ফাঁদ॥

আমাপানে কেন ফেরো, আপন সম্মুখে হের,
প্রেমের বরিষা-নদে সাজে না লাজের বাঁধ ॥
এমন নহে ত কালা, হাতে লয়ে ফুল-মালা,
আসিতেছে দেখ অই ঘটাইতে পরমাদ ॥
ওদিকে মেঘের ঘটা, এ দিকে বিজলি ছটা,
মিলনে কি হয় শোভা দেখিতে গিয়াছে সাধ ॥
এ সকল গীত গানে, আর শুনিবনা কাণে,
ফুরায়েছে সুখের বসন্ত।
জিনিয়ে করাল কাল, এসেছে কলের কাল,
গীত-স্বরে পড়েছে হসন্ত ॥
অমিত্র অক্ষর ছন্দ, রসের কপাট বন্ধ,
করিয়াছে কবিত্ব-কাননে।
অমিত্রের কষাঘাতে, গেল দেশ অধঃপাতে,
হাসি নাই ভাবের আননে ॥
এতেক দুশ্চিন্তা যত, সকল করিব হত,
দুই বেলা গঙ্গাস্নান করি।
সেবিলে তোমায় গঙ্গে, বল পাই ক্ষীণ অঙ্গে,
মনোদুখ সকল পাসরি ॥
তোমার সলিলে নাবি, পৃথিবীকে স্বর্গ ভাবি,
এমনি শীতল কর দেহ।
তোমার কূলেতে আমি, পোহাই দিবসযামী
দীন দ্বিজে এই ভিক্ষা দেহ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের উল্লেখ করা গিয়াছে। যাহারা কোনরূপ প্রলোভনে না পড়িয়া উত্তমরূপে আপনাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের চরিত্র প্রথমতঃ বর্ণনীয়। আর যাহারা নানারূপ প্রলোভনে পড়িয়াও আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনুমাত্র অনাস্থা প্রদর্শন করেন নাই তাঁহারাই সর্ব্বপ্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহাদের চরিত্র অপর এক অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে স্ত্রীচরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। সেটী প্রধানতঃ স্মৃতিশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে তাদৃশ নারীচরিত্রের কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে। স্মৃতি মধ্যে ঋষিরা উদাহরণ স্বরূপে একটীও স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ করেন নাই। সুতরাং প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ, প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত এবং পুরাণাবলি হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাস ;—পরাশর, অত্রি প্রভৃতি সংহিতারদিগের সমকালবর্ত্তী। সুতরাং তাঁহাদিগের গ্রন্থেই স্মৃতিসম্মত উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। পুরাণ অনেক পরের লেখা ; পুরাণ রচনা সময়ে আর্য্যগণের সে তেজস্বিতা ও সে রূপ চরিত্রের ঔন্নত্য ছিল না। পুরাণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচার ব্যবহার প্রকাশেই অধিক পটু। ঋষিরা যেখানে বলিয়াছেন ব্রহ্মচর্য্য করিবে, পুরাণ সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের যত নিয়ম পাইলেন তাহা ত দিলেনই, তাহার পর, আবার কতকগুলি লৌকিক আচারও তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। শুদ্ধ তাহাতেই তৃপ্ত নহেন কঠোর ব্রতধারী ব্রহ্মচারীর বৈশেষিক চারিত্র (Idiosyncracy) ও তাহার মধ্যে দিয়া ভয়ানক করিয়া তুলিলেন। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের টীকা করিতে গিয়া স্কন্দপুরাণে বৈধব্য আচরণ

যে কিরূপ শোচনীয় ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, যাঁহারা সে পুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। পতিসেবা ঋষিদিগের ব্যবস্থা, পুরাণ তাহার বিশেষ করিতে গিয়া, যে কত আগ্‌ড়ম বাগ্‌ড়ম লিখিয়াছেন তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক এস্থলে আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীস্থ নারীগণের চরিত্র নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাদিগের মধ্যে প্রাচীন পুরন্ধী (মেট্রন) অধিক। কয়েকটী পতিপ্রাণা যুবতীও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা আছেন। পুরাণমতে স্ত্রীলোক, প্রকৃতির অংশ, সত্বগুণাত্মিকা। প্রকৃতি হইতে সাধ্বীদিগের উৎপত্তি। রজোগুণাত্মিকা হইতে ভোগ্যাদিগের এবং তমোগুণাত্মিকা হইতে কুলটাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোক আমাদিগের বর্ণনীয় নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে কতকগুলি প্রধানা প্রকৃতির* নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যথা স্বস্তি ক্ষমা প্রকৃতি অদিতি প্রভৃতির নামোল্লেখের পর নারায়ণ বলিতেছেন—

উপযুক্তাঃ সৃষ্টিবিধৌ এতাশ্চ প্রকৃতেঃ কলাঃ।
কলাশ্চান্যাঃ সন্তি বহ্ব্যঃ তাসু কাশ্চিন্নিশাময়ঃ॥

১। রোহিণী চন্দ্রপত্নীচ
২। সংজ্ঞা সূর্য্যস্য কামিনী।
৩। শতরূপা মনোর্ভার্য্যা
৪। বশিষ্ঠস্যাপ্যরুন্ধতী॥
৫। অহল্যা গোতমস্ত্রী চা
৬। প্যনুস্যূয়াত্রিকামিনী।
৭। দেবহুতি কর্দ্দমস্য
৮। প্রসূতি দক্ষকামিনী॥
৯। পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনকা সাম্বিকাপ্রসূঃ।
১০। লোপামুদ্রা তথাহুতী ১১
১২। কুবেরকামিনী তথা॥
১৩। বরুণানী যমস্ত্রীচ ১৪

---

*ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড—১ম ও ২য় অধ্যায়।

(১) কালিকাপুরাণ (২) বিষ্ণুপুরাণ (৩) শ্রীমদ্ভাগবত (৪) কালিকাপুরাণ ও রামায়ণ (৫) (৬) রামায়ণ (৭) ভাগবত (৮) (৯) কালিকাপুরাণ (১০) কাশীখণ্ড (১১) মহাভারত (১২) রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড (১৫) ভাগবত ও রামায়ণ (১৬) (১৭) মহাভারত।

১৫। বলের্বিন্ধ্যাবলীতিচ।
১৬। কুন্তী চ দময়ন্তী চ ১৭
১৮। যশোদা দেবকী তথা॥ ১৯
২০। গান্ধারী দ্রৌপদী শৈব্যা
২১। সাবিত্রী সত্যবৎপ্রিয়া। ২২
২৩। বৃকভানুপ্রিয়া সাধ্বী।
২৪। রাধামাতা কলাবতী॥
২৫। মন্দোদরী চ কৌশল্যা ২৬
২৭। সুভদ্রা কৈটভী তথা ২৮
২৯। রেবতী সত্যভামা চ ৩০
৩১। কালিন্দী লক্ষ্মণা তথা॥ ৩২
৩৩। জাম্ববতী নাগ্নজিতী ৩৪
৩৫। মিত্রবিন্দা তথাপরা।
৩৬। লক্ষ্মাচ রুক্মিণী ৩৭ সীতা
৩৮। স্বয়ং লক্ষ্মী প্রকীর্ত্তিতা॥
৩৯। কলা যোজন গন্ধাচ
৪০। ব্যাসমাতা মহাসতী।
৪১। বাণপুত্রী তথোষাচ।
৪২। চিত্রলেখা চ তৎসখী॥
৪৩। প্রভাবতী ভানুমতী ৪৪
৪৫। তথা মায়াবতী সতী।
৪৬। রেণুকা চ ভৃগোর্মাতা
৪৭। হলিমাতাচ রোহিণী॥

উপরি উক্ত গণনায় সকল সাধ্বীদিগের নামোল্লেখ নাই কারণ শ্রীবৎস পত্নী চিন্তা, শকুন্তলা, ও বালীরাজমহিষী তারা প্রভৃতি অনেকের নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না আর উহাতে দেবতা ও মানুষীর কোন ইতর বিশেষ নাই। এবং প্রকৃতিখণ্ডে ইহাদের সকলের চরিত্র বর্ণনাও নাই। এ প্রস্তাবে ইহাদের কয়েক জনের মাত্র জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইবে এবং তিন বা চারি জনের বিস্তৃত জীবনী সংগৃহীত হইবে।

অহল্যা। গোতমের পত্নী অহল্যা। তিনি পতিপ্রাণা ও সকল বিষয়ে পতি নিদেশানুগামিনী ছিলেন। ইনি যেরূপে ইন্দ্রের প্রলোভনে পতিত হয়েন

তাহা আমাদিগের দেশে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই অবগত আছেন। গোতম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থ বর্ণনা করিলেন। গোতম বহুকাল উঁহাকে কষ্ট দিয়া পরে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকারের পর উঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি উঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয়াদিগের মধ্যে প্রথম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, কি আশ্চর্য্য, প্রাতঃকালে যে কয়েকটী স্ত্রীলোকের নাম করিতে হয় সকল কয়েকটিই ব্যভিচারিণী। কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝিবার ভুল। পুরাণ-কর্ত্তাদিগের ন্যায় বাঁধা বাঁধি করিতে গেলে সব আল্‌গা হইয়া পড়ে। মনুষ্য-স্বভাব দুর্ব্বল, প্রলোভন হইতে উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। একবার এইরূপ প্রলোভনে পড়িয়া একটী দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া একেবারে তাঁহার রাশীকৃত সদগুণ বিস্মৃত হওয়া কি ন্যায়ানুগত কার্য্য? বিশেষতঃ অহল্যাদির দোষোদ্ধারের পর তাঁহারা অতি সাধু আচারে জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম করিলে এইমাত্র বোধ হয় যে যদি মন বিশুদ্ধ থাকে কোন কারণ বশতঃ পাপে পড়িলে তাহা হইতে উদ্ধার সম্ভাবনা আছে। কেহ বুঝিতে না পারিয়া অথবা হঠাৎ কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার না করিয়া উৎপীড়ন করিলে তাহার পাপ প্রবৃত্তি দৃঢ়ীভূত করা হয় মাত্র।

লোপামুদ্রা। পৌরাণিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে হইলে কাশীখণ্ডীয় লোপা-মুদ্রা চরিত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা এই উপাখ্যানটী সবিস্তার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ঋষিরা নৈমিষারণ্যে উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র অন্যান্য ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন "হে মুনে! তোমার তপোলক্ষ্মী আছে—তোমার ব্রহ্মতেজঃ আছে, তোমার পুণ্য লক্ষ্মী আছে এবং তোমার মনের ঔদার্য্য আছে। এই পতিব্রতা কল্যাণী সুধর্ম্মিণী লোপামুদ্রা তোমার অঙ্গচ্ছায়া তুল্যা। ইঁহার কথা অন্যকে পবিত্র করে। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনুসূয়া সাণ্ডিল্যা, সতী, খ্যাতরূপা, লক্ষ্মী, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা, স্বাহা প্রভৃতির ন্যায় ইনিও অতীব পতিপ্রাণা। কিন্তু ইঁহাকে যেমন শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা আছে এমন আর কাহারও নাই। তুমি ভোজন করিলে ইনি ভোজন করেন, বসিলে উপবেশন করেন, নিদ্রাগত হইলে নিদ্রাগতা হয়েন এবং তোমার অগ্রে শয্যা ত্যাগ করেন। পাছে তোমার আয়ু হ্রাস হয় এই ভয়ে কখন তোমার নাম তিনি গ্রহণ করেন না; পুরুষান্তরের নামও কখন মুখে আনেন না। তুমি তাঁহাকে আকর্ষণ করিলে তিনি চীৎকার করেন

না। তাড়না করিলে বরং প্রসন্না হন। এই কর্ম্ম কর বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিয়া, স্বামিন্ ক্ষমা কর বলিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তুমি আহ্বান করিলে গৃহকার্য্য ত্যাগ করিয়া সত্বর গমন করেন এবং বলেন, নাথ! কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন। দ্বারদেশে অধিকক্ষণ থাকেন না। সর্ব্বদা দ্বারে গমন করেন না। তুমি আজ্ঞা না করিলে কাহাকেও কিছু দেন না, তুমি বলিবার অগ্রে সমস্ত পূজার উপকরণ সংগ্রহ করেন। অনুদ্বিগ্ন ভাবে অতি হৃষ্ট হইয়া যথাসময়ে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া সমস্ত সামগ্রী তোমার নিকট উপস্থিত করেন। স্বামীর উচ্ছিষ্ট ফলমূলাদি ভোজন করেন। পতিদত্ত সামগ্রী মহাপ্রসাদ বলিয়া হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। দেবতা অতিথি পরিবারবর্গ গো ও ভিক্ষুকগণকে না দিয়া কিছুই ভক্ষণ করেন না। সর্ব্বদা তৈজস পত্র পরিষ্কার রাখেন। সকল কর্ম্মেই দক্ষা। সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তা ও ব্যয়পরাঙ্মুখী। তোমাকে না বলিয়া ইনি কখন উপবাসাদি ব্রতাচরণ করেন না। তোমার অনুজ্ঞাব্যতীত সমাজ ও উৎসব দর্শন ইনি দূর হইতে পরিত্যাগ করেন। বিবাহ প্রেক্ষণাদি এবং তীর্থ যাত্রাদিতে তোমার অনুমতি বিনা প্রবৃত্ত হয়েন না। তুমি যখন সুখে নিদ্রা যাও বা সুখে উপবেশন করিয়া থাক বা ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া কর তখন অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও তিনি তোমাকে কিছু বলেন না। স্ত্রীধর্ম্মিণী হইয়া ত্রিরাত্রি স্বামীকে আপন মুখ দেখান না এবং যাবৎ স্নান করিয়া না শুদ্ধ হয়েন তাবৎ আপনার বাক্যও শ্রবণ করান না। (মূলে অনেকক্ষণ হইতে আর লটের ব্যবহার নাই এক্ষণে বিধিলিঙের ব্যবহার উঠিয়াছে। ক্রমে লোপামুদ্রার সকল কথাই লোপ হইয়া যাইবে স্ত্রীচরিত্রের নিয়ম উঠিবে। সহমরণের প্রশংসা উঠিবে। এইরূপে এক কথা কহিতে কহিতে অন্য কথা উত্থাপন করা পুরাণ রচনার এক মহদ্দোষ। কবি গায়কেরাও এইরূপ এক কথা কহিতে কহিতে অন্য কথা পাড়িয়া ফেলে।) স্নান করিবার পর ভর্ত্তৃবদন মাত্র দর্শন করিবে আর কাহারও মুখ দেখিবে না। যদি স্বামী নিকটে না থাকেন মনে মনে তাঁহারই ধ্যান করিবে। পতিব্রতা নারী হরিদ্রা কুঙ্কুম সিন্দুরাদি মাঙ্গল্য আভরণ কখন ত্যাগ করিবে না, করিলে স্বামীর আয়ু হ্রাস হইবে। রজকী হেতুকী আশ্রমত্যাগিনীর সহিত সাধ্বী কখন বন্ধুতা করিবে না। যে স্বামীর দ্বেষ করে তাহার মুখ দর্শন করিতে নাই। কোন স্থানে একাকিনী থাকিতে নাই। নগ্ন হইয়া কোথাও স্নান করিতে নাই। উদূখল মূষল বর্দ্ধণী প্রস্তরদেহলী যন্ত্রক প্রভৃতি স্থলে অর্থাৎ যে যে স্থলে অনেক দুষ্ট স্ত্রীলোক সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা যে সকল স্থলে সাধ্বীর উপবেশন করিতে নাই। স্বামীর সহিত প্রগল্‌ভতা করিতে নাই। যে যে দ্রব্যে স্বামীর অভিরুচি

সেই সেই দ্রব্যেই সর্ব্বদা প্রেমবতী হইবেন। স্ত্রীলোকদিগের এই এক যজ্ঞ এই এক ব্রত এবং এই এক দেবপূজা যে স্বামীর বাক্য কখন লঙ্ঘন করিবে না। স্বামী ক্লীব হউন দুরবস্থ হউন ব্যাধিত হউন বৃদ্ধ হউন সুস্থিত হউন বা দুঃস্থিত হউন তাঁহার বাক্য কখন লঙ্ঘন করিবে না। স্বামী হৃষ্ট হইলে হৃষ্ট হইবেন, বিষণ্ন হইলে বিষণ্ন হইবেন। সম্পৎ ও বিপদ উভয় সময়েই একরূপ হইবেন। ঘৃত লবণ তৈলাদি ফুরাইয়া গেলেও স্বামীকে নাই এরূপ বলিবে না। এবং তাঁহাকে আয়াসকর কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। তীর্থ স্নানের ইচ্ছা হইলে স্বামীর পাদোদক পান করিবেন। স্ত্রীর পক্ষে স্বামী শঙ্কর বা বিষ্ণু সকল হইতেই অধিক। যিনি স্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন ব্রতোপবাসাদি করেন তিনি স্বামীর আয়ুর্ণাশ করেন এবং মরিয়া নরক গমন করেন। ডাকিলে যে স্ত্রী ক্রোধান্বিতা হইয়া উত্তর দেয় সে যদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে তবে কুক্কুরী হয় এবং বনে জন্মগ্রহণ করে তবে শৃগালী হয়। স্ত্রীলোকের এই ধর্ম্ম যে স্বামীর চরণ সেবা করিয়া আহার করিবে। কখন উচ্চ আসনে বসিবে না পরের বাটী যাইবে না। লজ্জাকর বাক্য ব্যবহার করিবে না। কাহারও অপবাদ করিবে না। দূর হইতে কলহ ত্যাগ করিবে। যে আপন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গোপনে অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে সে বৃক্ষকোটরবাসিনী উলুকী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে তাড়িত হইয়া স্বয়ং তাড়ন করিতে চেষ্টা করে, সে ব্যাঘ্রী হয়।" এইরূপ নানা প্রকার শাস্তি ও রূপান্তর বর্ণনা করিয়া পরে মুনি আবার আরম্ভ করিতেছেন, "দূর হইতে স্বামীকে আসিতে দেখিয়া যে নারী ত্বরিত গমনে জল, খাদ্য, আসন তাম্বুল ব্যজন পাদসংবাহনা ও চাটু বচন দ্বারা প্রিয়ের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে সেই ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছে। পিতা অল্প পরিমাণে দেন ভ্রাতাও অল্প পরিমাণে দেন পুত্রও অল্প পরিমাণে দেন স্বামী যাহা দেন তাহার পরিমাণ নাই, অতএব এমন স্বামীকে কে পূজা না করিবে? স্বামী দেবতা, গুরু, তীর্থ ধর্ম্ম ও ক্রিয়া। অতএব সকল ত্যাগ করিয়া স্বামীর সেবা করিবে। জীবহীন দেহ যেমন অশুচি হয় স্বামীহীন স্ত্রীও সেইরূপ অশুচি। সকল অমঙ্গল অপেক্ষা বিধবা অধিক অমঙ্গল। বিধবাকে দেখিলে কখন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। মাতা ভিন্ন অন্য বিধবার আশীর্ব্বাদ আশীবিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।" ইহার পর বিধবার নিন্দা সহমরণের প্রশংসা ও হৃদয় বিদারিণী বৈধব্য যন্ত্রণার বর্ণনা। তাহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। পুনশ্চ "গৃহে গৃহে কি রূপলাবণ্য-সম্পান্না গর্ব্বিতা রমণী নাই? তথাপি কেবল বিশ্বেশ্বরে ভক্তি থাকিলেই পতিব্রতা নারী লাভ হয় যাহাদের গৃহে পতিব্রতা রমণী আছে সেই গৃহস্থ।" ইত্যাদি।

লোপামুদ্রার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল এবং তাঁহাকে এই শ্রেণীর কামিনীগণের আদর্শ স্বরূপ বলিয়া গণনা করা যায়। তাঁহা অপেক্ষা অনেক গুণবতী রমণী এই শ্রেণীর অন্তর্গতা এবং তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্প গুণবিশিষ্টাও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা। কিন্তু তিনিই আদর্শ (Type) তাঁহার চরিত্র রামায়ণেও আছে। যেমন পুণ্যশ্লোক শব্দটী যুধিষ্ঠিরাদি কয়েকটি ভাগ্যবানের বিশেষণ হইয়া পড়িয়াছে সেইরূপ যশস্বিনী লোপামুদ্রার বিশেষণ।

এস্থলে পুরাণ ও স্মৃতিকথিত স্ত্রীলোকের চরিত্রগত ভেদ প্রদর্শন করা প্রায়াজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্মৃতি, যত পারেন, অধিক গুণ থাকিলেই প্রশংসা করিয়াছেন, পুরাণ গুণ অধিক চান না। একটী বা দুইটী গুণ সম্পূর্ণরূপে থাকিলেই প্রশংসা করেন। স্মৃতি অনেক দূর ক্ষমা করেন। পুরাণ দুর্ব্বাসা মুনি, তাঁহার ক্ষমা নাই। যদি একটুকু ব্যত্যয় হইল, যদি একদিন রাগ করিয়া স্বামীকে মুখ করিলেন অমনি তাঁহার সহস্র গুণ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। পুণ্যের বলে যদি গ্রামে জন্মিলেন কুক্কুরী হইলেন। না হয় ত শৃগালী হইলেন। পুরাণের বাঁধাবাঁধি অনেক অধিক। সামাজিক অবস্থাগত যে কত প্রভেদ তাহা এই কয় পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। অধীনতা বৃদ্ধি হইয়াছে। অবরোধ প্রায়ই মুসলমানদিগের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোকের স্বামীর সখিত্ব আর নাই এখন কেবলমাত্র দাসীত্ব হইয়াছে।

মহাভারতীয় শকুন্তলা।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান তৎকালীন স্ত্রীচরিত্রের একটী উদাহরণ। ঋষি-পালিতা শকুন্তলা রাজার দর্শনাবধি তাঁহার প্রণয় পাশে বদ্ধ হইলেন। রাজাও গান্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। রাজার ঔরসে তাঁহার এক পুত্র হইল। রাজা কিন্তু রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া অবধি শকুন্তলার কোন সংবাদ লইলেন না। শকুন্তলা পাঁচবৎসর সহ্য করিয়া তাহার পর সন্তান ক্রোড়ে রাজার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা শকুন্তলাকে চিনিলেন কিন্তু দুষ্টতা করিয়া কহিলেন, তুই কুলটা আমি তোকে কখন চিনি না। শকুন্তলা তখন রাজাকে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিলেন। যে প্রতারণা করিতে বসিয়াছে তাহাতে তাহার স্মরণ কেন হইবে। শকুন্তলা তখন রাজাকে মিথ্যা কথা কহার কতকগুলি দোষ দেখাইয়া দিলেন এবং এরূপ সাহসের সহিত বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে সভাস্থ তাবৎ লোকেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল। রাজাও শেষ তাঁহাকে আপন ধর্ম্ম পত্নী বলিয়া স্বীকার করিলেন। আর প্রতারণা করিতে পারিলেন না। মহাভারত ও রামায়ণে সাধ্বীস্ত্রীগণের এরূপ অপূর্ব্ব সাহস দেখা

যায় যে তাহা পাঠ করিলে তৎকালীন রমণীকুলের চরিত্র অতি উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। শকুন্তলা, দেবযানী, দৌপদী, সীতা সকলেই সাহস সহকারে স্বামীর সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছেন এবং দুষ্ট লোকদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। এরূপ সাহস দূষণাবহ নহে বরং ইহাকে একটী গুণের মধ্যে গণনা করা উচিত। আমার চরিত্রে পাপ স্পর্শ নাই এবং পাপে আমার মন নাই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই ওরূপ সাহস জন্মে। মহাভারতে পাতিব্রতোপাখ্যান বলিয়া একটী অধ্যায় আছে। স্ত্রীলোকের চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে তাহার যে কিরূপ সাহস হইত উহাতে তাহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। পাতিব্রতোপাখ্যান দেখ।

সাবিত্রী। এক্ষণে আমরা এই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধানা রমণীর চরিত্রবর্ণনা করিব। তাঁহার নাম সাবিত্রী। ইনি অশ্বপতি রাজার কন্যা। মহারাজা অশ্বপতি কন্যাকে বিবাহের উপযুক্তবয়স্কা দেখিয়া বলিলেন, সাবিত্রি! তোমার বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে অতএব তুমি আমার এই বিশ্বস্ত সারথির সহিত গমন কর। তুমি যাহাকে আপন পতিত্বে বরণ করিবে তাহারই সহিত তোমার বিবাহ দিব। তুমি ইহাতে লজ্জিত হইও না, ইহাই আগমোক্ত বিধি, এবং এই রূপেই অনেক রমণী অভিলষিত পতিলাভ করিয়াছে। সাবিত্রী সেই সারথির সহিত নানাদেশ পরিভ্রমণ করতঃ রাজ্যভ্রষ্ট দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে তপোবন মধ্যে দেখিতে পাইলেন। দ্যুমৎসেনের শত্রুরা তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার চক্ষুঃ উৎপাটন করিয়া দিয়াছে। সত্যবানের গুণের পরিচয় পাইয়া সাবিত্রী তাঁহাকে মনে মনে স্বামী বলিয়া বরণ করিলেন। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ আসিয়া অশ্বপতি রাজাকে কহিলেন, তোমার কন্যা সত্যবান্‌কে বিবাহ করিবার জন্য মনন করিয়াছে। কিন্তু একবৎসরের মধ্যেই উহার মৃত্যু হইবে। শুনিয়া অশ্বপতি কন্যাকে বিস্তর বুঝাইলেন যে তুমি সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি অন্বেষণ কর। তখন স্থির প্রতিজ্ঞা সাবিত্রী বলিলেন—

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণোনির্গুণোঽথবা।
সকৃদ্‌বৃতোময়াভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহং॥
সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহদদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥

তখন রাজা কন্যার মন ঈপ্সিতার্থে স্থিরনিশ্চয় জানিয়া সত্যবানের সহিত বিবাহ দিলেন। সাবিত্রী কায়মনোবাক্যে অন্ধ শ্বশুরের ও তপোবনগত গুরুজনের সেবায় তৎপরা হইলেন। এবং নিরন্তর দেবসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। সর্ব্বদা প্রার্থনা হয় সত্যবানের মৃত্যু না হউক, না হয় স্বয়ং উহার অনুমৃতা হউন। ক্রমে

মৃত্যুর তিথি উপস্থিত। পতিপ্রাণা সাবিত্রীর মন আকুল হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া স্বামীর সহিত ফল মূলাহরণার্থ বনগমনে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সত্যবানের বাধা অতিক্রম করতঃ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্ত দিন নিবিড় বনমধ্যে পর্য্যটন করিলেন। সায়ংকালে সত্যবান্ ফলভার মস্তকে করিয়া গৃহাভিমুখ হইলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া প্রবল শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, প্রিয়ে, তুমি এই স্থানে উপবেশন করিয়া ফলরক্ষা কর। আমি তোমার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করি। শিরঃপীড়ায় আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। তখন সাবিত্রী অন্তরে বুঝিলেন সেই নিদারুণ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন স্বামীর অঙ্গ ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিল। তখন একাকিনী সেই শব ক্রোড়ে করিয়া কত যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন তাহা কে বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারে। ক্রমে রজনী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সাধ্বীর ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ আনয়ন করা যমদূতদিগের কার্য্য নহে। যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, সাবিত্রি তোমার স্বামীর দেহে এক্ষণে আমার অধিকার হইয়াছে। তুমি আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মে কেন বাধা দিতেছ। তোমার ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ গ্রহণ করিতে আমারও সাধ্য নাই। তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। সাবিত্রী তাহাই করিলেন। যমরাজ মৃতদেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ লিঙ্গ শরীর সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী নির্ভীকচিত্তে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে যমরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, সাবিত্রি, তুমি কেন আমার অনুবর্ত্তন করিতেছ, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র লাভ নাই। বৃথা পরিশ্রম হইতেছে মাত্র। তখন সাবিত্রী কহিলেন—

> "শ্রমঃ কুতো ভর্ত্তৃসমীপতো মে
> যতো হি ভর্ত্তা মম সাগতির্ধ্রুবং।
> যতঃ পতিং নেষ্যতি তত্র মে গতিঃ সুরেশ"।

কিয়দ্দূরে যমরাজ বলিলেন, তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন কি প্রার্থনা কর? যদি কোন পৌরাণিক সাবিত্রী চরিত্র লিখিতে বসিতেন তিনি বলিতেন আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। এবং সাবিত্রীকে আর খানিক কাঁদাইতেন; কিন্তু সাবিত্রী পৌরাণিকদিগের বর্ণনার অতীত পদার্থ। তিনি বলিলেন, যাহাতে আমার শ্বশুরের অন্ধত্ব মোচন হয় করুন। যমরাজ তথাস্তু বলিলে সাবিত্রী পুনরায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। যমরাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বরে তাঁহার শ্বশুরের রাজ্য প্রাপ্তি ও পিতার শত পুত্র হইবে বলিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিলেন। সাবিত্রী তথাপি আসিতেছেন দেখিয়া যমরাজ কহিলেন, তুমি বাটী

ফিরিয়া যাও সেখানে তুমি রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। তুমি কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছ। সাবিত্রী তখন পুনরায় কহিলেন, স্বামীর সহিত গমনে আমার শ্রম কোথায় আর আপনি যে রাজ্যভোগের কথা কহিতেছেন আমার স্থির প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন—

ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা সুখং
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ং
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা দিবং
ন ভর্ত্তৃহীনং ব্যবসামি জীবিতং ॥

তখন যমরাজ জানিলেন সাবিত্রী সামান্যা রমণী নহেন। তিনি সাবিত্রীর পতিপরায়ণতার বিস্তর প্রশংসা করিয়া উঁহার স্বামীর জীবন উঁহাকে অর্পণ করিলেন (ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ কর্ত্তা এই সুযোগে সাবিত্রীকে ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রীর অবতার বলিয়া লইয়াছেন এবং বিষ্ণুমন্ত্র প্রচারের পথ করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন যমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া সাবিত্রীকে সাবিত্রীর অবতার জানিয়া উঁহাকে মুক্তির প্রধান উপায় বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করেন।) সাবিত্রী পতিদেহে তাঁহার আত্মা সংযোগ করিয়া দিলে সত্যবান্ জীবনপ্রাপ্ত হইলেন, এবং কহিলেন উঃ, অনেক রাত্রি হইয়াছে। পিতামাতা আহারাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। এই বলিয়া সত্বর পদে তপোবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীও পূর্ণ-মনোরথ হইয়া হর্ষদ্বিগুণিত বেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস এই উপাখ্যানটী মহাভারতীয় বনপর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সমুদয় প্রবন্ধটী অনুবাদ করিলাম না। সংক্ষেপে সংগ্রহ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। কিন্তু যে কেহ মহর্ষির গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তিনিই জানেন উহা অনুবাদ করিতে পারা যায় না এবং সংগ্রহ করিতে গেলে উহার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়। যে সকল স্থানে হৃদয়ের গভীর ভাব ব্যক্ত হইতেছে তাহা অনুবাদ করিতে পারিলাম না, মহর্ষির বাক্যই উদ্ধার করিয়া দিলাম।

এক্ষণে দেখা যাউক সাবিত্রী প্রাচীন কালের রমণীচরিত্রের একটী উৎকৃষ্ট চিত্র কি না। সাবিত্রী বাল্যকালে পিতার বশীভূতা হইলেন। পরে পিতার আদেশানুসারে অভিমত পতিলাভ করিবার জন্য পিতার একজন সারথির সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে বর মনোনীত করেন তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন। ইহাতে সাবিত্রী লোকবৃত্তান্ত বিষয়ে বিশেষরূপ পারদর্শী ছিলেন বোধ হয়। তিনি শুদ্ধ ঐশ্বর্য্য রূপ বা বল দেখিয়া বর মনোনীত করেন নাই। সত্যবান্ তখন একজন অন্ধ মুনির পুত্র, নিজে বন হইতে ফলমূলাহরণ করিয়া পিতামাতার ভরণ পোষণ করেন। তাঁহার অবস্থায় এমন কিছুই ছিল না যাহাতে

রমণীর মন আকর্ষণ করে। কিন্তু সাবিত্রী এন্ জেলিনার ন্যায় পবিত্রস্বভাবা ছিলেন। এন্ জেলিনা বলিয়াছেন,—

"In humble simplest habits clad
No wealth or power had he ;
Wisdom and worth were all he had
And these were *all* to me."

একবার সত্যবানকে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়া সাবিত্রী তাঁহাকে চিরদিনের জন্য পতিরূপে বরণ করিলেন। দেবর্ষি নারদ ও মহারাজ অশ্বপতি কত বুঝাইলেন শুনিলেন না। বলিলেন, এসকল কাজ একবার ছাড়া দুইবার হয় না। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া অন্ধ শ্বশুরের সেবায় ও গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। তিনি যে স্বামীর মৃত্যুতিথি জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা এক দিনের তরেও কাহাকে জানিতে দিলেন না। কিন্তু সর্ব্বদাই ইষ্টদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ কঠোর নিয়ম ও ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর দিবস উপস্থিত জানিয়া কাহারও কথা না শুনিয়া স্বামীর সহিত বনে গেলেন। সেখানে যাহা যাহা ঘটিল পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যমরাজকে শব দিয়া অবধি তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। যমরাজ বর দিতে আসিলে চতুরা সাবিত্রী এই সুযোগে পিতা ও শ্বশুরের শুভ বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি স্বামী বিয়োগে অধীর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ছিল। ওরূপ ভয়ানক সময়ে বর দিতে আসিলে প্রাকৃত রমণীরা কখনই সাবিত্রীর ন্যায় দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন না। স্বামী তাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহা বলিয়া পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম তিনি একবারও বিস্মৃত হয়েন নাই (পুরাণ মতে পরলোকেরও উপায় করিয়া লইয়াছিলেন) তিনি যদি শুদ্ধ পতিব্রতা হইতেন, সেই ঘোর রজনীতে স্বামীর মৃতদেহের উপর স্বয়ংও প্রাণত্যাগ করিতেন। তাহা হইলেও তিনি রমণীকুলের শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য হইতেন না। কত শত পতিপরায়ণা রমণী স্বামীর জলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন কিন্তু সাবিত্রীর ন্যায় কেহই জগতীতলে মাননীয়া হয়েন নাই। সাবিত্রী পতিপ্রাণা ছিলেন তাহার সন্দেহই নাই। কিন্তু তাঁহার অনন্যনারীসাধারণ অনেক গুণও ছিল। এবং সেই জন্যই এতদ্দেশীয় রমণীরা জ্যৈষ্ঠ মাসে সাবিত্রী ব্রত করিয়া থাকেন। কোন্ রমণী এক বৎসরের মধ্যে পতির মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে তাহাকে বিবাহ করেন! কোন্ রমণী বৎসরাবধি সেই সংবাদ গোপন করিয়া রাখিতে পারেন? কেই বা তাদৃশ ঘোর বিপৎপাত সময়ে হতচেতনা না হইয়া অভিলষিত সিদ্ধিতে

দৃঢ় নিশ্চয়া হইতে পারেন এবং কেই বা তাদৃশ সময়ে আপনার সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারেন ?

স্মৃতি সংহিতাদিতে যত গুণ থাকা প্রয়োজন বলে সাবিত্রীর তাহা সকলি ছিল। তাহার উপর উঁহার পুরুষের ন্যায় নির্ভীকতা সত্যনিষ্ঠতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি নানা গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সাবিত্রীর অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সত্য বটে তাঁহাকে সীতা দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় নানা প্রলোভনে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্র দৃষ্টে বোধ হয় সেরূপ প্রলোভনে পড়িলে তিনি তাঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিক যশস্বিনী হইতে পারিতেন। তিনি এই শ্রেণীর রমণীগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টস্বভাবা তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। দময়ন্তী সীতা প্রভৃতি রমণীগণাপেক্ষাও অনেক বিষয়ে তাঁহাকে উন্নতচরিত্রা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা তাদৃশ উৎকৃষ্ট স্বভাবা কামিনীগণের মধ্যে কে প্রথম ও কে দ্বিতীয় তাহা বলিয়া দিতে পারি না। মেকলে তাদৃশ কার্য্যকে জঘন্য কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Invidious office.) আমরাও তাহাই বলি। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিলাম প্রথম শ্রেণীরও একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিব। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ছোট বড় বাছিয়া উঠা নিতান্ত কঠিন।

সাবিত্রী চরিত্র বোধ হয় মহর্ষি বেদব্যাস ভিন্ন আর কেহই বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না। সীতা দ্রৌপদী দময়ন্তী লইয়া কত কাব্য কত নাটক লেখা হইয়া গেল কিন্তু কেহই সাবিত্রী চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। বাল্মীকির পর সীতার চরিত্র বর্ণনে কেহই সম্যক কৃতকার্য্য হয়েন নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইহা সীতা চরিত্রের প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সাবিত্রীচরিত আরো অধিক প্রশংসনীয় হইবে। যে হেতুক কোন কবিই এ পর্য্যন্ত সাবিত্রীচরিত্র অনুকরণে আপনাকে সমর্থ বিবেচনা করেন নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

তৃতীয় শোবোক্ত শ্রেণীর কামিনীগণের মধ্যে দ্রৌপদী দময়ন্তী ও সীতা সর্ব্বপ্রধান। শ্রীবৎস মহিষী চিন্তা ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারী প্রভৃতি নারীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূতা। ইঁহাদের চরিত্রের মধ্যে পতিপরায়ণতাই বিশেষ গুণ। গান্ধারীর স্বামী অন্ধ হইলেও তিনি যাবজ্জীবন স্বামীশুশ্রূষা করিয়াছেন এবং তিনি চিরদিন সাধ্বী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার শাপে কষ্ট পাইয়াছেন। তিনি পুত্রাদির মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের রমণীবর্গকে অনেক করিয়া

বুঝাইয়াছিলেন। তাহাদের সকলেই সহগমণ করিল। শোকজর্জ্জরিত হইয়াও তিনি স্বামীর সেবার জন্য জীবিত রহিলেন। এবং পরিশেষে আশ্রমে যাইয়া পতির সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী স্বয়ংবরে দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়াও নলকে বিবাহ করিলেন এবং বনমধ্যে তিনি নানাবিধ কষ্ট পাইলেন, এই দুই কারণেই তিনি আমাদিগের দেশে আদরনীয়া হইয়াছেন। তাঁহার ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে কলি স্পর্শ করিতে পারে না। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে প্রিয়বাদিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার অন্য কোন গুণের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু উপরিউক্ত দুইটি কার্য্য দ্বারাই তাঁহার চরিত্রের ঔন্নত্য বৈশুদ্ধ্য প্রতিপন্ন হইতেছে। অহল্যা বিবাহিতা এবং পুত্রবতী হইয়াও যে প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া নানা কষ্ট পাইলেন, দময়ন্তী অবিবাহিতা বালিকা হইয়াও সেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করিলেন।

শ্রীবৎস রাজার স্ত্রী চিন্তার চরিত্র অনেক অংশে দময়ন্তীর মত। তাঁহার চরিত্র পাঠ করিলে শনির দশা হয় না।

দ্রৌপদী সংস্কৃত গ্রন্থাবলী মধ্যে একটি প্রশংসনীয়া কামিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যাহাদিগকে বিবাহ করিলেন তাঁহাদের রাজ্য নাই। তাঁহারা অতি দুঃখী, ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট। বিবাহের পর এক কুম্ভকারের গৃহে উপস্থিত। এই তাঁহার শ্বশুরালয়। শেষে তাঁহার স্বামীরা রাজ্য পাইল। তিনি রাজমহিষী হইলেন। রাজসূয় যজ্ঞ হইল। ইহাতে তিনি লোকের সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন যে সকলেই তাঁহাকে সুখ্যাতি করিতে লাগিল। শেষে যুধিষ্ঠিরের দোষে রাজ্য গেল ধন গেল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী পর্য্যন্ত হারিলেন। সভার মধ্যে দুরাত্মারা তাঁহার যারপর নাই অবমাননা করিল। এমন কি কেশাকর্ষণ করিল বস্ত্রহরণ করিল শেষে কুরুবৃদ্ধেরা তাঁহাকে ছাড়াইয়া লইলেন। পরে তিনি স্বামীদিগের সহিত বনগামিনী হইলেন। অর্জ্জুনের আরও ভার্য্যা ছিল, ভীমের ছিল। সকলেই আপন আপন বাটী রহিল কেবল দ্রৌপদীই স্বামিভাগ্যে আপন ভাগ্য মিশাইলেন। বনেও তাঁহার কষ্টের একশেষ। তিনি স্বামীদিগের সেবা করিতেন। যুধিষ্ঠিরের সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন ও অনেক রাত্রিতে স্বয়ং ভোজন করিতেন। সর্ব্বদা নীতিশাস্ত্রে পরামর্শ দিতেন। তিনিই পরামর্শ দিয়া অর্জ্জুনকে ইন্দ্রসন্নিধানে প্রেরণ করিয়া পাণ্ডব সৌভাগ্যের সূত্রপাত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। দ্রৌপদী সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেন। এক দিন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দ্রৌপদীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা

ও সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী কি আর আছে ? যদিও কোনরূপে অসহ্য বনবাস যন্ত্রণা সহ্য করিলেন তাহার পর আবার দাসত্ব। বনে যেমন জয়দ্রথ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে বিরাটরাজভবনে কীচকও সেইরূপ অত্যাচার করিল। দুই বারই ভীম তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তাহার পর যুদ্ধের উদ্যোগের সময় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী। যুদ্ধের পর আর তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বভ্রুবাহন হস্তে অর্জ্জুনের বিনাশ হইলে তিনি অত্যন্ত পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়া উঁহার পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। পরে স্বামীদিগের সহিত মহা প্রস্থানে গমন করিয়া সর্ব্ব প্রথমেই স্বামীদিগের সমক্ষে দেহত্যাগ করিলেন।

"দ্রৌপদী সতীলক্ষ্মী ছিলেন। মাতৃ আজ্ঞায় তাঁহার পঞ্চস্বামী হইয়াছিল। তিনি সেই পঞ্চস্বামীরই মনোরমা হইয়া সতীর মধ্যে অগ্রগণ্যা হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা দয়াশীলা ছিলেন এবং অধীনগণকে মাতার ন্যায় পালন করিতেন। রাজকন্যা ও রাজভার্য্যা হইয়াও তিনি পতিগণের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সকল গুণে তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর কি আবশ্যক।"

সীতা। বাল্মীকির সীতা একটী সুশীলা ও শান্তস্বভাবা বালিকা—তিনি বিবাহের পর সর্ব্বদা স্বামীশুশ্রূষণে ব্যাপৃতা থাকিতেন। রামচন্দ্র এই সময়ে সীতার সহবাসে যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তিনি সর্ব্বদাই সেইরূপ বিশুদ্ধ আমোদ লাভের জন্য উৎসুক থাকিতেন। রাম কৈকেয়ীর গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সীতাকে বনগমণের কথা বলিলেন তখন সীতাও তাঁহার সহগামিনী হইতে উৎসুক হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয় করুণরসে আপ্লুত হয়। সীতা বনবাসে যাইবেন, রাম তাঁহাকে বাধা দিবেন। রাম কত বুঝাইলেন বনগমনের নানা কষ্ট বর্ণনা করিলেন; গৃহবাসের সুখ বর্ণনা করিলেন; গৃহবাস করিলে নানাবিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারা যায় এবং তাহাদ্বারা স্বামীর নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিতে পারা যায়। সীতা অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন,—

"স মাননাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থিতু মর্হসি।
তপোবা যদি বারণ্যং স্বর্গোবা স্যাত্ত্বয়াসহ॥
ন চ মে ভবিতা কশ্চিত্তত্র পথি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্ঠত স্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেস্বিব।
কুশকাশ শরেষীকা যে চ কণ্ঠকিনোদ্রুমাঃ।
তুলাজিন সমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া॥

এই বলিয়া তিনি রামের গলদেশ ধারণ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। রাম তখন আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি উঁহাকে বনে লইয়া যাইব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রামের সহিত শ্বশ্রু শ্বশুরদিগকে প্রণাম করিয়া সীতা বসন ভূষণ পরিত্যাগ করতঃ জটা ও বল্কল ধারণ করিতে গেলেন। তিনি নিতান্ত মুগ্ধস্বভাবা। বল্কল কিরূপে ধারণ করিতে হয় জানেন না। তিনি একখানি চীরবস্ত্র হস্তে ধারণ ও অপর খানি স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং অপ্রতিভমুখে সাশ্রুনয়নে রামকে কহিলেন, স্বামিন! চীরধারণ কিরূপে করিতে হয়? রাম তখন সীতার কৌষেয় বস্ত্রের উপরি চীরদ্বয় সংযোগ করিয়া দিলেন, তাহার পর সীতা স্বামীর সহিত বনে বনে নানা কষ্ট পাইয়াছেন। পথগমনে তিনি সর্ব্বদাই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। কদর্য্য বনফল মাত্র তাঁহার আহার ছিল। পর্ণ-শয্যায় শয়ন ছিল। কিন্তু সে সকল কষ্ট কেবল রামমুখাবলোকন করিয়া দূর হইত। চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটী গমন সময়ে সীতা রামকে অকারণ বৈর করিতে নিষেধ করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

যখন রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, সে রথের উপরে তাঁহাকে কত বুঝাইতে লাগিল। সীতে, আমিই তোমার সদৃশ পতি। তুমি আমার স্ত্রী হও। দেবতারাও তোমার অধীন হইবে। আমার পাটরাণীরাও তোমার দাসী হইবে। পাঁচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে। সীতা তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া তাহাকে বলিলেন, রামের সহিত তুলনায় তুমি শৃগাল স্বরূপ দাঁড়কাক স্বরূপ। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তুমি আমায় হরণ করিতেছ ইহার জন্য তোমায় সবংশে মরিতে হইবে।

যখন রাবণের অন্তঃপুরে তিনি বন্দী, রাবণ প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করে, তাঁহার পায়ে পড়িয়া তোষামোদ করে, তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করে, সীতা কেবল বলেন—

রামোনাম সধর্ম্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
দীর্ঘবাহু বিশালাক্ষো দৈবতং স পতির্ম্ম॥

অনেক দিন এইরূপে গেলে একদিন রাবণ বলিল তুমি যদি আর বার মাসের মধ্যে আমায় স্বামী বলিয়া স্বীকার না কর তোমার মাংস ভোজন করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিব। তখন পতিপরায়ণা সীতা অণুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন,—

ইদং শরীরং নিঃসংজ্ঞং রক্ষ বা ঘাতয়স্ববা।
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতঞ্চাপি রাক্ষস॥

হনূমান আসিয়া অশোকবন মধ্যে সীতাকে দেখিলেন। সীতা মজ্জনোন্মুখ নৌকার ন্যায় শোকভারে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত অশ্রুপাত করিতেছেন, রাবণ তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক রাক্ষসী রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা দিন রাত ধরিয়া তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতেছে ভয় দেখাইতেছে কখন বা তাঁহাকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। কিন্তু তিনি আপন গুণে সেই ভয়ানক রাক্ষস পুরী মধ্যেও ত্রিজটা ও সরমা নাম্নী দুই রাক্ষসীকে সখী পাইয়াছেন। তাহারা অবসর পাইলেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করে। হনূমান্‌কে দেখিয়া সীতা অনেক দিনের পর আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি হনূমানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, রামকে আপন মনের কথা বলিলেন। তখন তাঁহার ভরসা হইল রাম তাঁহাকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন।

রাবণবধের পর বিভীষণকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সীতা উপস্থিত হইলে বলিলেন, সীতে আমি তোমার উদ্ধারসাধন করিয়াছি শত্রুনাশ করিয়াছি এবং কলঙ্ক অপনয়ন করিয়াছি। আজি বিভীষণাদির শ্রম সফল হইল। এই সকল কথা শুনিয়া সীতার মুখ বিকসিত হইল; আনন্দাশ্রুতে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গেল। তখন রাম কর্কশ স্বরে কহিলেন, জানকি! আমার কর্ম্ম আমি করিয়াছি। কিন্তু তোমাকে আমি গ্রহণ কতিে পারি না। তুমি পরগৃহে অনেক দিন বাস করিয়াছ। আমি সৎকুলপ্রত্রত হইয়া তোমাকে গ্রহণ করিলে কেবল নিন্দাভাগী হইব মাত্র। অতএব তোমায় অনুমতি দিতেছি তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয় আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা কর। সীতা এই পরুষ বাক্যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, স্বামিন্ আপনি আমাকে প্রাকৃত রমণীর ন্যায় ভাবিলেন। আমি লঙ্কা পুরীর মধ্যে কি অবস্থায় বাস করিয়াছি তোমার দূত হনূমান্ সম্পূর্ণ রূপে অবগত আছে। অতএব এক্ষণে আমাকে এরূপে পরিত্যাগ করা কি যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে।

নপ্রমাণীকৃতঃ পাণি বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিঞ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বন্তে পৃষ্টতঃ কৃতং॥

এই বলিয়া লক্ষ্মণকে চিতাসজ্জা করিতে কহিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে বহ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহ্নিপ্রবেশ সময়ে দেবতা ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন,—

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃপাতু পাবক॥

যথামাং শুদ্ধচারিত্রাং দৃষ্ট্বা জানাতি রাঘবঃ।
তথালোকস্য সাক্ষীমাং সর্ব্বতঃপাতুপাবকঃ॥
কর্ম্মণামনসা বাচা যথানাতিচরাম্যহং।
রাঘবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং যথামাং পাতু পাবকঃ॥

অগ্নি প্রবেশ করিলে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। সকলে ধন্য ধন্য বলিয়া তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল।

সীতা বহুকাল রামগৃহে অবস্থান করিলে পর ভদ্রক নামে একজন লোক প্রসঙ্গ ক্রমে সভামধ্যে বলিল রাবণগৃহে বহুকাল থাকিলেও রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রজারা অনেকে তাঁহার নিন্দা করে। রাম ক্ষত্রিয়পুরুষ, তাঁহার ধমনীতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়শোণিত প্রধাবিত, তিনি তৎক্ষণাৎ সীতা পরিত্যাগে সংকল্প করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "তুমি আশ্রম গমন ব্যপদেশে সীতাকে ভাগীরথী তীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস।" লক্ষ্মণও সীতাকে লইয়া গেলেন। সীতা নিদারুণ পরিত্যাগ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল হতচেতনা হইয়া রহিলেন, পরে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, নিতান্ত নিরন্তর দুঃখভোগের জন্যই আমার দেহ সৃষ্টি হইয়াছিল, আমি পূর্ব্বজন্মে যে কি পাপ করিরাছিলাম, কোন পতিপরায়ণা নারীকে অসহ্য পতিবিরহ যন্ত্রণা দিয়াছিলাম বলিতে পারি না নচেৎ নৃপতি আমায় কেন পরিত্যাগ করিবেন।"

পুনশ্চ বলিলেন, লক্ষ্মণ তুমি আর্য্যপুত্রকে বলিও যে তিনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুন না তিনিই আমার পরম গতি। তাহাকে সর্ব্বদা আপন কর্ম্ম অবহিত হইতে বলিও। এরূপ সময়েও সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত প্রতিকল্যাণ কামনা করা প্রাকৃত রমণীর কার্য্য নহে। সীতার বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরেই তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাব এবং দুরপনেয় অলৌকিক প্রণয় প্রকাশ পাইতেছে।

অনাথিনী সীতা আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিলেন এবং ঋষিরা আবার রামকে তাঁহার পুনর্গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। রামও আবার সর্ব্বসমক্ষে সীতার পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন। এবার অগ্নিপরীক্ষা নহে—এবার শপথ। সীতা যখন সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন তাঁহার নয়ন স্বপদে অর্পিত। তাঁহার মনের ভাব কিরূপ তাহা বর্ণনা করা দুরূহ। তাঁহার অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় প্রণয় পূর্ব্ববৎই আছে, কিন্তু সভামধ্যে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দেওয়ায় তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে; প্রাচীন রমণীসুলভ তেজও বিলক্ষণ আছে। তিনি সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া কোনদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া করুণস্বরে স্বীয় জননী মাধবীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে

লাগিলেন। তাঁহার তখনকার অবস্থা মনে পড়িলে এবং তাঁহার শোক দীন বচনাবলী পাঠ করিলে পাষণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং সহৃদয় হৃদয়ে গভীর শোকসাগরের উদগ্‌রণ হয়। তিনি বলিতে লাগিলেন,

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মিরামাৎপরংনচ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি॥

সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হইল। ঋষিগণ অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল। সহসা প্রদীপ্তজ্যোতিঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধরণীদেবী আবির্ভূত হইলেন এবং সীতাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পাতাল মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

শেষোক্ত শ্রেণীস্থ কামিনীগণের মধ্যে জনকতনয়া সীতা সর্ব্বপ্রধানা। সীতা সর্ব্বগুণসম্পন্না ছিলেন; তাঁহার ন্যায় পতিপারায়ণা আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহাকে যাদৃশ প্রলোভনে পড়িতে হইয়াছিল কোনকালে কোন নারী তাদৃশ প্রলোভনে পড়িয়াছিল কিনা সন্দেহ। অদৃষ্টের দোষে তাঁহাকে নানা কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি রাজনন্দিনী ও সসাগরা ধরণীপতির মহিষী হইয়াও একপ্রকার জন্মদুঃখিনী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বামীর সহিত বনে গেলেন। তথায় রাবণ তাঁহাকে হরণ করিল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তাহার পর স্বামী তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে দায়ে কোনরূপে উদ্ধার পাইলেন। আবার মিথ্যাপবাদভীত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, এবার তিনি বনে বনে একাকিনী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে প্রায় যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল কিন্তু শেষ কালে তিনি সশরীরে ভগবতী পৃথিবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

তুলনা

সীতা ও সাবিত্রী দুইজনই অদ্বিতীয় রমণী। পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবিই স্বীয় কল্পনাশক্তি বলে উঁহাদের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সীতার স্নেহপ্রবৃত্তি অলৌকিক, সুখদুঃখ বিপদ সম্পৎ সকল সময়েই স্বামীর প্রতি তাঁহার মনোভাব অবিচলিত। দেবর লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার সমান স্নেহ। দেবর তাঁহাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া

আসিলেন তথাপি উঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গুরুজনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বামীর বিরহে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তি সমান প্রভাবশালিনী। সীতা রাবণের সহিত, সাবিত্রী যমরাজের সহিত কথোপকথনে ইহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সীতা অপেক্ষা সাবিত্রী কর্ম্মক্ষমতায় অনেক উৎকৃষ্ট। বল্মীকি কোন স্থলেই সীতার কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় দেন নাই। তিনি উঁহাকে শান্ত সুশীলা ও একান্ত সুধীরস্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাবিত্রীও ধীরস্বভাবা সন্দেহ নাই কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে তিনি কোন শ্রমকেই শ্রম জ্ঞান করেন না এবং এমন কষ্ট নাই যে তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের দুইজনেরই মনের তেজস্বিতা আছে। যমরাজও সাবিত্রীর তেজস্বিতা স্বীকার করিয়াছেন। সীতাও দ্বিতীয় বার পরীক্ষার সময় উহার পরিচয় দিয়াছেন। কর্ম্মক্ষমতা বিষয়ে সাবিত্রী সীতা অপেক্ষা উন্নতস্বভাবা হইলেও তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই। সীতা ও সাবিত্রীকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত চরিত্রা বলিবার কারণ এই যে তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিত্রয়ের যুগপৎ সমুন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি সমুদয়ই রামায়ণ প্রভৃতি আর্ষ গ্রন্থাবলী হইতে। কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ প্রণীত গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি উদাহরণ সংগ্রহ না করিলে, এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া কখনই বোধ হইবে না। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ ঋষিদিগের অনেক পরের লোক। তাঁহাদিগের সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থাগত নানা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে প্রচার হইয়াছে ও বিনাশ হইয়াছে। বেদ ও স্মৃতিপ্রতিপাদিত ধর্ম্মের লোপ হইয়াছে। পৌরাণিকদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। আর্য্যগণ বিলাসী হইয়াছেন, কুসংস্কারাপন্ন হইয়াছেন এবং অনেকাংশে হীনবীর্য্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা আর ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম পালন করেন না, তাঁহারাও বাণিজ্যাদি নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকেরও চরিত্রগত অনেক ভেদ দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের জন্য জেনানা মহল সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতীয় রমণীগণের ন্যায় তাঁহাদের সে নির্ভিকতা নাই। স্বামীর আর তাঁহারা সখী নহেন কেবল দাসী মাত্র। রাজারা পূর্ব্বে নিমিত্তাধীন মাত্র বহুবিবাহ করিতে পারিতেন এক্ষণে তাঁহারা ইচ্ছামত অসংখ্য বিবাহ করিতে পারেন। কতকগুলি ভোগ্যা স্ত্রী তাঁহাদিগের অন্তঃপুরে স্থানপ্রাপ্ত

হইয়াছে। দশকুমার চরিত পাঠ করিলে খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে আমাদের দেশের বিশেষতঃ আমাদের দেশের স্ত্রীগণের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে।

কবিগণ যে সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছেন তাহা দুই প্রকার; হয়, তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত না হয় মহাভারত বা রামায়ণ অথবা কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। যে সকলগুলি তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত, তাহাতে তাঁহাদিগের সমসাময়িক সমাজের অবস্থা বিষয়ক অনেক কথা পাওয়া যায়। এইরূপ নাটকের মধ্যে রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মৃচ্ছকটিক ও মালতীমাধব প্রধান। দশকুমার চরিত এবং কাদম্বরীও কোন শাস্ত্রের উপাখ্যান নহে। যে গুলি তাঁহাদের নিজের নহে তাহাতেও তাঁহাদের আপন সময়ের ভাবই অধিক। বাল্মীকির সীতা ও ভবভূতির সীতা ভিন্ন সময়ের লোক। বেদব্যাসের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলায় অনেক অন্তর। ঋষি-প্রণীত এবং কবিপ্রণীত গ্রন্থের রচনাগত কিরূপ প্রভেদ তাহা একজন সাহেব এইরূপে প্রকাশ করিয়াছে।

***The Mahabharata tells the story in simple but vigorous and noble language. It is full of powerful description of passion. The poet nowhere pays any undue attention to mere forms of words. His chief exertion is devoted to attract our sympathy to the qualities and passions which he describes. Refer for example to the deep pathos in the description of the grief of Damayanti when abandoned by her husband in the solitude of the forest.

Instead of ennobling the affections and appealing to the tenderest and most sacred feeling of man the love which the poet describes (poet, one like Shreeharsa) is earth-born in a degree far exceeding the lasciviousness of some of the Roman poets.

যাহা হউক আমরা কাব্যগ্রন্থ হইতে কতকগুলি সাধুশীলা রমণীর চরিত্র বর্ণনা করিব। প্রথমতঃ মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে একটি বেশ্যা ও একটি পতিপ্রাণা রমণীর চরিত্র বর্ণনা আছে। উভয়েই চারুদত্তের প্রতি সমান প্রণয়বতী—উভয়ের চরিত্রই বিশুদ্ধ নির্ম্মল এবং উন্নত। বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া অবধি কত অত্যাচার সহ্য করিলেন কত প্রলোভন হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন এবং শেষ একটা নরাধমের হস্তে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত

গেল। তথাপি তাঁহার প্রণয় অবিচলিত। তিনি শুদ্ধ নিজেই প্রণয়বতী এমন নহেন যেখানে বিশুদ্ধ প্রণয় সেইখানেই তাঁহার প্রীতি। তিনি শর্ব্বিলকের প্রণয়িনী আপন দাসীর দাসত্ব মোচন করিয়াছিলেন। আপনার কণ্টক স্বরূপ চারুদত্তের মহিষীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। বেশ্যালোকের ওরূপ অবস্থা হইলে প্রায়ই তাহারা অত্যাচারী ও উদ্ধত হইয়া উঠে, কিন্তু বসন্তসেনা বরাবর আপনাকে বেশ্যা বলিয়া জানিতেন এবং ঘৃণা করিতেন, তিনি সাহসপূর্ব্বক চারুদত্তের বাটী মধ্যে প্রবেশ করিলেন না, বলিলেন সেখানে প্রণয়বতী ধর্ম্মপত্নীর অধিকার। চারুদত্তের ব্রাহ্মণীও স্বামীকে অন্যাসক্ত জানিয়াও তাহাতে অনুমাত্র দুঃখিত হইলেন না বরং যখন শুনিলেন চোরে বসন্তসেনার অলঙ্কার চারুদত্তের গৃহ হইতে অপহরণ করিয়া লইয়াছে এবং চারুদত্ত "কথংন্যাসঃ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন আপনার সমস্ত অলঙ্কার বসন্তসেনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এবং স্বামী যখন মিথ্যা হত্যা-পরাধে বধ্যস্থানে নীত হইলেন, তখন তাঁহার সহগামিনী হইলেন। তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধস্বভাবা কামিনী অতি বিরল।

মালবিকা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিগণের অতিশয় প্রিয়পাত্রী। তাঁহার চরিত্র অপবিত্র নহে। তিনি রাজনন্দিনী, একজন সেনাপতি তাঁহাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া রাজপরিবারে প্রেরণ করেন। তিনি রাজার সংসারে থাকেন এবং নৃত্যগীত শিক্ষা করেন। তৎকালের লোক অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় সুতরাং বিলাস-প্রিয় রাজা বা রাজকর্ম্মচারীকে প্রীত করিতে হইলে যে সকল শিক্ষা আবশ্যক তিনি তাহাতেই নিপুণা। পরে তিনি রাজার প্রণয়িনী হইলেন। কিন্তু তাহা তাঁহার অন্তরেই রহিল। রাজাও যে তাঁহার প্রতি আসক্ত তাহা তিনি জানেন না। পরে কোন দিন বিদূষকের কৌশলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। সে আবার সভামধ্যে। মালবিকা গীতিচ্ছলে এবং অঙ্গভঙ্গির দ্বারা আপন মনের ভাব রাজাকে জানাইলেন। পরে গান্ধর্ব্ব বিধানে উভয়ের বিবাহ হইল। মালবিকা কবিগণের প্রিয়পাত্রী; কেন না তিনি সুন্দরী, নৃত্যগীতাদি কলাভিজ্ঞা। নৃত্য করিতে পারেন, গান করিতে পারেন, অভিনয় করিতে পারেন, কৌশল পূর্ব্বক হাবভাব প্রকাশ করিতে পারেন। তিনি চতুরা ও প্রণয়িনী—তিনি অভিলষিত লাভের জন্য কত কষ্ট পাইলেন সমুদ্রগৃহে বন্দী রহিলেন, মহারাণীর বিরাগভাগিনী হইলেন তথাপি তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইল না। আধুনিক কবিরা হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশে তাদৃশ সক্ষম নহেন, তাঁহারা মালবিকার ন্যায় চরিত্র বর্ণনে বিলক্ষণ পটু। মালবিকার চরিত্র, নারীগণের উৎকৃষ্ট চরিত্র বর্ণনাচ্ছলে উল্লিখিত হওয়া অন্যায় কিন্তু তিনি একটি শ্রেণীর আদর্শ, এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এখানে উল্লেখ

করিলাম। যেমন পুরাণকর্ত্তাদিগের লোপামুদ্রা, ঋষিদিগের সীতা ও সাবিত্রী সেইরূপ কবিদিগের মালবিকা অত্যন্ত আদরণীয়া। যেমন পুরস্ত্রীদিগের লোপা-মুদ্রা, বালিকাদিগের শিলা, যুবতীদিগের সাবিত্রী এবং সর্ব্বাবস্থা নারীদিগের সীতা আদর্শস্বরূপ সেইরূপ মালবিকাও এক সময়ে ও এক অবস্থার নারীগণের আদর্শ এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এ স্থলে বর্ণিত হইল।

ধারিণী রাজার মহিষী। তিনি যতক্ষণ পারিলেন ততক্ষণ মালবিকার সহিত রাজার যাহাতে সাক্ষাৎ না হয় তাহার চেষ্টায় রহিলেন কিন্তু বিদূষকের ষড়যন্ত্রে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তিনি যখন দেখিলেন রাজার মন টলিবার নহে তখন তাঁহার মনে হইল পতিকে কষ্ট দেওয়ার অপেক্ষা নিজে কষ্ট পাওয়া ভাল। অযন্তস্বভাবা ইরাবতীর অনুরোধে মালবিকাকে কষ্ট দিলেন কিন্তু অল্প দিন পরেই স্বয়ং বিবাহে উদ্যোগী। বঙ্কিম বাবুর সূর্য্যমুখীর সহিত ধারিণীর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

মালতী ভবভূতির কল্পনাশক্তির প্রথম অঙ্কুর। ভবভূতি তাঁহার চরিত্র অথবা তাঁহার প্রণয় বর্ণনায় অলৌকিক কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এমন কিছুই নাই যাহাতে তিনি সীতা সাবিত্রী শকুন্তলার সহিত একত্রে স্থানপ্রাপ্ত হন। মালবিকার শ্রেণীর মধ্যে তিনিও এক জন। মালতীমাধবের মধ্যে আর একটি অদ্ভুত স্বভাবের স্ত্রীলোক আছেন। ইঁহার নাম কামন্দকী—ইহার সংসারকার্য্য-চাতুর্য্য বুদ্ধিকৌশল শাস্ত্রজ্ঞান কর্ত্তব্যকর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সুহৃদ্বর্গের প্রতি অনুরাগ মালতী ও মাধবের প্রতি স্নেহ অলৌকিক। ইঁহার সাহস পুরুষের ন্যায়, মনের জোর পুরুষের ন্যায়। ইনি দুই জন মন্ত্রীর সহাধ্যায়িনী বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে তাহাদের সমতুল্যা। দুই জনেই তাঁহাকে সম্মান করেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তিনি সংসারে বিরাগিণী বুদ্ধমঠ আশ্রয় করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রের পণ্ডিত কৌষিকী এবং মালতীমাধবের কামন্দকী কালিদাস ও ভবভূতির কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। পণ্ডিত কৌষকীও সংসার ত্যাগ করিয়া কাষায় ধারণ করিয়াছেন। তিনিও একজন অমাত্যের ভগিনী—তাঁহার মানসিক বল পুরুষের ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি পুরুষের ন্যায়। রাজা ও ধারিণী সর্ব্বদা তাঁহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তিনি গণদাস ও হরদত্তের বিবাদে মধ্যস্থ। তিনি, যতদিন আপনাদিগের দুরবস্থা ছিল, কাহাকেও আপন পরিচয় দেন নাই। তাহার পর যখন শুনিলেন, তাঁহার ভ্রাতার শত্রুগণ পরাভূত হইয়াছে এবং তাঁহারই রাজ-কন্যা রাজার প্রণয়ভাগিনী হইয়াছেন তখন আপন পরিচয় প্রদান করিলেন। পণ্ডিত কৌষিকী হিন্দু ও কামন্দকী বৌদ্ধ পণ্ডিত ও কৌষিকীচরিত্র বিশুদ্ধ

কামন্দকী তাহাতেও আবার কর্ম্মকুশল। তিনি আপন কার্য্যে অণুমাত্র অনাস্থা করেন না এবং প্রাণপণে কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত্নবতী। কৌষিকী কেবল দেবতা দিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। কামন্দকী সাহস সহকারে কাল কাপালিক অঘোরঘণ্টের সহিত বিবাদ করিয়া তাহার দুরভিসন্ধি নিষ্ফল করিলেন। কৌষিকী দস্যুহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া রাজবাটী আশ্রয় করিলেন, সমভিব্যাহারিণী রাজকুমারীর কোনরূপ উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন না। কিন্তু ইঁহারা দুইজনেই একশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ—সে শ্রেণীর স্ত্রীলোক এখন নাই, ঋষিদিগের সময়েও ছিল না। বৌদ্ধেরা মঠ সংস্থাপন করিলে তাঁহাদের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতভূমি হইতে তাড়িত হইয়া যখন চীন ও সিংহল আশ্রয় করিল তখন হিন্দুরাও মঠ করিতে শিখিয়াছেন এবং তথাও দুই একটী ঈদৃশী সংসারবিরাগিণী রমণী দেখা যাইত কিন্তু এক্ষণে মঠও বিরল, পণ্ডিত কৌষিকীও বিরল।

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের মহিষী—শৈব্যা যথার্থ পতিপ্রাণা ও রমণীকুলের বিভূষণ স্বরূপ। যখন বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদে রাজার সর্ব্বস্ব গেল তিনি দক্ষিণার জন্য আত্মদেহ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত তখনও শৈব্যা তাঁহার সহায়। রাজা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন, শৈব্যা উত্তর করিতেছেন, "অজ্জ উত্তো মক্খু অত্তস্তবো হোহি। তা পদীদ মংজ্জেবব ইমখিং কজ্জে আরোবেহি। অবচ্ছিমো দে দানিং পণয়ো।" এই বলিয়া স্বামীর মুখ প্রতীক্ষা করিলেন হরিশ্চন্দ্রের অশ্রুজল নির্গত হইল। শৈব্যা তখন বলিয়া উঠিলেন "কিনব কিনবমং অজ্জা পরপুরিস পজ্জু পাসনং পরুচ্ছিঁট্ঠ ভোজন অ স্কাবিহরিয় সব্ব কম্ম কারিনীত্তি।" যখন এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্রয় করিল তখন শৈব্যা হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বলিলেন, "দিট্ঠিয়া অদ্ধাবশিট্ঠ পডিন্নাভারো দানিং অজ্জউত্তো কিমদম্হি।" আর্য্যপুত্রের ঋণের অর্দ্ধেক প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন বলিয়া তাঁহার হর্ষ হইল। চিরকালের জন্য যে দাসী হইলেন সেটী তাঁহার মনেও হইল না। কিন্তু ইহাতেও বিধাতার তৃপ্তি হইল না। শৈব্যার এক মাত্র সন্তানও কিছুদিন পরে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। শৈব্যা উদ্বন্ধনে দেহত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন, সে স্বর প্রস্তরও বিদীর্ণ করিতে পারে। বিধাতা সদয় হইয়া তাঁহাকে স্বামীর সহিত মিলাইয়া দিলেন।

পার্ব্বতী—ইনিই পূর্ব্বজন্মে স্বামীর নিন্দা শ্রবণে আপনার দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এজন্মেও সেই মহাদেবের প্রতি অনুরাগবতী হইয়াছেন। মহাদেব মনুষ্য নহেন দেবতা, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তপস্যা আবশ্যক করে ও পূজা আবশ্যক করে। পার্ব্বতী প্রথমতঃ পূজা আরম্ভ করিলেন। নিত্যই

মহাদেবকে স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমালা প্রদান করেন এবং নানা প্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। পার্ব্বতী বিদ্যাবতী, পিতার প্রিয়পাত্রী এবং রাজার কন্যা; বয়সও অল্প কিন্তু তখন হইতেই তাঁহার প্রণয় প্রগাঢ়। তাঁহার প্রণয় তারামৈত্রক বা চক্ষুরাগ নহে উহার আবাসভূমি হৃদয়ে। একজন প্রধান সমালোচক বলিয়াছেন কালিদাসাদি কবিগণ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন বটে কিন্তু সে প্রণয় বাল্মীকির ন্যায় নহে; কালিদাসের প্রণয়ে ঐহিকতাই অধিক। কিন্তু যে কবি পার্ব্বতীর প্রণয় বর্ণনা করিয়াছেন তিনি যে বিশুদ্ধ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন না এরূপ বলা অসঙ্গত। পার্ব্বতী মহাদেবের প্রণয়বতী; মহাদেব যোগী; তিনি অপর উপাসকের যেরূপ পরিচর্য্যা গ্রহণ করেন, পার্ব্বতীর পূজাও সেইরূপ গ্রহণ করেন। তাঁহার মন টলিবার নহে। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য বিধানের জন্য স্বয়ং কাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনও চঞ্চল হইল কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তিনি তখনি সে ভাব নিগ্রহ করিয়া কোপ কটাক্ষে মদনকেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। এবং স্ত্রীসন্নিকট পরিহারের জন্য সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতী ভগ্নমনোরথ হইয়া আপন পিতার নিকট তপঃসমাধি করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি কঠিনশরীর ঋষিগণ আজন্ম পরিশ্রম করিয়াও যেসকল নিয়ম পালন করিতে অক্ষম পার্ব্বতী সেই সকল নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। একদিন মহাদেব স্বয়ং ব্রাহ্মণ বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে মহাদেবের বিস্তর নিন্দা করিলেন। যিনি একবার পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে এরূপ নিন্দা অসহ্য। তিনি সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেছেন এমন সময়ে মহাদেব নিজদেহ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে!!! তখন কোপ প্রণয় বিস্ময় প্রভৃতি নানা বৃত্তি যুগপৎ সমুদগত হইয়া তাঁহার যেরূপ চিত্তবিকার জন্মাইয়া দিল তাহা কালিদাস ভিন্ন আর কেহই বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন কি না সন্দেহ। সেক্ষপিয়রের মিরন্দা যেমন সরলস্বভাবা পার্ব্বতীও সেইরূপ। তিনিও মিরন্দার ন্যায় পিতার নিকট আপন প্রণয় ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মিরন্দা সামাজিক অবস্থা জানে না পার্ব্বতী জানিয়াও ভাবিলেন বিশুদ্ধ প্রণয় প্রখ্যাপণে দোষ কি? তিনি বিদ্যাবতী গৃহকর্ম্ম-চতুরা, নানা বলি কর্ম্মে তাঁহার নিত্য আমোদ। তিনি আতিথেয়ী। তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইবার নহে মন টলিবার নহে। মেনকা কত বুঝাইলেন, বলিলেন তোমার পিতা দেবতাদের দেশের অধিপতি যদি দেবতা তোমার কামনা হয় বল। পার্ব্বতী মৌনভাবেই তাহার উত্তর দিলেন। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন মহাদেবেই কি তোমার প্রণয়? পার্ব্বতী একটী নিশ্বাস ফেলিয়া

তাহার জবাব দিলেন ; পিতার নিকট যখন বিবাহের কথা উঠিল তখন লীলাকমল-পত্রের গণনায় তৎপরা হইলেন। তিনি কুলোকের সংসর্গ ভালবাসেন না গুরুজনের নিন্দা তাঁহার বিষ। সকল ভূতেই তাঁহার সমান দয়া। যে সকল গুণে রমণীর চরিত্র উৎকৃষ্ট হয় সে সকলই তাঁহাতে আছে। রমণীকুলের তিনিই গর্ব্বহেতুভূতা। তিনি যেস্থানে তপস্যা করিয়াছেন তাহা এখনও তীর্থ। তাঁহার নিকট সিতশ্মশ্রু ঋষিগণও ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন। তাঁহার চরিত্র তপস্বীদিগেরও উদাহরণস্থল। তাঁহার চরিত্র প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে বিস্ময়মিশ্রিত অদ্ভুত রসের আবির্ভাব হয়। কুমারসম্ভব গ্রন্থ হইতে আমরা তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত জানি। ইহার মধ্যে ঐহিকতার লেশ মাত্রও নাই। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মে ভক্তি দেবতায় ভক্তি মনু প্রভৃতি মুনিগণের বচনে আস্থা বিশেষতঃ তাঁহার সরলতা পিতৃভক্তি স্বামীভক্তি. সখীগণের প্রতি ব্যবহার আশ্রমের উন্নতি চেষ্টা লৌকিক নারীগণের মধ্যে অতি বিরল। নারীচরিত্র বিষয়ে কবিরা কতদূর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন পার্ব্বতী চরিত্রে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গদর্শনকার স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন বাল্মীকির রামায়ণ হইতে আখ্যায়িকা লইয়া যে সকল কাব্য ও নাটক রচনা করা হইয়াছে তাহাতে রাম ও সীতার চরিত্র উত্তমরূপে বর্ণিত হয় নাই। ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কালিদাসের রাম ও সীতা বাল্মীকির রাম ও সীতা হইতে উৎকৃষ্ট না হউক তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। বাল্মীকির ন্যায় কালিদাসও সীতার বাল্য-কালের কোন কথাই লিখেন নাই, কালিদাস স্পষ্ট জানিতেন যে, বাল্মীকির সঙ্গে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে পরাভূত হইতে হইবে। এই জন্যই তিনি অযোধ্যাকাণ্ড বনকাণ্ড কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সুন্দরাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড এক সর্গের মধ্যে সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন। ঐ সর্গও নীরস কিন্তু তাহার বিদ্যুত্বরিত গতি বর্ণনা উহার একটী আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। তিনি চতুর্দ্দশে সীতাচরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সর্গ হইতে তাঁহার সীতার বনবাসের অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। যখন লক্ষ্মণ বনমধ্যে রাজার ভয়ঙ্কর আদেশ সীতাকে অবগত করাইলেন তখন সীতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ স্থির দুঃখভাগী আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বিদায় হইবার জন্য প্রণাম করিলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি সেই রাজাকে বলিও যদি অন্তঃস্বত্বা না হইতাম তোমার সমক্ষে এই মুহূর্ত্তেই জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। তুমি তাঁহাকে বলিও,

"সাহংতপঃ সূর্য্য নিবিষ্ট দৃষ্টি রূর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেপি ত্বমেব ভর্ত্তা নচ বিপ্রয়োগঃ।

তিনি আবার বলিলেন "তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিবে যদিও ভার্য্যাভাবে আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু যেন সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য হই। তিনি সসাগরা পৃথিবীর ঈশ্বর। যেখানে যাই তাঁহার অধিকারের বহির্ভূত নহি।" মহর্ষি বাল্মীকি যখন তাঁহাকে আপন আশ্রমে লইয়া রাখিলেন তখন তিনি অতিথি সেবা নিরন্তর স্নানাদি ধর্ম্মকার্য্য করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার যে নিদারুণ কষ্ট হইয়াছিল যখন শুনিলেন আজিও রাম তাহা ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না এবং তিনি হিরন্ময়ী সীতা প্রতিকৃতি লইয়া যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার অনেক শমতা হইল।

একদিন রামচন্দ্র যজ্ঞ সমাপনান্তে পৌরবর্গকে একত্রিত করিয়া সীতা পরীক্ষার কথা উত্থাপন করিলেন। সীতাও আচমন করিয়া কহিলেন,

বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি মামন্তর্দ্ধাতু মর্হসি॥

ভগবতী বিশ্বম্ভরা সীতার কথা শুনিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া ভূগর্ভে অন্তর্হিতা হইলেন। প্রধান কবিরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন না। কালিদাস সীতা চরিত্রের দুই একটী অতি বিশুদ্ধ নির্ম্মল ও ভাবপূর্ণ অংশের পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

সংস্কৃতে কাব্য ও নাটকের সংখ্যা অনেক। সেই সমুদয় হইতে স্ত্রীচরিত্র সংগ্রহ করিতে হইলে গ্রন্থ বিস্তার হইয়া পড়ে। সুতরাং অগত্যা নাগানন্দ রত্নাবলী বাসবদত্তা প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখমাত্র করিয়া সংস্কৃত কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস ও ভবভূতির সর্ব্বস্বভূত অভিজ্ঞান শকুন্তল ও উত্তররাম চরিত হইতে শকুন্তলা ও সীতাচরিত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। এই দুইটী রমণীয় চরিত্র বর্ণনে কবিরা আপন আপন কল্পনা শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দুইটী রমণীর অবস্থাগত অনেক প্রভেদ। সীতার বিরহ, শকুন্তলার পূর্ব্বরাগ, সীতা যুবতী, শকুন্তলা বালিকা। সীতা রাজনন্দিনী, শকুন্তলা তপোবন প্রতিপালিতা, কিন্তু উভয়েই প্রত্যাখ্যান প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েই নানাবিধ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েরই চরিত্র স্ত্রীচরিত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। দেবতা ও ঋষিরা উভয়েরই দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা করিয়াছেন এবং স্বামীর সহিত মিলন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছেন। উভয়েই অনেক কাল বনে বাস করিয়াছেন। বনতরু বনলতা বনময়ূর বনমৃগ উভয়েরই প্রিয়পাত্র।

উভয়েরই হৃদয় সরল ও প্রণয়প্রগাঢ়। বনবাস-সখীদিগের সহিত উভয়েরই সমান সখ্যভাব। সীতা রাবণ কর্ত্তৃক পীড়িতা হইয়া এক্ষণে পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, রাজরাণী হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার মুগ্ধস্বভাব পূর্ব্ববৎই আছে। চিত্রদর্শন প্রস্তাবে তাহার সকল ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বিবাহ সময়ে সুখের চিত্র দেখিয়া হর্ষিত হইলেন। শূর্পনখাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। আর্য্যপুত্রের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অশ্রুপাত হইল। তপোবন দেখিয়া পুনর্ব্বার তথায় ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি রামকে বলিলেন, তোমাকেও আমার সহিত যাইতে হইবে। রাম কহিলেন অয়ি মুগ্ধে একথাও কি বলিতে হয়। তিনি রামবাহু আশ্রয় করিয়া শয়ন করিলেন কিন্তু তাঁহার কোমল অন্তঃকরণে চিত্র দর্শন জনিত নানা উদ্বেগ এখনও শান্ত হয় নাই। তিনি স্বপ্নে বলিয়া উঠিলেন "আর্য্যপুত্র এই তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ।" রামচন্দ্র সেখান হইতে চলিয়া গেলে নিদ্রাভঙ্গানন্তর উঠিয়া বলিলেন, "ভোদুকুবিস্মং" তাহার পরই বলিলেন "ষই অত্তনো পভবিস্মং"। লক্ষ্মণ রথ আনয়ন করিলে আর্য্যপুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে তাহাতে আরোহণ করিলেন। যখন লক্ষ্মণ প্রস্তরবৃষ্টির ন্যায় রাজসন্দেশ অবগত করাইলেন তখন সীতা অসহ্য শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়কে পৃথ্বী ও ভাগীরথী বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন এবং তিনি ভাগীরথীর সহিত পাতাল পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

এক দিন ভাগীরথী ছল করিয়া তমসার সহিত সীতাকে পঞ্চবটীর বনে পাঠাইয়া দিলেন। যেখানে আর্য্যপুত্রের সহিত নানা সুখভোগ করিয়া ছিলেন যেখানে "সরসী আরসী"-তে আর্য্যপুত্রের সহিত আপন মুখাবলোকন করিতেন আবার সেই স্থানে। রামচন্দ্রও কার্য্যোপলক্ষে পুনরায় পঞ্চবটী আসিয়াছেন, সঙ্গে কেহই নাই। সীতা রামের গম্ভীর স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র চকিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাহার পর যখন জানিলেন সত্যই তাঁহার আর্য্যপুত্র পঞ্চবটী আসিয়াছেন তখন সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন এবং একতানমনে তাঁহারই কথা শুনিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন রামচন্দ্র তাঁহারই জন্য শোক করিতেছেন তখন বলিলেন, অজ্জ উত্ত অসরিসং কৃখু এদং ইমস্স বুত্তন্তস্স। তাহার পর বলিলেন, আর্য্যপুত্র তুমি আজিও সেইই আছ। রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সীতা, পাছে তিনি স্পর্শ করিলে রামচন্দ্র কুপিত হন এই ভয়েই অস্থির হইলেন। পরে সাহসে ভর করিয়া কহিলেন যা হবার হউক আমি উঁহাকে স্পর্শ করিব। যখন রামচন্দ্রকে বাসন্তী তিরস্কার করিতে লাগিলেন তখন তিনি কহিলেন, "সখি তুমি ভালর জন্য বলিতেছ

বটে কিন্তু দেখিতেছ না কি উহাতে বিষময় ফল ফলিতেছে। সখি তুমি বিরত হও।" তাঁহার প্রিয় হস্তী বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে শুনিয়া সীতার মন চঞ্চল হইল, উহাকে হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ দেখিয়া শুদ্ধ তাঁহার হর্ষ হইল এমন নহে তাঁহার কুশ ও লবকে মনে পড়িয়া গেল। রামচন্দ্র বিদায় হইলে যতক্ষণ তাঁহার রথচক্র দেখা যাইতে লাগিল ততক্ষণ কাহার সাধ্য সেদিক্ হইতে তাঁহার স্থিরদৃষ্টি অন্যত্র নিক্ষেপ করে। তাহার পর নমো নমো অজ্জ উত্তা চরণ কমলাণং নমো অপূব্ব পুন্ন জণিত দংশনানং বলিয়া কষ্টে সৃষ্টে বিনিবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বার পরীক্ষার সময় যখন সীতা সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন তাঁহার নয়ন স্বামীর চরণে অর্পিত। হৃদয়ে নানা উদ্বেগ। তাঁহার আকৃতিতে স্পষ্টই অনুভব হইতে লাগিল তিনি বিশুদ্ধ চরিত্রা। রামচন্দ্র পৌরজানপদবর্গের মত লইয়া পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

সীতার চরিত্র। সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন। তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে বোধ হয় বিধাতা মানব জাতিকে পতিব্রতা ধর্ম্মে উপদেশ দিবার জন্যই সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী কোন কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতিলাভ করিয়া তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন এরূপ বোধ হয় না।

শকুন্তলাও সীতার ন্যায় মুগ্ধস্বভাবা। মুনি তাঁহাকে বনমধ্যে কুড়াইয়া পান এবং সন্তানের ন্যায় তাঁহার প্রতিপালন করেন। তিনি অল্প বয়সেই গৃহ কার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছেন এবং লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন, তপোবন তরুদিগের পাটী করিতে তিনি বড় ভালবাসেন। তাঁহার পিতা সোমতীর্থ গমন কালীন বৃদ্ধা গৌতমীকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারই হস্তে অতিথিসেবার ভার দিয়া গিয়াছেন। তপোবনবাসী আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁহাকে ভালবাসে। তাঁহার সখীদিগের তিনিই সর্ব্বস্ব। তাহারা তাঁহার সেবা করিতেছে তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তাঁহার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে পুষ্পবৃক্ষের আলবাল পূরণ করিতেছে এবং তাঁহার ভাবিবিরহ আশঙ্কায় কাঁদিতেছে। তাঁহার অদৃষ্টের জন্য তাঁহার অণুমাত্র চিন্তা নাই তিনি একমনে রাজাকেই ভাবিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সখীদিগের ভাবনা তাঁহারই জন্য। তাহারা দুর্ব্বাসার শাপ মোচন করিল, তাঁহার আশঙ্কিত প্রত্যাখ্যান নিরাকরণের উপায় করিয়া দিল এবং কত যে দুঃখ প্রকাশ করিল তাহা বলা যায় না। শকুন্তলাও যাইবার সময় পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন সখীরাও আমার সমভিব্যাহারে চলুক। তিনি তাহাদিগকে আপনার

ভাবিতেন, আপন মনের ভাব তাহাদিগকেই বলিতেন এবং তাহাদিগকেই বিশ্বাস করিতেন। সরলহৃদয়া গৌতমীও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি পিতৃ সেবায় তৎপরা ছিলেন বলিয়া পিতাও তাঁহার জন্য কাতর। রাজার প্রথম দর্শনদিনাবধি শকুন্তলা তাঁহার জন্য ব্যাকুলা। তিনি তপোবনবাসিনী, প্রণয় তপোবনবিরোধী ভাব ; এবং তাঁহার পক্ষে অনুচিত ইহাও তিনি জানেন। তিনি নানা প্রকারে ভাব গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন কিন্তু তিনি সে বিদ্যা শিখেন নাই। যতই গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন ততই আরও প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে অপার চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ করিল তিনি ম্রিয়মানা হইলেন। তাঁহার প্রিয় সখিরা তাঁহার জন্য রাজাকে জানাইতে উদ্যোগ করিল। রাজা তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিলেন এবং অতি সত্বরই রাজধানী প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার শকুন্তলার প্রতি বাস্তবিক প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু অলৌকিক দৈব দুর্ব্বিপাকে শকুন্তলা তাঁহার হৃদয় হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন। শকুন্তলার কথা তাঁহার আর মনে রহিল না। কণ্বমুনি শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এবং সত্বর তাঁহাকে দুইজন শিষ্য ও সরলস্বভাবা গৌতমীর সহিত রাজবাটী প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা আসিবার কালীন আপন হরিণ শিশুটিকেও বিস্মৃত হইলেন না। সকলের নিকট বিদায় লইয়া অশুভক্ষণে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।

(বেদব্যাস সাধ্বী নারীদিগের যেরূপ সাহস বর্ণনা করিয়াছেন কালিদাস সেরূপ পারেন নাই। তাঁহার সময়ে সেরূপ সাহস লোকে ভালবাসিত না। শকুন্তলা মহাভারতে রাজার সহিত যে সকল কথা কহিয়াছিলেন কালিদাস ঠিক সেই সকল কহাইবার জন্য তাঁহার সহিত দুইজন লোক পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন।)

রাজা দুর্ব্বাসার শাপে সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। শকুন্তলা আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু তিনি চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং শকুন্তলার উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন। শকুন্তলা যে সকল অভিজ্ঞানের কথা কহিলেন তাঁহার ন্যায় সরলস্বভাবার উপযুক্ত বটে। কিন্তু তাহাতে কি হইবে। তিনি রাজাকে হরিণশিশু স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের মিথঃ সংলাপ মনে করাইয়া দিলেন। কিছুতেই রাজার স্মরণ হইল না। তাহার পর শার্ঙ্গরব তিরস্কার করিয়া উঠিলেন শকুন্তলা ভীতা হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ; গৌতমী তাঁহার দুঃখে কাতরা হইলেন। সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ হইল তিনি পুরোহিতের গৃহে প্রসবকাল পর্য্যন্ত বাস করিবেন। তিনি পুরোহিত গৃহ গমন কালীন কেবল আপন ভাগ্যকেই নিন্দা করিতে

লাগিলেন। এমন সময়ে স্ত্রী আকারধারী জ্যোতিঃ তাঁহাকে লইয়া তিরোভূত হইল। তিনি তাহার পর বহুকাল হিমালয়শৈলে কশ্যপ ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিলেন। তথায় প্রোষিতভর্তৃকাবেশে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া পতিব্রতা ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া এবং নিজ শিশুর লালনপালন করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। দৈবানুগ্রহে যখন রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজার শকুন্তলাবৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছে—শাপ মোচন হইয়াছে। তিনি উঁহাকে দেখিয়াই চিনিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখনও শকুন্তলা বলিলেন "নূনং মে সুচরিদ পডিবন্ধ অং পূর্ব্ব কিদং তেসু দিয়সেসু পবিণাম্ সুহং আসী যেন সানুক্কোশেবি অজ্জ উত্তো মহ বিবলোসংবুত্তো।" রাজা যখন পুনরায় তাঁহার হস্তে অঙ্গুরীয়ক সংযোগ করিতে গেলেন তখন ভীরুস্বভাবা শকুন্তলা কহিলেন "নসেবিশ্বসিমি" এবং যখন শুনিলেন শাপ প্রযুক্তই রাজা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না, তাঁহার আনন্দ, উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "দি ট্ঠিয়া অআবণ পচ্চদেসীন অজ্জউত্তো।" আর্য্যপুত্রের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হওয়ায় তাঁহার আমোদ হইল। তার পর ঋষিদিগকে নমস্কার করিয়া আর্য্যপুত্র সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

কালিদাসের শকুন্তলা ও পার্ব্বতী এবং ভবভূতির সীতা বেদব্যাসের সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্র পাঠ করিলেই প্রাচীনকালের স্ত্রীচরিত্রবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা কতদূর উন্নতিকল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যাইবে। এই সকল রমণীই নারীকুলের রত্ন। ইঁহারা সকলেই চিরদিন ভারতবর্ষীয়দিগের দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া থাকিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন সীতা পতিপরায়ণতা গুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী পার্ব্বতী শকুন্তলা প্রভৃতি কামিনীরাও তাহাই করিয়াছেন। ইহাদের মানসিকবৃত্তি প্রায় সকলেরই সমান। কেবল ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। দয়া দাক্ষিণ্য সৌজন্য প্রভৃতি যেসকল গুণ সকল সময়ে সকল জাতীয় মনুষ্যের অলঙ্কার সেই গুণ ইঁহাদের সকলেরই অধিকপরিমাণে ছিল। যে প্রণয় মনুষ্যহৃদয়ের মহার্হ রত্ন ইঁহারা সেই প্রণয়ের আধার ভূমি। স্মৃতি শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীলোকের যেসকল কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন কবিরা সে নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু স্ত্রী-লোকের তাঁহারা যে সকল গুণ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন সেই সকল গুণ তাঁহারা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করাইয়াছেন। কোন নারীরই প্রমাদ, উন্মাদ, কোপ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চন, অভিমান খলতা, হিংসা বিদ্বেষ অহঙ্কার ধূর্ত্ততা ছিল না। সীতা একবার মনে করিলেন "তত্থ কুবিস্সং" তাহার পরক্ষণেই বলিলেন "যদি অত্তনোপহবিস্সং" সাধ্বী রমণীর ঈর্ষ্যা থাকে না। কাশী

রাজদুহিতা তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। ধারিণী কৌশল্যা চারুদত্তবণিতা ইহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। স্বামী ত্যাগ করিলেন বলিয়া সীতা বা শকুন্তলা কাহারও অভিমান হয় নাই। উভয়েই আপন ভাগ্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। যখন আবার স্বামী উপস্থিত হইলেন শকুন্তলা একেবারেই তাঁহাকে আপনার করিয়া লইলেন। সীতা পাছে স্বামী রাগ করেন এই ভয়েই ব্যাকুলা হইলেন। দক্ষ প্রজাপতি বলিয়াছেন সাধ্বী রমণী পাইলে পৃথিবীই স্বর্গ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেক সৌভাগ্য না থাকিলে সাবিত্রী বা শকুন্তলার ন্যায় ভার্য্যা লাভ হয় না।

উপসংহার

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি অত্যন্ত স্নেহপ্রবৃত্তির সহিত যথা পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতার প্রকাশ থাকিলেই নারীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা highest ideal হইবে। এবং আরো বলিয়াছি যে সামাজিক অবস্থা জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাব এই তিনটী প্রতিদ্বন্দ্বী কারণবশতঃ কেহই ঈদৃশ উন্নত চরিত্রা রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার পর ঋষিদিগের পৌরাণিক দিগের ও কবিদিগের সময়ে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। এই সমুদয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হইবে বাল্মীকি প্রভৃতি কবিগণ আপন আপন অদ্ভুত কল্পনাশক্তি বলে যেসকল রমণী সৃষ্টি করিয়াছেন পূর্ব্বোল্লিখিত সামাজিক অবস্থায় তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র মনে ধারণা করাও যায় না। সেই সকল নারীগণের মধ্যে সীতা সাবিত্রী পার্ব্বতী ও শকুন্তলা সর্ব্বপ্রধানা। শকুন্তলা স্নেহপ্রবৃত্তির মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি। ইঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সর্ব্বতোমুখী সমুন্নতি লাভ করিয়াছে। শকুন্তলা ও পার্ব্বতীর যেমন সর্ব্বভূতে সমান স্নেহ এরূপ বোধ হয় জগতের আর কুত্রাপি দেখা যায় না—কি পশু, কি পক্ষী, কি চক্রবাক্ দম্পতী, কি মনুষ্য, কি সখী, কি স্বামী, কি পুত্র সকলের প্রতি ইহাঁদের স্নেহ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু পার্ব্বতী অপেক্ষাও শকুন্তলার স্নেহপ্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী—কালিদাস তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা উত্তেজিত করিতে তাদৃশ যত্ন করেন নাই। তাঁহার হৃদয় স্বরূপ নন্দনকাননে যতকিছু অমৃতময় ফল বা পুষ্প ছিল সমুদয়ই শকুন্তলার অঙ্গশোভা সম্পাদনের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। ভবভূতির সীতা শকুন্তলার ছায়া মাত্র। যদিও শকুন্তলার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা তাদৃশ প্রকাশ পায় নাই কিন্তু তাঁহার কোমলতর বৃত্তিসকল এত সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে যে আমরা পূর্ব্বোক্ত অভাবদ্বয় অনুভবই করিতে পারি না। তাঁহার সরলতা-মিশ্রিত-সহিষ্ণুতাই আমাদের হৃদয়ে আনন্দ সমুৎপাদন করে।

সীতার বুদ্ধিবৃত্তি ও স্নেহপ্রবৃত্তি দুইটাই বলবতী, তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা তাদৃশ প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার সহিষ্ণুতা আমাদিগের মনোরঞ্জন করে। কিন্তু তাঁহার পতিপরায়ণতা সকলের অপেক্ষাই অধিক। সীতা যে আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের প্রিয়পাত্রী তাহার কারণ কেবল তাঁহার সরলতা এবং তাঁহার স্বভাবের গুণ। তিনি নির্দ্দোষী হইয়াও এবং সর্ব্বগুণসম্পন্না হইয়াও নানাবিধ কষ্টভোগ করিয়াছেন এই জন্যই তাঁহার চরিত্র পাঠে আমাদের সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়।

সাবিত্রীচরিত্রে বৃত্তিত্রয়েরই উচিত মত সমুন্নতি দেখা যায়। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি যেমন, স্নেহ প্রবৃত্তি এবং কর্ম্মক্ষমতাও তেমনি ; কিন্তু স্নেহপ্রবৃত্তির যেরূপ প্রাধান্য থাকা আবশ্যক, তাঁহার চরিত্রে তাহা নাই। আমরা পূর্ব্বেই তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করিয়াছি।

পার্ব্বতীচরিত্রে স্নেহপ্রবৃত্তিই প্রধান। মহাদেব তাঁহার অবিচলিত প্রণয়ের অধিকারী। হিমালয় ও মেনকা ভক্তির অধিকারী। আশ্রম বৃক্ষ মৃগ রথাঙ্গ-দম্পতী—জয়া বিজয়া এমন কি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎই তাঁহার স্নেহের অধিকারী। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। তাঁহার ন্যায় অবস্থায় শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার মুখ চাহিয়া থাকিতেন। কিন্তু পার্ব্বতী অমনি বুদ্ধি স্থির করিলেন যে তপস্যা করিবেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা বিলক্ষণ তেজস্বিনী। প্রায়ই দেখা যায় আর্ষ গ্রন্থাবলী হইতে প্রবন্ধ লইয়া কাব্য রচনা করা হইলে স্ত্রীচরিত্র বর্ণনা মন্দ হইয়া পড়ে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কালিদাস বরং পার্ব্বতীচরিত্র বর্ণনা করিয়া উহার অধিকতর সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। পার্ব্বতীর চরিত্র পাঠে আমাদের যেরূপ বিস্ময়মিশ্রিত অদ্ভুত রসের * আবির্ভাব হয় সংস্কৃত কবিদিগের আর কোন নারী চরিত্র পাঠে তাদৃশ হয় না।

এই চারিজন রমণীই আর্য্য কবিগণের কল্পনাবৃক্ষের অমৃতময় ফল। ইঁহাদের চরিত্রগত যদিও কিছু ইতর বিশেষ দেখা যায় তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি নাই। আর্য্য কবিকল্পিত নারীচরিত্রের ইঁহারাই প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা highest ideal। ইঁহাদের চরিত্র পাঠে যে কেবল কাব্যপাঠজনিত আনন্দ লাভ মাত্র এরূপ নহে—উহাতে হৃদয়ের প্রশস্ততা হয়, ধর্ম্মে মতি হয়, দুঃখের সময় সহিষ্ণুতা জন্মে এবং নানা সময়ে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয়।

প্রাচীন কালের নারীদিগের চরিত্র বর্ণনা শেষ হইল। স্মৃতিকারেরা যেরূপ স্ত্রীচরিত্রের চিত্র দিয়াছেন তাহার অপেক্ষা সুন্দর চিত্র জগন্মধ্যে পাওয়া সুকঠিন।

* Sublimity.

কোন দেশীয় স্মৃতিকারেরাই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর চরিত্র লিখিতে পারেন ও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নিয়মাবলী প্রচার করিতে পারেন এরূপ বোধ হয় না। স্মৃতিকারেরা যাহাই করুন কবিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য ভাণ্ডারে সেরূপ নারীচরিত্র অতি বিরল। আমরা হয় ত দময়ন্তী শকুন্তলা দুএকটী পাইতে পারি কিন্তু সীতা পার্ব্বতী ও সাবিত্রী মিলিয়া উঠা ভার। বোধ হয় বাল্মীকি ও বেদব্যাস ভিন্ন আর কোন দেশীয় কোন কবিই ওরূপ বর্ণনা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

যখন আমরা কল্পনারাজ্য ত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই তখনও আমরা এতদ্দেশীয় রমণীগণের সময়ে সময়ে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিতে পাই। আমরা দেখিতে পাই দুএকজন রমণী পণ্ডিত-মণ্ডলীর রত্ন স্বরূপ। দুএকজন সংগ্রাম কার্য্যেও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং দুই চারিজন রাজনীতিতে সম্যক্ দক্ষ ছিলেন। কর্ণাটী রাজমহিষী, বিশ্বদেবী, লক্ষ্মীদেবী, খনা, লীলাবতী, প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। দুর্গাবতী লক্ষ্মীবাই যশোবন্ত রায়ের রমণী—স্বয়ং যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তারাবাই অহল্যাবাই সাবিত্রীবাই তুলসীবাই অনেক দিবস ধরিয়া মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অহল্যাবাই সর্ব্বগুণবিভূষিতা ছিলেন। তাঁহার দয়া দানশক্তি রাজনীতি-চাতুর্য্য ভারতবর্ষের ইতিহাস মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। আমাদিগের দেশে রাণী ভবানীও বিখ্যাত রমণীগণের মধ্যে একজন। এবং এখনও আমরা সর্ব্বদা সংবাদ-পত্রে নানা গুণবতী রমণীর নাম শুনিতে পাই।

মধ্যকালে ভারতবর্ষের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থাগত অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। এক্ষণে সেই ক্ষতি পূরণের জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। বোধ হয় এক শতাব্দী মধ্যে আমরাও আমাদিগের দেশে আরও অনেক উৎকৃষ্ট চরিত্রা নারীর নাম শুনিতে পাইব। স্ত্রীলোক যদি পুরুষের সহিত মিলিয়া দেশের উন্নতি প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হয় তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। মহাত্মা মিল বলিয়াছেন তিনি পলিটিকাল ইকানমি প্রণয়নের সময় তাঁহার স্ত্রীর নিকট অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরাও ভরসা করি অতি অল্প দিনের মধ্যে আমাদের দেশেও অনেক ওরূপ গুণবতী দেখিতে পাইব। সমাজের স্ত্রী অর্দ্ধেক ও পুরুষ অর্দ্ধেক। যদি অর্দ্ধেক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে তবে অপর অর্দ্ধেকের দ্বারা সমাজের সমস্ত হিতসাধন হইবে এরূপ কামনা কখনই করিতে পারা যায় না।

৫৫

সতের সংসর্গে প্রায় অসত দুর্জন।
পরিহার করে দুষ্ট স্বভাব আপন॥
দেখহ প্রখরতর দিনকর কর।
অমৃত ধারায় ক্ষরে প্রাপ্তে নিশাকর॥

৫৬

কালক্রমে পরিণামে সব ভাবান্তর।
পূর্ব্বতন বুদ্ধি প্রতি জন্মে অনাদর॥
পূর্ব্বে বারিধরে যেই ছিল জলকণা।
শুক্তিগর্ভে মুক্তা হলো, বংশেতে রোচনা॥

৫৭

ঋণ-শেষ অগ্নি শেষ, আর রোগশেষ
বিচক্ষণগণ কভু না রাখেন লেশ॥
থাকিলেই পুনর্ব্বার সংবর্দ্ধিত হয়।
অতএব শেষরাখা সমুচিত নয়॥

৫৮

পর পরিবাদ, পরদ্রব্য, পরদার।
গুরু স্থানে পরিহাস কর পরিহার

৫৯

যার বশে থাকে দারা, সুত, ভৃত্যবর্গ।
অভাবে সন্তোষতার ধরাতলে স্বর্গ॥

৬০

এক পদে রাখি ভর, অন্যপদে অগ্রসর।
করেন যাঁহারা বুদ্ধিমান।
যদবধি পরস্থান, নাহি হয় দৃশ্যমান,
পরিত্যাজ্য নহে পূর্ব্বস্থান॥

৬১

দানকর্ত্তা দাতাগণ ভূতলে বিরল।
ঘরে ঘরে পূর্ণ কিন্তু ভিখারীর দল॥
চিন্তামণি আছে কি না বিবাদ বিষয়।
পথে পথে ধূলার ত সংখ্যা নাহি হয়।

৬২

জাতি যায় রসাতল, গুণগণ সুবিমল,
একেবারে অধোগত হয়।
চূর্ণ শৈলতটে পড়ি, শীল যায় গড়াগড়ি,
হুতাশনে দগ্ধ বন্ধুচয়॥
শূরত্ব বীরত্ব যত, বৈরিকৃত সব হত,
আশু প্রপতিত বজ্রানলে।
একা ধনাভাব জন্য, তৃণসম হয় গণ্য,
সব গুণ বিগত বিফলে॥

৬৩

বিষ-দন্ত ভগ্ন হেতু নাহি তেজ মাত্র।
সাপুড়ের সাপুড়ীতে সুপীড়িত গাত্র॥
ক্ষুধায় মলিন তাহে ইন্দ্রিয় নিকর।
জীবিতে মৃতের প্রায় ছিল বিষধর॥
হেন কালে দেখ দেখি কি দৈবের গতি।
রজনীতে এলো তথা ইন্দুর দুর্ম্মতি॥
ক্ষুধানলে প্রজ্বলিত তাহার শরীর।
সাপুড়ীতে আছে খাদ্য ইহা করি স্থির॥

কাটুর কুটুর রবে গর্ত্ত কাটি তলে।
একেবারে প্রবেশিল ফণীর কবলে॥
আহার পাইল ফণী প্রাপ্ত হলো পথ।
একেবারে সিদ্ধ তার দুই মনোরথ।
অতএব শুন ভাই কথা সাবধানে।
শুভাশুভ সকলই বিধির বিধানে॥

৬৪

কন্দুকে* আছাড়ি মার ভূমির উপরে।
তখনি লাফায়ে সেই উঠিবে অম্বরে॥
সেরূপ জানিবে যত মহতের ধারা।
বিপদে পড়িবা মাত্র সমুত্থিত তাঁরা॥

৬৫

কন্দুকের প্রায় সব মহৎ ধীমান্।
যেমন পতন-প্রাপ্ত, অমনি উত্থান॥
মাটিতে মিশায় মাটি, ঢেলা যদি পড়ে।
ইতর বিপদে পড়ি নাহি নড়ে চড়ে॥

৬৬

বিভবেতে মহতের মানস কমল।
উৎপলের অনুরূপ বিহিত কোমল॥
আপদ সময়ে কিন্তু সেই তামরস।
মহাশৈল-শিলা সম বিষম কর্কশ॥

৬৭

পূর্ব্ব দুগ্ধ কৃপাধান, উদকেরে দিল স্থান,
দুই তনু এক তনু তায়!
তাপে তপ্ত দেখি ক্ষীরে, সহ্য নাহি হয় নীরে
অনল প্রবেশে দ্রুত তায়॥
দেখি নীরে ক্ষিপ্ত-প্রায়, দুগ্ধ নাহি ছাড়ে তায়,
উভয়েতে প্রবেশে অনলে।
এইরূপ সদাচার, যদি হয় সুসংস্কার,
সেই ত মিত্রতা ভূমণ্ডলে॥

৬৮

একটুকু পচা নাড়ী বস্যাতে মলিন।
কিবা একখানি অস্থি মজ্জা মাংস হীন।
প্রাপ্ত হয়ে কুকুরের পরিতোষ কত।
ফলে তার ক্ষুধার সুধার নহে গত॥
কিন্তু দেখ কেশরীর রীতি ভিন্ন মত।
যত্তপি জম্বুক তার হয় অনুগত॥
কুঞ্জরে দেখিবামাত্র তারে পরিহরি।
কুম্ভ বিদারিয়ে রক্তধারা পিয়ে হরি॥
অতএব স্বীয় সত্ব অনুরূপ ফল।
কষ্টস্থষ্টে অন্বেষিয়া লয় জীবদল॥

৬৯

মৃগ মীন আর সাধু সজ্জন নিকরে।
তৃণ, জল, সন্তোষেতে, জীবিকা নির্ভরে॥
নিষাদ, ধীবর, আর পিশুন দুর্জ্জন।
অকারণে ইহাদের বৈর-পরায়ণ॥

৭০

সন্তাপে বিকৃত বারি প্রখর অনলে।
মুক্তাকারে শোভা পায় নলিনীর দলে॥
সাগরের শুক্তি মধ্যে পতনে তাহার।
অপরূপ মুক্তারূপ ফল অবতার॥
কেবল সংসর্গগুণে জানিবে নিশ্চয়।
অধম মধ্যমোত্তম গুণজাত হয়॥

৭১

নীরবে থাকিলে পরে বোবা কহে তায়।
বাচাল বাতুল বলে বাক্ পটুতায়॥
ক্ষমাগুণ যদি থাকে ভীরু নাম হয়।
সহ্য গুণ না থাকিলে ছোট লোক কয়॥
ধৃষ্ট খ্যাতি যত্তপি নিকটে সদা রয়।
অন্তরে থাকিলে পরে জড় সুনিশ্চয়॥
অতএব সেবা ধর্ম্ম পরম দুর্গম।
যোগীরাও না জানেন তাহার মরম॥

৭২

লোভ যদি হৃদয়স্থ গুণে কিবা হয়।
ক্রূরতা থাকিলে সেই পাতক নিশ্চয়॥

* বস্ত্র বা চর্ম্মাদি নির্ম্মিত গোলা (Ball).

সত্য যদি থাকে তপে কিবা প্রয়োজন।
শুচিমনে কিবা কাজ তীর্থ পর্য্যটন॥

৭৩

ভজ এক দেব বিষ্ণু কিম্বা পশুপতি।
মিত্রতা ভূপতি কিম্বা যতির সংহতি॥
হয় বাস নগরেতে, কিম্বা বাস বনে।
বিবাহ সুন্দরী সনে, কিম্বা দরী* সনে॥

৭৪

তৃষ্ণা ত্যজ, ভজ ক্ষমা, মদ পরিহর।
পাপে রতি ছাড়, সত্যকথা সার কর॥
সাধুর চরণচিহ্নে করহ পয়ান।
সেব সুপণ্ডিতগণে, মান্যে দেহ মান॥
বিদ্বেষীকে বশীভূত কর অনুনয়ে।
স্বমুখে করোনা ব্যক্ত নিজ গুণচয়ে॥
দুঃখিতেরে দয়া কর কীর্ত্তির পালন।
এই সব সুজনগণের আচরণ।

৭৫

বুদ্ধির জড়তা হরে, সত্যে দেয় মতি।
সম্মানে উন্নতি করে কলুষে বিরতি॥
হৃদয় প্রসন্ন করে কীর্ত্তির সঞ্চয়।
সাধুসঙ্গে মানুষের কি না লাভ হয়॥

৭৬

মুকুরে বিম্বিত মুখ যথা ধৃত নয়।
অনায়ত্ত সেইরূপ কুনারী হৃদয়॥
পর্ব্বতের সূক্ষ্ম পথ যেরূপ বিষম।
সেইরূপ হয় তার ভাব সুদুর্গম॥
চিত্তটী তরল যেন পদ্মপত্র জল।
যারে হেরি বিদ্বানেরো মানস বিকল॥
কুনারী লতিকারূপ গরল-অঙ্কুর।
দোষরূপ পঙ্কে তার শ্রীবৃদ্ধি প্রচুর॥

৭৭

স্বার্থ পরিত্যাগ করি পরার্থ যোজনা।
যাহার দ্বারায় হয়, সাধু সেই জনা॥
আত্মলাভ প্রতিকূলে পরার্থে যোজনা।
সচেষ্ট যে নহে, সেই সামান্য গণনা॥
স্বার্থ হেতু পরহিতে বিঘ্নকারী যেই।
মানুষ রাক্ষস দুষ্ট নরাধম সেই॥
নিরর্থক পরহিত যে জন সংহারে।
সে যে কি পদার্থ আমি না জানি তাহারে

৭৮

দোষগুণ সব কার্য্যে আছে বিদ্যমান।
পরিণাম চিন্তি কার্য্য করেন ধীমান্॥
সম্পদে সহজে কৃতকার্য্য বহুতর।
বিপদে হৃদয় দহে শেলের শোষর॥

৭৯

বনে, রণে, শত্রুমাঝে, সলিলে অনলে।
মহার্ণবে কিম্বা গিরি-মস্তক-মণ্ডলে॥
প্রসুপ্ত প্রমত্ত তথা বিষম বিপদে।
পূর্ব্বকৃত পুণ্য রক্ষা করে পদে পদে॥ †

৮০

পূর্ব্ব পুণ্যবল যার আছয়ে যথেষ্ট।
তার পক্ষে ভীমবন হয় পুরশ্রেষ্ঠ॥
দুর্জ্জন সুজন হয় যাহার সদন।
নিধি রত্ন পূর্ণ ধরা সদা সর্ব্বক্ষণ॥

৮১

বরং ঘোর বনে ভ্রম বনচর সহ।
সুরেন্দ্রভবনে মূর্খ সংসর্গ দুঃসহ॥

৮২

ধনের ত্রিতয় গতি দান, ভোগ, নাশ।
দান ভোগ হীন প্রাপ্ত তৃতীয় নির্ব্বাস॥

* পর্ব্বতের গুহা।
† এই নীতি মূলগ্রন্থকারীর অনুমোদনীয় নহে।

৮৩

ধন যার আছে সুকুলীন সেই নর।
সেই বক্তা, সেই মনোহর রূপধর॥
সেই সুপণ্ডিত শ্রুতবান গুণালয়।
স্বর্ণেতেই সব গুণ করয়ে আশ্রয়॥

৮৪

ঈর্ষী, ঘৃণী, অসন্তুষ্ট, নিত্য ভীত রাগী।
পরভাগ্যজীবী, এই ছয় দুঃখ ভাগী।

৮৫

যজ্ঞে, পরিণয়ে, রিপুক্ষয়ে, কি ব্যসনে।
যশস্কর কর্ম্মে আর মিত্র সংগ্রহণে॥
প্রাণ প্রিয়া নারী তথা বান্ধব কারণ
এই অষ্টে অতিব্যয় নাহি কদাচন॥

৮৬

সর্ব্বসুখ নাশে তৃষ্ণা, রূপ নাশে জরা।
খলসেবা পুরুষের অভিমান হরা॥
ভিক্ষায় গৌরব, আত্মম্ভরিতায় গুণ।
চিন্তা জরে বল, অদয়ায় লক্ষ্মী, ন্যূন॥

৮৭

অনুদ্যোগী পুরুষের যশ হয় ক্ষয়।
মৈত্রী কোথা যেখানেতে এক ভাব নয়॥
ধনলুব্ধে ধর্ম্মনাশ, কুকর্ম্মীর কুল।
ব্যসনীর বিদ্যাফল ব্যসনে নির্ম্মূল॥
কৃপণ বিনষ্ট যদি করে ব্যবহার।
মাতাল মন্ত্রীর দোষে রাজ্য ছারখার॥

৮৮

জলনিধি আবরণ হন ধরণীর।
আবাসের আবরণ হয় ত প্রাচীর॥
রাজা ভিন্ন দেশের কি আবরণ আর।
সুচরিত্র আবরণ হয় ললনার॥

৮৯

হস্তের প্রতিষ্ঠা যদি দানধর্ম্মে রত।
মস্তকের শ্লাঘা যদি গুরুপদে নত॥
মুখের প্রশংসা সত্যবাণী সুনিশ্চয়।
ভুজের প্রতিষ্ঠা বীর্য্যাবিভাত বিজয়॥
হৃদয়ের শ্লাঘা ইচ্ছামত আচরণ।
শ্রুতির গৌরব সদা শ্রুতির শ্রবণ॥
প্রকৃতি-মহৎ যাঁরা, সেই সব নরে।
ধন বিনা এসকল ভূষা শোভা করে॥

৯০

আমাতে তোমাতে অন্যে একই ঈশ্বর।
তবে বল মম প্রতি কেন ক্রোধ কর॥
একেবারে পরিহার করি ভেদজ্ঞান।
সকলেই দেখ ভাই আপন সমান॥

৯১

নূতন বসন, নূতন ভবন,
নবছত্র নবনারী রতন।
সর্ব্বত্র নূতন, হয় সুশোভন,
সেবকায় পুরাতন॥

৯২

কভু ভূমিশয্যা, কভু পালঙ্কে শয়ন।
কভু শাকাহার, কভু পরান্ন-ভোজন॥
কভু ছেঁড়া কাঁথা, কভু বিনোদ বসন।
ইথে সুখ দুঃখ জ্ঞানী না করে গণন॥

৯৩

তিন লোক দান করি, অর্চনা করিয়া হরি,
বলি গেল পাতাল ভবন।
ছাতু শরা করি দান, কোন এক তপস্বান,
স্বর্গপুরে করিল গমন॥
আবাল্য অবধি যার, কত কত হৈল জার,
সে কুন্তীর স্বর্গেতে বসতি।
আহা পতিপ্রাণা সতী, সীতার পাতালে গতি,
মরি কি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি॥

২৪

কানীন আপনি মুনি, পুন পুরাণেতে শুনি,
ভ্রাতৃবধূ বিষবারমণ।
গোলক নন্দনগণ, তাঁর নাতি পাঁচজন,
কুণ্ডবলি আছে বিঘোষণ॥
সে পাণ্ডব অব্যাহত, এক রমণীতে রত,
পুণ্যবলে নাহি কিছু ক্ষতি।
তাহাদের গুণগ্রাম, গায় লোক অবিশ্রাম,
মরি কি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি॥

২৫

আহারেতে শুদ্ধাচার, বচন সুধার ধার,
গৃহাভাবে পরঘরে রয়।
মমতা বিহীন মন, বনে রস আলাপন,
বাচালতা বসন্ত সময়॥
এতগুণ সেই ধরে, ত্যজি হেন পিকবরে,
কি কারণ ভক্তি ভাবে অতি।
খঞ্জরীট কৃমিভুজে, মানব মণ্ডলী পূজে,
মরি কি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি॥

২৬

কপোতিনী সকাতরে কান্তপ্রতি কয়।
আজি নাথ অন্তকাল হইল উদয়॥
ধনু শর করে ব্যাধ ভ্রমে অধোভাগে।
উপরেতে শ্যেন পক্ষী ফিরে ভাগে ভাগে॥
হেনকালে ব্যাধেরে দংশিল বিষধর।
শ্যেনেরে আহত করে নিষাদের শর॥
উভয়ে তখনি গেল যমের বসতি।
দেখ দেখি অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি॥

২৭

পারীন্দ্রের পরাজয়ে, সুরভীর মাংস লয়ে,
বাড়াইনু কুকুরের কায়।
দিলাম শাল্যন্ন দধি, পায়সান্ন নিরবধি,
ফুলিয়া উঠিল তনু তায়॥
কিন্তু সিংহ রব শুনি, অতি ভয়াতুর শুনী,
গভীর গুহায় পলাইল।
হায় একি সর্ব্বনাশ, হত যত অভিলাষ,
লাভ মাত্র গোবধ হইল॥

২৮

চন্দন চম্পক বন, রসাল রসাল গণ,
কাটি কাঁটা করীর † রক্ষণ।
হিংসি হংস শিখাবল, কোকিল কোকিলা দল,
কাকলয়ে ক্রীড়া আকুঞ্চন॥
করি করি বিনিলয়, গর্দ্দভ ক্রয়িত হয়,
কার্পাস কর্পূরে এক দাম।
গুণিপক্ষে এ প্রকার, যথা হয় অবিচার,
সে দেশের পায়েতে প্রণাম॥

২৯

পুরোভাগে রেবা পার, শোভিতেছে পরে তার
দুরারোহ পর্ব্বত-শিখর।
পশ্চাতে সবর বর, ধনুশর যুক্তকর,
ধাইতেছে অতি দ্রুততর॥
দক্ষিণেতে সরোবর, বামে দহে ভয়ঙ্কর,
দাবাদাহ তাহে তপ্তকায়।
পলাইয়া যেতে নারে, থাকিতেও নাহি পারে,
মৃগশিশু কাঁদে হায় হায়॥

ইতি দ্বিতীয় অঞ্জলি।

---

† কণ্টক বৃক্ষ বিশেষ।
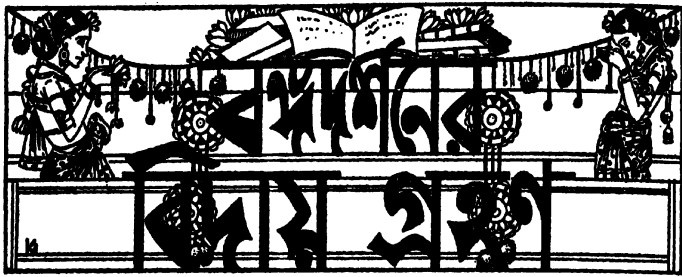
চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম, কতকগুলি অব্যক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আর্য্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য আমি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক, আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

এ সম্বাদে কেহ সন্তুষ্ট, কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন এ কথা বলায় আত্মশ্লাঘার বিষয় কিছুই নাই। কেননা এমত ব্যক্তি বা এমন বস্তু জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ না কেহ অনুরক্ত নহেন। যদি কেহ বঙ্গ-দর্শনের এমত বন্ধু থাকেন যে, বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই যে, যতদিন বাঁচিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রত বিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন, তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্য-জীবন ক্ষণস্থায়ী ; এই অল্পকাল মধ্যে সকলকেই অনেকগুলি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে

হয়; এজন্য কোন একটিতে কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহসংসারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে, যে তাহাতে এই জীবন মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার নহে, এবং আমিও তাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্য পাত্র নহি।

যাঁহারা বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন, তাঁহাদের প্রতিই আমার এই নিবেদন। আর যাঁহারা ইহাতে আহ্লাদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সম্বাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জ্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গদর্শন সম্পাদন কালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য্য।

প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনের প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি একদিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এতদিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কি না সন্দেহ। এবৎসর বঙ্গদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ যত্ন করি নাই, এবং সন ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই, তথাপি পাঠকশ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা দেখি নাই। ইহার জন্য আমি বঙ্গীয় পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তৎপরে, যেসকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় * প্রভৃতির লিপিশক্তি,

* বাহুল্য ভয়ে সকলের নাম লিখিত হইল না। বিশেষ আমার ভ্রাতৃদ্বয়, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অথবা আজন্মসুহৃৎ বন্ধু বাবু জগদীশ নাথ রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাগাড়ম্বর মাত্র। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শ্রীকৃষ্ণদাসও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ, এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।

আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নাম উল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক —আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই এখনও আর কিছু বলিলাম না।

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটী স্পর্দ্ধার কথা আছে। উচ্চ শ্রেণীর দেশী সম্বাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন, অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে নিম্নশ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা বাংলা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না; কিন্তু এক্ষণে গতাসু ইণ্ডিয়ান অবজর্বর বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান অবজর্বর এবং ইণ্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এরূপ আর কোন ইংরেজি পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবজর্বর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মিরর অদ্যাপি উন্নত ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবং ঈশ্বরেচ্ছায় বহুকাল তদ্রূপ মঙ্গল সাধন করিবেন; তাঁহাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ। বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতেও তিনি যে এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাঁহার উদারতার সামান্য পরিচয় নহে।

সহৃদয়তা এবং, বল, আমি কেবল অবজর্বর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি এমত নহে। দেশী সম্বাদ পত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু পেট্রিয়ট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দেশবৎসল সহচরের দ্বারা আমি তদ্রূপ উপকৃত, এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সদ্বিদ্বান্ এবং যথার্থবাদী ভারতসংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট, ও তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আনুকূল্যের জন্য, আমি শত শত ধন্যবাদ করি।

চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।